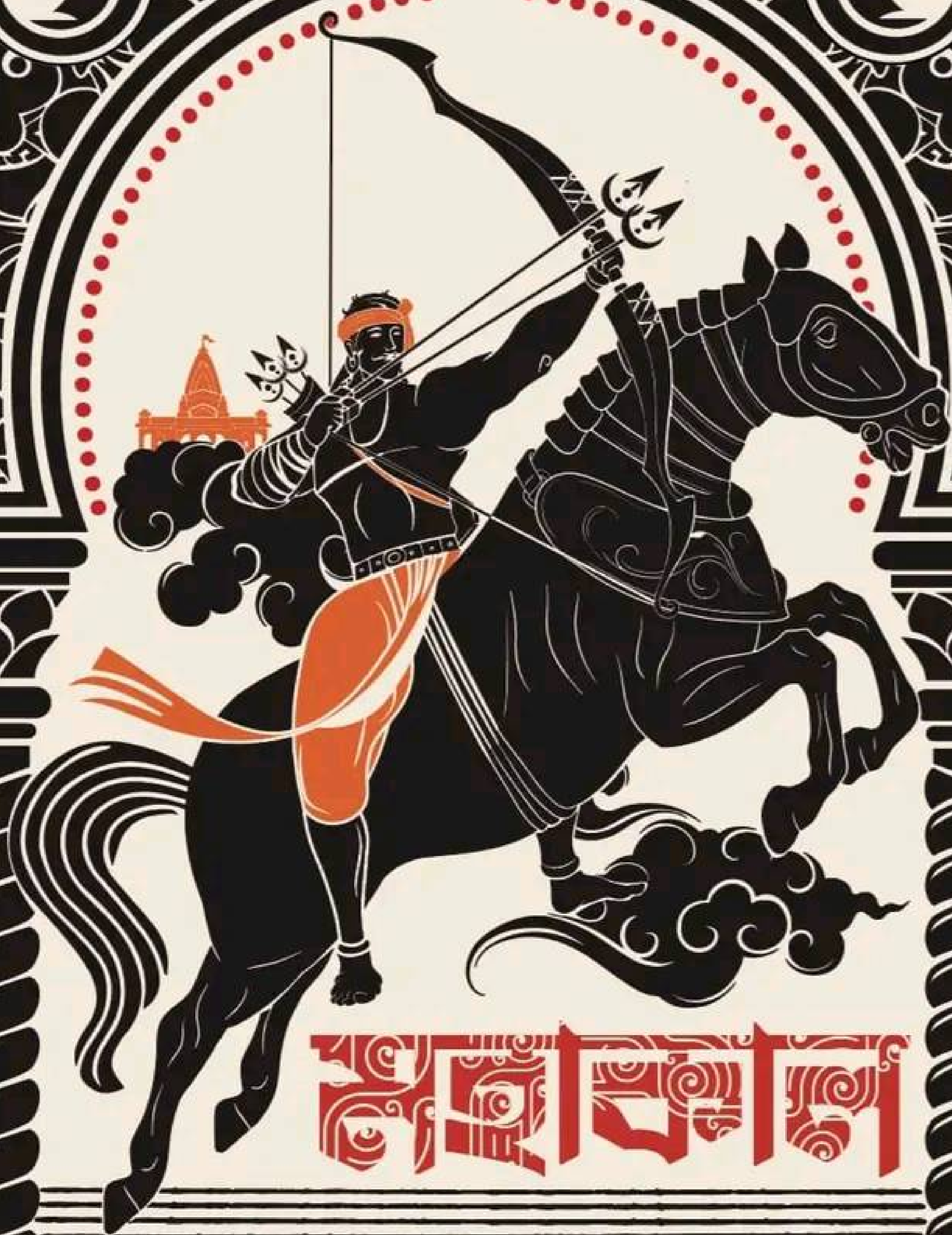
দিবাকর দাস



মহাকাল

দিবাকর দাস



ভূমিকা

ভূমিকায় প্রথমেই বলতে হচ্ছে মহাকাল লেখা শুরুর কথা। এই বইয়ের আগে আমি আরও কিছু বই লিখেছি। সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটা ছাড়া সবই ছোটো কলেবরের। কারো শব্দ সংখ্যাই পঞ্চাশ হাজার পেরোয়নি। একমাত্র যে বইটা এক লক্ষের বেশি শব্দ হয়েছিল, সেটা লিখতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যার সামনে পড়েছিলাম। সময় কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না। বাংলা ভাষার অন্যান্য অভাগা সাহিত্যিকের মতো আমারও ভাগ্য হয়নি শুধু লেখালেখি নিয়ে পড়ে থাকার। চাকরি করি, সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়, তার মাঝে একটু সময় মিললে লেখা নিয়ে বসতে হয়।

তবে লিখতে খুব ইচ্ছে করতো। মহাকালের গল্পটা আমার মাথায় ঘুরছে সেই ২০১৬-১৭ সাল থেকে। কিন্তু আমি লিখতে সাহস করছিলাম না। এত বিশাল কলেবরের লেখা আমি কি শেষ করতে পারবো? সেই সময়ই তো পাবো না। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সেই ভয়েই পুরো গল্পটা মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে আমাকে। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার সময় পাইনি।

কোভিড-১৯ আমাদের জীবনে একটা অভিশাপ হয়েই এসেছিল। আমার জন্যও তাই। অনিশ্চয়তায় ভরে গিয়েছিল জীবন। এই মাসের বেতন হবে কি না, বাড়ির মানুষ কেমন অবস্থায় আছে, মেয়েটা কেমন আছে, এসব চিন্তার মাঝে সারাদিন অলস বসে থাকতে থাকতে একদিন হঠাৎ মনে হলো, এখন তো আর সময়ের কোনো অভাব নেই, এখন তো ঐ বড়ো লেখাটা শুরু করাই যায়।

বেশ, শুরু হলো মহাকালের সাথে আমার যাত্রা। আসলে যাত্রা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, এইবার আমরা সঠিক বাহন খুঁজে পেলাম। তিন মাস ঘর থেকে বেরোতে পারলাম না, কেবল নিজের জন্য দুই বেলা রান্না করা, আর খাতা-কলম নিয়ে বসা। আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগলো মহাকাল।

তারপরে আরও অনেকটা সময় লেগেছে মহাকাল শেষ করতে। চূড়ান্ত রূপটা তৈরি করতে প্রায় দেড় বছর সময় লেগেছে। শেষ হবার পর একটা কথা ভেবেই আমার স্বস্তি লেগেছিল, হয়তো যা বলতে চাচ্ছিলাম তা বলতে সক্ষম হয়েছি।

মহাকাল গত অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল চিরকুট প্রকাশনী থেকে। বাংলাদেশের পাঠক বইটিকে যেভাবে আপন করে নিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন, তাতে পরিশ্রম সার্থক হবার সুললিত অনুভূতি আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে।

আমার অনেক দিনের আশা ছিল বাংলাদেশের মত পশ্চিমবঙ্গেও আমার বই প্রকাশিত হবে। আর সেই লক্ষ্যে পদ ফেলার জন্য মহাকালের চাইতে উত্তম সুযোগ হয়তো আমি পেতাম না। বুক লুক পাবলিশিংকে আমার এই লক্ষ্য পূরনে সাহায্যের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দিবাকর দাস

আমি সেই সময় দেখেছি। হ্যাঁ, তোমরা বিশ্বাস করো অথবা নাই করো, সেই উত্তাল সময়ের চাক্ষুস সাক্ষী আমি। আমাকে দেখলে অবশ্য তোমাদের তেমন কিছুই মনে হবে না। কালের সাক্ষী আমি, অথচ আমার দেহে সেই কালের কোনো ছাপ নেই। তবে শরীরে আশ্রয় নিয়েছে কালরূপ জরা। আমাকে সেই জরার অভিশাপ দিয়েছেন স্বয়ং কালরূপ ঈশ্বর। আমার অমরত্বই আমার অভিশাপ। যে বর পাওয়ার জন্য লোকে-অসুরে হাজার হাজার বছর তপস্যা করে, আমি সেই বর পেয়েছি। তবে, ভগবানের অভয় হস্ত থেকে নয়, তার ক্রোধরূপ ত্রিনয়ন থেকে।

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য নিজের চোখে দেখেছি। দেখেছি কীভাবে ঐশ্বর্য, শৌর্য, সামর্থ্য, বৈভব, পরাক্রম, পুত্র, রাজ্য থাকার পরেও মানুষ অসুখী হয়। কীভাবে সবচেয়ে যোগ্য এবং ধার্মিক ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞাপাশে বারবার নিজেকে বেঁধে ফেলেন। কীভাবে আত্মদংশন সবচেয়ে বীর যোদ্ধার তীর ভোঁতা করে দেয়। সিংহাসনের লোভ কীভাবে সবকিছু ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে। ন্যায়বান লোক ধর্মের জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করে গেছে। আর অধার্মিক নিজের জেদ আর লোভ বজায় রাখার জন্য বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে বারবার।

আমি আগুন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হতে দেখেছি। সে স্ফুলিঙ্গ ভস্ম করে দিয়েছিল সমগ্র আর্যাবর্ত। হত্যার পণ নিয়ে তার সাথে জন্মানো বালককেও আমি দেখেছি। ক্ষমা দেখেছি, প্রতিশোধ দেখেছি, বলিদান দেখেছি, স্বার্থপরতা দেখেছি, বীরত্ব দেখেছি, কাপুরুষতাও দেখেছি। ছল দেখেছি, আবার তার উল্টো পিঠে দেখেছি অদ্ভুত সারল্য।

পৃথিবীর সেরা ধনুর্ধরকে আমি দেখেছি। দেখেছি তার হাতে নিহত তারই সামনে পড়ে থাকা ঠিক তারই মতো আরেক যোদ্ধাকে। এক মায়ের না বলতে পারা কথা কীভাবে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে তাও আমি দেখেছি।

আমি কে সেটা জানতে চাচ্ছো? সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। শুধু জেনে রাখো, হ্যাঁ, আমি ঐ যুদ্ধ দেখেছি। ধর্মযুদ্ধ। আর্যাবর্তের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো লড়াই। যেখানে ধর্ম লড়াই করেছিল অধর্মের ব্রত নিয়ে। ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে করেছিলেন ছল। এক বালক যেখানে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দুঃসাহসিক অসম লড়াই লড়েছিল একপাল হিংস্র নেকড়ের বিরুদ্ধে।

হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম। সেই মহা সমরের অন্তিমে যে কয়জন যোদ্ধা বেঁচে ছিল, আমি তাদের একজন। সূর্যের উত্তরায়ণে তারা সবাই স্বর্গে গেছেন, বীরগতি প্রাপ্ত হলে মানুষ সেখানেই যায়। কিন্তু এক অভিশপ্ত আমি কোথাও যেতে পারিনি। মৃত্যু নামক মুক্তি তার কোলে আমাকে জায়গা দেয়নি।

আমিই সেই সর্বদোষের যুদ্ধে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজটা করেছিলাম। একবার নয়, দুবার। কিন্তু সেই শাস্তি কি এমন ভয়ানক হবে? কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে? এতগুলো বছর নরকের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? না-কি

সর্বযোদ্ধার সেরা যোদ্ধা, সর্ব রাজার শ্রেষ্ঠ রাজা, সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, ছল আর সারল্যের প্রভুর আমাকে নিয়ে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা আছে। তাতে আমিই বা কী করতে পারি? সহায় নেই, সম্বল নেই, শক্তি নেই, বন্ধু নেই। কারো কাছে নিজেকে যোদ্ধা বলে পরিচয় দিলে নিশ্চিত হাসবে। আমার জরাযুক্ত শরীর আর কপালে বাঁধা মোটা কাপড়ে আমাকে অশক্ত বৃদ্ধ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

সব পাপেরই না-কি প্রায়শ্চিত্ত আছে। সব প্রশ্নেরই নাকি উত্তর থাকে। কই, আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। কোন মহাজনের কাছে আছে আমার প্রায়শ্চিত্তের উপায়?

জানি, কোনো পথই আমার সামনে নেই। একটা কাজই করার আছে, তাই করি আমি। শুধুই প্রার্থনা। তাই তো প্রতি রাতে এই শিবমন্দিরে আসি। তখন কেউ থাকে না। পূজারী সন্ধ্যাপূজা শেষ করে সদর দরজা লাগিয়ে চলে যান। আর কেউ ঢুকতে পারে না। কিন্তু আমি ঢুকে পড়ি।

এই মন্দিরে আমার মতো লোকের ঢোকা বারণ। দিনের বেলা সবার উপস্থিতিতে সে চেষ্টা করা বৃথা। আমি অশুচি। আর অশুচি মানুষ মন্দিরে ঢুকলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে। কুকুর আর আমার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমি তা মানি না। কার ক্ষমতা বেশি? আমার শরীরের অশুচির, অপবিত্রতার না-কি দেবাদিদেবের? নিশ্চয়ই মহাযোগীর ক্ষমতা বেশি। আমার অশুচি স্পর্শে তিনি কিছুতেই অপবিত্র হবেন না। তবে আমিই হয়তো একদিন তার আশীর্বাদে শুচি হবো।

সেইদিনের অপেক্ষায় প্রতি রাতে তার পূজা করি। প্রতিদিন পালন করি একাহার ব্রত। একবার আহার করি প্রাতে, তাও শুধু কাঁচা ফলমূল।

আর অপেক্ষা করি। কবে আমার ফুল, বেলপাতা, জল আর ভক্তির স্পর্শে এই পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। মেয়াদ শেষ হবে আমার শাস্তির।

১

ইন্দ্রপুর গ্রামটা তেমন বড়ো না। এপাশ থেকে ওপাশে দুলকি চালে ঘোড়ায় যেতে বড়োজোর পাঁচ কলা সময় লাগে। তবে যে সীমা মানুষ ঠিক করে দিয়েছে, সে হিসেবে এই গ্রাম ঐশ্বর্যে, আয়তনে, লোকবলে কম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তা অকৃপণ হাতের দান কখনোই মানুষের সীমা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সেই হাত এই গ্রামকে প্রাণভরে দিয়েছে।

মাত্র ১৪০০ ধনু হবে পাশাপাশি দৈর্ঘ্যে। অনেক আগে একবার রাজার লোক এসে মেপে গেছে। তখন এই গ্রামের অনেক বৃদ্ধ লোক যুবক ছিল। তবে সেই মাপ একেবারে ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। রাজার লোক সব কাজেই অমনোযোগী। মোটামুটি নমঃ নমঃ করেই শেষ করে। শুধু একটা কাজেই তাদের জুড়ি মেলা ভার। যখন খাজনা আদায় আর নানা ছুতায় অত্যাচার করা হয়, তখন তাদের পূর্ণ উৎসাহ থাকে। সেই উৎসাহের বেশিরভাগ যদিও কাজের থেকে বেশি প্রজার পিঠের দিকেই থাকে।

ইন্দ্রপুরে বিধাতার আশীর্বাদ আছে। জমি উর্বর। পাশের কৃপা নদী চওড়ায় কম হলেও ক্রমাগত জলের জোগান দেয়। ফল, কাঠ আর ওষুধি গাছের অভাব নেই। গো পালনের জন্য যথেষ্ট ঘাসজমিও আছে। তবে অভাব আছে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের। রাজার কোষাগার ভরিয়ে লোকের নিজের গোলায় খুব কমই জমা থাকে। প্রতি বছরেই বিফলে যায় বিধাতার আশীর্বাদ।

অসিত কৃপা নদীর তীরে বসে আছে। এই ইন্দ্রপুরের সবচেয়ে সহায়সম্বলহীন মানুষ সে। তার কিছুই নেই। তাই তার চিন্তাও কম। পনের বছরের রোগা পাতলা দেহে অপুষ্টির অভাব স্পষ্ট। তার বাবা কোনো চাষের জমি রেখে যাননি। ছিলই না তো রেখে যাবেন কীভাবে। পারিবারিক একটা সম্পত্তি অবশ্য সে পেয়েছে। সে কথায় পরে আসছি।

চাষের জমি না থাকায় ভীষণ সুবিধা হয়েছে এক দিক থেকে। রাজার কর আদায়কারীর খাঁড়ার নিচে তাকে পড়তে হয় না। তাকে শুধু দুবেলা নিজের খাবারের চিন্তা করতে হয়। আর কোনো চিন্তা নেই। রাজা মহানুভব। অসিতের জঙ্গলের ধারের ঘাসলতার কুটির আর কৃপা নদীর জলের ওপর কোনো খাজনা বসাননি তিনি। তাই একটা পেটের চিন্তা করলেই চলে যায় তার।

না, কথাটায় একটু ভুল হলো। একটা না, দুটো পেটের চিন্তা করতে হয় তাকে। তার সাথে সবসময় আরেকজন থাকে। তার বাবার থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া সম্পত্তি। এই সম্পত্তি স্থাবর নয়, জঙ্গম। একটা প্রাণ, নাম অঙ্গদ। তার পরিবারের এই দুই সদস্য। অঙ্গদ থাকাতে একা থাকার কষ্ট সহ্য করতে হয় না তাকে।

অঙ্গদ এখন তার সামনেই আছে। নদীর কিনারে কী যেন খুঁজছে সে। অনেকক্ষণ ধরেই চলছে এই কাজ। অসিতের খিধে পেয়েছে। কুটিরে কিছু নেই। তবে তাতে এমন কোনো ক্ষতি নেই। গ্রামের পাশের জংগলের গাছ থেকে ফল পেড়ে খেয়ে নিলেই হলো। তবে সে কাজ অবশ্যই করতে হবে লোকের চোখ এড়িয়ে। জঙ্গল রাজসম্পত্তি। সেখান থেকে ফল পাড়তে হলে রাজার লোকের অনুমতি নিতে হয়। তার কাছে অনুমতি নেবার

মুদ্রা নেই। তাই আপাত দৃষ্টিতে রাজার হিসেবে চুরি করতে হবে। চুরি করে অনেকেই জঙ্গলের ফল পাড়ে। সেখানে গিয়েই দেখা যাক। পাহারা দেবার তো কেউ নেই।

'অঙ্গদ, এদিকে আয়।'

নিজের নাম শুনে খুব মনোযোগ দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকা অঙ্গদ চোখ তুললো। মুখ করুণ করে আরেকটু সময় প্রার্থনা করলো সে। যা খুঁজছে তা এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু আর সময় দিতে নারাজ অসিত,

'অনেক হয়েছে। আর খুঁজতে হবে না। চলে আয় এখন। আজ আমাদের কপাল খারাপ। খেতে হলে জঙ্গলে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে আয় বলছি।'

আর অনুরোধ করলো না অঙ্গদ। লেজ নেড়ে অসিতের পায়ের কাছে বসলো সে এক লাফে। তারপর গা বেয়ে উঠে গেল কাঁধে।

অঙ্গদ অসিতের পরিবারের একমাত্র সদস্য। একটা বানর। অসিতের বাবা যখন মারা যান তখন দুটো বানর রেখে গিয়েছিলেন। বানরের খেলা দেখিয়ে সংসার চালাতেন তিনি। ছেলেকেও শিখিয়েছেন সেসব খেলা। তবে শিক্ষা পুরোপুরি সমাপ্ত হয়নি। তার আগেই বাবা পরলোকে চলে গেছেন। কিছুদিন পরে দুটো বানরের মধ্যে বুড়ো বানরটা মরে যায়। পোষা বানরেরা না-কি মালিকের মৃত্যুর পর বেশিদিন বাঁচে না।

মা আগেই মরে গেছেন। শেষ পর্যন্ত দশ বছরের অসিত দুই বছর বয়সি অঙ্গদকে নিয়ে যতটুকু জানা আছে ততটুকু খেলা দেখাতে শুরু করলো। প্রথমে অনেক ভয় পেয়েছিল সে। খেলা দেখাতে পারবে তো? না-কি লোকে তার মতো ছোটো ছেলের সাথে এই নেংটি বাঁদরের খেলা দেখতেই চাইবে না। হয়তো দূরদূর করে তাড়িয়ে দেবে। পয়সা অথবা মুদ্রা রোজগারের আশাও করেনি অসিত। কেবল সে আর অঙ্গদ দুজনে দুবেলা খেতে পারলেই হলো।

তবে ভাগ্য তার সহায় হয়েছিল। তার আশংকা ছিল অমূলক। একটা ছোটো ছেলে আর ছোটো আদুরে বানরের খেলা বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখত লোকে। খাবার, শস্য বেশ জুটত। সেগুলো জমিয়ে মাঝে মাঝে পঞ্চায়েতের বাজারে বিক্রি করতো সে। বেশ কিছু তামার আর রুপার টাকা জমেছিল। একবার তো রাজার বাড়ির এক লোক তার খেলা দেখে গোটা গোটা দুটো স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়েছিলেন। তামা আর রুপার টাকা সব খরচ হয়ে গেলেও সেই স্বর্ণমুদ্রা দুটো এখনো লুকানো আছে তার কাছে।

সে কখনো ভাবেনি তার রোজগার কমে যাবে। তবে তার ভাবনাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে তার আয় ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলো। বড়ো হয়ে উঠেছে সে আর অঙ্গদ পূর্ণ আকৃতি লাভ করেছে। সাথে সাথে তাদের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমেছে। একই খেলা দেখে আর তারা চমকিত হয় না। আর বিনোদনের সবচেয়ে ভালো সহায়ক হচ্ছে এই চমক। আর যতই চমকের সাথে সাথে বিনোদনের অভাব হতে লাগলো ততই মানুষের গোলা থেকে অসিতের জন্য বরাদ্দ শস্যের পরিমাণও কমতে থাকে। এখন তো অনেকে ওকে বাড়িতে ঢুকতেই দেয় না। মুখের ওপর বলে, 'না বাবু, তোমার এই খেলা অনেক দেখেছি। আর দেখতে চাই না। অন্যদিকে যাও।'

অসিত ঘরের দুয়ার থেকে বিরস মুখে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে কৃপা নদীর তীরে বসে থাকে অনেকক্ষণ। একমাত্র এই জায়গাতে এলেই তার মাথা থেকে দুনিয়ার সকল চিন্তা উধাও হয়ে যায়। এই শীতল জল শুধু বুকের তৃষ্ণা না, সাথে মনের তৃষ্ণাও মিটিয়ে দেয়।

অঙ্গদ বয়সের সাথে সাথে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। অসিতের মতো রোগা নয়। মৃত্যুর সময় অসিতের বাবা বলে গিয়েছিলেন, 'এই বানরকে তুই শুধু খেলা দেখিয়ে রোজগারের উপায় হিসেবে ভাববি না। তাহলে আর বানর তোর কথা শুনবে না। মনে রাখবি, এটা তোর ভাই। দুজনে মিলে রোজগার করবি, দুজনে মিলে খাবি। তুই যেহেতু বড়ো ভাই, তুই খাবি পরে আর অঙ্গদ খাবে আগে। আগে ছোটো ভাইয়ের পেট ভরাবি।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল অসিত। আসলে বাবা তার স্বার্থের জন্যই কথাটা বলেছিলেন। চাষীর যেমন বলদকে সুস্থ না রেখে উপায় নেই, সহিসকে যেমন অবশ্যই ঘোড়াকে সুস্থ রাখতে হয়, তেমনি তাকে অঙ্গদকে সুস্থ রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনে। সেও অঙ্গদের দিকে বেশ ভালো করেই খেয়াল রাখে।

তার বাবা তাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'শোন, মানুষের আয়ু আর বানরের আয়ু এক না। তুই অনুমান একশো বছর বাঁচবি, যদি আমার মতো কোনো শক্ত অসুখে না পড়িস। কিন্তু বানর বাঁচে বড়োজোর পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর। খুব বেশি যত্ন করলে হয়তো চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। তবে ত্রিশ বছরের পরে আর লাফালাফি করে খেলা দেখাতে পারবে না। তাই সবসময় টাকা জমানোর দিকে খেয়াল রাখবি। আর যখন যথেষ্ট টাকা জমবে তখন একটা ছোটো খোজা বানর কিনে নিবি। তাতে তোর লাভ হবে। এই বানর মরলে ঐ বানর দিয়ে খেলা দেখাবি, আর এমনিতেও ছোটো আর বড়ো বানরের খেলা একসাথে দেখতে লোকে পছন্দ করে।'

বাবার সব উপদেশ মেনেছে সে। অঙ্গদকে কখনো ক্ষিধের কষ্ট করতে হয়নি। নিজে না খেয়ে হলেও ওকে খাইয়েছে। তবে ছোটো বানর কেনার জন্য যথেষ্ট পয়সা জমেনি। আছে শুধু দুটো সোনার মুদ্রা। তাতে মনে হয় হবে না। সে জানে সোনার মুদ্রা মূল্যবান, তবে ঠিক কতটা মূল্যবান তা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। কখনো পরখ করে দেখা হয়নি। কাউকে দেখাতেও ভয় হয়। যদি কেড়ে নেয়।

শরীর রোগা হলেও অঙ্গদের দশ সের ভার তাকে তেমন কষ্ট দিচ্ছে না। পুরোটাই অভ্যাসের বিষয়। জঙ্গল দেখা যাচ্ছে এখন। বেশি সময় লাগবে না। অঙ্গদকে ইশারা দিলেই সে দুজনের জন্য পর্যাপ্ত ফল নিয়ে আসবে।

কিন্তু জঙ্গলের সামনে এসে আশা ভঙ্গ হলো তার। একটু ভয়ও পেলো। দশ বারোজন সশস্ত্র সজ্জিত সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের পাশে বেশ বড়ো একটা লাল কাপড়ের তাবু। সে তাবুর ভেতরে হয়তো আরো সৈনিক আছে। তাবুর বাইরে রান্নার জায়গা, পানি রাখার পাত্র আর নানা দরকারি জিনিস রাখা। দুটো বাঁশ মাটিতে পুঁতে তার সাথে আরেকটা বাঁশ আড়াআড়ি বাঁধা আছে। সেই বাঁশের সাথেই বাঁধা আছে সৈনিকদের ঘোড়াগুলো।

সৈন্যরা এখানে ছাউনি ফেলেছে। এরা রাজার সৈনিক। অসিত অবাক হলো। এই জায়গায় তো এখন ছাউনি পড়ার কোনো কারণ নেই। ডাকাতদল রাজমার্গের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের ওপর হামলা চালায়। আর যেসব জায়গায় এমন ডাকাতের উপদ্রব বেশি সেখানেই এমন ছাউনি ফেলে সেনারা। কিন্তু এই জঙ্গলে কোনো রাস্তা নেই। স্বভাবতই পথিক নেই, আর ডাকাতদল থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এরা এই ঘরে ছাউনি ফেললো কেন?

বিস্ময়ের ধাক্কায় চলতে চলতে বানর কাঁধে নিয়ে সৈন্যদের একটু বেশি কাছে চলে এসেছিল অসিত। এক সৈন্যের নজরে পড়ে গেল সে.

'এই কে রে ওখানে? এদিকে আয়। খবরদার দৌড় দিবি না। বল্লম দিয়ে একেবারে এফোঁড়ওফোঁড় করে দেবো।'

দৌড় দেবার প্রশ্নই ওঠে না। সৈন্যের ধমক শুনে স্নায়ু স্তব্ধ হয়ে গেছে তার। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে সৈন্যদলের দিকে।

'নাম কী রে তোর? থাকিস কোথায়?'

'আমার নাম অসিত। এই গ্রামেই থাকি।'

আরেক সৈন্য যোগ দিলো আলোচনায়। একটু আনন্দের উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে,

'তোর কাঁধের এই বানর কী করে রে? বানর দিয়ে জঙ্গলের ফল চুরি করতে এসেছিস তুই। বুঝতে পেরেছি।'

অসিত তো সেই কারণেই এসেছিল। তবে তা তো আর স্বীকার করা চলে না, 'না, এটা আমার পোষা বানর। আমি এই বানর দিয়ে খেলা দেখাই। চুরি করি না। এদিকে এমনিতেই হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি।'

'তাই না-কি?' এবার মোটামুটি সব সৈন্য জড়ো হয়ে গেছে, 'নে, তাহলে তো ভালোই হলো। এবার তাহলে খেলা দেখা। দেখি তোর বানর কেমন খেলা দেখায়। যদি খেলা আমাদের ভালো লাগে তাহলে তোকে ছেড়ে দেবো। আর যদি ভালো না লাগে, তাহলে বুঝবো, তুই আসলে খেলা দেখাস না, আর তুই আর তোর বানর চুরি করতেই এসেছিস। তাহলে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে যাবো। তুই যাবি গারদে।'

অসিতের গলায় এবার কান্না চলে এলো, 'না, আমি চুরি করতে আসি নাই। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে তো দেবো। তবে তার আগে খেলা দেখা।'

'এখন কীভাবে খেলা দেখাবো? আমার খেলা দেখানোর সবকিছুই ঘরে রয়ে গেছে। ওগুলো আমি নিয়ে আসি। তারপর আপনাদের খেলা দেখাবো।'

'আহারে বাছা। তোর তাহলে খেলার জিনিস নেই। কিন্তু তোমাকে তো এখন আমরা যেতে দেবো না। তাহলে তুমি পালিয়ে যাবে। আচ্ছা তোকে এখন আমি শিখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে খেলার জিনিস ছাড়া বানরকে দিয়ে কীভাবে খেলা দেখানো যায়। এই দেখ'

নিমেষে তলোয়ার বেরিয়ে এলো সৈন্যের হাতে। আতঙ্কিত চোখে চকচকে ফলার দিকে তাকালো অসিত।

'এই দেখ' সৈন্য তলোয়ার ঘোরায়। তলোয়ারের আগার হালকা একটা খোঁচা দিলো অঙ্গদের পিঠে। ভারী ধারালো তরোয়ালের ছোটো খোঁচাতেই অঙ্গদের শরীরে তীক্ষ্ণ জ্বালা ছড়িয়ে পড়লো। এক লাফে অসিতের ঘাড় থেকে মাটিতে পড়লো সে। জংলী বানর হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে অঙ্গদ সৈনিকের দিকে মুখচোখ খিঁচিয়ে ছুটে যেতো। তবে সে দীর্ঘকাল মানুষের সাথে থেকেছে, সভ্য হয়েছে। সভ্যতার নানা গুণের সাথে একটা বড়ো দোষও অর্জন করেছে সে। আর তা হচ্ছে ভয়। ভয়ে অসিতের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

সৈন্যরা খেলাটায় মজা পেয়েছে। তলোয়ার আর বর্শা হাতে ওদের দুজনকে ঘিরে ফেললো তারা। তারপর এলোপাথাড়ি খোঁচা দিতে লাগলো।

অঙ্গদকে বাঁচাতে বেশির ভাগ খোঁচাই নিজের গায়ে নিলো অসিত। ওরা দুতরফা খেলা দেখছে। শুধু বানর না, বানরের মালিকও লাফিয়ে নেচে খেলা দেখাচ্ছে। সৈন্যদের মিলিত অট্টহাসির কাছে অসিত আর অঙ্গদের মিলিত কান্না আর আর্তনাদের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ক্ষান্ত দিলো সৈন্যরা। ঘটনার উদ্যোক্তা সৈন্য বলে উঠলো, 'যা এখান থেকে। আর কখনো এদিকে আসবি না। যদি আসিস তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবি না। যা, ভাগ।'

অসিত কোলে তুলে নিলো অঙ্গদকে। তারপর এক দৌড়ে সৈন্যদের থেকে দূরে চলে এলো। জায়গায় জায়গায় শরীর কেটেছড়ে গেছে। জ্বালা করছে। অঙ্গদের শরীর অত কাটেনি। তবে তারও দুই থেকে তিন জায়গায় রক্ত বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি উমা পিসির বাড়ি যেতে হবে। পিসির বাড়িতে একটা ফুল গাছ আছে। সেই গাছের পাতার রস লাগালেই বন্ধ হয়ে যাবে এই রক্ত।

উমা পিসির পরিচয় এখানে একটু দিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি অসিতের আপন পিসি না। তার সাথে রক্তের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই তার। গ্রামে এমন সম্পর্ক অনেক দেখা যায়। অসিতের মুখবোলা পিসি উমা। তবে মুখবোলা হলেও পিসি তাকে অনেক ভালোবাসেন।

তাড়াতাড়ি পা চালালো অসিত। সংস্কার তাকে একবার মুখ তোলালো আকাশের দিকে। সাহায্যের আশায় না-কি বিচারের তা ঠিকমতো বোঝা গেল না। দেবতাদের তাদের মতো লোকের দিকে নজর দেবার সময় নেই। তারা বড়ো বড়ো মন্দির বানাতে পারে না, স্বর্ণমূর্তি বানিয়ে সেই মন্দিরে রাখতে পারে না, শ ব্রাহ্মণে গো দান করে যজ্ঞও করতে পারে না। তাহলে আর দেবতারা তাদের দিকে তাকাবেন কেন।

উমা পিসিদের বাড়ি জীর্ণ হলেও বেশ সাজানো গোছানো। লক্ষ্মীশ্রী আছে। পিসি বিধবা। বিপত্নীক শ্বশুর আর এক ছেলেকে নিয়ে সংসার। জমি জমা আছে মোটামুটি। সেখানে ভাগচাষীরা চাষ করে। ধনী বলা যাবে না, তবে মোটামুটি চলে যায়।

অসিত যখন দরজা দিয়ে ঢুকলো, তখন পবনকে দেখতে পেলো সে। পবন উমা পিসির ছেলে। সে বাইরের উঠানে খেলছিল। অসিতকে দেখেই মাকে খবর দিতে ঘরের ভেতরে চলে গেল সে,

'মা, অসিত দাদা এসেছে।'

উমা পিসি সিকে বুনছিলেন। অসিতের আসার কথা শুনে স্নেহাস্পদ মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। কাজ ফেলে উঠে ছেলেকে কপট শাসন করলেন তিনি, 'হ্যাঁ, আসছি। তোকে আর মাটিতে গড়াগড়ি করে খেলতে হবে না। সারা শরীর তো আবার ময়লা করে ফেলেছিস। একদিনে কবার স্নান করাবো?'

পবন বিশেষ পাত্তা দিলো না। সে আবার উঠানের দিকে ছুটে গেল তার অসমাপ্ত খেলা শেষ করতে।

বাইরে এসে অসিতকে দেখে আঁতকে উঠলেন উমা পিসি। অসিতের দেহের অন্য ক্ষতগুলো প্রথম দেখাতে দৃশ্যমান না হলেও চিবুক থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত সহজেই ওনার চোখে পড়ে গেল।

আর্তনাদ বেরিয়ে এলো উমা পিসির গলা দিয়ে, 'কী হয়েছে তোর? গালে কাটলো কীভাবে?'

'সে অনেক কথা পিসি। জঙ্গলের ধারে সৈন্যদের শিবির পড়েছে। ওরা বর্শা আর তলোয়ার দিয়ে আমাকে আর অঙ্গদকে খোঁচা দিয়েছে। অঙ্গদের শরীরও কেটেছে অনেক জায়গায়।'

'আচ্ছা তুই একটু বস এই পাশটায়। আমি গাছ থেকে পাতা নিয়ে আসছি।'

পাতা এনে পাথরে ঘষতেই পাওয়া গেল রস। সেই রস লাগাতে রক্ত বন্ধ হতে শুরু করলো আস্তে আস্তে। অঙ্গদের ক্ষতেও ওষুধ লাগিয়ে দিতে লাগলেন পিসি। ব্যথা কমে আসতে অঙ্গদের ছটফটানিও কমে আসতে লাগলো অনেকটা।

উমা পিসির শ্বশুর আদিনাথ একটু জমির তদারকি করতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় বাড়িতে ঢুকলেন তিনি। চিকিৎসা কার্য সচক্ষে দেখলেন তিনি, 'কী হয়েছে পবনের মা?'

'দেখুন তো বাবা। জঙ্গলের ধারে না-কি সৈন্য শিবির পড়েছে। ওখানে গিয়েছিল অসিত। তারপর সৈন্যরা ওদের এই হাল করেছে।'

আদিনাথ ঘরের দাওয়ায় বসলেন। বুড়ো শরীরের সাথে সাথে স্বরও ক্লান্ত, 'সৈন্য শিবির রাজ্যের সব জঙ্গলে পড়েছে মা। রাজা জঙ্গলের ফল আর কাঠ থেকে প্রজা আর পশুপাখির অধিকার তুলে দিয়েছেন।'

'কেন বাবা? আমাদের দেশে কি ফলের অভাব? এই ফল দিয়ে রাজা কী করবেন?'

'ব্যবসা করবেন গো মা। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।'

'আমাদের দেশে ফল কিনবে কে? মানুষের তো নিজস্ব গাছ আছে অনেক।'

'কিনবে। আমাদের দেশের লোকে হয়তো কিনবে না। তবে ব্যবসা এখন আমাদের দেশ থেকে সমুদ্রের ওপারে চলে গেছে। সমুদ্রের ঐ পাড়ের রাজ্যে নাকি আমাদের দেশের এসব ফল, মসলা পাওয়া যায় না। এইসব ফল শুকিয়ে তেলে ডুবিয়ে আচার বানিয়ে বিক্রি করলে নাকি তাদের থেকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আয় করা যায়। তাই যতো রাজসম্পত্তি জঙ্গল আছে সেগুলো এখন থেকে রাজা সেনা দিয়ে পাহারা দেওয়াবেন। ঘরে জল আছে না মা?'

'হ্যাঁ বাবা, আপনি বসুন। আমি দিচ্ছি। এই পবন, দাদুকে একটু বাতাস করো।'

'থাক, তুমি অসিতের গায়ে ওষুধ লাগাও। আমি জল নিয়ে নিচ্ছি।'

ওষুধ লাগানো শেষ হলো। পিসি এবার ঘটনার বিস্তারে ফিরে গেলেন, 'তুই জঙ্গলের ওদিকে গিয়েছিলি কেন?'

উত্তর দিলো না অসিত। তবে তার নিচু শুকনো মুখ দেখে আন্দাজ করে নিলেন পিসি, 'দুপুরে কিছু খাসনি তাই না? দাঁড়া, এখন তো ভাত নেই। সকালে কয়েকটা ক্ষীরপুলি বানিয়েছিলাম। তার কয়েকটা দিচ্ছি, খেয়ে নে।'

মাথা নিচু করেই ঘাড় কাত করলো অসিত, 'অঙ্গদও কিছু খায়নি পিসি।'

পিসি হাসলেন, 'আমি জানি। অঙ্গদের জন্য গাছের কলা আছে ঘরে। ওকে কয়েকটা দিলেই ও পেট ভরে খেতে পারবে।

পিঠে খাবার সময় পবন এসে হাজির হয়েছে। তারও ক্ষীরপুলির ভাগ চাই। অঙ্গদ কলায় মন দিয়েছে।

একটু আগের বিভীষিকা অসিতের মন থেকে কেটে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

২

রাত্রির তৃতীয় প্রহর। প্রাসাদ জুড়ে এখন আলোআঁধারির খেলা চলছে। সন্ধ্যের সাথে সাথে জ্বেলে দেওয়া প্রদীপগুলোর তেলের পরিমাণ আর সলতের দৈর্ঘ্য দুই-ই কমছে। সেই সাথে আলোর ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, আঁধার দখল করে নিচ্ছে আলোর সীমানা। আর আলো যতই কমছে ততই প্রহরীদের চোখের পাতা মেলে রাখার ক্ষমতাও কমছে।

অজয়নাথের আঁধারে কোনো সমস্যা নেই। বরং এই আঁধারের বেড়ে যাওয়া তার জন্য আজ রাতে আশীর্বাদ। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই রাজ্যে এসেছিল সে। অজয়নাথের পরিচয় সে রাজার বাহিনীর একজন সদস্য। তবে এটা আসল নয়। অজয়নাথ আসলে একজন সত্রী। সোজা করে বললে বিশেষ ক্ষমতাশালী গুপ্তঘাতক।

ছোটোবেলাতেই বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে সে। এই অবস্থায় আর সবার যেখানে স্থান হয় তারও তাই হয়েছে। আশ্রয় নিয়েছে এক গুরুগৃহে। সে গুরুর আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হতো তার মতো অনাথ ছেলেদের। সেই সাথে বাবা-মা বেঁচে থাকা ছেলেরাও শিক্ষা নেয়। তবে সেই গুরুকুলের একটা গুপ্ত অংশ আছে। সেই অংশে বিশেষ ছেলেদের গুপ্তচর বৃত্তি আর সত্রী হবার শিক্ষা দেওয়া হয়। অজয়নাথ সে শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তার গুরুর খুব পছন্দের শিষ্য ছিল সে।

সত্রীরা একই সাথে খুব ভালো গুপ্তচর আর গুপ্তঘাতক হয়। নিজেদের পরিচয় সারাজীবন লুকিয়ে রাখতে হয় তাদের। অনেক রাজাই গোপনে সত্রী পালন করেন। তবে কিছু রাজা এবং ক্ষমতাশালী লোকেরা নিজের কাজ সমাধার জন্য সত্রী ভাড়াও করেন। এখানে একজন রাজা অঢেল স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে অজয়নাথকে ভাড়া করেছেন।

কিছু স্বর্ণমুদ্রা আগাম পাওয়া গেছে। আর আসল কাজটা শেষ করতে পারলে বাকিটা পাওয়া যাবে। তাতে এক নিমেষে অনেক ধনী হয়ে যাবে সে। তবে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি কাজটাও বেশ কঠিন। বলতে গেলে বর্তমান আর্যাবর্তের সবচেয়ে কঠিন কাজ।

এই প্রাসাদে প্রবেশ করতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। বেশ বড়ো আর ধৈর্যশীল একটা পরিকল্পনা করতে হয়েছে। ছোটোবেলা থেকে ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে তার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আর ধৈর্য দুটোই প্রায় অসীম।

প্রথমে রাজার সেনাদলে সাধারণ একজন সৈন্য হিসেবে যোগদান করে সে। তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। ছোটোবেলা থেকেই সব ধরনের অস্ত্র আর কৌশলে শিক্ষা নিয়েছে সে। তবে সেসব পুরোপুরি সৈন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দেখায়নি সে। যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই দেখিয়েছে। সুযোগ্য সৈনিক গায়ের জোরের সাথে সাথে বুদ্ধির জোরেও এগিয়ে থাকে। তার শেখা অস্ত্রবিদ্যার মৃদু ঝলকই সৈন্যবাহিনীতে ঢোকার জন্য যথেষ্ট ছিল।

তারপর শুরু হয় ছদ্মজীবন। সেনাদের নবিশ থেকে পাকা যোদ্ধা বানানোর প্রশিক্ষণ সেও নিতে লাগলো। মনে মনে হাসলেও মুখে কিছু বলার সুযোগ নেই। অভিনয় এত পাকা হলো যে তার কোনো প্রশিক্ষক তার আগে থেকেই শিখে আসা বিদ্যার ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারেনি।

প্রায় একবছর প্রশিক্ষণ নেবার পরে এলো সুযোগ। রাজপ্রাসাদে রক্ষী নেওয়া হবে। সৈন্যদের থেকে লোক বাছাই করা হবে। নিজের নাম পরীক্ষার্থী তালিকায় ঢুকিয়ে দিলো অজয়নাথ। অনেকেই দিয়েছে। রক্ষী বাছাই করার প্রক্রিয়া বেশ কঠিন। অনেক যুদ্ধ কৌশলের পরীক্ষা নেওয়া হলো। সাথে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ। যোগ্যতা বলে নিজেকে টিকিয়ে নিলো অজয়নাথ। তারপর প্রবেশ করলো রাজধানীতে। তার সাথে আরো চুয়াত্তর জনকে আনা হয়েছে এখানে। প্রায় এক মাস আগে।

এই এক মাস সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে রাজপ্রাসাদ আর তার প্রতিরক্ষার নানা নিয়ম সম্পর্কে। রাজপ্রাসাদের প্রতিটা কোণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। প্রতিটা ঘর, অস্ত্রাগার, মন্ত্রণাকক্ষ, রাজার নিবাস, রাজসদস্যদের বিশ্রামঘর সব। সবগুলো গুপ্তঘর আর গুপ্তপথ সম্পর্কেও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অজয়নাথের কাজের জন্য তাতে সুবিধাই হয়েছে। সে মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছে। এরমধ্যেই গুপ্তপথ সম্পর্কে সে পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছে। কাজ শেষ করে ঐ গুপ্তপথগুলোর একটা দিয়েই এখান থেকে বেরোতে হবে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে দেওয়ালগুলোতে। দেওয়ালে গা ঘেঁষে এগোতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। চারিদিকে আশ্চর্য নীরবতা। পাশের গোদাবরী নদীর বয়ে চলা জলের আওয়াজ মৃদু কানে আসছে। জায়গায় জায়গায় মশালের সলতের পুড়ে যাবার চিড়বিড়ে আওয়াজও কানে আসছে তার। তবে এই নিঃশব্দের মাঝে একেবারে কোনোরকম শব্দ না করে চলাফেরা করার অভ্যাস অজয়নাথের পুরোপুরি আয়ত্ত করা আছে। আধো ঘুমে ঢুলতে থাকা প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে সে পৌঁছে যেতে লাগলো রাজপ্রাসাদের গভীরে। অন্দরমহলের দিকে। যেখানে রাজপরিবারের সদস্যরা বাস করেন।

কোমরে শুধু একটা ধারালো ছুরি আছে তার। আর কোনো অস্ত্র সাথে নেয়নি। অতিরিক্ত অস্ত্র সত্রীরা নেয় না। তাতে চলাফেরায় অসুবিধা হয়, শব্দ হবার শঙ্কা থাকে। তবে এই ছুরি দিয়েই কাজটা নির্বিঘ্নে হয়ে যাবার কথা। অনেকদিনের পরিচিত হাতলের ওপর আরেকবার হাত বুলিয়ে নিলো সে।

কাজটা আজ রাতেই করতে হতো। আর কোনো উপায় ছিল না। আজ সকালে তাদের শেষবারের মতো পরীক্ষা হয়েছে। তবে সে পরীক্ষায় কেউই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। রাজপরিবারের প্রহরী হবার নিয়ম অনেক শক্ত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কোনো সুযোগ নেই। ওদের সবাইকেই কাল পাঠিয়ে দেওয়া হবে রাজধানীর বাইরের সৈন্য শিবিরে। তারপর আবার অন্য শিবিরের সৈন্যদের মাঝ থেকে বেছে নেওয়া হবে রাজপ্রহরী।

তাই আজ রাতটাই হাতে আছে। এবং অজয়নাথের জন্য তাই যথেষ্ট। অন্দরমহলের সদর দরজা খুলে ঢুকে পড়লো সে। তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে গেল রাজার শয়নকক্ষের দিকে। প্রাসাদের সব ঘরই এখন তার চেনা। মহারাজ এখানেই নিদ্রা যান।

নিশ্চয়ই একা নেই এখন মহারাজ। রানি অথবা অন্য কোনো শয্যাসঙ্গিনী আছে। নারী হত্যায় অজয়নাথের রুচি নেই, তবে যদি দেখা যায় কোনো সংশয় অথবা তার ধরা পড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহলে রাজার শয্যাসঙ্গিনীকেও ছাড় দেওয়া হবে না।

গত এক মাসে শেখানো মানচিত্র পুরো মাথায় গেঁথে আছে তার। অন্দরমহলের প্রতিটা প্রহরীকে এড়িয়ে সে এসে পৌঁছল শয়নকক্ষের সামনে। জানালায় একবার কান পাতলো। না, ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসছে না। ঘুমন্ত রাজার নিঃশ্বাসের শব্দ মনে হচ্ছে একটু কানে আসছে।

সদর দরজা দিয়ে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। সে জানে, ওখানে এখন দুইজন প্রহরী আছে। তবে এই ঘরে ঢোকার দুটো গুপ্ত রাস্তা আছে। একটা রাজা ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদেরও শেখানো হয়নি। আরেকটা জানে সে। সেটা দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়লো। সেই অন্ধকার গুপ্ত রাস্তায় ঢুকেই নিজের সাথে রাখা ছোটো মশাল জ্বাললো সে। অন্ধকার গুপ্তপথে সেই আলো যথেষ্ট। এই মশাল বিশেষভাবে তৈরি। সহজেই জ্বলে আবার সহজেই নিভিয়ে ফেলা যায়। এমনিতে নিজে নিজে সহজে নেভে না।

গুপ্তপথের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলো অজয়নাথ। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস নিলো। এবার আসল কাজের পালা। তবে করতে হবে একেবারে নিঃশব্দে। নইলে এই প্রাসাদ থেকে স্বর্ণমুদ্রা ভোগ করার জন্য বেঁচে বেরোতে হবে না।

গুপ্তপথের দরজা খোলার কৌশলও গুপ্ত। দেওয়ালের একটা পাথর চাপ দিয়ে দাবিয়ে দিতে হবে। তারপর ধাক্কা দিয়েই খুলে যাবে দরজা। পাথরটা চাপ দিয়েই হাতের মশাল নিভিয়ে কোমরে গুঁজে রাখলো সে। তারপর ধীর হাতের চাপে খুলে ফেললো দরজা।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্দেহ হলো তার। পুরো ঘরে কোনো আলো না জ্বেলেই কি রাজা ঘুমান না-কি। অন্তত ছোটো দুই একটা প্রদীপ জ্বলার কথা ছিল। মনে হয় নিভে গেছে। এই অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার সামনে এখন দুটো উপায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে তার চোখে অন্ধকার সয়ে আসবে। নীরবে অপেক্ষা করা যায়। তবে অন্ধকারের যে অবস্থা তাতে সেই কিছুক্ষণ অনেকক্ষণও হয়ে যেতে পারে। আরেকটা উপায় হচ্ছে কোমরের মশাল। তবে এই অন্ধকারে মশাল জ্বেলে দিলে রাজা এবং তার সঙ্গিনীর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। রাতের আরো এক প্রহর বাকি আছে। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। সতর্ক অপেক্ষা। কোমরের ছুরি তার হাতে বেরিয়ে এসেছে।

তবে ঠিক তখনই ঘরের ঠিক মাঝখান থেকে একটা স্বর ভেসে এলো, 'তোমার চোখে আলো সয়ে আসতে এখনো কিছুটা সময় লাগবে। অত সময় তোমাকে দেওয়া যাবে না। যা করার তোমাকে এই অন্ধকারের মধ্যেই করতে হবে। আমি তোমার পরিচয় জানি। তুমি একজন সত্রী। ছোটোবেলা থেকেই তুমি অস্ত্রবিদ্যায় পাকা। এবং তোমার কাছে এক আঘাতে মানুষ হত্যা করার মতো অস্ত্রও আছে। এবং তাও জানি তুমি খুবই বুদ্ধিমান। নবিশ সৈনিকের ছদ্মবেশে আমার সেনাদলে এতদিন ছিলে কিন্তু

কেউ তোমাকে ধরতে পারেনি। তুমি যাকে মারতে এসেছ আমিই সে। তুমি একবার সুযোগ পাবে। চেষ্টা করো। সময় কিন্তু হাতে খুব বেশি নেই।'

অজয়নাথ জায়গায় জমে গেছে। এবং সেই সাথে তার মাথাও কাজ করছে বেশ জোরে। ঘরটা বেশ বড়ো। এত বড়ো ঘরে কথা বললে প্রতিধ্বনি হয়। সেই প্রতিধ্বনির কারণে কারো কথার আওয়াজ থেকে অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সে একজন সত্রী। আর লোকটা অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছে। অবস্থান মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলেছে সে। হাতের ছুরিটা আস্তে করে তুলে আনলো সে মাথার ওপর। একটা বড়ো করে নিঃশব্দ নিঃশ্বাস নিলো। তারপর ছুরিটা ছুঁড়ে মারলো শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। এই মার অব্যর্থ। শব্দভেদী শাস্ত্রে সিদ্ধ সে।

কিছু একটায় ছুরি বেঁধার আওয়াজ এলো। মানুষের মাংস বলেই মনে হলো। নিশ্চিত হবার জন্য পা বাড়ালো সে। ঠিক তখনই অন্ধকারে মৃদু শব্দে একটা ছুরি তার দিকেই ছুটে এলো। আলো থাকলে হয়তো সেই আঘাত এড়িয়ে যেতে পারতো অজয়নাথ কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলো না। ছুরিটা একেবারে তার কণ্ঠ দিয়ে ঢুকে ঘাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। মারা যাবার আগে অজয়নাথ বুঝতেই পারলো না, এটা তারই ছুরি। এটাই একটু আগে সে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আজ সকালেও ধার দিয়েছিল সে এই ধারালো ফলাতে। গলা এফোঁড়ওফোঁড় করতে এই ফলার কোনো সমস্যাই হয়নি।

ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে তিনবার হাততালির আওয়াজ ভেসে এলো। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরা এই সংকেতের অপেক্ষাতেই ছিল। সবাই হাতে একটা করে মশাল নিয়ে ঘরে ঢুকল। মোট আট জন।

'আজ্ঞা, সম্রাট।'

'বলদেবকে খবর দাও। মন্ত্রীমশায় এখনো জেগেই আছেন। তাকে আগে থেকে বলা আছে। গিয়ে বলবে আমি ডাকছি।'

বলদেব সাতবাহন সম্রাট সাতকর্ণীর মন্ত্রী। বৃদ্ধ কিন্তু চিন্তায় এখনো সবল। দুজন প্রহরী বেরিয়ে গেল তাকে খবর দিতে।

যিনি ঘরের অন্ধকারে অজয়নাথের গলা অজয়নাথের ছুরি দিয়েই বিদ্ধ করেছেন তিনিই সম্রাট সাতকর্ণী। শয়ন ঘরের আসনে বসলেন তিনি। একটু আগে যে তার জীবন সংশয় হয়েছিল তার কোনো লক্ষণ তার চেহারায় নেই। এক আলতো ঘষায় মোটা পাকানো গোঁফের প্রান্তে জমে থাকা ঘাম মুছে ফেললেন তিনি। তারপর চুমুক দিলেন তৃষ্ণা নিবারনী সুরা পাত্রে। সামনে দশ হাত দূরে নিশ্চল পড়ে থাকা অজয়নাথের গলা থেকে তখনো বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে।

প্রহরীরা হাতের মশালগুলো ঘরের মশালদানিতে রেখে দিয়েছে। পুরো ঘরে এখন আলোর কোনো অভাব নেই।

বৃদ্ধ বলদেব কিছুক্ষণ পরেই এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে ঢুকতেই তার চোখ চলে গেল অজয়নাথের শরীরের দিকে।

'বসুন। আপনার বুদ্ধিতে সবসময় কাজ হয়। রাজপ্রহরীদের বাছাই করার প্রক্রিয়ার শেষ ধাপটা কাজে দিয়েছে। আপনার মাথা থেকেই বেরিয়েছে এই বুদ্ধি। আমাদের সাবধানতা ঠিক আছে। একটা সত্রী ছিল দলের মধ্যে। আর আপনার কথামতো

সবাইকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেবার কথা রটিয়ে দিতেই সে এসেছিল আমাকে মারতে। পরিণাম তো দেখতেই পাচ্ছেন। নিজেই এখন চিৎ হয়ে পড়ে আছে।'

সম্রাটের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। বলদেব বসে পড়লেন। রাজপ্রহরীদের নিয়োগের আগে এই কাজ করার বুদ্ধি গতকাল তিনিই দিয়েছিলেন। কোনো সুযোগ নেওয়া যায় না এক্ষেত্রে। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হয়। যার মনে কোনো অপকর্ম করার ইচ্ছে আছে সে এই সুযোগ হারাতে চাইবে না। আঘাত করতে চাইবে।

আসলে এটা একটা ফাঁদ। অজয়নাথ এই ফাঁদেই আটকে প্রাণ হারিয়েছে। আসলে কাউকে কোথাও পাঠানো হবে না। সবাইকেই প্রাসাদের রক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু এই পড়ে থাকা দেহটা বাদে।

বলদেব এক প্রহরীর দিকে তাকালেন, 'দেহ সরাবার ব্যবস্থা করো তাড়াতাড়ি। সাথে রক্ত পরিষ্কারের ব্যবস্থাও করবে।'

সাতকর্ণী হেসে উঠলেন, 'রক্তে এত ভয় কেন আপনার? আমাদের সবার দেহেই এই জিনিস আছে। একই রকম।'

উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলদেব কিছুই বললেন না। প্রসঙ্গ বদলালেন, 'মহারাজ, ফাঁদের টোপ হিসেবে আপনি নিজেকে কেন রেখেছেন? আমি কতবার বলেছি, এসব বিপজ্জনক কাজে নিজেকে জড়াবেন না। রাজ্যের স্বার্থে আপনার বেঁচে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বদলে এই ঘরে কয়েকজন রক্ষী রাখলেই তো চলতো।'

সাতকর্ণী হাসলেন, 'আপনার যেমন তীব্র বুদ্ধি আছে তেমনি আমার আছে শক্তি, ক্ষত্রিয় তেজ। আমাকে সম্মুখ যুদ্ধে হারিয়ে দেবে এমন যোদ্ধা আছে না-কি ভূ-ভারতে? একজন সত্রীর সাথে সাক্ষাতের এবং সম্মুখ সংগ্রামের এমন সুযোগ আমি কী করে হারাই।'

'মহারাজ, রাজাকে অহংকার কখনোই শোভা পায় না। অহংকারী এমন এক প্রজাতির মানুষ, যাকে মারতে যমের প্রয়োজন হয় না। অহংকারী ব্যক্তিকে নিজের অহংকারেই মারে। যেখানে সতর্ক থাকার সুযোগ আছে সেখানে শুধুশুধু বিপদের সামনে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।'

'হ্যাঁ। সামনেরবার আমি এমন কাজ আর করবো না। আপনার উপদেশ অবশ্যই মেনে চলবো।'

'আরেকটা কথা সম্রাট। আপনি গত দুবছর ধরে টানা দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠানায় আছেন। আমাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি কিন্তু এই নগরে না, অমরাবতীতে। আপনি যদি দুটো রাজধানী রাখতে চান তাহলে একটাকে গ্রীষ্মকালীন আরেকটাকে শীতকালীন বানাতে পারেন। রাজা যদি দীর্ঘকাল রাজধানীর বাইরে থাকেন তাহলে রাজ্যের হানি হয়।'

তাচ্ছিল্য ঝরে পড়লো সাতকর্ণীর কণ্ঠে, 'কে আমার রাজ্যের হানি করবে? ঐ কলিঙ্গ আর চোলার রাজারা। ওরা কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে সম্রাট সাতকর্ণীর শক্তি? আমার রাজ্যের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসও এই জীবনে তাদের হবে না।'

'ভুল বললেন মহারাজ। মেঘ যদি দূর আকাশে থাকে তাহলে পথিক আর ক্ষেত্রজীবী ভয় পায় না। কিন্তু মাথার ওপরে থাকলে উভয়েই আশ্রয় খোঁজে। তেমনি রাজা যদি অনেক দিন রাজধানীর বাইরে থাকেন তাহলে প্রজার মনে আনুগত্য আর শত্রুর মনে ভয় থাকে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাকে প্রতিষ্ঠানাতেই থাকতে হবে। পূবে এখন আর কোনো সম্পদ নেই। সেখান থেকে এখন আর সম্পদশালী হওয়া সম্ভব না। বাণিজ্য এখন পশ্চিমে। যেসব জিনিস এতদিন আমাদের কাছে মূল্যহীন ছিল সেসব জিনিস এখন সমুদ্রের ওপার থেকে আসা বণিকদের কাছে অমূল্য। কখনো শুনেছেন, সামান্য মসলা, ওষুধি আর বনের ফলের বিনিময়ে মণ মণ সোনা পাওয়া যাবে?'

'না মহারাজ শুনিনি। সম্পদ এখন ভারতের সমুদ্রতটে ঢেউয়ের সাথে লুটিয়ে পড়ছে। তবে রাজাকে শুধু সম্পদশালী হবার দিকে নজর দিলেই চলে না। তাকে প্রজার সুখশান্তির দিকেও নজর দিতে হয়। মসলা চাষ করতে গিয়ে আপনার শস্যের ক্ষতি হচ্ছে, রাজ্যে শস্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। ফল বিক্রি করতে গিয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে। এমন চললে দেশে অচিরেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। আপনার অধীনের ছোটো রাজারা এখন প্রজাদের জোর করে মসলা চাষ করাচ্ছেন। শস্য জমিতে চাষ করা হচ্ছে মসলা। বনের ফলে ব্রাহ্মণ, ভবঘুরে আর গরিবের অধিকার। সে অধিকারও ক্ষুন্ন করছেন সেই সামন্তরাজারা। প্রজা বিদ্রোহ হলে আশেপাশের সব রাজারা গুপ্তচর নিয়োগ করে সেই বিদ্রোহ উস্কে দেবে। রাজা শত্রু রাজ্যের সাথে যুদ্ধে জিততে পারেন, তবে মনে রাখবেন নিজ প্রজার সাথে লড়াইয়ে পূর্ণ বিজয় কখনোই আসে না। অসম্ভব।'

এবার রেগে উঠলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কার এত বড়ো সাহস? আমার প্রজারা জানে না আমি কে? আমার রাজ্য এখন ভারতের বড়ো বড়ো রাজ্যগুলোর সাথে পাল্লা দেয়। এই রাজ্যের বৃদ্ধি আর সমৃদ্ধি কি প্রজারা দেখে না?'

'না সম্রাট দেখে না। রাজ্য কত বড়ো, রাজার কত শক্তি, রাজ্য কত সমৃদ্ধ তা দিয়ে প্রজার কোনো লাভ হয় না। প্রজার লাভ হয় শুধু সম্পদের সঠিক বণ্টনে। আপনি আর আপনার রাজারা পশ্চিমের বণিকদের সাথে ব্যবসা করে সব সম্পদ নিজেদের কোষাগারে জমাচ্ছেন। মসলা চাষ করেও তেমন একটা আয় হচ্ছে না প্রজাদের। এটাকে আর যাই বলা হোক, কখনোই সুশাসন বলা যায় না।'

'আপনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না। আপনি কি চান আমি ব্যবসা বন্ধ করে দেই? আর ঐ নরকের কীট শক রাজা পশ্চিমের সব ব্যবসা নিজের রাজ্যে নিয়ে যাক। সে সম্পদশালী হোক আর আমি দরিদ্র থেকে যাই।'

'না সম্রাট। আমি তা বলিনি। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর পূজা আমাদের করতে হবে। তবে আপনি ভুলে যাচ্ছেন তিনি যেমন লক্ষ্মী আবার তিনিই অন্নপূর্ণা। আপনি অন্নপূর্ণার পূজা করা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। আপনি আপনার সাম্রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত শস্য ফলাবার আদেশ দিন। তারপর বাকি জমিতে যে মসলা ফলবে তা আপনি বিক্রি করতে পারবেন। শক রাজার সাথে পাল্লা হয়তো ঠিকভাবে দিতে পারবেন না,

তবে আপনার রাজ্যে শান্তি থাকবে। আর প্রজারা যাতে ফলিত মসলার দাম সঠিকভাবে পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' মুখে এই কথা বললেও মনে মনে অন্য চিন্তা চলছে সম্রাট সাতকর্ণীর। এই বৃদ্ধের চিন্তাও বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এই চিন্তা দিয়ে হবে না। ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত একজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। তার আগে বলদেবের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

'আপনি অমরাবতীর কথা তুলে ভালোই করেছেন বলদেব। ওদিকটাও ভালো করে নজর রাখা উচিত। আমি এইমাত্র একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাকে আর প্রতিষ্ঠানায় থাকতে হবে না। আপনি এখানের কাজ গুছিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় অমরাবতীতে চলে যান। কলিঙ্গ আর চোলাকে সামলাতে হবে। আর আমাকে যে বুদ্ধি দিলেন সেই ব্যবস্থা আপনি রাজ্যের পূর্ব অংশে নিন। আমি এদিকে বাণিজ্য দেখছি।'

বৃদ্ধ বলদেব সব বুঝতে পারলেন, 'সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য। তবে কখনো শত্রুকে নির্বিষ ভাববেন না। শত্রু ভীত হলে আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আর তা আজকে আপনি ভালোই টের পেয়েছেন। এই শেষ নয়। সামনে আপনাকে এমন বিপদ আরো সামলাতে হবে।'

সাতকর্ণী হেসে বললেন, 'তা আমি জানি। আর ঐ শক রাজাকে আমি ভালোই সামলাবো।'

'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।'

বলদেব বেরিয়ে গেলেন। সাতকর্ণী ঠিক করলেন উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানার সভার মহামন্ত্রীর পদটা খালি রাখবেন। কাউকে মহামন্ত্রী বানিয়ে দিলেই সে নিজেকে রাজার থেকেও বড়ো ভাবে। কাজের সময় খবর নেই, খালি উপদেশ দেয়।

৩

পেট ভরে পিঠে খেলো অসিত। অঙ্গদের পেট ওদিকে কলা খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। অঙ্গদ সাধারণ জঙ্গলের বানরের মতো না। তার রংঢং শিখতে হয়েছে। আর সেই ছলাকলার একটু দেখালো সে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। সাদা লোমে আবৃত পেটের ওপর দিয়ে হাত বোলাচ্ছে। যেন ভরপেটে খুব কষ্ট পাচ্ছে। একেবারে মানুষের নকল। তার অবস্থা দেখে পিসি আর পবন হেসে খুন। অসিতও হাসছে।

হাসতে হাসতেই অসিতের নিজের ঘরের কথা মনে পড়লো। তার ঘরও জঙ্গলের কাছে। সৈন্যরা সেটার কী অবস্থা করেছে কে জানে। যদিও সৈন্যরা যেখানে শিবির ফেলেছে সে জায়গা থেকে তার ঘরের অবস্থান অনেক দূরে। তবু বলা যায় না। আশংকা চেপে বসতে শুরু করলো অসিতের বুকে।

'পিসি আমাকে এখনই যেতে হবে। কে জানে সৈন্যরা আমার ঘরের কোনো ক্ষতি করেছে কি না। এই ঘর চলে গেলে আমি থাকবো কোথায়?'

আশংকায় উমা পিসির মুখের ভাবও বদলে গেল। 'ঠিক আছে যা। সব দেখে আমাকে জানিয়ে যাস কিন্তু।'

'আচ্ছা পিসি, চল অঙ্গদ।' ওঠার জন্য তাড়া দিলো অসিত। অঙ্গদ এখনো অভিনয় ছাড়েনি। অনেক কষ্টে চিত থেকে সোজা হলো সে।

তখনই পিসির বাড়িতে ঢুকলো রাঁধা। ইন্দ্রপুরে অনেক ঘরে গোরু থাকলেও জাতে গোয়ালা ঘর একটাই আছে। রাঁধা সেই ঘরের মেয়ে। বাবা অনেক আগেই মরেছে। মা আর পাঁচটা দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে তার সংসার। ঈশ্বর কৃপা করেছেন অনেক। পাঁচটা গাভী যেন কামধেনু সুরভী। অনেক দুধ দেয়। ইন্দ্রপুরের বিভিন্ন বাড়িতে দুধ, ঘি, ননী, মাখন বিক্রি করে সংসার চলে মা আর মেয়ের। হাটের দিন এই পণ্যগুলো বাইরের লোকের কাছেও বিক্রি হয়।

রাঁধা অপূর্ব সুন্দরী। সদ্য কিশোরী সে। পরিশ্রমে দেহের গাঁথুনি বেশ। যদিও কুঁড়ি থেকে পাপড়ি মেলার বয়স তবু মনে হচ্ছে কুঁড়ি মোটামুটি পূর্ণ পুস্পের আকার পাচ্ছে।

অসিত ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের ঘরের কথা ভুলে গেল। অঙ্গদ ওর কাঁধে উঠে বসেছে। এখন সেই যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে। ওকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা আরাম অবস্থা থেকে তুলে এনেছে অসিত। এখন অসিতের থেমে যাওয়া মেনে নিতে পারছে না। না গেলে তো সে শুয়েই থাকতে পারতো।

রাঁধা অসিতের দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকালো। তারপর তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উমা পিসির দিকে হাতের পাত্র এগিয়ে দিলো, 'একটু দেরি হয়ে গেল পিসি। আজ আবার হাট থেকে লোক এসেছিল। তাকে ননীর ভাণ্ডগুলো বুঝিয়ে দিয়ে এই সময় পেলাম। পয়সা দিতে চায় না ওরা।'

'আচ্ছা, খুব একটা দেরি হয়নি। আজ কোন গাভীর দুধ এনেছিস। তোদের কালো গাভীর দুধের স্বাদ কিন্তু অন্যগুলোর থেকে ভালো।'

'জানি পিসি। তোমার জন্য আমি ঐটাই রেখে দেই। আজও ভুল হয়নি। আগেই আলাদা করে রেখে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, দাঁড়া। আমি ভেতর থেকে চাল নিয়ে আসছি।'

'না পিসি। আজকে আর চাল দিয়ো না। মা বলেছে তোমার কাছে তিল থাকলে নিয়ে যেতে। কী যেন পায়েস বানাবে।'

ইন্দ্রপুরের কারো বাড়িতেই তামা বা রুপার মুদ্রা থাকে না। যদিওবা থাকে তবে সেগুলো খরচ করার মানসিকতা থাকে না মালিকের। মুদ্রার আধিক্য শুধু আছে অধিকারীদের বাড়িতে। স্বর্ণমুদ্রার কথা তো বলাই বাহুল্য। তাই এখানে চলে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা। এক পণ্যের বিনিময়ে আরেক পণ্য দেওয়া-নেওয়া চলে।

'দিদি কি বলেছে, কতটুকু তিল লাগবে?' পিসি প্রশ্ন করেন।

'মা আর কী বলবে। হিসেব তো করা যাবে না। দুধের হিসেব করে যতটুকু আসে দিয়ে দাও।'

'তোদের সাথে আবার হিসেব কি রে।' চোখ পাকালেন উমা পিসি, 'তোরা কি পর? হাট থেকে তিল কিনতে এসেছিস? কতটুকু নিতে বলেছে দিদি সেটা বল।'

'আধা সের দাও।'

'তা দেওয়া যাবে। তুই একটু বোস। আমি ভেতরে দুধটা ঢেলে রেখে এই পাত্রেই দিয়ে দেবো।'

পিসি তিল আনতে ভেতরে চলে যান। অসিতের একটু আগের তাড়া এখন আর নেই। সে অঙ্গদকে কাঁধে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পিসি ভেতরে যেতে সে আবার ঘরের দাওয়ায় বসে পড়লো এক কোণে।

আধ সের তিল মাপতে পিসির বেশি সময় লাগলো না। আধ সের তিল দুধের পাত্রে এনে এগিয়ে দিলেন তিনি রাঁধার দিকে। তারপর নজর পড়লো অসিতের ওপর,

'কি রে তুই না চলে যাচ্ছিলি। এখন আবার বসে পড়লি কেন? তোর ঘরের অবস্থা তাড়াতাড়ি দেখ গিয়ে।'

অসিত অপ্রস্তুত হয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো, 'এইতো যাচ্ছি পিসি।'

রাঁধা ঠিক তার পরপরই বললো, 'আমিও তাহলে যাই পিসি। মা অপেক্ষা করছেন। ঘরে আবার রাজ্যের কাজ পড়ে আছে।'

'আচ্ছা, যা।'

রাঁধা নেমে এলো উঠানে। তার ঠিক সাথে সাথে অঙ্গদকে কাঁধে নিয়ে উঠানে নেমে পড়েছে অসিতও।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাঁধা মৃদু ছন্দে নিজের বাড়ির পথ ধরলও। এখন অবশ্য তার চলায় মায়ের কাজের তাড়া নেই। বাড়িতে একটু দেরিতে পৌঁছালেও তেমন কোনো সমস্যা হবে না।

অসিত এমনিতেই তার পাশে হাঁটছে। রাঁধা ওর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'তোর কি কাজ করতে ভালো লাগে না। বেকার ঘুরে ঘুরে কী মজা পাস তুই? সারাদিন দেখি মানুষের বাড়ি গিয়ে বসে থাকিস।'

অসিত একটু অপমানিত বোধ করলো। স্বাভাবিক। একে সে সদ্য তরুণ। তার ওপর রাঁধার মতো কিশোরী যদি অপমান করে তাহলে লাগারই কথা। আর রাঁধা

সম্পর্কে সে যে মনোভাব বুকের মধ্যে লালন করে, সে হিসেবে রাঁধার অপমানজনক কথা তার বুকের বেশ গভীরেই বেঁধার কথা। তাই বিঁধল, 'তোকে কে বলেছে আমি সবসময় মানুষের বাড়ি গিয়ে বসে থাকি? তুই যেন অনেক কাজ করিস। ভদ্রতা জানিস না, ঠিকমতো কথাও বলতে পারিস না।'

চোখ পাকালও রাঁধা, 'কী বললি! আমি অভদ্র। কী অভদ্রতা করেছি তোর সাথে এখন?'

'সবসময়ই তো করিস। আমি তোর দুই বছরের বড়ো। আমাকে তুই কেন তুইতুই করে বলবি। অথচ আমাকে তোর দাদা বলা উচিত।'

'ও এই তাহলে কথা। অভদ্রতা একটু অবশ্য হচ্ছে। তবে ইচ্ছে থাকলেও তোকে আমি দাদা বলতে পারবো না। অসুবিধা আছে।'

'কী অসুবিধা তোর?' এবার অসিত ক্ষেপে উঠেছে।

'সেটা তোর মোটা মাথায় ঢুকবে না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোদের দুজনের মধ্যে অঙ্গদের বুদ্ধিই বেশি।'

অসিত বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলে। রাগের মাত্রা তাকে বোবা করে দিয়েছে। রাঁধার বাড়ি চলে এসেছে। বাড়ির পথ ধরবে রাঁধা এমন সময় অসিত ডাকলো,

'শুনে যা।'

রাঁধা থেমে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। শরীরটা ঘোরে না। চোখে তার বাঁকা দৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত চাহনি। এ যেন এক অব্যর্থ অস্ত্র, 'বল, কী বলবি। তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই।'

সেই বাঁকা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অসিতের সব কথা ফুরিয়ে যায়। সে আবার বাকহারা হয়। রাঁধাই একটু সামনে এগিয়ে আসে, 'তোর থেকে অঙ্গদের যে শুধু বুদ্ধি বেশি তাই না, সাহসও বেশি। এই দেখ।'

অঙ্গদকে ইশারা করলো রাঁধা। ইশারা পেতেই সে অসিতের কাঁধ থেকে লাফিয়ে রাঁধার কোলে গিয়ে পড়লো।

'দেখলি, অঙ্গদের কেমন সাহস। তুই কোনোদিন পারবি এভাবে আমার কোলে উঠতে?'

'দূর। আমার বয়েই গেছে তোর কোলে উঠতে।'

'কোলে না উঠিস ঠিক আছে। কিন্তু তোর কখনো অঙ্গদের মতো আমাকে ছোঁবার সাহস হবে?'

'তুই বাড়ি যা। অঙ্গদ চলে আয়।'

অঙ্গদের কোনো নড়নচড়ন নেই। সে রাঁধার কোলেই থাকবে। রাঁধা অঙ্গদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, 'আমি জানি তুই আমাকে কী বলতে চাস। শুধু আজ না, অনেকদিন ধরেই বলার চেষ্টা করছিস, কিন্তু তোর মুখে তালা লেগে যায়। তুই আমাকে বিয়ে করতে চাস। শুধু তুই না, এই গ্রামের অনেক ছেলেই চায়।'

'আর, তুই কী চাস?' অসিতের গলা যেন একটু কেঁপে ওঠে।

'শোন, মহীস্থান থেকে আমাকে বিয়ে করার জন্য লোক এসেছিল। কিন্তু না করে দিয়েছে মা। আমাকে এত দূরে বিয়ে দেবে না। এই গ্রামেই দেবে। বিয়ের পরেও মার

সাথেই থাকবো। তবে তুই ভাবিস না যে তোর মতো হাঁদারামকে আমি কখনো বিয়ে করবো। তোকে বিয়ে করার চেয়ে অঙ্গদকে বিয়ে করা ভালো।'

'তাহলেও হয়। তুই অঙ্গদকেই বিয়ে কর। তখনও তুই আমার সাথেই থাকতে পারবি।'

চোখের বাঁকা হাসি মুছে গেল রাঁধার। টোল পরা গালে লাল ছোপ পড়লো। কিছুই বললো না সে। অঙ্গদকে ইশারা করতেই সে লাফিয়ে চলে গেল অসিতের কাঁধে। রাঁধাও আর কিছু না বলে এক ছুটে বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

অসিত পা বাড়ালো নিজের ঘরের দিকে। মানুষ অসম্ভব কল্পনা করতে ভালোবাসে। অসিতও ব্যতিক্রম নয়। সেও মাঝে মাঝে কিছু অসম্ভব কল্পনা করে। রাঁধাকে বিয়ে করার কল্পনা তার মধ্যে একটা। কল্পনায় সে রাঁধার সাথে প্রেম করে, সংসার করে, মান-অভিমান করে। সে জানে এই কল্পনা কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। তবু চিন্তা করতে খুব ভালো লাগে। সব দুশ্চিন্তা মাথা থেকে উড়ে যায় তখন।

নিজের ঘর দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। নিশ্চয়ই সৈন্যরা এদিকে আসেনি। তারা এই ঘর দেখতে পেলে আস্ত রাখতো না। ঘরের ভেতর থেকে খুট করে একটা আওয়াজ হলো। থেমে গেল অসিত। ঘরের ভেতর কেউ আছে না-কি। চোর হবার সম্ভাবনা নেই। তার অবস্থা সব চোরেই জানে, কেউ ঢুকবে না। জঙ্গল থেকে চলে আসা কোনো প্রাণী হতে পারে। ধীরে ধীরে ঘরের দরজায় হাত দিলো সে।

না, ঘরের ভেতরে কোনো বিপজ্জনক প্রাণী বসে নেই। একজন মানুষ বসে আছে। অধিকারীর বাড়ির চাকর। অসিত কিছুই বুঝতে পারছে না। এই লোকের তার কাছে কোনো কাজ থাকতে পারে না। সে এখানে কেন বসে আছে?

'আপনি আমার ঘরে কী করছেন?'

'তোমার ঘরে তো সিন্নি বিলাচ্ছে, তাই বসে আছি। তোমার জন্যই বসে আছি গাধা। থাকো কোথায় তুমি? সারাদিন কি ঘরে আসো না?'

সে কথার জবাব দিলো না অসিত, 'আমার সাথে আপনার কী কাজ?'

'তুমি জানো না, আজকে অধিকারী বাবুর ভাইয়ের ছেলের বিয়ে।'

'জানি তো। তাতে আমার কী। আমাকে তো আর নিমন্ত্রণ দেয় নাই।'

'আলাদা করে নিমন্ত্রণ দেবার দরকার কী? এই গ্রামের সবার নিমন্ত্রণ। তুমি আবার কে যে তোমাকে আলাদা করে নিমন্ত্রণ দিতে হবে। বিয়ের ভোজ রাতের প্রথম প্রহরের পরেই দেওয়া হবে। তখন খেতে যাবে সবাই।'

'আচ্ছা, আমিও যাবো তাহলে।'

'সে তো যাবেই। তবে তোমাকে আগেই যেতে হবে। ভোজের আগে তোমার কাজ আছে। সন্ধ্যার একেবারে পরপরই।'

'কেন? আমি আগে গিয়ে কী করবো?'

'যা তুমি সবসময় করো। শোনো, অধিকারী বাবুর বাড়ির উৎসব বলে কথা। অনেক বড়ো বণিকেরা আসবে। চাই কি রাজবাড়ির লোকও আসতে পারে। সবার জন্য আমোদের ব্যবস্থা করতে হবে। গান, নাচ আর সোমের ব্যবস্থা আছে। অধিকারী মশায় বললেন, তোমার বানর নিয়ে যেতে। তোমার বানরের খেলা দেখলে হয়তো মানুষের

আরও বেশি মজা লাগবে। তাই আমি তোমাকে ডাকতে এসেছি। আর তুমি তো একেবারে বিকেল গড়িয়ে দিলে।'

অসিত কিছুই বললো না। তাকে চুপ থাকতে দেখে বার্তাবাহক এবার লোভ দেখালেন, 'আরে চলে এসো। অধিকারী মশাইয়ের বাড়ির অনুষ্ঠান। ভালো বকশিশ পাবে। এমনিতেও তোমার খেলা এখন আর কেউ দেখে না। রাজবাড়ির লোক খুশি হলে হতে পারে তোমাকে স্বর্ণমুদ্রাও উপহার দিতে পারেন। তোমার কপাল ভালো, খেলা দেখাবার সুযোগ পাচ্ছো। আমি এখন যাই। তুমি দেরি কোরো না। প্রথম প্রহরের মাঝামাঝি চলে এসো।'

অসিত বিছানায় বসে পড়লো। বকশিশের লোভ না দেখালেও চলতো। অনেকদিন খেলা দেখায় না সে। আবার অধিকারী মশাইয়ের আদেশও ফেলে দিতে পারবে না। উপার্জন একেবারেই নেই। দেখা যাক, আসলেই তার কপাল ভালো কি না।

সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে লাভ নেই। খেলা দেখানোর সামগ্রীগুলো বের করতে লাগলো সে। অনেকদিন ব্যবহার করা হয় না। ধুলো পড়ে গেছে। একটু ঝাড়পোঁছ করা প্রয়োজন। হাত লাগালো অসিত। ডমরু, লাঠি, দড়ি আর লোহার বলয়গুলো মুছে নিতে লাগলো এক এক করে।

সন্ধ্যের মুখে যখন পাখিরা ঘরে ফেরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে তখন সবকিছু নিয়ে ঘর ছাড়লো অসিত। জিনিসপত্র নিয়ে বেশি জোরে হাঁটতে পারছে না। অধিকারীর বাড়ির কাছে আসতেই হই হুল্লোড়ের আওয়াজ কানে এলো তার। তাদের এই প্রত্যহ অন্ধকার গ্রামের তুলনায় আজকের এই আলো আর হুল্লোড় বেশ বেমানান। একটু ভয় পেয়ে গেল অসিত। এমন উৎসব খুব বেশি দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার।

অধিকারীর বাড়ির বাইরে থেকে দেখে উৎসব সম্পর্কে মোটামুটি একটা আন্দাজ করেছিল অসিত। তবে ভেতরে ঢুকে দেখলো তার আন্দাজ ভুল। উৎসবের জাঁকজমক আরো বেশি।

ঢুকেই এক নজরে সব দেখে নিলো সে। আলোর রোশনাইয়ের সাথে সাথে নানা রকম সুস্বাদু খাবারের সুঘ্রাণ ভেসে তার নাকে এসে ধাক্কা মারছে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ঘ্রাণই সে চিনতে পারছে না। তার মানে, এখানে এমন অনেক খাবার রান্না হচ্ছে যেগুলো সে আগে কখনও-খায়নি, আর খেলেও স্বাদ-গন্ধ ভুলে গেছে।

অঙ্গদকে কাঁধে নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। গ্রামের অনেকেই এসে জুটেছে। খাবার দেওয়া শুরু করার জন্য অপেক্ষা করেনি। যে যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক লোক আছে অসিতের অচেনা। তার মানে তারা বাইরে থেকে এসেছে। কর্তব্য স্থির করতে পারছে না সে। অধিকারীর চাকর তাকে এখানে আসতে বলেছিল বটে, কিন্তু এসে কার সাথে কথা বলতে হবে তার কিছুই বলেনি।

তখনই অধিকারীকে নিজের দিকে আসতে দেখলো সে। ভয় আরো বেড়ে গেল তার অধিকারীকে দেখে। এত দ্রুত তার দিকে কেন এগিয়ে আসছেন তিনি?

অধিকারী মশায় সামনে আসতেই সোজা মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো সে, 'প্রণাম কর্তা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওঠে পড় এখন। আমি তো ভাবলাম তুই আসবি কি না। অথিতিদের তোর খেলার কথা আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম। তুই তৈরি হয়ে এসেছিস তো?'

'আজ্ঞে কর্তা।'

'ভালো করে খেলা দেখাস। তোর খেলা আজকে কে দেখবে জানিস?'

'না কর্তা, জানি না। কে দেখবে?'

'আরে কে কে বলছিস কেন? অসম্মান করা হবে। বেয়াদপি হবে। স্বয়ং মহীস্থানের যুবরাজ এসেছেন। সাথে তার সহচরেরা। তিনিই তোর খেলা দেখতে চেয়েছেন। ওদিকে দেখ, যেখানে চারটা মশাল জ্বালিয়ে রেখেছি।'

অসিত সেই জায়গার দিকে তাকালো, 'আজ্ঞে।'

'সেখানে যা তুই। তোর দড়ি, বাঁশ যা যা আছে সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেল। আমি ওনাকে আর ওনার সাথের সব লোকজন ডেকে আনছি।'

'আজ্ঞে।'

গোছগাছের আসলে বিশেষ কিছু নেই। বাঁশগুলো অভ্যস্ত হাতে মাটি খুঁড়ে সহজেই পুঁতে ফেললো অসিত। তারপর দড়ি টানিয়ে দিলো। লোহার বলয়গুলো জায়গামতো বেঁধে দিলো সে। কাজগুলো সে ছোটোবেলা থেকে করে। তাই সময় লাগলো না। এখন সে খেলা দেখানোর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

অধিকারী মশায় বেশ তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এলেন। তারপর উঠানের মাঝখানে গিয়ে বেশ জোরালো গলায় চিৎকার করলেন,

'সবাই সাবধান। সাবধান। যে যেখানে আছো সেখানে দাঁড়িয়ে যাও। মহীস্থানের যুবরাজ, শূরবীর, শত্রুযম রাজা অত্রিসোমের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র, শূরবীর, মহাক্ষত্রিয় যুবরাজ মহাবল এখন পদার্পণ করবেন।'

সবাই যে যেখানে আছে সেখানে যেন জমে গেল। হুল্লোড় এক নিমেষে বদলে গেল শ্মশানের নিস্তব্ধতায়। সাথে সাথে অধিকারীর বাড়ির দরজাটা বেশ শব্দ করে খুলে গেল। মহীস্থানের যুবরাজ তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

মহীস্থানের ভবিষ্যৎ রাজা, শূরবীর, মহাক্ষত্রিয় মহাবল আপাতত নিজের দুপায়ের ভারই নিতে পারছেন না। সোমরসের আধিক্যে তার চোখ বেশ ফোলা, পরনের সুবিন্যস্ত রাজপোশাকের সব ভাঁজ নষ্ট প্রায়, পাগড়ি অর্ধেক স্থানচ্যুত। সাথের চারজন সঙ্গী, যারা কোনো এক অদূর ভবিষ্যতে মহীস্থানের অমাত্য হবে তাদের অবস্থাও একই রকম। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, বরং বলা যায় মহীস্থানের ভবিষ্যৎ বেশ ভালো। রাজা আর অমাত্যদের স্বভাব কাছাকাছি হলেই ভালো। তাহলে মতের মিল হয় সহজেই, সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় বেশ।

যুবরাজ মহাবল তার নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে এই অবস্থাতেও কারো সাহায্য না নিয়েই অধিকারী মশাইয়ের বাড়ির উঠানে প্রথম কদম ফেললেন। সাথে সাথে সবাই দুদিকে সরে যুবরাজের যাবার রাস্তা করে দিলো। চার মশাল ঘেরা জায়গায় একটা বসার জায়গা করা হয়েছে। যুবরাজ সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে সেখানেই বসলেন, 'কই অধিকারী, কোথায় তোমার বানরের খেলা। বিকেলে যে নাচ দেখালে আর যে গান শোনালে তাতে

তো তেমন ভরসা পাচ্ছি না। এমন জানলে মহীস্থান থেকে বাইজি নিয়ে আসতাম। আচ্ছা, শুরু করো তোমার খেলা।'

অধিকারী মশাই ইশারা করলেন অসিতকে। অসিত তৈরিই ছিল। সাথে সাথে একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো, 'প্রণাম। আমি অসিত। আমিই আজ বানরের খেলা দেখাবো।'

মহাবলের এক সঙ্গী টিপ্পনী কাটলো, 'তোমার বানর কোথায়? নাকি তুমিই বানর। লেজ কই? ধুতির নিচে লুকানো আছে না-কি?'

সবাই একচোট হেসে নিলো। অসিত এবার ইশারা করলো অঙ্গদকে। অঙ্গদ লাফিয়ে নামলো গাছের ওপর থেকে। অসিত নির্দেশ দিলো, 'যা অঙ্গদ, সবাইকে নমস্কার কর।'

অঙ্গদ একে একে সবার সামনে গিয়ে মানুষের মতো হাতজোড় করে সবাইকে প্রণাম করলো। তারপর খেলা শুরু হলো।

অঙ্গদ অসিতের লাঠির ইশারায় নানান অঙ্গভঙ্গি করলো, অভিনয় করলো নানা ভূমিকায়। মাতালের অভিনয় সে অনেক ভালো করে। সে অভিনয় দেখে সবাই হেসে কুটিকুটি। মহাবল আর তার সঙ্গীরা তো এমনিতেই মাতাল। তারা হেসেই চলেছে। মাতালের হাসি সহজে থামতে চায় না।

দেখতে দেখতে একেবারে শেষ খেলার সময় চলে এলো। একটা লোহার বলয় দুটো উল্লম্ব বাঁশের সাথে বাঁধা। অঙ্গদ সেই বলয়ের মাঝ দিয়ে লাফিয়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে চলে গেল। এবার প্রথম বলয়ের পেছনে দ্বিতীয় বলয় বসালো অসিত। অঙ্গদ তার ইশারায় দুটো বলয় পেরিয়ে গেল।

তিন নাম্বার বলয়টা বসানোর সময় গলায় কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুললো। তার শঙ্কায় দর্শকদের মনেও সন্দেহ জন্ম নিলো। তিনটা বলয় একসাথে নাকি অঙ্গদ মাঝে মাঝে পেরোতে পারে না। দর্শকরা ভাবছে এবার একসাথে তিনটা বলয় অঙ্গদ পেরোতে পারবে তো।

সবাই বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। অসিত লাঠি তুললো। তারপর সপাটে বাতাসের গায়ে নামিয়ে আনলো লাঠি। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে দৌড়ে এসে লাফ দিলো অঙ্গদ। একেবারে বেঁধে যায় যায় অবস্থায় তিন নাম্বার বলয় সফলভাবে পার হয়ে এলো অঙ্গদ। দর্শকদের মধ্য থেকে হর্ষধ্বনি আর করতালির আওয়াজ ভেসে এলো।

মহীস্থানের যুবরাজ মহাবল হাততালি দিয়ে উঠলেন। অধিকারী মশাই এগিয়ে এলেন তার দিকে, 'আপনার এই খেলা কেমন লেগেছে যুবরাজ?'

মহাবল উঠে দাঁড়ালেন, 'না, খেলা ভালোই। তবে বড়ো যেন সাদামাঠা। কোনো উত্তেজনা নেই, বীরত্ব দেখবার কোনো উপায় নেই। খেলায় একটু বিপদের সম্ভাবনা না থাকলে সেই খেলা ক্ষত্রিয়ের ভালো লাগার কথা না। আমাদেরও এই খেলা তেমন ভালো লাগেনি। কী বলো তোমরা?'

তার সঙ্গীরা সবাই সায় জানালো, 'একেবারে সঠিক কথা। কোনো মজা নাই।'

মহাবল অসিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'তাহলে তো এখন একটু বিপদের ব্যবস্থা করতে হবে।'

৪

এই দুর্গের নাম সোহিনী। অনেকদূর থেকে চোখে পড়ে এই স্থাপনা। বেশ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এক সময় তৈরি হয়েছিল এই দুর্গ। এক সময় এই রাজ্যের সীমানা দুর্গ ছিল এটা। চারদিকে চারটে সিংহদরজা এখন শুধু অতীত ঐশ্বর্যের সাক্ষী দেয়। এখনো অনেক কিছুই কালের গর্ভ থেকে বেঁচে আছে। চার কোণায় পাহারাদারদের উঁচু চারটে পাহারা দেবার জায়গা এখনো বিদ্যমান।

সোহিনীর এখন আর কোনো সামরিক গুরুত্ব নেই। রাজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় রাজ্যের সীমানা এখন আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সেই নতুন সীমানায় স্থাপিত হয়েছে নতুন দুর্গ। সেখানে এখন জমজমাট অবস্থা। সোহিনীর আলোগুলো কেড়ে নিয়ে সেই দুর্গের দেওয়ালের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। এক সামন্ত রাজা তার পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে এখন সেই দুর্গ পাহারা দেন। পরিত্যক্ত দুর্গ সোহিনীতে এখন রাজ্যের গণমানুষের বাস।

পরিত্যক্ত দুর্গ থাকার জন্য মোটামুটি আদর্শ স্থান। উঁচু জায়গায় তৈরি বলে এখানে কখনোই জল ঢুকে বন্যা হয় না। দেওয়ালের কারণে চোর আর চরেরা প্রবেশ করতে পারে না। বাকি সুবিধাও আছে পর্যাপ্ত। দুর্গের পাশ দিয়েই বেশ চওড়া একটা নদী বয়ে গেছে। পানীয় জলের সংস্থান দুর্গের ভেতরেও আছে। জমজমাট সময়ে বেশকিছু কুয়া খোঁড়া হয়েছিল দুর্গের ভেতর।

আরেকটা গুরুত্ব আছে এই দুর্গের। তা হলো দুর্গের ভেতরের মন্দির। প্রত্যেক দুর্গে আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ মন্দির স্থাপন করা হয়। আর একবার দেবতা স্থাপিত হয়ে গেলে নিত্য পূজা দিতে হয়। যে মন্দির একবার স্থাপিত হয়ে গেছে সেখানে যদি নিত্য পূজা না হয় তাহলে কূলের অকল্যাণ হয়। অনেক বড়ো অধর্ম হয়। আর রাজা কখনোই এই অধর্ম করতে পারেন না।

এক পুরোহিতকে এখানে নিয়োগ দিয়েছেন রাজা। তিনি পরিবার নিয়ে এখানেই থাকেন। রাজার দেওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি কেবল এই মন্দিরেরই নন, বরং এই পুরো দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আশেপাশের গ্রাম থেকে তিনি লক্ষণবিচার করে পছন্দ মতো বেশ কিছু পরিবারকে তিনি এই দুর্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এত বড়ো দুর্গে একা থাকা যায় না। অস্বস্তি হয়।

তবে একাকীত্বের অস্বস্তি দূর করাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এই দুর্গের আশেপাশের জমিও তিনি একা সামলাতে পারতেন না। তার আশ্রয় দেওয়া লোকেরা সেই জমিতে চাষ করে, গো-পালন করে। তিনি ভাগ পান, দুর্গের প্রজাদের থেকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধাও পান। রাজা না হয়েও রাজার মতো একটা অনুভূতি। পুরোহিতের খারাপ লাগে না। ক্ষমতা এমনই এক জিনিস যা কারোই খারাপ লাগে না।

রাজার কুলদেবতা ভোলানাথ। এই দুর্গে তারই মন্দির স্থাপিত আছে। বেশ বড়ো কালো পাথরের একটা শিব লিঙ্গ এখানে স্থাপন করা হয়েছে। এই শিব লিঙ্গ সম্পর্কে

জনশ্রুতি আছে। এই লিঙ্গ স্বয়ম্ভু। তাই বেশ শ্রদ্ধার সাথেই নিত্য ভোলানাথের সেবা করা হয় এই মন্দিরে।

তবে এই মন্দিরের পূজারীর কর্মে কিছু রহস্য আছে। সব মন্দিরের নিত্য সেবক মাত্র একজন পূজারী হলেও এই মন্দিরে আছেন দুজন। একজন পুরোহিত যিনি দিনে পূজা করেন, আরেকজন রাত্রিকালীন পুরোহিত। তার কথা কেউ জানে না। সে এই জায়গায় অনাকাঙ্ক্ষিত। এই দুর্গের প্রজা, পুরোহিত সবার কাছেই। এমনকি এই স্থাপিত মন্দির এবং দেবতার কাছেও।

তবু সেই পুরোহিত আসে। কেন আসে? তা সে নিজেও জানে না। হয়তো সেই পুরোহিতের ঈশ্বরের দরজা ছাড়া আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। হয়তো কারোই এই পৃথিবীতে এক ঈশ্বরের দরজা ছাড়া যাবার আর কোনো জায়গা নেই।

রাতের দুই প্রহর মাত্র পেরিয়েছে। পঞ্চমীর চাঁদ এখন একেবারে মাথার ওপর। দুর্গের সবাই এখন গভীর ঘুমে। এখন আর প্রহরান্তরের প্রহরীরা রাত জেগে এখানে পাহারা দেয় না। এই রাতের পুরোহিত সেই পাহারা দেবার সময়েও এই মন্দিরে নিয়মিত আসতো। প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে। রাতের বুক চিরে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলাচল করার অভ্যেস তার অনেক আগ থেকেই ছিল। তার জীবনে পাপের অভাব নেই। হিসেব করতে গেলে অনেকগুলো কালি খরচ হবে। আর সেই পাপগুলোর মধ্যে একটা বেশ গুরুতর পাপ এরকম রাতের আঁধারে পা টিপেটিপেই করেছিল সে। তখনো সৈন্যদের ফাঁকি দিতে হয়েছিল। এখন তাকে একই কাজ করতে হচ্ছে। তবে এখন কোনো পাপ করার উদ্দেশ্যে এই কাজ করছে না সে। বরং সেই পাপগুলো থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

পুরোহিতের ঘরের দরজা পেরিয়ে এলো সে। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে মোড়া সমস্ত শরীর। অন্ধকারে আচমকা কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই। প্রত্যেকটা দরজার সামনে দিয়ে রীতিমতো পা টিপে এগোচ্ছে সে। প্রত্যেকটা ঘর থেকেই ঘুমন্ত ভারী নিঃশ্বাস আর নাকের আওয়াজ তার কানে আসছে। সেই রাতেও ঠিক এমন করেই শব্দগুলো তার কানে এসেছিল। আহা, সেদিন যদি তার এমন দুর্মতি না হতো। অসহায় হিংসা অনুভব করতে লাগলো সে বন্ধ দরজার ওপাশের ঘুমন্ত মানুষগুলোর প্রতি। কত শত বছর এমন করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না সে।

মন্দিরের দরজায় তালা নেই। কড়ায় শেকল দিয়ে পুরোহিত চলে যান। নিঃশব্দে সেই ধাতব বন্ধন থেকে দরজার কড়াকে মুক্ত করলো সে। শেকলটা এক পাশে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। অনেকক্ষণ ধরে। স্তুতি শেষ হতে ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ালো। এবার বজ্রাসনে শুরু করলো শিব স্তুতি পাঠ। বেশ স্পষ্ট কিন্তু নিচু গলায় মন্ত্র পাঠ করছে সে।

এই মন্দিরই প্রথম নয়। এমন কত মন্দিরে রাতের পর রাত মাথা ঠেকেছে সে। বজ্রাসনে থেকেছে শরীরে যতক্ষণ কুলায়। একমনে স্তোত্র পাঠ করেছে। কত প্রহরের পর প্রহর। কিন্তু ঐ পাষাণ কোনো উত্তর দেয়নি।

আজো সে দাঁড়িয়েছে বজ্রাসনে। শিবের পূর্ণ মন্ত্র সেই আসনে থেকেই একমনে জপ করতে লাগলো সে। মন্দিরের দরজা জানালা বন্ধ। এই মৃদু শব্দ বাইরে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

জপ শেষ হতে আসন ভাঙলো সে। এবার দেবতাকে অঞ্জলি দেবার পালা। সাথে আনা ফুল আর বেলপাতা অঞ্জলি মন্ত্র পড়ে শিবলিঙ্গের গোঁড়ায় ফেললো সে। ঠিক তখনই ঘটলো সেই ঘটনা। যা প্রতি রাতে ঘটে। এই দরজা জানালা বন্ধ ঘরেও কোত্থেকে যেন এলো দমকা এক ঝলক বাতাস। সেই বাতাস তার অঞ্জলি দেওয়া ফুল আর বেলপাতাগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আর কোনোকিছুই ঐ বাতাসের স্পর্শ পেল না। মন্দিরে দুটো দীপ সারারাত ধরে জ্বলে। সেই দীপ দুটো সেই বাতাসে নিভলো না, এমনকি শিখাও একটু কাঁপলো না। এই বাতাস কোত্থেকে এসেছে তা সে জানে। দেবতা নেবেন না তার অঞ্জলি।

তাড়াতাড়ি প্রণামরত অবস্থা থেকে উঠে এসে ফুল আর বেলপাতাগুলো কুঁড়িয়ে নিলো সে। তারপর আবার অঞ্জলি মন্ত্র পড়ে সেগুলো স্থাপন করলো আগের জায়গায়, 'গ্রহণ করো প্রভু আমার অঞ্জলি। তোমার নামে নাকি সব পাপ চলে যায়। মহা মহা সব পাপী তোমার প্রসাদে নবজীবন পায়। আমার পাপ কি এতই বেশি? ভক্তি দিয়ে কাটানো যায় না এমন পাপ কি পৃথিবীতে আছে? উত্তর দাও প্রভু।'

পাথর উত্তর দেয় না। শুধু আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কোত্থেকে আবার আসে সেই এক ঝলক বাতাস। উড়িয়ে নেয় তার ফুল আর বেলপাতা। হাল ছেড়ে দেয় সে। আর জড়ো করে লাভ হবে না। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। রাত্রির শেষ অর্ধে অনেকেই ঘুম থেকে উঠে যাবে। তার আগেই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ফুল আর বেলপাতাগুলো তুলে নিলো সে। এগুলো সাথে করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো পুরোহিতের চোখে পড়ে যাবে। ধরা পড়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না।

অভ্যস্ত রাস্তায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে তেমন কোনো সমস্যা হলো না। নক্ষত্রের আলোর আভা সাহায্য করছে তাকে। দুর্গ থেকে বেরিয়ে নদীর ধার ধরে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগলো সে। এই মন্দিরের আগে কত মন্দিরের এভাবে রাত জেগে শিবের আরাধনা করেছে সে। সেসব মন্দিরের কতগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিছু কিছু আবার হয়ে গেছে সাপ আর বাদুড়ের আড্ডাখানা। একটার পর একটা মন্দির বদলালেও তার ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এতগুলো বছরের মধ্যে একবারও ভোলানাথ তার অঞ্জলি গ্রহণ করেননি। বারবার ছুঁড়ে ফেলেছেন তার বাড়িয়ে দেওয়া অর্ঘ্য। দেবাদিদেব যদি কৃপা না করেন, তবে কার সাধ্যি তাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। সাধনা করে যাওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ নেই।

জঙ্গলের গভীরে তার ঘর। একটা পর্ণকুটির। আসবাব কিছুই নেই। শুধু একটা শুকনো পাতার বিছানা। একটা আড়াআড়ি করে বাঁধা লাঠিতে কিছু মলিন কাপড় শুকাচ্ছে। কপালের কাপড়টা খুলে ধুয়ে নিলো সে। তারপর সেটা শুকাতে দিয়ে আরেকটা কাপড় মোটা করে বেঁধে দিলো মাথায়।

সারাদিন তার আর কোনো কাজ নেই। কেবল এই কুটিরে বসে থেকে চারদিকে নজর রাখা। কোনো মানুষের নজরে পড়ে যাওয়া চলবে না। তাহলে তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। নতুন জায়গার সাথে সাথে সন্ধান করতে হবে নতুন মন্দিরের।

৫

বিপদের আঁচ পেলে বুকের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই খচখচে অনুভূতি হয়। আর সে বিপদ যদি আচমকা চলে আসে তবে সে অনুভূতিরও হয় বাহুল্য। অসিতের বুকে পিনপিনে কী যেন বিঁধছে। মহীস্থানের যুবরাজ মহাবলের জন্য এখন বিপদযুক্ত খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সে আবার যেমন তেমন বিপদ নয়, ক্ষত্রিয়ের জন্য উপযুক্ত বিপদ। মাথায় কিছুই আসছে না অসিতের। খেলার সব কৌশলই সে ব্যবহার করে ফেলেছে। তার মাথায় অথবা থলেতে এখন আর নতুন কিছু নেই। ভোম্বলের মতো সে তাকাচ্ছে অধিকারী মশাইয়ের দিকে।

অধিকারী মশাইয়ের দিকে তাকিয়েও যে কোনো লাভ হবে তা মনে হচ্ছে না। তিনিও বিহ্বল মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। যুবরাজকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন নেহাত প্রথার খাতিরে। কিন্তু যুবরাজ যে তার মতো একজন গ্রামের অধিকারীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দলবলসহ হাজির হবেন তা তিনি কখনো ভাবেননি। যুবরাজের আসার খবর পেয়েই তার ত্রাহি অবস্থা। নানা আয়োজন করেছেন তিনি যুবরাজের আগমন উপলক্ষে। তবে সেসবে তেমন লাভ হয়নি। কোনোকিছুতেই ঠিকভাবে যুবরাজের মন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

যেভাবেই হোক যুবরাজ মহাবলকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাকে তুষ্ট করতে না পারলে তার এবং এই গ্রামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মহারাজ অত্রিসোমের শরীর তেমন ভালো না। ওনার মৃত্যুর পর এই যুবরাজই রাজা হবেন। তার হিসেবে সেই সময়ের খুব একটা বাকি নেই। এখন যদি যুবরাজ মহাবলের মাঝে ইন্দ্রপুর সম্পর্কে কোনো অসন্তুষ্টির কুঁড়ি জন্ম নেয়, তাহলে রাজা মহাবলের মনে সেই অসন্তুষ্টি বড়ো বৃক্ষ হয়ে ধরা দেবে। রাজরোষ বড়ো ভয়ানক। সেই রোষের ঝড় তাকে আর ইন্দ্রপুরকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

অধিকারী মশাই তাড়া দিলেন, 'কি রে অসিত, তোর খেলা কি সব শেষ? আরো কিছু জম্পেশ খেলা দেখা। এত তাড়াতাড়ি আসর শেষ হলে চলবে?'

অসিতের মুখ নিচু, 'কর্তা, আমি অঙ্গদকে দিয়ে যেসব খেলা দেখাই তার সবই দেখিয়ে ফেলেছি। তিন বলয়ের লাফের খেলাটা সবার শেষে দেখালাম। সেটাই আমার সবচেয়ে জমজমাট খেলা। সেই খেলা কী আবার দেখাবো?'

'তাহলে সেই খেলাই আবার দেখা। যুবরাজ মশাই তো তোর খেলা দেখতে চাচ্ছেন।'

'না।' ভারী কণ্ঠে একটা নিষেধ ভেসে এলো। এবং তা স্বয়ং যুবরাজ মহাবলের কণ্ঠ থেকে।

যুবরাজের এক সঙ্গী বেশ তাল মেলালো, 'না, আমরা এসব খেলা আর দেখবো না। কোনো মজা নেই। বিরক্তিকর। এসব খেলা দেখলে রংমহলের তামাশা করা মেয়ে আর দেবদাসীরা খুশি হতে পারে। তাদের মন ভরে, ক্ষত্রিয়দের না। যদিও আমরা

অথিতি, আর অথিতিদের গৃহস্বামীর নিন্দা করা অনুচিত, তবু বলতেই হয়, আয়োজন যাচ্ছেতাই। ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কোনো আয়োজনই নেই।'

অধিকারী হাতজোড় করে দাঁড়ালেন যুবরাজ মহাবলের সামনে, 'আসলে যুবরাজ, আমাদের গায়ে এই একটাই ছেলে আছে যে খেলা দেখায়। আর কেউ নেই। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। এখন খাবার সময়ও হয়ে গেছে। আপনাদের তো আবার ফিরতেও হবে। তাহলে চলুন, আমরা এখন খাবারের জায়গায় যাই।'

মহাবল অধিকারীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, 'আপনি তাহলে অন্যভাবে আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি আপনার সাধারণ কুটুম অথিতি না, আমরা রাজঅথিতি। এই তাহলে আপনাদের গ্রামে রাজঅথিতিদের আপ্যায়ন করার রীতি। রাজঅথিতিদের সৎকারে যদি আপনি এতটাই অপারগ তাহলে বলুন, কেন আপনি লোক পাঠিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন? রাজবাড়ির উপহার গ্রহণ করার সময় ষোলোআনা বুঝে নেবেন, আর আপ্যায়নের বেলায় অপমান করবেন? এই গ্রামের সৌভাগ্য এখানে রাজপুরুষদের পায়ের ধুলো পড়েছে। তাও যেনতেন রাজপুরুষ না, আমি স্বয়ং যুবরাজ।'

অধিকারী মশাইয়ের শরীর কাঁপছে, 'না যুবরাজ, আপনি ভুল বুঝছেন। আসলে আমি জানি আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি আছে। আমাদের এই গরিব গ্রাম ইন্দ্রপুর। আপনাদের মতো রাজপুরুষদের যোগ্য আয়োজন আমি কীভাবে করবো? আপনারা গরিবের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা না করলে আমরা কোথায় যাবো? আপনাদের বংশ অনেক আগে থেকেই রাজধর্মের পালন করে আসছে। আর ক্ষমাই তো সবচেয়ে বড়ো রাজধর্ম যুবরাজ।'

এবার যুবরাজের আরেক সঙ্গী উত্তর দিলো, 'যুবরাজ, এখানে তো মনে হয় আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিনি। মনে হচ্ছে গুরুগৃহে এসেছি। রাজধর্মের শাস্ত্রপাঠ চলছে এখন। একটু পর আবার শুরু হবে নীতিপাঠ, চতুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র, শস্ত্রবিদ্যা, কাব্য, অলংকার। আমরা এখন কী করবো? আমার তো মনে হয় মাটিতে কুশ বিছিয়ে বসে পড়াই উচিত।'

যুবরাজ এবং তার সঙ্গীরা হেসে উঠলেন। যুবরাজ শোনালেন তার সিদ্ধান্ত, 'ক্ষত্রিয়ের যোগ্য খেলা যখন আপনারা দেখাতেই পারবেন না, তখন আমাদেরই সেই খেলার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এবং সেই খেলা দেখার পরেই আমরা খেতে যাবো।'

অধিকারী মশাই হাল ছেড়ে দিয়ে নীরব মুখে এক কোণে দাঁড়ালেন। জল এখন পাত্র থেকে মাটিতে পড়েছে। তুলবার আর উপায় নেই। গড়িয়ে কোনদিকে যায় তাই এখন দেখতে হবে।

যুবরাজ সবার সামনে দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। মাথায় চিন্তা চলছে তার। কী করা যায়, কী করা যায়।

আশেপাশের লোকজনের স্তব্ধ অবস্থা এখনো কাটেনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছে সবাই। রাজার খেয়াল, পাগলা শেয়াল আর ভাঙ্গা দেয়ালের কোনো ভরসা নেই। বিপদের ব্যবস্থা কীভাবে হবে কে জানে। কারো চোখের পলকও পড়ছে না।

তখনই মশালের আগুন আর তেলের দিকে নজর গেল যুবরাজের। একটু আগে বানরটা তিনটা বলয়ের ভেতর দিয়ে একসাথে লাফিয়ে পেরিয়েছিল। সেই খেলাটাই

৫

বিপদের আঁচ পেলে বুকের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই খচখচে অনুভূতি হয়। আর সে বিপদ যদি আচমকা চলে আসে তবে সে অনুভূতিরও হয় বাহুল্য। অসিতের বুকে পিনপিনে কী যেন বিঁধছে। মহীস্থানের যুবরাজ মহাবলের জন্য এখন বিপদযুক্ত খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সে আবার যেমন তেমন বিপদ নয়, ক্ষত্রিয়ের জন্য উপযুক্ত বিপদ। মাথায় কিছুই আসছে না অসিতের। খেলার সব কৌশলই সে ব্যবহার করে ফেলেছে। তার মাথায় অথবা থলেতে এখন আর নতুন কিছু নেই। ভোম্বলের মতো সে তাকাচ্ছে অধিকারী মশাইয়ের দিকে।

অধিকারী মশাইয়ের দিকে তাকিয়েও যে কোনো লাভ হবে তা মনে হচ্ছে না। তিনিও বিহ্বল মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। যুবরাজকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন নেহাত প্রথার খাতিরে। কিন্তু যুবরাজ যে তার মতো একজন গ্রামের অধিকারীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দলবলসহ হাজির হবেন তা তিনি কখনো ভাবেননি। যুবরাজের আসার খবর পেয়েই তার ত্রাহি অবস্থা। নানা আয়োজন করেছেন তিনি যুবরাজের আগমন উপলক্ষে। তবে সেসবে তেমন লাভ হয়নি। কোনোকিছুতেই ঠিকভাবে যুবরাজের মন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

যেভাবেই হোক যুবরাজ মহাবলকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাকে তুষ্ট করতে না পারলে তার এবং এই গ্রামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মহারাজ অত্রিসোমের শরীর তেমন ভালো না। ওনার মৃত্যুর পর এই যুবরাজই রাজা হবেন। তার হিসেবে সেই সময়ের খুব একটা বাকি নেই। এখন যদি যুবরাজ মহাবলের মাঝে ইন্দ্রপুর সম্পর্কে কোনো অসন্তুষ্টির কুঁড়ি জন্ম নেয়, তাহলে রাজা মহাবলের মনে সেই অসন্তুষ্টি বড়ো বৃক্ষ হয়ে ধরা দেবে। রাজরোষ বড়ো ভয়ানক। সেই রোষের ঝড় তাকে আর ইন্দ্রপুরকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

অধিকারী মশাই তাড়া দিলেন, 'কি রে অসিত, তোর খেলা কি সব শেষ? আরো কিছু জম্পেশ খেলা দেখা। এত তাড়াতাড়ি আসর শেষ হলে চলবে?'

অসিতের মুখ নিচু, 'কর্তা, আমি অঙ্গদকে দিয়ে যেসব খেলা দেখাই তার সবই দেখিয়ে ফেলেছি। তিন বলয়ের লাফের খেলাটা সবার শেষে দেখালাম। সেটাই আমার সবচেয়ে জমজমাট খেলা। সেই খেলা কী আবার দেখাবো?'

'তাহলে সেই খেলাই আবার দেখা। যুবরাজ মশাই তো তোর খেলা দেখতে চাচ্ছেন।'

'না।' ভারী কণ্ঠে একটা নিষেধ ভেসে এলো। এবং তা স্বয়ং যুবরাজ মহাবলের কণ্ঠ থেকে।

যুবরাজের এক সঙ্গী বেশ তাল মেলালো, 'না, আমরা এসব খেলা আর দেখবো না। কোনো মজা নেই। বিরক্তিকর। এসব খেলা দেখলে রংমহলের তামাশা করা মেয়ে আর দেবদাসীরা খুশি হতে পারে। তাদের মন ভরে, ক্ষত্রিয়দের না। যদিও আমরা

অথিতি, আর অথিতিদের গৃহস্বামীর নিন্দা করা অনুচিত, তবু বলতেই হয়, আয়োজন যাচ্ছেতাই। ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কোনো আয়োজনই নেই।'

অধিকারী হাতজোড় করে দাঁড়ালেন যুবরাজ মহাবলের সামনে, 'আসলে যুবরাজ, আমাদের গায়ে এই একটাই ছেলে আছে যে খেলা দেখায়। আর কেউ নেই। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। এখন খাবার সময়ও হয়ে গেছে। আপনাদের তো আবার ফিরতেও হবে। তাহলে চলুন, আমরা এখন খাবারের জায়গায় যাই।'

মহাবল অধিকারীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, 'আপনি তাহলে অন্যভাবে আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি আপনার সাধারণ কুটুম অথিতি না, আমরা রাজঅথিতি। এই তাহলে আপনাদের গ্রামে রাজঅথিতিদের আপ্যায়ন করার রীতি। রাজঅথিতিদের সৎকারে যদি আপনি এতটাই অপারগ তাহলে বলুন, কেন আপনি লোক পাঠিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন? রাজবাড়ির উপহার গ্রহণ করার সময় ষোলোআনা বুঝে নেবেন, আর আপ্যায়নের বেলায় অপমান করবেন? এই গ্রামের সৌভাগ্য এখানে রাজপুরুষদের পায়ের ধুলো পড়েছে। তাও যেনতেন রাজপুরুষ না, আমি স্বয়ং যুবরাজ।'

অধিকারী মশাইয়ের শরীর কাঁপছে, 'না যুবরাজ, আপনি ভুল বুঝছেন। আসলে আমি জানি আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি আছে। আমাদের এই গরিব গ্রাম ইন্দ্রপুর। আপনাদের মতো রাজপুরুষদের যোগ্য আয়োজন আমি কীভাবে করবো? আপনারা গরিবের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা না করলে আমরা কোথায় যাবো? আপনাদের বংশ অনেক আগে থেকেই রাজধর্মের পালন করে আসছে। আর ক্ষমাই তো সবচেয়ে বড়ো রাজধর্ম যুবরাজ।'

এবার যুবরাজের আরেক সঙ্গী উত্তর দিলো, 'যুবরাজ, এখানে তো মনে হয় আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিনি। মনে হচ্ছে গুরুগৃহে এসেছি। রাজধর্মের শাস্ত্রপাঠ চলছে এখন। একটু পর আবার শুরু হবে নীতিপাঠ, চতুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র, শস্ত্রবিদ্যা, কাব্য, অলংকার। আমরা এখন কী করবো? আমার তো মনে হয় মাটিতে কুশ বিছিয়ে বসে পড়াই উচিত।'

যুবরাজ এবং তার সঙ্গীরা হেসে উঠলেন। যুবরাজ শোনালেন তার সিদ্ধান্ত, 'ক্ষত্রিয়ের যোগ্য খেলা যখন আপনারা দেখাতেই পারবেন না, তখন আমাদেরই সেই খেলার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এবং সেই খেলা দেখার পরেই আমরা খেতে যাবো।'

অধিকারী মশাই হাল ছেড়ে দিয়ে নীরব মুখে এক কোণে দাঁড়ালেন। জল এখন পাত্র থেকে মাটিতে পড়েছে। তুলবার আর উপায় নেই। গড়িয়ে কোনদিকে যায় তাই এখন দেখতে হবে।

যুবরাজ সবার সামনে দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। মাথায় চিন্তা চলছে তার। কী করা যায়, কী করা যায়।

আশেপাশের লোকজনের স্তব্ধ অবস্থা এখনো কাটেনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছে সবাই। রাজার খেয়াল, পাগলা শেয়াল আর ভাঙ্গা দেয়ালের কোনো ভরসা নেই। বিপদের ব্যবস্থা কীভাবে হবে কে জানে। কারো চোখের পলকও পড়ছে না।

তখনই মশালের আগুন আর তেলের দিকে নজর গেল যুবরাজের। একটু আগে বানরটা তিনটা বলয়ের ভেতর দিয়ে একসাথে লাফিয়ে পেরিয়েছিল। সেই খেলাটাই

আবার হবে। তবে এবার একটু অন্যভাবে। খেলাটায় কেবল একটু পরিবর্তন আসবে। আর পরিবর্তনের পরিকল্পনা তার মাথায় এরই মধ্যে চলে এসেছে। কেবল একটু পরিবর্তন।

'অধিকারী।'

নিজের পদবী শুনে হন্তদন্ত হয়ে যুবরাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন অধিকারী, 'বলুন যুবরাজ, কী আদেশ?'

'রাজধর্ম তো আমাদেরকে অনেক শেখালেন। এবার তাহলে আপনি একটু প্রজাধর্মের পালন করুন। রাজাজ্ঞা পালন করবেন তো?'

'অবশ্যই। রাজাজ্ঞা সবসময়ই পালনীয়।'

'এখনই অনেকগুলো মোটা মশালের কাপড় আনতে বলুন। সলতের মতো কেটে না। কাপড় আস্ত থাকবে। সেই কাপড়ে আগুন অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে পারবে।'

'আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি ব্যবস্থা করতে।'

বেশি দেরি হলো না। কতগুলো মোটা কাপড় নিয়ে হাজির হলেন অধিকারী, 'এবার কী করবো বলুন যুবরাজ।'

কাপড়গুলো নিজের হাতে নিলেন মহাবল, 'বাহ, বেশ ভালো কাপড়। হ্যাঁ, এগুলো দিয়েই হবে। এবার আপনি মশালের তেল নিয়ে আসুন। দুই সেরের মতো আনবেন। তেলে যাতে কোন কিছু মেশানো না থাকে।'

অধিকারী মশাই কিছুই বুঝতে পারছেন না। তেল আর মশালের কাপড় দিয়ে কী হবে। তবে পরিস্থিতি এখন নাজুক। কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করে মুখ বুজে কাজ করে যাওয়াই এখন উত্তম। এমনিতেই তার রাজভক্তি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন।

তেল আনতেই যুবরাজ এবং তার সাথের ক্ষত্রিয়রা কাজে লেগে পড়লেন। অসিত পরপর যে তিনটে লোহার বলয় বাঁশের গায়ে বেঁধে দিয়েছিল সেগুলোর গায়ে মোটা কাপড়গুলো জড়ানো হলো। তবে তার আগেই সেগুলো তেলে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে। একেবারে চুপচুপে করে। বলয়গুলো যে বাঁশে বাঁধা ছিল সেগুলোর গা বেয়েও তেল বেয়ে পড়ছে।

কাজ শেষ হতেই ঘোষণা করলেন যুবরাজ, 'কাজ শেষ। এবার এই কাপড়গুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলেই হলো। আর তখন এই বানর সেই আগুনের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে যাবে। তখন পুড়ে যাবার ভয় থাকবে। বিপদ থাকবে। দেখা যাবে এই ছেলে আর তার বানর কেমন খেলা দেখাতে পারে। তবেই এই খেলা ক্ষত্রিয়ের দেখার যোগ্য হবে।'

অসিতের চোখ আতঙ্কে বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। এমনিতেই এই খেলা তার খেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জটিল। সে অঙ্গদের বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে পারছে। এমনিতেই শেষ বলয় অতিক্রম করতে অঙ্গদের বেশ কষ্ট হয়ে যায়। আর যখন বলয়ে আগুন জ্বলবে তখন সেই কষ্ট আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে। আর কষ্টের চেয়েও বড়ো কথা, আগুন দেখলে অঙ্গদ ভয় পেয়ে যাবে। আর ভয় মনে যে জিনিস প্রথমেই উৎপন্ন করে তা হচ্ছে সংশয়। সেই সংশয় মনের ভেতরে রেখে অঙ্গদ বলয় পেরোতে পারবে কি না সন্দেহ। না, অঙ্গদকে কিছুতেই এই বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না। অসিত এগিয়ে গেল অধিকারী মশাইয়ের দিকে,

'কর্তা, অঙ্গদ এই খেলা দেখাতে পারবে না। আগুন দেখে ও ভয় পেয়ে যাবে। আপনি যুবরাজকে একটু বুঝিয়ে বলেন। অঙ্গদ কিছুতেই এই খেলা দেখাতে পারবে না।'

অসিত পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও অধিকারী মশাইয়ের অভিজ্ঞ মাথা ঠিকই বুঝতে পারছে। এত প্রস্তুতির পর যুবরাজকে বুঝিয়ে বলে আর কোনো লাভ হবে না। তার মনেও এখন অন্য ভয় গেঁড়ে বসেছে, 'শোন অসিত, যুবরাজ মশাইকে এখন কোনো কিছু বুঝিয়ে বললে কোনো লাভ হবে না। তোকে খেলাটা দেখাতেই হবে। অঙ্গদকে লাফ দিতে হবে এই আগুনের ভেতর দিয়ে। ভুলে যাস না, রাজাজ্ঞা পালন করাই প্রজার একমাত্র কর্তব্য। যুবরাজের মনে কোনোভাবেই বিরক্তির উৎপাদন করা চলবে না। তুই অঙ্গদকে নিয়ে তৈরি হ। এখনই লাফ দিতে হবে।'

অসিত একবার অঙ্গদের দিকে তাকালো। এক কোণায় এখন নীরবে বসে আছে সে। ঘাসের মধ্য থেকে কী একটা খুঁজে নিলো সে। তারপর একবার শুঁকলো। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো তার। জিনিসটা পছন্দ হয়নি। সেটা অঙ্গদ আবার ঘাসেই ছুঁড়ে ফেললো। সে মানুষের ভাষা বোঝে না। যদি বুঝতো, তাহলে এত নির্বিকার বসে থাকতে পারতো না। একটু পরেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সামনে পড়তে হবে তাকে।

অসিত বুঝতে পারলো আর কোন উপায় নেই। যুবরাজের আদেশ মানতেই হবে। নিজেকে সামলে নিয়ে অঙ্গদকে ইশারা করলো সে, 'চল অঙ্গদ, আরেকবার খেলা দেখাতে হবে। তারপর আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যাবো। চল, উঠে আয়, দেরি করিস না।'

ইশারা দেখে অঙ্গদ বুঝতে পারলো, তাকে এখন আবার শেষ খেলাটা দেখাতে হবে। তৈরি হয়ে নিলো সে। বলয় থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালো।

যুবরাজের মুখে হাসি ফুটলো, 'বাহ, আমাদের খেলোয়াড় দেখি একেবারে তৈরি। তাহলে খেলা শুরু হোক, এবার জমবে মজা।'

এবার যুবরাজ সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কই, সবাই এতো মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এতক্ষণে একটা খেলার মতো খেলা হতে যাচ্ছে। আর আমি তো তোমাদের মধ্যে কোনো উৎসাহই দেখতে পাচ্ছি না। সবাই কেমন যেন মুখ ভোঁতা করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই হাততালি দাও, চিৎকার করো। আমাদের খেলোয়াড়কে চেঁচিয়ে উৎসাহ দাও।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হর্ষধ্বনি উঠলো দর্শকদের মাঝে। অধিকারী মশাই সেই হাততালি আর হর্ষধ্বনির নেতৃত্ব দিলেন। এই খেলার মধ্যে যদিও রাজবংশের অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার ছায়া দেখতে পাচ্ছে সবাই, তবু আদেশ না মেনে উপায় নেই। সময় এবং সংস্কার তাদেরকে অত্যাচারের প্রতি প্রতিবাদী হতে নয়, বরং অত্যাচারীর প্রতি ভীত হতে শিখিয়েছে।

একটা জলন্ত মশাল দিয়ে তিনটে বলয়ের গায়েই আগুন ধরিয়ে দিলেন যুবরাজ। দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। তারপর তিনি তাকালেন অসিতের দিকে, 'শুরু করো। আগুন বেশিক্ষণ থাকবে না।'

অঙ্গদ এতক্ষণ বিপদের কিছুই বুঝতে পারেনি। এবার আগুন জ্বলতে দেখে বিপদের স্বরূপ বুঝতে পারলো সে। আগুনের দিকে সে তাকালো তীব্র আতঙ্ক নিয়ে। তার খেলায় আগুনের পরিচয় আগে কখনো ছিল না।

একই দৃষ্টিতে অসিতের দিকে তাকালো অঙ্গদ। অসিত পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো অঙ্গদের দিকে, 'ভয় পাস না। তুই পারবি। কোনো সমস্যা হবে না। এটা একটা খেলা। তুই কতবার খেলেছিস। দেখবি, সহজেই পেরিয়ে যাবি লাফ দিয়ে।'

অসিত অঙ্গদকে লাফ দেবার ইশারা করলো। অঙ্গদ অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে অসিতের দিকে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, অসিত তাকে আগুনের ভেতর দিয়ে লাফ দিতে বলছে। তবে অসিতের ইশারা তাকে মানতেই হবে। দুলকি চালে দৌড়ে গিয়ে লাফ দিলো সে। যুবরাজ আর তার সঙ্গীদের চোখে কৌতুক। দর্শকদের চোখে নির্ভেজাল আতঙ্ক। লাফ দেবার মুহূর্তের উত্তেজনা নিতে পারলো না অসিত। অঙ্গদের লাফ দেবার ঠিক আগ মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

দর্শকদের হর্ষধ্বনি শুনতে পেয়ে চোখ মেললো সে। এক প্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে সরাসরি আরেক প্রান্তের বলয়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। স্বয়ং যুবরাজ এবার বলে উঠলেন, 'বাহ, বেশ ভালো। শাবাশ।'

তারপর আবার ঘোষণা করলেন, 'প্রথমবার বেশ ভালোই করলো বানর। আর দুবার কেমন করে দেখা যাক। যে কোনো খেলা তিন দান হলেই ভালো।'

অসিত এবার একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে অধিকারী মশাইয়ের দিকে তাকালো। অধিকারী যুবরাজের সামনে গিয়ে হাতজোড় করলেন, 'যুবরাজ, খেলা দেখা তো শেষ হয়েছে। এবার তাহলে খাবারের ব্যবস্থা করি? আগুনটাও তো নিভিয়ে ফেলতে হবে।'

যুবরাজের মুখ কঠিন, 'আপনি মনে হয় আমার শেষ কথাটা লোকজনের চিৎকারের কারণে ঠিকমতো শুনতে পাননি। বললাম তো, আরো দুবার লাফ দিতে হবে।'

'কিন্তু'

'থামুন আপনি।' এক ধমকে অধিকারীকে চুপ করিয়ে দিলেন যুবরাজ, 'কোনোকিছুই একবারে সিদ্ধ হয় না। তিন দান খেলতে হয়। ওকে বলুন বানরকে দিয়ে আরো দুবার লাফ দেওয়াতে। তাহলেই শেষ হবে খেলা।'

অধিকারী আবার নিরুপায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন অসিতের দিকে। ওদিকে অসিত তখন অঙ্গদের কী অবস্থা হয়েছে তাই দেখতে ব্যস্ত। অঙ্গদের গায়ের বেশ কিছু লোম পুড়ে গেছে। আগুনের ছ্যাকার যন্ত্রণায় সে মৃদু আর্তনাদ করছে। অসিত তার কানে কানে বললো, 'ভালোই করেছিস অঙ্গদ। আর দুবার মাত্র লাফাতে হবে। যা, ওপাশে যা।'

নিরুপায় দৃষ্টিতে অঙ্গদ আবার তাকালো অসিতের দিকে। সে দৃষ্টি পড়তে পারছে অসিত। যেন স্পষ্ট বলছে, আমাকে রক্ষা করো তুমি। আগুনের ভেতর দিয়ে আর লাফ দিতে বোলো না। আমার খুব কষ্ট হয়েছে গো। আর বোলো না।

অঙ্গদের মনের কথা বুঝতে পেরে বুকটা যেন মুচড়ে উঠতে লাগলো অসিতের। কিন্তু করার কিছুই নেই। খেলা না দেখিয়ে এই জায়গা থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো উপায় নেই।

অঙ্গদ আবার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। অসিতের ইশারায় আবার লাফ দিলো সে। এবারো অসিত চোখ খোলা রাখতে পারলো না। আবারো আগের বারের মতো চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে দর্শকদের চিৎকার আর যুবরাজের বাহবা শুনতে পেলো। বুঝতে পারলো, অঙ্গদ এবারো সফল হয়েছে। চোখ খুলেই সে ছুটে গেল অঙ্গদের দিকে। না, এবারো জোরালো কোন আঘাত পায়নি অঙ্গদ। আর মাত্র একবার। তারপর এই বিভীষিকা থেকে মুক্তি।

আবার লাফ দিলো অঙ্গদ। শেষবার। আবার চোখ বন্ধ অসিতের। কিন্তু এবার আর গত দুবারের মতো অসিতের কানে দর্শকদের আনন্দধ্বনি আর যুবরাজের বাহবা এসে এলো না। তার বদলে এলো সম্মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ।

আতঙ্কিত চোখ মেললো অসিত। এবার আর সফল হতে পারেনি অঙ্গদ। দ্বিতীয় বলয়ে বেঁধে গিয়েছিল অঙ্গদের শরীর। তেল বাঁশ বেয়ে নেমে আসার কারণে প্রথম থেকেই বাঁশে আগুন জ্বলছিল সেই প্রথম থেকেই। বাঁশের শক্তি কমে গিয়েছিল। আর ক্রমাগত শক্তি হারাতে থাকা সেই বাঁশ বেঁধে যাওয়া অঙ্গদের শরীরের ভার রাখতে পারলো না। সবকিছু নিয়ে অঙ্গদ নিচে পড়লো। মোটা কাপড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর সে কাপড় এখন জড়িয়ে আছে অঙ্গদের শরীরে। বাঁশ আর বলয় জড়িয়ে থাকার কারণে সেই ওজনে অঙ্গদ উঠতে পারছে না। বলতে গেলে অঙ্গদের পুরো শরীরেই এখন আগুন ধরে গেছে।

জোরে এক চিৎকার দিয়ে সেদিকে ছুটে গেল অসিত। নিজের শরীরের কাপড় সঠিক নিয়মে খুলতে গেলে সময় বেশি লাগবে, তাই এক ঝটকা টানে ছিঁড়ে খুলে নিলো সে কাপড়। অঙ্গদের শরীরে জ্বলতে থাকা আগুন চাপা দিলো সে কাপড়টা দিয়ে। কিন্তু তেলের শক্তিতে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা সেই আগুন এত সহজে নিভলো না। বরং আগুন ধরে গেল অসিতের কাপড়েই।

পাশে রাখা ছিল মস্ত এক জলের জালা। অধিকারী মশাই উপস্থিত বুদ্ধি দেখালেন। পুরো জালার জলটা তিনি ঢেলে দিলেন আগুনে।

এবার আগুন নিভলো। কিন্তু অঙ্গদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ জলের স্পর্শে আরো বেড়ে উঠলো। অঙ্গদের শরীর প্রায় পুরোটাই পুড়ে গেছে। পুরো শরীরের খুব কম জায়গাতেই লোম দেখা যাচ্ছে। অসিতের চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াতে লাগলো।

যুবরাজ মহাবল এগিয়ে এলেন, 'এবার হয়েছে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত খেলা। বিপদের ভয় থাকবে, উত্তেজনা থাকবে, হয়তো শেষে বলিদানও থাকবে। আমি তোমার খেলা দেখে তৃপ্ত। এই নাও তোমার পুরস্কার।'

এক থলি রৌপ্য মুদ্রা অসিতের দিকে ছুঁড়ে দিলেন যুবরাজ মহাবল। থলিটা এসে পড়লো অসিতের সামনে। অসিতের মনে ঘৃণা আর ক্রোধ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ঘৃণার দৃষ্টিতে সে তাকালো থলিটার দিকে। কিন্তু, পরক্ষণেই তার মনে ফিরে এলো সেই পুরানো, রক্তের গভীরে গেঁথে থাকা রাজভয়। ক্রোধ নিমেষে গেল উবে। রাজার উপহার না নিলে রাজদ্রোহ হবে। আর রাজদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কাঁদতে কাঁদতে সে থলিটা নিয়ে কোমরে গুঁজলো।

আর অপেক্ষা করলো না অসিত। অঙ্গদের দেহটা তার আধপোড়া কাপড়ে জড়িয়ে এক ছুটে সে বেরিয়ে গেল অধিকারী মশাইয়ের বাড়ি থেকে। এক নিঃশ্বাসে ছুটছে সে।

অধিকারী মশাইয়ের বাড়ি থেকে সুকুমারে বৈদ্যের বাড়ি অনেক দূর। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেখানে পৌঁছাতে হবে তাকে।

সুকুমার এই অঞ্চলের একমাত্র বৈদ্য। একেবারে ধন্বন্তরি কিংবা অশ্বিনীকুমার বলা যাবে না, তবে এই অঞ্চলের তিনিই একমাত্র ভরসা। মানুষের যে-কোনো রোগেই ওষুধ দেন তিনি। তবে যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হয়।

মাঝপথ পর্যন্ত দৌড়ে আসার পর অসিতের মনে হলো, আজ তো আবার অধিকারীর বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ। সুকুমার বৈদ্য কি বাড়িতে আছেন নাকি সেখানে গেছেন? তবে চিন্তাটা মাথায় এলেও দৌড় থামালো না সে। চলতে চলতেই চিন্তা করতে লাগলো। না, সুকুমার দাদুর দুই ছেলেকে সেখানে দেখলেও সুকুমার দাদুকে সেখানে দেখা যায়নি। মনে হয় বাড়িসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ খেতে গেছে আর বৃদ্ধকে রেখে গেছে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য।

অসিতের ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল। পথে নারী আর উৎসবে বৃদ্ধ বিবর্জিত হয়েই থাকে। আর বৃদ্ধেরও এতেটা রাস্তা লাঠি ঠেঙ্গিয়ে যাওয়া পোষাত না। তারচেয়ে বাড়ির লোক খাবার বেঁধে নিয়ে আসবে, সেই ভালো।

অসিত তাড়াতাড়ি দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলো, 'সুকুমার দাদু, ও সুকুমার দাদু।'

বৃদ্ধ বৈদ্য ঘুমাচ্ছিলেন। তবে পেশাগত কারণেই অনেক আগে থেকেই তার ঘুম পাতলা। রাত বিরাতে এমন ডাক তিনি অনেক শুনেছেন। প্রথম ডাকেই ঘুম ভেঙ্গে গেল তার, 'কে রে? কী হলো আবার এত রাতে?'

'দাদু, আমি অসিত। একটু খোলো দাদু। খুব বিপদ হয়েছে আমার।'

অসিতের আকুল আহবানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না বৃদ্ধ সুকুমার। দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে চিকিৎসা করছেন তিনি। অভিজ্ঞ চিকিৎসক মানুষের ডাকে বিচলিত হন না, সে অভিজ্ঞতার জোরে, কিন্তু সেই সাথে মানবতার জোরে আকুল ডাকে সাড়া না দিয়েও পারেন না। সেটা চিকিৎসকের ধর্ম। আর এই ধর্ম না মানলে অশ্বিনীকুমারের দান মুছে যাবে।

দরজা খুলতেই অসিত আর তার কোলে কাপড়ে জড়ানো অঙ্গদকে দেখতে পেলেন তিনি, 'কিরে, তুই এখানে কী করিস। আজ না অধিকারীর বাড়িতে ভোজ। সেই ভোজ ফেলে রেখে তুই এখানে কী করছিস?'

'সেখানে গিয়েছিলাম দাদু। সেখানে গিয়েই বিপদে পড়লাম। অঙ্গদ আগুনে পড়ে গিয়েছিল। ওর সারা শরীর পুড়ে গেছে। একটু দেখেননা দাদু।'

অসিত কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছে। অসিতের কান্নার সাথে সাথে ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অঙ্গদের শরীর পরীক্ষা করলেন তিনি। আঁতকে উঠলেন তিনি। আরও ভালো করে করলেন পরীক্ষা। না, বেশি সময় ধরে আগুনের সংস্পর্শে ছিল না অঙ্গদ। মাংসে পোড়া ধরেনি। তবে চামড়া আর রোমের দফারফা হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে অঙ্গদ। এখন আর চেঁচিয়ে আর্তনাদ করতে পারছে না সে। চি চি আওয়াজ বেরোচ্ছে শুধু তার গলা দিয়ে।

'কিছু করেন দাদু। অঙ্গদ কি ভালো হবে?'

'হ্যাঁ, হবে। ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদিস না। কান্না কখনো কারো উপকার করতে পারে না। আমাকে একটু চিন্তা করতে দে। মানুষের ওষুধ বানরের ওপর পুরোপুরি কাজ

না করলেও ভালোই করার কথা। বানরও মানুষের মতো স্তন্যপায়ী। খুব একটা পার্থক্য নেই। প্রথমে আমাকে অঙ্গদের শরীরের জ্বলুনি কমাতে হবে। দাড়া, স্নায়ুর অনুভূতিনাশক ওষুধটা আগে বের করি।'

একটা মুখ বন্ধ করা বোতল বের করে আনলেন তিনি। রোগ যন্ত্রণা যখন কারো খুব বেশি হয়ে যায়, যখন রোগীর আর্তনাদ করার শক্তিও অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই ওষুধ খাওয়ানোর নিয়ম। মানুষের স্নায়ুতে কাজ করে, তার ধারণা বানরের স্নায়ুতেও করবে, আসলে করবে কি? চিন্তা ভাবনা আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি। দেখাই যাক না চেষ্টা করে। এখন কিছু না করলে অঙ্গদ এমনিতেই মারা যাবে।

'ওর মুখ হাঁ করে ধর। এই ওষুধটা খাওয়াতে হবে।'

অসিত অঙ্গদের মুখ হাঁ করে ধরলো। পরিমাণ মতো ওষুধ ঢেলে দিলেন সুকুমার বৈদ্য।

পাঁচ কলা সময়ের মধ্যেই ওষুধ কাজ করলো। এই ওষুধ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। অঙ্গদের মুখ থেকে যন্ত্রণার ছাপ মুছে গেল ধীরে ধীরে। চোখের মণি স্বাভাবিক হয়ে এলো তার। অসিতের দিকে তাকিয়ে হাসির মতো একটা ভঙ্গি করলো।

অসিতের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'ভালো হয়ে গেছে। অঙ্গদ ভালো হয়ে গেছে। দাদু আপনার আসলেই তুলনা নেই। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।' শুধু কথায় নয়, দেহ দিয়েও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো সে। গড় হয়ে প্রণাম করলো সুকুমার বৈদ্যকে।

সুকুমার বৈদ্য ধমকে উঠলেন, 'এখনই প্রণাম করতে হবে না। উঠে দাঁড়া। এখনো ভালো হয়নি অঙ্গদ। ওষুধ দিয়ে শুধু ব্যথা কমিয়েছি। দূর করতে পারিনি। তাও বেশিক্ষণের জন্য না। বেশি হলে দুই মুহূর্ত ভালো থাকবে ও। সেই সময়ের মধ্যে আমাদের আসল ওষুধ খুঁজে আনতে হবে। সেই ওষুধ বেটে রস লাগিয়ে দিতে হবে অঙ্গদের সারা দেহে। কাপড়ের পট্টি বাঁধতে হবে সারা শরীরে। তারপর কয়দিন গেলে ভালো হবে অঙ্গদ।'

'আসল ওষুধ?'

'হ্যাঁ, পাবক লতা।'

'সে ওষুধ আপনার কাছে নেই?'

'না, সেই ওষুধ কীভাবে থাকবে? পোড়া রোগী কি প্রতিদিন আমার কাছে আসে? এটা এখন আনতে হবে জঙ্গল থেকে।'

অসিত সংশয়ে পড়লো, 'এই রাতের বেলা আপনি এই পাবক লতা কোথায় খুঁজে পাবেন?'

'আরে ব্যাটা, এই গ্রামে চিকিৎসা করে করে বুড়ো হয়েছি। এই গ্রামের জঙ্গলে আর ঝোপে কোথায় কী আছে সব আমার জানা। বেশি দূর যেতে হবে না। তুই মশাল জ্বালিয়ে আমার সাথে আয়। কথা কম।'

অসিত আর কথা বাড়ালো না। জ্বালিয়ে নেওয়া মশালটা হাতে করে সুকুমার বৈদ্যের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো। অঙ্গদ ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে। ওষুধের আবেশে তার চোখে ঘুম চলে এসেছে প্রায়।

বৃদ্ধ অত্যুক্তি করেননি। জঙ্গলের কাছের ঝোপেই পাওয়া গেল প্রচুর পাবক লতা। সেগুলো সুকুমার বৈদ্যের আদেশ মতো তুলে আনলো অসিত।

যথেষ্ট পরিমাণ লতা নিয়ে ফিরে এলো তারা। সুকুমার বৈদ্য হামানদিস্তা এগিয়ে দিলেন। অসিত লতা পাতা পিষে রস বের করতে লাগলো।

রস তৈরি হতেই কাজে লেগে পড়লেন সুকুমার বৈদ্য। অঙ্গদের পুরো শরীরে সেই রস পুরু করে লেপে দিতে লাগলেন তিনি। রস মাখানো শেষ হলে পুরো শরীর মুড়িয়ে দেওয়া হলো পরিষ্কার সাদা কাপড়ে। দেখার জন্য দুই চোখ, শ্বাস নেওয়ার জন্য নাকের দুই ফুটো আর মুখ বাদে বাকি সবই মুড়ে দেওয়া হলো। ও আচ্ছা, অঙ্গদের শরীরের দরজাগুলোর মধ্যে আরো দুটো দরজা খোলা রাখতে হলো। তবে সেই জায়গা দুটোর নাম সরাসরি নেওয়া একটু কুরুচির পরিচয় দেয়। আরেকটা বোতলে স্নায়ুর ওষুধটা দিয়ে দিলেন তিনি,

'শোন, এই কাপড়ে তিনদিন ওর শরীর ঢেকে রাখবি। এই তিনদিন কোন ধরনের নড়াচড়া করতে পারবে না অঙ্গদ। আর যদি ব্যথা হয় আর চিৎকার করে তাহলে এই বোতলের ওষুধ এক ঢোক খাইয়ে দিবি। যদি ব্যথা না করে তাহলে খাওয়ানোর দরকার নেই। যদি না খাওয়াস তাহলে ওষুধটা আমাকে ফেরত দিয়ে যাস।'

'আচ্ছা দাদু' যুবরাজের দেওয়া থলি থেকে দুটো রুপোর মুদ্রা অসিত বাড়িয়ে দিলো সুকুমার বৈদ্যের দিকে, 'এই নিন দাদু, আপনার প্রণামী।'

দুটো পয়সা পেয়ে বৃদ্ধ বেশ অবাক হলেন, 'কিরে, এই গ্রামের মানুষের কাছ থেকে তো তামার পয়সা বের করতেই কষ্ট হয়ে যায়। আর তোর কাছে দেখি রুপার মুদ্রা। এগুলো কই পেলি তুই?'

নতমুখে উত্তর দিলো অসিত, 'দাদু, আমার অঙ্গদের পোড়া চামড়া আর রোমের দাম হলো এই পয়সা।'

বৃদ্ধ কী বুঝলেন কে জানে, শুধু বললেন, 'রুপার মুদ্রাগুলো সাবধানে রাখিস। আর ঠিক তিনদিন পরে অঙ্গদের গায়ের কাপড় খুলে ফেলে আমার কাছে নিয়ে আসিস। এখন যা। রাত তো অনেক হলো।'

'আচ্ছা দাদু। আমি তিনদিন পরে আসবো।'

৬

বারবারিকনের বন্দর থেকে জাহাজটা শকদের সমুদ্র সীমায় প্রবেশ করলো। জাহাজটা বেশ শক্তপোক্ত করে বানানো। অবশ্য যে রাস্তা পাড়ি দিতে হয় সেখানে নড়বড়ে কাঠামোর টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। পঞ্চাশ দাঁড়ের জাহাজটার পাটাতনের বেশির ভাগ জায়গাই মালামালে পূর্ণ।

বারবারিকনের বিখ্যাত বন্দর মিনাগারা থেকে জাহাজে অনেক চীনা মখমলের কাপড় তুলে নেওয়া হয়েছিল। এই কাপড়ের চাহিদা পশ্চিমে অনেক। দাম নেহাত কম নেয়নি। শুধু কেনা দাম নয় এর সাথে ব্যবসায়ীদেরকে আরো নানা খরচ যোগ করতে হয়। দামের সাথে যোগ হয় বন্দরে প্রবেশের ওপর আরোপ করা উচ্চ কর আর বন্দরের কর্মকর্তাদের বকশিশ। এক কথায় বলতে গেলে ঘুস। রাজার সামন্তের জন্য যেসব উপহার নিতে হয়, সেগুলোর খরচও ধরতে হয়। তবে সেই উপহার হিসেবে পশ্চিমের মদের চাহিদা বেশ উচ্চ। আর এই অঞ্চলে যে মদের কদর অনেক বেশি সে মদের দাম পশ্চিমে তেমন বেশি না।

ক্রেয়ন মাস্তুলের একেবারে আগায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাস এখন পুরোপুরি পড়ে গেছে। ফিরতি বাতাস পেতে হলে এখনো কম করে চল্লিশবার সূর্য ওঠার অপেক্ষা করতে হবে। এখনো অবশ্য কেনাকাটা শেষ হয়নি। অবশিষ্ট কেনাকাটার জন্য যেতে হবে শকদের বন্দর বারিগাজায়। সেদিকেই যাচ্ছেন এখন তিনি।

শকদের সীমানা দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারের উঁচু জায়গায় পাহারা মাচা বাঁধা হয়েছে। সেটা পার হয়েই জাহাজ মাত্র ঢুকেছে শক রাজ্যে।

তীরের থেকে এখনো বেশ দূরে আছে জাহাজ। তীরের পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের তোড়জোড় আছে। তাছাড়া এই অঞ্চলের সমুদ্রের বেশ দুর্নাম। তীরের কাছের পানিতে ডুবো পাথর আর জলঘূর্ণি আছে। ওগুলোর মাঝে পড়লে আর বাণিজ্য করতে হবে না। ক্রেয়ন খুব অভিজ্ঞ জাহাজ অধিপতি হলেও এদিকের সমুদ্র আর পথের হদিশ তার অজানা। তবে অন্যান্য জাহাজের নাবিকদের কাছ থেকে এদিকের সমুদ্রের বিপদ সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণাই পেয়েছেন। এবং সেই ধারণা বেশ ভয়ংকর। এই ডুবো পাথর আর ঘূর্ণি এখন পর্যন্ত অনেক জাহাজকে সমুদ্রদেবের কাছে পাঠিয়ে ছেড়েছে। আর সেগুলোর সামনে যদি তার এই ৩০ পেস দৈর্ঘ্যের আর ৮ পেস প্রস্থের জাহাজ একবার পড়ে তবে সেখানেই সলীল সমাধি। প্রধান নাবিককে জাহাজ স্থির রাখার হুকুম দিলেন তিনি। চোখ উপকূলের ওপর নিবদ্ধ। কিছু একটা খুঁজছেন একমনে।

খাঁড়ির পাহাড়ের আড়াল থেকে তখনই নৌকাটা বেরিয়ে এলো। নৌকাটা একেবারে ছোটো নয়। ৩ পেসের মতো হবে লম্বায়। খুব সরু। মাত্র চার জন কালো মানুষ আছে সেই নৌকায়। দেহের বিচারে তাদের খুব একটা দীর্ঘদেহী বলা যাবে না। তবে সেই ভারই নৌকাটা নিতে পারছে না। ডোবে ডোবে প্রায়। সবাই দাঁড় বাইছে। ছোটো নৌকা ঢেউয়ের পিঠে চেপে তরতর করে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

দেখতে দেখতে জাহাজের কাছে এসে পড়লো নৌকা। ঝুলিয়ে দেওয়া রশিতে নৌকা বেঁধে ফেললো নিমেষে। তারপরও তাদেরকে ক্রমাগত দাঁড়ের ব্যবহার করতে হচ্ছে নৌকা স্থির রাখার জন্য। একজন কালো লোক দাঁড় ফেলে উঠে দাঁড়ালো। হাত নেড়ে নদীর মুখ মানে প্রবেশ পথের দিকে ইশারা করছে সে। সাথে ক্রমাগত চিৎকার করে কী যেন বলছে।

ক্রেয়ন পড়লেন বিপদে। এইদিকের ভাষা তিনি কিছুই বোঝেন না। এদিকে আরো কয়েকবার আসলে ভাষা হয়তো একটু একটু বোঝা যাবে। তিনি হাতের ইশারায় কালো লোকটাকে একটু থামতে বললেন। তারপর জাহাজের যে নাবিককে সামনে পেলেন তাকেই বললেন, 'যাও তো, তাড়াতাড়ি রাহুকে ডেকে নিয়ে এসো। তাকে তো একবারও কাজের সময় পাওয়া যায় না। থাকে কোথায়?'

'ঘরে আছে মনে হয় হুজুর।'

'যাও, ডেকে আনো।'

রাহু নিজের ঘরেই আছে। জাহাজের থাকার ঘরগুলো যথেষ্ট ছোটো। শুধু কোনোমতে একটা বিছানা ফেলা হয়েছে সেই ঘরে। সেই কোনোমতে বিছানো বিছানার ওপর গুটি মেরে শুয়ে আছে সে। গা খালি। সবুজাভ মখমলি কাপড় ধুতির মতো করে পরা। ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো বস্ত্র না থাকলেও গলায় বেশ বড়ো আকারের একটা লাল মোতির মালা শোভা পাচ্ছে। এই জাহাজে খাবারের রেশন বাঁধা হলেও মদের ক্ষেত্রে সেসবের বালাই নেই। আর যখন মদ সামনে থাকে তখন রাহুর মনে খাবার নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। মদ গিলে গিলে এই ঘরে পড়ে থাকাই তার কাজ। এই জাহাজে তার কাজ বিশেষ কিন্তু বেশি নয়।

একমাত্র জাহাজ অধিপতির কামরা বাদে জাহাজের আর কোনো কামরার দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। নাবিক সরাসরি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো। গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগানো হলো রাহুকে, 'এই ওঠ। তোকে ক্যাপ্টেন ডাকছেন।'

রাহু মাতাল চোখে পিটপিট করে তাকালো। চোখে এই মৃদু আলোও সহ্য হচ্ছে না। তার এখন যে অবস্থা তাতে শুধু ক্যাপ্টেন কেন, যদি স্বয়ং যমরাজও তার সাক্ষাতে আসতেন, তাহলেও তার কিছু যেত আসতো না। উল্টো যম অথবা যমদূতকে নিয়ে আরও দুই পেয়ালা গিলতে বসতো সে।

নাবিক পুনরাবৃত্তি করলো, 'কি, কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন ডাকছে বললাম শুনতে পাওনি?'

এবার ধাক্কার পরিমাণ একটু বেশি। নেশার ঘোর তাতে একটু কাটলো। রাহু এবার বুঝতে পেরেছে ঘটনার গুরুত্ব। ক্যাপ্টেন ক্রেয়নের মেজাজ বেশ চড়া। সেই চড়া মেজাজ যদি তার ওপর চড়ে যায় তাহলে বিশাল সমস্যা। লাফিয়ে উঠতে গেল সে, কিন্তু নেশাগ্রস্থ শরীর সাড়া দিলো না। কোনোমতে টলমল পায়ে ডেকে গিয়ে উপস্থিত হলো সে। অন্ধের মতো এটা সেটার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। ক্রেয়ন ডেকের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। টলমল পায়ে ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়ালো রাহু। কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে, 'বলুন ক্যাপ্টেন। এই বান্দা সবসময় হাজির আপনার জন্য।'

ক্যাপ্টেনের চোখ সরু হয়ে এলো, 'তোমাকে না বলেছিলাম, মদ যা গেলার রাতে গিলে ঘুমাবে। সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গার পরে মদ ছোবে না। দিনের বেলা কাজের সময়। আর তখন জাহাজের কোনো লোকের মাতাল হওয়া আমি পছন্দ করি না।'

রাহুর চোখ এখনো পিটপিট করছে। ক্রেয়নের আর সহ্য হলো না। তিনি নাবিকদের দিকে তাকালেন, 'এই তোমরা তাড়াতাড়ি ওকে ঠিক করো। এক বালতি পানি তাড়াতাড়ি মাথায় ঢালো ওর।'

তবে রাহু বুঝতে পারলো না তার কোথায় ভুল হয়েছে। সে তার গালের কাটা জায়গাটায় হাত বোলালো। ক্যাপ্টেন যে আদেশ দিয়েছিলেন তা সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে। তিনি বলেছিলেন কেউ যেন দিনের বেলা মদ না খায়। সে তো তাই করেছে। দিনের বেলা মদ খায়নি। তবে কাল রাতে মদ গিলতে গিলতে একেবারে ভোররাত হয়ে গিয়েছিল। ভোরে ঘুমালে এত তাড়াতাড়ি জাগালে তো সমস্যা হবেই।

ঝপ।

পুরো এক বালতি নোনা জল এসে পড়লো রাহুর মাথায়। নোনাজলের বিশেষ কিছু গুণ আছে। সমুদ্রদেবের আশীর্বাদে রাহুর চোখ জ্বালা করে উঠলো। আর সেই সাথে মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো নোনা স্বাদে। এইবার আর নেশা টিকতে পারলো না। ওঝার তাড়িয়ে দেওয়া ভূতের মতো রাহুকে ছেড়ে চলে গেল। দূরে উপকূলে শকদের সীমানা দেখতে পেলো সে। সেই সাথে দেখতে পেলো জাহাজের নিচের নৌকাও। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো সে সাথে সাথে। নিচের নৌকার উদ্দেশ্যে চেঁচালো সে, 'এই কী হয়েছে তোদের? বল।'

নিচের নৌকার লোকজন বুঝতে পারলো তাদের উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলা হয়েছে। নিজেদের ভাষা শুনে নিচের কালো চারজনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, 'আমরা বারিগাজার পাহারাদার নৌকা। কোনো জাহাজ বারিগাজা যাবার জন্য এলে আমরা ছোটো নৌকা দিয়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাই। আপনারা তো বারিগাজাতেই যাবেন, তাই না?'

'তোদের কাছে রাজার অনুমতিপত্র আছে? না-কি বিনা অনুমতিতে চুরি করে এই নৌকা চালাচ্ছিস?'

'না, আছে তো। রাজার অনুমতিপত্র ছাড়া এইখানে কোনো কাজ হয় না।'

নিচের একজন লোক কোমরে গুঁজে রাখা তালপত্রের একটা টুকরা বের করে দেখালো। সেই তালপত্রে সরু লেখা এত ওপর থেকে পড়া যাবে না, তবে লাল রঙের শক রাজার রাজকীয় সিলমোহর দেখতে পেলো রাহু। এই মোহর সে স্পষ্ট চেনে।

ক্রেয়নের দিকে তাকালো সে, 'ক্যাপ্টেন, এদেরকে দিয়ে কাজ হবে। এই নৌকা শকরাজার অনুমোদিত। এরা আপনাকে ডুবো পাথর আর ঘূর্ণি এড়িয়ে বন্দরে পৌছে দিতে পারবে। আপনি এদেরকেই ভাড়া করুন।'

ক্রেয়নের চোখে সন্দেহ, 'তুমি তো একটু আগেও টলে পড়ে যাচ্ছিলে। ঠিকভাবে দেখতে পেয়েছ তো?'

বুক টান করে দাঁড়ালো রাহু, 'আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ক্যাপ্টেন। আপনি বললে এখন আমি পাঁচশো হাত সোজা হেঁটে যেতে পারবো।'

'না, তার আর দরকার হবে না। ওদেরকে নৌকা জাহাজের সামনে নিয়ে আসতে বলো। আমরা তৈরি হয়ে ইশারা করলে অরা যাতে নৌকা চালানো শুরু করে।'

কথামতো নির্দেশ দিলো রাহু। তারপর শেষ ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিলো সে, 'তোমাদের কত পয়সা দিতে হবে?'

'পয়সার হিসেব দামদর করার কিছু নাই। রাজামশায় নিজেই সে ঠিক করে দিয়েছেন। চার রুপার মুদ্রা। এক পয়সা কমও নয়, এক পয়সা বেশিও নয়। দুটো মুদ্রা পাবো আমরা আর বাকি দুটো যাবে রাজার ভাণ্ডারে।'

রাহু মনে মনে ভাবলো, শালার রাজা, এখান থেকেও পয়সা খাবে। মানুষ শুধু শুধু জঙ্গলের ডাকাতকে ভয় পায়, আসল ডাকাত তো এই সিংহাসনের ওপর বসে থাকা রাজারা। এই ডাকাতদের থেকে পালিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

বাতাস আর পালের আশা করে লাভ নেই, কাজ করবে না। দাঁড় দিয়েই এখন কাজ চালাতে হবে। সেই দাঁড় যথাসম্ভব আস্তে বাইবার নির্দেশ দিলেন ক্রেয়ন নাবিকদের উদ্দেশ্য করে। আর তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন জাহাজের একেবারে পেছনের দিকে। এখান থেকে জাহাজের সব নাবিকের ওপর নজর রাখতে পারবেন তিনি। তার দুপাশে যে দুই নাবিক হাল ধরেছে তাদেরকে নিয়মিত নির্দেশ দিয়ে যেতে হবে। একটু ভুল হলেও ডুবো পাথর তার কাজ সেরে ফেলতে পারে। সব প্রস্তুতি শেষে যাত্রা শুরু হলো। সামনে ছোটো নৌকা, পেছনে জাহাজ। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে।

নৌকার তিনজনের হাতে এখন দাঁড়। সামনের একজনের হাতে দাঁড় নেই। তার হাতে আছে লম্বা একটা লাঠি। সেটা দিয়েই সামনের পানিতে কী আছে তা বোঝার চেষ্টা করছে তারা। যদিও এই জল তার ভালোমতোই চেনা তবু দুটো কারণে কাজটা বেশ মনোযোগ দিয়ে করছে নৌকার নেতা। প্রথমে, অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। আর পরেরটা হচ্ছে, চারটা রৌপ্য মুদ্রা পারিশ্রমিক নেবার বিপরীতে একটু কাজ তো দেখাতে হবে।

ক্রেয়ন খুব সতর্ক হয়ে নজর রাখছেন নৌকার ওপর। নর্মদা নদীর মোহনায় ঢেউয়ের অত্যাচার ততটা নেই। নদীর স্রোতও বছরের এই সময়ে একটু কমে এসেছে। নদীতে ঢুকেই হাতের লাঠির কাজ বন্ধ করলো নৌকার নেতা। জাহাজের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, 'এখন আর কোনো বিপদ নেই। এখন আমরা নর্মদা নদীতে ঢুকে পড়েছি। এই নদী ধরে গেলেই বারিগাজা বন্দর।'

রাহু ক্রেয়নকে মাঝির বলা কথাগুলো বুঝিয়ে দিলো। কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ক্রেয়ন। এবার আর অতটা সতর্ক হবার দরকার নেই। যারা দাঁড় বাইছে তাদেরকে গতি বাড়াবার আদেশ দিলেন তিনি। জাহাজের গতি বেড়ে গেল। এরই মধ্যে সামনের নৌকার গতি বেড়ে গেছে। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে পানির বুক চিরে। নর্মদার মোহনা থেকে প্রায় এক যোজন দূরে বারিগাজা বন্দর। তার থেকে আরো দুই যোজন গেলে শকদের মিনাগারা। মিনাগারা একটু দূর হয়ে যায় এজন্য এক যোজন দূরের বারিগাজাকেই মূল বন্দর বানানো হয়েছে। আর মূল বন্দর হবার কারণে বারিগাজা নগরও এখন অনেক সমৃদ্ধ।

বারিগাজার কথা অনেক শুনেছেন ক্রেয়ন। এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য তার নতুন বন্দর দেখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যাবসা করা। তাদের অঞ্চলের অনেক ব্যবসায়ীই এখন এই কাজটা করছে। জাহাজ পাঠিয়ে মাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা উদ্দেশ্য তার অবশ্য আছে। সময় অনুকূলে থাকলে তৃতীয় উদ্দেশ্যটাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠতে পারে।

ক্রেয়ন যখন বন্দরের জাহাজ ভেড়ানোর জায়গায় জাহাজ নিয়ে এসে পৌছালেন ততক্ষণে দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেছে। বর্ম আর শস্ত্রে সজ্জিত সৈনিক দল পাহারা দিচ্ছে পুরো বন্দর। অবস্থা দেখেই ক্রেয়নের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারলো এই বন্দর বেশ কঠিন নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। বন্দরে ত্রিশটার মতো জাহাজ ভেড়ানো আছে। ভালো করেই খেয়াল করলেন ক্রেয়ন। জাহাজগুলোর মধ্যে গ্রীস, মিশর আর রোমান সব কায়দারই জাহাজ আছে।

এক সৈন্য এগিয়ে এসে তাদের জাহাজকে ভেড়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলো। নাবিকেরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। যে জায়গা তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ঠিক সেখানেই জাহাজ ভেড়াল তারা। ভিড়ানো হয়ে যেতেই দুপাশ দিয়ে দুটো মোটা রশি ফেলে দেওয়া হলো। ঘাটের পাটাতনের ওপর থাকা মোটা খুঁটিতে রশি দুটো বেঁধে ফেললো সৈনিকেরা।

এসব বন্দরে নগদ নারায়ণ নীতি বেশ চলে। জাহাজের কেউ নেমে পড়ার আগেই নগদের ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে হবে। সবার আগে এগিয়ে আসা সৈনিক এতক্ষণ ইশারায় কাজ সারছিল, এবার কথা বললো, 'কর কর্মকর্তা আসছেন। তিনি এবং প্রহরীদলের প্রধান আপনাদের জাহাজ এবং আপনাদেরকে তল্লাশি করবেন। আমাদের বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য ধার্য কর তাদের হাতে দিতে হবে। আমাদের বন্দরের থেকে বাজার বেশি দূরে না। পাশেই। সেখানে আপনারা ইচ্ছামতো ঘুরাঘুরি করতে পারবেন। কেনাকাটা করতে পারবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিনা অনুমতিতে আপনারা কেউ রাজভবন এবং নাগরিক আবাসের কাছে যেতে পারবেন না। জাহাজে সবসময় পাহারাদার রাখতে হবে। কখনোই জাহাজ পুরোপুরি খালি রাখা যাবে না। পরে কিছু হারালে বন্দরের রক্ষীদলের ওপর কোনো দায় থাকবে না।'

নিয়মগুলো আগেই ক্রেয়নকে জানিয়ে রেখেছিল রাহু। এখন সৈনিকের কথা অনুযায়ী আবার বুঝিয়ে দিলো।

বারিগাজা বন্দরের কর্মকর্তারা অনেক সক্রিয়। সরকারি চাকরি করে বলে অকারণ অলসতা দেখায় না। করকর্তা আর প্রহরীদলের প্রধান কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারপরের কাজ বেশ সময়সাপেক্ষ। জাহাজে যত মালামাল ছিল সবগুলোর তালিকা তৈরি করা হলো। একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলোও পরীক্ষা করা হলো। শুধু তাই নয়, যেসব জিনিস এই বন্দরে বেচাকেনা অথবা উপহার দেবার নিমিত্তে এনেছেন ক্রেয়ন, সেগুলোর আলাদা করে তালিকা করা হলো। শুধু বন্দরে বেচতে আনা জিনিসের ওপর কর ধার্য হবে। জাহাজ থেকে যেসব মাল নামানো হবে না সেসব মালের ওপর কোনো কর নেই। কাঁচের কিছু পাত্র আর বেশ কয়েক পাত্র মদ এই বন্দরে নামবে। জাহাজের আর মালামালের কর মিটিয়ে দিলেন ক্রেয়ন।

নিচে নামার আগে প্রহরীদলের নেতা শেষ নিয়মটা শুনিয়ে গেলেন রাহুর মাধ্যমে, 'আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র সব জাহাজেই রাখতে হবে। বন্দরে অথবা নগরে শস্ত্র ব্যবহার অথবা বহনের অনুমতি নেই। যদি আপনার দলের কোন লোক শস্ত্র বহন করতে গিয়ে ধরা পড়ে তবে কিন্তু কঠিন শাস্তি পেতে হবে।'

ক্রেয়ন হাসিমুখে সেই নিয়ম মেনে নিলেন, 'আপনাদের এই নিয়মে আমার কোন সমস্যা নেই। আশা করি বারিগাজাতে কোন বাইরের দস্যু প্রবেশ করতে পারবে না।'

'আমি আপনাকে পুরো নিশ্চয়তা দিচ্ছি। কোন দস্যুর আগমন এখানে হবে না।'

রাহুর মাধ্যমে কথা চলছে। এবার জানতে চাইলেন ক্রেয়ন, 'আপনাদের রাজা মহারাজ নাহাপনা কি এখন বারিগাজা বন্দরেই আছেন?'

'জি, উনি এই বন্দর নগরীতেই আছেন।'

'আমি ওনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। কিছু উপহার দেবার ছিল। মহারাজ কি আমার সাথে দেখা করবেন?'

'অবশ্যই দেখা করবেন। আপনাদের মতো বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করার জন্য বছরের এই সময়ে তিনি বারিগাজাতেই থাকেন। আমি মহারাজকে খবর পাঠাচ্ছি। উনিই বলে দেবেন কখন আপনার সাথে দেখা করবেন।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

প্রহরীদের নেতা চলে গেলেন। ক্রেয়ন ফিরে এলেন জাহাজে। নাবিকেরা এবার একটু অবসর পেয়েছে। এতদিন তারা সমুদ্রে ছিল। স্নান করেছে সমুদ্রের নোনা জলে। বাতাসে ছিল লবণ। তাদের শরীরে চামড়ার ওপর লবনের একটা আলগা স্তর পড়েছে। নাবিকেরা যে যা পাচ্ছে তাই নিয়েই নদীর জলে স্নান সেরে নিচ্ছে। নর্মদার নির্মল জলের খ্যাতি ভারত জোড়া। নিজেকে সামলাতে পারলেন না ক্রেয়ন। নিজেকে আপাদমস্তক ভিজিয়ে নিতে লাগলেন নর্মদার জলে।

তবে পৃথিবীর যেকোনো সুখ, তা যে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করা হোক না কেন খালি পেটে বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। সকালের শুকনো রুটি আর শিমের বিচির ঝোল তরকারী অনেক আগেই সবার পেট থেকে হজম হয়ে গেছে। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন ক্রেয়ন। বারিগাজা বন্দরে নিরাপদে পৌছানো উদযাপন করার জন্য আজ লবনের জারানো ছাগলের মাংসের ভোজের আয়োজন করলে মন্দ হয় না। তাহলে নাবিকরা বেশ খুশি হবে। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় নাবিকদের খুশি রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পোশাক বদলাতে বদলাতে ক্রেয়ন ঘোষণাটা দিলেন। আনন্দের হল্লা উঠলো নাবিকদের মাঝে। রাহুর যদিও ধর্মমতে মাংস খাওয়া বারণ, তবে ছাগলের মাংস ধর্মের নিয়মের কচকচানির চেয়ে অনেক সুস্বাদু। রাহুও যথেষ্ট খুশি হয়ে উঠলো এই ঘোষণায়। নিজের জন্মস্থান এবং ধর্ম সে অনেক আগেই ত্যাগ করেছে।

বেশ তোড়জোড় করে রান্নার আয়োজন হলো। বেশিক্ষণ লাগলো না। মাংস তৈরি আছে। শুধু ঝলসে নেওয়া। আর রুটি তো ভাণ্ডারে বানানোই আছে। খাওয়া হলো বেশ উৎসব উৎসব ভাব নিয়ে।

খাবারের পালা শেষ হতেই প্রহরী নেতা এলেন জাহাজে। জানালেন, মহারাজ নাহাপনা নবাগত জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন। রাহু আর দুজন অনুচর নিয়ে প্রহরী নেতার সাথে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা দিলেন ক্রেয়ন। নদীর ধার ধরে রাস্তা। অপূর্ব দৃশ্য চারপাশে। অনাঘ্রাতা প্রকৃতির চেয়ে মনোরম আর কিছুই হতে পারে না। নদীর অপর পার এখনো মানবের স্পর্শবিহীন।

রাজপ্রাসাদের শেষ কিছুটা পথ বাজারের ভেতর দিয়ে গেছে। বাজার বেশ জমজমাট। ক্রেতারা প্রায় সবাই ভিনদেশি। আর বিক্রেতারা দেশি। তাদের মধ্যে ইশারায় এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় কথা হচ্ছে। পণ্যসম্ভারের বিচিত্রতার দিকে বারবার নজর চলে যাচ্ছে ক্রেয়নের। সেই সাথে বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। এসব জিনিস যদি কোনমতে তার দেশে নিয়ে ফেলা যায় তাহলে বুলিয়ন দুহাতে কামানো যাবে। তবে পকেটের ক্ষমতা অপ্রতুল। যা ইচ্ছে হবে তাই কেনা যাবে না। আগে ভালো করে বাজার ঘুরে সব পণ্য সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। তারপর পকেট আর পণ্যের সর্বোত্তম বিন্যাস খুঁজে বের করতে হবে। এখন আগে মহারাজের সাথে দেখা করা যাক।

রাজপ্রাসাদ দেখে আবার চোখ কপালে উঠে গেল ক্রেয়নের। তার জন্মভূমি স্পার্টায় অনেক বড়ো বড়ো স্থাপনা আছে। তাদের কারিগররা নির্মাণে শৌর্য আর বিশালতা ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু এখানে নির্মাণে আসল প্রভাবক নকশা। প্রাসাদের বিশালতার চেয়েও নকশাগুলোর সৌন্দর্য বেশি আকৃষ্ট করছে তাকে। সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে ঘাসের সবুজ গালিচা। দুদিকেই জলাশয়। জলাশয়ে এই ভূখণ্ডের পরিচিত অনেক ফুলই ফুটে আছে। বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠছে ক্রেয়নের মন।

প্রাসাদের ভেতরটা আরো সুন্দর। নানা রকমের অপূর্ব মূর্তি পায়ে চলার পথের দুদিকে শোভা বর্ধন করছে। পথে গালিচা বিছানো। সেসব মূর্তি নিঃসন্দেহে অনেক জীবন্ত করে তুলেছে পরিবেশ।

রাজসভাও দেখার মতো। মাটি থেকে বেশ উঁচু আসনে সম্মানিত সভাসদেরা বসে আছেন। আর সবচেয়ে উঁচু আসনে রাতের আকাশের পূর্ণচন্দ্রের মতো বিরাজ করছেন শকরাজ নাহাপনা। মুখে তার কাঁচাপাকা দাঁড়ি। বামগালে দাঁড়ির সীমানার ওপরেই একটা কালো আঁচিল। মাথায় শোভা পাচ্ছে সোনালি মুকুট। রত্নখচিত মখমলি পোশাকে আভিজাত্য ফুটে বেরোচ্ছে।

ক্রেয়ন সভার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। কুর্নিশ করলেন এদিকের কায়দায়। এদিকের কায়দাটা রীতিমতো মনোযোগ খরচ করে শিখে আসতে হয়েছে তাকে। তার দেশের রাজ কুর্নিশ এখানকার রাজ কুর্নিশের চেয়ে আলাদা।

নাহাপনা মুখে হাসি ধরে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তার দেখাদেখি সভাসদেরাও উঠে দাঁড়ালেন।

এই মৌসুমে যে কথা অনেকবার বলা হয়েছে সেই কথাগুলো হাসিমুখে অক্লান্ত কণ্ঠে বলে গেলেন মহারাজ নাহাপনা, 'আপনাকে স্বাগত বণিক। আপনার সময় এই বারিগাজায় অবশ্যই অনেক ভালো কাটবে। আপনার যে-কোনো সমস্যায় আপনি

আমাদের সাহায্য পাবেন। সভাসদগণ, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার অথিতিকে সাথে করে একটু অথিতিশালায় যাবো। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসছি।'

অথিতিশালায় গিয়ে সেখানের সিংহাসনে বসলেন মহারাজ নাহাপনা। ক্রেয়ন এক অনুচরের কাছ থেকে মদের পাত্র নিয়ে মহারাজের সামনে রাখলেন, 'আপনার জন্য এই ক্ষুদ্র উপহার। আমাদের দেশে তৈরি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মদ এটা। আপনি যদি কৃপা করে গ্রহণ করেন তবে বড়োই কৃতজ্ঞ থাকবো। পুরো এক কায়াস আছে।'

গ্রীকদের হিসাবের একক বুঝতে পারলেন না মহারাজ নাহাপনা। রাহু নিজেও এই জিনিস ঠিকমতো অনুবাদ করে বোঝাতে পারলো না। রাহু এই জায়গায় বিপদে পড়ে। পশ্চিমের কাজ চালানোর ভাষাতে তার মোটামুটি দক্ষতা থাকলেও পরিমাপের এককগুলো তার এখনো ঠিকমতো আয়ত্তে আসেনি। এখনো কেমন জানি গুলিয়ে যায়। তবু উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কোনোমতে সামলে নিলো সে, 'মহারাজ এটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মদ। এখানে পুরো চার সের আছে।'

নাহাপনা নিজে দেশের ভাষা শুনে হাসলেন। রাহুর দিকে তাকালেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

রাহু মিথ্যে বললো, সত্যি বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'আমি আপনারই একজন ক্ষুদ্র প্রজা। তবে আমি বহুদিন এক জায়গায় থাকি না। ঘুরে বেড়ানোই আমার স্বভাব।'

'বুঝেছি, ঐ পানপাত্রটা নিয়ে এসো।'

রাহু কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। কোনো কথা না বলে পাত্রটা নিয়ে এলো সে।

'এবার এই পাত্রে মদ ঢালো।' আদেশ করলেন নাহাপনা।

এই আজ্ঞাও পালন করলো রাহু। তারপর নাহাপনা নিজ হাতে গ্লাস তুলে ধরলেন। কয়েকবার এদিক সেদিক করে গ্লাসটা দেখলেন। তারপর বাড়িয়ে দিলেন ক্রেয়নের দিকে, 'নিন, পান করুন।'

ক্রেয়ন অবাক হলেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'কিন্তু মহারাজ, এই মদ তো আপনার জন্য।'

নাহাপনার চোখ থেকে সৌহার্দ্য একটু কমলো, গলায় খেলে গেল একটু নিষ্ঠুরতা, 'আমি তো নেবোই, তবে আগে আপনি।'

রাহু ক্রেয়নকে ইশারা করলো। এখন পান করতে হবে, তর্ক নয়।

ক্রেয়ন পানপাত্র হাতে নিয়ে এক চুমুকে সাবাড় করে দিলো। পাত্রটা নামিয়ে রাখলেন সামনে।

নাহাপনার মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে, 'এবার এই মদ নিশ্চিন্তে খাওয়া যাবে। বলুন, আপনি আমার বন্দরে কী কিনতে এসেছেন?'

রাহু তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'আমি মূলত এই বন্দর থেকে রত্ন কিনতে এসেছি মহারাজ। নানারকম। আমার কিছু সবুজ রত্নপাথর দরকার। রত্ন ব্যবসায় আমার রীতিমতো আসক্তি আছে বলতে পারেন। আর আপনার রাজ্যের রত্নের তুলনা পুরো পৃথিবীতে নেই।'

'হ্যাঁ, তা কোনো সমস্যা নয়। আপনি সবুজ পাথর পেয়ে যাবেন। আপনাকে তো বাতাস আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'জি, মহারাজ।'

'আচ্ছা। তাহলে তো অনেক সময়। আপনার সাথে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগলো। আপনার এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। কেনাকাটার আগে আমাদের রাজ কোষাগার থেকে মুদ্রা বদল করে নেবেন।'

'জি মহারাজ। জানি, আপনার খুবই মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। তবে আমার আরেকটা প্রার্থনা ছিল মহারাজ।'

নাহাপনা ক্রেয়নের দিকে তাকালেন। চোখে জিজ্ঞাসা।

'মহারাজ, রত্নের ব্যাপারে আমি রীতিমতো নেশাগ্রস্থ। আমি আপনার কাছে থাকা সেই বিশেষ রত্নটা একবার দেখতে চাই। যে রত্ন পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আমি অনেক শুনেছি সেই রত্নের কথা। সেই রত্ন দেখাও আমার এই বন্দরে আসার অনেক বড়ো উদ্দেশ্য। যদি একবার সেই রত্ন চোখে দেখতে পেতাম তাহলে জীবন সার্থক হতো।'

নাহাপনা হাসলেন, 'ঠিক আছে। আসুন। তবে আপনি একা আসবেন। আপনার লোকজন এখানেই থাকবে।'

'জি মহারাজ।'

প্রাসাদের একেবারে গভীরে রত্নভাণ্ডারে ক্রেয়নকে নিয়ে আসলেন মহারাজ নাহাপনা। এখানে মহারাজের নিজস্ব সব রত্ন রাখা আছে। এগুলো বিক্রির জন্য নয়। একটা সিন্দুকের একটা বিশেষ তালা খুললেন তিনি। সেই সিন্দুকের ভেতরে রাখা আছে সে রত্ন। দ্যুতিতে চোখ ঝলসে গেল যেন ক্রেয়নের। আকারেও কম নয়। প্রস্থে ২ আঙ্গুল হবে।

এটা একটা অমূল্য পাঁচমুখী রক্তনীলা। বুলিয়নে এই রত্নের দাম দেওয়া যাবে না। এই রত্নের প্রয়োজন অলংকারে নয়, আরো বড়ো কোনো ব্যবহার আছে এই রত্নের।

পলকহীন চোখে সেই রত্নের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্রেয়ন।

৭

সারা শরীরে ওষুধ, তার ওপরে পট্টি নিয়ে অঙ্গদ ঘুমাচ্ছে। দেহের ওপর দিয়ে কম ঝড় যায়নি। এখন ওষুধ দেওয়াতে শরীরের ব্যথা কমে যাওয়াতে আরামে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অঙ্গদ। সুকুমার বৈদ্যের বাড়ি থেকে ঘুমন্ত অঙ্গদকে বয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছে অসিত।

সুকুমার বৈদ্য বারবার বলে দিয়েছেন অঙ্গদ যদি ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করে তাহলে তাকে যাতে বোতলের ওষুধটা খাওয়ায়। ওষুধের বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে অসিত। এক মুহূর্তের জন্য তার নজর অঙ্গদের ওপর থেকে সরছে না। রাজা না-কি ঈশ্বর সমতুল্য। কথাটা ঠিক। একদিক দিয়ে তারা দুজনেই সমান। রাজাও গরিবের ওপর অত্যাচার করেন, ঈশ্বরও করেন। সে হিসেবে রাজাও ছোটোখাটো ঈশ্বর।

রাতের শেষ প্রহরে আর জেগে থাকতে পারলো না অসিত। তার ঝিমুনি চলে এসেছে। অঙ্গদের পাশে বসে ঢুলতে লাগলো সে। আস্তে আস্তে ঘুমের কবলে চলে যেতে লাগলো তার চোখ। সূর্যদেব আর কিছুক্ষণ পরেই উঠে পড়বেন। ঠিক তখনই অঙ্গদের চেতনা ফিরে এলো। অসিত ততক্ষণে ঢুলতে ঢুলতে বসা থেকে শুয়ে পড়েছে।

সারা শরীরে পট্টি বেঁধে দেওয়ায় অঙ্গদ নড়তে পারছে না। সে চি চি আওয়াজ করে উঠলো। মৃদু স্বরে নিজের ভাষায় অসিতকে ডাকছে সে। কিছুক্ষণ ডাকতেই অসিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঘুম ভাঙ্গতে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না অসিত। পরে তার গতরাতের ঘটনার কথা মনে পড়লো। ঘুম চোখে অঙ্গদের চি চি আওয়াজকে সে অঙ্গদের যন্ত্রণার আর্তনাদ হিসেবে ধরে নিলো। তাড়াতাড়ি ওষুধের বোতলটা খুলে সে কিছুটা ঢেলে দিলো অঙ্গদের মুখে। অঙ্গদ সহজেই গিলে নিলো ওষুধটা।

এবার অপেক্ষা করার পালা। এই ওষুধটা বেশ কাজের। তবে এবার আর ওষুধ আগের বারের মতো দ্রুত কাজ করলো না। অঙ্গদ চি চি আওয়াজ করেই যাচ্ছে। হাতে থাকা একমাত্র সমাধান কাজ না করাতে বেশ ভয় পেয়ে গেল অসিত। এখন কী করবে? এই অঞ্চলে সুকুমার বৈদ্যের চেয়ে উত্তম আর অধম কোনো রকমেরই চিকিৎসক নেই। তার ওষুধ অব্যর্থ। অঙ্গদের অবস্থা নিশ্চয়ই আরো খারাপ হয়েছে। তাই এই ওষুধ আর কাজ করছে না।

এত চিন্তার মধ্যেও পেটে খিধের তাড়া অনুভব করলো অসিত। কালকে দুপুরে উমা পিসির কাছ থেকে পিঠে খেয়ে আসার পরে পেটে আর কিছু পড়েনি। রাতে অধিকারীর বাড়িতে ভালো ভোজের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঝামেলায় সেই ভোজ খাবার ভাগ্য তার হয়নি।

নিজের পেটে খিধের তাড়না বেড়ে যেতে আরেকটা চিন্তা তার মাথায় উঁকি দিলো। অঙ্গদ খিধের জ্বালায় এমন করছে না তো? হতে পারে, ব্যথা নয়, খুব বেশি খিধে পেয়েছে বলে অঙ্গদ এমন করছে। ভালো করে অঙ্গদের দিকে খেয়াল করলো এবার সে। অঙ্গদের মুখের ভাষা এখন সে বুঝতে পারছে। অঙ্গদ এখনো ছটফট

করছে। তবে ব্যথায় নয়, এটা ক্ষিধের ছটফটানি। ঘরে খাবার বলতে কিছুই নেই। খাবার জোগাড় করতে হবে।

অধিকারীর বাড়ির কথা মনে পড়লো অসিতের। তার খেলা দেখানোর সমস্ত জিনিস ঐ বাড়িতে রয়ে গেছে। খেলা দেখানোর পারিশ্রমিকও আনা হয়নি অধিকারী মশাইয়ের কাছ থেকে। সেসবের সাথে কিছু খাবারও চেয়ে আনতে হবে। কাল রাতের ভোজের সব খাবার নিশ্চয়ই গ্রামবাসী খেয়ে শেষ করতে পারেনি। অধিকারী খাবার নিতে না করবেন বলে মনে হয় না। কাল তার সম্মান সে রক্ষা করেছে। নিজের ভাইয়ের মতো সাথির যন্ত্রণার বিনিময়ে।

অঙ্গদকে কয়েকটা ইশারা করলো অসিত। অঙ্গদের গলার চি চি আওয়াজ একটু কমে এলো। তারপর অধিকারীর বাড়ির দিকে রওনা দিলো সে। আলো ভালোভাবেই ফুটে গেছে ততক্ষণে। অধিকারীর বাড়িতে এত সকালে যাওয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না অসিত। তবে তার আর কোনো উপায় নেই। কিছু বাদাম সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়। বানররা বাদাম খুব পছন্দ করে, অঙ্গদও ব্যতিক্রম নয়।

অধিকারীর বাড়িতে উৎসব শেষের বিষণ্নতার ছাপ। রাতে ভোজ শেষ হয়ে সব গোছাতে গোছাতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবু অধিকারীর প্রত্যহ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি সূর্যদেবের আগেই উঠে পড়েছেন। এর মধ্যেই কৃপা নদী থেকে স্নান করে এসেছেন। তারপর সূর্য নমস্কার শেষ করে এখন প্রাতঃপূজায় বসেছেন। গৃহদেবতার সেবা প্রতিদিন দিতে হবে। কোন অযত্ন চলবে না।

তখনই অসিত বাড়িতে ঢুকেছে। অধিকারীর গোয়ালা গাভী পরিচর্যায় ব্যস্ত। গোবর আর চনা পরিষ্কার করা হলেই দুধ দোয়ানোর কাজে হাত দেবে। অসিতকে সেই প্রথম দেখলো। বিরক্ত হলো সে, অসিতকে দেখে এই গ্রামে আহ্লাদিত হবার মানুষ খুব কমই আছে, 'তোর এত সকালে আবার এখানে কী?'

'আমি আমার জিনিস নিতে আসছি। আর অধিকারী মশাইয়ের সাথে আমার একটু কাজ আছে।'

'এখন অধিকারী মশাইয়ের সাথে দেখা হবে না। তিনি পূজা দিচ্ছেন। তোর জিনিসপত্র যেখানে রেখে দৌড় দিয়েছিলি সবকিছু সেখানেই পড়ে আছে। যা, তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বিদায় হ।'

কাল রাতের খেলা দেখানোর জায়গায় গিয়ে জিনিসগুলো একত্র করলো অসিত। লোহার বলয়গুলো আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে তবে একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়নি। খেলা দেখানো যাবে। তবে লাঠি আর বাঁশগুলো আর ব্যবহার করা যাবে না। একেবারে পুড়ে গেছে। কিছু কিছু জায়গায় ছুতেই ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার উঠানের এক কোণায় বসে পড়লো সে। এবার গোয়ালা এগিয়ে এলো তার দিকে,

'কিরে, তোরে না বললাম, জিনিস নিয়ে বিদায় হতে, এখন আবার এখানে এসে বসেছিস কেন? যা, ভাগ।'

অসিত কিছুই বললো না। মুখ কঠিন করে তার জায়গায়ই বসে রইলো।

অধিকারী মশাইয়ের পূজা শেষ হয়েছে। ঠাকুরঘরের বাইরে বেরোতেই তিনি দেখতে পেলেন উঠানের কোণায় বসে থাকা অসিতকে। কাল রাতের বিভীষিকাময়

ঘটনা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ভোজের উৎসবে আর ব্যস্ততায়। অসিতকে দেখে তার সেই ঘটনার কথা আবার মনে পড়লো। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি,

'আরে অসিত, কই ছিলি তুই? কাল রাতে তো আর এলি না। আমারও হাজার ঝামেলায় তোর কথা মনে ছিল না।'

সবার সাথে রাগ দেখানো যায় না। অধিকারী মশাইয়ের গোয়ালা আর অধিকারী মশাইয়ের সাথে এক ব্যবহার করা যায় না। অসিত উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলো,

'কর্তা, কাল রাতে অঙ্গদের শরীর পুড়ে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে আমি সুকুমার দাদুর কাছে গিয়েছিলাম। সুকুমার দাদু ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন, পট্টিও বেঁধে দিয়েছেন। এখন অঙ্গদ একটু ভালো আছে।'

'তুই তো কাল রাতে খেয়ে যাসনি। দাঁড়া দেখি, কাল রাতে অনেক কিছু বেঁচে গেছে। দেখি তোর কপালে কী আছে। এই কে আছিস, ওকে কিছু খাবার বেঁধে দে।'

'কর্তা' ইতস্তত করতে লাগলো অসিত।

'কিরে, কিছু বলবি নাকি? বলে ফেল।'

'অঙ্গদের সারা শরীর পুড়ে গেছে। সুকুমার দাদুর ওষুধে এখন ভালো আছে, ব্যথা নাই। তবে ব্যথা না থাকলেও ক্ষিধা লাগছে। আমার ঘরে খাবার কিছু নেই। শরীর সারতে এখন অঙ্গদের ভালো ভালো খাবার দরকার। ওর জন্য কিছু খাবার দিয়ে দেবেন কর্তা।'

'আচ্ছা, সে দেওয়া যাবে। তোর বানর খায় কী?'

'ফল খায় বেশ ভালো। বাদাম আর কলা। বাদাম খেলে শরীর সারবে। সুকুমার দাদু বলে দিয়েছেন।'

অধিকারী মশাই সবকিছুর ব্যবস্থা করলেন। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার, কলা, বাদাম, পারিশ্রমিক হিসেবে দুটো তামার পয়সা আর নিজের জিনিসপত্র মাথায়, ঘাড়ে আর হাতে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলো অসিত। জিনিসের ভারে একটু দেরি হয়ে গেল তার। অধিকারীর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ অনুভব করছে সে। তার মনে হচ্ছে পারিশ্রমিক নয়, বরং দাক্ষিণ্য উপহার দিয়েছেন তিনি। খেলা তো অনেকেই দেখে কিন্তু এত কিছু তো কেউই দেয় না। অনেকে তো খেলা দেখে কিছুই দেয় না, মাগনা খেলা দেখে।

সে এসে দেখে অঙ্গদ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে সেই ঘুম গাঢ় হয়নি। অসিতের সাড়া পেয়ে জেগে উঠলো সে। অসিতের হাতে কলা দেখে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলো। আগ্রহের আতিশায্যে উঠতে চেষ্টা করলো সে নিজের শরীরের অবস্থার কথা ভুলে। কিন্তু অসিত তাড়াতাড়ি ওকে উঠতে মানা করলো। নিজে তাড়াতাড়ি একটা কলা ছিলে ধরলো অঙ্গদের মুখের সামনে। গপগপ করে সাবাড় করলো অঙ্গদ। কলার মান যথেষ্ট উৎকৃষ্ট। অঙ্গদের চোখের স্বাভাবিক দুষ্টুমি আর ঠোঁটের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ফিরে এসেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো অসিত। সব আবার আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। অঙ্গদের শরীর সেরে যাচ্ছে। কিন্তু তাড়াহুড়া করে কিছুই করা যাবে না। সুকুমার দাদুর কথামতো তিনদিন পট্টি শরীরে রাখতে হবে। ওনার কথার বাইরে কিছুই করা যাবে না।

এরপরের তিনদিন অসিতের ভালোই কাটলো। এখন আর অঙ্গদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা নেই। সে ধরেই নিয়েছে, তিনদিন পর পট্টি খুললে অঙ্গদ আবার আগের মতো হয়ে যাবে। খাবারের চিন্তা নেই। অধিকারী মশাই অনেক খাবার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে পচনশীল খাবারগুলো আগে খেয়েছে। তারপরে খেয়েছে শুকনো খাবারগুলো। দিন তিনটে বেশ আরামেই কেটেছে তার।

তিনদিন পার হতেই চার দিনের দিন সকালবেলা অঙ্গদকে কোলে তুলে নিয়ে সুকুমার বৈদ্যের বাড়িতে উপস্থিত হলো অসিত। সুকুমার বৈদ্য সকালের খাওয়াদাওয়া শেষ করে উঠানের রোদে বসে আরাম করছিলেন। সাড়া গায়ে পট্টি বাঁধা অঙ্গদকে দেখে তার তিনদিন আগে চিকিৎসা করা রোগীর কথা মনে পড়লো,

'কিরে, তোকে কয়দিন রাখতে বলেছিলাম পট্টি?'

'তিনদিন বলেছিলেন দাদু। কালকেই তিনদিন শেষ হয়েছে। পট্টি খোলার জন্যই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

'কোনো সমস্যা হয়েছিল? অঙ্গদ কি আর চিৎকার করেছে?'

'না দাদু।'

'বেশ, তার মানে ওষুধ ভালোই কাজ করেছে। করবে না কেন? এই হচ্ছে সুকুমার বৈদ্যের চিকিৎসা। এখন আর বয়সের কারণে পারি না। আগে কত মরা মানুষ দাঁড় করিয়েছি। তবে বানরের চিকিৎসা আগে কখনো করিনি। এবার কপালে তাও হলো। দে, এখন তাহলে আমার ওষুধের বোতল ফেরত দে। সেটা তো আর ব্যবহার করতে হয়নি।'

বোতলটা অসিত নিয়েই এসেছিল। একবার বলতেই বের করে ফেরত দিলো।

সুকুমার বৈদ্য অঙ্গদের পট্টি খুলতে শুরু করলেন। অঙ্গদের ব্যথা একেবারেই কমে গেছে। সে কোনো প্রতিবাদ করছে না। তবে পট্টিটা হাতের ওপর থেকে একটু খুলতেই সুকুমার বৈদ্য বৃদ্ধ চোখে কি যেন ঝাপসা দেখতে পেলেন। আস্তে আস্তে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। চোখে কি ভুল দেখছেন নাকি।

অঙ্গদের কাপড় সরানো অনাবৃত হাত দেখে অসিতের চোখ ছানাবড়া। ধূসর বাদামী রোমের চামড়া এখন আর আগের অবস্থায় নেই।

অঙ্গদ কিছুই বুঝতে পারছে না। অসিত সুকুমার বৈদ্যের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো উঁচু গলায় বললো, 'কী হলো এটা সুকুমার দাদু! এখন কী হবে!'

সুকুমার বৈদ্য উত্তর দেবেন কি, তিনিও অসিতের মতো ছানাবড়া চোখে অঙ্গদের হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার অস্পষ্ট হয়ে আসা স্মৃতি থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠগুলো মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু অনেক খুঁজেও চিকিৎসাবিদ্যার কোনো শাখাতেই পাবক লতার এমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা পেয়েছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটা জানার কৌতূহল থেকে এবার তাড়াতাড়ি হাত চালালেন তিনি। দেখতে দেখতে অঙ্গদের শরীরের পুরো পট্টি খোলা হয়ে গেল। পট্টি স্বরে যেতে তিনি চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তার অজ্ঞান হবার দশা। এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখেননি তিনি। ওষুধের এমন ব্যবহার কে শুনেছে কোন কালে। অশ্বিনী প্রণাম মন্ত্রটা অনেকবার মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু

উত্তেজনার মাত্রা তাকে এতটাই হতবুদ্ধি করে দিলো যে গত ষাট বছর ধরে নিয়মিত জপ করতে থাকা মন্ত্রটা ভুলে গেলেন।

সুকুমারের বৌমা শ্বশুরের জন্য প্রতিদিনের নিয়মমতো এক বাটি দুধ নিয়ে আসছিল। চোখের সামনে অঙ্গদকে দেখে তাকে রীতিমতো বিষম খেতে হলো। দেহে বয়ে গেল ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্প। তার হাত থেকে দুধের বাটি পড়ে গেল। একটা আধা চিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে, 'এটা কী রে বাবা?'

কোনোমতে পড়তে পড়তে সুকুমার বৈদ্যের বৌমা সামলে নিলেন। অসিতের হয়েছে দোটানা অবস্থা। অঙ্গদ ভালো হয়েছে এবং লাফালাফি করছে এটা বেশ ভালো কথা, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছে তা তাকে কিছুতেই আনন্দিত হতে দিচ্ছে না। অনুভূতিটা আনন্দ অথবা কষ্টের না, হতবুদ্ধিকর।

'দাদু, এমন হলো কেন?'

সুকুমার বৈদ্য কিছুই বলতে পারলেন না। অঙ্গদের গায়ে হাত বুলালেন। না, চামড়া স্বাভাবিক, কোন ধরনের অসুস্থতা কিংবা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ নেই।

'বুঝতে পারছি না রে। পাবক লতার রসের এমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা তো আয়ুর্বেদে কখনো পড়িনি। বোধহয় মানুষের শরীরে পাবক লতা যেভাবে কাজ করে বানরের শরীরে ওভাবে কাজ করে না। কিন্তু চামড়া তো ঠিকই ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু তার সাথে এটা কী হলো? আচ্ছা, রাতে ভুল করে পাবক লতার সাথে অন্য লতা নিয়ে আসিসনি তো? হতে পারে অন্য কোনো লতার রস মিশে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

অন্য কোন লতার রস মিশেছে কি না সেটা অসিতের জানার কথা না। অঙ্গদ এতক্ষণ নিজের শরীরের দিকে তাকায়নি। সুস্থতা উপভোগ করছিল। এবার নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল সে। এক লাফে এসে উঠলো অসিতের কোলে।

অঙ্গদের শরীরের বাদামি ধূসর রং পুরোপুরি বদলে গেছে। যেন তার পুরো দেহ হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত রংধনু। কোথাও সবুজ, কোথাও হলুদ, কোথাও নীল, কোথাও আবার বেগুনি।

এমন হরেক রঙের মিশেলে রঙ্গিন বানর কেউ কারো জন্মেও দেখেনি। সুকুমার বৈদ্য তার পুঁথি খুলে বসেছেন ততক্ষণে। কিন্তু কোথাও এমন কোনো পরিণতির কথা খুঁজে পেলেন না। তিনি নিশ্চিত হলেন, রাতের বেলা পাবক লতার সাতে অন্য কোনো লতা চলে এসেছে। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক লতাপাতার একটা না একটা গুণ অবশ্যই আছে। মানুষ এখনো খুব কম উদ্ভিদেরই সঠিক ব্যবহার জানে। কোনো এক অচেনা লতার অচেনা গুণে অঙ্গদের এই দশা হয়েছে।

অসিত এবার অঙ্গদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার হতবুদ্ধি ভাব কেটে গেছে। অঙ্গদ বুঝতে পারলো তেমন কিছু হয়নি। সে এক লাফে উঠে গেল ঘরের চালে। অসিত বিদায় নিলো, 'দাদু, আমি তাহলে এখন যাই। অঙ্গদ ভালো হয়ে গেছে এটাই যথেষ্ট। আচ্ছা, রং আবার আগের অবস্থায় আনার কোনো ওষুধ আছে?'

সুকুমার নিরুপায় চোখে তাকালেন, যে রোগের কথাই এই প্রথম শুনলেন, তার ওষুধ আসবে কোত্থেকে? তিনি কোনো জবাব দিলেন না।

অসিত মেনে নিলো, 'থাক, ঠিক না হলে নাই। যা হবার ছিল তাই হয়েছে।'

অঙ্গদকে ইশারা করতেই সে চাল থেকে লাফিয়ে অসিতের ঘাড়ে উঠলো। একবার উমা পিসির বাড়ি যেতে হবে। এমন একটা খবর তাকে না দিলে চলবে না। অঙ্গদের এই রূপ সবাইকে দেখাতে হবে। আর সেজন্যই তার প্রথম পিসির কথাই মনে পড়লো।

হঠাৎ খেয়াল করলো অসিত, অঙ্গদের এই পরিবর্তনে সে আসলে মনে মনে খুশি। বৈচিত্র্য নেহাত মন্দ হয়নি। অঙ্গদ নিজেও প্রথমে ভয় পেয়েছিল। পরে অসিতের স্বাভাবিক ইশারা দেখে সে বুঝেছিল ভয় পাওয়ার মতো কিছুই হয়নি। এখন সেও উপভোগ করছে তার বদলে যাওয়া। নিজের শরীরের দিকে তাকাচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর তাকাচ্ছে আর সেই সাথে আনন্দধ্বনি বের হচ্ছে তার গলা দিয়ে।

অসিতের কাঁধে অঙ্গদকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলেন উমা পিসি। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন, 'কিরে, অঙ্গদকে এমন সং সাজিয়েছিস কেন? এখন কি ওকে দিয়ে এভাবেই খেলা দেখাবি?'

অসিত হাসছে, 'কী আর বলবো পিসি। তুমি তো কিছুই জানো না। অঙ্গদ অধিকারী মশাইয়ের বাড়িতে খেলা দেখাতে গিয়ে আগুনে পড়ে গিয়েছিল।'

'তাই না-কি।' পিসির চোখে চিন্তা, 'কি একটা ঘটনা ঘটেছিল শুনেছিলাম রাঁধার থেকে। কিন্তু তুই তো আমাকে একবারও খবর দিলি না। কি ভয়ংকর ঘটনা।'

'আরে শোনো না। আগুনে পড়ার পর ওকে নিয়ে আসি সুকুমার দাদুর কাছে। তিনি ওষুধ লাগিয়ে পট্টি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তিনদিন পড়ে পট্টি খুলতে। আজ তিনদিন পর পট্টি খোলা হয়েছে। এই তিনদিন অঙ্গদকে নিয়ে ঘরেই ছিলাম। অঙ্গদের পোড়া চামড়া ভালো হয়েছে কিন্তু এখন সে হয়ে গেছে রঙ্গিন বানর। তার চামড়ার রং পুরোপুরি বদলে গেছে।'

উমা পিসি পবনকে ডাকলেন। পবন এতক্ষণ ঘরের পেছনে খেলছিল। মায়ের ডাকে সামনে এসে সে দেখতে পেলো অঙ্গদকে। সেই সবচেয়ে বেশি আমোদ পেলো। কোনোমতেই তার হাসি আর থামতে চায় না।

উমা পিসিও ছেলের আনন্দে আনন্দিত, 'থাক, আর লাফাস না। অনেক হয়েছে। তুই যা, তাড়াতাড়ি রাঁধা দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি আমি ডাকছি। মেয়েটা এই অঙ্গদকে দেখলে অনেক খুশি হবে।'

অসিত অনুযোগ করলো, 'রাঁধাকে আবার কেন ডাকতে বললে? ও আবার এখানে এসে কী করবে?'

'শুনলি না, ওকে ডেকেছি অঙ্গদকে দেখতে।'

পবন ততক্ষণে মায়ের আদেশ পালন করতে বেরিয়ে গেছে। অসিত একটু বিরক্ত, 'রাঁধাকে আবার কেন ডাকতে পাঠালে? পরে নিশ্চয়ই জানতে পারতো। দেখার যদি শখ হতো তাহলে তো আমার বাড়ি গিয়েই দেখতে পারতো।'

উমা পিসি মুখ টিপে হাসলেন, 'কি যে কথার ছিরি তোর। তোর তো মাথা খারাপ হয়েছে। রাঁধা তোর বাড়ি কীভাবে যাবে?'

'কেন? যেতে পারবে না কেন? ও কি আমার বাড়ি চেনে না?'

'বাড়ি চেনে। কিন্তু ওর বয়সি একটা মেয়ে তো আর এমনি এমনি তোর ঘরে যেতে পারবে না। তোর ঘরে যদি রাঁধাকে যেতেই হয় তবে একটা যজ্ঞ করতে হবে।'

অসিত তির্যক দৃষ্টি হানলো, 'যজ্ঞ করতে হবে। কি যজ্ঞ! রাঁধাকে কি পূজা দিয়ে ঘরে নিতে হবে না-কি?'

'ঠিক বলেছিস। ওকে যদি তুই ঘরে নিতে চাস তাহলে তোকে পূজা করতে হবে, সাথে করতে হবে যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ রাজসূয় আর অশ্বমেধের চেয়েও বড়ো যজ্ঞ। পূজা না করে কি দেবীকে কারো ঘরে নেওয়া যায় না-কি রে।'

'কি যে বলো তুমি পিসি তার মাথামুণ্ডু নেই। ঐ রাঁধা আবার দেবী হলো কবে? ওকে আবার পূজা করতে হবে।'

পিসি এবার হেয়ালি ছাড়লেন, 'হ্যাঁ, সে দেবী। এবং তোকে সেই দেবীকে ঘরে নিতে হলে পূজা দিয়েই নিতে হবে। সেই মহাপূজা আর মহাযজ্ঞের নাম বিবাহ।'

অসিত এবার বুঝতে পারলো। রাগ আর লজ্জায় মিশে তার চেহারা হলো দেখার মতো। সে অন্যদিকে তাকালো।

তখনই বাড়িতে ঢুকলো রাঁধা, 'পিসি, পবন বলছিল, কি জানি হয়েছে, এখনি দেখতে ডেকেছ আমাকে' তখনই তার নজর পড়লো অঙ্গদের ওপর।

হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়লো রাঁধা। পবনও দ্বিতীয়বারের মতো হাসিতে যোগ দিলো। পিসিও হাসতেন কিন্তু ততক্ষণে শ্বশুর আদিনাথ চলে এসেছেন দেখে আচলে মুখ চাপা দিলেন। অঙ্গদও ভালো আমোদ পেয়েছে। সে রাঁধা আর পবনকে ঘিরে লাফাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পর পিসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো রাঁধা, অসিত আর অঙ্গদ। অঙ্গদ এখন রাঁধার কাছে, 'তোর বানর তো এখন অনেক সুন্দর হয়েছে। এবার ওকে নিয়ে আবার হাটে বাজারে যাওয়া শুরু কর। মানুষ আবার তোদের খেলা দেখবে, তুই পয়সা পাবি, পুরস্কার পাবি।'

এই চিন্তা এতক্ষণ অসিতের মাথায় আসেনি। ঠিকই তো, এই রঙ্গিন বানরের খেলা তো সবাই আগ্রহ ভরে দেখবে।

রাঁধা ওদিকে বলে চলেছে, 'তুই অঙ্গদকে নিয়ে আবার খেলা দেখাবি। অনেক মুদ্রা পাবি। গ্রামে শস্যভূমি কিনবি। দুটো বড়ো দেখে কালো গাভী কিনবি। তাহলে তোর আঙিনা ঘর হয়ে উঠবে। সুলক্ষণ যুক্ত ঘর।'

'তখন কি তুই আমার ঘরে যাবি?' অসিত কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে।

রাঁধা পূর্ণদৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকালো, 'হ্যাঁ, যাবো। আমার মাও তখন আর বারণ করবে না। দুটো কালো গাভী হলেই মা খুশি।'

রাঁধাকে বাড়ি রেখে নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হলো অসিত। বিছানায় এলিয়ে দিলো শরীর। তার চোখে কেবল একটাই দৃশ্য। হিরন্ময় আলোতে কাঠের সংগীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মনোজগতের রাজসূয় যজ্ঞ।

৮

সোপারা বেশ বড়ো বন্দর। একদিকে বৈতরণী নদী, অন্যদিকে ভাসাই প্রণালী। দুটোই এই বন্দরের দুপাশ দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। বন্দরের পাশের শহর বেশ মনোরম। সেনাদের আবাসস্থল, বণিকদের জন্য তৈরি বিশ্রামাগার, রাজভবন, রাস্তা, দোকানপাট সব ঝকঝক করছে। বাজারে বিদেশি বণিকদের জন্য পসরা সাজিয়ে বসেছে দেশি বণিকেরা। বেচাকেনা হচ্ছে তবে তা এই বন্দরের সজ্জার তুলনায় খুবই কম।

যারা একটু আগেই শকদের বন্দর বারিগাজা থেকে ঘুরে এসেছেন তাদের সোপারা বন্দর দেখে একটু আশাহতই হবার কথা। এই বন্দরের আসল শোভাই আসলে অনুপস্থিত। যে-কোনো বন্দরের আসল শোভা হচ্ছে স্বর্ণমুদ্রার ভারী থলে নিয়ে ঘুরতে থাকা বণিকেরা। তারা নানারকম জিনিস কিনবে আর সেই সাথে দেশের রাজা এবং প্রজা দুইয়েরই লাভ হবে। এতো বড়ো জাহাজ ঘাটে মাত্র দুটো জাহাজ দেখা যাচ্ছে। এখন ভরা মৌসুম। অথচ প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা জাহাজ নোঙ্গর আর খালাসের জায়গা আছে এই বন্দরে। পথপ্রদর্শক নৌকার মালিকেরাও নৌকাগুলো নিয়ে বসে আছে অলসভাবে।

মহারাজ সাতকর্ণী গতকাল সোপারায় এসেছেন। এখন রাজভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সামনে লক্ষ্য করছেন তার সবচেয়ে বড়ো বন্দরের দুর্দশা। নেহাত শক্ত মানুষ আর নিয়মিত শৌর্যের অনুশীলন করেন বলে তার মুখে অবিচল ভাব। চোখের সামনে দেখছেন তার স্বপ্নের সমাধি। তার অভিজ্ঞতা থেকে জানেন একবার কোনো জায়গা পরিত্যক্ত হয়ে গেলে তাকে জাগিয়ে তোলা বেশ কঠিন। প্রতিষ্ঠানায় থাকতেই খবরটা পেয়েছিলেন তিনি। এবার তার প্রধান বন্দর সোপারা, কল্যাণ আর চোলে ব্যাবসার অবস্থা খুবই খারাপ। রকমসকম শুনে আর স্থির থাকতে পারেননি তিনি। কারো ওপরে ভরসা করা যায় না এমন সময়ে। নিজেই চলে এসেছেন বন্দরে। এখন নিজ চোখে নিজের দুঃখ দেখছেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শেষ। বেশি নীতিকথা শোনানো মন্ত্রী বলদেবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অমরাবতীতে। সেখানে পৌছে সবকিছু বুঝে নিয়ে খবর পাঠাবেন মন্ত্রী মহাশয়। তবে অমরাবতীর খবরের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন মহারাজ সাতকর্ণী। অমরাবতী তার পূর্বতন রাজধানী। আর পুরানোকে আঁকড়ে ধরে রাখার সময় এটা নয়।

বলদেবের প্রস্থানের পর প্রতিষ্ঠানার রাজসভায় কোনো মহামন্ত্রীর নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তবে অনুচর সাথে রাখার অভ্যাস রাজাদের বেশ পুরানো। সাতকর্ণীর সাথেও একজন অনুচর আছে। তাকে প্রতিষ্ঠানা থেকেই নিয়ে এসেছেন তিনি।

চোখের ইশারায় ছাদে প্রহরারত এক সৈনিককে ডাকলেন, 'অথিতিশালায় এক ব্রাহ্মণ আছেন। নাম গিরিধারী। তাকে গিয়ে বলবে আমি ডাকছি। একেবারে সাথে করে এখানে নিয়ে আসবে।'

গিরিধারীর পরিচয় একটু দিয়ে নেওয়া যাক। জন্ম সূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও গিরিধারী বেদে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ নন। সুপণ্ডিত হবার জন্য বেদের অধ্যয়নে সময়ও ব্যয় করেন না তিনি। যাগ-যজ্ঞ-বেদের জ্ঞান ও অনুষ্ঠানে তার তেমন আগ্রহ নেই। তার বদলে বাস্তব বুদ্ধি আর পার্থিব জ্ঞান আহরণে তার আগ্রহ ছোটোবেলা থেকেই বেশি ছিল। নীতিশাস্ত্রের নীতি অংশটুকু সাবধানে বেছে নিয়ে তার আগে কূট শব্দটা যোগ করে কূটনীতিকে তিনি বেশ ভালোভাবেই আঁকড়ে ধরেছেন। আয়ত্ত করেছেন রাজনীতিতে কূটনীতির নানাবিধ ব্যবহার। অর্থশাস্ত্রেও তার দখল প্রতিষ্ঠানায় কিংবদন্তিতুল্য।

বেদ না পাঠ করলে ব্রাহ্মণের নাকি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্র হওয়া নিয়ে তার অবশ্য তেমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই। শাস্ত্রে আছে, যদি কোনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন এবং তিনি যদি সুকৃতিশালী হন, তাহলে একাই তিনি একুশ পুরুষকে মুক্তি লাভ করাতে পারেন। একুশ পুরুষের হিসেবও বেশ চমকপ্রদ। পিত্রাদি দশ পুরুষ মানে দশ স্তর পর্যন্ত পূর্বপুরুষ, পুত্রাদি দশ পুরুষ মানে দশ স্তর পর্যন্ত উত্তরপুরুষ এবং তিনি নিজে। গিরিধারীর বাবার ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছিল। সেই সাথে নিঃসন্দেহে তিনি বেদজ্ঞ এবং সুকৃতিশালীও ছিলেন। তাই সে যত পাপই করুক না কেন, বেদ পাঠ না করুক, নিয়মের ঘোরপ্যাঁচে তার সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। এই সমাজে এবং নীতিতে ব্রাহ্মণদের মুক্তির অনেক উপায় আছে।

সবাই শূদ্রদের নিচুজাত মানে। বলে ওরা অবহেলিত, সমাজের সেবা করার জন্য ওদের জন্ম। গিরিধারীর তা মনে হয় না। ব্রাহ্মণ পাপ করলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু শূদ্র পাপ করলে কোথায় যাবে? সে তো আছেই সবার নিচে। আর তো নিচে যাবার জায়গা নেই। ব্রাহ্মণেরা উঁচুতে আছে বলে ভীষণ গর্ব করে, কিন্তু এটা ভাবে না, যত উঁচু থেকে পড়া যায়, ব্যথা তত বেশি লাগে। নিচু বর্ণের নিয়মকানুন নেই, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক কিছুই নেই। এরচেয়ে বড়ো স্বাধীনতা আর কী হতে পারে?

সৈনিকের আগমনে চিন্তায় ছেদ পড়লো গিরিধারীর। মহারাজের ডাক শুনে তিনি গৈরিক গায়ে চাপিয়েই ছুটলেন। ব্রাহ্মণের গায়ের এই গৈরিকের মহিমা অনন্য। সামনে যেই থাকুক না কেন তার দৃষ্টি এই গৈরিকের সামনে একটু হলেও নত হয়ে যায়। একটু বুঝে কথা বলে, সম্মান দিয়ে কথা বলে। যেতে যেতে দেহের পোশাকের মতো মুখেও ভারিক্কি চাল ফুটিয়ে তুললেন তিনি। অনেকদিন পরে সুযোগ এসেছে, তিনি খুবই উত্তেজিত, এসব সে মুখ দেখে আন্দাজ করার কোনো উপায় নেই।

ততক্ষণে মহারাজ সাতকর্ণী ছাদে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে এক কোণায় রাখা রাজ আসনে বসে পড়েছেন। তার পাশে এসে দাঁড়ালেন গিরিধারী, সম্ভাষণ জানালেন রাজোপযুক্ত ভঙ্গিমায়। তবে নজর রাখলেন যাতে মাথা না ঝুঁকে যায়। সাতকর্ণী রাজা হতে পারেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়। আর তিনি ব্রাহ্মণ। অন্য কোনো জাতের সামনে ব্রাহ্মণ কখনো মাথা নোয়াতে পারেন না।

'মহারাজ সাতকর্ণীর বিজয়ধ্বজা অষ্টদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।'

'বসুন গিরিধারী।'

ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত আসনে বসলেন গিরিধারী। এই অবস্থার সাথে তিনি পরিচিত। তার মনে হচ্ছে মহারাজ অনেক বিচলিত।

'গিরিধারী, আমরা কী খবর পেয়ে সোপারায় এসেছি তা তো আপনি জানেন, তাই না? যদিও আপনার সাথে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ হয়নি আমার।'

'হ্যাঁ মহারাজ। সোপারায় আসার কারণ আমি জানি। আমাদের বন্দরগুলোতে ব্যাবসা ভালো হচ্ছে না। তাই আমরা এসেছি পেছনের কারণ খুঁজে বের করতে।'

'হ্যাঁ, একেবারে ঠিক বলেছেন। কিন্তু এখানে এসে আমরা কী করছি? আপনি অথিতিশালায় বসে আছেন আর আমি আরাম করছি রাজভবনে।'

'জি মহারাজ। তবে আমি যে-কোনো মুহূর্তে যে কোনো কাজ করতে সদা প্রস্তুত। শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা।'

'শুনুন, বলদেব কিন্তু এখন আর এখানে নেই। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অমরাবতীতে। আর তাকে সেখানে পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে এখানে কেন এসেছি তা কি আপনি বুঝতে পারছেন? আপনার অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তা আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

গিরিধারীর মুখ অনুভূতিশূন্য, 'মহারাজ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন একভাবেই হওয়া সম্ভব। যখন তার কর্তব্যের পরিবর্তন হয়। আর কোনো পরিবর্তনই আমার কাছে অবস্থার পরিবর্তন নয়। আমার কর্তব্যের এখন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি মহারাজ। আমি আগেও আপনার আর সাতবাহন সাম্রাজ্যের সামান্য একজন সেবক ছিলাম এখনো ঠিক তাই আছি।'

সাতকর্ণী খুশি হলেন, 'আপনার কর্তব্যের পরিবর্তন হয়েছে গিরিধারী। বলদেব আগে যেসব কাজ করতেন মহামন্ত্রীর সেসব কাজ এখন থেকে আপনাকে করতে হবে।'

'বলুন মহারাজ, আমি এখন কী করতে পারি?'

'এখন আমি চাই আপনি আমাকে আমার ব্যাবসার এই অবস্থার পেছনের কারণ খুঁজে দেবেন।'

'সেজন্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মহারাজ। প্রথমেই আমাদের দুটো জায়গায় খোঁজ নিতে হবে। আপনার বন্দরের মালামাল সংরক্ষণাগার আর কোষাগারে। আগে এই দুই জায়গায় অনুসন্ধান করে পরে বাকি ব্যাপারগুলো ভাববো। কারণটা তার পরেই খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সাতকর্ণী উঠে দাঁড়ালেন। সাথে সাথে চারজন প্রহরী এগিয়ে এলো। একই সাথে উঠে দাঁড়ালেন গিরিধারী।

'চলুন গিরিধারী। আমিও এই অনুসন্ধানে আপনার সাথে থাকবো। তাহলে প্রথমে কোথায় যাবেন?'

'প্রথমে সংরক্ষণাগারে যাবো, পরে কোষাগারে। প্রথমে অন্নপূর্ণা, পরে লক্ষ্মী।'

দুবছর আগেও এই বন্দরের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। রমরমা না হলেও মোটামুটি ভালোই চলতো। মসলার চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছিল বিদেশি বণিকদের মাঝে। এমন সময়ও গেছে চাহিদামতো জোগান দেওয়া যেতো না। তখন মসলার বাজার খোলা ছিল। দেশি বণিকেরা নিজ নিজ এলাকা থেকে মসলা নিয়ে আসতেন। দারুচিনি আর আদাই বেশি। সেই বণিকেরা পয়সা ভালোই রোজগার করতো। সাতকর্ণী সুযোগটা নিলেন। মসলার কারবারের পুরোটাই তিনি নিয়ে এলেন রাজার

নিয়ন্ত্রণে। বণিকদের কাছ থেকে কিনে বিক্রি করতেন বিদেশিদের কাছে। এই ব্যবসায় অনেক সম্ভাবনা দেখেছিল তার অর্থমন্ত্রীরা। সব বণিক এসে তাদের মসলা সাতকর্ণীর কাছেই বিক্রি করতো। টাকা নিয়ে যেতো রাজকোষ থেকে।

প্রথম বছর বেশ ভালোই আয় হলো। সমস্যা হলো এবারে। কেন যে এবার বিদেশি বণিকেরা আর এদিকে আসছে না, তা কোনোভাবেই বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে দেশি বণিকদের কাছ থেকে মসলা কিনে পুরো সংরক্ষণাগার ভরিয়ে ফেলা হয়েছে। ব্যবসায়ের মৌসুম শেষ হতে আর এক মাসের মতো বাকি।

মসলা সংরক্ষণাগারে ঢুকে মহারাজ সাতকর্ণীর শ্বাস ভারী হলো। অনেকগুলো মুদ্রা খরচ হয়ে গেছে রাজকোষ থেকে। এমনিতেই রাজকোষের অবস্থা ভালো না। এমন ভর্তি সংরক্ষণাগার তার আরো দুই বন্দরে আছে। এই মসলা যদিও সংরক্ষণ করা যাবে, তবু ঝামেলা মিটবে না। মসলা দিয়ে তো আর রাজ্য চলবে না। কোষাগারে মুদ্রা থাকা চাই। আর মসলা যদি বিক্রি না হয় তাহলে আগামী মৌসুমের মসলা তিনি বণিকদের কাছ থেকে কিনে রাখবেন কোথায়?

'মহারাজ, দেখতেই পাচ্ছি, যে ঝুঁকি আপনার অর্থমন্ত্রীদের কথা শুনে আপনি নিয়েছিলেন তা কাজ করেনি।'

সায় জানালেন সাতকর্ণী, 'হ্যাঁ, আমিও তাই দেখতে পাচ্ছি। এবার কারণটা কী খুঁজে বের করুন। নাহলে তো সমাধান করা যাবে না। এই স্বর্ণমুদ্রার খোঁজে আমি রাজধর্ম লঙ্ঘন করেছি। প্রজাদের ক্ষিধের কথা চিন্তা না করে আমি বাণিজ্যের কথা চিন্তা করেছি বারবার। ভেবেছি বড়োজোর পাঁচ বছর আমার প্রজাদের কষ্ট করতে হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার স্বর্ণের মজুত যথেষ্ট হয়ে গেলেই বাণিজ্য আর কৃষির সাম্য আবার নিয়ে আসতাম রাজ্যে।'

'দূরদর্শিতার অভাব ছিল মহারাজ। এখন লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণা দুইয়ের কৃপা থেকেই বঞ্চিত হলো আমাদের রাজ্য। চলুন মহারাজ, এখন আমরা আমাদের বন্দরের কোষাগারে যাই।'

কোষাগারে গেলেন মহারাজ আর গিরিধারী। কোষাধ্যক্ষ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে মৃদু কাঁপছে। গত তিন বছর ধরে এই দায়িত্বে আছে সে। মহারাজ দুসংবাদ শুনে এখানে এসেছেন, এটাই ভয়ের যথেষ্ট কারণ। তার ওপর এই দুঃসংবাদের আসল স্বরূপ তাকেই প্রকাশ করতে হবে মহারাজের সামনে।

গিরিধারী কোষাধ্যক্ষের অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। তিনিই এই অবস্থা থেকে মুক্ত করলেন তাকে, 'কই দেখি, তোমার গত তিন বছরের হিসাবের খাতা দাও। দেখি কী করেছো এই তিন বছরে।'

কোষাধ্যক্ষের এখন অন্য কাজ নেই। সে মহারাজের আগমনের খবর পেয়ে আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল হিসাবের সব খাতা। পুরানো খাতাপত্রগুলো ধুলো ঝেড়ে নিতে একেবারে নতুন হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোতে নতুন কালি বুলিয়ে রেখেছে কোষাধ্যক্ষ।

গিরিধারী টিকিতে আঙুল পেঁচাতে পেঁচাতে হিসেবের খাতা দেখতে শুরু করলেন। হিসেবে তেমন ঘোরপ্যাঁচ নেই। প্রথম বছরে আছে শুধু শুল্ক আদায়ের হিসেব। আর

পরের বছর থেকে জাহাজ গুনে গুনে বেচাকেনার হিসেব। সাতকর্ণী একটু তাড়া দিলেন, 'হিসেব দেখতে কি সময় বেশি লাগবে?'

'প্রায় হয়ে গেছে মহারাজ। প্রথম বছরের হিসেব করে লাভ নেই। তখন এই বন্দরে শুধু শুল্ক আদায় করা হয়েছে। গত বছরের হিসেবটা দেখুন।'

'আচ্ছা।'

'গত বছরে আপনার এই বন্দরে বেচাকেনা থেকে সব খরচ বাদ দিয়ে আয় হয়েছিল সত্তর মণ স্বর্ণ তিনশো মণ রূপা। আর এই বছর এখন পর্যন্ত আয় হয়েছে বারো মণ স্বর্ণ আর আশি মণ রূপা। তারমানে গত বছরের তুলনায় এই বছরে আপনার আয় সাত ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। মহারাজ এই হচ্ছে হিসেব।'

'বুঝলাম। সাত ভাগের এক ভাগে নেমে গেছে, এটা নির্ণয় করার জন্য তো আমি এখানে আসিনি। সাত ভাগ থেকে এক ভাগে কেন নামলো? কীসের অভাব আছে এই বন্দরে?'

'মহারাজ কারণটা বলছি।'

'বলুন।'

'মহারাজ আপনি তো জানেন, আপনার অনুমতি এবং অর্থ সাহায্য নিয়ে আমি গত পাঁচ বছর ধরে আর্যাবর্তের সব রাজ্য থেকে খবর সংগ্রহ করি। কখনো প্রলোভন, কখনো ভয় আবার কখনো ব্যবহার করি নগদ অর্থ। আমার গুপ্তচরেরা আর্যাবর্তের সব রাজ্যেই আছে।'

'হ্যাঁ। সেটাই বলদেবকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে এই পদে স্থান দেবার পেছনের একটা বড়ো কারণ।'

'মহারাজ, আপনার বাণিজ্যের অবস্থা কিন্তু এই বছর খারাপ হয়নি। গত বছরেও খারাপ ছিল।'

'মানে?'

'বলছি মহারাজ। গত বছরে আপনার তিন বন্দর মিলে আয় করেছিল একশো বিশ মণ স্বর্ণ। আর ওদিকে পল্লবদের বন্দর বারবারিকন একাই উপার্জন করেছিল একশো ষাট মণ স্বর্ণ, চেরাদের মুঝিরিস বন্দর আয় করেছিল দুইশো মণ স্বর্ণ। আর বারিগাজা, যাকে নির্দ্বিধায় এখান আর্যাবর্তের সবচেয়ে বড়ো বন্দরের স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তার আয় ছিল তিনশো পঁচিশ মণ স্বর্ণ। আপনার পতনের ধ্বনি গত বছরেই বেজে উঠেছিল মহারাজ, শুধু সেই আওয়াজটা আপনি এই বছর শুনতে পেয়েছেন।'

'তাহলে গত বছর আপনি আমাকে এই ব্যাপারে জানালেন না কেন?'

'মহারাজ, এই তথ্য আমি গতবছর জানতে পারিনি। জানতে পারলে এই আভাস আমি আপনাকে অবশ্যই দিতাম।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার বন্দরের আয় গতবছর থেকেই কম, আপনার কথা বুঝলাম। কিন্তু এই বছর সেই আয় একেবারে তলানিতে কেন ঠেকেছে?'

'বলছি মহারাজ। আমার মনে হচ্ছে, সেই কারণও আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'বাহ, আপনার তো দেখছি সবই জানা। তাহলে সবকিছু আগেই তো বলতে পারতেন।'

'তা পারতাম মহারাজ। কিন্তু তখন আপনি সবকিছু জানতেন কিন্তু বুঝতেন না। এজন্যই মূল গল্পের আগে ভূমিকার প্রয়োজন। একটু রয়েসয়ে ব্যাখ্যা করলে শ্রোতা নিজগুণেই অনেককিছু বুঝে ফেলে।'

'আচ্ছা হয়েছে,' অধৈর্য হলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'কারণ বলুন।'

'একটা প্রশ্ন করি মহারাজ। পশ্চিমের বণিকেরা আমাদের আর্যাবর্তের বন্দর থেকে কী কী জিনিস নেয় তা কি আপনি বলতে পারবেন?'

'মসলা নেয়, শুকনো ফলের আঁচার নেয়, আর কী নেবে?'

'না মহারাজ। এগুলো ওরা কেবল আপনার বন্দর থেকে নেয়। এগুলোই আপনার কাছে আছে তাই। ওরা আরো অনেক কিছু নেয়।'

'যেমন?'

'ওদের মূলত আকর্ষণ মসলায়। সেটা ঠিক আছে। সেই সাথে ওদের আগ্রহের তালিকায় আছে হাতির দাঁত, চীন থেকে আসা মসৃণ কাপড়, আর সবচেয়ে মূল্যবান যে বস্তু, মানে রত্নপাথর।'

'মূল্যবান রত্ন পাথর?'

'জি মহারাজ। উত্তর পশ্চিম ভারতের খনিগুলো থেকে এসব রত্ন উত্তোলন করান মহারাজ নাহাপনা। তারপর সেসব পাথর শোধিত হয়ে চলে যায় বারিগাজায়। আপনি মণকে মণ আদা বিক্রি করে যে স্বর্ণ উপার্জন করেন, তা শকরাজ নাহাপনা একটা ছোটো নীলা বিক্রি করেই উপার্জন করে ফেলেন।'

'আর চেরাদের মুঝিরিস বন্দরের আয় আসে কোত্থেকে?'

'পশ্চিমের যেসব ব্যবসায়ী শুধু মসলা কিনতেই আসেন তারা বেশিরভাগই যান মুঝিরিস বন্দরে। তাদের কাছে সব ধরনের মসলাই আছে। আমাদের দেশে রসুন নেই, তেজপাতা নেই, আবার হাতির দাঁত নেই। সেই হিসেব করলে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হলো বারিগাজা। নিজেদের মসলা আর হাতির দাঁত বেশি না থাকলেও পাঞ্চাল, কোশল, দর্শন আর কলিঙ্গ থেকে তারা সেগুলো সংগ্রহ করে। ঐসব দেশের পশ্চিম সমুদ্রে কোনো বন্দর নেই। তাই জিনিস বিক্রি করতে হলে মহারাজ নাহাপনার সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর উত্তরের শকদের সহায়তায় চীন থেকে আসা মসৃণ কাপড় সহজেই সংগ্রহ করতে পারেন মহারাজ নাহাপনা। এখন আপনিই বলুন মহারাজ, আপনি যদি জাহাজের মালিক হতেন তাহলে কী করতেন? সব বন্দরে ঘুরে বেড়াতেন নাকি যে বন্দরে সব একসাথে পাওয়া যায় সেখানে যেতেন? বুদ্ধিমান জাহাজ চালক মাত্রই একটা বন্দর থেকেই সব কিনে নেবে।'

মহারাজ সাতকর্ণীর মুখে কোনো ভাষা নেই। এতক্ষণে ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন তিনি। অসহায়ত্ব আস্তে আস্তে রূপ নিলো তীব্র ক্রোধে, 'এই বহিরাগত রাজারা ভারতবর্ষের সব সম্পদ কুক্ষিগত করে বসে আছে। আর আমরা আর্য সন্তানেরা, যারা এই ভূখণ্ডের মূল অধিকারী, আমরা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হচ্ছি।'

গিরিধারী নম্র ভঙ্গিতে বললেন, 'অপরাধ না নিলে একটা কথা বলি মহারাজ। আপনার বীরত্ব এখন সারা ভারত জানে। আপনি অনেক ভূমি জয় করেছেন, অনেক রাজাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমার বিচারে আপনার এই দিগ্‌বিজয় তেমন কোনো কাজের না।'

'মানে?'

'আপনি সব অকেজো ভূমি জিতেছেন। ভূমি জিতে কী লাভ হবে তা আপনি বিচার করেননি, যুদ্ধের নেশায় কেবল যুদ্ধ করে গেছেন। আপনার রাজ্য এখন এই ভূখণ্ডে সবচেয়ে বড়ো রাজ্য; কিন্তু বাণিজ্যে আর সম্পদে আপনার রাজ্যের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। এরচেয়ে বড়ো পরিহাস আর কী হতে পারে।'

'আমাকে আপনি কী করতে বলেন? এখন আমাকে আরো রাজ্য জয় করতে হবে?'

'মহারাজ, আপনার রাজ্যের এখন চারদিকেই শত্রু রাজ্য। আপনি যদি একদিকে আক্রমণ করেন, তাহলে নিশ্চিত থাকুন, বিপরীত দিকের রাজা আপনার অরক্ষিত রাজ্যাংশ আক্রমণ করবেন। ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করে এখন আর আপনি জিততে পারবেন না। দুরূহ হবে ব্যাপারটা।'

'তাহলে?'

'যা বলে হয় না তা ছলে করতে হয় মহারাজ। কূটনীতির এটাই নিয়ম। আমাদের এখন মহারাজ নাহাপনার পশ্চিম শক রাজ্যের বারিগাজা আর চেরাদের মুঝিরিসের দিকে নজর দিতে হবে। দখল করতে হবে দুটোর যে-কোনো একটা। অবশ্য যদি আপনি এখনো বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী নীতিতে এগোতে চান।'

'বাণিজ্য ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু কীভাবে ঐ দুটো আমি দখল করবো? যুদ্ধ ছাড়া তো আমি আর কোনো উপায়ই জানি না। শৌর্যের প্রদর্শন ছাড়া অন্য কোনোকিছুর বিনিময় আমার দ্বারা হবে না।'

হাসলেন গিরিধারী, 'তাহলে আপনার এই সেবক কবে কাজে আসবে মহারাজ? আমরা ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করবো। শতরঞ্জের এই খেলায় আমাদের চালও দিতে হবে সাবধানে, বাজিও ধরতে হবে সাবধানে।'

'কিন্তু কী উপায়ে? আমি তো কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।'

'উপায় আছে মহারাজ। আর্যদের অতি প্রাচীন উপায়। যা শুক্র থেকে বিদুর আবার বিদুর থেকে চাণক্য সবাই প্রয়োগ করেছিলেন।'

'আহা, ভণিতা রাখুন, সরাসরি বলুন।'

'সাম, দান, দণ্ড, ভেদ।'

৯

জঙ্গলের এই পাশটায় আগে আসেনি সে। আসার দরকার পড়েনি। প্রয়োজন ছাড়া কাজ মানুষ জীবনে সবচেয়ে বেশি করে। তবে সেই স্বাভাবিক অদরকারী নিয়ম পালন করার স্তর সে পেরিয়ে এসেছে। জঙ্গলের এই দিকটা তার কোনো কাজে আসে না। বনের ঐদিকে নদীর জল আছে, নারিকেল এবং অন্যান্য ফলের গাছ আছে অঢেল। সে দিনে একবার খায়, একাহার ব্রত পালন করছে দেবাদিদেবের কৃপা লাভের জন্য। এইদিকের জঙ্গল তার দিনের একবার আহার জোগান দিতে যথেষ্ট।

তবে এদিকের জঙ্গলে অনেক খুঁজেও একটা ওষুধি লতা খুঁজে পায়নি। লতাটা তার অনেক দরকার। তাই এদিকে এসেছে সে, যদি খুঁজে পাওয়া যায়। সঠিক ওষুধি গাছে আয়ুর্বেদের সঠিক জ্ঞান ব্যবহার করতে পারলে যে-কোনো রোগেরই নিদান পাওয়া সম্ভব। তবে তার সারা দেহের যে অবস্থা তাতে আয়ুর্বেদের তেমন কোনো কার্যকারিতা নেই। ওষুধে রোগের চিকিৎসা হয়, কিন্তু অভিশাপের কোনো চিকিৎসা হয় না। তবে লতাপাতা ব্যবহার করে দেখেছে সে। না সারলেও শরীরের কষ্টের কিছুটা আরাম হয় ব্যবহার করলে। এমনিতে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলে সে লতা ব্যবহার করে না। তবে গত দুদিন থেকে শরীরের যন্ত্রনা অসহ্য বোধ হচ্ছে। তাই আগে ব্যবহার করা বিশেষ লতাটা খুঁজতে বেরিয়েছে সে।

জঙ্গল এদিকটায় একটু ঘন। এমন ঘন জঙ্গলে যেখানে সূর্যের আলো সহজে প্রবেশ করতে পারে না সেখানেই পাওয়া যায় এই লতা। সঠিক জায়গার লক্ষণ দেখতে পেয়ে খোঁজার গতি বেড়ে গেল।

অনুমান সত্য। একটা ঘন ঝোপের পাশেই পাওয়া গেল লতাটা। বেশ কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিলো সে। গুনে গুনে। আয়ুর্বেদিক লতা ছেঁড়ার নিয়ম আছে, যেমন ইচ্ছে তেমন ছেঁড়া যায় না। যেসব গাছের শেকড় চিকিৎসায় লাগে না, শুধু লতা অথবা পাতা লাগে, সেসব গাছের মূলোৎপাটন করা যাবে না। যে গাছের শেকড় কোনো চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়, সেসব গাছ সংগ্রহ করার পরে অবশ্যই সেই গাছ অথবা গুল্ম আবার রোপণ করতে হবে। সব চিকিৎসকেরাই এই নিয়ম একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এখন অবশ্য আর কেউ তেমন পালন করেন না। এজন্য তাদের হাতযশ কমে গেছে। শাস্ত্রে আছে, বসুমতির কাছ থেকে সঠিক নিয়মে ওষুধ সংগ্রহ করলেই সেই ওষুধ ভালোভাবে কাজ করবে। যতটুকু লাগবে ততটুকুই সংগ্রহ করতে হবে। ওষুধ সংগ্রহ করে ব্যবহার না করা হলে তার গুণাগুণ কমে যায়।

গুনে গুনে বারোটা পাতা নিলো সে। একবার ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট। একবার ওষুধ প্রয়োগ করলে মাসখানেক জ্বলুনি কম থাকে। পাতাগুলো হাতের মুঠোয় ধরে নিজের কুটিরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো সে।

ঠিক তখনই একটু দূর থেকে মানুষের আর্তনাদ ভেসে এলো। বেশ তীক্ষ্ণ চিৎকার, নিশ্চিত কারো আর্তনাদ। আর্তনাদের সাথে সাথে ধ্বস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে আসছে।

মানুষ থেকে দূরে থাকাই তার জন্য ভালো। শুধু ভালো না, রীতিমতো আবশ্যক। মনুষ্য সমাজে সে সহস্র বছর ধরে ব্রাত্য। তবে কী হয়েছে তা জানার কৌতূহল তার মাঝেও আছে। আর লুকিয়ে দূর থেকে ঘটনা দেখতে কোনো অসুবিধা নেই।

জঙ্গলের এদিকে সে আগে আসেনি। আসলে জানতো এদিকের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা রাজমার্গ চলে গেছে। রাজা এখানে রাজমার্গ তৈরি করেছেন বেশিদিন হয়নি। ত্রিশ হাত চওড়া এই রাস্তা রাজ্যের এই অংশের সাথে রাজধানীর যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তবে সে রাস্তা বিপদশূন্য না। নতুন রাস্তা নতুন সুবিধা শুধু প্রজার জন্যই আনে না, সেই সাথে ডাকাতের জন্যও নিয়ে আসে নতুন সুযোগ। বেশ ভয়ানক ডাকাতের দল এই জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো নিরীহ, নিরস্ত্র পথিকদল পেলেই হামলা চালায়। এই ডাকাতেরা বড়োই ভয়ানক। ক্ষমা শব্দটা শুরুতেই ত্যাগ করে এই পেশায় আসতে হয়। শিকারকে জিনিস দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার কোনো সুযোগ দেয় না। প্রথমে হত্যা করে পরে মৃতদেহের সাথে কী আছে সেগুলো খুঁজে দেখে তারা।

শিকারকে ছেড়ে দেবার অসুবিধা আছে। তাতে প্রমাণ থেকে যায়। নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তাতে। রাজ্যের কোনো বিখ্যাত চেনা মানুষ অথবা রাজ কর্মচারীর ওপর হামলা করে না তারা। রাজার কানে খবর গেলে তিনি এই রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য সেনাদল পাঠাবেন। তাতে তাদের বিপদ বাড়বে। আর ধরা না পড়লেও ডাকাতি করার সুবিধা আর থাকবে না। তাতে ভাতের জোগাড় থমকে যাবে।

তাই তাদের লক্ষ্য থাকে ভবঘুরে পথিক যাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকে না, অথবা কোনো পরিবার যাদের অপেক্ষা করে থাকার মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম। এদের থেকে সম্পদ তত বেশি পাওয়া যায় না বটে, তবে নিরাপদে থাকা যায়। ভবঘুরে অথবা গরিব পরিবারের হত্যার প্রতিকারে রাজা নিশ্চয়ই সেনা পাঠিয়ে রাজখরচ বাড়াবেন না। এসব শিকারের গুরুত্ব রাজা, প্রজা কারো কাছেই নেই। এমন শিকারকে পেলে মেরে ফেলো, জিনিস কেড়ে নাও, আর লাশ পুঁতে দাও জঙ্গলের ভেতর। ঝামেলা শেষ।

আজ তারা এমনই একটা পরিবার পেয়েছে। এক বৃদ্ধ বাবা তার বিধবা অল্পবয়স্কা মেয়েকে নিয়ে জঙ্গল পেরোচ্ছে। ছুটে পালাবার সাধ্য নেই তাদের, অল্পতেই ডাকাতদের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

ঝোপের ভেতর থেকে সাবধানে লতা সরিয়ে সামনে তাকালো সে। পাঁচজন ভীষণ চেহারার ডাকাত দুজনকে ঘিরে আছে। মৃত্যুভয়ে অনুনয় করছেন বৃদ্ধ,

'আমাদের কাছে কিছু নেই বাবারা। আমাদের মেরে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। আমরা পাঞ্চাল রাজ্যে যাচ্ছি। এই রাজ্যে আর কখনো ফিরে আসবো না। পাঞ্চালে আমাদের এক আত্মীয় আছে। তার কাছেই যাচ্ছি আশ্রয় নিতে।'

ডাকাত সর্দারের পরনে লাল ধুতি, তার খালি গা, কপালে রক্ততিলক। চোখও সেসবের সাথে পাল্লা দিয়ে লাল।

'কপাল খারাপ আপনাদের। আমাদেরও কপাল একই সাথে খারাপ। আপনার খারাপ আমাদের হাতে পড়েছেন বলে। আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া আর যমের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া একই কথা। আপনার কাছে ধনসম্পদ আছে কি না তার সাথে আপনার

মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের সাথে দেখা হয়েছে সেজন্যই আপনাদের মরতে হবে। আমাদেরও কপাল খারাপ। আপনি বললেন আপনাদের সাথে কোনো ধনসম্পদ নেই। এখন বিনা উপার্জনেই আমাদের হত্যা এবং সমাধি স্থাপনের কাজটা করতে হবে। বেগার খাটতে হবে।'

বৃদ্ধ এবার অনুনয় ছেড়ে হুমকির পথ ধরলেন, তার অস্ত্র এখন ধর্ম, 'আমার পুত্রবধূ অন্তঃসত্ত্বা। তোমরা কি ওকেও মেরে ফেলবে? সেটা হবে মহা অধর্ম। তোমরা মহাপাতক হয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে বলছি, এই কাজ কোরো না, ভ্রূণহত্যার মতো গর্হিত অপরাধ কোরো না তোমরা।'

চোরা কখনোই ধর্মের কাহিনি শোনে না। তার নিজেরই সৃষ্টি করা একটা ধর্ম আছে। ডাকাত সর্দার এবার সেই ধর্মের ব্যাখ্যা দিলো, 'আপনার ধর্মের সাথে আমাদের ধর্মের অনেক পার্থক্য। আমাদের ধর্ম লুট করা। আর যেভাবেই হোক আমাদের এই ধর্ম রক্ষা করতে হবে। আর তা করতে গিয়েই আপনাদের মেরে ফেলা প্রয়োজন। নাহলে আপনি পাঞ্চালে পৌঁছে আমাদের কথা রাজাকে বলে দেবেন। আর রাজা তখন পালন করবেন তার নিজের ধর্ম। রাজধর্ম পালন করে আমাদের লুটধর্ম বন্ধ করে দেবেন। নিজেদের ধর্মের এত বড়ো ক্ষতি তো আমরা করতে পারি না।'

বৃদ্ধ আবার ফিরে যান অনুনয়ে, 'না বাবা, আমরা রাজাকে কিছুই জানাবো না। আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা কাউকে কিছুই বলবো না।'

পাশের বিধবা মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডাকাতদের দিকে! তেল চকচকে ডাকাতদের ভীষণ চেহারা দেখে আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে সে।

সর্দার তার হাতের প্রকাণ্ড তলোয়ারের ফোলা নাচিয়ে অনুচরদের আদেশ দিলেন, 'এই, তোরা এদের দুজনকে ধরে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে চল।'

সর্দারের নির্দেশে আবার শুরু হলো হুটোপুটি। হত্যার কাজটা জঙ্গলের ভেতর করাই উত্তম, তাই সবসময় করা হয়। রাস্তার ওপরে মারলে রক্তের দাগ থেকে যাবার সম্ভাবনা। আর রক্তের দাগ চোখে পড়ে যেতে পারে পরবর্তী পথিকদের। আর তাহলেই তাদের পরিচয় রাজার কাছে ফাঁস হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ আর বিধবাকে সহজেই জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গেল ডাকাতেরা। দুজনের কারো শরীরের জোর তেমন নেই। চিৎকার করা ছাড়া শারীরিকভাবে কেউই তেমন বাঁধা দিতে পারলো না।

পুরো ঘটনাটা ঝোপের পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলো সে। দৃশ্যটা তার মনে তেমন একটা ছাপ ফেলতে পারলো না। তার এই দীর্ঘ যৌথ অজ্ঞাতবাস আর বনবাসে এমন দৃশ্য সে অনেক দেখেছে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে সে, আর এসব জায়গাতেই চোর ডাকাতদের অবাধ বিচরণ।

এই বৃদ্ধ আর বিধবার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। এদেরকে এখন যম সদনে যেতে হবে।

এখানে আর থাকার কোনো মানে নেই। কৌতূহল নিবৃত হয়েছে। কুটিরের দিকে পা বাড়ালো সে। খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। এই নির্জন জঙ্গলে অল্প আওয়াজ

অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। তাহলে তাকেও বিপদে পড়তে হবে। সাবধানে চলতে লাগলো সে বিপরীত দিকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে হবে।

আচমকা তিন হাজার বছর আগের সেই ঘটনাটা তাকে যেন পুনরায় আঘাত করলো। মাটিতে বসে পড়লো সে। হাঁপাতে লাগলো বুড়ো হাঁপানি রোগীর মতো। এই আঘাত এসেছে একেবারে ভেতর থেকে। গত তিন হাজার বছর এই অনুভূতির সাথে পরিচয় হয়নি তার।

সেই গর্ভধারিণী নিস্পাপ নারী। কোনো রকমের শত্রুতা ছিল না, কোনো রকমের কারণ ছিল না, ছিল শুধু অকারণ ক্রোধ আর হিংসা। ক্ষমতার সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যবহার, সবচেয়ে বড়ো পাপ। কুঁড়ি ফুল হবার আগেই ছিঁড়ে ফেলার পাপ। হাঁটু গেঁড়ে বসা অবস্থায় চিন্তাটা যেন তার ভেতরটা চিরে দিচ্ছে। মাটিতে সে বসেনি, যা তার কাঁধ চেপে তাকে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে তা তার আদি পাপ, তার বিবেকের দংশন, আত্মগ্লানি, সে তার ফেলে আসা অতীত।

আজো কি সে একই কাজ করছে না? আজ তার সামনে আরেক গর্ভধারিণী মা। তাকেও আজ তারই সামনে আবার প্রাণ দিতে হচ্ছে। এই বিরানে সেই অসহায় নারীর সাহায্যে কেউ নেই। কোনো রাজা নেই, কোনো ক্ষত্রিয় নেই, আত্মীয় বন্ধু নেই। শুধু সে আছে। আজ যদি সে কিছুই না করে তাহলে তাকে আরো একবার ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী হতে হবে।

পাপের ভারকে কাঁধ থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। না, আজ আর সে বিপরীত দিকে যাবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এই তিন হাজার বছর মানুষ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু আজ জানবে। আজ আর নিজেকে পাপ করতে দেবে না সে।

অশক্ত দেহ জোরে চলতে পারে না। তার মধ্যেও প্রবল চেষ্টা করে যতটা পারা যায় দ্রুত জঙ্গলের মাঝে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো সে।

ততক্ষণে অর্ধ সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্দারের হাতের তলোয়ার জীবন রঙে রাঙা হয়ে আছে। তলোয়ারের হাতল বেয়ে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে মাটিতে। পাশেই ভূমিতে পড়ে থাকা বৃদ্ধের দেহ এখনো তিরতির করে কাঁপছে।

একবার তলোয়ারের চকচকে ফলায় রক্ত লাগলে তার বোধন হয়। সেই ফলায় তখন তৃষ্ণা জাগে। সে তখন জীবন্ত হয়ে উঠে মালিককে বারবার তাগাদা দেয় তৃষ্ণা মেটানোর জন্য। সেই তাগিদ বেশির ভাগ সময়ই তলোয়ারধারী অগ্রাহ্য করতে পারে না। মালিকের চোখ হয়ে যায় তখন রক্তজবার মতো। রক্ত তখন আরো রক্ত দেখতে চায়।

রক্তের টানে সর্দার এবার তাকালেন বুড়োর পাশে বসে থাকা বিধবার দিকে। সর্দারের দেহে দয়ার লেশমাত্র নেই। কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলাই ভালো হবে।

বিধবা মেয়েটা এখন আর কাঁদছে না। ভয়ের বদলে তার মনে এখন জায়গা নিয়েছে শোক। শ্বশুরের পাশে বসে থেকে শোক অনুভব করছে সে। শ্বশুরের জন্য। তার অনাগত সন্তানের জন্য। নিজের জীবনের জন্য।

সর্দার বাঁকানো ফলা বিধবার মাথার ওপরে তুলে ধরলো। এখনই সম্মিলিত জোড়া হাতের শক্তি আঘাত করবে অনাহারে জীর্ণ ক্ষীণ গ্রীবায়।

'থামো' শব্দটা উচ্চারণ করে নিজেই চমকে গেল সে। কতদিন পড়ে কাউকে উদ্দেশ্য করে সে কিছু বললো। নিজের স্বর নিজের কাছেই অপরিচিত লাগছে।

ডাকাতের দল তার থেকেও বেশি চমকে গেছে। এই জনমানবহীন গহীন জঙ্গলে কারো থাকার কথা না। এই লোক এলো কোথেকে? লোকটার পোশাকও খুব অদ্ভুত। একটা কালো মোটা কাপড়ে সারা দেহ আপাদমস্তক ঢাকা তার। মাথায় একটা কাপড় বাঁধা। ঠিক পাগড়ির মতো না, বরং কপাল কেটে অথবা ফেটে গেলে যেভাবে বাঁধা থাকে ঠিক সেভাবে কাপড় বাঁধা। লোকটা বেশ লম্বা কিন্তু বৃদ্ধ। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে শরীর অশক্ত।

সর্দারের চমক কাটলো প্রথমে, 'কে রে তুই? তোর সাথে কোনো অস্ত্র নেই, কোনো লোকজন নেই। হাঁটতে যার কষ্ট হয়ে যায়, যে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না লাঠির সাহায্য ছাড়া, সে এসেছে আমাকে হুমকি দিতে। বুড়ো হয়েছিস, কয়দিন পর তো এমনিতেই মরবি। এই বয়সে আবার আত্মহত্যার স্বাদ হলো কেন তোর? আমাদেরকে চিনিস না? জানিস না, আমরা রক্তবীজের পূজা দেই। আমাদেরকে এই বেশে যে দেখে তার মৃত্যু নিশ্চিত।'

আগন্তুকের মুখের কিছু অংশও কাপড়ে ঢাকা। মুখটা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। তবে তার গলার স্বর স্পষ্ট শোনা গেল, 'আমি অশক্ত, বৃদ্ধ, লাঠি ছাড়া দাঁড়াতে পারি না কথাটা ঠিক। তবে আমি যে নিরস্ত্র এই কথাটা তুমি ঠিক বলোনি। তোমাদের সবাইকে ঘায়েল করার মতো অস্ত্র আমার কাছে আছে। এই অস্ত্র আমার কাছে সবসময় থাকে। থাক সে কথা। এই অস্ত্রের ব্যবহার আমি করতে চাই না। আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমি আসার আগেই তোমরা বুড়োকে মেরেছ। আমি কিছু করতে পারিনি। সেজন্য তোমাদের কিছু বলবো না। সেই শাস্তি তোমাদের ভগবান দেবেন। কিন্তু এক্ষুনি যদি তোমরা এই বিধবাকে না ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের পাপের শাস্তির জন্য ভগবানের অপেক্ষা করবো না। তোমাদের শাস্তি বিধান আমিই করবো।'

সর্দার এবার অট্ট হাসলেন, 'বা, কথার তো তোর বাহার আছে। ঠিক আছে, সাধ মিটিয়ে দেব আজ তোর। এই মেয়ের জীবন পরে, আগে তোর মুণ্ডুই কাটবো।'

সর্দার খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। আগন্তুক শেষবারের মতো সাবধান করলো, 'কাছে এসো না। তোমাকে শেষবারের মতো বলছি। তোমরা যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছো। এখনই পালাও।'

'তবে রে' চিৎকার করে উঠলেন সর্দার। তেড়ে গেল আগন্তুকের দিকে।

তখনই পুরো দেহের কালো কাপড় একটানে সরিয়ে ফেললো সে। পুরো শরীরে দুই জাং আর লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা কাপড় ছাড়া আর একটা সুতোও রইলো না। বেরিয়ে এলো তার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র।

সে অস্ত্র দেখে আঁতকে উঠলেন সর্দার। সর্দারের অনুচরেরা দূর থেকেও সেই অস্ত্র স্পষ্ট দেখতে পেলো। সেই সাথে চিনতেও পারলো। তারা রীতিমতো সমবেত কণ্ঠে

চিৎকার করে উঠলো। সর্দারের হাতের রক্ত মাখানো মহা তলোয়ার খসে পড়লো ভূমিতে।

সামনের আগন্তুকের সারা দেহ অদ্ভুত ক্ষতে ভর্তি। শরীরের প্রতিটা রোমকূপে পচন ধরেছে। সেই ক্ষত স্বাভাবিক কোনো ক্ষত নয়। এই ডাকাতদলের কেউ এমন ক্ষত কখনো দেখেনি। শুধু ক্ষত নয়, সারা দেহের সেই ক্ষতে অসংখ্য শাদা কীট কিলবিল করছে। আগন্তুকের শরীরে কোনো চামড়া নেই, সেই কীটগুলোই যেন তার চামড়া। এমনকি নাকে, কানে আর ঠোঁটেও কিলবিল করছে অসংখ্য কীট। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কীটগুলো সর্বক্ষণ নড়াচড়া করছে ঠিক কিন্তু একটা কীটও খসে পড়ছে না।

আগন্তুকের চোখ এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সে চোখ তুলে সর্দারের দিকে তাকালো। এতক্ষণে সবাই দেখতে পেলো তার চোখ। তাতে বিভীষিকা বাড়লো বই কমলো না।

সেই চোখের ভেতরেও কীট নড়ছে। শুধু কালো অংশে কীট নেই। তাই আগন্তুক দেখতে পাচ্ছে।

সর্দারের চোখ আতঙ্কে বড়ো। এই রোগ তিনি চেনেন না। কোন রোগে মানুষের শরীরে এমন কীটের বাস হয়? তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই রোগ বড়ো সাংঘাতিক। নিশ্চয়ই তীব্র কোনো চর্মরোগ। এরকম রোগীর একশো হাতের মধ্যে থাকলেই এমন রোগের অভিশাপ শরীরে লাগে। আর একবার এই অভিশাপ শরীরে লাগলে অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ হবে। জীবিত থাকতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করা হয়ে যাবে।

সর্দার এবার পেছনে ফিরে তাকালেন। তার অনুচররা সেখানে আর কেউ নেই। সবাই সটকে পড়েছে। কেউ আর এই সটকে পড়ার ব্যাপারে সর্দারের অনুমতির অপেক্ষা করেনি। সর্দারের মনোবলের যে ছিটেফোঁটা বাকি ছিল, একা হওয়াতে তাও উবে গেল। তলোয়ার মাটিতে রেখে তিনিও ছুট লাগালেন। যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে এই অশরীরী অভিশাপের কবল থেকে।

বিধবা মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল আগন্তুক। মেয়েটা এখনো বৃদ্ধের মৃতদেহের পাশেই বসে আছে। আগন্তুক আবার নিজের শরীরে আগের মতো কাপড় জড়িয়ে নিয়েছে। দেহটা অদৃশ্য হতেই ভয় একটু কমে এলো মেয়েটার। কিন্তু পুরোপুরি চলে গেল না।

'ভয় নেই মা। ওরা চলে গেছে। এদিকে আর আসবে না। আর আমার শরীরে তুমি যা দেখেছো সেটা কোনো রোগ না মা, তোমার ভয় নেই। এটা একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ আমার একান্ত, আর কাউকে স্পর্শ করবে না।

মেয়েটার ভয় এত তাড়াতাড়ি কাটবার নেই। তাই এবার অভয় না দিয়ে কাজের কথা বললো সে, 'এখানে তোমার বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। অন্য কোনো ডাকাতদলের হাতে পড়তে পারো।'

'আমি কোথায় যাবো এখন?' মেয়েটা এই প্রথম কথা বলল। ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

'কাছেই একটা দুর্গ আছে। সেই দুর্গের সাথেই আছে একটা গ্রাম। আমি তোমাকে সেখানে দিয়ে আসবো। আমি অথবা তুমি কেউই ওনার মৃতদেহ সাথে করে নিয়ে যেতে

পারবো না। তুমি ঐ গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে এসে মৃতদেহ নিয়ে যেও, তারপর তারাই সৎকার করে দেবে। চলো।'

মেয়েটা আর কিছুই বলে না। সে আগন্তুকের পেছনে চললো। তবে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে।

যেখান থেকে দুর্গের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে ওখানে গিয়ে সে মেয়েটাকে বলল, 'ঐ যে মা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। সেখানের লোকজন অনেক ভালো। ওদের সাহায্য পাবে তুমি। তোমার শ্বশুরের শেষ কাজ করতে পারবে। যদি তুমি চাও ওখানের লোকজন পাঞ্চাল পৌঁছে দেবে তোমাকে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেয়েটা।

'আমি এখান থেকে আর সামনে যেতে পারবো না মা। তুমি চলে যাও। এই পথ ধরে সোজা গেলেই চলবে।'

মাথা নেড়ে হাঁটতে শুরু করলো মেয়েটা। বেশ জোরে। তার থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় দূরে সরে যেতে হবে।

সে জানে, মেয়েটা আর কখনো ফিরে তাকাবে না। তাকে কেউ ধন্যবাদ দেবে না, কেউ তার প্রশংসা করবে না। স্নেহ, প্রেম, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব এসব থেকে বঞ্চিত থাকবে সে সারাজীবন।

গায়ের এই কীটগুলো নয়, বরং এটাই তার জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।

১০

রাতের দুই প্রহর পেরিয়ে গেছে। এখন কৃষ্ণপক্ষ। রাতের আকাশ নক্ষত্রে ছেয়ে আছে। শীত আসি আসি করছে। এখনো গা কাপাচ্ছে না। নর্মদার জল আগাম বার্তা হিসেবে ঠান্ডা বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে এক অচিন উৎস থেকে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বারিগাজার বণিকেরা যার যার তাবুতে ও জাহাজে ফিরে গেছে। বেশিরভাগেরই চোখে নেমে এসেছে নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদ। শুধু জাহাজগুলোতে যে নাবিকেরা সারাদিন ঘুমিয়েছিল তারা এখন জাহাজ পাহারা দিচ্ছে।

বন্দরের রাত্রী প্রহরীদের চোখে কোনো ঘুম নেই। তারা সতর্ক হয়ে পাহারা দিচ্ছে। কেউ পায়চারি করছে আবার কেউ একই জায়গায় স্থির। এক প্রহর পরপর পাহারার পালা বদল হয়।

শীতের শুরুতে সমুদ্রে ফিরতি বাতাস বইতে শুরু করেছে। বণিকেরা এরই মধ্যে বন্দরের কেনাবেচার পাঠ চুকিয়ে ফেলেছে। এরই মধ্যে দুই একটা জাহাজ ফিরতি পথ ধরতেও শুরু করেছে। সমুদ্রের নেশা অদম্য। নাবিকদের জন্য এই নেশা দোটানার মতো। খুব বেশিদিন সমুদ্রে থাকলে বাড়ির নেশা অদম্য হয়ে ওঠে। আবার যে একবার সমুদ্রের দোলায় অভ্যস্ত হয়েছে তার ডাঙ্গায় বেশিদিন ভালো লাগে না। জাহাজের ফিরতি যাত্রার জন্য খাবার আর পানির জোগাড় করতেই এখন ব্যস্ত সব নাবিকেরা।

ক্রেয়নের এক মাস কেটে গেছে বারিগাজায়। বেশ কিছু দামি পাথর আর মসলা কিনেছেন তিনি। আর কিছু কেনার নেই। তার আসল উদ্দেশ্য এখনো পূরণ হয়নি। সময়টা এগিয়ে এসেছে। সমুদ্রে শীত বাতাস শুরু হয়ে গেছে। আসল কাজ শেষে আজ রাতেই ফেরার পথ ধরতে হবে। রাতেও বন্দরের জাহাজ নোঙ্গর তোলে। কারো মনে কোনো সন্দেহ হবে বলে মনে হয় না।

কাজ সেরেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। আজ রাতেই। প্রথমে একটা চিন্তা মাথায় এসেছিল ক্রেয়নের। নদীর মোহনা পেরিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার সময় মহাবিপদ হতে পারে। রাতে আবার পথপ্রদর্শক নৌকা থাকে না। তবে কিছু অনুসন্ধান করতেই সেই সমস্যা মিটে গেল। বারবারিকন থেকে বন্দরে আসার সময় জলঘূর্ণি আর ডুবো পাথরের ভয় আছে। তবে বন্দর থেকে সমুদ্রে ফেরার সময় সেই ভয় নেই। তখন নর্মদা থেকে সরাসরি মাঝ দিয়ে সমুদ্রের বুকে গিয়ে পড়লেই হলো। পাল ঠিক করে তুলে দিলে শীত বাতাস জাহাজকে সহজেই নিয়ে যাবে আফ্রিকার শিঙে। তারপরের সমুদ্রপথে গেলেই খোঁজ পাওয়া যাবে আরসেনির।

এই এক মাস ধরে কেনা মখমলি কাপড়, মসলা আর কয়েকটা রত্ন পাথর ক্রেয়নের মতো লোকের এই বন্দরে আসার আসল কারণ না। সেই বিশেষ উদ্দেশ্য যা সাধনের জন্যই তিনি রওনা দিয়েছিলেন সেই সুদূর স্পার্টা থেকে। বারবারিকন বন্দরে থাকা, বেচাকেনা-সবই ছিল লোক দেখানো। এখানে আসার পর এক মাস অপেক্ষা করেছেন। কয়েকদিন আগ থেকেই ফিরতি বাতাস বইতে শুরু করেছে। আর আজকের দিনে সেই

বাতাস জোরালো হয়েছে। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন তিনি বাতাস আর পরিস্থিতির এই পরিবর্তন। আজই মোক্ষম সময়। হ্যাঁ, আজ রাতেই মোক্ষম সময়।

রক্তপাতে আগ্রহ নেই ক্রেয়নের। স্পার্টার সৈন্যরা পৃথিবী বিখ্যাত। তারা যখন বর্শা আর তাদের বিখ্যাত বর্ম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ায় তখন সামনের যোদ্ধার গালে এক ফোঁটা হলেও ঘাম গড়িয়ে পড়ে। একবারের জন্য হলেও তাদেরকে ঢোক গিলতে হয়। ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন জারাক্সিস। তিনশো জনের সামনে তার বিশাল বাহিনী থুবড়ে পড়েছিল।

থাক সেকথা। সেসব এখন অতীত গৌরব। যে স্পার্টানরা পরাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতো, পরাধীনতার নরম বিছানায় শোবার চেয়ে যারা ভালোবাসতো মৃত্যুর বিষের পেয়ালায় চুমুক দিতে, এখন তারাই অপরের অধীনে আছে। শুধু স্পার্টা নয়, পুরো গ্রিসই এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রোমানদের দ্বারা। তবে সবগুলো প্রদেশের চেয়ে স্পার্টার অবস্থা ভালো। তারা ফ্রি-টাউন। শাসকরা তাদের সামনে স্বতন্ত্র শাসনের মুলো ঝুলিয়ে রেখেছে। শাসন, প্রজা-ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা এখনো স্পার্টান আভ্যন্তরীণ লোকজনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

তবে গোপনে স্পার্টার বিখ্যাত যোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখনো চালিত হয়। সেই প্রশিক্ষণ তাদের অনেক পুরানো ঐতিহ্য। সেই কেন্দ্র থেকে শুধু অকুতোভয় স্পার্টান যোদ্ধাই তৈরি হয় না, যারা দেশের জন্য বর্ম, শিরস্ত্রান, তলোয়ার আর বর্শা হাতে যুদ্ধ করে। আরেকটা খুবই গোপন বাহিনী সেই কেন্দ্র থেকে তৈরি হয়। এই গোপন বাহিনী আগেও তৈরি হতো। তবে এখন এই বাহিনীর কাজ করার পদ্ধতি আর উদ্দেশ্য বদলে গেছে।

ক্রেয়ন সেই গোপন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। সেই যোদ্ধাদলের নাম ক্রিপ্টেয়ার। স্পার্টানদের গোপন সৈন্যদল। সেই আদিকাল থেকেই স্পার্টান রাজা আর অভিজাতরা এই দলকে ব্যবহার করেছেন নানা ব্যক্তিগত আর সামরিক গোপন কাজে। সেরকম একটা গোপন কাজেই এই বারিগাজা বন্দরে এসেছেন ক্রেয়ন। আর আজ রাতেই সেই কাজটা সম্পন্ন করতে হবে।

ক্রেয়নের পরনে এখন আর ঢিলেঢালা পোশাক নেই। সেই রাজকীয় পরিচ্ছেদ আলখেল্লা যা কিনা তার ছদ্ম আভিজাত্যের পরিচায়ক তা তিনি ত্যাগ করেছেন। তার পরনে এখন কালো শিরস্ত্রাণ আর যুদ্ধ পোশাক। সেসবের রঙও কালো। এই রাতের আঁধারে এই পোশাক কোনোমতেই প্রহরীদের চোখে পড়বে না। রাতের গোপন কাজের সময় ক্রিপ্টেয়ারদের পরনে এমন পোশাকই থাকে সব সময়। সেই প্রথম যৌবনে যখন তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতেন, যখন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে রাতের বেলা তাকে হেলটদের ঘরে ঘরে ঢুকে অতি সন্তর্পণে তাদের হত্যা করতে হতো, ঠিক তখন থেকেই এই পোশাকে অভ্যস্ত তিনি। আলখেল্লা খুলে এই পোশাক পরাতে নিজের পরিচয় যেন ফিরে পেলেন তিনি।

জাহাজের সব নাবিক এখন গভীর ঘুমে আছে। তিনি নাবিকদের ঘরগুলোর সামনে গিয়ে একটা বিশেষ কায়দায় শিষের আওয়াজ করলেন। পরপর তিনবার। এরপর চলে গেলেন জাহাজের খোলের ভেতর।

আজকের পরিকল্পনা পুরোপুরি পাকা। রাজা নাহাপনার অন্দরমহলে হানা দেবেন তারা আজ রাতে। এখানে এসে প্রথমদিনেই রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢুকেছিলেন তিনি। প্রতিটা দরজা আর প্রবেশ পথ তার স্মৃতিতে গেঁথে আছে। একবার দেখলে সেটা আর না ভোলা তার ছোটোবেলার প্রশিক্ষণের অংশ ছিল।

গত একমাস ধরে তিনি আর তার অনুচরেরা নগরে বণিকের বেশে ঘোরাফেরা করেছেন। প্রহরীদের পাহারা দেওয়ার স্থান, সংখ্যা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তার ফাঁকগুলো বেশ ভালোভাবে বুঝে নিয়েছেন তারা। আর সেসব পুরোপুরি বুঝে নেবার পরেই শানানো হয়েছে আজকের পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী একজনকেও বধ করার ইচ্ছে নেই ক্রেয়নের। তবে সাবধানের মার কখনোই নেই। কেউ যদি বাঁধা হয়ে আসে তবে তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে যম সদনে।

প্রথমদিন এসেই সেই রত্ন দেখেছেন তিনি। সেই রত্ন, যার খোঁজে তিনি এখানে এসেছেন। মহারাজ নাহাপনার সবচেয়ে দামি রত্ন। সেই পঞ্চমুখী নীলা।

এই রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন এই নীলা। তবে এই মূর্খ রাজা এই রত্নের আসল ক্ষমতার কথা মোটেই জানে না। এই প্রচণ্ড দ্যুতিময় পাথরের অমোঘ শক্তি। এটা একটা দৈব পাথর। আর এই পাথরই পারে স্পার্টার পুরানো দিন ফিরিয়ে আনতে। এই পাথরই পারে গ্রিসকে আবার পৃথিবীর ক্ষমতায় বসাতে, স্পার্টাকে স্বাধীন করতে। এই পাথরের স্পর্শে জেগে উঠবে তাদের যোদ্ধারা, তাদের সাহস এবং পরাক্রম। কোন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থেকে ফ্রি-টাউন হিসেবে নয়, বরং তারা বাঁচবেন পৃথিবীর বুকে স্বাধীন হয়ে।

ডেলফির পুরোহিতের ভুল হতেই পারে না। কখনোই হয়নি। এই পাথরের খোঁজ অনেক করেছে স্পার্টার লোকজন। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বণিকদের কাছ থেকে এই রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়। এই আশ্চর্য রত্ন যে একবার দেখে সে আর ভোলে না। নির্ভুল বর্ণনা শুনে তারা ঠিক বুঝতে পেরেছেন, এই রত্নই তাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত। এই রত্নই টিয়ার অব এপোলো। এই রত্নই পারবে ডেলফির পুরোহিতের কথা অনুযায়ী তাদেরকে জাগিয়ে তুলতে।

এই পাথরটা রাজ্যে নিয়ে যাওয়াই ক্রেয়নের মূল উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতেই এখন কাজ শুরু হবে। যে সিন্দুকে পাথরটা রাখা আছে সেটাও সেদিন ভালো করেই খেয়াল করেছিলেন। যথেষ্ট ভারী। তবে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। পরিকল্পনার একটা অংশ তার জন্যও করা আছে। দূরত্ব হিসেব করা হয়ে গেছে। একটা নৌকা তৈরি আছে বন্দর থেকে দূরে আঁধারে। সেই নৌকার সাথে রশি বেঁধে সিন্দুক নিয়ে যাওয়া হবে নদীর অপর পারে। তারপর সেই অন্ধকারে নৌকা অন্যপার দিয়ে বেয়ে নর্মদার মোহনার দিকে যাবে। বন্দরের আলো থেকে দূরে এলেই সিন্দুক নৌকার সাথে বাঁধা রশি থেকে তুলে ফেলা হবে জাহাজে। জলে জিনিসের ওজন কমে যায়। আর নৌকাটা যথেষ্ট বড়ো। কাজটা অত কঠিন হবে না।

সিন্দুকটা আনতে খবর হয়ে যাবে নদীর জল পর্যন্ত। তবে তা নিয়ে চিন্তা করছেন না ক্রেয়ন। আরে যতই ভারী হোক না কেন, তার হাতেও বিশজন সুদক্ষ শক্তিশালী

লোক আছে। একবার দড়ি বেঁধে রাজভবন থেকে বের করে ফেলতে পারলে আর চিন্তা নেই। চারটে মোটা রশিতে অব্যর্থ বাঁধনে বাঁধতে হবে সিন্দুকটা।

আজ বন্দরের প্রহরীদের থেকে একটু দূরেই নোঙ্গর করা হয়েছে জাহাজটা। তাদের চোখে কিছু পড়ার সম্ভাবনা নেই। রশির বদলে শেকল ব্যবহার করলে শক্ত বাঁধন দেওয়া যেত তবে শেকলে শব্দ হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। রাতে জাহাজ ছাড়ার সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে। সবগুলো আলো জ্বালিয়ে সরে যেতে হবে কারো সন্দেহ উদ্রেক না করে।

পরিকল্পনা পাকা। এখন ক্রেয়নের সামনে ঠিক তার মতোই পোশাক পরা বিশজন লোক বসে আছে।

'দড়ি জায়গা মতো বাঁধা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ক্রেয়ন।

'জি।'

'আচ্ছা। এখনই উৎকৃষ্ট সময়। সবাই নিঃশব্দে পানিতে নেমে পড়ো।'

বন্দরের দিকে জাহাজের ডানপাশ ফেরানো। এতদূর থেকে তাদের খোল থেকে নেমে পড়া প্রহরীরা দেখবে না, তবু এই বাড়তি সতর্কতা। বামদিকের খোলের ঢাকনা খুলে পানিতে নেমে পড়লো তারা। তারপর ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করলো। হাত পা তেমন নড়ছে না কারোই। অল্প নেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ সাঁতারের এক বিশেষ কৌশল। ঢেউ খুবই কম তৈরি হচ্ছে। যেটুকু হচ্ছে তা নর্মদার স্বাভাবিক ঢেউ ছাপিয়ে যাচ্ছে না।

রাজভবনের কাছে পাড়ে উঠলো সবাই। প্রায় একই সময়ে। তারপর যে যার কাজে লেগে পড়লো। এদিকের দেওয়ালের পাশে কোনো প্রহরী থাকার কথা না। তাদের এতদিনের জোগাড় করা খবর তাই বলে। তবে টহলে প্রহরী থাকতে পারে।

দুজন পাশাপাশি দেওয়ালের ঠিক নিচে দাঁড়ালো। একজন সেই দুজনের হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো দুজনের কাঁধের ওপর। ঠিক যেন কোন দক্ষ দড়াবাজ তার খেলা দেখাচ্ছে। এবার এগিয়ে এলো চতুর্থ জন। সে এদের চেয়েও এক কাঠি সরেস। সে এক লাফে তৃতীয় জনের হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে দেওয়ালের ওপরে উঠে বসলো। তারপর সাবধানে তাকালো দেওয়ালের অন্য পাশে।

দেওয়ালের নিচে কোনো প্রহরী নেই। তবে অনুমান ত্রিশ পেস দূরে এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে রাখা একটা মশাল। সেই আলো এত দূরে এসে পৌঁছায়নি। সবাইকে ইশারায় নিঃশব্দে থাকতে বললো সে। তারপর ইশারা দিলো দড়ি বাড়িয়ে দেবার জন্য। দড়ির মাঝামাঝি এক পাশের গাছে বেঁধে দুটো প্রান্ত সৈনিকের হাতে দেওয়া হলো। সেই দড়ি বেয়ে সবাই দেওয়াল টপকে ঢুকে পড়লো ভেতরে। যে তিনজন মানব মই তৈরি করে রেখেছিল তাদের দক্ষতার মাত্রা আরো বেশি। তারা দড়ি বেয়ে এপাশে চলে এলো সবার শেষে।

দড়িটা বাঁধা হয়েছে একটা বিশেষ কৌশলে। দড়ি ফিরে পাবার আদি এবং সহজ কৌশল। গাছের সঙ্গে প্যাচ দিয়ে বেঁধে দুই প্রান্তই অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঐ দুই প্রান্ত শক্ত করে ধরে রাখায় সবাই পার হতে পেরেছে। এবার ক্রেয়নের হাতে দুটো প্রান্তই আছে। এক প্রান্ত ছেড়ে দিয়ে আরেক প্রান্ত টান দিতেই পুরো দড়ি প্যাঁচ খুলে

তার হাতে চলে এসেছে। দড়িটা ভাজ করে কাঁধে তুলে নিলো একজন। সিন্দুক বাঁধতে এই দড়িরই দরকার হবে।

ভেতরে ঢুকে প্রহরীকে নজরে পড়লো ক্রেয়নের। এই দিক দিয়ে সিন্দুক বের করা যাবে না। প্রহরী দেখে ফেলবে। অন্যদিক দিয়ে দেওয়াল পেরোতে হবে। সবাইকে হাতের ইশারায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

সবকিছু পরিকল্পনা মতো হিসেবের ভেতরেই হচ্ছে। তারা যে যে জায়গায় প্রহরী থাকার কথা ধারণা করেছিল সেখানেই পাহারায় আছে রাজার প্রহরীরা। মন্ত্রী মহলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেই রাজমহল। এখানেই রাজসভা বসে। রাজার রত্নভাণ্ডার এখানেই আছে।

আর একটু ভেতর থেকেই রাজার অন্দরমহল শুরু হবে। এখানে পাহারা একটু বেশিই হবার কথা। মশালের আলোতে এদিকটা বেশি আলোকিত হয়ে আছে। সাবধানে সকল প্রহরীদের অবস্থান দেখে নিলেন ক্রেয়ন। হাতের ইশারায় সবাইকে আবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

সাথে সাথে ছয়টা দলে ভাগ হয়ে গেল বিশজন। ক্রেয়ন ভেবেছিলেন রক্তপাত ছাড়াই কাজ শেষ করা যাবে। তবে এখন তাকে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। কড়া পাহারা একটু পাতলা করতে না পারলে ভেতরে ঢোকা যাবে না। প্রহরীদের মেরে এগিয়ে যেতে হবে। আর কোনো জায়গার প্রহরীদের মেরে ফেলার সহজ নিয়ম হচ্ছে, পারলে কাউকে না মেরে নিঃশব্দে কাজ হাসিল করো, আর যদি মারতেই হয় তবে সবাইকে মেরে ফেলতে হবে যাতে কেউ বাকিদের সতর্ক করতে না পারে।

সবার হাতেই বেরিয়ে এসেছে অস্ত্র। ক্রেয়নের হাতে বেরিয়ে এসেছে দুটো খাটো তলোয়ার। তার লক্ষ্য টহল দিতে থাকা দুজন সৈন্য। বাকি সবাই ইশারা মতো যার যার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রহরীরা নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মতো পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। কেউ এখনো ঘুনাক্ষরেও কিছু টের পায়নি।

দুটো তলোয়ার শক্ত করে ধরেছেন ক্রেয়ন। সেই ছোটোবেলা থেকে অনুভব করা পুরানো উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি। এই মুহূর্তে ঠিক দুই প্রহরীর পেছনেই আছেন তিনি। দূরত্ব আর মাত্র এক পেস।

ঠিক তখনই রাজমহলের সামনের এক অন্ধকার কোণ থেকে একটা শীতল স্বর ভেসে এলো, 'থামো। অকারণে মানুষ হত্যা করা কোনো যোদ্ধার উচিত নয়। এতে তোমার কোন লাভ হবে না বন্ধু।'

বিজাতীয় ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারলেন না ক্রেয়ন। তবে এটা বুঝতে পারলেন যে তিনি এবং তার অনুচরেরা ধরা পড়ে গেছেন।

১১

অসিত বারান্দায় বসে আছে। অঙ্গদকে দিয়ে নব উদ্যমে খেলা দেখানোর চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। নতুন নতুন চিন্তা মাথায় আসছে। সেগুলোই সাজিয়ে নিচ্ছে সে মনে মনে।

খেলা দেখানোর অনেক জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে। সব যে ঐদিন আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে তা নয়, আগেও অনেক জিনিস নষ্ট হয়েছে কালের আঘাতে। আবার খেলা ঠিকমতো শুরু করতে হলে সেসব জিনিস আবার জোগাড় করতে হবে। অনেক খেলা আগে দেখাতো সে, এখন আর দেখায় না। জিনিসের অভাবেই সেগুলো দেখাতে পারে না সে। জিনিস জোগাড় করতে হবে।

বাঁশ আর কাঠ দিয়ে যেগুলো বানানো সম্ভব সেগুলো নিজেই বানিয়ে নেবে সে। লোহার জিনিসগুলো জোগাড় করতে হলে তাকে আবার যেতে হবে কামারের কাছে। আগে পয়সার ঝামেলা ছিল। এখন আর তা নেই। যুবরাজের দেওয়া রুপোর পয়সা থেকে দুটো দিলেই সব কাজ করে দেবে কামার।

তাদের গ্রাম ইন্দ্রপুরে কামার নেই। যেতে হবে পাশের গ্রামে। সকাল সকাল অঙ্গদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। কাজটা করতে সময় লাগবে। যখন সে কামারের বাড়ি পৌঁছেছে ততক্ষণে কামারের হাঁপরের কয়লা গনগনে হতে শুরু করেছে। অসিতের কাঁধের অঙ্গদকে দেখে কয়লায় বাতাস দিতে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল কামার,

'এটা কি রে?'

এই প্রশ্নের জবাব অনেকবার দেওয়া হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অসিত বিচলিত হলো না, 'এটা আমার বানর। আমি ওকে দিয়ে খেলা দেখাই।'

'এত রঙের বানর তো জীবনে দেখি নাই রে। আমাদের গ্রামের বটগাছে কয়েকটা আছে। অনেক জ্বালায়। ঐদিন একটা তলোয়ার বানিয়ে রেখেছিলাম। এক বানর এসে সেটাকে নিয়ে তুললো বটগাছের আগায়। আমি শুধু অনুরোধ করি, কিছুতেই শোনে না। মারধর করতে পারি না, বকাবকিও করতে পারি না। হাজার হোক বজরংবলীর বংশধর। পরে আবার অভিশাপ পেতে হবে। দেখা যাবে এক তলোয়ারের জন্য চুরাশি নরকের একটায় গিয়ে বসে আছি।'

হেসে উঠলো অসিত, 'আমার অঙ্গদ সেরা বানর। ভূভারতে এমন বানর আর দ্বিতীয়টা নেই। আপনার তলোয়ারটা কি পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, সে পেয়েছিলাম। খোঁচাখুঁচি করত গিয়ে একটা আরেকটাকে দিলো রাম খোঁচা। সেই খোঁচা খেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেল বানর। তাদের ঝগড়ার এক ফাঁকে হাত থেকে তলোয়ারটা খসে পড়লো মাটিতে।'

অসিতের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। এবার গল্প করা বাদ দিয়ে নিজের কাজের কথায় এলো কামার, 'এবার বলো, আমার কাছে কেন এসেছ? আমি তো আর খেলা দেখবো না।'

'না, খেলা দেখাতে আসি নাই আপনার কাছে। আমাকে খেলা দেখানোর কিছু জিনিস বানিয়ে দিতে হবে। তেমন বেশি কিছু না। কয়েকটা লোহার বলয়, দুটো পাতলা ভোঁতা তলোয়ার, আর একটা দশ হাত লম্বা পাতলা শেকল।'

বেশ বড়ো কাজের বায়না। কামার বেশ উৎসাহী হলো, 'আর কিছু লাগবে?'

'না।'

'তলোয়ার আমার কাছে বানানোই আছে। সেখান থেকেই তুমি দুটো নিয়ে নিতে পারবে।'

'না, আপনার তলোয়ার তো বড়ো মানুষের জন্য। ভারী, ধারালো। আমার ভোঁতা পাতলা তলোয়ার লাগবে। অঙ্গদ কি আর ভারী তলোয়ার তুলতে পারবে?'

'অঙ্গদ আবার কে?'

'আমার বানরের নাম অঙ্গদ।'

'আচ্ছা। যদি ও তুলতে না পারে, তবে ওর জন্য একটা বানিয়ে দেবো। আর তুমি একটা আসল নিয়ে যাও। তাতে তো তোমার কোনো সমস্যা হবে না?'

অসিত মাথা নাড়লো, 'না, আমিও আসল ভারী তলোয়ার তুলতে পারবো না। সেগুলো অনেক ভারী। আর সেগুলোতে অনেক ধার। আপনি দুটো পাতলা ভোঁতা তলোয়ার বানিয়ে দিন।'

'আচ্ছা।' কামারের মুখে একটু দুঃখের ছাপ পড়লো। আগে বানিয়ে রাখা তলোয়ার থেকে দুটো গছিয়ে দিতে পারলে কষ্ট আর সময় দুটোই বাঁচতো।

'বলয়ের মাপটা দাও।'

মাপটা বুঝিয়ে দিলো অসিত। কামার এবার সোজা কথায় এলো, 'দেখো, আমি এখনই সব বানিয়ে দিচ্ছি। তবে পাঁচটা মুদ্রা লাগবে সবকিছু বানাতে। অন্যকিছু দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। অন্যকিছুর বিনিময়ে আমি কাজ করি না।'

অসিত বিচলিত হয় না, 'বুঝলাম। পাঁচটা মুদ্রা লাগবে। সে তো তামার মুদ্রা। রুপার মুদ্রা হলে কয়টা লাগবে?'

কামার অবাক চোখে তাকায় তার দিকে। এই ছেলে রুপার মুদ্রা পাবে কোত্থেকে? সামলে নিলো সে, 'রুপার মুদ্রা একটা হলেই চলবে।'

'আচ্ছা, তাই দেবো।'

কামার নিজের কাজ শুরু করলো। অসিত অঙ্গদকে নিয়ে এক কোণে বসেছে। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে।

স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলছে কামারের হাত। রুপার মুদ্রা দেখার লোভ যে তার গতি বাড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য। লোহার শিক বাকিয়ে বাকিয়ে অতি সহজেই সে দশ হাতের একটা শেকল বানিয়ে ফেললো। তবে তলোয়ার পাতলা করতে হলে কষ্ট বেশি। লোহাকে অনেক নরম করতে হবে। তাহলেই পেটালে দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে আর পুরুত্ব কমে আসবে। দেখতে দেখা যাবে আসল তলোয়ারের মতো কিন্তু ওজন হবে খুবই কম। কয়লা আর সময় অনেক বেশি লাগবে। তবে একদিক দিয়ে লাভ হবে। লোহা কম লাগবে, আর ধার করতে হবে না দেখে সময় অনেকটা বেঁচে যাবে।

বলয় বানানোতে অতটা ঝামেলা করতে হলো না। লোহার শিক বাঁকানোই আছে। সেই শিক মাপমতো নিয়ে নির্দিষ্ট আকারের গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে হাতুড়ির আঘাত

করতেই সমান পুরুত্বের কয়েকটা সুন্দর বলয় তৈরি হয়ে গেল। বিভিন্ন মাপের বলয় তৈরির জন্য বিভিন্ন মাপের গাছের গুঁড়ির ব্যবস্থা আছে। বলয়গুলো বানানো হতেই দুই মাথা যেখানে এক হয়েছে সেখানে আগুন দিয়ে লাল করে এক করে দিতে লাগলো কামার। কাজ শেষে কোনো ফাঁক রইলো না।

সব কাজ শেষ হতে কামারের মুখ অবাক করে আর মনের সব সন্দেহ দূর করে তার হাতে একটা রুপার মুদ্রা রাখলো অসিত। তারপর আবার গ্রামে ফেরার পথ ধরলো।

পরদিন সব নতুন আর পুরানো খেলা দেখানোর সামগ্রী ঝোলায় ভরে কাঁধে নিলো, হাতে নিলো লাঠিগুলো আর অঙ্গদ কখনো তার মাথায় কখনো নিজে নিজে লাফাচ্ছে আবার কখনো ঝোলার সাথে কাঁধে বসছে। এমন অবস্থায় রাস্তায় বেরোলো সে। ভোরে ভোরে। আজ খড়গপুরের বাজারে যাওয়াই উদ্দেশ্য। ওখানে প্রতিদিন জমজমাট বাজার বসে। ওখানকার লোকজনের সুনাম আছে। তারা ইন্দ্রপুর আর আশেপাশের গ্রামের মানুষের মতো গরিব না। তাদের কাছে পয়সা আছে।

খড়গপুর বাজারে পৌঁছতে প্রায় দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়ে এলো। অনেকটা হেঁটে বেশ ক্ষিধে লেগেছে অসিতের। অঙ্গদেরও নিশ্চয়ই একই অবস্থা। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ঝোলাতে কিছু খাবারও এনেছিল সে। সেগুলোই খেয়ে নিলো অঙ্গদকে নিয়ে। অঙ্গদ অবশ্য বেশি খেলো না। আসার সময় এক বন্য কলাবাগান পাওয়া গেছিল। সেগুলো দিয়েই যথেষ্ট উদরপূর্তি করেছিল অঙ্গদ।

বাজারের সবাই অঙ্গদের দিকে তাকিয়ে অবাক হচ্ছে। সুবিধামতো জায়গায় গিয়ে অঙ্গদকে নিয়ে দাঁড়ালো অসিত। তারপর সবকিছু বুঝে নিয়ে ডমরু বের করলো। বাজানো শুরু করলো দ্রুত লয়ে। দ্রুত লয়ের ডমরুর বাজনা দৃষ্টি আকর্ষণে অব্যর্থ। চমৎকার বানর দেখে অনেকেই তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

দর্শকদের একজন জিজ্ঞেস করে বসলো, 'কিরে, তোর বানরের এই অবস্থা কেন?'

আসল কারণ বলার প্রশ্নই ওঠে না। রহস্য রাখলো অসিত, 'বজরংবলীর কৃপা।'

দর্শকরা অঙ্গদের লাফালাফিতে বেশ আমোদ পেলো। নানা রকম রব উঠলো ভিড়ের মাঝে। 'আবার লাফাও' 'একটা ভালো খেলা দেখাও' আরো কত কী।

অসিত শুরু করলো। সে বলছে আর অঙ্গদ তার ইশারায় অভিনয় করে দেখাচ্ছে।

এক মাতাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। পদ এলোমেলো। ভালো পরিমাণই পেটে পড়েছে। অনেকদিনের চেনা রাস্তা বলে বোধহীন অবস্থায়ও চলতে পারছে কোনোমতে। হঠাৎ রাস্তার একটা গর্তে পা হড়কে পড়ে গেল সে।

পায়ের ওপর চোট ভালোই গেল। ভালো রকম ভাবেই মচকেছে। একেবারে অচল না হলেও হাঁটতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হচ্ছে মাতালকে।

বাড়ি পৌঁছে যথারীতি হম্বিতম্বি শুরু করলো মাতাল। তার বৌয়ের কাছে একটা রোজকার ঘটনা। সে প্রতিদিন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে পানশালা থেকে এসে মাতাল তার ঘুম ভাঙ্গায়।

সে রাতেও বৌ উঠে এসে দরজা খুলে দিলো। তারপর মাতালের সামনে ভাতের থালা রেখে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো।

ভাত মুখে দিতেই মাতালের মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো। ভাত বেশ ভালো রকম ভাবেই পচে গেছে। একে তো পেটে ক্ষিধে। দুইয়ে মাথায় নেশা। দুইয়ে মিলে মাতালের ক্রোধ সীমা ছাড়ালো। এত কষ্ট করে মচকানো পা নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি এসে পাওয়া গেল পচা ভাত। রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে বৌকে ঘুম থেকে টেনে তুললো সে। তারপর কোনো কথা না বলে, কোনো রকমের সময় নষ্ট না করে শুরু করলো বেদম মার। বেচারি জানতেও পারলো না, কেন মার খাচ্ছে।

বৌকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেললো মাতাল। প্রতিবেশীরা স্বামীর চিৎকার আর বৌয়ের আর্তনাদ শুনলো কিন্তু কেউই গা করার প্রয়োজন মনে করলো না। মাতাল ক্ষেপেছে, আর এটা তো হতেই পারে।

তবে ঘটনা এখানেই শেষ হলো না। প্রতিবেশীরা ঘটনার সময় কেউ কিছু না করলেও কথাটা তাদের থেকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। আর একসময় গিয়ে পৌঁছুল রাজার কানে।

নিজের রাজ্যে এই বধূ অত্যাচারের কাহিনি শুনে স্বভাবতই ক্রোধিত হলেন রাজা। আর রাজার ক্রোধ বলে কথা। সাথে সাথে প্রহরী পাঠিয়ে সভায় ধরে আনা হলো সেই অত্যাচারী মাতাল স্বামী আর অত্যাচারিত বৌকে।

বৌ দেখলো, এবার সুযোগ পাওয়া গেছে। এবার নালিশ ঠুকলো সে, 'এই লোক মাতাল হয়ে বিনা দোষে আমাকে প্রহার করেছে।'

মাতালও মুখ ভ্যাংচালো, 'হ্যাঁ, তোকে আমি বিনা দোষে মেরেছি। আমার তো আর খেয়ে কাজ নেই। সত্যি করে বল, তুই আমাকে পচা ভাত খেতে দিসনি? স্বামীকে কেউ পচা ভাত খেতে দেয়? সেজন্যই তো তোকে মেরেছি।'

এক সভাসদ মত দিলেন, 'মহারাজ, আমার তো মনে হচ্ছে দোষ বৌয়ের। পচা ভাত খেতে দিলে কারই বা মাথার ঠিক থাকে।'

বৌ প্রতিবাদ করলো, 'আমি তো ওকে প্রতি রাতেই ভাত দেই। ঐদিনও দিয়েছিলাম। আমি কীভাবে জানবো ভাত পচে গেছে। আর কোনোদিন তো পচে না।'

মহামন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন এবার, 'মহারাজ, ওদের কারোরই দোষ নেই। ভালো করে চিন্তা করে দেখুন। মদ পেটে পড়লে মাতাল হবে মানুষ। অল্পতেই তার ক্রোধ হবে। মাতাল সেই ক্রোধে পতিত হয়ে বৌকে মেরেছে। মাতাল মাতালের ধর্ম পালন করেছে।

বৌয়ের কাজ হচ্ছে স্বামী ঘরে ফিরলে খাবার দেওয়া। এখানেও মাতালের বৌ ভাত বেড়ে দিয়েছে। সেও তার ধর্ম পালন করেছে।

অন্নের ধর্ম হচ্ছে অধিক ক্ষণ থাকলে পচে যাওয়া। এখানে অন্য পচে গেছে। অন্নও নিজের ধর্ম পালন করেছে। মহারাজ, এরা সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করেছে। আপনি এদের কাউকেই শাস্তি দিতে পারেন না, কাউকে দায়ীও করতে পারেন না।'

রাজা পড়লেন মহা ভাবনায়। মহামন্ত্রীর কথা ঠিক। সবাই যার যার মতো করে ধর্ম পালন করেছে। কিন্তু তাকেও তো এখন নিজের ধর্ম পালন করতে হবে। রাজধর্ম হচ্ছে সুবিচার করা। এখন তো সুবিচার না করতে পারলে তিনিই ধর্মের লঙ্ঘনকারী।

তখনই রাজার মাথায় সমাধান আসে, 'আচ্ছা, ভাত তো প্রতিদিন বেড়ে দেয়। ভাত কি প্রতিদিন পচে যায়?'

মাতাল উত্তর দেয়, 'না, প্রতিদিন তো পচে যায় না। আমি প্রতিদিন খাই।'

রাজা এবার বৌকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি সেদিন রাতে কখন ভাত রেঁধেছিলে?'

উত্তর এলো, 'প্রতিদিন যে সময় রাঁধি।'

রাজা এবার সিদ্ধান্ত জানালেন, 'হ্যাঁ, তাহলে দোষ মাতালের। সে নিশ্চয়ই সেদিন রাতে দেরি করে বাড়ি ফিরেছে। এজন্য দেরি হওয়াতে ভাত পচে গিয়েছিল।'

মাতাল প্রতিবাদ জানায়, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমার দেরি হয়েছিল। তবে সেটা তো আমার কোনো দোষ নয়। দেরি অন্য কারণে হয়েছে।'

'কি সেই কারণ?'

'রাস্তায় একটা গর্ত ছিল মহারাজ। তাতে পড়ে আমার পা মচকে গিয়েছিল। আর শেষে মচকানো পা নিয়ে আস্তে আস্তে আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। সেজন্যই দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

এবার রাজা বুঝতে পারলেন তিনি বিপদে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন, আসল ঘটনার পেছনে দোষ তার। রাজ্যের সব রাস্তার সুরক্ষার ভার তার ওপর। আর সেই রাস্তার সুরক্ষা তিনি দিতে পারেননি। রাস্তার গর্ত সময়মতো মেরামত করা হয়নি। তার মানে প্রধান দোষ তার। তারই শাস্তি হওয়া উচিত।

রাজা যদি নিজের কাজ ঠিকমতো না করেন তবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আস্তে আস্তে লোকজনের ঘরে ঢুকে পড়ে।

গল্প শেষ হতে লোকেরা হাততালি দিয়ে উঠলো। অঙ্গদ সব ভূমিকায় অভিনয় করেছে। সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছে মাতালের চরিত্রে। রাজার অভিনয়ও দারুণ হয়েছে।

প্রচুর পয়সা পাওয়া গেল। সব পয়সা জড়ো করে নিজের গায়ের পথ ধরলো অসিত। খড়গপুর বাজারের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো সে।

বাজারের এই অংশে গাভী বিক্রি করেন ব্রাহ্মণরা। নানান রাজা, ব্যবসায়ী, জমিদাররা ব্রাহ্মণদের গাভী দান করেন। নিজের দুধের জন্য রেখে বাড়তি গাভীগুলো ব্রাহ্মণরা বিক্রি করে দেন। সেখান থেকে তাদের আশ্রম এবং ঘর দুই-ই চলে।

সেখানে নানা রঙের গাভী আছে। একটা কালো গাভী নিয়ে একজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে গিয়ে গাভীটার দাম জিজ্ঞেস করলো অসিত।

উত্তর এলো, 'রাজার ঠিক করা দাম। এটা একেবারে পুষ্ট গাভী। ঠিক একশো মুদ্রা লাগবে। এক মুদ্রা কম না, এক মুদ্রা বেশি না।'

অসিত মনে মনে হিসেব কষে ফেললো। একটার দাম একশো মুদ্রা, তার মানে দুটোর জন্য দুশো মুদ্রা লাগবে।

রাঁধা ওর মায়ের দাবি সম্পর্কে দুটো গাভীর কথাই বলেছিল।

১২

সাতকর্ণী বসে আছেন তার অন্দরে। সিংহাসন তার কাছে আরামদায়ক মনে হচ্ছে না। মানুষের আরাম বেশির ভাগ সময়ই মনের ওপর নির্ভর করে।

মনে ঝড় চলছে তার। ষোলো মহাজনপদের এই ভারতে এখন তার সাম্রাজ্যের চাইতে আয়তনে বড়ো কোনো রাজ্য নেই। কিন্তু, গিরিধারীর সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারছেন, আসলে তার রাজ্যে মাটির ঢেলা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি জয় করেছেন দায়, সম্পদ নয়। রাজাকে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদও বাড়াতে হয়। রাজ্য শাস্ত্রে আছে, যে রাজা নিজের সম্পদ বাড়াতে সচেষ্ট হন না, তার পতন অনিবার্য।

ব্যাবসা করার এখন আর কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। তার সেনাবাহিনী এখন আর পাশের রাজাদের মনে ভয় উৎপাদন করতে পারছে না। প্রথমে রাজ্য ছোটো ছিল তার। তখন তার আশেপাশের অন্য ছোটো রাজ্যগুলোর তুলনায় তার সেনাও ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। সেই রাজ্যগুলো সহজেই জয় করে রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই সাথে শুরু হলো আরেক সমস্যা। যতই তার রাজ্যের আকার বাড়তে লাগলো ততই রাজ্যের আয়তনের তুলনায় কমতে শুরু করলো তার বাহিনীর ঘনত্ব। এখন আর তার সেনা মহাসেনা না। চারদিকের ছোটো রাজ্যগুলো জয় করতে করতে এখন তার রাজ্যের চারপাশেই বড়ো রাজ্য।

এখন সেনাদের রাজ্য রক্ষার কাজে চারদিকের দুর্গ আর সীমান্তে প্রহরায় রাখা হয়েছে। আগের রাজধানী অমরাবতীর রক্ষায়ও কিছু সৈনিক নিয়োগ করা আছে। সেনাদল এক জায়গায় করে এখন অন্য কোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এই পরিস্থিতিতে অনেক কঠিন। তিনি শুধু রাজ্যই জয় করেছিলেন তবে সেই অনুপাতে সেনাদল বাড়াননি। এখন যদিও এদিকে নজর দিয়েছেন তবু অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

অন্দরমহলের প্রহরী দরজার সামনে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালো, 'মহারাজের জয় হোক।'

'ভেতরে এসো।'

ভেতরে এসে কুর্নিশ করলো প্রহরী, 'মহারাজ, গিরিধারী মহাশয় আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'তাকে ভেতরে আসতে বলো।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

গিরিধারী ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, 'মহারাজের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। রাজলক্ষ্মী প্রসন্ন হউন।'

প্রহরী প্রস্থান করলো। সাতকর্ণী ইশারা করলেন, 'বসুন গিরিধারী।'

'মহারাজের মুখই বলে দিচ্ছে, খুব চিন্তায় আছেন। চিন্তার বিষয়টা যদিও অনুমান করতে পারছি, তবু জিজ্ঞেস করছি কারণটা।'

'তোমার অনুমান ঠিক আছে। ঐ ব্যাপারটা ছাড়া এখন আর আমার চিন্তায় কিছুই নেই।'

'হ্যাঁ মহারাজ, গাধার ওপর যখন সাধ্যাতীত ভার চাপানো হয় তখন গাধার খুব কষ্ট হয়। ধোপারও চিন্তা হয়। তবে গাধা কিন্তু সেই ভার পিঠ থেকে ফেলে দেয় না। ভারটার সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করে যায়।'

'হ্যাঁ, আর তাই করতে করতে গাধা ভারের চাপে মারা পড়ে।'

'স্বাভাবিক চিন্তা করলে তাই হবার কথা মহারাজ। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো তা হয় না। সেই অতিভার নিয়ে গাধা পথ চলতে থাকে। ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা বাড়ে। একসময় দেখা যায় সেই ভার গাধার সাধ্যের মধ্যে চলে এসেছে। গাধার কাছ থেকে এই গুণটাই আমাদের শেখা উচিত। মহামতি চাণক্য ঠিক এই কথাটাই বলে গেছেন।'

'তাহলে বলেন, আমার অতিভার লাঘব করার উপায় কী? আমি সেনাদল বাড়াবার কথা ভাবছি, অস্ত্রশস্ত্র বাড়াচ্ছি। এতেই হয়তো একসময় আমার অতিভার আমার সাধ্যের ভেতরে চলে আসবে।'

'ঠিক বলেছেন মহারাজ। তবে এসব নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো। এখন আপনার ভার লাঘব করার চেয়েও চিন্তা লাঘব করা বেশি জরুরি। মাথায় দুশ্চিন্তার আধিক্য হলে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এখন চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায় আবার যাবো এখন?'

'বৈতরণী নদীতে মহারাজ। আপনার মনোরঞ্জনের জন্য কিছু আয়োজন আছে। আসুন, গেলেই দেখতে পাবেন। আপনার খারাপ লাগবে না আশা করি।'

সাতকর্ণী উঠে দাঁড়ালেন। অবচেতনে তিনিও আসলে এমন কিছুই চাইছিলেন। মাথার চিন্তা একটু দূর করে আসা যাক।

বৈতরণীর বুকে ভাসছে প্রমোদ তরী। তরীতে হরেক আলোর অপূর্ব সমাবেশ। হরেক রকমের সুবাস ভেসে আসছে। তার মধ্যে ধূপের সুবাস আলাদাভাবে বোঝা যাচ্ছে। আগুনে গলছে সুগন্ধি ধূপ। নানা রকমের বাদ্যযন্ত্রে সজ্জিত যন্ত্রীদল আর নৃত্যসাজে সজ্জিত অপ্সরারূপিণী মানবীরা নৌকার বুকের ওপর সুদৃশ্য নরম গালিচায় বসে আছে।

সব দেখেশুনে একটু অবাকই হলেন মহারাজ সাতকর্ণী। অবাক চোখে তাকালেন গিরিধারীর দিকে, 'করেছেন কী আপনি? আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতির তো কোনো রকমের লক্ষণ দেখছি না। এসব তো সফলতার উদযাপন। কোন সফলতার উদযাপনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন?'

'মহারাজ, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি। বরং আপনার যাতে মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে সেজন্যই এই ব্যবস্থা।'

'আয়োজন যেহেতু করেছেন আপনি সভাসদদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন। এই আনন্দে এখন আমার ইচ্ছে নেই।'

'মহারাজ, সফল মানুষ কখনোই নিজের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তারা নিজের ইচ্ছাকে পরিচালিত করেন।'

'আপনি কী বলতে চান?'

'তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি মহারাজ। আপনি কি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন?'

'প্রশ্নটা অবান্তর। আপনাকে বিশ্বাস না করলে বলদেবের জায়গায় আপনাকে জায়গা দিতাম না।'

'তাহলে মহারাজ, এখন আপনি আমার কথা শুনবেন। আপনি এখন হাসিমুখে এই প্রমোদ তরীতে উঠবেন। তারপর নিশ্চিন্তে নিজের আসনে বসে নৃত্য-গীত উপভোগ করবেন। ধরে নিন, এটা একটা রাজনৈতিক চাল।'

'এখানে আবার রাজনীতি আসলো কোত্থেকে? আমি তো জানতাম মদ, নৃত্য আর গীত রাজাদের সবসময় ক্ষতিই করে এসেছে। হস্তিনাপুরের মতো রাজ্যের যুবরাজ বিচিত্রবীর্যের কথাই ধরতে পারেন। এসবে মত্ত হয়েই তো তার দুর্গতি হয়েছিল।'

'একেবারে সঠিক কথা মহারাজ। এসবে মত্ত হলে বিপদ। তবে আপনি তো আর মত্ত হবেন না। যদি ইন্দ্রিয় কবলে রেখে মদ-নৃত্য-গীত উপভোগ করা যায় তবে এসব বেশ উপকারী। আর এখানে তো আমাদের আরেকটা উদ্দেশ্য আছেই।'

'সেটা কী?'

'বলছি মহারাজ। আপনার গুপ্তচর যেমন এই ভারতের সব জায়গায় আছে, তেমনি মনে রাখবেন, অবশ্যই অন্য সকল রাজ্যের গুপ্তচরও আপনার রাজ্যে আছে। তারাও নিত্য আপনার বিভিন্ন খবর তাদের নিজ নিজ রাজ্যে পাঠায়। এখন আপনি যদি নৃত্য-গীত উপভোগ করেন তাহলে সেই গুপ্তচরদের মারফত সেই খবর শত্রু রাজারা পেয়ে যাবে। আর তখনই তারা পড়বে মহা ধন্দে।'

'বুঝলাম না। আমি আমোদ তো করতেই পারি। কিন্তু আমার আমোদ করার সঙ্গে শত্রু রাজাদের ধন্দে পড়ার সম্পর্ক কী? রাজারা তো নিয়মিতই এসব করেন।'

'হ্যাঁ মহারাজ। মন ভালো থাকলে সব রাজারাই এসব করেন। কিন্তু নিজের এবং নিজের রাজ্যের চরম সর্বনাশের বেলায় কেউই আমোদ উপভোগ করেন না। আপনার ব্যাবসার অবস্থা অনেক খারাপ। এবং আমি নিশ্চিত আপনার এবারের ব্যাবসার ভরাডুবির কথা এবার সব রাজাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আপনি যে সেই খারাপ অবস্থা দেখার জন্য সোপারায় এসেছেন সেটাও সবাই জানে। তারা স্বভাবতই বুঝে গেছে, ব্যাবসার খারাপ অবস্থা দেখে আপনার মনের অবস্থা এখন খুবই খারাপ।

এবার চিন্তা করে দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এখন প্রমোদ তরীতে রাতভর মজে থাকেন তাহলেও অন্য রাজারা সে খবর পাবে। আর তখন তারা সঠিক চিন্তা করতে পারবে না। এজন্যই আমি ধন্দে কথাটা ব্যবহার করেছি। তারা চিন্তা করবে, কী হলো রে বাবা, যে রাজার এত সর্বনাশ হয়ে গেছে সেই রাজা কেন আমোদে মেতে থাকবেন? তাহলে তাদের মাথায় আপনার বর্তমান চিন্তা এবং পদক্ষেপের ভাবনা আসবে না। এটা এক ধরনের ধোঁকা বলতে পারেন। এসব চাল রাজনীতিতে হরহামেশাই দিতে হয়।'

সাতকর্ণী বুঝতে পারলেন। মুচকি হাসলেন তিনি, 'আপনি ধর্মশাস্ত্র না পড়লেও রাজনীতির পাঠ যে পড়েছেন সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'না মহারাজ, আমি ধর্মশাস্ত্রও পড়েছি। সেখানে অতি সুকৌশলে রাজনীতির পাঠও শেখানো হয়েছে। আমি শুধু সেই অংশটুকুই মেনে চলি।'

সাতকর্ণী হাসিমুখে প্রমোদ তরীতে উঠলেন। সবাই সাথে সাথে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানালো।

উনি নিজের আসনে বসার পর অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমেই করা হলো নৃত্যের মাধ্যমে রাজ আরতি। তারপর চন্দ্ররাগে চন্দ্রকলা নৃত্যে বেজে উঠলো ঝুমুর। আস্তে আস্তে মহারাজ সাতকর্ণী ডুবে গেলেন সেই ঝুমুরের তালে।

রাত্রির শেষ প্রহরে সাতকর্ণী উঠে দাঁড়ালেন। এবার প্রাসাদে ফিরতে হবে।

গিরিধারীও মহারাজের সাথে প্রাসাদে গেলেন। মহারানি নয়নিকার সাথে দীর্ঘ এক মাসের বিচ্ছেদ চলছে মহারাজের। গিরিধারী বেশ বুঝতে পারছেন সেই কারণেও মহারাজ একটু মনঃকষ্টে আছেন। শৌর্য আর বীর্যময় যোদ্ধার দুটোই মনোরঞ্জন। এক, যুদ্ধ আর দুইয়ে আছে বিহার। মহারাজের বিহারের কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়াও আজকের এই আয়োজনের একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মরেছে। মহারাজের শত্রুদের কাছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভুল সংবাদ পৌঁছে যাবে। আর মহারাজের মতিগতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, তার চিত্ত একটু হলেও স্থির হয়েছে। মহারাজের চরিত্র নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজারা এদিকে একটু চরিত্রহীন হলেও দোষের কিছু নেই। তবে এই ক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্র সম্পূর্ণ মেনে চলেন। উপপত্নী আর সেবাদাসীদের একান্ত সেবা নিতে মহারাজ সাতকর্ণী একেবারেই অনিচ্ছুক।

অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন মহারাজ। গিরিধারীও আছেন তার পেছনে।

মহারাজ শয্যায় বসলেন, 'রাত্রি তো প্রায় শেষ হতে চললো গিরিধারী। আপনার তো এখন অথিতিশালায় যাওয়া উচিত।'

'তা তো যাবোই মহারাজ। আমি বেদজ্ঞ এবং বেদের ঠিকমতো পালন না করা ব্রাহ্মণ হলেও কিছু নিয়মকানুন আমাকেও মানতে হয়। বেদে আছে, কোনো ব্রাহ্মণ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় যদি সূর্য উদিত হয় অথবা অস্ত যায় তবে সেই ব্রাহ্মণ মহাপাতক হবে। আর এখন ঘুমালে আমাকে শয্যায় রেখেই সূর্যদেব উদিত হবেন। তাই আমি ভেবে দেখলাম এখন ঘুমানো উচিত হবে না। একেবারে সূর্য নমস্কার সেরে সকালে ঘুমাবো। তবে আপনার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।'

'আমিও এখন ঘুমাবো না গিরিধারী। আপনার যেমন শাস্ত্রের নিয়ম আছে, তেমনি ক্ষত্রিয়ের জন্যও শাস্ত্রের কিছু নিয়ম আছে। সূর্যোদয়ের ক্ষণে আমাকে শরীরচর্চা আর অস্ত্রবিদ্যার চর্চা করতে হবে। নয়তো ক্ষত্রিয় বীর্য হ্রাস পাবে। শাস্ত্রে এমনটাই বলে।'

'তাহলে তো ভালোই হলো মহারাজ। নৃত্যগীতে মন নির্মল হয়েছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ পরিবেশ। এমন সময় মন্ত্রণা ভালো হয়। রাজাদের কাছে ভুল সংবাদ পৌঁছানোর কাজ শেষ। এবার আমাদের সঠিক কাজটা করতে হবে। কিছু মন্ত্রণা করে ফেলি তাহলে।'

'আপনি কোন ব্যাপারে কথা বলতে চান?' ভ্রু কুঁচকে গেল সাতকর্ণীর।

'মহারাজ, এই ক্ষণে আপনার রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা কী?'

'তা তো জানোই। কম তো আর আলোচনা হলো না। আমার রাজ্য ব্যবসায় অনেক পিছিয়ে গেছে।'

'আপাতত সেই সমস্যা সমাধানের একটা পথ আমি খুঁজে পেয়েছি মহারাজ।'

'তাই নাকি? কীভাবে?'

'মহারাজ, এটা একটা আপাতত এবং অস্থায়ী সমাধান। আপনার সোপারা, কল্যাণ এবং চোল বন্দরে যে মসলা সংরক্ষণ করা আছে সেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা আমি করেছি। আপাতত লাভ তেমন একটা হবে না। তবে ব্যবসায় একেবারে ডুবে যাবার চেয়ে চালানের টাকাটা তুলে আনতে পারা উত্তম।'

উৎসুক হয়ে উঠলেন সাতকর্ণী, 'না, তা একেবারে মন্দ হয় না। কিন্তু, আপনি একবারে সব বিক্রি করলেন কী করে? বিদেশি বণিকদের সাথেও আপনার যোগাযোগ আছে নাকি?'

'না মহারাজ। বিদেশি বণিকদের সাথে কোনো কথা বলিনি। তবে আমি ভেবে দেখলাম চেরাদের মুঝিরিস বন্দরে মসলার চাহিদা অনেক। তাদের বন্দরে মসলার জোগানও মৌসুমের শেষ বলে কম। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা আমাদের মসলা তাদের মাধ্যমে বিদেশি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেবো। ওরা মাঝখান থেকে ওদের একটা লাভের ভাগ পেয়ে যাবে। কালই ওদের জাহাজ এখানে আসবে সব মসলা নিয়ে যাবার জন্য।'

'কাজটা কি ঠিক হলো? এতে তো আমাদের দৈন্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল ওরা।'

'সেটা নিশ্চিত হবার কিছু নেই মহারাজ। এটা তারা আগে থেকেই জানে। আমাদের বন্দরে যে এবার জাহাজ আসেনি তা তাদের গুপ্তচর এতদিন কি আর না জানিয়ে থেকেছে। আর প্রস্তাবটা আমি তাদেরকে দেইনি, তাদের তরফ থেকেই এসেছে।'

'আচ্ছা। কিন্তু এভাবে তো প্রতিবার চলতে পারে না। আমার বন্দরগুলোকেও তো স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। এত খরচ, এত লোকবল দিয়ে তিনটা বড়ো বন্দর চালাচ্ছি।'

'আগেই বলেছি মহারাজ এটা একটা আপাতত সমাধান। আমাদের যদি ব্যাবসা করতে হয় তাহলে ভারতের যে-কোনো একটা দিকের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে হবে। দক্ষিণ ভারতের নিয়ন্ত্রণ যদি আমরা পেয়ে যাই, তাহলে সবগুলো বন্দর সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। আবার উত্তর ভারতের রত্নভাণ্ডার আর মখমলের রাস্তার দখল যদি পাই তাতেও হবে। এখন কোনদিকের দখল আপনি নিতে চান বলুন।'

'এমনভাবে কথাটা বললেন যেন তারা আমার জন্য সব সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। আমি দূত পাঠালেই সব ডালায় সাজিয়ে আমার হাতে তুলে দেবে।'

'মহারাজ দখল নিতে পারবো কি পারবো না সেটা তো পরে দেখা যাবে। তবে চেষ্টা তো আমরা করবোই। আর চেষ্টা করার আগে আমাদের পথ স্থির করতে হবে। এখন বলুন, পথ কোনটা আপনি বাছতে চান? উত্তর নাকি দক্ষিণ?'

মহারাজ সাতকর্ণী একটু চিন্তায় পড়লেন, সিদ্ধান্ত দিলেন একটু পরে, 'মসলা তো আমরাই চাষ করি। সেটা অধিকার করে আর কী হবে। দখল যদি নিতেই হয় উত্তরের নেওয়াই উচিত। উত্তর ভারত দখল করলে রত্নের অধিকার পাওয়া যাবে। আর একই সাথে চীনাদের মখমলি কাপড়ের অধিকারও পাওয়া যাবে। তাই আমার সাধ্য থাকলে আমি অবশ্যই উত্তর ভারত দখল করতাম আগে।'

'জি মহারাজ। আমার সাথে আপনার চিন্তা হুবহু মিলে গেছে। উত্তর ভারতের পশ্চিম অংশ বিজয়েই আমাদের লাভ সবচেয়ে বেশি হয়। দক্ষিণ ভারত যদিও তিন রাজ্যে বিভক্ত তবু মনে রাখতে হবে সেই তিন রাজবংশের মুকুট কিন্তু একই জায়গা থেকে এসেছে। তারা যদিও মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে তবু কেউ যদি বাইরে থেকে আক্রমণ করে তবে তারা সবসময় একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ায়। আমাদের বিরুদ্ধেও তিন রাজার এক হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তাই উত্তর ভারত আক্রমণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

উত্তর ভারতের পশ্চিম শক রাজ্যে এখন শাসন করছেন শক রাজা নাহাপনা। আপনি তো জানেন মহারাজ শকরা ভারতীয় নয়, তারা এসেছে পশ্চিম দিক থেকে। ভিনজাতিদের এই রাজ্য সম্পর্কে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর মনোভাব ভালো নয়। এটাই আমার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। তাই যদি নাহাপনার সাথে আপনি যুদ্ধ করেন তাহলে নাহাপনার সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আর তাকে হারিয়ে দিতে পারলেই বাজিমাত।'

'তা মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছেন। কিন্তু শক জাতি কিন্তু যুদ্ধে অনেক পটু। ওদের সেনাও অনেক বিশাল। যুদ্ধে আমি ভয় পাই না। কিন্তু এখন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে আমাকে অমরাবতী আর প্রতিষ্ঠানা সহ রাজ্যের পুরো দক্ষিণ দিক অরক্ষিত রেখে যুদ্ধ করতে যেতে হবে। আপনি তো জানেন, কলিঙ্গ আমাদের পুরানো শত্রু।'

'জি মহারাজ জানি। সাতবাহন রাজবংশের প্রথম সময়ে সে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। তখন কলিঙ্গের রাজা খারবেল আপনার পূর্বপুরুষকে এক যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ পুরানো শত্রুতা কি আর এখন আছে? আমি তো জানি কলিঙ্গ এখন কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।'

'শত্রুতা কখনো পুরানো হয় না গিরিধারী। সম্পত্তি এবং শত্রুতা মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। আর একটা কথা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সম্পত্তির বাড়া-কমা থাকলেও শত্রুতা কেবল বেড়েই চলে।'

'হ্যাঁ, তাহলে কলিঙ্গের ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। আসলে ভেবে দেখলাম, পুরো ভারতের ওপরই আমাদের নজর রাখতে হবে। শুধু নাহাপনাকে নিয়ে ভাবলে হবে না। আমাদের লক্ষ্য এখানে স্থির কিন্তু সেই লক্ষ্যে যাবার জন্য শুধু এক পথে হাঁটলে হবে না, অনেকগুলো পথের দখল নিতে হবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। উত্তর পশ্চিমে যুদ্ধ করতে গিয়ে দক্ষিণ আর পুব অরক্ষিত রাখলে চলবে না। অমরাবতীতে বলদেব আছেন। তার কাছে সৈন্য থাকলে তিনি নিজেই অমরাবতীর রক্ষা করতে পারবেন। এত সরলে হবে না গিরিধারী। আরো গভীর পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের।'

'বুঝতে পেরেছি মহারাজ। আমি শতরঞ্চ বিছিয়ে বসবো আজকেই।'

'হ্যাঁ। বসুন। এখন আমি অর্ধেক সেনা নিয়ে নাহাপনাকে আক্রমণ করতে পারি। কিন্তু বিজয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

'সেটা ঠিক হবে না। বীরত্ব আর মূর্খতা এক জিনিস নয়।'

'তাহলে কী করবো?'

'আপনার একটাই কাজ করার আছে মহারাজ। বাকি সব আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আমি কী করবো?'

'সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করুন মহারাজ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দ্রুত তাদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলুন। এবং অবশ্যই তা করতে হবে খুবই গোপনে।'

১৩

পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। একমনে দেখছে বিধবার অবয়বটা। সাদা পোশাকে আবৃত দেহটা আস্তে আস্তে তার দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল। যতক্ষণ ঐ সাদা পোশাক দেখা গেল ততক্ষণ নড়লো না সে। গ্রামের সীমানায় একটা বটগাছ আছে। সেই গাছ যখন ঐ বিধবা ক্লান্ত, অবসন্ন পায়ে পেরিয়ে গেল তখন তার চেয়ে থাকার দায় ফুরালো। ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সেও।

একটু আগের ঘটনার সময়ে সংগ্রহ করে রাখা পাতাগুলো পড়ে গিয়েছিল। তবে ঘটনাস্থলে একটু খুঁজতেই সেগুলো পাওয়া গেল। কম্পিত হাতে সেগুলো কুঁড়িয়ে নিলো সে। তারপর জড়ো করে হাঁটতে শুরু করলো নিজের পর্ণ কুটিরের দিকে। একটু পরেই মহিলার সাথে গ্রামবাসীর কথা হবে। তারা আর দেরি করবে না। বুড়োর মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্য তারা এদিকে চলে আসবে। কিছুতেই তাদের চোখের সামনে পড়া চলবে না। মেয়েটা নিশ্চয়ই তার বর্ণনাও দেবে তাদের। আর তারা তাকে খুঁজবে। সরে পড়াই ভালো।

কুটিরে ফিরেই প্রথমে মুখে কিছু দিলো সে। তারপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো। ডাকাতদের সামনে দৃঢ়ভাবে চলাচল করতে হয়েছে, মনোবল দৃঢ় রেখে কথাও বলতে হয়েছে। বিধবার সাথে অনেকদূর হাঁটতে হয়েছে। এই শরীরে এত ধকল পোষায়নি।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলো সে। তারপর আস্তে আস্তে শরীর একটু স্থির হলো। কাজে লেগে পড়লো সে। পাতাগুলো আর একটা পাথর নিয়ে বসলো। ক্লান্ত হাতে পিষতে লাগলো আস্তে আস্তে। সাথে একটু জল মেশাতে পাতা থেকে ঘন আঠারস বের হতে লাগলো। সবগুলো পাতা পেষা শেষ হতেই বেশ কিছুটা রস পাওয়া গেল।

এবার সেই রস নিজের শরীরের নানা জায়গায় লাগাতে শুরু করলো। এই রসের অনেক গুণ। লাগানো শুরু হতেই শরীরে এক অদ্ভুত আরাম অনুভব করতে লাগলো সে। শরীরের পোকার কিলবিলে অনুভূতি তার এখনো হচ্ছে তবে সেই অসহ্য জ্বলুনি এখন আর অনুভব করছে না সে। এই লতার রস আগেও ব্যবহার করেছে সে। অনেকবার। তবে আজ যেন আরামের অনুভূতি একটু বেশিই।

পাতায় তৈরি শুকনো বিছানায় আবার শুয়ে পড়লো সে। আরামে চোখে জড়িয়ে আসছে ঘুম। এত প্রশান্তির আভাস নিয়ে এই এত বছরে একবারও তার চোখে ঘুম আসেনি। চোখ আপনাতেই বুজে আসছে। শরীরের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঘুমিয়ে পড়লো সে। গভীর প্রশান্তির ঘুম।

সেই ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যার একেবারে মুখে। পাখির ডাক দিনের এই সময়টায় সবচেয়ে তীব্র হয়। সেই আওয়াজেই হয়তো তার ঘুম ভেঙেছে। জঙ্গলে ঝপ করে নেমে আসছে রাতের আঁধার। পাশে রাখা পাত্র থেকে একটু জল খেয়ে নিলো সে।

ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে চলে এলো সে। সন্ধ্যের বাতাস নদী থেকে জলকণা বয়ে নিয়ে আসছে। শীতল বাতাসের সেই পরশে দেহ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। সহস্র বছরের বয়ে চলা ক্লান্তি যেন আজ একটু কম মনে হচ্ছে।

চাঁদ আকাশে ঠিক তার মাথার ওপরে আসা পর্যন্ত সে নদীর তীরেই ঠায় বসে রইলো। তারপর সময় হতেই উঠে দাঁড়ালো। এবার মন্দিরে যেতে হবে। রাতে ফুল তোলা শাস্ত্রে নিষেধ। তাই প্রতিদিন ভোরে স্নান করে যখন সে সূর্য নমস্কার সম্পন্ন করে তখনই ফুল তুলে আনে সে। সেই ফুল যাতে না শুকিয়ে যায় এজন্য জলে ভিজিয়ে রাখে। সেই ফুল পরের দিন সকাল পর্যন্ত তাজা থাকে, বাসী হয় না। সেই ফুলই রাতে ব্যবহার করে সে।

ফুলগুলো জড়ো করে সোহিনী দুর্গের দিকে রওনা দিলো সে। রাতের পথচলা আর সোহিনী দুর্গের ফটকে ধরা পড়ার ভয় তার নেই। এমনিতেও খুব বেশি থাকে না, তবে আজ যেন ভয়ের অনুভূতি তার অন্তর থেকে বহু দূরে পালিয়ে গেছে।

আজ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। দেবাদিদেবের সামনে সে আর আজ দুরুদুরু বুকে দাঁড়াবে না। আজ সে আর কোনো অভিযোগ অনুযোগ করবে না। শুধু পূজা করবে, ভক্তি ঢেলে দেবে অন্তর থেকে।

সোহিনী দুর্গে ঢোকার অনেক পথ জানা আছে তার। আয়তনের তুলনায় এই পরিত্যক্ত দুর্গে খুব বেশি মানুষ থাকে না। বেশ নীরবেই ঢুকে পড়লো সে। তারপর সহজেই প্রতিদিনের মতো ঢুকে পড়লো মন্দিরে।

শিবলিঙ্গের সামনে বজ্রাসনে দাঁড়ালো সে। একমনে জপ করতে লাগলো শিব স্তুতি। কোন তাড়াহুড়া নেই তার। আজ আর স্মৃতি থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হচ্ছে না তাকে। যেন আপনাআপনিই দেবতার প্রশংসা বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে। স্তুতি শেষে ফুল আর চন্দন মাখা বেলপাতা হাতে নিলো সে। মন্দিরের ভেতরে পূজারীর ব্যবহৃত চন্দন আছে। সেখান থেকেই খানিকটা নিয়ে বেলপাতার গায়ে ফোঁটা দিয়েছে সে।

অঞ্জলিতে ফুল আর বেলপাতা নিয়ে হাঁটু মুড়ে শিবলিঙ্গের সামনে বসেছে সে। তারপর আধবোজা চোখে অঞ্জলি মন্ত্রটা উচ্চারণ করলো। তারপর দেবতাকে উদ্দেশ্য করে মনের কথা খুলে বললো, 'প্রভু। আজ আর আমি তোমার কাছে কিছুই চাইবো না। তুমি আমার অঞ্জলি গ্রহণ না করলে আমি আর কষ্ট পাবো না। আমি এই ঈশ্বরের অভিশাপকে আশীর্বাদ মেনে নিয়ে বেঁচে থাকা শিখে গেছি। এই অমর অভিশপ্ত জীবন আমি এভাবেই কাটিয়ে দিতে পারবো। আজ আমি যে প্রশান্তি হৃদয়ে অনুভব করেছি, তার কোন তুলনা নেই, সেই প্রশান্তির উৎস একজনই হতে পারেন। পরমেশ্বর। আমি এতদিন ঈশ্বরের অভিশাপ নিয়ে তোমার কাছে অনেক অভিযোগ করেছি, আজ আমি তোমার কাছে সন্তুষ্টি স্বীকার করছি। আমার অন্তরকে এই প্রশান্তির অনুভব করানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞ প্রভু।'

কথাগুলো শেষ করে হাতের অঞ্জলি শিবলিঙ্গের সামনে রাখতে গেল সে। তখনই আলোর ঝলকানিতে যেন ভরে গেল মন্দিরের ভেতরটা। চোখ প্রায় ঝলসে গেল তার। অপার্থিব দৈব সে আলো। দেখতে দেখতে সেই আলোর ঝলকানি পুরো মন্দির থেকে একটা গোলকে এসে জড়ো হলো। আলোর ঝলকানি একটু কমতেই চোখ মেললো সে।

পিটপিট করে তাকালো আলোর গোলকের দিকে। যদিও আলোর তীব্রতা কমেছে তবু সেই আলোর গোলকের দিকে ভালো করে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে তার। শিবলিঙ্গের ঠিক ওপরেই গঠিত হয়েছে সে আলোর গোলক।

তখনো তার হাতের অঞ্জলিতে ফুল বেলপাতা রাখা। একেবারে থমকে গেছে সে। অনেকদিন পড়ে চোখের সামনে দৈব ঘটনার সাক্ষী হয়ে পুরো শরীর যেন পাথর হয়ে গেছে তার। প্রথমে ভয়ের অনুভূতি হলো, তবে সে অনুভূতি ছিল খুবই অল্প সময়ের জন্য।

আচমকা দমকা বাতাসের ঘূর্ণি উঠলো ঘরে। এই দমকা ঘূর্ণি তার চেনা। প্রতিবার অঞ্জলি দেওয়ার পর এভাবেই ঘূর্ণি সৃষ্টি হয় মন্দিরে। আজ অঞ্জলি তার হাতেই আছে। অঞ্জলি না দিতেই আজ বাতাসের ঘূর্ণি তৈরি হয়ে গেছে।

সেই ঘূর্ণি তার হাতে আছড়ে পড়লো। তারপর হাতের ফুল আর বেলপাতা হাত থেকেই উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই অলৌকিক ঘূর্ণি বাতাস শূন্যে থাকা অবস্থাতেই ফুল আর বেলপাতা এক জায়গায় করে ফেললো। আর বাতাসের ঝাপটায় সেই অঞ্জলি গিয়ে পড়লো একেবারে শিবলিঙ্গের গোঁড়ায়।

চোখ এতক্ষণে পুরোপুরি খুলে গেল তার। আর চোখ ঝলসানো আলোর পরোয়া করলো না সে। যে বাতাস সবসময় শিবলিঙ্গের সামনে থেকে ফুল উড়িয়ে দূরে ফেলে আজ সেই বাতাসের ঘূর্ণিই তার হাত থেকে অঞ্জলি উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে দেবতার পায়ে।

আচমকা চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল তার। তবে কি ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অবিশ্বাসী চোখে আবার হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো সে, 'প্রভু, আপনি কি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? অবশেষে আজ গ্রহণ করেছেন আমার অঞ্জলি।' তার স্বরে আর কোনো কথা জোগালো না। লুটিয়ে পড়লো তার দেহ। সাথে সাথে কপাল ঠেকলো মাটিতে।

তখনই সেই আলোর গোলক থেকে বেরিয়ে এলো দৈব স্বর। প্রতিধ্বনি উঠলো মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে, 'হ্যাঁ। আজ আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি। আজই তোমার আর্তস্বর প্রথমবার আমার কাছে এসে পৌছেছে। আর জানো, কেন আজ আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি?'

কোনো কথা জোগায় না তার মুখে। সেই গোলক থেকে স্বর বেরিয়ে আসছে,

'কারণ আজ তুমি কোনো প্রার্থনাই করোনি। আমি তখনই কারো প্রার্থনা শুনি, যখন সে আমার কাছে কোনো প্রার্থনা করে না, কোনো কিছু চায় না, শুধু আমার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে। তাই আমি আজকে তোমার অঞ্জলি গ্রহণ করলাম। আজ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করবো। তুমি বলো, কী চাও তুমি?'

মাটিতে ঠেকানো কপাল তুললো সে, 'প্রভু, আমার জীবন আজ ধন্য। আমি ভুলিনি প্রভু, তোমার প্রসাদ ব্যবহার করে একদিন আমি মহাপাপ করেছিলাম, আজ আবার সেই তোমার আশীর্বাদেই আমি মহাপাপ থেকে মুক্ত হবো প্রভু। আমায় দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও।'

গোলকের রূপ ভেঙ্গে আলো আবার ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমশ তা রূপ নিলো অন্য এক রূপে। গলায় সর্পমালা আর হাতে ডমরু বাঁধা ত্রিশূল হাতে তার সামনে দাঁড়ালেন স্বয়ং আশুতোষ।

জোড়হাত এবার ভক্তের কপালে গিয়ে ঠেকলো, 'তোমার কাছে কিছু চাইবার ভুল আমি করবো না প্রভু। তুমি ত্রিকালজ্ঞ। তুমি জানো কীসে আমার মঙ্গল আর কীসে ক্ষতি। তোমার দেখা পাবার জন্য আমি এই তিন হাজার বছর ধরে একাহার ব্রত পালন করেছি। প্রতিদিন তোমার পূজা করেছি। তোমার কাছে মুখ ফুটে কিছু চাওয়া মানে ধৃষ্টতা। এই সত্য আমি আজ বুঝতে পেরেছি। আজ তাই অন্তর থেকে চুরি করে তোমার কাছে আমার কোনো বাসনা নেই। এতদিন ভুল ভাবে আমি তোমার পূজা করেছি।'

আশুতোষ মুখ খুললেন। ভরাট সে স্বর, কিন্তু কী মধুর, 'হ্যাঁ, এতদিন ভুলভাবে তুমি আমার পূজা করেছো। আমি শুধু একটা বেলপাতায় তুষ্ট হই। তবে গোপন কথা হচ্ছে, এত কমে আমাকে পাওয়া যায় না। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সঁপে না দিলে আমাকে কেন পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। ভক্ত যখন আমার উপাসনা করে তখন আমি খুব উদগ্রীব থাকি। দেখা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। কবে ভক্ত সঠিক উপায়ে আমাকে ডাকবে, আর আমি সাড়া দেবো। কিন্তু ব্যাপার কী জানো, খুব কম লোকেই উপাসনার গূঢ় তত্ত্ব বোঝে। বেশির ভাগের কাছেই পরমার্থ অধরাই থেকে যায়।'

'প্রভু, আজ যে প্রশান্তি আমি অনুভব করেছিলাম তা এখন যেন পূর্ণতা পেলো। আজ আমার ভাগ্যে তোমার কৃপা লেখা ছিল। তাই মনে হয় সকাল থেকেই আগাম প্রশান্তি টের পেয়ে গেছিল আমার মন।'

'না বৎস। তুমি আমার অনুগ্রহ পাবে বলে তোমার মনে প্রশান্তি অনুভব করোনি। মানুষ পরম শান্তির সন্ধান ততক্ষণ পায় না, যতক্ষণ তার কর্মের বন্ধন মুক্ত না হয়। কর্মফল যতক্ষণ অদৃষ্টে থাকবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। চিন্তা করো আজকের সকালের কথা। তিন হাজার বছর আগে তুমি যে পাপ করেছিলে, যে পাপের ফলে তুমি আজকের এই জীবন পেয়েছ, সেই পাপের কথা একবার মনে করো। সেই ভ্রূণের প্রাণ সংহার করেছিলে তুমি। আজ সকালে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তুমি একজনকে বাঁচাওনি। দুজনকে বাঁচিয়েছ। ঐ মায়ের পেটেও একটা ভ্রূণ ছিল। তোমার প্রায়শ্চিত হয়েছে। আর সে কারণেই তোমার মনে এই প্রশান্তি।'

'আমাকে করুণা করো প্রভু। কৃপা করো আমাকে।'

'আমি তোমাকে অভিশাপ মুক্ত করবো। তোমার অভিশাপের কাল শেষ হয়েছে।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টি তার চোখে, 'তোমার কথায় অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না প্রভু। কিন্তু আমার এই অভিশাপ তো অমোঘ। সময়ের শেষ পর্যন্ত আমাকে এই অভিশাপ কাঁধে বয়ে বেড়াতে হবে। স্বয়ং ঈশ্বর এই অভিশাপ দিয়েছেন আমাকে। তোমার অজানা তো কিছুই নেই। কালের অন্ত পর্যন্ত আমাকে এই ক্ষত নিয়ে, রোগযন্ত্রণা নিয়ে, অশক্ত শরীর নিয়ে কাটাতে হবে। আমি বন্ধুহীন থাকবো, আমার কোনো আশ্রয় থাকবে না, এই অসহ্য অবস্থা নিয়েই আমাকে অমর জীবন কাটাতে হবে। এটাই আমার অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে আমি মুক্ত কী করে হবো?'

দেবাদিদেবের মুখ স্মিত, 'হ্যাঁ, কালের অন্ত পর্যন্ত তোমার এই অভিশাপ থাকবে। কিন্তু, তুমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারোনি, যে তোমাকে এই অভিশাপ দিয়েছেন তিনি

করুণার সাগর। তার কাছে সব পাপীরই উদ্ধার পাবার উপায় থাকে। তিনি সেই উপায় তোমার অভিশাপের সাথেই দিয়ে দিয়েছেন। তার এক কথার অনেক মানে থাকে। কেউ সেই কথা থেকে ভক্তি নেয়, কেউ নেয় জ্ঞান আবার কেউ নেয় বহুরূপ কর্ম। উপায় পৃথিবীতে সবকিছুরই থাকে।'

সে কিছুই বুঝতে পারছে না। অজ্ঞানতা দূর হচ্ছে না পুরোপুরি। মাথা নাড়লো সে, 'প্রভু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ। যতদিন তুমি নিজের স্বরূপ না বুঝবে, তোমার লক্ষ্য না বুঝবে, ততদিন তুমি তোমার মুক্তির উপায় খুঁজে পাবে না।'

'কিন্তু প্রভু, তিনি আমাকে বলেছিলেন, সময়ের অন্ত পর্যন্ত আমি এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারবো না। সময়ের তো এখনো অন্ত হয়নি প্রভু।'

মহাযোগীর চোখে কৌতুক, 'তুমি কি কথাটার মানে বুঝতে পেরেছ? তুমি কি জানো সময় মানে কী? কাল মানেই বা কী?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো সে। সত্যিই তো, এই কথার উত্তর তো তার জানা নেই। সে আসলেই কালের অথবা সময়ের স্বরূপ জানে না।

'জানি না প্রভু। তুমি মহাকাল। কাল ধ্বংসকারিণী মহাকালীর অধীশ্বর। তুমিই বলে দাও প্রভু, সময় মানে কী।'

'শোনো, সময়ের অন্ত অথবা শুরু বলতে আসলেই কি কিছু আছে? যে বস্তু অন্তহীন তার অন্ত কীভাবে খুঁজে পাবে কেউ? সময়ের তো অন্তই নেই। আর সেই সর্বজ্ঞ আদিশ্বর তোমাকে সময়ের অন্ত পর্যন্ত অভিশাপ কী করে দিলেন? করেছো কখনো নিজেকে এই প্রশ্নগুলো? করোনি। করলে বহু আগেই নিজের মুক্তির রাস্তা পেয়ে যেতে।'

'আমি জানি না প্রভু। সত্যিই তো। কালের শুরু বা শেষ তো নেই। কালের শুরু মানে তোমার শুরু, কালের শেষ মানে তোমার শেষ। আর তুমি যেহেতু অনন্ত, তাই কালও অনন্ত।'

'তার মানে এই অনন্ত কালের অভিশাপ তোমাকে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে এমন কালের যার আসলেই অন্ত আছে।'

আবার হাতজোড় করলো সে।

'শোনো। আমি মহাকাল। ভালো করে ভেবে দেখো, প্রতি নিমেষে আমিই কি কালের অন্ত করছি না। এই যে পলক পেরিয়ে গেল আমিই কি এই পলকের অন্ত করিনি। কালের অন্ত পর্যন্ত তোমার এই অভিশাপ আমি মহাকালই হরণ করতে পারি। তোমার অভিশাপের কালের অন্তও আমি করবো।'

হাতজোড় করে মাথা নিচু করে বসে রইলো সে। মহাদেব কাল ধ্বংস করার জন্য ত্রিনেত্র উন্মোচন করলেন। বেরিয়ে এলো দৈব অপার্থিব মহারশ্মি। সে রশ্মি সামনে হাতজোড় করে বসে থাকা ভক্তের আপাদমস্তক বেষ্টন করলো। আস্তে আস্তে তার কপালের ঠিক মধ্যভাগের ক্ষতটা শুকিয়ে গেল। তিন হাজার বছর ধরে যে ক্ষত থেকে কখনোই রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি, তা বন্ধ হলো। পুরো দেহে কিলবিল করতে থাকা পোকারা আস্তে আস্তে দেহের মধ্যে মিলিয়ে যেতে শুরু করলো। তার দেহে মাংসের ওপর আবার দেখা দিতে শুরু করলো চামড়া। টানটান। শরীরের অশক্ত ভাব কেটে যেতে লাগলো তার। দেখতে দেখতে অশীতিপর বৃদ্ধ হয়ে উঠলো যুবা পুরুষ।

'আজ থেকে তুমি নবজীবন পেলে। এই জীবনে তুমি মোক্ষের সন্ধান পাবে এই কামনা করি। এই জীবনে তুমি আগের নাম নিয়ে চলতে পারবে না। তোমার নতুন নাম হবে রুদ্রদেব। তুমি আজ থেকে মানব সামজে বাস করার অধিকারী হলে। সবকিছু নতুন হলেও ধর্মের শক্তি কিন্তু এখনো পুরানোই আছে। মনে রাখবে, ধর্ম কেবল দুটো গুণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। ধৈর্য আর করুণা। এই কথা কখনো ভুলবে না। এই দুই গুণের ত্যাগ জীবনের কোন অবস্থাতেই করবে না।'

'আজ্ঞে প্রভু। আমি তোমার এই কথা জন্ম জন্মান্তরে মনে রাখবো।'

'রুদ্রদেব, তোমাকে এবার নতুন পৃথিবীতে নতুন করে পথ চলতে হবে। তিন হাজার বছর আগের পৃথিবীর সাথে এই পৃথিবীর তেমন কোনো মিল নেই। তোমাকে নানা নিয়ম শেখাবার জন্য এখন আর কোন মহাগুরুর সন্ধান পাবে না। তিন হাজার বছর আগের সেসব শিক্ষা দিয়েই তোমাকে পথ চলতে হবে। কলি শুরু হয়েছিল আগে, এখন আস্তে আস্তে শক্তিশালী হচ্ছে। এখন এই পৃথিবীতে নানা ধর্ম সংহারক ঘটনা ঘটবে। এই নতুন পৃথিবীতে ধর্মই হয়ে উঠবে ধর্মের প্রধান শত্রু।'

শেষের বাক্যটা ভালো করে বুঝতে পারলো না রুদ্রদেব, 'প্রভু, ধর্ম তো সবসময় অধর্মের শত্রু। অধার্মিকের পথের প্রধান বাঁধা। সে ধর্মের শত্রু কী করে হবে?'

মহাদেব স্মিত হাসলেন, 'শোনো, চারযুগের মধ্যে কলি নিকৃষ্ট। তবে সেই যুগধর্মে সবচেয়ে শক্তিশালী। আর কলির এটাই ধর্ম। এই যুগে ধর্ম ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। ধার্মিক দাঁড়াবেন ধার্মিকের বিরুদ্ধে। সবই হবে কলির প্ররোচনায়।'

'কীভাবে প্রভু?'

'তোমাকে আমি ধর্মের গুপ্ত তত্ত্ব বলছি। মন দিয়ে শোনো। বহু আগে তুমি গুরুর কাছে শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলে। তোমার হয়তো এখনো সেই শিক্ষার কিছু মনে আছে।'

'কিছু আছে মনে হয়।'

'তাহলে বলো, সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা সৃষ্টির বিকাশের জন্য কয়জন মনু সৃষ্টি করেছিলেন?'

'আমার মনে আছে প্রভু। প্রভু ব্রহ্মা সাতজন বিবস্বত মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন।'

'কখনো কি ভেবেছিলে, কেন ব্রহ্মা সাতজন মনু সৃষ্টি করলেন? একজন মনুই কি যথেষ্ট ছিল না। একজনই তো ব্রহ্মার বিধান এই সৃষ্টিতে নিয়ে আসতে পারতেন। জীবন সংহিতা সৃষ্টি করতে পারতেন। তাহলে কেন তিনি সাতজনকে সৃষ্টি করলেন?'

'হ্যাঁ প্রভু। একজন মনুই তো আমাদের জীবন এবং বর্ণ বিধান সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রজাপতির সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টির নিয়মের প্রতিবিধান করেছেন। মায়া, বুদ্ধি, স্থিতি, শক্তির বন্টন করেছেন, চার জাতি সৃষ্টি করেছেন, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার বর্গ ভাগ করেছেন। কিন্তু বাকি ছয়জন মনুর কোনো কর্মের ব্যাখ্যা তো শাস্ত্রে নেই। কেন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল? আমি তো কোনো তল খুঁজে পাচ্ছি না।'

'রুদ্রদেব, নতুন রহস্য জানো। নিজেকে প্রস্তুত করো। ধর্মের এই তত্ত্ব কোনো শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এখন পৃথিবীতে এই তত্ত্ব উন্মোচনের সময় এসেছে। তোমার মাধ্যমেই এই জ্ঞান মানবের মাঝে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি আমি।

ব্রহ্মা সৃষ্টির একেবারে আদিতে এই পৃথিবীকে সাতটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তারপর সেই সাতটি ভাগে সাত ধর্ম প্রকরণ সৃষ্টি করার জন্য সাত জন

বিশেষ মনুর সৃষ্টি করলেন। সেই সাতজনের একেকজন যার যার ভাগের জন্য একেবারে উপযুক্ত ছিলেন। এই ভাগে যে মনু দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি এই ভাগের সবকিছু সৃষ্টি করেন। তিনি এই আর্যাবর্তের দেবতামন্ডল সৃষ্টি করেন। প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেন, নিয়ম আর সবশেষে ধর্ম বিধান সৃষ্টি করেছিলেন। সেগুলোই তুমি অথবা তোমরা জানো।

বাকি ছয় জন মনু তাদের জন্য ঠিক করে রাখা ছয় ভূভাগে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সেই ছয় ভাগের ভৌগলিক আর আভ্যন্তরীণ চরিত্র অনুযায়ী সেই ছয়জন মনু ছয়টি আলাদা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। সেসব ধর্মের দিক, নিয়ম, দেবতা, শাস্ত্র সবই এই দিকের থেকে আলাদা। এখন কলিতে সেই সাত মনুর সাত ভাগের মধ্যে যোগাযোগ হবে। আর সেই যোগাযোগের ফলে তাদের নিয়মের মধ্যে সংঘর্ষ হবে। আর এভাবেই ধর্ম দাঁড়াবে ধর্মের বিপক্ষে। সত্য মুখোমুখি হবে সত্যের।'

রুদ্রদেব পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে, 'তাহলে তো দেবাদিদেব, প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে পুরো পৃথিবী জুড়ে।'

মহাদেবের সদা শান্ত মুখে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, 'কলির ধর্মই তো বিশৃঙ্খলা। কলি এক হাতে বিশৃঙ্খলা আর আরেক হাতে অতৃপ্তি নিয়েই পথ চলে। আর এই কলির মধ্যে চলতে হলে তোমাকেও এসব সামলে নিয়েই চলতে হবে। মনে রাখবে, সাতজন মনু, তাদের তৈরি বিধান, নিয়ম, শাস্ত্র, দেবতাসকল, স্বর্গ, নরক সবই নশ্বর। শুধু পরম ব্রহ্ম অমর। আর আমরা ত্রিদেব আর মহামায়া পুরুষ আর প্রকৃতি হয়ে সেই ব্রহ্মের সাকার রূপ ধরে এই সমগ্র সৃষ্টি ধারণ করি।

দেবতা, দানব, মানবে পার্থক্য কেবল স্বভাবে। এটাও মনে রাখবে। ন্যায়ের বিপক্ষে গেলে দেবতা অসুর হয়ে যায়, ধর্মের বিপক্ষে গেলে পূজারীও হয়ে যায় চণ্ডাল। তাই তোমায় বলছি এই ঘোর কলি থেকে বেঁচে থাকার একটাই উপায়।'

'বলুন প্রভু, কৃপা করে বলুন, কী সেই উপায়? কীভাবে আমি এই ভয়াল কলি থেকে বেঁচে থাকবো?'

'আগেই তো বলেছি। দুটোই উপায়। ধৈর্য আর করুণা। করুণা থেকেই জন্ম নেবে ন্যায়। যদি তুমি ন্যায়ের পক্ষে থাকো তাহলে সব শাস্ত্র আর দেবতারা তোমার বিরুদ্ধে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তুমিই জয়ী হবে। তবে কলিতে শুধু সাহস দিয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করা যাবে না। ক্ষত্রিয়কে চতুর হতে হবে। জায়গাভেদে ছলনা করতে হবে, কূটনীতিতে হতে হবে কুটিল। তোমার তো শুনে মনে হচ্ছে, এসব তো মহাপাতকের লক্ষণ, তাই না? না, রুদ্রদেব। তিন ভাগ অসত্যের বিরুদ্ধে এক ভাগ সত্যের লড়াই কখনোই সম লড়াই হবে না।'

'তাহলে কি ধর্মচ্যুত হবো না আমি প্রভু?'

'না, তুমি যদি ধর্মের হিতকল্পে অধর্মাচরণ করো, সত্যের হিতকল্পে অসত্যকে প্রশ্রয় দাও, নবজীবনের জন্য স্বীকার করে নাও মৃত্যুকে, নবসৃষ্টির জন্য পুরানোকে ধ্বংস করো, তাহলে ধর্মচ্যুত হবে না তুমি।'

এই কথাগুলো রুদ্রদেবের পরিচিত। আগেও সে শুনেছে এসব কথা।

'শোনো, তোমার কর্মের দ্বারা তুমি কখনোই পাপবিদ্ধ হবে না। পাপ নির্ভর করে সেই পাপ তুমি কেন করলে সেই উদ্দেশ্যের ওপর। সেই উদ্দেশ্যের ওপরই নির্ভর

করবে তোমার কর্মফল। এটাই কলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিয়ম। সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। মনে রেখো সব সময়।'

'প্রভু, আমি তোমার আশীর্বাদ চাই শুধু।'

'তাই হবে। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। আমি এখন চলে যাবো। তবে যাবার আগে তোমাকে বর দিতে চাই। প্রার্থনা করো।'

'প্রভু, আমার দেহমনের অভিশাপ দূর করেছো তুমি। এরচেয়ে বড়ো বর আমার জন্য আর কিছুই তো হতে পারে না।'

'না, রুদ্রদেব। সেটা আমার আশীর্বাদ ছিল। বর না। তুমি নিজের কর্ম দ্বারাই সেই ফল অর্জন করে নিয়েছো। আমি তোমাকে বর দিতে চাই। চাও।'

'প্রভু, তাহলে আপনি অর্জুনকে যে মহাস্ত্র দান করেছিলেন, সেই পাশুপত আমাকে দান করুন।'

'বাহ, তুমি ব্রাহ্মণ হলে কী হবে, অভ্যাস আর শিক্ষা গুণে তুমি তো হয়েছ ক্ষত্রিয়। সেই রূপ দেখা যায় জেগে উঠেছে। তথাস্তু। আমি তোমাকে পাশুপত অস্ত্র দান করলাম। তবে সেই অস্ত্র তুমি এখন ব্যবহার করতে পারবে না। তোমার শরীরের এখনো সেই যোগ্যতা হয়নি। তবে আমি জানি, তুমি সেই ক্ষমতা ফিরে পাবে। তোমার গুরু ছিলেন স্বয়ং পরশুরামের শিষ্য। যাকে আমি স্বয়ং যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছি। সেই শিক্ষা বিলুপ্ত হতে পারে না। যেদিন তোমার দেহ আবার পূর্ণ শক্তি ফিরে পাবে, সেদিন তুমি আবার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে।'

'সবই আপনার কৃপা প্রভু।'

'তবে তোমার আগের জীবনের কথা মনে রেখো। সেই ভুল আর করো না। দিব্যাস্ত্র কখনোই দিব্যাস্ত্রের জ্ঞানহীন কোন যোদ্ধার ওপর প্রয়োগ করা যায় না।'

'হ্যাঁ প্রভু, আমি মনে রাখবো।'

'যে ভুল একদিন করেছিলে রুদ্রদেব তা আর কোরো না। কক্ষনো না। তাহলে পরিণতি আরো খারাপ হবে।'

মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ালো। তার মাথায় নতুন জ্ঞানের আশীর্বাদ। নতুন জীবনের চেতনা। কাল সকালে সে নির্বাসন থেকে ফিরে যাবে মানব সমাজে।

১৪

ঝট করে পেছনে ফিরলেন ক্রেয়ন। স্বরটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকালেন। অন্ধকারের ভেতর অবয়ব চোখে পড়লেও মানুষটাকে চেনা গেল না। ভালো করে দেখার সময়ও পাওয়া গেল না। সামনের দিকে নজর দিতে হলো। যে সৈন্যকে মারার জন্য তিনি পা টিপে টিপে এগোচ্ছিলেন সেও সেই স্বর শুনে পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। আর তাকাতেই তার পেছনে খোলা তলোয়ার হাতে উদ্যত ক্রেয়নকে দেখে ফেলেছে।

প্রহরী যা বোঝার বুঝে নিলো। সাথে সাথে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো ক্রেয়নকে। তবে সে বুঝতে পারেনি ক্রেয়ন কোনো সাধারণ সেনা নন। তিনি স্পার্টার গৌরব এক গোপন সেনাবাহিনীর অতি যত্নে শিক্ষিত এক দক্ষ সৈনিক। চমকের ঘোর কাটিয়ে সে আঘাত এড়ালেন তিনি। সেই সাথে হাতের খোলা তলোয়ারের ধারালো ফলা বসিয়ে দিলেন প্রহরীর বুকে।

অন্ধকারের ভেতর থেকে অবয়বটা এবার বেরিয়ে এলো আলোতে, 'বাহ, আপনার সাথে বণিক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতেই হচ্ছে, আপনি যোদ্ধা হিসেবে অসাধারণ। এত দ্রুত তলোয়ার চালালেন। এরা আমার খাস প্রহরী। বেশ কুশলী যোদ্ধা। কিন্তু আপনার সামনে তো দাঁড়াতেই পারলো না।'

এবার আলোতে বেরিয়ে আসা অন্ধকারের অবয়বটা চিনতে পারলেন। স্বয়ং মহারাজ নাহাপনা। যদিও কথার এক বর্ণও বুঝতে পারলেন না। তবে এটুকু বোঝা গেল, বিপদ বেশ ভালোভাবেই এসেছে। তিনি ধরা পড়ে গেছেন। এখনই আঘাত করতে হবে। তিনি সবাইকে পালানোর সংকেত দিলেন চিৎকার করে। এই সংকেত তার যোদ্ধাদের কানে যাওয়া মাত্র তারা গুপ্ত ঘাতক থেকে হয়ে যাবে সম্মুখ যোদ্ধা। ক্রিপ্টেয়ারের বিশজন সৈনিক একটা সেনাবাহিনীর সমান। লড়াই করার ক্ষমতায় এরা অতুলনীয়। একটু পরেই তাণ্ডব নেমে আসবে এই নগরে। জান্তব চিৎকারে কেঁপে উঠবে এই রাজভবন। এখনই শুরু হবে মৃত্যুর উৎসব।

তবে তিনি যেমন আশা করেছিলেন তেমন কিছুই ঘটলো না। চারদিক থেকে সেই বিশজন সৈন্য এসে রাজভবনের সামনে জমা হলো। তাদেরকে চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে প্রায় দুইশো জন সুসজ্জিত সৈন্য।

নাহাপনা তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, 'মহাবীর ক্রেয়ন, আপনার লোকেরা এখন আমার বন্দি। রাজধর্ম অনুযায়ী যে আইন আছে তাতে রাজার ওপর গুপ্ত আক্রমণকারীদের একটাই শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড। সেই বিধানে আপনি এবং আপনার সেনারা কেউই জীবিত ফিরে যেতে পারবেন না।'

ক্রেয়নের সৈন্যরা শত্রু বেষ্টিত হয়ে আছে। এক জনের বিপরীতে দশ জন। এই সময় সাহসিকতা দেখানোর মানে আত্মহত্যা। তবু তারা নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। তারা সর্বদা জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত।

তাদের হাবভাব বুঝতে পারলেন মহারাজ নাহাপনা, 'আপনার সেনারা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আদেশ দেওয়ার আগে একটা কথা ভালো করে শুনে নিন। আপনারা এই রাজভবনের সামনে সর্প ব্যূহে আটকে গেছেন। সাপের কুণ্ডলীর মতো নানা স্তরে আমার সৈন্যরা আপনাদের ঘিরে আছে। আর তার মধ্যে এক স্তর তিরন্দাজদের। আমি আদেশ দিলেই তারা তীর ছুঁড়ে আপনাদের ছিন্নভিন্ন করে দেবে। আপনাদের হাতে কোন ঢাল নেই, বাঁচারও কোন উপায় নেই।'

ক্রেয়ন এবারো এক বর্ণও বুঝতে পারলেন না। এবার নাহাপনা সমস্যা বুঝতে পারলেন। আরে এই ব্যাটা তো তার কথা বুঝতেই পারছে না।

আশেপাশের সৈনিকদের দিকে তাকালেন তিনি। না, এরা কেউ সেই ভিনদেশের ভাষা জানে না। দোভাষী ডাকতে হবে। নাহাপনা হাসলেন, 'কথা বলে তো লাভ নেই। আপনি তো আমার কোনো কথাই বুঝতে পারছেন না। আপনার দোভাষীকে তো আর এখন জাহাজ থেকে আনা যাবে না। এখন আপাতত আমার দোভাষীকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। কই, একবার সামনের দিকে আসো।'

নাহাপনার সৈন্যদের প্রথম স্তরটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। তাদের পেছন থেকে এগিয়ে এলেন একজন সৈনিক। পরনে যুদ্ধসাজ, তবে তা নাহাপনার অন্যান্য সৈন্যদের মতো নয়। বরং তার সাজের সাথে ক্রেয়নের সাজের মিল আছে। তার চেহারা আর রঙের সাথেও ক্রেয়নের মিল আছে।

'এসো অ্যালেক। তোমার স্বদেশিকে এতক্ষণ তো অনেক কথাই বললাম। সে কিছুই বুঝতে পারেনি। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো। ঘটনার গুরুত্ব আগে বোঝা দরকার। তাহলেই এই লোক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।'

এখানে অ্যালেকের পরিচয় একটু দিয়ে দেওয়া দরকার। আলেকজান্ডার যখন খ্রিষ্টের জন্মের ৩২৫ বছর আগে হিন্দুকুশ আক্রমণ করেন, তখন পুরু রাজাকে পরাজিত করার পরেই থেমে যান তিনি। তার মৃত্যুর পর তার প্রধান সেনাপতিদের একজন সেলুকাস আলেকজান্ডারের হিন্দুকুশের বিজিত অংশে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আলেকজান্ডারের তিনটা স্থাপন করা শহরই তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এবং পরে পারস্যের ক্রমাগত আক্রমণে সেই রাজ্য ছোটো হয়ে আসতে শুরু করে। এর মধ্যেই গ্রীস থেকে অনেক মানুষ এসে বাস করতে লাগলো সেই রাজ্যে। তার নামই হয়ে যায় ইন্দো-গ্রীক রাজ্য।

ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু এই ইন্দো-গ্রীক রাজ্যের শেষ পর্যন্ত যে টুকরোটা বেঁচে ছিল তা একেবারে বিলুপ্ত করেন উত্তর শকদের রাজা মহাক্ষত্রিয় রাজুভুলা। সেটা এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা। ইন্দো-গ্রীকরা তাদের রাজ্য হারালেও বাস করার অধিকার হারালো না। তারা ভাগ হয়ে উত্তর আর পশ্চিম এই দুই শক রাজ্যে বাস করতে লাগলো। তারাও একসময় প্রায় মিশে গেল সাধারণ জনগণের সাথে।

নাহাপনা তার পশ্চিম শক রাজ্যের এই ইন্দো-গ্রীকদের ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন। তাদের দিয়ে তিনি এক বিশেষ বাহিনী তৈরি করেছেন। এই জাতির শরীর ভারতীয়দের থেকে তাগড়া। তাদের যুদ্ধ কৌশলও অন্যরকম। আর এই অ্যালেক হচ্ছে সেই বাহিনীর অধিনায়ক।

অ্যালেক নাহাপনার সব কথাই অনুবাদ করে দিলো। ক্রেয়ন পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে। অ্যালেকের চৌদ্দ পুরুষ এই মাটির। যদিও সে গ্রীক ভাষা ভোলেনি। ইন্দো-গ্রীকেরা নিজেদের যুদ্ধবিদ্যার সাথে সাথে নিজেদের ভাষা, জ্ঞান আর সংস্কৃতির চর্চা নিয়মিত করে। তবে জাতীয়তায় তাদেরকে কোনোভাবেই এখন আর গ্রীক বলা যাবে না।

ক্রেয়নের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে এরা ওদের এই গোপন হামলার কথা আগে থেকেই জানে। ঠিক যেন তৈরি হয়ে বসে আছে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? তার সেনারা ছাড়া এই কথা তো কেউ জানে না। আর তাদের মধ্যে কেউ মরে গেলেও এই কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। তাহলে রাজা নাহাপনা সবকিছু কীভাবে জানলেন?

নাহাপনা যেন মন পড়তে পারেন, 'আপনার মাথায় নিশ্চয়ই এখন প্রশ্ন ঘুরছে, আপনাদের এই আক্রমণ সম্পর্কে আমি কীভাবে জানলাম? কীভাবে আমরা আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য সর্প ব্যূহ সাজিয়ে বসে আছি?

ক্রেয়ন এবার কথা বললেন, 'হ্যাঁ। কে করেছে এই বিশ্বাসঘাতকতা?'

'কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আপনি এই চিন্তাটা বাদ দিন। কারো ফাঁস করে দেবার জন্য অপেক্ষা করি না আমরা। লক্ষণ বিচার করলেই সব টের পাওয়া যায়। আপনার ক্ষেত্রেও লক্ষণ বিচার করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

অনুবাদ করে দিচ্ছে অ্যালেক। 'কী লক্ষণ?' ক্রেয়নের স্বরে স্পষ্ট দ্বিধা।

'হ্যাঁ, বলছি। ঠান্ডা মাথায় শুনুন। আপনারা যখন জাহাজ নিয়ে প্রথম বার বারিগাজায় এসেছেন, তখনই আমাদের নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। আর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা যোদ্ধা হিসেবে পটু, পরিকল্পনায় বেশ কাঁচা।

প্রথমেই বলি, আপনার পঞ্চাশ দাঁড়ের জাহাজে লোক সংখ্যা আশি জন। জাহাজ চালাবার নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চাশ দাঁড়ের বাণিজ্যিক জাহাজে মানুষ থাকবে বেশি হলে পঞ্চাশ জন। বড়োজোর সব মিলিয়ে ষাট জন। বাণিজ্যিক জাহাজে যথেষ্ট মালামাল বহন করতে হয়। বেশি মানুষ নিলে তার ওজনের সাথে সাথে তাদের রসদের ওজনও যুক্ত হয়। এজন্য লোকজন থাকে কম। সেখানে নাবিকেরাই হয় খালাসি, তারাই পাল খাটে, দাঁড় বায়। এখানেই আপনারা সবচেয়ে বড়ো ভুলটা করেছেন। প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন মানুষ বেশি। তার মানে বোঝাই গেছে বাড়তি লোক নিয়ে আপনারা এখানে অন্য কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এসেছেন।

তারপরে, আপনারা এসেছেন বারবারিকন থেকে। সেখান থেকে বণিকেরা যতটা মখমলি কাপড় কিনে আনে, আপনার জাহাজে যতটুকু ওজনের মালামাল থাকার কথা ততটুকু মালামাল ছিল না। আপনার জাহাজের খোলের ভাসমান অংশের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। যদি যথেষ্ট মালামাল থাকতো তাহলে আরো বেশি অংশ ডুবে থাকতো। আপনারা হিসেব দিয়েছিলেন বেশি মালের কিন্তু মাল ছিল অনেক কম। তার মানে মখমলি কাপড় আপনারা ব্যাবসা করার জন্য কেনেননি, কিনেছেন আমাদের বন্দরে ঢোকার একটা উপায় হিসেবে।

অ্যালেক পুরো দমে করে যাচ্ছে অনুবাদকের কাজ। ক্রেয়নের চোখেমুখে স্পষ্ট হতাশা।

নাহাপনার কথা এখনো শেষ হয়নি, 'তারপরের কাজে অবশ্য অ্যালেক আমাকে সাহায্য করেছে। আপনার জাহাজে যারা নাবিকের কাজ করছে তাদের মধ্যে দুই জাতের মানুষ আছে। এটা প্রথম অ্যালেকের চোখে পড়ে।

যারা ছোটোবেলা থেকে নাবিকের কাজ করে, জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ায় তাদের দেহাবয়বের সাথে ছোটোবেলা থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা লোকের দেহাবয়বের পার্থক্য থাকে। নাবিকের বাহু আর বক্ষ সবল হলেও পা থাকে তুলনামূলক দুর্বল। দাঁড় টেনে টেনে তাদের হাতের আর বুকের পেশি সুগঠিত হয়। কিন্তু পায়ের কাজ তেমন থাকে না বলে, পায়ের পেশি অত সুঠাম হয়ে গড়ে ওঠে না।

উল্টোদিকে যারা যুদ্ধবিদ্যা চর্চা করে তারা ছোটোবেলা থেকেই আপাদমস্তকের চর্চা সমানুপাতে করে। তাদের শরীরের এক বিশেষ অনুপাত থাকে। আর তাই যোদ্ধার দেহ দেখলেই চেনা যায়। অ্যালেক আমাকে জানায়, আপনার জাহাজে বিশজন যোদ্ধার মতো গঠনের লোক আছে। সেই কথা শুনে আমি বুঝে গেলাম, আপনি বিশ জন সৈন্য নিয়ে এসেছেন। আপনার এদিকে আসার একটাই উদ্দেশ্য। আমার ওপর কোনো চোরাগোপ্তা হামলা করা। বিশজন সৈন্য দিয়ে তো আর যুদ্ধ হয় না।

তিনদিন ধরে শীতের উল্টো বাতাস বইতে শুরু করেছে। এই তিনদিন ধরেই আমি প্রতি রাতে আপনাদের জন্য সর্প ব্যূহ সাজিয়ে বসে আছি। কারণ উল্টো বাতাস বইবার আগে আপনি কিছু করবেন না আমি জানতাম। যাক, এতদিনে আপনারা ধরা পড়লেন।'

নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা শুনতে কারোই ভালো লাগে না। কিন্তু এখন আর ক্রেয়নের কিছুই করার নেই। এমন জানলে অর্ধেক লোক নিয়ে আসতেন। পরিকল্পনায় অনেক গলদ রয়ে গিয়েছিল। আসলে কীভাবে কাজটা করা হবে তা ভাবতে গিয়ে বাকি দিকে ভালো করে নজর দেওয়া হয়নি।

যোদ্ধার শরীর আড়াল করতে হয় গুপ্ত হামলার সময়। এই প্রাথমিক ব্যাপারটাতেই তিনি অত গা করেননি। এখানে যে গ্রীক শরীর বিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক থাকবে এটাই বা কে জানতো। শরীরের গঠন আড়াল করার অনেক বিদ্যা আছে। আসলে রাজা নাহাপনাকে খাটো করে দেখার ভুল করেছিলেন তিনি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

'বাকি কাজটা আমার এই মিত্র অ্যালেক করেছে। আপনারা কীভাবে পরিকল্পনা করেন, কীভাবে চোরাগোপ্তা হামলা করেন সেই সম্পর্কে তার জ্ঞান সম্পূর্ণ। ওর মতামত নিয়েই আপনাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

অধৈর্য হয়ে উঠলেন ক্রেয়ন, 'বুঝেছি। এত কথা বলার দরকার নেই। গুপ্ত হামলা করতে এসে ধরা পড়েছি। আমাদের পরিণতি সম্পর্কে এখন আমরা সুনিশ্চিত। আপনি অযথা আর দেরি করবেন না। আপনার সৈন্যদের আদেশ দিন।'

ক্রেয়নের গলায় উদাসীন ভাব। যোদ্ধা হিসেবে যদি মৃত্যুবরণ করতেই হয় তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই।

নাহাপনা হাসলেন, 'আপনার আর আমার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আমি রাজা হতে পারি কিন্তু আপনার মতো আমিও কিন্তু জাত যোদ্ধা। আর একজন যোদ্ধা হিসেবে আরেকজন যোদ্ধাকে সম্মান দিতে জানি আমি। আপনি যেহেতু এই যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে ওপরের আসনে আছেন তাই ধরে নিচ্ছি আপনিই ওদের সেনানায়েক। প্রাচীনকালের একটা রীতি আমি এখনো মানি।'

'কী সেটা?'

'রীতিটা হচ্ছে এক সেনানায়ক আরেক সেনানায়ককে যুদ্ধে আহবান করবে। যে সেই দ্বন্দ্বে মারা যাবেন তার সেনার সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, পরাজয় কিন্তু তারই হবে। তাই সেই রীতি অনুযায়ী আপনি কিন্তু আমাকে সেরকম দ্বন্দ্বে আহবান করতেই পারেন। যদি আমি হেরে যাই, তাহলে আপনি নির্বিঘ্নে আপনার কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যেতে পারবেন। চাই কী আমার রাজ্যের রাজাও হয়ে বসতে পারেন।'

কথাগুলো অ্যালেকের অনুবাদে শোনার পর আশ্চর্য হলেন ক্রেয়ন। এই লোক বলে কী! তাকে যুদ্ধে আহবান করছে। গ্রিসের সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধার জাত স্পার্টানদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধার বুক তার সামনে দাঁড়াতে কাঁপে। আর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তার তিনভাগের দুই ভাগ একটা মানুষ তাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহবান করছে। নিষ্ঠুর একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে, 'আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। আমি আপনাদের রীতি মেনে আপনাকে এখনই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করতে চাই।'

'বাহ্, তাহলে তো মিটেই গেল। এবার আমাদের মধ্যে একজনের বীরগতি প্রাপ্ত হবেন, আর আরেকজন প্রাপ্ত হবেন বীরস্থান। এখন চলুন, আমরা যার যার পছন্দ মতো অস্ত্র বেছে নিই।'

স্পার্টানদের মূল অস্ত্র হচ্ছে তাদের বিখ্যাত ঢাল আর বর্শা। সাথে কোমরে ঝোলানো থাকে তলোয়ার। গোপন হামলার জন্য এসেছেন বলে সেই বিখ্যাত ঢাল আর বর্শা তার কাছে নেই। তবে তলোয়ার আছে। তবে সেটাও আকারে ছোটো। নাহাপনার এক সৈন্যের কাছ থেকে বর্শা নিলেন তিনি। আরেকজনের কাছ থেকে নিলেন প্রমাণ আকারের একটা তলোয়ার। তবে ঢাল ছাড়াই যুদ্ধ করতে হবে। এদের ঢালগুলো একবার দেখেই নাক সিটকেছেন ক্রেয়ন। এগুলো দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ওদিকে মহারাজ নাহাপনাও তৈরি। যুদ্ধসাজ তার আগে থেকেই ছিল। রাজ তলোয়ারটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। হাতলের দিক থেকে প্রস্থ আস্তে আস্তে কমে এসেছে বাঁকানো ফলার। শুধু সেই তলোয়ার হাতেই তিনি রণভূমিতে নেমে এলেন।

সৈন্যদের মাঝে এখন টু শব্দও নেই। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন ক্রেয়ন আর নাহাপনা।

নাহাপনার চোখ সতর্ক, 'একটা কথা আপনাকে বলে নেওয়া ভালো, আপনার উপহার দেওয়া মদের স্বাদ অতুলনীয় ছিল। আপনার অসাধারণ স্বাদের মদের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

ক্রেয়ন কিছু বললেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে বার্তালাপে কোনো প্রয়োজন নেই। এই যোদ্ধাকে মশার মতো পিষে ফেলতে হবে। প্রথম আঘাত তিনিই করলেন। পূর্ণ বলয়ের মাঝ বরাবর একেবারে নাহাপনার বুকের দিকে বর্শা চালিয়ে দিলেন। এই আঘাত যথেষ্ট

মারাত্মক। তবে তা প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ ভাবে। সামনের সৈন্যের হাতের তলোয়ার সেই আঘাত ফেরানোর জন্য বামদিকে চালানো হবে। আর সেই সুযোগে আরেক হাতের তলোয়ার দিয়ে সামনের যোদ্ধার বুকে লম্বভাবে আঘাত করা যাবে। ক্রেয়ন দুই হাতেই যুদ্ধে সমান দক্ষ।

নাহাপনা বামদিক থেকে অর্ধচক্রে আসা বর্শাটা দেখলেন। মুচকি হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। ঝট করে দুই পা এগিয়ে গেলেন তিনি। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা তার বাঁ দিকে আঘাত করার কথা ছিল। তার বদলে আঘাত করলো দণ্ডের বাম অংশ। বাম হাতের এক ঝটকায় সেই বর্শার দণ্ড নিচে ফেলে দিলেন তিনি। সাথে সাথেই নেমে এসেছে তার বাম হাঁটু।

হাঁটুর ঝটিকা চাপে বর্শার দণ্ডের ঠিক মাঝ বরাবর ভেঙ্গে গেল। ততক্ষণে ক্রেয়ন তার হাতের তলোয়ার নাহাপনার গলা বরাবর চালিয়ে দিয়েছেন। তবে তার পরিকল্পনার প্রথম ভাগ অকার্যকর হয়ে গেছে। নাহাপনা ততক্ষণে সরে গেছেন বাঁ দিকে। তার গলার একটু পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রেয়নের তলোয়ারের ফলা।

ক্রেয়নকে আর কিছুই বুঝতে দিলেন না নাহাপনা। এক পাক ঘুরেই লাফ দিলেন তিনি। পবন যেভাবে হঠাৎ ঘূর্ণি সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি। যুদ্ধের এই দেহ ভঙ্গিকে পবন কলা বলে। শূন্যে থাকতেই ক্রেয়নের গলা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালেন নাহাপনা।

ক্রেয়নের তখন কিছুই করার নেই। ডান হাতের বর্শা ভেঙ্গে গেছে। বাঁ হাতের তলোয়ারের আঘাত চ্যুত হয়ে তার শরীরের ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। নাহাপনার রাজ তলোয়ার তার কেশ সূক্ষ্ম ধারালো ফলা দিয়ে ক্রেয়নের গলা ধড় থেকে একবারে আলাদা করে দিলো। ক্রেয়নের সুবিশাল শরীর কয়েকবার কেঁপে উঠে খসে পড়লো ভূমিতে।

ক্রেয়নের বিশ জন অনুচর অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। এমন যুদ্ধের কৌশল তারা জন্মেও দেখেনি। নাহাপনার পক্ষের কেউ তেমন আশ্চর্য হলো না। মহারাজের যুদ্ধপটুতা সম্পর্কে তারা অবগত।

এক সৈনিক এসে নাহাপনার হাত থেকে তলোয়ারটা নিয়ে নিলো। আঙ্গুলের ইশারা করলেন নাহাপনা। সাথে সাথে ক্রেয়নের বিশজন অনুচরের মস্তকও ভূমি স্পর্শ করলো।

নাহাপনা অ্যালেকের দিকে তাকালেন, 'চলো, এবার তাদের জাহাজের দিকে যাওয়া যাক।'

১৫

পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম। অসিতের অবস্থারও এখন পরিবর্তন ঘটেছে। কোথা থেকে এক নতুন উৎসাহ শরীরে এসেছে তার। এখন প্রতিদিন নিয়ম করে ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে সে। চলাফেরায়ও এখন আর পূর্বের মতো উদাসীনতা নেই। ভোরে উঠেই সে আর অঙ্গদ খেয়ে নেয়। তারপর খেলার সামগ্রী আর অঙ্গদকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অঙ্গদকে কাঁধে ঝুলিয়ে একেক দিন একেক জায়গায় যায়। রোজগার এখন শূন্যের কোটা থেকে অনেকটাই বেড়েছে। তার স্থির করা লক্ষ্যে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হবার কথা না।

আজ সকালেও নিয়মমতো ঘরের ঝাঁপি বন্ধ করে বের হয়েছে সে। কাল রাতেই আজকের খেলা দেখানোর জায়গা ঠিক করে রেখেছে। আজ অনেক দূরের একটা বাজারে যেতে হবে। সকাল সকাল বেরিয়ে জোর কদমে হাঁটলে তবেই সময়মতো পৌঁছানো যাবে।

গ্রামের মেঠো পথ ধরে নিজের মনে হাঁটছে সে। একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে গ্রামের ছোটোখাটো মন্দির। এই গ্রামের রক্ষাকর্তা দেবতা সোমনাথ। তারই মন্দির। দেখতে দেখতে মন্দিরের ঠিক সামনে চলে এলো সে।

তবে অন্য সব ভোরের সাথে এই ভোরের একটা পার্থক্য নজরে পড়লো তার। একটু দূরে থাকতেই মন্দিরের ভেতরের কোলাহল তার কানে আসছিল। ঘটনা বুঝতে পারছে না সে। এত ভোরে এত কোলাহল কেন মন্দিরে?

মনে হয় আজ কোনো পূজা আছে। কিন্তু এত বড়ো কোনো পূজা থাকলে তো আগে থেকেই সে জানতে পারতো। গ্রামে কোনো কথা গোপন থাকে না। সবাই জেনে যায়। পূজা থাকলে আগে থেকেই শোরগোল থাকে, জোগাড় যন্ত্রের ব্যাপার থাকে। আজকে কী বার, কত তারিখ, কী তিথি কিছুই তার মনে আসছে না। এসব খবর মনে রাখার প্রয়োজন তার পড়ে না। কেবল কোন বারে কোন বাজার বসে তাই মনে রাখতে হয়।

মন্দির পেরোনোর সময় একটা ডাক শুনতে পেলো সে, 'এই অসিত, ওদিকে যাচ্ছিস কোথায়? এদিকে আয়, শুনে যা।'

অজয় তাদের গ্রামেরই ছেলে। অসিতের সমবয়সি। যদিও তাকে শুধু সমবয়সিই বলা যায়, কোনোভাবেই বন্ধু অথবা খেলার সাথি বলা যায় না। অসিতের পারিবারিক এবং আর্থিক অবস্থা তার সামাজিক অবস্থানও ঠিক করে দিয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ সমবয়সি ছেলেদের খেলাধুলায় সে ব্রাত্য।

তাই আজ অসিত তাকে ডাকতে সে একটু অবাকই হয়েছে। এখন আবার অজয় তাকে মন্দিরের ভেতরে ডাকছে কেন? তার তো তাড়া আছে। তবে অজয়ের ডাক উপেক্ষা করা যাবে না। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে।

দরজার কাছে যেতেই অজয় অবহেলা মেশানো তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, 'কিরে, সব কি ভুলে মেরে দিয়েছিস না-কি? তুই আজ সকালে মন্দিরে না এসে মন্দিরের সামনে দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? জানিস না, আজ সকালে সবাইকে মন্দিরে আসতে হয়।'

এতক্ষণে ঘটনাটা বুঝতে পারলো অসিত। তার মনে পড়েছে। উত্তরায়ণের এই বিশেষ তিথিতে এই মন্দিরে এক বিশেষ পরম্পরা সম্পন্ন করতে হয়। অঙ্গদকে নিয়ে খেলা দেখাতে দেখাতে সে এসবের কথা ভুলেই গিয়েছিল। গ্রামের ভেতরে একটু হাঁটাহাঁটি করলে আজকের দিনের আভাস সে পেতো।

অঙ্গদকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। আজকের দিন মাটি হয়ে গেল। আজ আর খেলা দেখাতে যাওয়া যাবে না। সারাদিনের উৎসবে মন্দিরেই কাটাতে হবে।

মন্দিরে ঢুকে খেলার সামগ্রীগুলো একটা পাশে রাখলো সে। অঙ্গদকে সামলানোর কিছু নেই। সে নিজের মতো করে কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল।

অসিতকে মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে দেখলো রাধামাধব শাস্ত্রীর দুটো সদা সতর্ক চোখ। তিনি এই সোমনাথ মন্দিরের পুরোহিত। এগিয়ে এলেন তিনি, 'কিরে, এতক্ষণে তোর আসার সময় হয়েছে। আর এগুলা কী নিয়ে মন্দিরে ঢুকেছিস? আজ কি মন্দিরে তোর বানরের খেলা দেখাবার কথা? এটা কি রঙ্গশালা?'

অসিত কিছু বললো না। তার হয়ে জবাবটা দিয়ে দিলো অজয়, 'ঠাকুর, ও তো মন্দিরে আসছিল না। মন্দিরের সামনে দিয়ে ওদিকে যাচ্ছিল। আমি ডেকে নিয়ে এসেছি।'

এই কথা শুনে মেজাজ আরও গরম হয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন রাধামাধব শাস্ত্রী, 'তা তো যাবেই। মূর্খের দল সব। এইসব দেব পরম্পরার কথা কি আর তোদের মনে থাকবে। আমি মরে গেলে তো দেখছি তোরা এই সোমনাথের মন্দিরই বন্ধ করে দিবি। যতসব অধর্মী আর অর্বাচীনের দল।'

কথাগুলো বলে রাধামাধব শাস্ত্রীর শরীরের জ্বালা মনে হয় একটু কমেছে। পরের কথাগুলোতে মিশে থাকলো একটু দুঃখ, 'তোরা কি আর জানিস ইন্দ্রপুরের গৌরব। এই গ্রাম ক্ষত্রিয়দের। ইতিহাস বলে কত বড়ো বড়ো যোদ্ধা এই গ্রাম থেকে এক সময় রাজার সেনাদলে ভর্তি হয়েছিল। তারা কত বীরত্বের সাথে কত যুদ্ধে লড়াই করেছিল। আর সেই ইন্দ্রপুরের ছেলেরা এখন আছে বানর নিয়ে।'

ইঙ্গিতটা অসিতের দিকে। এবার অসিতের এই উচ্ছন্নে যাবার যথাযথ কারণটা বর্ণনা করলেন তিনি, 'তোর বাবারও তলোয়ারের চেয়ে বানর প্রিয় ছিল। ছেলেটাকেও একেবারে উচ্ছন্নে দিয়ে গেছে। তুই সেখানেই যা। বর্ণধর্ম পালন না করলে তো শেষমেশ নরকেই যেতে হবে। তবু এই ক্ষত্রিয় পরম্পরা পালন করলে পাপের ভার একটু হলেও কমবে তোর। ক্ষত্রিয়ের ছেলে হয়ে একদিন অন্তত তো ধনুকের পূজা করলি। আর সেই ধনুক পূজার দিনেই সব বাদ দিয়ে বাবু চলেছেন বানর নাচাতে। যা হারামজাদা, সবকিছু মন্দির থেকে বের করে ঘরে রেখে আয়।'

অসিত মুখ নিচু করে সবকিছু তুলে নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো। এই ভর্ৎসনা তার প্রাপ্য ছিল। গ্রামে থাকা গ্রামের এতদিনের চলে আসা পরম্পরা না মানা তো সমাজ

বিরোধী কাজ। ভয়ানক পাপ। পাপের ভারের হিসেবে শাস্তি কমই হয়েছে। সামান্য ধমকাধমকির ওপর দিয়েই আপাতত সমস্যা কেটে গেছে।

ঘরে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে রেখে আবার মন্দিরের পথ ধরলো সে। অঙ্গদকে নিয়ে জোর পায়ে এসে পৌঁছুল মন্দিরে। এবার আর অঙ্গদকে মন্দিরে ঢোকানোর সাহস পেলো না। অঙ্গদ অসিতের নির্দেশ মতো মন্দিরের বাইরের এক গাছের ডালে উঠে বসে রইলো।

অসিত রাধামাধব শাস্ত্রীর নজর বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে তার বয়সি ছেলেদের দলে মিশে গেল। ওকে দেখলে আবার বদমেজাজি পুরোহিত কী করবেন কে জানে। হয়তো আবার শাপশাপান্ত করতে করতে তাকে যমের দুয়ারে পাঠাবেন।

মন্দির থেকে প্রাঙ্গনে বেরিয়ে এলেন এবার রাধামাধব শাস্ত্রী। হাতে একশো আট সলতের সপ্তমুখী প্রদীপ। বেশ ভারী। দুই হাতে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। সবগুলো সলতে হিসেব অনুযায়ী সমানভাবে জ্বলছে। প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যভাগে সেই প্রদীপ রাখা হলো। সবাই একে একে স্পর্শ করলো সেই আগুনের তাপ। শুদ্ধ হয়ে নিলো সোমনাথের কৃপায়।

এবার আসল কাজ শুরু হবে। সেই সময় এগিয়ে আসতেই উপস্থিত সবার মুখ পাণ্ডুর হয়ে এলো। কাজটা সবার প্রতি বছর একবার করে করতে হয়। আর প্রতি বছরের ফলাফল একই হয়। অসম্মানজনক।

সোমনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে একটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করা আছে। সেই মহা শিব লিঙ্গ থেকে ঠিক একশো ধনু দূরে একটা তীর আর ধনুক রাখা আছে। রাধামাধব শাস্ত্রী সেই তীর আর ধনুকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন,

'এই ধনু তোমরা সবাই চেনো। এটা কোন সাধারণ ধনুক নয়। এই ধনুকের নাম হচ্ছে বিজয় ধনু। মহাভারতের যুদ্ধে এটার উল্লেখ আছে। মহাবীর কর্ণ বিজয় ধনু দিয়ে যুদ্ধ করতেন। সবাই এটা জানে। কিন্তু অনেকেই জানে না, বিজয় ধনু কেবল মহাবীর কর্ণই ব্যবহার করতেন না, আরো ছয়জন মহারথ এই একইরকম ধনু ব্যবহার করতেন। এই ধনুক সেই ছয় ধনুর একটা। তিন হাজার বছর আগেও এই ধনুক যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর বংশের পরম্পরায় এই ধনু আমাদের গ্রামের অধিকারে এসেছে। এত পুরানো, অথচ দেখো এখনো এই ধনুকের বাঁকানো কাঠ অথবা ছিলায় কোনো ক্ষতি হয়নি। দেখো সবাই, এখনো ঠিক আগের মতোই আছে এই ধনু। কোনো সাধারণ কাঠ অথবা সুতার এতদিন টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। অবশ্যই এই ধনুক দিব্য। তোমাদের সবার ভাগ্য ভালো, এই দিব্য ধনু স্পর্শ করার সুযোগ পেয়েছো।'

এই কথা প্রতি বছরই শোনে তারা। তবে সেই মহা পুরানো দিব্য ধনুক স্পর্শ করার আগ্রহ কারো মধ্যে দেখা গেল না। এই সৌভাগ্যে তাদের অরুচি। একটু পরে কী হবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে সবাই।

সবাইকে এখান একটা পরীক্ষা দিতে হবে। সরল সে কাজ। গ্রামের ক্ষত্রিয় প্রথা অনুযায়ী এখন এই গ্রামের সমর্থ সব পুরুষকে এই ধনুক দিয়ে একশো ধনু দূরের সেই শিবলিঙ্গে তীর ছুঁড়তে হবে। প্রথা অনুযায়ী যার তীর ঐ শিবলিঙ্গে স্পর্শ করবে সেই হবে

মহা ক্ষত্রিয়। ইন্দ্রপুরের ক্ষত্রিয়দের সেনাপতি। এই গ্রামের অধিকারী। তার কথাই তখন সবাই শুনবে।

কাজটা শুনতে সহজ মনে হতে পারে। ধনুক থেকে তীর ছুঁড়তে হবে। একশো ধনু তীরের জন্য এমন আর কী দূরত্ব। তবে কাজটা ভালোই কঠিন। এমনই কঠিন, গত একশো পঞ্চাশ বছরে এই কাজটা করে কেউই গ্রামের প্রধান হতে পারেনি। তাই দেড়শো বছর ধরে অধিকারীর পরিবার সবচেয়ে বেশি ভূমির মালিক হিসেবে গোত্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করছে।

অধিকারীই উদ্বোধন করবেন। তাই নিয়ম। রাধামধব শাস্ত্রীকে সম্ভাষণ আর প্রণাম করে বিজয় ধনুর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার। এই গাঁয়ের বৃদ্ধরা এই পরীক্ষা দিয়ে কে কতটা বুড়ো হয়েছে সেই হার মাপে। অধিকারীর বয়সও বাড়তির দিকে।

অধিকারী বিজয় ধনু সামনে রেখে একবার কোমরের বাঁধনটা শক্ত করে নিলেন। তারপর জোরে একটা দম নিয়ে জোরালো মুষ্টিতে ধরলেন ধনুকের মধ্যভাগ। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এবার তিনি ধনু আকর্ষণ করলেন।

স্থাপিত কাঠামো থেকে ধনুক দুই আঙ্গুল মতো উপরে উঠলো। আবারো দম আবদ্ধ করে শরীরের গহীন থেকে শক্তি সন্ধান করতে চাইলেন তিনি। তাতে অবশ্য পরিস্থিতির উন্নতি হলো। ধনু দুই আঙ্গুলের বদলে পরের বার উঠলো চার আঙ্গুল ওপরে। তার বেশি কিছু হলো না।

একসময় দম ছেড়ে দিলেন অধিকারী। সাথে সাথে ধনু চার আঙ্গুল ওপর থেকে তার বিশ্রাম স্থানে পতিত হলো। এক বছরের জমা ধুলো থেকে কিছুটা ধনুকের দেহ থেকে বাতাসে উড়লো।

লোকজনের মধ্যে কানাকানি উঠলো, 'না রে, অধিকারী মশাই অনেকটাই বুড়ো হয়ে গেছেন। গতবার তো টেনেটুনে আট আঙ্গুলের মতো তুলেছিলেন আর এবার চার আঙ্গুলেই তার দম শেষ হয়ে গেল।'

কানাকানি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। সব ন্যাড়াকেই বেলতলায় দাঁড়াতে হবে। এরপরেই বয়ঃক্রম অনুসারে সবাই একবার করে সুযোগ পেলো। কেউই ধনু ঠিকমতো তুলতে পারলো না। কেউ কেউ তুলতে পারলেও ধরে রেখেছে দুই হাতে। এক হাতে পারছে না। দুই হাতেই যদি ধনু ধরে রাখে তাহলে তীরে তো কোনোভাবেই জ্যা তে পরানো যাবে না। বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায় কেউই তীরে হাতই দিতে পারলেন না। শুধু ধনু শূন্যে তুলেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

এরপর এলো যুবক আর কিশোরদের পালা। তারা অবশ্য বাহুতে যথেষ্ট শক্তি ধরে। এতটা অশক্ত নয়। তারা ধনু তুলতে পেরেছে। কেউ কেউ অতি কষ্টে তীর জ্যাকর্ষণ করতেও সমর্থ হলো। কেউ কেউ তো তীরও ছুঁড়তে পারলো। কারো তীর অতিক্রম করলো বিশ ধনু, কারো বা আবার ত্রিশ ধনু।

তবে সবাই বিশেষ একজনের জন্য অপেক্ষা করছে। আজকের এই পর্বের প্রধান আকর্ষণ। সূর্যকান্ত। সে রাধামাধব শাস্ত্রীর ভাষায় ইন্দ্রপুরের আর সব কুলচ্যুত ক্ষত্রিয়দের মতো নয়। এখনো সে ধরে রেখেছে কুল ধর্ম। রাজার বাহিনীতে কাজ করে সে। শুধু যে

কাজ করে তাই নয়, সেই বাহিনীর একজন বিশেষ যোদ্ধা হিসেবে বেশ সুনাম আছে তার। গতবার তার ছোঁড়া তীর আশি ধনু দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। এবার জেতার সম্ভাবনা আছে। গ্রামের মানুষের মধ্যেও তা নিয়ে কানাকানি চলছে।

সূর্যকান্ত থাকে মহীস্থানে। এই পূজা উপলক্ষে গ্রামের পরম্পরা পালন করার জন্য এসেছে সে। তার সুগঠিত দেহের উর্ধ্বভাগ অনাবৃত। বিজয় ধনুককে প্রণাম করে প্রায় অবলীলায় হাতে তুলে নিলো সে। তবে দুই হাত থেকে ধনু এক হাতে নিয়ে উল্লম্ব ভাবে স্থাপন করার পর তার চোয়ালে চাপ ধরলো। সবাই অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শক্ত কাঠের তৈরি তীর জ্যাতে জুড়লো সে। জ্যা আকর্ষণ করতে গিয়ে চোখমুখ একেবারে টানটান হয়ে গেছে তার। শক্তির সর্বশেষ সীমা ব্যবহার করে যতটুকু পারা যায় জ্যা টেনে ধরলো। তার হাতের পেশীগুলো সর্বোচ্চ সীমায় ফুলে উঠেছে। এবার লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ে দিলো সে। এরচেয়ে বেশি জ্যা ধরে রাখা সম্ভব নয়।

টঙ্কার শব্দ তুলে ছুটে চললো তীর। সবাই অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। শিবলিঙ্গের পা কি ছুঁতে পারবে তীর? উত্তর পাওয়া গেল একটু পরেই। না, এবারো পারলো না সূর্যকান্ত। এবারো লক্ষ্য বিশ ধনু দূরে থাকতেই তীর মাটির স্পর্শ পেলো। নিক্ষেপকারী হতাশায় অধোমুখ হয়ে ধনুক নামিয়ে রাখলো যথাস্থানে।

যদিও সে ব্যর্থ হয়েছে তবু উপস্থিত সবার মধ্যেই হর্ষধ্বনি উঠলো। গত পঞ্চাশ বছরে কেউ এই ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়ে পঞ্চাশ ধনু দূরত্বও অতিক্রম করতে পারেনি। সেই হিসেবে জীবিত প্রজন্মের কাছে সূর্যকান্তই সবচেয়ে বড়ো বীর।

এবার কিশোরদের পালা। বালকেরা বাদ। তাদের অবস্থাও মোটামুটি বৃদ্ধদের মতো। তারা হয়তো কেউ ধনুক তুলতে পারলো, কেউ পারলো না। গায়ে গতরে যারা বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বেড়ে গেছে তাদের কেউ কেউ তীর একটু আধটু ছুঁড়তেও পারলো।

এক সময় এলো অসিতের পালা। সে বিরস মুখে গিয়ে দাঁড়ালো ধনুকের সামনে। সবার যে গতি তারও একই গতি। ধনুকে টান দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করলো সে। চারপাশ থেকে স্বাভাবিক উপহাস আর ঠাট্টা ভেসে আসতে লাগলো।

তবে গতবারের তুলনায় এবার অসিতের উন্নতি বেশ ভালো। প্রথম টানেই ধনু প্রায় কাঁধের সমান্তরালে তুলে ফেললো সে। নিজের কৃতিত্বে সে নিজেই অবাক। চারপাশের টিটকারি আর ঠাট্টা এক নিমেষে থেমে গেল। এমনকি স্বয়ং সূর্যকান্ত তার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে।

ধনুক আনুভূমিক তুলেছে সে। কিন্তু এভাবে তো তীর ছোঁড়া যাবে না। এটাকে উল্লম্ব অবস্থানে আনতে হবে। পরের ধাপে সেটাই করলো অসিত। সে দুইহাত থেকে ধনুকের ভার বামহাতে নিতে চেষ্টা করলো। ধনুক আধ পাক ঘুরলো।

আর তাতেই বাঁধল বিপত্তি। আনুভূমিক ধনুক দুহাতে থাকাতে ভরের একটা ভারসাম্য ছিল। কিন্তু সেই ভারী ধনুক বামপাশে যেতেই ভর একদিকে চলে গেল। ভারী ধনুকের সেই আচমকা ভারের অসামঞ্জস্য অসিতের শরীর সামলাতে পারলো না। ধনুক সহ অসিতের শরীর বামদিকে কাত হয়ে ভূমিতে পড়লো।

এবার হাসির আওয়াজ হলো দ্বিগুণ। ভালো একটা খেলা দেখা গেল।

রাধামাধব শাস্ত্রীর মুখে হাসি নেই। এগিয়ে এলেন তিনি, 'সবাই চুপ। এতে হাসির কী হলো। এই অর্বাচীন চতুষ্পদের জন্য বিজয় ধনুকের এত বড়ো অপমান হলো। এই ধনুক মাটির স্পর্শ পেলো। ক্ষত্রিয় নামের কলংক। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে তোকে এখনই ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্র করে দিতাম। তোর আসলে বানর নাচানোই ঠিক আছে। তীর, ধনুক আর তলোয়ার নাচানো তোর কাজ নয়। বয়স কত হলো?'

অসিত শোয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুইজন এগিয়ে এসে বিজয় ধনুক তুলে যথাস্থানে রাখলো। অসিত তার বয়স নিয়ে প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না।

শাস্ত্রী নিজেই উত্তর ভেবে নিলেন, 'পনেরর তো কম হবে না। তোর চেয়েও কম বয়সে অভিমন্যু একাই চক্রব্যূহে ঢুকে সপ্তরথীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আর তুই একটা ধনুক তুলতে গিয়েই লেজে গোবরে একেবারে মাখিয়ে ফেললি।'

এই কথারও কোন জবাব দিলো না অসিত। নত মুখে এক পাশে সরে এলো। তার নীরব মন মনে মনে উত্তর দিলো, 'আপনার চেয়েও বেশি বয়সে পিতামহ ভীষ্ম এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিনায়ক হয়েছিলেন, আর আপনি আছেন কেবল হম্বিতম্বি নিয়ে। সবাই তো চেষ্টা করলো আপনি কেন ধনুকে হাত দিলেন না?'

কিন্তু মুখে তো আর এই কথা বলা যায় না। সবার পালা শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মুঠো প্রসাদ পেটে দিয়ে আজকের বিজয়ী সূর্যকান্তের জয়গান করতে করতে সবাই বাড়ির পথ ধরলো।

অসিত সেখান থেকে ঘরে ফিরলো না। চলে গেল কৃপা নদীর তীরে। আজকে উৎসব উপলক্ষে একটু অবসর পাওয়া গেছে। গত কিছুদিন ধরে খেলা দেখানোর জন্য নানা জায়গায় যাওয়াতে তার প্রিয় এই নদীর তীরে আসা হয়নি। আজ অনেকক্ষণ থাকার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

রাঁধা তখনই নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরছিল। কাঁখে কলসি নিয়ে অসিতের সাথে দেখা হয়ে গেল।

'কিরে, তীর ছুঁড়ে কতদূর নিতে পারলি?'

'কি যে বলিস। তুই মনে হয় কিছুই জানিস না। তীর ছোঁড়া কি এতই সোজা। কতো জোয়ান মানুষ পারে না, আর আমরা তো ছোটো। আমাদের বয়সের ছেলেরা তো অনেকে ঐ ধনুক তুলতেই পারেনি। জানিস, আমি আজকে কাঁধ পর্যন্ত তুলে ফেলেছিলাম ধনুক।'

'হ্যাঁ। তারপর সেই ধনুক জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়েছিস। সব শুনেছি আমি।' খিলখিল করে হেসে উঠলো রাঁধা।

নাহ, আর কোনো কথা জোগাল না অসিতের মুখে। মানুষের অপমান আর অপদস্ত হবার খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। এরই মধ্যে গ্রামের সবাই নিশ্চয়ই এই বিষয় নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে মুখরোচক গল্প ফেঁদেছে। রাঁধাও এই কথা শুনে তাকে খোটা দিচ্ছে।

প্রসঙ্গ বদলে ফেললো অসিত, 'অঙ্গদকে দিয়ে খেলা দেখিয়ে অনেক মুদ্রা পাচ্ছি জানিস। সেদিন খড়গপুরের বাজারে খবর নিয়েছিলাম। সেখানে খবর নিয়েছি। সেই বাজারে দুটো গাভী কিনতে দুইশো মুদ্রা লাগবে। বেশিদিন লাগবে না, একটা কিনবো লাল, আরেকটা কালো।'

রাঁধার হাসি এবার বদলে গেল লজ্জায়, 'তারপর কী করবি।' তার নজর এখন নিচের দিকে।'

'তারপর উমা পিসিকে তোর মায়ের কাছে পাঠাবো। বিয়ের কথা বলতে।'

'আগে তো দুটো গাভী কিনে দেখা। দুশো মুদ্রা কি তুই কম মনে করেছিস। জমাতে কতদিন লাগবে কে জানে। শেষে দেখা যাবে আমার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাবে।'

'নাহ, দেখিস, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।'

'তুই এখানে বসে থাক। আমি যাই। গাইগুলো আবার জলের জন্য বসে আছে।'

অসিত ঘরে ফিরে এলো। তারপর লুকিয়ে রাখা মুদ্রার থলিটা বের করলো। গুণতে বসলো সে।

একশোর মতো মুদ্রা জোগাড় হয়ে গেছে। আর মাস দুয়েক খেলা দেখালেই টাকা উঠে আসবে।

অঙ্গদকে খেতে দিলো সে। প্রথমে ভেবেছিল অঙ্গদের গায়ের রং বোধহয় স্থায়ী হবে না। কয়দিন পর হয়তো আগের মতো হয়ে যাবে। তবে সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিনদিন অঙ্গদের শরীরের হরেক রঙের উজ্জ্বলতা যেন বেড়েই চলেছে।

১৬

জায়গাটা প্রতিষ্ঠানা থেকে বেশি দূরে নয়। দুই রাত আগেই মহারাজ সাতকর্ণী আর গিরিধারী মিলে নৃত্য-গীত উপভোগ করেছিলেন। তারপরই বেছে নেওয়া হয়েছে এই জায়গা। দুজনেই এখন চলে এসেছেন এই জায়গাতে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

প্রতিষ্ঠানার আশেপাশের বেশকিছু এলাকায় ঢেরা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রাজধানী থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত এই জায়গা বড়োই মনোহর। গোদাবরী নদী সবসময় সরবরাহ করছে নির্মল বাতাস। জায়গাটা কারো অধিকারে নেই। রাজার খাস জমি। আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত কোনো নগর অথবা গ্রাম নেই। রাজারা তাদের খাস জমিতে নতুন নগর কিংবা গ্রাম স্থাপন করেন নানা উদ্দেশ্যে। সাতকর্ণীর তেমনই ইচ্ছে।

ঢেরায় ঘোষণা হয়েছিল, রাজা তার খাস জমিতে নানা রকমের মশলা চাষ করবেন। তার অনেক লোকবল দরকার। যে কেউই এখানে কাজ করার আবেদন করতে পারবে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রজীবী তাদের কাজে বড়োই অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কিন্তু নিজের জমি নেই, হাতে কোনো কাজ নেই, তারা যেন বিনা দ্বিধায় এখানে আসে। রাজ্যে এমন লোকের অভাব নেই। রাজার চাকরি করতে পারলে তো পোয়াবারো।

সুবিধা অনেক পাওয়া যাবে। সেসবও বলা হয়েছে ঢেরায়। লোকে রাজার বরাদ্দ করা জমিতে নানা রকমের মসলা চাষ করবে। বিনিময়ে পাবে যথেষ্ট আহার এবং রোগের প্রতিকারে ওষুধি। শুধু তাই নয়, ফসল তোলার মৌসুম শেষ হলে ক্ষেত্রজীবীদের নানা পরিমাণে মুদ্রাও উপঢৌকন দেওয়া হবে।

মোহন সেই ঢেরা শুনেই এসেছে। তার তিন কূলে কেউ নেই। নিজের গ্রামের এক জমিদারের জমিতে চাষ করতো সে। সে থেকেই দুবেলার খাবারের জোগাড় কোনোমতে হয়ে যেতো। আশ্রয়ও তার ছিল না। জমির ধারের একটা ছাউনিতে কেনোমতে শুয়ে থাকতো। জমিদারই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শোবার কাজও চলবে, আবার পাহারা দেওয়ার কাজও চলবে।

স্বাভাবিকভাবেই ঐ জীবনে মোহনের ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। রাজার ঘোষণা শুনে সে আর দেরি করেনি। সাথে সাথে বেরিয়ে পড়েছে। রাজার হয়ে কাজ করে যদি ভাগ্য ফেরে। জমিজমার কাজে সে বড়োই পাকা। আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বুর হয়ে আছে সে। নিশ্চয়ই রাজার চাষির দলে তার জায়গা হয়ে যাবে।

খাসজমির পরিমাণ নেহাত কম নয়। চারপাশে মনোহর বৃক্ষরাজি। শীতল বাতাস। মোহনের সব দেখেশুনে চোখ কপালে উঠলো।

অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। তাদের এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। একজন একজন করে ঢোকানো হচ্ছে একটা তাবুতে। মোহনের আগের জন তাবুতে ঢুকলো। মোহন ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে। তাবুর ভেতরে কী হচ্ছে তা জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে তার। কান খাড়া করলো সে।

চারপাশে প্রচুর সেনা। রাজার কাজ। সৈন্য তো থাকবেই।

তাবুর ভেতরে স্বয়ং গিরিধারী আছেন। তিনিই তদারকি করছেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা। বাছাইয়ের কাজটাই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ভেতরে যে ঢুকেছে এখন তার সাথেই কথা বলছেন তিনি, 'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'আজ্ঞে সূর্যগড়।'

'বাহ্, বেশ দূর থেকে এসেছ দেখছি। ঘরে কে কে আছে তোমার?'

'স্ত্রী আর দুই পুত্র।'

'বাহ্, সৌভাগ্যবান তুমি। তা গ্রামে তোমার নিজের জমি আছে?'

'জি আছে।'

'কতটুকু?'

'একশো ধনু লম্বায় আর পাশে ষাট ধনু।'

'জমিও তো তোমার নেহাত কম নেই। বুঝতে পারছি না, তুমি নিজের জমিতে চাষ না করে রাজার জমিতে চাষ করতে এসেছ কেন?'

'আমার জমি অন্য লোক দিয়ে চাষ করাবো। রাজার জমি চাষ করলে যদি ভাগ্যটা একটু মুখ তুলে চায়।'

মানুষের ভাগ্য যতই ভালো হোক, তা কখনোই তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি দিতে পারে না। অবুঝ লোক কখনোই নিবৃত হয় না। গিরিধারী হাসলেন, 'ভালো ভাবে যদি তুমি ভাগ্য ফেরাতে চাও, তাহলে যাও, নিজের জমিতেই চাষ করো। মা এবং ভূমি কখনো লোভের কারণে ত্যাগ কোরো না। আমরা তো ঘোষণায় বলেই দিয়েছিলাম বিশেষ করে ভূমিহীন চাষিদের কথা। তুমি কি সেটা শোনোনি?'

'আজ্ঞে শুনেছিলাম। তবু এসেছি। আমি খুব ভালো চাষ করতে পারি।'

'সেই বিদ্যা নিজের জমিতে গিয়ে ফলাও। এবার যাও। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকো।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢোকে মোহন। একই প্রশ্ন তাকে করেন গিরিধারী। তবে মোহনের উত্তর হলো আলাদা, 'আমার পরিবার নেই, ভূমি নেই। পরের জমিতে কাজ করি। জমিদার যা দেয় তাই খাই, জমির পাশেই ঘুমাই।'

'আচ্ছা।' গিরিধারী তড়িৎ পরখ করে নেন মোহনের দেহ গঠন, 'তুমি যদি এখান থেকে আর গ্রামে ফিরে না যাও তাহলে কি এখানে তোমার খোঁজে কেউ আসবে?'

'না মহাশয়, তেমন কেউ শুধু আমার গ্রামে কেন, এই পৃথিবীতেই নেই।'

'আচ্ছা, তুমি এখান থেকে পাশের তাবুতে যাও।'

পাশের ঘরে ঢুকলো মোহন। সে ঢুকতেই দেখলো এক সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তলোয়ার হাতে এগিয়ে এলো সেই সৈন্য। ভয় পেয়ে গেল সে। তবে সৈন্য তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো না, 'এই তলোয়ারটা ধরো। তারপর আঘাত করো এই কাঠে। যত জোরে সম্ভব আঘাত করবে।'

ভারী তলোয়ার দুহাতে তুলতে বেশ কষ্ট হলো মোহনের। ভারী কাঠের ওপর সজোরে নামিয়ে আনলো সে তলোয়ারটা।

কাঠ একটুও নড়্‌ল না। কেবল তলোয়ার এক আঙুলের মতো বিঁধেছে। সৈনিক আঘাত পরীক্ষা করে রায় দিলো, 'যাও, ভেতরে যাও।'

দ্বিতীয় তাবু পেরোতেই একটা উঁচু বেড়া দেওয়া জায়গার সামনে এসে হাজির হলো মোহন। দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো বেড়ার ভেতর। ভেতরে ঢুকে তার চোখ চড়কের গাছ।

এখানে জমির ওপর অনেক তাবু খাটানো হয়েছে। চারপাশে অনেক মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। তবে সেগুলো পূজার উদ্দেশ্যে নয়। কিছু মূর্তি কাঠের তৈরি, কিছু খড়ের। কিছু কিছু জায়গায় মাটি খুঁড়ে ঝুরঝুরে করে রাখা হয়েছে। প্রচুর ঘোড়া এবং হাতি রাখা আছে জায়গায় জায়গায়। সৈন্যে গিজগিজ করছে চারপাশ। তাদের মধ্যে তার মতো সাধারণ মানুষও আছে। মোহন একটা কথা বেশ বুঝতে পারলো, এই জায়গায় আর যাই হোক, চাষ করা হবে না। সব দেখেশুনে বিস্ময়ে তার চোখ কপালে চলে গেল, কোমরে চলে গেছে দুই হাত আর মুখে দেখা গেল মস্ত হাঁ।

গিরিধারী আরো তিনদিন সেখানে থাকলেন। সব কাজ গোছাতে গোছাতে ঠিকমতো নাওয়া খাওয়ার সময় পায়নি সে। ভালো মতো পরীক্ষা করে বাছাই করলেন প্রতিজনকে। পুরোপুরি যোগ্য চাষিদল! বাছাই করে অবশেষে রাজধানীতে ফিরে গেলেন তিনি।

মহারাজ সাতকর্ণী এই তিনদিন তার অপেক্ষাতেই ছিলেন। গিরিধারী রাজধানীতে ফিরে আসা মাত্র রাজার দূত এসে তাকে খবর দিলো। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হতো না, কিন্তু সেই পরোয়া করলেন না গিরিধারী। মহারাজের গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে এসে উপস্থিত হলেন অনতিবিলম্বে। মহারাজ সরাসরি আলোচনায় চলে গেলেন, 'তোমার অগ্রগতি কতদূর?'

'প্রথম ধাপ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছি মহারাজ। আপনার গোপন সেনাদলের জন্য লোক সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সৌগামা আর অনাগামা এই দুই রকমের সেনাদলের জন্যই লোক বাছাই করেছি। আমি লক্ষণ জানি শাস্ত্র থেকে। এই দুই প্রকার চলনেই দক্ষ হবে আপনার এই সেনাদল।

বেছে বেছে সেরা অস্ত্রবিশারদ আর যুদ্ধবিশারদদের আমি ওখানে আচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। তাই দ্রুত গতিতে কিন্তু সুচারু রূপে তাদের শরীর, মন ও নীতির শিক্ষা সম্পন্ন করা হবে। আমি আপনাকে দশ সহস্র পদাতিক, পাঁচ সহস্র ঘোড়সওয়ার আর পাঁচ সহস্র তিরন্দাজ দেবো। হাতি আর ষাঁড় জোগাড় করার কাজও এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। আপনার সেনাশক্তি এই গোপন দলের বদৌলতে অনেকটাই বেড়ে যাবে মহারাজ।'

'সব শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার চাষের কথা বলে লোক জোগাড় করার বুদ্ধি কি আদৌ কাজে দেবে? বাইরের কেউ কি কোনো খবর পাবে না?'

'মহারাজ, যেভাবে কোন কাজকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বারা গোপন রাখতে হয় তার সব কৌশলই আমি এখানে প্রয়োগ করেছি। বাইরের গুপ্তচর ব্যবস্থা আটকাতে পারবো আশা রাখি। তবে এত বড়ো একটা কাজ বাইরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখা বড়োই শক্ত কাজ। তাই শত্রু আঁচ পাবার আগেই আমাদের কাজ গুছিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমি আপনার পদক্ষেপে নিশ্চিত না। এভাবে অক্ষত্রিয় লোকজন দিয়ে কি ঠিকভাবে যুদ্ধ করানো যাবে?'

'কেন হবে না মহারাজ? ধরুন শকদের কথা। এই যে তারা সেই পশ্চিম স্থল থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করে আমাদের ভারতের একটা দিক দখল করে রেখেছে, তারা কি ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয় তো দূরের কথা, তারা তো হিন্দু ধর্মেরই কেউ ছিল না। এখন অবশ্য তারা ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে।

মহারাজ, যুদ্ধ করার জন্য কেবল সবল হাত আর যুদ্ধের নিয়ম শিক্ষা করতে হয়। আর ভুলে যাবেন না, আমরা কেবল একটা কুশলী সেনাদল তৈরি করছি, তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের শাসন গুণ না থাকলেও চলবে।'

সাতকর্ণী ঠিক মেনে নিতে পারছেন না, 'ঠিকই আছে। শাসন গুণ থাকতে হবে না। কিন্তু সাহস? জন্মসূত্রে আমরা যে সাহস বংশ পরম্পরায় শিখি সেই সাহস তাদের বুকে আসবে কীভাবে? যুদ্ধক্ষেত্রে এই সাহসই আত্মবিশ্বাস জোগায়, আর সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই আসে শক্তি। তখন যোদ্ধা হয় অজেয়।'

'বংশ পরম্পরায় রাজা হবার আর সাহসী হবার উদাহরণ কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি তো ছিলেন দাসীপুত্র।'

তর্কের বশে হাসলেন সাতকর্ণী, 'অনেকে অবশ্য বলে, তিনি দাসীর পুত্র ছিলেন ঠিক, কিন্তু তার বাবা ছিলেন রাজা নন্দরাজ। যদিও অবৈধ।'

হাসি ফিরিয়ে দিলেন গিরিধারীও, 'তাহলেও সংস্কার আর অভ্যাস তাকে সম্রাট করেনি মহারাজ। তার সংকল্পই তা করেছে। আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন মহারাজ, এটা কলিযুগ। প্রাচীন বর্ণ ব্যবস্থা আর বর্ণ প্রথা এই যুগে ভেঙ্গে পড়বে। পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম। আর নতুনকে যে আগে বরণ করে নিতে পারবে সেই হবে বিজয়ী। শুধু ক্ষত্রিয় দিয়ে সেনা সাজালে আপনি এত বড়ো সেনাদল কখনোই সাজাতে পারবেন না। আপনার রাজ্যে এত ক্ষত্রিয় যুবক আর পুরুষ নেই। আর সবার মধ্য থেকে ক্ষত্রিয় বাছতে গেলে আপনার বাহিনীর কথাও গোপন থাকবে না। এখন আমি সব বর্ণের লোক বেছে নিয়েছি। এখন আর কোনো রাজাই ধারণা করতে পারবেন না, আপনি এখানে সব বর্ণ দিয়ে সেনাদল বানাচ্ছেন।'

'তা ঠিক বলেছেন। সেনাদের শিক্ষা তো শুরু হয়ে যাবে। এখন কী করণীয়?'

'এখন আমাদের ভালো দেখে কিছু গুপ্তচর বাছাই করতে হবে। আর আপনি আমাকে গুপ্তচর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঢোকার এবং যেমন খুশি তেমন গুপ্তচর বাছাই করার অনুমতি দেবেন।'

'সে না হয় দিলাম। কিন্তু আপনার কতজন গুপ্তচর লাগবে?'

'তা আমি এখনো ঠিক বলতে পারছি না মহারাজ। তবে আমার হিসেবে বেশ কয়েকজন লাগবে। আপনি এই ভূখণ্ডে আবার ঝড় তুলতে যাচ্ছেন। তখন প্রচুর ঢেউ উঠবে। আর আমাদেরকে সেই ঢেউ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আমাদের এখন প্রত্যেক রাজ্যের শক্তি, মনোভাব, পরিকল্পনা ও সৈন্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখতে হবে। আর সেসব খবর নিয়ে আসতে তো গুপ্তচর লাগবেই।'

'কিন্তু প্রতি রাজ্যেই তো আমাদের গুপ্তচর আছে। তাদের পাঠানো খবর নিয়মিত পাচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা নিয়মিত সংবাদ। এবার আমরা বাড়তি কিছু খবর চাই। আর সেটাও দ্রুত। তাই আমাদের বিশেষ গুপ্তচর তো লাগবেই।'

'একটা কথার উত্তর দিন গিরিধারী। এই অনাগত দিনের যুদ্ধ নিয়ে আপনার মধ্যে অনেক উত্তেজনা দেখছি। মাঝে মাঝে তো আমার মনে হচ্ছে, আমার চেয়েও আপনার উত্তেজনা বেশি। আপনার এত আগ্রহের কারণ তো আমার কাছে পরিষ্কার না।'

'এই প্রশ্নের উত্তর তো সহজ মহারাজ। কর্ম। একটা বড়ো কর্ম করার ইচ্ছে থেকেই আমার এই উত্তেজনার সৃষ্টি।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে তো যুদ্ধ কখনোই মহৎ কোনো কর্ম নয়।'

'মহারাজ, যুদ্ধ শুধু ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে নয়, কারো জন্যই মহৎ কর্ম নয়। তবে আমাদের তো অধিকার আদায় করে নিতে হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সন্ধান করার অধিকার তো সবারই আছে। এই ব্যাপারে বর্ণে বর্ণে কোনো প্রভেদ নেই।'

'অধিকারের প্রশ্ন এখানে আসছে কীভাবে? নাহাপনা নিজের রাজ্যে আছে। তার রাজ্যে থেকে তার বন্দরে বাণিজ্য করছে। সে তো আমাদের প্রজার অথবা আমাদের কোনো অধিকার হরণ করেনি। এখানে উল্টো আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য তার রাজ্য দখল করার চেষ্টা করছি।'

'না মহারাজ। আপনি স্বার্থের জন্য কাজটা করছেন না। আপনি যুদ্ধ করছেন আত্মরক্ষার জন্য। আপনি যুদ্ধ করছেন নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য। আচ্ছা মহারাজ, বলুন তো এই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো সম্রাট কে ছিলেন?'

'কেন? চন্দ্রগুপ্ত।'

'তিনিই কেন? তার মতো বীর কেউ ছিল না, এইজন্য? না। তার রাজত্বে রাম রাজত্ব চলতো? তাও নয়। তিনি বড়ো সম্রাট ছিলেন কারণ তার রাজ্য সবচেয়ে বড়ো ছিল। ভারতবর্ষে স্মরণকালের মধ্যে তার মতো এত বড়ো রাজ্যের গোঁড়া পত্তন আর কেউ করতে পারেননি। তখন ভূমি ছিল শ্রেষ্ঠত্ব, আর এখন শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে বাণিজ্যে। ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অধিকারী না হতে পারলে আপনার আর এই ভূখণ্ডের সত্যিকারের সম্রাট হয়ে ওঠা হবে না।'

'এই কথা ঠিক। তবে তার সাথে ধর্মও স্থাপন করতে হবে। শকরা প্রজা ধর্ম পালন করে না। নাহাপনা অত্যাচারী রাজা। তার খনিগুলোতে শ্রমিকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে থেকেও সে আমাদের শাস্ত্র মেনে রাজ্য চালনা করে না। ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করে। সেসবও রোধ করা উচিত।'

'মহারাজ, সবই রোধ হবে। গৌরবময় সাম্রাজ্য আপনি অবশ্যই অধিকার করবেন। আমি তাহলে এখন যাই মহারাজ। আর আমার উত্তেজনার কারণ জানতে চাচ্ছিলেন না? চন্দ্রগুপ্তের পেছনে চাণক্যের যে উত্তেজনা ছিল, আপনার পেছনে থেকে আমি ঠিক সেই ভূমিকাই রাখতে চাই। আর এজন্য আমি সামান্য উত্তেজিত।'

'আচ্ছা, গিরিধারী আপনি আসুন। আপনার কথা অনুযায়ী আমি এদিকে সহস্র ঘোড়ার প্রশিক্ষণও শুরু করবো।'

'মহারাজের জয় হোক।' গিরিধারী প্রস্থান করলেন।

১৭

'তুমি কে বাপু? তোমাকে তো সোমগড়ে আগে কখনো দেখিনি।'

সেটাই স্বাভাবিক। রুদ্রদেবকে এই নগরে আগে দেখতে পাবার কোনো কারণ নেই। তিন হাজার বছর পরে তাকে সেদিন প্রথম দেখেছিল ঐ ডাকাতের দল আর বিধবা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। আজ সকালের আগে জঙ্গল ছেড়ে সে কখনো নগরে বেরোয়নি।

রুদ্রদেবের শরীরে জরার কোনো চিহ্ন এখন নেই। মহাদেবের কৃপায় তার অভিশাপ দূর হয়েছে। গাঁয়ের চামড়া হয়েছে টানটান। শরীর হয়েছে বৃদ্ধ অশক্তের পরিবর্তে একেবারে সবল সতেজ। তবে একটা জিনিস পুরোপুরি সারেনি। কপালের ক্ষতের গর্তটা বোজেনি, শুধু এখন আর ওখানে কোনো দগদগে ভাব নেই। রক্ত পড়ছে না। শুধু একটা বেঢপ গর্ত আছে সেখানটায়। সেই গর্ত খুব একটা স্বাভাবিক নয়। সহজেই লোকের চোখে পড়ে যাবে। লোকের চোখে পড়ে যায় এমন কোনো কাজ এখন করা যাবে না। তাই সেখানে এখনো একটা কাপড় বেঁধে রেখেছে সে।

আরেকটা ব্যাপারে তাকে খুব নজর রাখতে হচ্ছে। সে হচ্ছে ভাষা। খুবই সাবধান হতে হচ্ছে ভাষার ব্যবহারে। এই আর্যাবর্তের ভাষার মূল এখনো এক থাকলেও উচ্চারণ অনেকটাই বদলে গেছে। বিশুদ্ধতাও নষ্ট হয়েছে বেশ। সেই বদলে যাওয়া উচ্চারণ আর ভাষা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করাই তার এখন প্রথম কাজ। সোমগড়ের বাজারে সে এসেছে, আপন মনে ঘুরছে। লোকজন যখন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে তখন কান খাড়া করে সেই কথা শুনছে। মনে মনে চর্চাও করছে। তখনই এক আসবাব বিক্রেতা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে এই প্রশ্ন।

রুদ্রদেব কোনো কথা না বলে লোকটার দিকে তাকালো। সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাতে আসবাব বিক্রেতার কৌতূহলের মাত্রা একটু বাড়লো, তবে সাথে সাথে সতর্ক হবারও প্রয়োজন অনুভব করলো সে, 'না বাপু, তোমাকে তো এর আগে এখানে কখনো দেখিনি, তাই জিজ্ঞেস করলাম। সোমগড়ে এখন অনেক নতুন মানুষ আসছে, যাচ্ছে। অনেক কাজেই আসছে তারা। শুনেছি রাজা আবার তার জমিতে রাজক্ষেত্রজীবী নিয়োগ দেবার ঘোষণা দিয়েছেন। সেদিকেও যাচ্ছে অনেকে। তা বাপু, তুমি কি সেদিকেই যাচ্ছো?'

এবার কিছু না বললেই নয়। একটু ধীরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথাটা বললো রুদ্রদেব, 'না, আমি সেদিকে যাচ্ছি না।' উচ্চারণের কায়দাটা পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি বুঝেছে সে।

'বাহ, তোমার ভাষা দেখছি অনেক পরিপাটি। গুরুকুলের আচার্যের মতো করে কথা বলো দেখছি। শিক্ষিত লোক। তা, তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি নেই। ভবঘুরে মানুষ। আপাতত কাজ আর থাকার জায়গা খুঁজছি।'

'তাহলে তো রাজার চাকরিতে যোগ দিলেই পারো।'

'না, রাজা মহারাজার খুব বেশি কাছে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ না। আমি আসলে একটা নির্জন জায়গায় থাকতে চাই। নগরে বাজারে থাকতে ভালো লাগে না।'

আসবাব বিক্রেতা এবার ভালো করে সামনের যুবকের দিকে তাকালো। কথাবার্তায় সন্ন্যাসী হলেও শরীরের গঠন কিন্তু সেই কথা বলে না। দেহ সৌষ্ঠবে বেশ উত্তম গড়নের অধিকারী যুবক। কোথাও মেদের চিহ্নমাত্র নেই। সাধারণের চেয়ে লম্বায় একটু বেশি। পৌরুষ উদ্দীপ্ত চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। কাপড় খুবই সাধারণ। এটাই দারিদ্র্যের একমাত্র চিহ্ন।

ভালো করে চিন্তা করতে লাগলো আসবাব বিক্রেতা। এই যুবকের সাহস অবশ্যই সাধারণের চেয়ে বেশি। পরিবারে কেউ নেই। থাকার জায়গা, খাবার খুঁজছে। বিনিময়ে করে দেবে কাজ। না কাজটা একে দিয়েই হবে। শুধু টোপটা একটু বুঝেশুনে ফেলতে হবে।

এতক্ষণ কোন কথা না বলাতে রুদ্রদেব সরে যেতে উদ্যত হলো। তাকে পেছন থেকে ডেকে থামালো আসবাব বিক্রেতা, 'দাঁড়াও বাপু। কথা আছে তোমার সাথে।'

রুদ্রদেব থামলো। এত কথার পরে একজন অপরিচিত লোকের সাথে আর কী কথা থাকতে পারে।

একটা পাত্রে জল নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো আসবাব বিক্রেতা, 'নাও, জলটা খাও। তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি অনেক পিপাসা পেয়েছে। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে এখানে ঘোরাঘুরি করেছ।'

রুদ্রদেব জলের পাত্র হাতে নিলো। এই অযাচিত আথিতেয়তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছে। ব্যবসায়ী লোক উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কিছু করার কথা না। দেখাই যাক, উদ্দেশ্য কী।

'তোমার তো বাড়িঘর কিছু নেই বললে। কাজ খুঁজছ নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার কাছে একটা কাজ আছে তোমাকে দেবার মতো।'

জলের পাত্র নামিয়ে রাখলো রুদ্রদেব। আচ্ছা, এই তাহলে উদ্দেশ্য। কাজ দেবে। তা বেশ। তার তিন হাজার বছরব্যাপী অভিশাপের কিছু ভালো দিকও ছিল। বলা যায় শাপের মধ্যে বর। তাকে তখন নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো ঠিক, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি তার তেমন ছিল না। শাপমুক্ত হবার পর সে হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ। আর ক্ষুধাও হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের মতো। শুধু তাই নয়, সাধারণের মতো তারও এখন ইচ্ছে করছে একটু নিশ্চিত জীবন কাটানোর। একটা আয়ের নিশ্চিত পথ। তাই এখানে কাজের প্রস্তাব পেলে মোটামুটি মন্দ হয় না।

তারপর এলো প্রস্তাবটা, 'শোনো, দেখতেই তো পাচ্ছো, আমি বুড়ো হয়েছি। আমার ছেলেকে তো এখনই কাজ শিখিয়ে যেতে হবে। সে আমার কাছ থেকে প্রতিদিন কাজ শেখে। আগে আমিই সবদিক সামলাতাম। কিন্তু এখন তো আর সবদিক একসাথে সামলে নিতে পারি না। তাই একজন লোক দরকার।'

'কিন্তু আমি তো কাঠের কাজের কিছুই জানি না। আমাকে দিয়ে কি কাজ হবে আপনার?'

'আরে না বাপু। কাঠের আসবাব বানানোর কাজ তোমাকে করতে হবে না। তোমাকে শুধু পাহারা দিতে হবে।'

'পাহারা দিতে হবে? কী পাহারা দেবো? এই জায়গায় পাহারার দরকার কী?'

'আরে না, এই জায়গায় না। বলছি। একটু ভালো করে বুঝিয়ে না বললে তুমি সবকিছু বুঝতে পারবে না। আমি এই সোমগড়ের সবচেয়ে ভালো কাঠের কারিগর। এই নগরের যত অবস্থাসম্পন্ন লোক আছে, তারা আমার কাছ থেকেই আসবাব নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আমার তৈরি আসবাব স্বয়ং মহারাজার প্রাসাদে আছে।'

কথাগুলো বলার সময় কারিগরের চোখমুখ থেকে অহংকার ঝরে পড়তে দেখলো রুদ্রদেব। তবে এখনো তার কাজের ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।

'রাজার কাছ থেকে জঙ্গলের একটা ভাগ আমি বরাদ্দ পেয়েছি। অবশ্য বিনে পয়সায় নয়। সেজন্য রাজাকে বেশ বড়ো অংকের কর দিতে হয়। সেই জঙ্গল থেকেই আমি কাঠ নিয়ে আসি কাজের জন্য। অনেক ভালো ভালো গাছ আছে সেখানে। সেই জঙ্গল এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই চলে গেছে রাজমার্গ। সেই জঙ্গলে আমার ভাগের গাছ পাহারা দিতে হবে তোমাকে।'

যাক, এতক্ষণে বোঝা গেল। জঙ্গল পাহারা দিতে হবে। প্রশ্নটা রুদ্রদেব স্বাভাবিকভাবেই করলো, 'কেন? জঙ্গলের গাছ পাহারা দেবার কী দরকার? চোর আছে না-কি?'

'চোর আছে মানে! চোরে ভরা। ভালো ভালো গাছ কেটে নিয়ে যায়। রাজার আদেশ মতে, বছরে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছই আমি কাটতে পারবো। তার বেশি না। গাছের হিসাব বছরের শুরুতে করে যায় রাজার লোক। এখন চোরে যে গাছ কাটে তাদের হিসাব মতে সেই গাছ আমিই কাটি। আর যেহেতু রাজার বরাদ্দে আমিই এই জঙ্গলের মালিক তাই এই গাছের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্বও আমার। রাজার সৈনিকেরা এই কাজে আমাকে কোনো সাহায্য করবে না।'

রুদ্রদেব বুঝতে পেরেছে। একজনের বেশি লোককে এই কাজের জন্য এই কারিগর নিয়োগ করবে না। আর একা একজন লোকের পক্ষে জঙ্গলের ভেতর থেকে জঙ্গল পাহারা দেবার কাজ করাটা বেশ কঠিন হবে। চোরের ভয় তো আছেই। এছাড়া আছে হিংস্র শ্বাপদ আর বিষাক্ত সর্প। চন্দন গাছ যেখানে থাকে সেখানে সাপ থাকে অনেক।

এমন কাজের জন্য সহজে লোক পাওয়া যাবার কথা না। তাই একজন অনাহূত আগন্তুকের কাছে এই কাজের প্রস্তাব দিতে তার একটুও বাঁধেনি।

'আমি যদি কাজের ভার নিতে চাই তাহলে কোথায় থাকতে হবে?'

'অবশ্যই জঙ্গলের ভেতরে।'

'মানে?'

কার্যসিদ্ধির খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কাষ্ঠ কারিগরের চোখমুখ, 'আরে সেসব তো তোমাকে ভাবতে হবে না। আগেই না বললাম, আমি এই অঞ্চলের সেরা কাঠের কারিগর। জঙ্গলের একেবারে পাশেই আমার বানানো একটা মজবুত কাঠের ঘর আছে। তুমি ওখানেই থাকবে। শস্য, সবজি আর ভালো ভালো সব খাবার আমার এখান থেকেই নিয়ে যাবে তুমি। ওখানে তোমার জ্বালানিরও কোনো অভাব হবে না। যা তেল

লাগে আমিই দেবো তোমাকে। শুধু তাই নয়, তোমাকে খালি পায়ে হেঁটে জঙ্গল পাহারা দিতে হবে না। একটা ভালো জাতের ঘোড়া পাবে তুমি। ঘোড়ায় আরোহণ করতে জানো?'

'তা জানি একটু আধটু।'

'বেশ।'

'সব দেবেন। ঠিক আছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কী কী দেবেন তা তো বললেন না।'

'অস্ত্রশস্ত্র মানে?' কারিগরের মুখ এবার খানিকটা শঙ্কিত রূপ ধরলো, 'অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কী হবে?'

রুদ্রদেব এই কথা শুনে না হেসে পারলো না, 'আপনার জঙ্গলের কাঠচোর অথবা ডাকাতের সাথে যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে তো তাদের সাথে লড়াই করতে হবে। আর আমি কি খালি হাতে লড়াই করবো নাকি?'

'না না, খালি হাতে করবে কেন? একটা শক্ত বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরলেই হলো। আমার আগের পাহারাদার ঠিক তাই করতো।'

আগের পাহারাদারের কথায় চোখ নাচালো রুদ্রদেব, 'আপনার আগের পাহারাদার এখন কোথায়?'

উত্তর দিতে গিয়ে গলায় বাঁধল কারিগরের। কথাটা বলতে পারলো না।

'আমিই বলছি। আমি জানি আপনার আগের পাহারাদারের কী হয়েছে। দস্যুদের হাতে পড়ে বেচারা অকালে প্রাণ হারিয়েছে।'

ঝট করে চোখ তুললো কারিগর, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'যে লোক দস্যুভরা জঙ্গলের ভেতরে রাতে পাহারা দেয় শুধু লাঠি হাতে, তার শেষ পরিণতি যে দস্যুর হাতেই লেখা থাকবে, এতে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'না মানে, আমার পাহারাদার'

'থাক, আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনার আগের লোক সম্পর্কে আমার কিছু জানার দরকার নেই। একা একা ঐ জঙ্গল পাহারা দিতে হলে আমাকে অবশ্যই অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে। খালি হাতে পারবো না। দূরপাল্লা আর স্বল্পপাল্লা এই দুই রকমের শস্ত্রই আমার লাগবে। তাহলে ঐ দস্যুদলের সাথে আমি লড়াই করতে পারবো। আপনার কাঠও রক্ষা করতে পারবো অনায়াসে। কেউ গাছ আর কেটে নিতে পারবে না।'

'কিন্তু তুমি কি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারো? শিখলে কোথায়? তুমি কি ক্ষত্রিয় বর্ণের নাকি?'

'না, আমি ব্রাহ্মণ। তবে শস্ত্র আর শাস্ত্র এই দুই বিদ্যাই আমার সমানভাবে শেখা হয়েছে। এতো কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আপনি শুধু বলুন, আপনি কি আমাকে শস্ত্র দিতে পারবেন? তাহলে আমি কাজ শুরু করতে পারি।'

'আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি। তুমি তাহলে কাল ঠিক এই সময়েই চলে এসো। আমিও একটু ভেবে দেখি তোমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া যায় কি না।'

রুদ্রদেব সরে এলো।

পেছনে চিন্তারত কারিগর। অস্ত্রশস্ত্র দিতে গেলে অনেক টাকা বাড়তি খরচ হয়ে যাবে। সেটা বড়ো কথা নয়। সমস্যা আরো আছে। যার তার কাছে অস্ত্র ইচ্ছে করলেই

তুলে দেওয়া যায় না। বৈধ অবৈধ বলেও একটা ব্যাপার আছে। রাজার আইন আছে। তবে সে যতটুকু জানে, কেউ যদি কোথাও পাহারা দিতে যায়, তাহলে সে রাজার আইনেই সাথে অস্ত্র রাখতে পারে। সেটা নিশ্চয়ই বৈধ। তবু একটু খোঁজখবর করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

ওদিকে হাঁটতে থাকা রুদ্রদেবের মাথায়ও তখন চলছে অন্য চিন্তা। একটা জায়গা দরকার ছিল যেখানে সে থাকতে পারে। সাথে খাওয়ারও ব্যবস্থা হয়। তা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তবে তার আসল উদ্দেশ্য আলাদা। তিন হাজার বছর আগের শেখা বিদ্যাগুলোর অনেকটাই ভুলে গেছে সে। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। গত তিন হাজার বছর ধরে সে অভিশাপের যন্ত্রনায় ভুগেছে। সেই যন্ত্রণা ভোগের মাঝে পুরানো বিদ্যা অভ্যাসের অবসর ছিল না। তবে নিবিড় অভ্যাস করলে তার সেই বিস্মৃত বিদ্যা আবার মনে পড়বে বলেই তার বিশ্বাস। সেজন্য দরকার একটা নিরিবিলি জায়গা।

নিরিবিলি জায়গার সাথে অভ্যাস করার জন্য অস্ত্রও দরকার ছিল। ঝামেলা হবে মন্ত্রগুলো নিয়ে। তবে কঠোর তপস্যা করে সেসব আবার আত্মস্থ করতে হবে। মহাদেব তাকে মহাস্ত্র পাশুপতের বর দান করেছেন। তবে দক্ষতা ছাড়া সেই অস্ত্র তার আয়ত্তে আসবে না। মন্ত্রের ব্যবহার আর দিব্যাস্ত্র ধারণ করার জন্য শরীরকে প্রস্তুত করতে হবে। কাল গিয়ে দেখা যাক। কাঠের কারিগরের সিদ্ধান্তের ওপর তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অনেকটাই নির্ভর করছে।

পরদিন ঠিক সময়েই হাজির হলো সে। কাঠের কারিগর সব খোঁজখবর করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। তাকে দেখে সম্ভাষণ জানালেন, 'তুমি এসেছ তাহলে। আমি তোমার অপেক্ষাই করছি। আমি তোমাকে অস্ত্রশস্ত্র যা যা লাগে কিনে দেবো। আজই চলো। অস্ত্রশস্ত্র কিনে আজই তোমাকে সবকিছু সহ রেখে আসবো জঙ্গলে।'

'আচ্ছা।'

সোমগড়ের অস্ত্রের কারিগরের হাবভাব দেখার মতো। প্রথমেই নজর চলে যায় তার নাকের নিচে থাকা মস্ত গোঁফটার দিকে। এই জড়বস্তুর যেন দর্প আছে। কামারের ভাবভঙ্গি সম্রাটের মতো। বুকখোলা জামার বদৌলতে তার মস্ত ভূরির পুরোটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে অস্ত্রের কারিগর মানে ঠিক কামারের মতো লাগছে না। রাজার কারাগারের জল্লাদ হলে আরো বেশি মানাতো। সেই কামারের স্বরও জল্লাদের মতোই জলদগম্ভীর, 'তুমি কী অস্ত্র কিনবে হে? তাড়াতাড়ি বলো।'

কাঠের কারিগর অস্ত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। সে রুদ্রদেবকে দেখিয়ে দিলো, 'আমি কিনবো না। এই যুবক কিনবে। তবে চিন্তা কোরো না। টাকা আমিই দেবো।'

বিশাল দেহ টেনে অনেক কষ্টে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো অস্ত্রের কারিগর, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

ভেতরে তার নিজস্ব অস্ত্রাগারে ওদের নিয়ে গেল সে। অস্ত্রাগারের চেহারা দেখে সন্তুষ্ট হলো রুদ্রদেব। সব ধরনের অস্ত্রই আছে এখানে। তীর, ধনুক, তলোয়ার, ফাঁস, চক্র, বর্শা, তোমর, গদা, কুঠার, মুদগর, পাতিশা, বজ্র, উরুমি সব ধরনের অস্ত্রই সাজানো আছে সারে সারে। তিন হাজার বছরে মানুষের যুদ্ধকলায় নানা পরিবর্তন

অবশ্যই এসেছে তবে এটুকু দেখে বোঝা যাচ্ছে মূল ব্যাপারগুলোতে এখনো তেমন একটা পরিবর্তন আসেনি।

প্রথমেই ধনুকে হাত দিলো সে। সেই অস্ত্রের ঠান্ডা শরীরে হাত পড়তেই তার পুরো শরীর যেন মৃদু কেঁপে উঠলো। কত বছর পরে কোনো অস্ত্রে হাত পড়লো তার। স্মৃতির বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো সাথে সাথে। তার মনে পড়লো অস্ত্রশাস্ত্রের সেসব কথা। ধনুক কীভাবে পরীক্ষা করতে হয়। আদর্শ ধনুকের মাপ কেমন। ধনুক চার হস্ত দৈর্ঘ্যের ব্যবহার করা উত্তম। কিন্তু এখানে সাড়ে তিন হস্তের বেশি পাওয়া গেল না। তীর অবশ্য একেবারে শাস্ত্রমাপে আছে। পুরো তিন হস্ত।

ধনুক, তীর, বর্শা আর তলোয়ার পছন্দ করে কিনে নিলো সে। পয়সা মিটিয়ে দিলো কাঠের কারিগর। তারপর ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে পৌঁছল তারা।

জঙ্গলের পাশেই বেশ ভালো একটা ঘর বানানো আছে। শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনের আঙ্গিনার আকারও বেশ বড়ো। সব রকমের অভ্যাসই এখানে করা যাবে। প্রথম দেখাতেই জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল রুদ্রদেবের।

ঘরের দরজার বেশ শক্ত তালা দেওয়া। ভেতরে তেমন কিছু নেই। এদিকে চোরেরা মূল্যবান কাঠ চুরি করতে আসে, কিন্তু তারাও বোধহয় জানে এই ঘরে কিছু নেই। তাই তালায় কারো হাত পড়েনি।

ঘরের ভেতরে ঢুকলো রুদ্রদেব। সাথে কারিগর। ঘরের একপাশে শোবার ব্যবস্থা। ভূমিশয্যা। আরেক কোণে শস্য আর কিছু খাবার রাখা আছে। পরিমাণে নেহাত কম নয়। রান্না করার পাত্র আর কিছু প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস এদিক সেদিক ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে। জিনিসপত্র কম থাকায় ঘরটাকে আরো বেশি বড়ো মনে হচ্ছে।

কাঠের কারিগর বিদায় নেবে। রাত হয়ে আসছে, 'তুমি তাহলে থাকো। সব গুছিয়ে নাও। সামনেই কুয়া আছে। জল সেখান থেকেই পাবে। রাতের বেলা কান খাড়া রেখো। কাঠ চোরেরা রাতের বেলাতেই আসে বেশিরভাগ।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আজ থেকে আপনি আমার অন্নদাতা। প্রভু। আপনার আমানত রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবো না আমি। আপনার যখন কোনো দরকার হবে আমাকে স্মরণ করবেন।'

ঘোড়ার পিঠে চেপে বিদায় নিলো কারিগর। রুদ্রদেব আবার ঢুকল ঘরের ভেতরে। সময় নষ্ট করা চলবে না। আজ থেকেই যোগাভ্যাস আর শরীর চর্চা শুরু করতে হবে। সাথে এই জঙ্গলটাও একবার ঘুরে দেখে আসতে হবে। কোনো জায়গার সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে সেই জায়গার প্রতি অঙ্গুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে।

ঘোড়াটাও ভালোই মনে হয়েছে। আলো নিভে যাবার আগেই জঙ্গল থেকে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

১৮

ক্রেয়নের রেখে যাওয়া জাহাজ জায়গামতোই আছে। সমস্ত বন্দরে এখন নীরবতা। শুধু নদীর মৃদু ঢেউ জাহাজের গায়ে ছলাত ছলাত আওয়াজ করছে। কিন্তু সে আওয়াজ এই নীরবতা ভাঙছে না, বরং এই ছন্দে আরো গভীর হচ্ছে।

জাহাজের সাধারণ নাবিক আর খালাসিদের কোন ধারণাই নেই তাদের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসা মহাবিপদ সম্পর্কে। সারাদিনের নানা কাজের শেষে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে পরিশ্রমী শরীরগুলো। নাহাপনা অনেক সৈন্য নিয়ে জাহাজে উঠলেন। পেঁচার মতো নিঃশব্দে। তারপর তার লোকেরা জাহাজের চারদিকে অবস্থান নিলো নিঃশব্দে।

জাহাজের সবার এখন ঘুমিয়ে থাকার কথা থাকলেও একজনের চোখে কোনো ঘুম নেই। নাহাপনার সেনাদের জাহাজে ওঠা বেশ ভালোভাবেই টের পেলো সে। তারপর টের পেলো নোঙ্গর তুলে জাহাজ ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। টের পেলেও বিছানা ছেড়ে নড়লো না। সে জানতো আজ রাতে এমনটাই হবে। সেই অপেক্ষায় অনেকদিনের অভ্যাস আজকের রাতে ত্যাগ করেছে সে। যথেষ্ট মদ আর পান করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজ এক ফোঁটা মদও গলা দিয়ে নামতে দেয়নি। এখন অপেক্ষা করছে মোক্ষম সময়ের। রাহু জানে, সেই সময়ের এখন আর খুব বেশি বাকি নেই।

জাহাজ জায়গামতো দূরে সরিয়ে নেওয়া হতেই পরিকল্পনামতো কাজ শুরু করলো নাহাপনার লোকজন। অ্যালেক আছে তাদের তত্ত্বাবধানে।

'শোনো সবাই। নাবিক আর খালাসিরা সবাই ঘুমাচ্ছে। সবাইকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে নিচের খোলে জড়ো করো। সাবধান, কোন রকমের শব্দ এবং চেঁচামেচি যেন না হয়। ঘুম থেকে উঠিয়েই অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলবে। সাথে সাথে সবার হাত আর মুখ বেঁধে ফেলবে। আবারো বলছি, সাবধান, কোনো রকমের কোনো শব্দ যাতে না হয়। আশেপাশের কোনো জাহাজের লোক যাতে কিছুই টের না পায়।'

নাহাপনার আদেশ শুনে সৈনিকেরা কাজে লেগে পড়লো।

নাবিক আর খালাসিদের ঘরের দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা নেই। সৈন্যরা আদেশ মতো ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গেল। তারপর চলে গেল নাবিকদের ঘরে। সবাই একসাথে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বন্দি হয়ে গেল নাবিকেরা। টলতে টলতে বেরিয়ে এলো তারা। নিমেষের মধ্যেই তাদের হাত মুখ বেঁধে ফেলা হলো। তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। এখনো ঘুমের ঘোর ঠিকমতো কাটেনি।

সবাইকে খোলের ভেতর সার দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসানো হয়েছে। ঠায় বসে থাকা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো উপায় খোলা নেই।

অ্যালেক নাহাপনার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো, 'মহারাজ, আপনার আদেশ মতো সব কাজ শেষ। এখন বলুন, এই জাহাজ আর নাবিকদের কী করবেন?'

'পরিকল্পনা তো আগেই ঠিক করে রাখা আছে অ্যালেক। এই জাহাজে তাদের ধোঁকা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে কাজ দেওয়া হয়েছিল। তারা আসল উদ্দেশ্যের কিছুই জানতো না। সবাই নিজের নিজের কাজ করেছে। সবাই সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'জি মহারাজ।' অ্যালেক বুঝতে পেরেছে।

'কিন্তু, মনে রেখো, মানুষ কেবল নিজের কর্ম দ্বারাই শাস্তি পায় না, মাঝে মাঝে ভাগ্যের কারণেও পায়। ওরা ভাগ্যের কারণেই এখন শাস্তি পাবে।'

'কিন্তু মহারাজ, এভাবে এই নাবিকেরা যদি গায়েব হয়ে যায়, তাহলে তো আমরাও বিপদে পড়বো। মিশর, গ্রীস, রোমে খবর পৌঁছে যাবে যে এই নাবিকেরা ভারত থেকে আর ফিরে আসেনি। ভালো করে খোঁজখবর করলে সবাই জানতে পারবে তাদের শেষ দেখা গিয়েছিল আমাদের এই বন্দরে। তাহলে তো আপনি যে ভয় পাচ্ছিলেন সেটাই হবে। সবাই জেনে যাবে আমাদের এই বন্দরে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। সেটা তো খুব একটা ভালো হবে না।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ওরা ফিরে না গেলে নানা ঝামেলা হবে। তবে সে বুদ্ধিও আমার মাথায় আছে। আগেই এই ব্যাপারটা চিন্তা করে ফেলেছি। ওদের শাস্তি দিতে হবে প্রাকৃতিক উপায়ে। তাহলেই আর কেউ কোন সন্দেহ করবে না।'

'প্রাকৃতিক উপায়? সে আবার কী?'

'আমার লোকদের মধ্যে যারা খুবই দক্ষ সাঁতারু তাদেরকে দিয়ে এই জাহাজ আমি সমুদ্রে পাঠাবো। তারপর ওরা জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে তীরে ফিরে আসবে। সবাই জানবে এরা সবাই জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে। এমনিতেও আমাদের এদিকের চোরাস্রোত আর ডুবো পাথরের ভালোই বদনাম আছে।'

'ওদের সবাইকে মেরে ফেলবেন? এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে?' অ্যালেক মেনে নিতে পারেনা।

'উপায় নেই। ওদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না। তাহলে তারা উত্তরের অতীত অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে। তাই এখন এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

অ্যালেক আর কিছুই বললো না। নাহাপনা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। এখন আর উচ্চবাচ্চ করে লাভ নেই। নিরপরাধের বলি এই প্রথম তো হচ্ছে না। সে আদিকাল থেকে চলে আসছে। দেবতারাও এর অনেক উদাহরণের জন্ম দিয়েছেন যুগে যুগে। তবে নিপীড়িত মানুষ অন্যায়কে একেবারে অন্তর থেকে অনুভব করতে পারে। যত কিছুই হোক এই ভূখণ্ডে অ্যালেকের জাতি নিপীড়িত। কোনোমতে যুদ্ধবিদ্যা বিক্রি করে আপাতত রাজার সুনজরে থাকা গেছে।

নাহাপনা অ্যালেকের সাথে কথা শেষ করে সার বেঁধে বসিয়ে রাখা সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নদীর বাতাসে মশালের আলো কাঁপছে। সেই কাঁপা আলোয় নাবিকদের আতঙ্কিত দৃষ্টি স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। দীর্ঘ বাণিজ্য যাত্রা শেষে এদের এখন বাড়ি যাবার সময়। তবে এরা সবাই বুঝতে পেরেছে, এই জীবনে আর বাড়ি ফেরা হবে না।

নাহাপনা হাতমুখ বাঁধা একজনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সৈনিকদের দিকে ইশারা করলেন, 'ওর বাঁধন খুলে দাও।'

তড়িৎ আদেশ পালন করা হলো। হাত-মুখ খুলে দিলেও এই লোক কোনো চিৎকার করলো না। নাহাপনা এবার তাকে ইশারা করলেন, 'বাইরে এসো।'

খোল থেকে বেরিয়ে এলেন দুজনে। রাহু হাতের চামড়া ডলছে। বেশ শক্ত করে বেঁধেছিল। আশা দুরাশার দোলাচলে দুলছে এখন সে। বারিগাজায় আসার পরদিনই তাকে গোপনে ডেকে নিয়েছিলেন নাহাপনা। নিজেদের সন্দেহ এবং পর্যবেক্ষণের কথা খুলে বলেন তাকে। সব শুনে রাহুর মাথা ঘুরে ওঠে। টের পায় বিপদে পড়ে গেছে সে। তবে নাহাপনা পরের মুহূর্তেই তাকে তার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেন। প্রত্যাখ্যান করার উপায় ছিল না রাহুর। সে নাহাপনার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে রাজি হয়ে যায়। নাহাপনা অবশ্য তাকে বিনা মুল্যে খাটিয়ে নেবেন না। বিনিময়ে মোটা অংকের মুদ্রা পাওয়া যাবে। অবশ্য তা না দিলেও চলতো। রাজার কথার বাইরে যাওয়া যায় না। তাতে রাজদ্রোহ হয়। তার একটাই শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড। সে পথে হাঁটা যাবে না। প্রাণ রাহুর অনেক প্রিয়।

তারপর থেকে রাজার কাছে নিয়মিত জাহাজের নানা খবর পাচার করতে লাগলো সে। আজকের রাতের ঘটনার আভাসও সে আগেই পেয়েছিল। সে অনুযায়ী খবরও আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন দেখা যাক কি হয়। সবাইকে তো মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাকে কী বাঁচিয়ে রাখবেন?

খোলের বাইরে এসেই নাহাপনা ঠিক রাহুর সামনে দাঁড়ালেন, 'তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা এখন আমার এবং এই রাজ্যের জন্য খুবই বিপজ্জনক। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমাকে আমার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। রাজধর্ম অনুসারে যে রাজার জন্য একবার হলেও গুপ্তচরের কাজ করেছে সে যদি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে সে অবধ্য। তুমি কি নিজেকে আমার গুপ্তচর হিসেবে মেনে নিয়েছ?'

জীবনে এর আগে কখনো গুপ্তচরের কাজ করেনি রাহু। তার গুপ্তচর হবার কোন ইচ্ছেও নেই। বেশ বিপদজনক কাজ। তবে রাজার মন তো রাখতে হবে, 'মহারাজ, আপনি আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। আমি রাজাজ্ঞা সর্বদা পালন করবো। আপনি যদি বলেন তবে আবার গুপ্তচরের কাজ করবো। রাজ্যের ক্ষতি হবে এমন কোন কথাই কখনো আমার মুখ থেকে বের হবে না।'

'হ্যাঁ, তাহলেই ভালো। মনে রেখো, যে গুপ্তচর রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজ করে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরে ফেলাই নিয়ম। আর গুপ্তচরের গুপ্তহত্যাই হয় বেশির ভাগ সময়। এই নাও, তোমার পুরস্কার।'

একটা মুদ্রা থলি রাহুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন নাহাপনা। দুহাতে সে থলি গ্রহন করলো রাহু। এরপরে এলো নাহাপনার পরবর্তী নির্দেশ, 'শোনো, ওদের জাহাজ ডুবে যাওয়া নিয়ে লোকজন নানা কথা বলবে। সবার আগে তোমাকে খুঁজবে লোকে। তুমি ওদের জাহাজে ছিলে। তাই তুমি এই মুহূর্তেই বারিগাজা থেকে চলে যাবে। এই মৌসুমের সব জাহাজ আগামী দুই মাস পর্যন্ত এই বন্দরে থাকবে। এর মধ্যে তুমি এই বন্দরের ধারেকাছে আসবে না। এরপরে ইচ্ছে করলে আসতে পারো। তবে মনে রেখো, তুমি যখন আবার ফিরে আসবে তখনো লোকে তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস

করবে। ওদের মধ্যের দেশিও থাকবে আবার বিদেশিও থাকবে। তুমি শুধু বলবে কিছুই জানো না। একদম আকাশ থেকে পড়েছ।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো আমি।'

'এখন তুমি বারিগাজা থেকে চলে যাও। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

রাহু মুদ্রার থলিটা সতর্কতার সাথে কোমরে গুঁজে নিলো। তারপর জাহাজের পাশের নৌকায় নেমে তীরের দিকে রওনা দিলো। অন্ধকারে তাকে দিশা দেখাচ্ছে বন্দরের আলো। নৌকা থেকে নেমে সে আর দেরি করলো না। পা চালাল বেশ জোরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বেরিয়ে গেল বন্দরনগরী থেকে।

নাহাপনার তুখোড় সাঁতারু নাবিকেরা এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা শুনতে পেলো রাজার নির্দেশ, 'এবার তোমরা কাজ শুরু করো। নর্মদা থেকে বেরিয়ে পাঁচশো ধনু সমুদ্রের ভেতরে নিয়ে যাবে জাহাজটা। তারপর খোলে বেশ কয়েকটা বড়ো গর্ত করে জাহাজটা ডুবিয়ে দেবে। আশা করি তোমরা পাঁচশো ধনু সাঁতরে আবার ফিরে আসতে পারবে।'

'পারবো মহারাজ।'

'যাও। কাজ সম্পন্নের খবর পেতে যেন এই রাত না পেরিয়ে যায়।'

অ্যালেক আর বাকি সৈন্যদের নিয়ে তীরে ফিরে লেন নাহাপনা। নাবিকেরা ততক্ষণে জাহাজটাকে মাঝনদীতে নিয়ে গেছে। মুখ বাঁধা বন্দি নাবিকেরা কোনো শব্দই করতে পারছে না। তারা বুঝতে পারছে না, তাদের ছাড়া তাদের জাহাজ চলছে কীভাবে।

নর্মদা পেরিয়ে রাতের আঁধার চিরে জাহাজ এসে পড়লো সমুদ্রে। নির্দেশিত দূরত্বে এসে নাবিকেরা জাহাজের খোলে বেশ বড়ো গর্ত করলো কয়েকটা। গলগল করে ঢুকতে লাগলো জল। নিচের খোলের ভেতরের বন্দি নাবিকেরা জলের স্পর্শ পেলো। এবার তারা বুঝতে পারলো কী হতে যাচ্ছে। এরা জাহাজটা ডুবিয়ে দিচ্ছে। আর এভাবে হাত-পা-মুখ বাঁধা থাকলে শুধু জাহাজ ডুববে না। তার সাথে সাথে ওরাও ডুবে যাবে। মরিয়া হয়ে হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করলো তারা। মুখ দিয়ে ক্রমাগত বেরোচ্ছে গোঁ গোঁ শব্দ। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। জলের স্তর বাড়ার সাথে সাতে মরিয়া গোঙানির আওয়াজ বাড়তে লাগলো শুধু।

জাহাজ খুব দ্রুত ডুবছে। নাহাপনার পাঠানো নাবিকেরা সবাই জাহাজের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। জাহাজ তলিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে তারা লাফিয়ে পড়লো পানিতে। ভিনদেশের অপরিচিত সমুদ্রে বাড়ি ফেরার তীব্র হাহাকার আর আশা বুকে নিয়ে সলীল সমাধি হলো নাবিকদের।

নাহাপনা অ্যালেককে নিয়ে রাজভবনে ফিরে এসেছেন। তার পাঠানো নাবিকদের ওপর তার আস্থা আছে। কাজটা ওরা করতে পারবে। কোনো ভজকট পাকাবে না।

নাহাপনাকে রাজভবনে পৌছে দিয়েই অ্যালেক নিজের বাসস্থানের দিকে যেতে উদ্যত হলো। নাহাপনাক তাকে থামালেন, 'আজ রাতে তো আর ঘুমানোর জন্য সময় খুব একটা বাকি নেই। এই সময়টা ঘুমিয়ে কিইবা লাভ হবে? তুমি এই ব্যাপারে কী চিন্তা করলে?'

'মহারাজের কী আদেশ বলুন। কোন কাজ কী করতে হবে?'

'হ্যাঁ, বেশ বড়ো কাজই বটে। তোমার উপস্থিতি সেখানে বিশেষ প্রয়োজন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় তোমার অংশগ্রহণ যথেষ্ট জরুরি। আমার সেনাদলে তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে আছো। আমাদের এদিকের রাজনীতির সাথে তোমাদের রাজনীতির পাঠের অনেক পার্থক্য। সেই অন্য ভাবধারণা আমাদেরকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। আমি এজন্যই তোমাকে পরামর্শ সভায় যেতে বলছি। আজকের রাতে মন্ত্রণায় বসবো আমি।'

'মন্ত্রণা? এত রাতে। কার সাথে মন্ত্রণা করবেন?'

'তোমাকে বলা হয়নি, উজ্জয়িনী থেকে মন্ত্রী সারথীকে ডেকে আনা হয়েছে। তার সাথেই আজ রাতে মন্ত্রণা করতে হবে। কাল সকালে তিনি আবার ফিরে যাবেন। যেহেতু আমি এখন মৌসুম উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে থাকছি না, তাই মন্ত্রী সারথীর এখন ওখানে থাকাটা খুবই জরুরি। খনির কাজ সেখানে তিনিই তদারক করেন। একদিনও তার বাইরে থাকা চলবে না।'

'চলুন মহারাজ। মন্ত্রণাকক্ষে যাই তাহলে।'

'হ্যাঁ, চলো।'

সারথী বর্ণে ব্রাহ্মণ। ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া তার অন্য একটা প্রধান পরিচয় আছে। শক রাজ্যে কুশলী লোক হিসেবে তার বেশ সুনাম। এই মুহূর্তে রাত জেগে মহারাজের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। তবে শুধু অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করছেন না। জপমালা হাতে নিয়ে একমনে জপ করছেন। খালি গায়ে উত্তরীয় জড়ানো, গৈরিক ধুতি পরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, সৌম্য মুখশ্রী। দেখে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে এই লোক বিষয়বুদ্ধি, রাজনীতি এবং কূটনীতিতে বেশ পাকা ধারণা রাখেন।

নাহাপনা মন্ত্রণাকক্ষে বসে সারথীকে খবর পাঠালেন। সারথী খবর পেয়ে জপ সম্পন্ন করলেন। জপমালা প্রণাম করে সরিয়ে রাখলেন পাশে। এতক্ষণ যে উত্তরীয় তার শরীরে আলুথালু ভাবে জড়িয়ে ছিল এবার সারা শরীরে পরিপাটি করে জড়িয়ে নিলেন তিনি। তারপর রওনা দিলেন মন্ত্রণাকক্ষের দিকে। তার মুখের ভাব এখন আর সৌম্য নয়।

'মহারাজের জয় হোক।'

'বসুন সারথী। আপনাকে আজ রাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।'

'মহারাজ, মন্ত্রী যখন রাজার জন্য অপেক্ষা করেন তখন রাজ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু যদি উল্টোটা হয়, যদি রাজাকে মন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তবে রাজ্যের অবনতি সুনিশ্চিত।'

'আপনার কথা আগাগোড়া ভালো করে আমি কখনোই বুঝতে পারি না। থাক, সেটা বোঝার চেষ্টা করে তেমন একটা লাভ হবে না। আপনার কথা শুরু করতে পারেন। বলুন আমার জন্য কী খবর নিয়ে এসেছেন।'

সারথী অ্যালেকের দিকে তাকালেন, 'আমি এখন আপনার সাথে যে কথাগুলো বলবো, সেগুলো আমাদের দুজনের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়।' অ্যালেকের দিকে তার চোখ থাকলেও কথাটা বলা হয়েছে নাহাপনাকে উদ্দেশ্য করে।

নাহাপনা অভয় দিলেন, 'আমি সব বুঝেশুনেই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি সবকিছু নির্ভয়ে বলুন। আপনি আমার উজ্জয়িনীর মন্ত্রী আর এই অ্যালেক হচ্ছে এই বারিগাজার মন্ত্রী। সাথে সেনাপতিও।'

'আজ্ঞা, মহারাজের যা আদেশ। আমার গুপ্তচরেরা ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে খবর পাঠিয়েছে। নিয়মিত খবরের মধ্যে বেশ কিছু খটকা লাগা ব্যাপারও আছে। শেষ গুপ্তচর ফিরেছে দুদিন আগে।'

'বলুন, তারা কী কী খবর পাঠিয়েছে।'

'মহারাজ, তারা কোশল, পাঞ্চাল, দর্শন, কলিঙ্গ, সাতবাহন, চেরা, চোলা, পাণ্ড্য থেকে খবর সংগ্রহ করে এনেছে। সব রাজ্যের তথ্যই আমি পেয়েছি।'

'বলুন, এর মধ্যে কোন রাজ্য আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি? কোন রাজ্যের খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? সব রাজ্যের তথ্য আপনি পেয়েছেন, কিন্তু সেই সব শোনার সময় আমার নেই। আপনি তো জানেন কোনগুলো আমার শোনা দরকার। সেগুলোই বলুন।'

'যথা আজ্ঞা মহারাজ। আমার বিচারে আর্যাবর্তের যে রাজ্য আপনার জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি, যে রাজ্য থেকে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাবধানে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে সাতবাহন রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজা মহারাজ সাতকর্ণী। তিনি বহু রাজ্য জয় করে তার রাজ্যের সীমা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন। এখন তার রাজ্যের সীমানা নাসিকের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে। তার রাজ্যের পশ্চিম-উত্তর সীমানা এবং আমাদের দক্ষিণ সীমানা একই। আমার মনে হয় তার থেকেই আপনার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

'তার সম্পর্কে সবকিছু বলুন।'

'মহারাজ সাতকর্ণীর শত্রুর অভাব নেই। কিছুদিন আগেও গুপ্ত ঘাতক তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি।'

'আর্যাবর্তের সবচেয়ে বড়ো রাজ্যের রাজার অসংখ্য শত্রু থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তারপরে বলুন।'

'আমাদের বারিগাজার মতো ওনার তিনটা বড়ো বন্দর আছে। পশ্চিমের ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্য করার জন্য তিনটা বন্দরই উনি সুসজ্জিত করেছেন। কিন্তু সেই সজ্জা কাজে দেয়নি। আমাদের গুপ্তচরের দেওয়া খবর অনুযায়ী তার এই তিন বন্দরের ব্যাবসার অবস্থা খুবই খারাপ। আমি এর কারণ বের করেছি। সে শুধু মসলা বিক্রি করে। তার কাছে সব ধরনের সামগ্রী পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। আর ঠিক উল্টো কারণে এই ভূখণ্ডে সবচেয়ে ভালো ব্যাবসা করছি আমরা। সে খবর মহারাজ সাতকর্ণীর অজানা থাকার কথা না। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, সেই সম্পদের লোভে, ব্যাবসা কব্জা করার লোভে, মহারাজ সাতকর্ণীর নজর আমাদের রাজ্যের ওপরেই পড়বে। সাতবাহন সাম্রাজ্য সাতকর্ণীর চেয়ে বড়ো সম্রাট এখনো দেখেনি। তার সাহসেরও কোনো তুলনা নেই।'

নাহাপনা হাসলেন, 'ছোটো ছোটো রাজ্যকে হারিয়ে দেওয়া আর শক রাজ্যকে হারিয়ে দেওয়া কি একই কথা? আমাদের রাজ্যের সীমানা ছোটো হতে পারে, কিন্তু

তারা কি জানে না উত্তর শক আর পহ্লবরা আমাদের সাথে আছে। শকদের যুদ্ধের কুশলতা কি সে জানে না?'

'আমার মনে হয় জানে মহারাজ। তবে মানুষ যখন মরিয়া হয় তখন সে কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। আমার গুপ্তচর খবর এনেছে, সাতকর্ণী চাষবাসের জন্য লোক জড়ো করছেন। অনেক লোক। তার জমিতে চাষ করাবেন। সেই লোকের বাছাই চলছে বেশ সতর্কভাবে। আমার গুপ্তচর অনেক চেষ্টা করেও সেই ক্ষেত্রজীবীর দলে ঢুকতে পারেনি। সেই জায়গা অনেক উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সামান্য চাষের জমি কি কেউ অত উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে? এত বিশাল ক্ষেত্রজীবীর দলেরই বা কী দরকার?'

এবার ভ্রু কুঞ্চিত হলো নাহাপনার, 'তার মানে?'

'আমার ধারণা উনি নতুন সেনাদল তৈরি করছেন। সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছেন। তাও বেশ গোপনে। এবং এই লক্ষণ দেখে অবশ্যই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।'

'তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত? আপনি কী মনে করেন?'

সারথী ইতিহাসে ফিরে গেলেন, 'সে তো যুধিষ্টির অনেক আগেই শিখিয়ে গেছেন, 'শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র।'

'তাদের শত্রু বড়ো রাজ্য আছে?'

'আছে মহারাজ। কলিঙ্গের রাজার সাথে সাতবাহনের বংশানুক্রমে শত্রুতা। কলিঙ্গের এক রাজা অনেক আগে সাতবাহন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। সেই থেকেই শত্রুতা চলছে।'

'তাহলে আপনি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কলিঙ্গের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করুন।'

'তাই হবে মহারাজ।'

'আর আমিও সামরিক শক্তি বাড়াবো। মহারাজ সাতকর্ণী এবার আর রাজ্যের সীমা বাড়াতে পারবেন না।'

'আমি তাহলে উঠি মহারাজ। রথ প্রস্তুত করতে হবে। সকাল হয়ে এসেছে। আমি ভোরে ভোরেই রওনা দেবো।'

'ঠিক আছে। আপনি যান। সেনাদলের প্রস্তুতি নিয়ে আমি এখন অ্যালেকের সাথে কথা বলবো।'

১৯

রাহু সারারাত হেঁটেছে। একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। উত্তেজনা তার মনে ক্লান্তিকে স্থান পেতে দেয়নি। রাজার খেয়াল আবার কখন বদলে যায় কে জানে। ত্রিসীমানায় থাকা যাবে না।

নাসিক সীমান্ত পেরিয়ে সকালে সে প্রবেশ করলো সাতবাহন রাজ্যে। তার বাড়ি এই রাজ্যেই। তবে সে কথা কেউ জানে না। নাহাপনাকে সেই কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার কাজ সব রাজ্যেই থাকে। একটা সাধারণ নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারেই সে নিজের পরিচয় দেয়। যখন যে রাজ্যে থাকে তখন সে রাজ্যেরই নাগরিক হয়ে যায় সে।

এবার নিজের আসল বাড়িতে ফিরছে সে অনেকদিন পরে। পরিবারে কেউ নেই তার। ছোটোবেলাতেই অনাথ হয়েছে। বাবা-মা অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের চেহারা পর্যন্ত তার মনে নেই। গ্রামের কষ্টকর আর নিম্নমানের জীবন কখনোই ভালো লাগেনি তার। সব সময় ইচ্ছে ছিল গ্রাম থেকে বাইরে যাবার। তবে বাঁধ সেধেছিল বয়স আর দূর সম্পর্কের এক জ্যাঠা। তবে কালের নিয়মে যখন তার বয়স বেড়ে একটু পোক্ত হলো আর সেই জ্যাঠাও যমলোকে গেলেন, তখন আর কোনো বাঁধা রইলো না। সহায় সম্পত্তি সব ফেলে রেখে সে বেরিয়ে পড়লো। রঙ্গিন জীবনের খোঁজে। সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু যদিও ছিল না তার। এক টুকরো ভিটেমাটি আর এক চিলতে জমি। ওটুকু তার পিছুটান হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তবে সে সফল হয়েছে। সেদিনের সেই বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করেছে সে। আজ অনেকদিন পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছে সে, নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে তার গ্রামের যে-কোনো লোকের চেয়ে সে বেশি ধনী। তবে বাহ্যিক হাবেভাবে তা বোঝার তেমন কোনো উপায় নেই। গ্রামে পৌছে কিছুদিন নির্ঝঞ্ঝাট বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর সময় একটু স্থির হয়ে এলে বন্দরের দিকে রওনা দিতে হবে। যে পরিমাণ বিনোদনের উৎস বন্দরে আছে সে সম্পর্কে তার গ্রামের লোকজনের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। পাশা, বণিতা, সোম, পশ্চিমা সোম কোনো কিছুরই অভাব নেই। সেই রঙ্গিন জীবন ছেড়ে কেউ এই গ্রামের নিরামিষ জীবনে ফিরে আসার কথা কল্পনাও করতে পারবে না।

অনেকক্ষণ পায়ে হেঁটেছে সে। একটা নদীর ধারে আসতেই সে কষ্টের অবসান হলো। এই নদী আর ঘাট চেনে সে। সেই ঘাটে একটা বাণিজ্য তরী পাওয়া গেছে। একটু সকরুণ অনুরোধ করতেই তাকে নৌকায় তুলে নিয়েছে তারা। যদিও অপরিচিত লোকজন ডাকাতের হয়ে কাজ করে এবং মাঝে মাঝে নৌকার খবর ডাকাতের কাছে পাচার করে তবু এটুকু ঝুঁকি তো মানুষকে সাহায্য করতে হলে করতেই হয়। আর এমন লোক নৌকায় নেবার সুবিধাও বেশ। তাদের নিয়ে নানা টুকিটাকি কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। রাহুকেও কিছু কিছু কাজ করতে হচ্ছে। তবে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার চেয়ে সামান্য পরিশ্রমে নদীপথে আরামে যাওয়া অনেক ভালো।

দুদিন পরে রাহু নিজের রাজ্যের ঘাটে এসে নামে। এই বাণিজ্য তরী আর যাবে না। এখানেই এক মাস নোঙ্গর করে থাকবে। এখান থেকে হেঁটেই যেতে হবে। অবশ্য তার গ্রাম এখান থেকে বেশি দূরে না।

রাহু নৌকা থেকে নেমে পড়লো। এরপরের রাস্তা খুব ভালো করে চেনে সে। পথে একটু গেলেই বড়ো একটা নগর পড়বে। সেখান থেকে গ্রামে অবসর কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হবে। রাজা নাহাপনার দেওয়া থলিটা খুলে দেখেছে সে। তারপর পোশাকের ভেতর বেশ গোপনে লুকিয়ে রেখেছে। তার নিজের সাথেও কিছু খুচরো পয়সা আছে। সেগুলো দিয়েই কেনাকাটা করতে হবে। আসল ভাণ্ডারে হাত না দিলেও চলবে। ক্রেয়নের জাহাজে কাজ করা দীর্ঘ তিন মাসের বেতন পাওয়া যায়নি। যদিও মহারাজ নাহাপনা তা অনেক গুণে পুষিয়ে দিয়েছেন।

নিজ অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত আবহাওয়া টের পেতে শুরু করলো সে। একই সূর্য প্রতিদিন একই বসুমতিতে আলো দেয়। তবু সেই উষ্ণতা আর মাটির ঘ্রাণ একেক জায়গায় একেক রকম। তবে প্রকৃতি দেখার এবং সেই প্রকৃতির বৈচিত্র্য বিচার করার মানসিকতা রাহুর নেই। দুপুর পর্যন্ত হাঁটতেই নগরে উপস্থিত হলো সে। ক্লান্ত শরীরে প্রথমেই একটা অথিতিশালা খুঁজে বের করলো। না, থাকার জন্য নয়। প্রত্যেক অথিতিশালার সামনেই সাধারণের জন্য জল পান করার ব্যবস্থা থাকে। সেই শীতল জলে তৃষ্ণা মেটালো সে।

জল আর ছায়ার স্পর্শে শরীর একটু সুস্থির হলো তার। এবার কেনাকাটা শুরু করা যায়। প্রথমেই একটা ঘোড়া কিনতে হবে। এই জিনিসটার মালিক হবার শখ তার অনেকদিন থেকেই। এবার সুযোগ এসেছে। একটা ঘোড়া থাকলে চলাফেরা করা অনেক সহজ। হেঁটে হেঁটে মরতে হবে না। আর ঘোড়া দিয়ে আরামে চলাচল ছাড়াও আরো অনেক কাজ আছে। ঘোড়া অর্থেরও জোগান দেবে। বিভিন্ন নগরের অনেক বণিক ঘোড়সওয়ারের মাধ্যমে ব্যাবসার খবর এক নগর থেকে আরেক নগরে পাঠান। সেই কাজ করলে ঘোড়ার দানা আর রাহাখরচ বাবদ বেশ কিছু আয় করা যাবে। উপার্জন ভেঙ্গে খাবার লোক সে নয়। কিছুদিন পরে যখন আবার সে বন্দরে ফিরে যাবে তখন ঘোড়া বিক্রি করে দিলেই চলবে।

এই নগরের বাজারে আগেও অনেকবার এসেছে সে। প্রথমেই একটা শতরঞ্জি কিনলো সে। ঘরের জিনিসপত্র কোনটা কোন অবস্থায় আছে জানা নেই। একটা শতরঞ্জি থাকলে ভালো, শোবার ঝামেলা মিটে গেল। রান্নার পাত্র গ্রামের কুমোরের কাছেই পাওয়া যাবে। এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার নেই।

ঘোড়ার বিক্রেতারা যেখানে থাকে সেদিকে রওনা দিলো এবার সে। জায়গাটার কাছাকাছি যেতেই নানারকম ঘোড়ার হ্রেষা কানে এলো তার। তবে সেদিক থেকে তার মনোযোগ কেড়ে নিলো আস্তাবলের পাশের একটা ভিড়। ছোটোখাটো জটলা নয়, রীতিমতো অনেক মানুষ ভিড় করে আছে। এত লোকের ভিড় কেন এখানে?

কৌতূহল বশত আস্তাবলে না ঢুকে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল সে। চক্রাকারে মাঝখানের বেশ বড়ো একটা জায়গা ঘিরে আছে সবাই।

ভিড় যথেষ্ট জমাট। সামনের সারিতে যেতে রীতিমতো কসরত করতে লাগলো সে। তবু সামনের সারিতে যেতে সমর্থ হলো না। অনেক কষ্টে দুজনের মাথার ফাঁক দিয়ে মাঝখানের জায়গাটার দিকে তাকালো সে।

সাথে সাথে চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো তার। আরে এটা কী? এখানে যারা ভিড় করে আছে তাদের সবার থেকে সে বেশি জায়গা ঘুরেছে, অনেক আজব জিনিস দেখেছে। চার চারটে ভাষা সে অনর্গল বলতে পারে। তার চোখ যেহেতু সামনের জিনিসটা দেখে বড়ো হয়ে গেছে তাহলে ভিড়ের অন্যান্য মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য। এতক্ষণে এতো বড়ো ভিড়ের কারণ পরিষ্কার হলো।

অসিত আজ বেশ ভোরে উঠেছে। আজকে গ্রাম থেকে অনেক দূরের এক নগরে যাবার পরিকল্পনা করেছে সে। সেখানে আগেও খেলা দেখিয়েছে তবে সেটা অঙ্গদের রং বদলে যাবার আগে। সেখানে এখন গেলে অনেক রোজগার হবার সম্ভাবনা। দেরি না করে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে।

অঙ্গদ ঘুম থেকে উঠে গেছে। ঘরের বাইরে যায়নি। দরজা বন্ধ। ভেতরেই ঘোরাঘুরি করছে। অসিতকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ছুটে এসে তার পায়ের কাছে দাঁড়ালো। তারপর অসিতকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের এক কোণায়।

আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার। অঙ্গদের পাত্রের জল শেষ হয়ে গেছে। কুঁজো থেকে পাত্রে জল ঢেলে দিলো অসিত। অঙ্গদ দুহাতে তুলে চুমুক দিয়ে পাত্র সাবাড় করে দিলো। ছটফটানি যেন একটু কমলো তার।

ইদানীং নতুন একটা উপায় অসিতের মাথায় এসেছে। রাস্তা দিয়ে সে যখন দূর দূরান্তে খেলা দেখাতে যায়, তখন পথে অনেক গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। আর অঙ্গদকে নিয়ে গেলে সেইসব গ্রামের লোকজন অঙ্গদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তাই সে উপায়টা চিন্তা করেছে। অঙ্গদের শরীরে একটা চাদর জড়িয়ে রাখবে সে। অঙ্গদের এই শরীর দর্শন এখন অনেক দামি। খেলা দেখানো ছাড়া এখন অনুপযুক্ত জায়গায় প্রদর্শন করে সেই দাম কমানোর কোনো মানে নেই।

অঙ্গদকে কিছু ফল দিলো সে। বাদাম শেষ হয়ে গেছে। অঙ্গদ বিরস মুখে ফলগুলো খেয়ে নিলো। সে বাদাম অনেক পছন্দ করে। জঙ্গলের বানরের রুচির কোনো সমস্যা হয় না। তারা যা পায় তাই খায়। রুচির সমস্যা হয় পোষা বানরের ক্ষেত্রে। সবসময় একই খাবার তারা খেতে চায় না। আর সবসময় একই খাবার দিলে বানরের শরীর দুর্বল হয়ে যায়।

অসিতেরও ইদানীং একই সমস্যা হচ্ছে। আসলে মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম খাটে। গরিবেরা, যারা খেতে পায় না, বেলার খাবার বেলায় জোগাড় করে তাদের রুচির কোনো সমস্যা হয় না। বড়োলোকেরা, যাদের হাতে নানা রকমের খাবার বৈচিত্র্য আছে তারাই রুচির সমস্যায় ভোগে। তখন তাদের রুচির বদল করতে হয়। অসিতেরও এখন এই সমস্যা হচ্ছে। পকেটে মুদ্রা আসতে শুরু করেছে। শুকনো খাবার, জল মেশানো ছাতু, বনের ফল এখন আর তার ভালো লাগে না। মিষ্টান্ন, ক্ষীর, দুধ, দধির চাহিদা ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে এখন।

অঙ্গদকে কাপড়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলো সে। খেলার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়েছে। নগরের রাস্তা অনেক দূরে। একটানা হেঁটেও দুপুরের আগে পৌঁছতে পারলো না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শরীর। দেরি করা চলবে না। অঙ্গদের শরীরের জড়িয়ে রাখা চাদর সরিয়ে ডমরুতে কয়েকটা আঘাত করতেই লোকজন চারপাশ থেকে এসে জড়ো হয়ে গেল। উপস্থিত জনতার প্রায় সবাই নিজ নিজ কাজ ভুলে গিয়ে অঙ্গদকে দেখছে। কাজ হয় তো দুপুরের পরে করা যাবে, এই সপ্তাহে না হলে অন্য সপ্তাহে করা যাবে, কিন্তু অঙ্গদের মতো এমন বিচিত্র জিনিস দেখার সৌভাগ্য প্রতিদিন হয় না।

অসিত ডমরুর তালে নানা খেলা দেখাতে আরম্ভ করলো। দর্শকরা আগেই মজে গেছে। খেলা শুরু হতেই বিচিত্র অঙ্গদের নানা রকম বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে ভীষণ আমোদ পেলো তারা। হর্ষধ্বনি উঠলো তাদের মাঝে। দর্শকের করতালি পেলে খেলা দেখানোর উৎসাহ বাড়ে। আজ অসিতের উৎসাহের কোনো অভাব হচ্ছে না। প্রতিটি খেলা শেষ হবার পর আগের থেকেও বেশি উল্লাসে ফেটে পড়ছে দর্শকরা।

তবে অসিত শুধু খেলা দেখাচ্ছে না। প্রত্যেক খেলা শেষ হবার পর অসিতের ইশারায় অঙ্গদ দর্শকদের ভিড়ের সামনে থেকে ঘুরে আসছে। চক্রাকারে ঘুরে সবার সামনে যাচ্ছে সে। দর্শকেরা আনন্দ পেয়ে সমানে মুদ্রা দিচ্ছে যে যা পারছে। অসিতের খেলা দেখানোর চেয়েও মন বেশি পড়ে আছে মুদ্রার পরিমাণের দিকে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো সে। আমদানি মন্দ হচ্ছে না।

দর্শকদের সংখ্যা আর কৌতূহল আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। অসিত খেলা দেখানোর এসব লক্ষণ ভালোই বোঝে। এখন খেলা শেষ করার সময় চলে এসেছে। যখন সে লক্ষ্য করলো সভা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে, আর মুদ্রা পাবার সম্ভাবনা নেই, তখন সেও খেলা বন্ধ করে সবকিছু গোছাতে শুরু করলো। শেষ যে কজন দর্শক এদিক সেদিক দাঁড়িয়ে ছিল তারাও নিজ নিজ কাজে ফিরে গেল।

অসিত মুদ্রাগুলো গুছিয়ে কোমরে গুঁজে নিলো। ক্ষিধে লেগেছে বেশ। এই নগরের হালুইকরের কাজ বিখ্যাত। সেখান থেকে বেশ কিছু মিষ্টান্ন কিনে খেয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলো সে। সাথে মুদ্রার কোনো অভাব নেই। খাবার পর অপেক্ষা করতে হবে, সেই সাথে বিশ্রাম হয়ে যাবে। এই নগর থেকে তার গ্রামের দিকে যেসব দল যায় সেগুলোর একটা খুঁজে সাথে মিশে যেতে হবে। এবং অবশ্যই তা বেলা থাকতে থাকতে, যাতে বেলা থাকতে থাকতে ইন্দ্রপুরে পৌঁছানো যায়। ডাকাতের কথা কিছুই বলা যায় না।

সবকিছু সাথে নিয়ে চাদরে ঢাকা অঙ্গদকে ঘাড়ে ফেলে হালুইকরের দোকানের দিকে যেই না রওনা দিতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে একটা ডাক শুনলো সে, 'শুনে যাও।'

অসিত পেছনে ঘুরলো। অন্যরকম পোশাক পরা একটা লোক তাকে ডাকছে। পরনে বিদেশি হলেও চেহারা আর গাঁয়ের রং এদিকের মানুষের মতোই। গালে একটা কাঁটা দাগ। বেশ গভীর। অনেক দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে। চেহারাটা দেখে বেশ কৌতূহল অনুভব করলো সে।

রাহু ভিড়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। অঙ্গদকে দেখে প্রথমে তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গিয়েছিল। তবে সেই অনুভূতি সামলে নিতে বেশি সময় নিলো না সে। খেলা

দেখতে দেখতে তার মাথায় অন্য একটা চিন্তা ভর করলো। চিন্তাটা সময়ের সাথে তার মাথায় ক্রমশ ঝাঁকিয়ে বসতে লাগলো। মানুষের জীবনে প্রকৃতি দুরকমের অবস্থা সৃষ্টি করে। সুবিধা আর অসুবিধা। সফল হতে হলে অসুবিধার সময়টা দাঁতে দাঁত চেপে পার করে দিতে হয় আর সুযোগটা দ্রুত গ্রহণ করতে হয়। ছোটোবেলা থেকেই সুযোগ চিনতে তার ভুল হয় না। খেলা শেষে সবাই যখন যে যার কাজে ফিরে যাচ্ছে তখনই অসিতকে ডাকলো সে।

অসিত প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও পরে এগিয়ে গেল। রাহু প্রশ্ন করলো,

'তোমার নাম কী?'

'অসিত।'

'আচ্ছা। আমার নাম রাহু। তোমার বাড়ি কোন গ্রামে?'

'ইন্দ্রপুর।'

'আচ্ছা। আমার বাড়িও ওদিকে। ইন্দ্রপুরের পাশের গ্রাম। তুমি নিশ্চয়ই এখানে ইন্দ্রপুর থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ, সকালে রওনা দিয়েছিলাম।'

'দেখলাম তোমার আর তোমার বানরের খেলা। অনেকক্ষণ ধরে খেলা দেখালে। আবার সকাল থেকে কতটা পথ হেঁটেছ। নিশ্চয়ই তোমার অনেক ক্ষিধে পেয়েছে। আমারো অনেক ক্ষিধে পেয়েছে। সকাল থেকে আমিও হাঁটছি। জানোই তো, এখানকার হালুইকর অনেক ভালো মিষ্টি বানায়। চলো খেয়ে নেওয়া যাক।'

রাহুর ভঙ্গিতে এমন অনায়াস ভাব ছিল, অসিত একটুও ইতস্তত করলো না। তার মনের মিষ্টান্ন খাবার প্রবল ইচ্ছে আছে। লোকটার হাবভাবে আর যাই বোঝা যাক, এটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই লোক কোনো লুটেরা নয়।

অনেক রকমের মিষ্টান্ন, অন্ন আর সবজি দিয়ে দুজনে পেট ভরে খেলো। অঙ্গদও মিষ্টির ভাগ পেয়েছে। খাবারের দাম আগন্তুকই পরিশোধ করলো। অসিতের কোনো আপত্তি শুনলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসিতের সাথে রাহুর বেশ ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে। নানা রকমের কথায় তাদের মধ্যের সেই সম্পর্ক আরো গাঢ় হতে লাগলো।

খাবার শেষ করে রাহু বললো, 'চলো এবার একটা ঘোড়া কিনতে হবে। তারপর আমরা গ্রামের দিকে ফিরবো।'

এবার অসিতের অবাক হবার পালা। তার মুখে কোনো কথা জোগালো না। একটা ঘোড়া কেনা যেনতেন কথা না। অনেক মুদ্রা লাগে। নেহাত বড়োলোক হওয়া ছাড়া কেউ এই কথা চিন্তাও করতে পারে না। তাদের গ্রামে এক অধিকারী ছাড়া আর কারো ঘোড়া নেই। এই লোককে দেখে যদিও মনে হয় না তার এত মুদ্রা আছে। তবু নাকি ঘোড়া কিনবে। আচ্ছা, দেখাই যাক না।

আরেকটা চিন্তা তার মাথায় এসেছে। এই লোক যদি ঘোড়া কেনে তাহলে নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়েই গ্রামে ফিরে যাবে। আর তাকেও যদি ঘোড়ার পিঠে চাপায় তাহলে লম্বা পথ হাঁটার পরিশ্রম থেকে বাঁচা যাবে। পথটা এখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লম্বা মনে হচ্ছে। মানুষ আসলেই ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়ে যায়।

আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়া পছন্দ করতে শুরু করলো রাহু। কাজটায় বিশেষ ঝামেলা, বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। রং, দুই চোখের মাঝের দূরত্ব, কানের ভাজ, নাকের ফুটোর আকার এবং দুই ফুটোর মাঝের সাদৃশ্য, কাঁধ থেকে গ্রীবার দূরত্ব, কাঁধের সংযোগস্থল থেকে পেছনের পায়ের সংযোগস্থলের দূরত্ব, মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য এবং ঋজুতা, ক্ষুরের আকৃতি এবং ছাপের বৈশিষ্ট্য এমন অনেক কিছুই বিচার করতে হয় ঘোড়া কেনার সময়। রাহু সেসব পুরোপুরি না জানলেও মোটামুটি একটা ধারণা তার আছে। সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই একটা ঘোড়া কিনে ফেললো সে। দাম দেবার সময় নিজের মুদ্রায় কুলালো না। নাহাপনার দেওয়া থলিটা খুলতে হলো।

থলিতে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেখান থেকে দুটো খরচ হলো ঘোড়া কিনতে। মুদ্রা সবার অলক্ষ্যে বের করেছে রাহু। তার কাছে এত স্বর্ণমুদ্রা আছে জানলে নিশ্চিত ডাকাতের দল পিছু নেবে।

ঘোড়ায় উঠে বসলো সে। অসিতের দিকে তাকালো, 'তুমি সব জিনিসপত্র নিয়ে পেছনে উঠে বসো।'

অসিতের আশা সত্যি হয়েছে। সবকিছু নিয়ে একটা পূর্ণবয়স্ক ঘোড়ায় চড়তে বেশ কষ্ট হলো তার। রাহুই শিখিয়ে দিলো কৌশলটা। অঙ্গদের উঠতে কোনো সমস্যা হলো না।

ঘোড়াটা বেশ তেজি। দুলকি চালে অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্দ্রপুরে পৌঁছে গেল ওরা। ঘোড়া চালনায় রাহু যথেষ্ট অভিজ্ঞ। অসিতের কাছ থেকে নির্দেশনা নিয়ে তার জঙ্গলের ধারের কুটিরের কাছে এসে ঘোড়া থামালো সে। অসিত কসরত করে বোঝা নিয়ে নামলো। সে নামার পর রাহুও নেমেছে, 'আচ্ছা, এটা তাহলে তোমার ঘর?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকি আমি।'

'তোমার সাথে আর কে থাকে?'

'কেউ না। আমি আর আমার বানর। অঙ্গদ নাম। আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই।'

'আচ্ছা। তোমার অবস্থা তো খুব খারাপ মনে হচ্ছে। তবে তুমি ইচ্ছে করলে তোমার অবস্থা রাতারাতি বদলে ফেলতে পারো।'

অসিত বুঝতে পারলো না, 'কীভাবে?'

'দেখো, আমার কাছে তোমাকে দেবার মতো একটা প্রস্তাব আছে। তোমার বানরটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। এটা বিশেষ একটা বানর। পুরো পৃথিবীতে এমন বানর কেউ আর খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই গ্রামে থেকে আর ছোটো ছোটো নগরে খেলা দেখিয়ে তুমি কতই বা উপার্জন করবে? তাই আমি বলি কি, বানরটা তুমি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি তোমাকে অনেক মুদ্রা দেবো। যেনতেন মুদ্রা নয়, সবই স্বর্ণমুদ্রা।'

অসিত এই প্রস্তাব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। অঙ্গদকে নিয়ে এত কষ্ট সে তো মুদ্রার জন্যই করছে। অঙ্গদ যখন আগুনে পড়ে পুড়ে গিয়েছিল তখন সে কেন এত চিন্তা করেছিল? তখন সে কেন এত ভয় পেয়েছিল? কারণ কি অঙ্গদের প্রতি ভালোবাসা? না, আসলে তার চিন্তা হয়েছিল নিজের উপার্জন নিয়ে, খাবার নিয়ে। অঙ্গদ মারা গেলে যে

তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। একসাথে অনেক স্বর্ণমুদ্রা যখন পাওয়া যাবে, তখন তো এই জীবনে আর খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। প্রতিদিন কষ্ট করে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাতে হবে না।

রাহু এবার প্রস্তাব আরো নির্দিষ্ট করে দিলো, 'ভেবে দেখো। আমি তোমাকে বিশটা স্বর্ণমুদ্রা দেবো। তুমি এই গ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবে। জমি, ভিটে, গাভী, ঘোড়া সব কিনতে পারবে। আরাম আয়েসে কাটবে তোমার বাকি জীবন।'

অসিত এখনো স্তব্ধ। রাহু ঘোড়ায় চড়ে বসলো, 'তোমাকে অবশ্য এখনই কিছু বলতে হবে না। ভেবে দেখো ভালো করে। ভেবে দেখো। আমি কাল আবার আসবো। তুমি ঘরেই থেকো। আর মনে রেখো, বিশটা নগদ স্বর্ণমুদ্রা।'

রাহু চলে গেলেও অসিত অনেকক্ষণ ঘরে ঢুকলো না। ঘরের সামনে বসে রইলো। ঝড় চলছে তার মাথায়। বিশটা স্বর্ণমুদ্রা। জমি, গাভী, ঘোড়া, ভিটের চারদিকে চারটে ঘর, আর মাঝখানের আঙ্গিনায় রাঁধা ঘরকন্নার নিয়মিত কাজ করছে। অতকিছুর মালিক যদি সে হয়ে যায়, তবে তো আর রাঁধার মা কোনোভাবেই আপত্তি করবেন না। ওনার তো দুটো গাভী হলেই শর্ত পূরণ হয়ে যায়।

২০

মুঝিরিস।

চেরাদের একমাত্র বন্দর। কিন্তু শোভায় তা ভারতে অতুলনীয়। দেবতামধ্যে যেমন ইন্দ্র, ঋষি মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, গোপমধ্যে গোপাল তেমনি ভারতে এত সমৃদ্ধ বন্দর আর কারো নেই। চেরা রাজ্যের সমস্ত অর্থনীতি বিশেষভাবে এই বন্দরের ওপর নির্ভরশীল।

মহারাজ উথিয়ান চেরাল আথান এই বন্দরেই স্থাপন করেছেন তার রাজধানী। এখান থেকেই তিনি রাজ্যের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মুঝিরিস বন্দরের বাতিগুলো সারা বছর সারারাত ধরে জ্বলে। অন্যান্য বন্দরের মতো এটা মৌসুমি বন্দর নয়। শুধু বিদেশি বণিকের ওপর এই বন্দরের বাণিজ্য নির্ভর করে না।

মহারাজ উথিয়ান তার রাজ ভবনের সবচেয়ে ওপরের ছাদে অবস্থান করছেন। চারপাশ ঘেরা ছাদে বেশ কয়েকটা আরামদায়ক আসন রাখা। পেছনেই তার বিশ্রামকক্ষ আছে। রানি নলিনী পুত্রকে নিয়ে এই মুহূর্তে শুয়ে আছে সেখানে। এই জায়গাটায় মহারাজ মাঝেমাঝেই অনেকক্ষণ বসে থাকেন।

রাজার কাছে রাজ্যই সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, আর মহারাজ উথিয়ানের কাছে তার রাজ্যের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এটা। এখান থেকে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, সব ভবন, লোকজন, আলো আর পুরো মুঝিরিস বন্দর দেখা যায়। এখান থেকে সামনের দিকে তাকালে মনে হয়, এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব আছে। তার আগে এই বংশের আরো অনেক রাজা রাজত্ব করে গেছেন, তবে তাদের দূরদৃষ্টি খুব কম ছিল বলেই মনে হয় তার। রাজভোগ আর বিলাসে তারা নিয়মিত ভেসে যেতেন। মাঝে মাঝে শরীরের জট ছাড়ানোর জন্য অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে জড়াতেন। তিনি রাজা হয়ে সেসবকে না বলেছেন। তিনি রাজা হবার পর রাজ্যের যত টুকরো টাকরা অংশ আছে সেগুলো বেশ যত্ন করে জোড়া দিয়েছেন। আগে যেসব ভূমি শুধু মানচিত্রেই ছিল, এমনিতে কোনো কাজে আসতো না, সেগুলো থেকে সোনা বের করার বুদ্ধি তিনি বের করেছেন। আর ফসলের চেয়ে মূল্যবান কিছুই হতে পারে না।

তার রাজ্যের ভূমি সব ধরনের মসলার জন্ম দিতে সক্ষম। শুধু জন্ম দেওয়াই নয়, গুণগত মানেও তার মসলা ভারতের সেরা। পশ্চিমে এমন মশলা চোখেই দেখা যায় না, স্বভাবতই পশ্চিমের বণিকদের কাছে চেরাদের মসলার আলাদা কদর আছে। গুপ্তচরদের কাছ থেকে বহু খবর পেয়েছেন তিনি। তার রাজ্যের মসলার জন্য দ্বিগুণ দাম দিতেও পিছপা হয় না পশ্চিমের বণিকেরা। তার চেয়ে একমাত্র বারিগাজা বন্দরই বেশি ব্যাবসা করে। তা করুক, তাদের চীনা কাপড় আছে, রত্নখনি আছে। কে বেশি ব্যাবসা করছে তা নিয়ে মহারাজ উথিয়ান ভাবেন না। তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা জানেন। তার বুদ্ধি অনুযায়ী তার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে। তিনি এতেই খুশি।

রাজ্যের ওপর কয়েকবার দৃষ্টি বোলালেন তিনি। তারপর সে দৃষ্টি সরিয়ে এনে স্ত্রীর ওপর নিবদ্ধ করলেন। এই বয়সেও সৌন্দর্যের কোনো কমতি নেই সেই দেহ সৌষ্ঠবে। আজ পুত্র আছে তাদের সাথে। কাম নয়, নিখাদ প্রেম অনুভব করলেন মহারাজ। সমৃদ্ধ রাজ্য আর পরিপূর্ণ পরিবারের চেয়ে একজন রাজার আকাঙ্ক্ষিত আর কিবা হতে পারে।

রাতে ঘুম আসার সমস্যা নেই তার। সুখী মানুষের ঘুম নিয়মিত হয়। আজ রাতে ইচ্ছে করেই জেগে আছেন তিনি। মন্ত্রী ভেরাপ্পনের এখনই আসার কথা। তিনি আসলে সেই অপেক্ষাই করছেন। মন্ত্রী অনেকদিন রাজ্যে ছিলেন না। নানা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। আজ ফিরে এসেছেন। মন্ত্রী এসেই মহারাজের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন কোনো কথাই শোনেননি মহারাজ উথিয়ান। একবার দেখেই বুঝেছিলেন পথশ্রমে মন্ত্রীর অবস্থা বেশ কাহিল। পুরোপুরি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। রীতিমতো জোর করে তাকে তার ভবনে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার সাথে বলে দিয়েছেন, যত রাতই হোক তিনি অপেক্ষা করবেন। মন্ত্রী যাতে তার স্নান, খাওয়া, ক্ষৌরী, বিশ্রাম সব সেরে তারপরে আসেন। নিজের কথা রেখেছেন তিনি। অপেক্ষা করছেন।

প্রহরী অন্দরমহলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজার শয়নকক্ষের ভেতরে ঢোকার অনুমতি কারোই নেই। মহারাজ টের পেয়ে বেরিয়ে এলেন।

'মহারাজের জয় হোক। মন্ত্রী ভেরাপ্পন মহাশয় আপনার জন্য রাজসভায় অপেক্ষা করছেন।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

মহারাজ রাজমুকুট মাথায় চাপালেন। দিন হোক আর রাত, মন্ত্রে অভিষিক্ত রাজা কখনো রাজমুকুট ছাড়া রাজসভায় যান না। মুকুট মাথায় নিয়ে জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের মতো মহারাজ উথিয়ান রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন।

দিনের বেলা এই সভায় আলো ঝলমল করে। চামরগুলো নিয়মিত ছন্দে দুলতে থাকে। প্রত্যেকটা আসন থাকে পূর্ণ। সব সভাসদের পেছনে যে-কোনো আদেশ পালন করার জন্য দাসদাসীরা সদা প্রস্তুত থাকে।

তবে এই রাতে সেই আলো, চামর, সভাসদ, দাসদাসী কেউ নেই। সিংহাসনের কাছেই দুটো মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে আলোকিত হয়ে আছে একটু জায়গা। রাজ আসনের পাশের মন্ত্রীর আসনে বসে আছেন মন্ত্রী ভেরাপ্পন।

আবছা আলোতে সভা প্রাঙ্গন পেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে তেমন কোনো সমস্যা হলো না মহারাজ উথিয়ানের। মহারাজ কাছাকাছি যেতেই ভেরাপ্পন উঠে দাঁড়ালেন, 'মহারাজের জয় হোক।'

'তোমাদের এই সম্ভাষণের ব্যাপারে আমার বিশেষ আপত্তি আছে ভেরাপ্পন।'

'কী আপত্তি মহারাজ?'

'বসুন। এখন আর সভাসদেরা কেউ এখানে নেই। তাই ওসব লোক দেখানো রীতিনীতি দিনের বেলার জন্যই তোলা থাকুক।'

ভেরাপ্পন বসে পড়লেন।

মহারাজও বসেছেন, 'এই যে সবাই বলে, মহারাজের জয় হোক। তাতে কি আসলে আশীর্বাদ অথবা জয়ধ্বনি পূর্ণ হয়? আমার তো মনে হয় না। রাজা মানে তো আমি একজন। আমার একজনের জয়ে আপনাদের কী লাভ হবে?'

'কেন লাভ হবে না মহারাজ? প্রজার কল্যাণেই তো রাজার কল্যাণ।'

'এই শাস্ত্র কথাটা আমাকে আর কোনোদিন বলবেন না। আমার পূর্বপুরুষেরা তো সারাজীবন তাদের উন্নতি, তাদের জয় নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলেন। তাতে এই রাজ্যের কি কোনো লাভ হয়েছিল? প্রজারা কেমন আছে, তাদের উন্নতি কীভাবে হবে তা নিয়ে কেউ কি চিন্তা করেছিল? করেনি। খালি তাদের মহলে রঙের বাতি জ্বললেই হলো। তাই এখন থেকে 'মহারাজের জয় হোক' কথাটা কখনোই বলবেন না। বলবেন, এই চেরা রাজ্যের উন্নতি হোক, এই রাজ্যের জয় হোক।'

তর্ক আর আগে বাড়ালেন না ভেরাপ্পন, 'ঠিক আছে মহারাজ।'

'আচ্ছা, এসব কথা থাক। এবার আপনার খবর বলুন। এতদিন ধরে যে পুরো ভারতে আপনি বাণিজ্য সফর করে এলেন, তার ফলাফল কী? আমরা কি নতুন কোনো পণ্য বিদেশিদের সামনে রাখতে পারি?'

'মহারাজ, বাণিজ্যঘেরা চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাপারে একটু গভীরে চিন্তা করতে হবে আমাদের। ভারতের বর্তমান অবস্থা অনেক খারাপ। আপনার এখন বাণিজ্য চিন্তা বাদ দিয়ে সমর চিন্তা করার সময় চলে এসেছে।'

চোখ সরু হয়ে গেল মহারাজ উথিয়ানের, 'কী বললেন আপনি! আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমি যুদ্ধের নীতি এবং রীতি কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না, যুদ্ধকে কখনোই আমার পথ মনে করি না। আমার একমাত্র লক্ষ্য বাণিজ্য বিস্তার করা। সম্পদের বলে অন্য রাজ্যকে বশ্যতা স্বীকার করাবো। যেমন করেছি পাণ্ড্য রাজ্যের রাজাকে। এভাবে আমি সব রাজার সাথেই সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করবো।'

'মহারাজ, পাণ্ড্য রাজাকে আপনি আপনার নীতিতে বশে এনেছেন। কিন্তু এটাই একমাত্র নীতি নয়। নীতিশাস্ত্রে বলা আছে, রাজ্যের অংশ থাকে সাতটি। সেই সাত অংশকে শরীরের সাত অংশের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই সাত অংশের মধ্যে ধনসম্পত্তি হচ্ছে মুখ আর সেনা হচ্ছে রাজ্যের মস্তিষ্ক।'

'তাই না-কি? তা এর তাৎপর্য কী?'

'তাৎপর্য হচ্ছে, যে রাজা ধনসম্পদে বলীয়ান, তার মুখের কথার দাম বেশি। তার কথার দাম প্রজাদের কাছে আছে। তিনি রাজা হবার সময় মন্ত্রে প্রজাদের প্রতি যেসব দায়িত্ব নেন সেগুলো অর্থের জোরে পালন করতে পারেন। তিনি সেই অর্থের দ্বারা আশেপাশের রাজাদেরও বশে রাখতে পারেন।'

'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, আমার নীতি ঠিক আছে। আমার ধনসম্পত্তি আশেপাশের সব রাজ্যের থেকে অনেক বেশি।'

'মহারাজ আপনি কিন্তু পরের কথাটা বিচার করছেন না। সেনাকে বলা হয়েছে রাজ্যের মস্তিষ্ক। তার মানে হচ্ছে রাজা সেনার বল দিয়েই নতুন নতুন চিন্তা করবেন, বাইরের নানা ঝামেলা মেটানোর বুদ্ধি শানাবেন। যার সেনাবল যত বেশি সেই রাজাও তত বেশি বিস্তৃত চিন্তা করতে পারেন। পাণ্ড্য রাজা আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছেন

কারণ তার রাজ্যের মুখ আর মাথার কোনোটাই সবল নয়। চারনীতি অনুযায়ী এই সময় রাজারা সাম নীতিই বেছে নেন। তিনিও তাই করেছেন। আর জানেন তো মহারাজ, মুখের কথার বাহাদুরির চেয়ে মস্তিষ্কের ক্ষমতার গুরুত্ব এই সংসারে অনেক বেশি।'

'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ভেরাপ্পন?' মহারাজ উথিয়ানের স্বর এখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

মাথা নিচু ভেরাপ্পনের, 'আমি মিথ্যে বলেছিলাম মহারাজ। আমি কোনো বাণিজ্যিক সফরে যাইনি। আমি আমাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম।'

'আপনি তো জানেন ভেরাপ্পন, আমি এসব চরম গুপ্তচরবৃত্তি পছন্দ করি না। এসব নীতিতে আমি বিশ্বাসও করি না। হ্যাঁ, গুপ্তচরের ব্যবহার করতে হবে। তবে তার জন্য তো আমার লোক ঠিক করা আছে। আপনি কেন গেলেন এসব কাজে? তার ওপরে গিয়েছেন আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে।'

'মহারাজ, আমি জানি, আপনি কখনোই গুপ্তচরদের অতটা গুরুত্ব দেননি। আমি খেয়াল করেছিলাম অনেক আগ থেকেই। আর এবার আমাকেই যেতে হলো। কারণ ঘটনা অনেক গুরুতর রূপ নিয়েছে। আপনাকে জানালে আপনি নিশ্চয়ই বাঁধা দিতেন। তাই সে কাজ আর করিনি।'

মহারাজ একটু চেষ্টা করে নিজের রাগ আটকালেন। এখনো গলা শান্ত আছে তার, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার কথা শুনবো। এখন বলুন আপনার গুরুতর ঘটনাটা কী?'

'মহারাজ, গৃহস্থের ঘরে কোনো কারণে যদি ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় তার ওপর তস্করের দৃষ্টি পড়ে। তেমনি যখন কোন ছোটো রাজ্যের ধন বৃদ্ধি পায় তখন পাশের বড়ো রাজ্যের নজর পড়ে সেই রাজ্যের ওপর। সেই হিসেবে সাতবাহন রাজার চোখ এখন আমাদের রাজ্যের ওপর পড়েছে। সেই শ্যেনদৃষ্টি আমাদের রাজ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবার কথা।'

'বাহ, আপনি তো বেশ কথা বললেন। কোনো উস্কানি ছাড়াই সাতবাহন রাজা আমার রাজ্য আক্রমণ করবেন? সেটা তো কোনোভাবেই সম্ভব না। যতদূর জানি সাতবাহন রাজা নীতিবান লোক। তিনি কেন বিনা কারণে যুদ্ধ করবেন?'

'তিনি যে বিনা কারণে আপনার সাথে যুদ্ধ বাঁধাবেন সে কথা তো আমি বলিনি মহারাজ। আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

'করুন প্রশ্ন।'

'আপনি তো যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। তবু বলুন, কোন পরিস্থিতিতে আপনি যুদ্ধ করবেন? যুদ্ধ তো অবশ্যই করতে হবে। নয়তো এত বড়ো সেনা আমরা কেন পুষছি?'

'হ্যাঁ, প্রতিরক্ষার জন্য সেনা আছে। তা রাখতেই হয়। এবং একমাত্র প্রজা এবং রাজ্যের ওপর কোনো আঘাত এলে রাজ্য এবং প্রজার মঙ্গলের জন্যই আমি যুদ্ধ করবো।'

'মহারাজ সাতকর্ণীও তাই চিন্তা করছেন মহারাজ। তিনিও তার প্রজার কল্যাণের জন্যই আপনার সাথে যুদ্ধ করবেন।'

'কথার মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার সাথে যুদ্ধ করলে তার প্রজার কী কল্যাণ হবে?'

'ভেবে দেখুন মহারাজ, তার রাজ্য আপনার রাজ্যের চেয়ে চারগুণ বড়ো। প্রজাও আপনার চেয়ে চারগুণ বেশি। কিন্তু তার রাজ্যের আয় আপনার চেয়ে কম। সাতবাহনের লোকজন এখন দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় বাস করছে। আর রাজা হিসেবে মহারাজ সাতকর্ণীর এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে সম্পদের সন্ধান করা। আর সেই হিসেবে আমরাই তার সামনে সবচেয়ে শাঁসালো শিকার। তিনি অন্য রাজ্যও আক্রমণ করতে পারেন। তার চিন্তা তো আর আমরা জানি না। তবে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। মহারাজ সাতকর্ণী কিছু করার আগেই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'কী ব্যবস্থা নেবেন? আমরা কি এখন সাতবাহন রাজ্য আক্রমণ করবো?'

'না মহারাজ। রসিকতা করার সময় নয় এটা। মহারাজ সাতকর্ণীর প্রজারা গরিব হতে পারে, কিন্তু সেনা অত্যন্ত শক্তিশালী। আমরা গো-হারা হারবো।'

'তাহলে?'

'মহারাজ, এখন কূটনীতির প্রয়োগের সময়। চাল আগে আগে দিতে হবে, এবং সেই চাল হতে হবে একদম সঠিক। আমার হিসেবে ক্রমেই ভারতের অবস্থা মহাভারতের কালের চেয়েও খারাপ হয়ে যাবে। নীতিতে একটু পরিবর্তন এসেছে। তখন নীতি ছিল 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিবো সুচাগ্র মেদিনী' আর এখন নীতি হচ্ছে 'যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নাও সকল মেদিনী।'

'আমরা তাহলে কী করবো? আমার প্রজাদের এত কষ্টে অর্জিত সম্পদ আমি বাইরের লুটেরাদের হাতে পড়তে দেবো না।'

'মহারাজ, সাতবাহন রাজ্যের ওপর আমাদের কোনো প্রভাব খাটবে না। আপনি পাণ্ড্য রাজার সেনাদের আপনার সাথে পাবেন। তারা আপনার হয়ে যুদ্ধ করবে। কিন্তু আমার গুপ্তচরদের খবর অনুযায়ী আমাদের মিলিত বাহিনীও সাতবাহন বাহিনীর সামনে অপ্রতুল। একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি পুরো দক্ষিণ ভারত একসাথে সাতবাহনের অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া।'

'পুরো দক্ষিণ ভারত?'

'হ্যাঁ। এই দক্ষিণ ভারতে তিনটি প্রধান রাজ্য। আমরা, পাণ্ড্য আর চোলা।'

'তাহলে তো সমাধান হয়েই গেল। চোলা রাজার কাছে দূত পাঠান। তাকে ধনসম্পদ দিয়ে সন্ধি করে বশে আনতে হবে।'

'শুধু শুধু ধনসম্পদের অপচয় করার দরকার এখানে নেই মহারাজ। চোলার নতুন রাজা হয়েছেন তরুন কারিকালা। সে রাজ্যের অবস্থা এখন অনেক খারাপ। তবে আমার যা মনে হয় যুদ্ধের স্বাদ পাওয়া তরুণ রক্ত আপনার বশ্যতা স্বীকার করবে না। সামনীতি তার জন্য খাটবে না। তার জন্য প্রয়োজন দণ্ডনীতি।'

'মানে হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই আমরা আক্রমণ করবো?'

'তা তো করতেই হবে। তবে আমরা তো আর রাজ্য দখলের জন্য আক্রমণ করবো না। আমাদের লক্ষ্য হবে সাম, কিন্তু পথ হবে দণ্ড।'

'বুঝেছি। এখন আমাদের কী করণীয়?'

'প্রথম করণীয় হচ্ছে সেনা গোছানো, সেনাকে আরো শক্তিশালী করা। পাণ্ড্য রাজার সেনা আমাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। তারপর যৌথ সেনাদল নিয়ে একসাথে আক্রমণ করতে হবে।'

'পাণ্ড্য রাজার কাছে দূত পাঠান।'

'আজ্ঞে মহারাজ, আমি কালই পাণ্ড্য রাজার কাছে দূত পাঠাবো।'

'আর দ্বিতীয় করণীয়?'

'দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করা। কারিকালা চোলার নতুন রাজা। বয়সে তরুণ। রাজ্য চালনায় অনভিজ্ঞ। সামন্তরাজারা তার ওপর ঠিক সন্তুষ্ট নয়। আমাদের রাজ্যের ইন্ধনে তাদের রাজ্যে অচিরেই বেঁধে যাবে গৃহযুদ্ধ। এবং সেই সুযোগটাই নেবো আমরা।'

'হ্যাঁ, দেখুন, কূটনীতির চালে রক্তপাত কতটা এড়ানো যায়।'

উঠে দাঁড়িয়েছেন মহারাজ। ভেরাপ্পনও উঠে দাঁড়ালেন সাথে সাথে। যাবার আগে ভেরাপ্পনের দিকে তাকালেন মহারাজ উথিয়ান,

'খুব সাবধানে ভেরাপ্পন। আমি চাই না সাময়িক কোনো সমস্যা সমাধানে জন্ম নেওয়া শত্রুতা আমার উত্তরাধিকার এবং আমার প্রজারা বংশানুক্রমে বয়ে বেড়াক।'

ভেরাপ্পন মাথা নিচু করে রইলেন। মুখে কিছু বললেন না, কেবল মাথাটা সম্মতিতে একটু ঝুঁকলো। তবে একবার রক্তের ফোঁটা ভূমি স্পর্শ করলে তার রেশ বংশানুক্রমে বয়ে বেড়াতেই হয়।

২১

রুদ্রদেব জঙ্গলের ভেতর ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। এই এলাকা আর জঙ্গল সম্পর্কে তার জ্ঞান যে-কোনো সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি। সময় তো আর কম নয়। গত তিন হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের গহীন জঙ্গলে সে চষে বেরিয়েছে। কখনো কারো চোখে পড়েনি।

সাধারণ কেউ এই জঙ্গলে এই সময়ে একা থাকলে ভয় পেয়ে যেতো। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রাতের খুব বেশি দেরি নেই। তবে রুদ্রদেব জানে এই জঙ্গলের আবছা আলো অনেকক্ষণ থাকে।

কতদিন পরে ঘোড়ার পিঠে বসলো সে? তিন হাজার বছর? নাকি আরো বেশি? অথচ একসময় ঘোড়া ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। শস্ত্রের যেমন পরিচর্যা করতো, তেমনি করতো ঘোড়ার। রাজঘোড়া। এখনো ভোলেনি সে। ছোটো হলেও বেশ সমৃদ্ধশালী একটা রাজ্যের রাজা ছিল সে একসময়। তারপরই হলো সেই সব তোলপাড় করা মহাযুদ্ধ। তার অস্তিত্ব একেবারে মিটিয়ে দিয়ে গেল। তিন হাজার বছর পরে আজ মুক্ত বাতাসে আবার ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে। এতদিন অবশ্য সে স্বাধীনই ছিল, তবে এই বাতাস মুক্ত ছিল না।

ঘোড়ার পিঠে বহুদিনের অনভ্যাসে একটু অসুবিধা হচ্ছে সেকথা অস্বীকার করা যাবে না। অথচ একসময় তাকে ঘোড়ায় চড়া আর নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সে সময়ের সেরা ঘোড়া বিশারদরা। বায়ুগামী সেসব ঘোড়ার তেজের সাথে তুলনা করলে এই ঘোড়া অনেক শান্ত। তবু সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

তাকে যে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল তার প্রভাবে তার সব বিদ্যা সে ভুলে গেছে। তার সব অস্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিছুই তার মনে নেই। তবে আশার কথা একটাই। সে সব বিদ্যা ভুলে গেছে সত্য, তবে সেই বিদ্যা আবার অর্জন করার পথটা বিস্মৃত হয়নি। তার সকল অস্ত্র বিস্মৃত হয়েছে, হারিয়ে গেছে, তবে সে জানে একবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারলে সেসবের যোগ্যতা তার মাঝে আবার চলে আসবে। সেই মন্ত্রতন্ত্র অনেক কষ্টে সংরক্ষণ করেছে সে।

সেসব বিধি আর শারীরবিদ্যা অনুশীলন করে সেসব বিদ্যা আবার করায়ত্ত করতে হবে। সে ব্রাহ্মণ হলেও সকল ক্ষত্রিয় বিদ্যায় দিক্ষিত। আর যে যোদ্ধার যুদ্ধবিদ্যা বিস্মৃত হয় সে একেবারেই অচল।

তার মনে বিশ্বাস আছে। মহাদেবের আশীর্বাদ আছে। এখন শুধু মনের বিশ্বাস কাজে রুপান্তরের পালা। দেখা যাক এখন এই ঘোড়সওয়ারি বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে কি না।

ঘোড়াটাকে একটা গাছের সাথে বাঁধলো সে। মনের অবচেতনে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিদ্যা নিহিত আছে। এই শরীরের আত্মার সাথে পরমাত্মার সরাসরি যোগ আছে। তবে সেই পরমাত্মার খোঁজ পাওয়া বড়োই শক্ত। কোনোভাবে যদি আত্মা পরমাত্মার

সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে তাহলে আর কোনো ভাবনা নেই। যে-কোনো বিদ্যাই তখন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। প্রাচীন বেদদ্রষ্টা ঋষিদের বেদ কেউ শেখায়নি। নিজেরা ধ্যানে বসে পরমাত্মা থেকে সেই জ্ঞান লাভ করেছেন তারা। কয়েকদিন আগে গৌতম বুদ্ধ নামে এক ঋষি ধ্যানে নতুন মতের সন্ধান পেয়েছেন। সারা ভারতে আস্তে আস্তে তার মতের অনুসারী বাড়ছে। তাকে কেউ সেই বিদ্যা শেখায়নি। কোনো গুরুকুলে যাননি তিনি। বসে ছিলেন বোধিবৃক্ষের নিচে। সেটাও পরমাত্মার দান।

অশোক গাছের নিচে পদ্মাসনে বসার চেষ্টা করলো রুদ্রদেব। কিন্তু অনেকদিনের অনভ্যাসে পা ঠিকমতো ভাঁজ হচ্ছে না। অগত্যা সুখাসনে বসেই চোখ বন্ধ করলো সে। আস্তে আস্তে সময় ফিরে গেল তিন হাজার বছর আগে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সবকিছু। ঘোড়ার মুখের বন্ধনীতে এঁটে বসা লাগাম। পিঠের চামড়ার আসনে বসে পায়ের বন্ধনীতে ভর রাখা। লাগামের টানে ঘোড়ার গতি হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া, আবার হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়াকে থামিয়ে ফেলা। লাগামের কৌণিক টানে ঘোড়ার দিক পরিবর্তন। একটা সময় ঘোড়ার আর সওয়ারীর লাগামের টানের দরকার হয় না। সঠিকভাবে ঘোড়া চালাতে পারলে ঘোড়ার সাথে আরোহীর মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তখন সওয়ারীর মনের ইশারাতেই ঘোড়া চলে।

রুদ্রদেব যখন চোখ খুলেছে তখন অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থায় এখন আর ভূমি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সেই অবস্থায় আবার ঘোড়ায় চড়লো সে। এবার তার ঘোড়ায় চড়তে তেমন কোনো সমস্যা হলো না। ঘোড়াও এখন লাগামের ইশারা ভালোই বুঝতে পারছে। অন্ধকারে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে রুদ্রদেবের ঠোঁটে।

অভিশাপ মুক্তির সাথে সাথে ঈশ্বরের আশীর্বাদও পেয়েছে সে। জগতের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ যাই কেউ করতে যাক না কেন, একটা জিনিস লাগবেই। সেটা হচ্ছে সামর্থ্য। বোকা মানুষ যেমন প্রভূত উন্নতি করতে পারে না, সমাজের কল্যাণ করতে পারে না, তেমনি ক্ষতি করার ক্ষমতাও তার কম থাকে।

মানবসমাজে আসার সাথে সাথে এমন একটা জায়গা খুঁজছিল সে। নির্জন, নির্ঝঞ্ঝাট। খাওয়া-থাকার কোনো চিন্তা তাকে করতে হচ্ছে না। অস্ত্রশিক্ষার জন্য অস্ত্রের জোগান পেয়ে গেছে। তবে সমাজের তিন হাজার বছর ধরে বদলে যাওয়া রীতিনীতি বুঝতে তাকে সমাজের সাথেও মাঝে মাঝে যোগাযোগ রাখতে হবে। তবে সে যদি তার অস্ত্রবিদ্যা সমাজের ভেতরে থেকে অভ্যাস করতো তাহলে সবাই অবশ্যই সন্দেহ করতো। সাধারণ মানুষের আবার অস্ত্রবিদ্যার দরকার কী?

ঈশ্বরই তাকে সাহায্য করেছেন। তাকে এই জায়গাটা বলতে গেলে দান করেছেন। একটা মোক্ষম কাজ পাওয়া গেছে। এখন সে করছে পাহারাদারের কাজ। তার কাছে অস্ত্র দেখলে এখন আর কেউ সন্দেহ করবে না। এখন সে একই সাথে সমাজেও আছে, সমাজের বাইরেও আছে। এখানে কেবল নীরবে কাজটা করে যেতে হবে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে সম্পূর্ণ রাত হয়ে গেল। খেয়ে নিলো সে। পাহারাদারের তো আর রাতে ঘুমালে চলবে না। তবে নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে। সেখানে থাকলেই হলো। চোখ বন্ধ থাকলেও কান ঠিক খাড়া থাকবে। নিঃশব্দে

ভরা জায়গায় জঙ্গল থেকে নানারকম স্বাভাবিক শব্দ ভেসে আসছে। সেসব শব্দ রুদ্রদেবের চেনা। তবু আরেকবার আত্মস্থ করে নিতে লাগলো সে। স্বাভাবিক শব্দ যখন আত্মস্থ হয়ে যাবে তখন অস্বাভাবিক যে-কোনো শব্দই কান সহজে ধরে ফেলতে পারবে।

অর্ধনিদ্রা অবস্থাতেই রাত পেরিয়ে গেল। কোনো অঘটন ঘটলো না। ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। আশেপাশে পাখিরা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। রুদ্রদেব ইষ্টনাম জপ করে প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হলো। পাশেই একটা পরিষ্কার জলের ডোবা আছে। কাজ শেষ করে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। দরজায় শেকল বেঁধে দিলো। এটা একটা বিশেষ কৌশলের বাঁধন। যে শেকল বেধেছে সে এক নিমেষেই খুলে ফেলতে পারবে, কিন্তু যে এই বাঁধনের অপরিচিত তার অনেকক্ষণ লেগে যাবে বাঁধন খুলতে। এবার ঘোড়া নিয়ে বেরোনো যায়।

জঙ্গলের পুরো অংশ ঘুরে শেষ সীমায় পৌঁছে গেল সে। যেখানে এই জঙ্গলের সীমানা শেষ সেখানেই রাজমার্গের সীমানা শুরু। বেশ প্রশস্ত রাস্তা। জঙ্গলে কোনো ধরনের চৌর্যবৃত্তির লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না। ঘরে ফিরে এলো সে।

অন্নঋণ আপাতত শোধ হয়েছে। এবার নিজের কাজে মন দেওয়া যায়। তার অস্ত্রগুরুর সাথে তার বেশ গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাকে একটু আলাদাভাবে শিক্ষা দিতেন। আঠারো রকমের বিদ্যা সে শিখেছিল ঐ গুরুকুলে। সেই আঠারো বিদ্যার সবগুলো এখন আর দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তার বিদ্যা হয়ে উঠেছিল অস্ত্রবিদ্যা। নিজের শস্ত্রবিদ্যার অবস্থা নির্ণয় করার জন্য সচেষ্ট হলো সে।

প্রথমেই ধনুর্বিদ্যা। একমাত্র এই বিদ্যার চর্চাতেই দুজন লাগে না, একজনেই সম্পূর্ণ চর্চা করা যায়। বিশ ধনু দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের গায়ে চুন দিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে নিলো সে। সেই বৃত্তের কেন্দ্রে একটা চোখ। ধনুক হাতে নিলো সে। বাহুর ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। এই সাধারণ ধনুক তুলতেই তার কপালে চিনচিন ঘাম দেখা দিলো। অনেক কষ্ট হলো ধনুকে জ্যা জুড়তে। সেই বিদ্যাও ভুলে গেছে। অনেক কষ্টে যা হলো তা জোড়াতালির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বাম হাতে ধনুক উলম্ব অবস্থানে ধরে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। ছিলায় পালকপুচ্ছ স্থাপন করে জ্যা টেনে ছেড়ে দিলো সে। বিশ ধনু দূরের লক্ষ্যের ধারকাছ দিয়েও গেল না সে তীর। পাশের আরেকটা গাছে বিঁধলো। তাই হবার কথা। ধনুক যেভাবে কাঁপছে তাতে লক্ষ্য স্থির রাখা অসম্ভব।

পুরানো দিনের কথা বারবার মনে পড়ছে তার। মহারথী ছিল সে। মহারথী হবার জন্য ধনুর্বিদ্যার অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। সেই অনেকগুলো পরীক্ষার একটা হচ্ছে সপ্তচক্র পরীক্ষা। সাতটি রথের চাকা পরপর বসানো হতো। তারপর সেগুলোকে ঘোরানো হতো যন্ত্রের মাধ্যমে। সবগুলো একদিকে ঘুরতো না। প্রথমটা যদি ডান থেকে বামে ঘুরতো পরেরটা ঘুরতো বাম থেকে ডানে। এভাবেই নানাদিকে ঘুরতো সেই সাতচক্র। সেই সাত চক্রের ভেতর দিয়ে তীর চালিয়ে ফাঁকা স্থান দিয়ে ওপারের লক্ষ্যে বেঁধাতে হতো। সেটারও একটা কঠিন নিয়ম ছিল। লক্ষ্য স্থির করা যাবে না। তীর

থাকে ভূমি অভিমুখে। তুলেই ছুঁড়ে দিতে হবে। সেই তীর ঘূর্ণায়মান সাত চক্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে লক্ষ্যে বিঁধলে তবেই যোদ্ধার ভাগ্য হতো পরের ধাপে যাবার।

লক্ষ্যের চেয়ে পাঁচ ধনু দূরে গাছের গায়ে বেঁধা তীরটা খুলে নিলো সে। মহারথীর রথীগিরি একেবারে ছুটে গেছে। শূন্য থেকেই সব শুরু করতে হবে, ঠিক যেমনি একদিন শূন্য থেকে সব শুরু করেছিলেন ঈশ্বর।

ধনুক আর তীর যথাস্থানে রেখে দিলো রুদ্রদেব। না, শস্ত্র তোলার মতো শরীর এখনো প্রস্তুত হয়নি। শরীর প্রস্তুত করার জন্য তিনটা বিদ্যা আছে। তিনটা শাস্ত্র। যোগবিদ্যা, সংগীত কলা আর নৃত্যকলা। আগে এসব অনুশীলন করে শরীর প্রস্তুত করতে হবে। শস্ত্র আপাতত তার জায়গাতেই থাকুক।

প্রথমে প্রাণায়াম। সপ্ত প্রধান প্রাণায়ামের সবগুলো আস্তে আস্তে অভ্যাস করতে লাগলো সে। অনেকক্ষণ ধরে। প্রাণায়ামের পর আসনাভ্যাস। যোদ্ধাদের জন্য দুই ধরনের আসন নির্দিষ্ট করা আছে। শরীরের সহনক্ষমতার আর শক্তিবৃদ্ধির। সেই শক্তিবৃদ্ধির আবার রকম আলাদা। পেশি যথেষ্ট শক্তিশালী হবে কিন্তু আকারে বেশি বাড়তে পারবে না। শরীর ভারী হয়ে গেলে ক্ষিপ্রতা থাকবে না। এই ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম দ্বিতীয় পাণ্ডব।

শরীরের সহনক্ষমতা আর শক্তির যোগাভ্যাস শুরু করলো রুদ্রদেব। অনভ্যস্ত শরীর সায় দিচ্ছে না। তবু অতি কষ্টে প্রত্যেকটা ধাপ শেষ করলো সে।

শরীর ক্লান্ত। পেটে ক্ষিধে। আপাতত পেটের ক্ষিধে মিটিয়ে একটু বিশ্রাম নিলো সে। তারপর কাদামাটি নিয়ে বসে গেল। দেখতে দেখতে কাঁদা থেকে একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। রোদের মধ্যে কয়েকবার জল ঢেলে দিতেই মসৃণ হয়ে এলো সেই কাঠামো।

উঠানের বেদীতে সে কাঠামো স্থাপন করলো রুদ্রদেব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ উঠানে পড়েছে। সেই আলোয় সেই কাঠামোকে প্রণাম করলো সে। সব রকম যোগের আধার, নটরাজের প্রতীক শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে এবার নৃত্যকলার অভ্যাস শুরু করলো সে।

২২

অসিতের চোখ ভার হয়ে আসছে। সারাদিনের ক্লান্তি তার দেহে বেশ ভালোই জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু শত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও চোখ বন্ধ করতে পারছে না সে। একটা কথা কেবলই ভাবছে সে। আজ কি ঐ লোকের সাথে আসলেই দেখা হয়েছিল? ঘোড়ায় চড়া, ঐ লোকের সাথে খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা আর সবার শেষে সেই বিশ স্বর্ণমুদ্রার প্রস্তাব। ঈশ্বর মাঝেমাঝে মানুষকে বোধহয় এভাবেই সাহায্য করেন। তার কাছে ঐ লোক যেনতেন কোনো মানুষ নন, সাক্ষাৎ দেবদূত। ঐ লোকের হাবভাব, পোশাক এই অঞ্চলের মানুষের মতো না। তা তো হবেই, তিনি তো আর সাধারণ কেউ নন। সে বলেছিল বটে তার বাড়ি এদিকে, কিন্তু কই অসিত তো তাকে কখনো এদিকে দেখেনি।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ দেবদূতের রূপ হয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই। অসিতের এখন আফসোস হচ্ছে। আজই ঐ লোকের প্রস্তাব মেনে নিলে ভালো হতো। তার এই জীবন অভাব বেশি দেখেছে। ঈশ্বরকে মনে হয়েছে অনেক দূরের কেউ। যদি তার আশীর্বাদ খুব কম সময়ের জন্য এসে থাকে? তাহলে তো আর ঐ লোকের সাথে তার দেখা হবে না। দেবদূত চলে যাবে স্বর্গে।

শোয়া থেকে উঠে বসলো সে। এই হিসেবটা অনেকবার করে ফেলেছে সে এরই মধ্যে। বিশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঠিক কি কি কেনা যাবে তার তালিকাটা আরেকবার করতে বসলো। গাছে কাঁঠাল দেখলেই গোঁফে তেল দেবার জন্য তেলের বাটি খোঁজা মানুষের আদি স্বভাব।

স্বর্ণমুদ্রা কখনো বাজারে ব্যবহার করেনি সে। তবে ব্যবহার না করলেও তার গুরুত্ব বেশ ভালোই জানে। রাজার কাছে মাত্র এক স্বর্ণমুদ্রা জমা দিলে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একটা পঞ্চাশ ধনুর খাসজমি একশো বছরের মালিকানায় পাওয়া যায়। এরপর শুধু জমির ফলিত ফসলের ওপর বছর বছর কিছু খাজনা দেওয়া। সেই হিসেবে বিশ স্বর্ণমুদ্রায় ছোটোখাটো একটা গ্রাম হয়ে যাবার কথা।

একটু পরেই জমিদারি কেনার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তাকে অন্য পথে ধাবিত করলো সে। হাতে টাকা থাকলে মানুষের মাথায় নানাবিধ পরিকল্পনা এসে পড়ে। অতি কল্পনা করতে মানুষের ভালো সব সময়েই লাগে। এখন আপাতত জমিদারি চিন্তা বাদ দেওয়া যাক। জমিদার হবার জ্বালা অনেক। পেয়াদা পালতে হবে, লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করতে হবে, নানা তদারকি আর হিসেবের কারবার আছে। অত ঝামেলা করা পোষাবে না। তার চেয়ে একটা ভালো চার ঘরের বাড়ি আর আনুষঙ্গিক জিনিস থাকলেই হয়। সাথে থাকবে দুটো ভালো জাতের গাভী। আর অবশ্যই রাঁধা।

কাল ঐ লোক আবার আসলেই হয়। কথাটা শুনে বোকার মতো চমকে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়াটা বড়ো ভুল হয়েছে। আবার বিছানায় পিঠ দিলো সে। সুখকল্পনার সাথে সাথে এবার ঘুম আরো জাঁকিয়ে এসেছে। সেই ঘুম এসেছে সুখস্বপ্নের অঙ্গীকার নিয়ে।

তবে সেই ঘুমে তার সুখস্বপ্ন ধরা দিলো না। তার বদলে উঠে এলো তার ফেলে আসা অতীত। কোন কল্পনা নয়, একেবারে বাস্তব। সেই স্বপ্নে এই ঘরটাই আছে। সেই ঘরে পাতা আছে এই শয্যাই। তবে সে শয্যায় সে শুয়ে নেই। শুয়ে আছে তার বাবা। সে বসে আছে বাবার পাশে। আরেক পাশে বসে সুকুমার বৈদ্য রোগীর অবস্থা গম্ভীর মুখে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই দৃশ্য তার চেনা।

নাড়ি ধরে আর শ্বাসের গতি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন বৈদ্য। তারপর বুঝতে পারলেন রোগীর সময় সমাগত। এই পৃথিবীর আর কোনো ওষুধি এই শরীরে কাজ করবে না। এই দেহের জন্য কোন সঞ্জীবনী নেই। লক্ষণের দেহে সঞ্জীবনী কাজ করেছিল তার আয়ু তখনো বাকি ছিল বলে। দেহের বাইরের আঘাতে ওষুধ কাজ করে, কিন্তু দেহের ভেতরের প্রাণঘন্টির আওয়াজ যখন ক্ষীণতর হয়ে ওঠে তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বুঝতে পারেন। জবাব দেওয়া ছাড়া তখন আর কোনো কাজ বাকি থাকে না।

বিছানা থেকে উঠে সুকুমার বৈদ্য দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অসিতও তাকে উঠতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাবার পাশ থেকে সরে সে গিয়ে দাঁড়ালো বৈদ্যের সামনে,

'দাদু, চলেন, আপনার বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে আসি। এবার একটু ভালো দেখে ওষুধ দিয়েন। আগের ওষুধ খেয়ে বাবার কোনো লাভ হয়নি। ঠিকমতো খেতে পারে না, চলাফেরা করতে পারে না, কেবল শুয়ে থাকে।'

কথাটা এই জীবনে অনেকজনকে অনেকবার বলেছেন সুকুমার বৈদ্য। তবু অসিতের নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে বুকটা যেন একটু কেঁপে উঠলো তার, 'তোকে আর এখন আমার সাথে আসতে হবে না। তোর বাবার জন্য এখন আর পৃথিবীতে কোনো ওষুধ নাই। তুই তোর বাবার কাছে বসে থাক। আমি বিকেলে আরেকবার এসে দেখে যাবো।'

'আচ্ছা দাদু।' ঘটনার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না অসিত।

সুকুমার বৈদ্য বেরিয়ে গেলেন। বাবার পাশে গিয়ে আবার বসলো অসিত। তার বাবা এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলেন। এখন চোখ মেললেন। পুরোটা না, অর্ধেকটা পাতা, 'বাবা, আমাকে একটু জল দে তো।'

মাটির বাটিতে অর্ধেক জল ভরে নিয়ে এলো অসিত। শোয়া থেকে আধবসা হতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে বাবাকে। দশ বছরের অসিতের অপর্যাপ্ত সাহায্যে কোনোমতে উঠে বসলেন। মুখে ছোঁয়ানো বাটিটা থেকে খুব কম জলই গলদেশ বেয়ে ভেতরে গেল। বেশিরভাগই চিবুকের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে।

'আর জল খাবে বাবা?'

'না রে, আর খাবো না। তুই এসে এখন আমার পাশে একটু বসে থাক। তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে। কথাগুলো তোকে এখনই বলতে হবে। আর সময় নেই। তোরও একবারেই বুঝে নিতে হবে। আরেকবার শোনার সুযোগ পাবি না।'

তেমন কিছুই বুঝতে পারলো না অসিত। সে বসে পড়লো বাবার পাশে।

'শোন, তোকে আমি অনেকবার অঙ্গদের কথা বলেছি। আবার বলছি। মন দিয়ে শোন। বড়ো বানরটা আর কয়দিন পরেই মরে যাবে। বয়স হয়েছে তো। তোর সাথে

এই পৃথিবীতে থাকবে কেবল অঙ্গদ। একটা কথা মনে রাখিস বাবা। এই ছোটো বয়সে তোর এই কথা বোঝার কথা না। তবু তোকে বলছি। নিরুপায় হয়ে।'

অসিত মাথা নিচু করে শুনছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার মতো বয়স তার আসলেই হয়নি।

'শোন, এখন থেকে অঙ্গদকে তোর ভাইয়ের মতো দেখবি। মনে রাখবি, অঙ্গদ তোর মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। পৃথিবীর কোনো অভাবে, কোনো লোভে, কোনো ভয়ে তুই কখনো অঙ্গদকে কাছছাড়া করবি না। ঈশ্বর অন্নদাতা। বানরওয়ালাদের কাছে বানর ঈশ্বরের মতো। মা অন্নপূর্ণা আমাদের এই বানরের মাধ্যমেই খাওয়ান। অনেকে নিজের পোষা প্রাণী ছেড়ে চলে যায়। তাদের বিক্রি করে দেয়। এতে ঐ প্রাণীর মনে অনেক কষ্ট লাগে। দুজনের কেউই আর কখনো ভালো থাকতে পারে না। অন্নদাত্রীকে ত্যাগ করা মানে ঈশ্বরকে ত্যাগ করা, সুখ ত্যাগ করা, সৌভাগ্যকে ত্যাগ করা। এই কথাটা মনে রাখিস বাবা। নিজের যত্ন নিস, অঙ্গদের যত্ন নিস। ঈশ্বরে ভরসা রাখিস। আবারো বলছি, অঙ্গদকে কখনো কাছছাড়া করিস না।'

অসিতের বাবা আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। তার মাথাটা হেলে পড়লো একদিকে।

অসিত প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারলো না। মনে করলো তার বাবা বেশি কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেও বাবাকে আর বিরক্ত করলো না। সুকুমার বৈদ্য বিকেলে আসবেন বললেও তার আগেই এলেন। আর তিনিই এসে ঘোষণা করলেন অসিতের বাবার মৃত্যু সংবাদ।

সকাল হয়ে গেছে। রোদ এসে পড়েছে অসিতের ঘরের সামনে। চোখ মেললো সে। পাঁচ বছর আগে এই ঘরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এতক্ষণ যেন তার চোখের সামনে ভাসছিল। ঘুম কেটে গেছে, সেই সাথে শেষ হয়ে গেছে স্বপ্ন, কিন্তু তার বাবার শেষ কথাগুলো এখনো কানে বেজে চলেছে।

বিষণ্নতা নিয়ে বিছানা ছাড়লো সে। ঘুমাতে যাবার আগে কালকের লোকটার আবার ফিরে আসা নিয়ে আশা-নিরাশার দোটানায় ছিল সে। এখন মনে হচ্ছে, ঐ লোকটা না এলেই ভালো হবে। অঙ্গদকে সে বিক্রি করবে না, কোনোকিছুর বিনিময়েই না।

অঙ্গদ এখনো ঘুমাচ্ছে। তার দিকে তাকাতেই মায়ায় ভরে গেল অসিতের মন। কাল রাতে সে অঙ্গদকে বিক্রি করার কথা ভেবেছিল। কথাটা মনে পড়তেই নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে তার। লোভের বশবর্তী হয়ে কি ভয়ংকর ভুল করতে যাচ্ছিল সে। কষ্ট আর অধ্যবসায়ের রাস্তা ত্যাগ করে সে বেছে নিতে চেয়েছিল নিশ্চিত সুখের রাস্তা। সেই পথ চরম অধর্মের। তার বাবার আত্মা নরক যন্ত্রণার চেয়েও বেশি কষ্ট পেতো তার এই কাজে।

দুপুর পর্যন্ত ঘরের সামনে বসে রইলো সে। অঙ্গদকে খেতে দিয়েছে, কিন্তু আত্মগ্লানিতে ভরপুর হয়ে নিজে কিছুই খেলো না। খেতে ইচ্ছে করছে না, ক্ষিধে নেই, রুচি নেই। অবচেতন মন বোধহয় এভাবেই মানুষকে কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেয়।

দুপুরের একটু পরেই এলো রাহু। এই সুযোগ সে হেলায় হারাবে না। অসিত এখনো ঘরের সামনে বসে আছে। ঘোড়া থেকে নামলো রাহু,

'বাহ্, বাড়িতেই আছো দেখছি। নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে। ধন্যবাদ। তোমার বানর কোথায়?'

অন্য লোকের সাড়া পেয়ে অঙ্গদ ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাহু উল্লসিত হলো, 'এইতো। শোনো, আমি পুরো বিশটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসেছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সাথে কোনো স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করে নিতে পারো।'

'তার কোনো দরকার নেই।'

রাহু অসিতের কথাটা বুঝতে পারলো না। সে অন্য মানে করলো, 'দরকার নেই মানে? তুমি তো আর কখনো স্বর্ণমুদ্রা দেখোনি। আসল অথবা নকল জানার দরকার আছে না? না পরীক্ষা করে অতগুলো স্বর্ণমুদ্রার লেনদেন করা উচিত হবে না।'

অসিতের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি অঙ্গদকে বিক্রি করবো না। স্বর্ণমুদ্রা পরীক্ষা করে দেখার কোনো দরকার নেই। আপনার মুদ্রা আপনার কাছেই থাকুক।'

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো রাহু। সে ভেবেই নিয়েছিল, বিশ স্বর্ণমুদ্রার প্রস্তাব এই ছেলে ফেরাতে পারবে না। আসল ব্যাপার সে জানে। এই ছেলের তো কোনোভাবেই জানার কথা না অঙ্গদের আসল দাম। সেটা বিশ স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে অনেক বেশি।

কাল রাতে শুধু অসিতেরই ঘুমে সমস্যা হয়নি, রাহুরও হয়েছিল। সে এই বানর নিয়ে কী কী করবে, কোথায় কোথায় যাবে সব ভেবে রেখেছিল।

মনের ভাব মুখে প্রকাশ করলো না রাহু। তার মুখে স্বাভাবিক হাসি, 'তুমি মনে হয় বিশ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য বুঝতে পারছো না। বিশ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে ভাবনার চেয়েও বেশি ধনী করে দেবে।'

অসিত কিছুই বললো না। ধনী হবার ইচ্ছা তার হৃদয় থেকে দূর হয়ে গেছে। রাঁধাকে ঘরে আনা তার জন্য যেমন জরুরি তেমনি অঙ্গদকে সাথে রাখাও জরুরি। দায়িত্ব আর প্রেমের মধ্যে অবশ্যই দায়িত্ব বড়ো। অবশ্য প্রেমও একটা দায়িত্ব। তবে সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে ধর্ম। তার ওপরে মানুষের জন্য আর কিছুই নেই।

আবার লোভের টোপ ফেললো রাহু, 'দেখো আমি আসলেই তোমার বানর কিনতে চাই। ঠিক আছে, তুমি বিশ স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করতে চাচ্ছো না। আমি তোমাকে ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা দেবো। এবার তো আর তুমি না করবে না। আমি তোমাকে ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা এখনই দিতে পারি।'

এবার বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো অসিত। তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট, 'ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা নয়, লাখ স্বর্ণমুদ্রা দিলেও আমি অঙ্গদকে বিক্রি করবো না। আপনি চলে যান। এই বেচাকেনার কথা বলতে আর কখনোই আমার বাড়িতে আসবেন না।'

রাহু মানুষ যেমন চেনে তেমনি পরিস্থিতিও বুঝতে পারে বেশ। মানুষের মুখ দেখে মনের কথা বোঝার ক্ষমতা অনেক চেষ্টায় আয়ত্ত করেছে সে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই

ছেলে কোনোভাবেই এই বানর বিক্রি করবে না। হঠাৎ করে এই ছেলের মাঝে এমন মনোভাব কোত্থেকে এলো তা যদিও বোঝা যাচ্ছে না।

নিমেষে নিজের চরিত্রে ফিরে গেল রাহু, 'হ্যাঁ, বেশ বুঝেছি। তোমার বানর তুমি বিক্রি করবে না। তাতে আমার তো আর কিছু করার নেই। না বিক্রি করলে কোনো সমস্যা নেই। তবে আমি মাঝেমাঝে তোমার বাড়িতে আসবো। গল্প করতে। কথা দিচ্ছি, এই বানর বেচাকেনা নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না। শুধু এসে তোমাদের দেখে যাবো। এদিকে আমার কথা বলার মতো লোক খুব একটা নেই।'

অসিত আস্তে করে সায় দিলো, 'আচ্ছা।'

রাহু বিদায় নিয়ে ঘোড়া ঘোরালো। রওনা দিলো নিজের গন্তব্যের দিকে।

অসিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। অঙ্গদকে ইশারা করতেই সে তার কাঁধে লাফিয়ে পড়লো। অঙ্গদকে জড়িয়ে ধরলো অসিত। তার চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে। অঙ্গদ ডানবাম কিছুই বুঝতে পারছে না। সে শুধু হতবুদ্ধি হয়ে অসিতের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হলো অসিত। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। এবার ক্ষিধে অনুভব করলো সে। মাথা থেকে বোঝা সরে গেছে। অঙ্গদকেও খাওয়াতে হবে।

রাহু অনেকক্ষণ ঘোড়া দুলকি চালে চালালো। তারপর গাছের কাণ্ডে ঘোড়া বেঁধে নিজে বসে পড়লো গাছের ছায়ায়। মাথায় তার নানান চিন্তা ঘুরছে।

ঐ বানরটার ওপর চোখ পড়েছে তার। সেই জানে এই বানরের আসল সম্ভাবনা। কোনোভাবেই এই বানর হাতছাড়া করা যাবে না। বৈধ পথে করা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে কোনোভাবেই পিছু হটা চলবে না। যখন বৈধ উপায়ে কাজ হাসিল না হবে তখন অবৈধ উপায়েই কাজ হাসিল করতে হবে। গুরু শুক্রাচার্যের মতো মহাজ্ঞানী ঋষিও তাই করেছিলেন।

২৩

তোশিলার পাশ দিয়ে দয়া নদী বয়ে গেছে। দয়া নদীর নামের সাথে কাজের মিল আছে। বেশ শান্তিময় চেহারা এই নদীর। তোশিলা কলিঙ্গের রাজধানী। প্রাচীন জনপদ হিসেবে বেশ নাম ছিল একসময়। নগর ছিল বেশ সমৃদ্ধ। সেই সমৃদ্ধির লোভেই মহারাজ চণ্ডাশোক কলিঙ্গের যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য কলিঙ্গ বিজয় করেই তার চণ্ডাল রূপ দূরে চলে গিয়েছিল। তারপর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তিনি হয়েছিলেন শান্তির দূত। আর কলিঙ্গ হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে সাম্রাজ্যের একেবারে শেষ সীমায় থাকাতে তেমন একটা উন্নতি হয়নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে কলিঙ্গও স্বাধীন হয়ে যায়। তারপর থেকে এই রাজ্য শাসন করছে মেঘবাহন রাজবংশ।

সেই বংশেরই রাজা আসাকা-সাদা। তিনিই এখন সগৌরবে বসে আছেন কলিঙ্গের সিংহাসনে। আর্যাবর্তের মানচিত্রের দিকে তাকালে অবশ্য এই রাজ্য সম্পর্কে বর্তমান সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে না। আয়তনে কলিঙ্গ মহাজনপদগুলোর মধ্যে অতিকায় নয়, অনেকটাই ক্ষীণকায়। তবে সৈন্যবলে যথেষ্ট বলীয়ান এই রাজ্য। কলিঙ্গ সবসময় নিজের সেনার যত্ন নেয়।

মহারাজ আসাকা-সাদার অবশ্য সেনাদল নিয়ে কোনো লম্বা পরিকল্পনা অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। মেঘবাহন রাজাদের মধ্যে শুরুতে রাজ্যবিস্তারের বেশ উৎসাহ ছিল। তবে সেই উৎসাহ তার মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত। নিজ ভূমি রক্ষা করে বাকি জীবন নির্বিঘ্নে প্রজা আর স্বজন নিয়ে আরামে আয়েশে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। যদিও আর্যাবর্তে এখন রাজারা ব্যাবসা নিয়ে বেশ মেতেছে তবু তার রাজ্য হচ্ছে পূর্ব ভারতে, এখানে ব্যাবসার তেমন সুবিধা নেই। কৃষিকাজ আর পশুপালনই ভরসা।

তবে মহারাজ আসাকা-সাদার পরিকল্পনা যাই থাকুক না কেন, মহাপ্রকৃতির পরিকল্পনা হয়তো একটু অন্যরকম ছিল। আজ বিকেলে কলিঙ্গরাজের বহুদিনের লালিত পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসার বেশ সম্ভাবনা আছে।

মহারাজ এখন দয়া নদীর বুকে পড়ন্ত আলোর খেলা দেখছেন। তিনি একটু সন্ন্যাসী মনের অধিকারী। এখন সেরকমই চিন্তা করছেন। মাঝে মাঝেই তার মনে হয়, হয়তো রাজা না হয়ে জন্মালেই ভালো হতো। প্রকৃতি তার অনেক প্রিয়। তবে রাজশিক্ষার বাঁধায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঠিকমতো উপলব্ধি করা যায় না। তার মাঝে মাঝে পরিব্রাজক হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তবে পরিব্রাজক হবার ভাগ্য রাজার থাকে না। সবাই মনে করে রাজার মতো ক্ষমতাশালী আর স্বাধীন কেউ নেই। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। বাস্তবে রাজার চেয়ে কঠিন শেকলের বন্ধন আর কারো পায়েই থাকে না।

পশ্চিম শক রাজ্যের মন্ত্রী সারথী তার রাজ্যে এসেছেন। খবরটা আগেই পেয়েছেন। শক রাজ্য সম্পর্কে আগে একটুআধটু জানতেন। মন্ত্রী আসাতে একটু ভালো করে খোঁজখবর করেছেন। শকদের পূর্বপুরুষরা আর্যাবর্তের বাইরে থেকে এসেছিলেন। তবে তারা এখন বেশ ভালো করেই আর্যাবর্তের অংশ হয়ে উঠেছে। শেষ পাওয়া খবর থেকে তিনি জানেন, পশ্চিম শক রাজা বর্তমানে পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে বড়ো বন্দর

বারিগাজার মালিক। সেই বন্দর সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করে। স্বর্ণ আর রূপা সেই রাজার ধনভাণ্ডারে উপচে পড়ছে।

অন্যের ধনসম্পদ দেখে চোখ টাটানো স্বাভাবিক। যদি নিজের ভাণ্ডার দুর্বল হয় তাহলে তো টাটানোর সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়। তবে প্রতিবেশীর ধনে মানুষের হিংসা বেশি হয়। শকরাজ্যের অবস্থান তার রাজ্য থেকে অনেক দূরে। তাই সেই রাজ্যের ধনসম্পদের প্রতি তার আগ্রহ তেমন ছিল না।

তবে সেকথা আজ বিকেলে তাকে চিন্তা করতে হচ্ছে। এত লম্বা পথ পেরিয়ে পশ্চিম শক রাজ্য থেকে দূত এসেছে। তাও সাধারণ কোনো রাজদূত নয়, একেবারে ঐ রাজ্যের মন্ত্রী। ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর। তিনি এই বিশেষ সাক্ষাতে একা থাকতে চাচ্ছেন না। তার মন্ত্রী উদিতনাথকে খবর দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে তো চলে আসার কথা। তিনি আসলেই শক রাজার মন্ত্রীকে লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসা হবে।

উদিতনাথ মহারাজের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। মৃদু স্বরে সম্ভাষণ করলেন, 'মহারাজের জয় হোক। আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। হিসেবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। একেবারে শেষ করে এলাম। অপরাধ মার্জনা করবেন।'

'মার্জনা করলাম। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, এই রাজ্যের জন্য আপনি কেমন চিন্তা করেন। আপনার দ্বারা যদি কোনো অপরাধও সংগঠিত হয় তাহলেও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই হয়েছে। তাই এখানে মার্জনা করার কোনো প্রশ্ন উঠছে না।'

'মহারাজ, আপনি আমাকে অতিরিক্ত পছন্দ করেন দেখেই আমার ব্যাপারে এমনটা মনে করেন। এখন আমাকে খবর দেওয়ার কারণটা বলুন। আমি এখন আপনার কী সেবা করতে পারি?'

'সেবা না হলেও সাহায্য তো করতেই পারেন। এখনো আমি নিশ্চিত নই, তবে মনে হচ্ছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আর আপনি তো জানেনই, রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাকে সাথে না রেখে আমার উপায় নেই।'

'আপনার দয়া মহারাজ। এখন দয়া করে বলুন সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা।'

'সারথী এসেছেন।'

'সারথী? কোন রথের সারথী?' কিছুই বুঝতে পারলেন না উদিতনাথ।

'আরে না। কোনো রথের সারথী নয়। যিনি এসেছেন তার নাম সারথী। তিনি পশ্চিম শক রাজ্যের মন্ত্রী।'

উদিতনাথের চোখে এবার চিন্তার গাঢ় ছায়া পড়লো, 'পশ্চিম শক রাজ্যের সাথে তো আমাদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। সেই রাজ্যের মন্ত্রী আমাদের রাজ্যে কেন এসেছেন?'

'সেটা তো ওনার সাথে কথা না বলে জানা যাবে না। আমি একটু পরেই ওনার সাথে কথা বলবো। সেজন্যই আপনাকে খবর দিয়েছি। আলোচনার মধ্যে আপনার থাকাটা জরুরি।'

ঝড়ের গতিতে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে উদিতনাথের মাথায়। পশ্চিম শক বর্তমানে আর্যাবর্তের সবচেয়ে সম্পদশালী রাজ্য। আর ধনীদের সাথে বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা দুটোই সময়ে সময়ে বেশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই পথে খুব সাবধানে এগোতে হবে।

রাজা আসাকাকে রাজপদের ব্যবধানের কারণে শ্রদ্ধা করলেও ওনার বুদ্ধি সম্পর্কে তার তেমন শ্রদ্ধা নেই।

'চলুন, অথিতিশালায় গিয়ে ওনার সাথে দেখা করি। আর অপেক্ষা করতে ভালো লাগছে না। উৎকণ্ঠার সময় যতটা কমিয়ে আনা যায় ততই ভালো। যা হয় কিছু একটা তো হবে।'

'চলুন মহারাজ, যাওয়া যাক।'

দুপুরের আহারের পর পথশ্রম থাকা সত্ত্বেও সারথী আর বিছানায় যাননি। বয়স হয়েছে। তার ওপর যুক্ত হয়েছে দীর্ঘ যাত্রার ধকল। বিছানায় গেলে নিশ্চিতভাবেই শরীর মনের নির্দেশ মানবে না। ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু তার মন বলছে কলিঙ্গরাজ তার সাথে দেখা করতে বেশি দেরি করবেন না। সন্ধ্যের আগেই দেখাটা হয়ে যাবে। ঘুমঘুম চোখে চিন্তাগুণ ভালো কাজ করে না। আর কোনো রাজার রাজ্যে এসে তার সামনে উস্কুখুস্কু অবস্থায় উপস্থিত হওয়াটা শোভন নয়। তাই পুরোপুরি তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছেন তিনি।

তার দরজায় টোকা পড়লো একটু পরেই। দরজা খুলতেই তিনি প্রহরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, 'মহারাজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি তৈরি হয়ে আমার সাথে অথিতিশালার মন্ত্রণাকক্ষে চলুন।'

'চলো, আমি তৈরিই আছি।'

উদিতনাথ উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানালেন সারথীর প্রতি। সারথীও সম্ভাষণ আর জয়গান করলেন মহারাজের।

মহারাজ আসাকা সারথীকে বসতে ইশারা করলেন, 'আপনি অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। আজ আপনাকে বিশ্রাম করতে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তবে সত্যি বলতে কী, আমি আমার কৌতূহল কোনোভাবেই দমন করতে পারিনি। তাই আপনাকে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়েই চলে এলাম। আপনি আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ব্যাপারটা।'

'না মহারাজ, আমি বিশ্রাম নিচ্ছিলাম না। আসলে আপনার সাথে দেখা করার কৌতূহল আমার মনেও ছিল। আপনার ডাকের অপেক্ষাই করছিলাম আমি।'

এবার আলোচনায় ঢুকে পড়লেন উদিতনাথ, 'আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়াতে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এখন আপনি অবশ্যই আপনার আগমনের কারণ সম্পর্কে বলবেন। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু না ঘটলে পশ্চিম শকদের মন্ত্রী ভারতবর্ষের এক পাশ থেকে আরেকপাশে আসতেন না।'

'বলছি। প্রথমেই আপনাদের শকরাজ নাহাপনার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আসলে ওনারই একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি।'

'কী প্রস্তাব?' প্রশ্ন এলো মহারাজ আসাকার কাছ থেকে।

'দেখুন, প্রস্তাবটা হয়তো আমি এক কথায় বলতে পারবো, তবে প্রস্তাবের গুরুত্ব এক কথায় বোঝানো যাবে না। তাই আপনাদেরকে আমার কথা বিশদভাবে শুনতে হবে।'

'বলুন।'

'প্রথমেই বলি, আপনাদের হয়তো বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আপনাদের রাজ্যের দিকে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসা বিপদ সম্পর্কে।'

মহারাজ আসাকা চমকে উঠলেন, 'তার মানে?'

উদিতনাথ কিছু বললেন না। আলোচনা কোনদিকে এগোচ্ছে তা ভালো করে বোঝা দরকার।

সারথী আবার শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, আপনাদের রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত। আমার অনুমান খুব কমই ভুল হয়। আর সে অনুমান বলছে আপনাদের রাজ্যকে শীঘ্রই অনেক বড়ো এক সেনাদলের আক্রমণের মুখোমুখি হতে হবে।'

মহারাজ আসাকা এক কথা বারবার শুনে একটু অধৈর্য হলেন, 'দেখুন, আপনার এমন অনুমানের কী কারণ তা আমি জানি না। কিন্তু কলিঙ্গ রাজ্য কোনো রাজা আক্রমণ করবেন এমন কোনো সংবাদ আমাদের কাছে নেই। কলিঙ্গ রাজ্য এখন সম্পূর্ণ শান্তির পথে আছে। এই রাজ্য এখন কারো জন্য শত্রুতা অথবা স্বার্থ কিছুই প্রদর্শন করে না।'

সারথী একটু হাসলেন, 'মহারাজ, আপনার কলিঙ্গের মেঘবাহন বংশ এখন শান্তির পথে আছে সে কথা সত্য। কিন্তু আপনারা কি চিরদিনই শান্তির পথে ছিলেন? আপনি কি মেঘবাহনদের বীর্যশালী রাজা মহারাজ খারবেলের কথা ভুলে গেছেন?'

'না, ওনাকে ভুলি কী করে। উনি এখনো নমস্য।'

'তিনি কিন্তু যুদ্ধে বিমুখ ছিলেন না। সাতবাহন সাম্রাজ্যের সাথে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয় প্রবল বিক্রমের সাথে তাদের পরাজিতও করেছিলেন।'

'তার মানে এই নয় যে আমিও এখন শুধুশুধু বিক্রম দেখাতে যাবো। ওনার হয়তো যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। আমার তো প্রয়োজন নেই। মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বদলে যায়। আর আমিও এখন রাজা হিসেবে শান্তির পথই অবলম্বন করেছি।'

সারথী এবার মনে মনে বিরক্ত হলেন। খালি কেবল মুখে শান্তির বাণীর ফুলঝুরি। এক গৌতমের বাণী এখন পুরো ভারতে ভালোই ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের নিচে দশ বারোজন মিলে বসে পুরো পৃথিবীতে শান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। আরে শান্তি কি একমাত্র পথ? সবসময় কি এই পথ কাজ করে? করে না। মাঝে মাঝে এই শান্তির জন্যই হিংসাকে প্রশ্রয় দিতে হয়। অহিংসা পরম ধর্ম, এই কথা কেবল ভিক্ষুদের মুখেই মানায়, কোনো রাজার মুখে নয়। তবে মনের বিরক্তি চেপে গেলেন তিনি, 'মহারাজ, আপনি শান্তির পথে থাকুন। আপনাকে সাধুবাদ। কিন্তু এখনকার সব রাজাই তো আর আপনার মতো শান্তির পথে নেই। সাতবাহনদের বর্তমান সম্রাট সাতকর্ণী কিন্তু এরই মধ্যে পুরো মধ্য ভারত নিজের কজায় নিয়ে নিয়েছেন। তার রাজ্যের সীমানা কিন্তু এখন কলিঙ্গের সীমানায় এসে ঠেকেছে। তার যে আরো রাজ্য জয়ে আপত্তি আছে তা আমার মনে হয় না। আপনি বললেন, এখন মেঘবাহন আর কলিঙ্গ কারো প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে না। কিন্তু, আমার তা মনে হয় না। শত্রুতা তো আপনাদের মাঝে অনেক আগ থেকেই আছে। বংশানুক্রমিক শত্রুতা। সাতবাহন রাজা সাতকর্ণী অতি শীঘ্রই আপনাদের রাজ্যের দিকে হাত বাড়াবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

এবার আর উত্তরে মহারাজ আসাকা কিছুই বলতে পারলেন না। এতক্ষণ উদিতনাথ কোনো কথাই বলছিলেন না, এবার পাদপ্রদীপের আলোয় এলেন, 'কেউ

আক্রমণ করলে করুক। আমরা যে-কোনো আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতে সবসময় প্রস্তুত আছি।'

'হ্যাঁ, তা জানি। আপনাদের সেনাবাহিনী অনেক শক্তিশালী। আপনাদের কাছে ষাট সহস্র পদাতিক আছে, দুই সহস্র অশ্বারোহী আর সাতশো উৎকৃষ্ট হাতিও আছে। যথেষ্ট শক্তিশালী বাহিনী। তবে জানেন কি, এই বাহিনী সাতকর্নীর বাহিনীর সামনে কিছুই না। কেবল ঝরা পাতার মতো উড়ে যাবেন।'

'আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনো বুঝতে পারলাম না। আপনার মতো একজন লোক, একটা বড়ো রাজ্যের মন্ত্রী কেবল আমাদের বিপদের খবর দিতেই নিশ্চয়ই এখানে আসেননি। আপনার আসল উদ্দেশ্য কী? আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে এখানে আপনাদের রাজ্যের স্বার্থ কী?'

'আছে মন্ত্রীমশায়, আছে। পশ্চিম শক রাজ্যের স্বার্থ এখানে জড়িত। আপনাদের সাথে যেমন এখন সাতবাহন রাজ্যের পূর্বদিকের সীমানা তেমনি আমাদের রাজ্যের সাথে সাতবাহনের পশ্চিম সীমানা। আমরাও মহারাজ সাতকর্ণীর পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারি। আপনাদের রাজ্য তিনি আক্রমণ করতে পারেন পূর্বশত্রুতার জের ধরে, আর আমাদের রাজ্য তিনি আক্রমণ করবেন সম্পদের লোভে। আমরা দুজনেই এখন আক্রমণের আশঙ্কায় আছি। শত্রুর শত্রু মিত্র হয়। মহারাজ নাহাপনা তাই আমাকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। মহারাজ আসাকা যদি আমাদের বন্ধুত্ব স্বীকার করেন তাহলে প্রস্তাবে রাজি হবেন। আপনাদের জন্য প্রস্তাবের সাথে আমার কাছে মহারাজ নাহাপনার দেওয়া একটা ভেটও আছে। বন্ধুত্বের প্রথম উপহার।'

'কী উপহার?' মহারাজ আসাকা আগ্রহী হন।

'মহারাজ, আমাদের বন্ধুত্বের প্রস্তাবে রাজি হলে সম্পূর্ণ বিনা বিনিময়ে আমরা আপনাকে প্রতি বছর পাঁচ মণ সোনা উপঢৌকন হিসেবে দেবো।'

লোভনীয় প্রস্তাব। আর্যাবর্তের এই পাশ বহুকাল সোনার স্পর্শ বঞ্চিত অবস্থায় আছে।

'আচ্ছা, আপনার প্রস্তাব আমরা শুনলাম। এখন তাহলে আপনি বিশ্রাম করুন। এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে তো একটু সময় লাগবে। আমাদেরকে একটু সময় দিতে হবে।'

'কোনো সমস্যা নেই মহারাজ। আপনার যত সময় লাগে নিন। আমি অপেক্ষা করবো। আপনাদের অথিতিশালাতেই থাকবো যদি আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে।'

'না না, কী বলছেন। অথিতি সৎকারের সুযোগ থেকে আপনি আমাদের বঞ্চিত করবেন না। আপনি এবং আপনার অনুচরেরা রাজঅথিতিশালাতেই থাকবেন।'

সারথী উঠে দাঁড়ালেন। তার কাজ অর্ধেক শেষ হয়েছে। প্রস্তাব পৌছানো গেছে। বাকি অর্ধেক কাজে তার কোনো হাত নেই। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস, বাকি অর্ধেক কাজেও তিনি সফল হবেন।

২৪

অসিত আজ খেলা দেখাতে এসেছে একটা গ্রামে। প্রতিদিন নগরে যেতে ভালো লাগে না। নগরগুলো অনেক দূরে আর অনেক কোলাহল। কাছাকাছি গ্রামে গেলে ভালো। হইচই কম, কষ্ট কম আবার কিছু উপায়ও হলো।

তবে গ্রামে খেলা দেখানোর কিছু অসুবিধাও আছে। গ্রামের লোকে পারতপক্ষে নগদ মুদ্রা দেয় না পুরস্কার হিসেবে। থাকেই না, দেবে কীভাবে। তারা দেয় শস্য, নানারকম খাবার, কারিগরেরা দেয় তাদের তৈরি নানান জিনিস। গ্রামের খেলা দেখানো এই কারণে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়। খেলার পরে কাছাকাছি উপস্থিত বাজারে পাওয়া শস্য আর নানা জিনিস বিক্রি করে নগদ মুদ্রা জোগাড় করতে হয়। তারপর সেই মুদ্রা নিয়ে চলে আসতে হয় গ্রামে।

দুপুরের একটু পরেই খেলা দেখানো শেষ হলো। আজকে অন্য কোনো জিনিস পায়নি, শুধু শস্য কপালে জুটেছে। খেলা দেখানোর জিনিসপত্রের সাথে শস্যের বোঝাও মাথায় চেপেছে। সবচেয়ে কাছের বাজারটাও দূরত্বে নেহাত কম নয়। এখন সেই দূরত্ব এই বোঝা মাথায় নিয়ে পার হতে হবে।

ধূলি ওড়া মাটির রাস্তায় এগিয়ে চলেছে সে। ইচ্ছে করলে গ্রাম থেকে বাজারে যাওয়া গোরুর গাড়ি ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে গাড়ির ভাড়া যা হয়েছে সেটা শস্য বেঁচে পাওয়া মুদ্রার সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে। কষ্ট করলে তবেই সেই কষ্টের মূল্য পাওয়া যাবে।

ঘাড়ের কাছটা টনটন করছে। তবু থামলে চলবে না। নয়তো বাজার থেকে বাড়িতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। পথে দস্যুর উপস্থিতি যে একেবারে নেই তাও নয়।

পেছনে একটা আওয়াজ হতে থামলো অসিত। আওয়াজটা হ্রেষা। পেছনে ঘুরে দেখে একটা ঘোড়া ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে এতক্ষণ ছুটে এসে তার পেছনে থেমেছে। রাস্তায় এখনো ক্ষুরের ধাক্কায় আলোড়িত ধুলো উড়ছে। ঘোড়ার ওপর বসে আছে সেই রহস্যময় লোকটা।

'আরে তোমার সাথে দেখি আবার দেখা হয়ে গেল। পাশের গ্রামে যাচ্ছিলাম একটা কাজে। এখান থেকে বাজারে যাচ্ছি। তোমাকে সামনে দেখলাম। বোঝা কাঁধে বেশ কষ্ট করে হাঁটছো। কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

ঘোড়া দেখে অসিতের মন একটু দুলে উঠলো। লোকটা অঙ্গদকে কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে সে না করার পরে আর কোনো জোর জবরদস্তি করেনি। লোকটা আসলে খারাপ নয়। তবে রহস্যময় অবশ্যই। কোত্থেকে যেন আচমকা হাজির হয়ে যায়।

জবাব দিলো অসিত। সে সামনের বাজারেই যাচ্ছে।

রাহু ঘোড়া থেকে নামলো, 'আরে আমিও তো সেই বাজারেই যাচ্ছি। আমার কাছে ঘোড়া থাকতে তুমি এত কষ্ট করে বোঝা নিয়ে হেঁটে যাবে কেন? এসো, উঠে এসো।'

আপত্তি করা অথবা অজুহাত দেখানোর অবস্থা নেই অসিতের। রাহু তাকে মালামাল ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিতে সাহায্য করলো। তারপর দুজনেই উঠে বসলো ঘোড়ায়। দুলকি চালে ঘোড়া চলতে শুরু করতেই একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা অসিতের পুরো শরীর যেন জুড়িয়ে দিলো। সামনে বসা লোকটা সম্পর্কে দেবদূত জাতীয় চিন্তাভাবনা আবার তার মনে একটু একটু করে ফিরে আসছে।

রাহু ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাজারের দিকে। সে সেই সকাল থেকে ইন্দ্রপুর থেকে অসিতের ওপর নজর রেখেছে। তারপর সুযোগ বুঝে অসিতের অবস্থা যখন একেবারে তথৈবচ তখন সে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। খুব সাবধানে কাজ করছে সে। এই ছেলের নির্ভরতার জায়গায় গিয়ে বসতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে সারতে হবে আসল কাজ। কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র জোগাড়ের কাজ আছে। সেগুলো জোগাড় হয়ে গেলেই আসল পরিকল্পনায় হাত দিতে হবে।

ঘোড়ায় চড়ে বাজারে যেতে বেশিক্ষণ লাগলো না। অসিতের কপাল আজকে ভালো। সহজেই শস্য বিক্রি করে দিলো সে। দামও খারাপ পাওয়া গেল না। অসিত এত মুদ্রা পাবে ভাবেনি। তারপর বাজারে খেয়ে নিলো ওরা। বলাই বাহুল্য, খাবারের দাম দিলো রাহু, অসিতকে দিতে দিলো না।

ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যের অনেক আগেই অসিতকে ইন্দ্রপুরে পৌঁছে দিলো রাহু। ওকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার আগে জিজ্ঞেস করলো রাহু,

'কাল খেলা দেখাতে যাবে না?'

'যাবো তো।'

'কাল কখন বের হবে?'

'খুব ভোরে বের হবো। কাল অনেক দূরের এক নগরের খেলা দেখাতে যেতে হবে।'

'বাহ, অনেক দূরের নগরে যাবে। কাল তাহলে আমিও তোমার সাথে যাবো। এখনো তোমার খেলা আমার ভালো করে দেখা হয়নি। কাল মন দিয়ে দেখবো। আমি এখান থেকে অনেক দূরে কাজ করি। এখন কাজের ছুটি। তাই বাড়ির দিকে এসেছি। ঘুরেফিরে আবার ফিরে যাবো কাজে। সত্যি বলতে কি, তোমাকে আর তোমার বানরকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি যতদিন এদিকে আছি ততদিন তোমাদের সাথে সাথেই থাকবো। খেলা দেখবো। আমি খেলা দেখে আনন্দ পাবো। তোমারও লাভ হবে। আমার সাথে ঘোড়া আছে। তাই তুমি আরো দূরের জায়গায় খেলা দেখাতে যেতে পারবে। তোমার কষ্ট কমে যাবে।'

'আচ্ছা' অসিত খুশি হয়ে উঠলো, 'আপনি তাহলে কাল খুব ভোরে চলে আসবেন। আপনি এলেই আমরা রওনা দেবো।'

'আচ্ছা। এখন আমি যাই। তুমি বিশ্রাম নাও।'

হাসিমুখে বিদায় দিলো অসিত। রাহুও বিদায় নিলো হাসিমুখে। কিন্তু নিজ গ্রামের দিকে গেল না সে। তার বদলে গেল অনেক দূরের এক গ্রামের কামারের কাছে।

ততক্ষণে রাত বেশ গভীর হয়েছে। সেই কামারের হাঁপরের সামনে এখন বসে আছে রাহু। কথা বলছে বেশ মনোযোগ দিয়ে। দুহাত দিয়ে ইশারা করে কামারকে

নানান মাপ বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপর যে জিনিস বানানো হবে সেই জিনিসের আগাম বায়না বাবদ কিছু মুদ্রা দিয়ে দিলো কামারকে। অগ্রিম মুদ্রা পেয়ে কামারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একেবারে গড় হয়ে প্রণাম করলো সে রাহুকে। রাহু বেরিয়ে এলো। এবার আর কোথাও না, সোজা চলে এলো নিজের গ্রামে।

পরদিন সকালেই অসিতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো রাহু। অসিত ততক্ষণে উঠে পড়েছে। রাহুর জন্যই অপেক্ষা করছে সে। রাহু ঘোড়া থেকে নেমে শরীরের আড়মোড়া ভেঙ্গে নিলো, 'কী, তুমি তৈরি? খাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিছু ফল ছিল। আমি আর অঙ্গদ মিলে খেয়ে নিয়েছি। আপনার খাওয়া হয়েছে?'

'না, তবে আমি খাবার নিয়ে এসেছি। ফল তো শুনেছি ভরা পেটে খেলেই ভালো। তোমরা সকালে উঠে খালি পেটেই খেয়ে ফেললে। এসো আমার আনা খাবার থেকে একটু খেয়ে নাও। তারপর রওনা দেবো।'

রাহু গত রাতেই মিষ্টান্ন আর নানা রকমের পিঠা বানিয়ে রেখেছিল। একা একা থাকার কারণে তার রন্ধন প্রতিভার ভালোই বিকাশ ঘটেছে। সেই নানা রকমের মজাদার খাবার দেখে অসিতের চোখে লোভ দেখা দিলো। খাবারের দর্শনেই যেন স্বাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এমন দর্শন আর স্বাদের খাবার ঘরে অনেকদিন খায়নি সে। শেষবার পিঠে খেয়েছিল উমা পিসির বাড়িতে। সেটার চেহারা অবশ্য এত ভালো ছিল না।

সুস্বাদু মিষ্টান্ন আর পিঠা খেয়ে ভরা পেট আরো ভরিয়ে ফেললো অসিত আর অঙ্গদ। অঙ্গদ যদিও ভাগ পেয়েছে তবে বেশি খেলো না। সে এসব খাবার তেমন পছন্দ করে না।

এত ভরা পেটে হাঁটতে হলে অসিতের অবস্থা বেহাল হয়ে যেতো। তবে সেই সমস্যার সমাধান তার ঘরের সামনেই বাঁধা আছে।

ঘোড়ায় চড়ে মাঝবেলার আগেই কাঙ্ক্ষিত নগরে পৌছে গেল ওরা। ঘোড়া বেঁধে রেখে এবার দর্শকদের সাথে দাঁড়ালো রাহু। নানা মজাদার খেলা দেখাচ্ছে অসিত। রাহু বেশ ভালো করে নজর রাখছে। এটাও তার পরিকল্পনার একটা অংশ। অসিতের ইশারা আর কৌশলগুলো ভালো করে দেখে নিতে লাগলো সে। কিছুক্ষণ পরে অসিত আর অঙ্গদের মিলিত কসরতে সেও ভালোই মজা পেতে লাগলো। কিছুক্ষণের জন্য কূট পরিকল্পনাগুলো মনের একপাশে সরিয়ে রাখলো সে। নির্ভেজালে উপভোগ করতে লাগলো।

অনেক মুদ্রা পেয়েছে আজ অসিত। গুণে নিয়ে কোমরের থলিতে ভরে ফেললো সে ওগুলো। তারপর বাকি সব জিনিস গুছিয়ে চলে এলো রাহুর কাছে, 'চলুন, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। আজ কিন্তু খাবারের দাম আমি দেবো। আজ অনেক রোজগার হয়েছে।'

রাহু মাথা নাড়লো, 'নাহ, আজও খাবারের দাম আমিই দেবো। সবাই দলবেঁধে তোমার খেলা দেখেছে। সবাই যে যা পেরেছে সেভাবে মুদ্রা দিয়েছে তোমাকে। আমি কিন্তু খেলা দেখেও তোমাকে কিছুই দিইনি। বিনা পয়সায় তোমার এত সুন্দর খেলা

আমি দেখবো না। ধরে নিতে পারো, খেলা দেখানোর দাম হিসেবে আমিই তোমাকে আজ খাওয়াবো।'

অসিত হেসে সম্মতি জানালো। তারপর দুজনে এগিয়ে গেল খাবারের দোকানের দিকে।

সেদিন বিকালে যথারীতি অসিতকে বাড়ি পৌঁছে দিলো রাহু। তারপর আবার ঘোড়া ছোটালো কামারের বাড়ি লক্ষ্য করে। কামারের কাজ শেষ হয়েছে। জিনিসটা দুহাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো রাহু। জিনিসটা দেখতে খুব পোক্ত হয়েছে। পরীক্ষা করে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো সে। এই জিনিসে কাজ হবে। বেশ ভালো করেই হবে। সাথে আরেকটা ছোটো জিনিসের ফরমায়েশও দিয়ে রেখেছিল সে কামারের কাছে। সেটাও তৈরি হয়ে গেছে। বায়নার মুদ্রা বাদে বাকি মুদ্রাগুলো মিটিয়ে দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে নিলো রাহু। কামার গতকালের মতো আবার গড় হয়ে প্রণাম করলো তাকে।

পরদিন সকালে কোথাও যাবার পরিকল্পনা নেই অসিতের। সকালে উঠে একটুআধটু রান্না করতে বসলো সে। কাজটা অনেকদিন পরে করছে। কাজটা অত করতে হয় না। তার আনাড়ি হাত। হিসেবের গোলমালে অন্ন একেবারে আঠা আঠা হয়ে গেল। হতাশ হলো সে। এই জিনিস খাওয়া যাবে না।

অন্নের পালা শেষ করে এবার সবজিতে হাত দিলো সে। সেখানেও ঝামেলা হয়ে গেল। জলের মাপ ঠিক রাখতে পারেনি সে। সবজি সেদ্ধ হবার আগেই পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আঠা আঠা ভাত আর আধাসেদ্ধ সবজি কোনোমতে খেতে লাগলো সে। বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। অঙ্গদ একবার খাবারের দিকে নজর দিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে ফিরে গেছে তার সামনে রাখা ফল আর বাদামে।

কোনোমতে খাবার শেষ করে সব জমানো মুদ্রা এক জায়গায় জড়ো করলো অসিত। তারপর খুব সাবধানে গুণতে লাগলো। তার গণিত জ্ঞান অতি সামান্য। ছোটোবেলায় গ্রামের মন্দিরে শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে কয়েক বছর গ্রামের বালকদের সাথে শাস্ত্র শিক্ষা করেছিল। সেসব শাস্ত্রের ভেতরে গণিত শাস্ত্রও ছিল। তবে সে শিক্ষা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারেনি সে।

সবগুলো মুদ্রা গুণে শেষ করে শ্বাসের গতি বেড়ে গেল তার। নিশ্চয়ই সে ঠিকমতো গুণতে পারেনি। কোথাও ভুল হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি তো দুশো মুদ্রার লক্ষ্য পূরণ হবার কথা না। আবার গুণতে শুরু করলো সে। এবার আরো সাবধানে। এমনভাবে আরো দুদফা হিসেব হলো। কিন্তু, ফল বদলালো না। দুশো দশটা মুদ্রা আছে এখানে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো সে। আর দেরি করা যাবে না। কালকেই দুটো গাভী কিনে আনতে হবে। একা একা সামলাতে পারবে না সে। কাউকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। এই ব্যাপারে আগে হলে দুশ্চিন্তায় পড়তে হতো। তবে এখন আর চিন্তা হচ্ছে না। এই গ্রামে তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। উমা পিসির বাড়ির লোকজনের সাথে তার ভালো সম্পর্ক কিন্তু তাদের কেউ দূরের বাজারে গাভী কিনতে সাহায্য করতে যেতে পারবে না।

তার নতুন সাথীর কথা মনে পড়লো এবার। তাকে বললেই সে সাহায্য করবে। যখন চিন্তা করছে তখনই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। বন্ধুর কথা চিন্তা করতেই বন্ধু হাজির।

হাসিমুখে ঘরের বাইরে বেরোলো অসিত। তাকে দেখেই তার মনের ভাব বুঝে ফেললো রাউ, 'কী, আজ এতো খুশি খুশি লাগছে কেন তোমাকে? সব দাঁত দেখছি বেরিয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ, আজ মুদ্রাগুলো গুনছিলাম। আমার কাছে এখন দুশো দশটা মুদ্রা আছে।'

'আচ্ছা, ভালো কথা। কিন্তু তাতে এত খুশি হবার কী আছে?'

'দুশো মুদ্রা দিয়ে দুটো ভালো জাতের গাভী কিনতে পারবো।'

'ভালো কথা, গাভী কেনা যাবে। কিন্তু হঠাৎ করে তোমার দুটো ভালো জাতের গাভী কেনার প্রয়োজন হলো কেন? বানর খেলা বাদ দিয়ে তুমি কি দুধ বিক্রি করবে?'

কারণটা সরাসরি বলতে পারলো না অসিত। লজ্জা পেলো সে। বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যে থাকলেও সম্পর্ক নতুন। সবকিছু বলার মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। পর্দা রয়ে গেছে। তাকে তো আর বলা যায় না, দুটো গাভী কিনতে হবে প্রথমে। তারপর সেই গাভীর খবর উমা পিসিকে দিয়ে তাকে পাঠাতে হবে রাঁধার মার কাছে।

'আপনি কি আমার সাথে যাবেন? দুটো গাভী আজই কিনবো।'

রাহু জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, যাবো। আমার তো কোনো সমস্যা নেই। তার আগে চলো খেয়ে নেই। আজ আবার মিষ্টান্ন রেঁধে এনেছি। আজ অন্যরকমের মিষ্টি। এদিকের লোকে কখনো এমন মিষ্টি খায়নি। তুমি আর অঙ্গদ খাও।'

'আপনি খাবেন না?'

'খাবো। তবে শুধু ফল। আজকে আমার একটা ব্রত আছে। ফল ছাড়া অন্যকিছু এই ব্রতে খাওয়া নিষেধ।'

অসিত নিজের ফলের ঝুরি তার দিকে এগিয়ে দেয়।

অঙ্গদের আজকের মিষ্টি বেশ পছন্দ হয়েছে। আজকের মিষ্টান্নে বাদাম দেওয়া হয়েছে। এজন্যই বোধহয়। অসিত নিজেও যোগ দিলো খাওয়াতে। দেখতে দেখতে হাড়ি নিঃশেষ হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে জল খেতেই মাথাটা কেমন জানি ঝিমঝিম করে উঠলো অসিতের। অঙ্গদ ওদিকে জল পুরোপুরি খাবার সময়ই পায়নি। তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিছানার ওপর আড়াআড়িভাবে মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মতো পরে গেল অসিতের দেহ।

রাহু উঠে দাঁড়ালো। তার চেহারা থেকে এখন বন্ধুসুলভ মুখোশ খসে পড়েছে। তার চেহারায় এখন শুধুই নিষ্ঠুরতা।

কামারের কাছ থেকে কাল রাতে বানিয়ে আনা লোহার খাঁচা আর শেকল ঘোড়ার পিঠে চাদরে মুড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছিল সে। এবার সেগুলো নিয়ে এলো। অঙ্গদের ঘুমন্ত দেহকে খাঁচায় ভরলো সে। তারপর গলায় চামড়া জড়িয়ে তার ওপর শেকল দিয়ে বেঁধে ফেললো। জ্ঞান ফিরে পেলে অঙ্গদ নিশ্চয়ই অনেক লাফাবে আর চেঁচাবে। শুধু গলায়

শেকল বাঁধলে তখন চামড়া কেটে যেতে পারে। চামড়া জড়ানো থাকলে আর কেটে যাবে না।

শেকলের আরেক মাথা খাঁচার সাথে বেঁধে ভালো করে খাঁচা আটকে দিলো সে। তারপর মোটা চাদরে ঢেকে দিলো খাঁচা। বাইরে থেকে এখন কেউ খাঁচা অথবা খাঁচার ভেতরের অঙ্গদকে দেখতে পাবে না। এই বানর এই অঞ্চলে অনেক জনপ্রিয়। সবাই নিশ্চয়ই চেনে। ঢেকে না নিলে লোকের সন্দেহ হবে। সবাই বুঝে ফেলবে সে এই বানর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলের দিকে কাজ শেষ করে রাতে রওনা দিতে পারতো সে। তবে রাতে পথ চলতে অসুবিধা, আবার দস্যুর ভয়ও আছে ষোলোআনা। এখন দূরে সরে যাবার জন্য তার কাছে পুরো দিন পড়ে আছে। কাপড়ের ঢাকনা থাকায় কেউ বুঝতেও পারবে না তার কাছে কী আছে।

খাঁচাটা ঘোড়ার ওপরের আসনের সাথে ভালো করে বাঁধলো সে। ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল মিষ্টান্নতে। হাতি পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে এই ওষুধে। অসিত বা অঙ্গদ কারো ঘুমই পনের মুহূর্তের আগে ভাঙবে না। সেই সময়ের মধ্যে সে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে বহুদূরে। কাঙ্ক্ষিত সম্পদ হস্তগত হয়েছে। এই অঞ্চলে আর ফেরার দরকার নেই। পৈতৃক ভিটা, ঐতিহ্য, জন্মভূমি প্রভৃতি অনুভূতির ব্যাপারগুলো রাহুর কাছে তেমন পাত্তা পায় না।

২৫

পুহার নগরীর শোভা নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার সম্ভাবনা না থাকলেও ঐশ্বর্য নিয়ে যথেষ্ট দোনোমনা হওয়া সম্ভব। যে নগরীতে রাজা থাকে সে নগরীর শোভা এমনিতেই রাজ্যের অন্য সব নগরীর থেকে বেড়ে যায়। রাজধানী হিসেবে নতুন রাজা এখনো পুহারকে সর্বাত্মক স্বীকৃতি দেননি, এখানে কোনো বড়ো যজ্ঞ করে রাজসূয়ে রাজার সিংহআসন আরোহণ হয়নি, এমনকি রাজকুলদেবীর অভিষেকও এখনো হয়নি। তবু রাজা যে মহলে থাকে তাই রাজপ্রাসাদ এবং সেই নগরীই নিঃসন্দেহে রাজধানী।

তবু কিছু একটা যেন নেই, ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। রাজা থাকবে, রাজধানী থাকবে, রাজসভা থাকবে, প্রজাদের সম্মেলন থাকবে, নালিশ থাকবে, বিচার থাকবে, প্রহরীদের অহেতুক দম্ভের প্রকাশ থাকবে, সাজা হবে, সেনাদের প্রশিক্ষণ হবে, তবেই তো বোঝা যাবে এখানে বিশাল রাজকার্য চলছে। সেসবের কিছুই হচ্ছে না এখানে। সবকিছুই যেন থমকে আছে।

চোলা রাজ্যে এখনো স্বাভাবিক এসব নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক ঝামেলার পরে রাজ্যে এখন গুছিয়ে তোলার পালা চলছে। তবে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সবসময় যে এই রাজ্যে ছিল তা না।

আগের মহারাজ ইল্লামছেনির সময়ে সবকিছু স্বাভাবিক চলছিল। অবশ্য সবই ওপরে ওপরে। পৃথিবীর কোন রাজাই অজাতশত্রু হয় না। মহারাজ ইল্লামছেনি নিজের অবস্থা নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন যে বাইরের শত্রু ছাড়াও রাজার ভেতরের শত্রুরও অভাব থাকে না। আর ঢাকনার নিচে কী আছে সেটা দেখার মতো দূরদৃষ্টি ওনার ছিল না। তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। ভেতরে ভেতরে তার মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে রাজ্যের ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছিলেন। এরপর শুধু রাজার কাছ থেকে রাজ্যটা কেড়ে নেওয়া বাকি।

যুবরাজ অথবা হবু-রাজা যাই বলা হোক না কেন ইল্লামছেনির পুত্র কারিকালার মুখ থেকে তখনো দুধের গন্ধ ঠিকমতো মিলিয়ে যায়নি। মন্ত্রীরা বুঝলেন এখনই উৎকৃষ্ট সময়। অকাজটা ঘটিয়ে ফেললেন তারা।

এক সকালে প্রাতরাশের পর রক্তবমি শুরুর হলো মহারাজ ইল্লামছেনির। সাথে সাথেই ডাকা হলো রাজবৈদ্যকে। বৈদ্য অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। এমনকি এটাও বোঝা গেল না, খাদ্যদ্রব্যের গুণেই এমন হয়েছে, না-কি বাইরে থেকে কেউ গুণ টেনেছে। সিংহাসনের মায়া অল্প বয়সেই কাটালেন মহারাজ ইল্লামছেনি। আর সেই সাথে অবধারিত ভাবে সিংহাসনের ভার এসে পড়লো মুখে দুধের দাগওয়ালা যুবরাজের কাঁধে।

তবে খুব বেশিদিন গেল না। কারিকালার ছোটো অশক্ত কাঁধে রাজ্যভারের মতো কষ্ট মন্ত্রীরা সহ্য করতে পারলেন না। নিশ্চয়ই তারা কারিকালার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তারা। মহারাজের মৃত্যু সেই পরিকল্পনার

একটা অংশ ছিল। মন্ত্রীরা সিংহাসন তাদের ছত্রছায়ায় নিয়ে এলেন। কারিকালা মুক্তি পেলো। তাকে বের করে দেওয়া হলো রাজ্য থেকে।

তবে সমস্যা সেখানে শেষ হলো না। বলতে গেলে শুরু হয়েছে। রাজার ছেলে রাজা হবে এটা সাধারণ নিয়ম, কোনো গোলমাল নেই। কিন্তু বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে কে রাজা হবে তা নিয়ে তো আর সাধারণ কোনো নিয়ম নেই। আগেও এটা নিয়ে তারা গোপনে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। বহু সিংহের মাঝে যখন একজনকে বনের রাজা নির্বাচন করতে হয়, তখন ঘোর সংকটের আবির্ভাব হওয়া স্বাভাবিক। চোলা রাজ্যেও মহারাজ ইল্লামছেনির মৃত্যুর পর সেই ঝামেলা দেখা দিলো। সিংহাসন অনেকদিন ধরে চৈত্রের মাঠের মতো খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

তবে জগতে কোনো কিছুই আটকে থাকে না। সবকিছুরই সমাধান আছে। এখানেও একজন মন্ত্রীর নিজেকে অন্যরকম প্রমাণ করে রাজা হতে হবে। তাকে সিংহমধ্যে হতে হবে রাজসিংহ। সেরকম একটা কাজের পরিকল্পনা করলেন মন্ত্রীদের মধ্যে একজন। সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি বিতাড়িত যুবরাজকে খুঁজে এনে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আবার তিনি নিজেকে রাজা হিসেবেও ঘোষণা করতে পারবেন। যেভাবে ভাবলেন সেভাবেই কাজে লেগে পড়লেন তিনি। বিশেষ গোপন বাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হলো। আরেকটা কারণ ছিল এই অভিযানের। শুধু রাজপুত্র শত্রুই নয়, বরং সব শত্রুই নিধন করতে হবে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

নাবালক কারিকালাকে কোনোভাবেই সুকৌশলী বলা যাবে না। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তার অনুমান করা অতটা কষ্টসাধ্য ছিল না। তবে কারিকালা পারেননি। সেই বিশেষ বাহিনীর হাতে সহজেই ধরা পড়ে যান তিনি। তাকে নিয়ে আসা হলো রাজধানীতে। জায়গা হলো রাজপ্রাসাদের কারাগারে।

সেই সাথে ঐ মন্ত্রী সৈন্যদলের ওপর নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। কেউ প্রতিবাদ করার সুযোগও পেলো না, সাহসও হলো না। সবাই ভেতরে ভেতরে চরম ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। যাদের হাত দিয়ে একবার রাজঘাতকতার কাজ হয়েছে তারা অবশ্যই বিশ্বাসের অযোগ্য। নতুন রাজা নিশ্চয়ই চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতকদের বাঁচিয়ে রাখবেন না। এ যেন ঘরপোড়া গোরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাওয়া।

মন্ত্রীমণ্ডলের কেউ কেউ রাজ্য ছেড়ে বহু দূরে চলে গেলেন, আর যাদের সেই সুযোগ হলো না, তারা যেখানে গর্ত খোঁড়ার জায়গা আর সুযোগ পেলো, সেখানেই গর্ত করে টুপ করে ঢুকে পড়লেন।

মৃত্যুর অপেক্ষায় হতাশ কারিকালা ক্ষণ গুণতে লাগলেন কারাগারে বসে। তবে বিশ্বাসঘাতকদের পাশ থেকে সরিয়ে দিয়ে পূর্বতন মন্ত্রী আর নতুন রাজার সুবিধা যেমন হলো তেমনি অসুবিধাও হয়েছে। তিনি শত্রুদের সাথে সাথে অনেক বন্ধুও হারিয়েছেন।

এদিকে রাজ্যসুদ্ধ লোক কিন্তু ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়নি। প্রজাদের বেশীরভাগই মন্ত্রীদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট ছিল। অন্যদিকে মহারাজ ইল্লামছেনির কৃতজ্ঞ শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাদেরই একজন ছিলেন ইল্লামছেনির মোটামুটি দূরসম্পর্কের ভাই, ইরাম। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তার স্নেহ ছিল অপরিমিত। তিনিই প্রথম কারিকালাকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

বন্দিশালায় ঘোর পাহারা। কোনোভাবেই আচমকা আক্রমণ করে কারিকালাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সোজা উপায়ে যখন কাজ হলো না, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করতেই হলো। যাকে বলে রীতিমতো গেরিলা উপায়। মহাভারতের জতুগৃহের বুদ্ধি ইরামের বেশ কাজে লেগেছিল।

গভীর রাতে বন্দিশালার আশেপাশের দেওয়ালে এবং কাছাকাছি ভবনে কৌশলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই প্রহরীরা হয়ে পড়লো দিশেহারা। সেই সুযোগে নিজের সর্বশক্তি নিয়ে বন্দিশালা আক্রমণ করেন ইরাম। দিশেহারা সৈন্যরা সামলে নিয়ে প্রতিউত্তর দিলো কিন্তু তাতে তেমন সুবিধা হলো না। বন্দিশালা থেকে কারিকালাকে মুক্ত করা হলো। তবে একেবারে অক্ষত অবস্থায় নয়। দরজা ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে আগুন গ্রাস করেছে প্রায় পুরো ভবন। কারিকালা অনেক কষ্টে বেঁচে ছিলেন, তবে পা বাঁচাতে পারলেন না। তার এক পা সেই আগুনে একেবারে ঝলসে গেল।

সেই ঝলসানো পা নিয়েই কারাগার থেকে পালালেন কারিকালা। কারিকালা বন্দি থাকা অবস্থাতেই তার কাকা ইরাম মুক্তি পাওয়ার পরের ধাপ চিন্তা করে রেখেছিলেন। সেনাবাহিনীর পুরো অংশ তখনো বিদ্রোহী দলে নাম লেখায়নি। তাদের অনেকের মধ্যে রাজভক্তি একটু একটু বাকি ছিল।

সেই রাজভক্তি সমৃদ্ধ সৈন্যদের রাজভক্তি দেখানোর সুযোগ দেওয়া হলো। কারিকালা মুক্তি পাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই সেনাদল নিয়ে সিংহাসন দখল করে রাখা মন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন। মন্ত্রী কূটে পাকা হলেও সমরজ্ঞানে অতটা পাকা ছিলেন না। তার শোচনীয় পরাজয় ঘটে সেই যুদ্ধে। ততদিনে কারিকালার ঝলসানো পা ওষুধির গুণে সেরে এসেছে। তবে বিশ্রী দাগটা থেকেই গেল। সেই পা নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি মন্ত্রীরাজার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন।

তার ঠিক দুই মাস পরের ঘটনা। এখন পুহার নগরে আছেন কারিকালা। তার কাকা ইরাম এখন তার প্রধান পথপ্রদর্শক। চোলা রাজ্যে এখন আর কোনো সভাসদ নেই। আগের সভাসদদের সবাই এক হলে প্রাণ হারিয়েছেন নয়তো বিদ্রোহী হয়ে নগর ত্যাগ করেছেন।

সভাসদ নিয়োগ দিয়ে রাজকার্য সামলানোর চেয়ে এখন সেনাবল বাড়ানোর দিকেই কারিকালার নজর বেশি। বিদ্রোহী সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড আর নানা শাস্তি দেবার কারণে সেনাদলের শক্তি অনেকটাই কমে গেছে। মন্ত্রীমণ্ডল পরে তৈরি করলেও চলবে।

ঘোলা জল এখনো পরিষ্কার হয়নি। সেই সময়ে চোলা রাজ্যে এসেছেন গিরিধারী। এখানে আসার আগেই সব শুনেছিলেন তিনি। তবে তার মধ্যে অনেককিছুই ছিল ভাসা ভাসা। এখানে এসে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে তার সবকিছু শুনে। যুবরাজ আগে রাজা হয়, তবেই তার হাতে রাজকার্যের রক্ত লাগে। এখানে এই বালকের হাতে এখনই রক্ত লেগে গেছে। ঠিকমতো রাজা অথবা পুরুষ হবার আগেই। এই জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে।

এমন অবস্থায় রাজমহলে উপস্থিত হওয়া যায় না, রাজার অথিতিশালায়ও আতিথ্য গ্রহণ করা সমীচীন নয়। পুহার নগরীর একটু বাইরে এক মনোরম স্থানে দলবল নিয়ে

তাবু ফেলেছেন তিনি। রাজমহলে তার আগমনের খবর গেছে। এখন কেবল প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা।

এক বিশেষ চিন্তা করে চোলা রাজ্যে এসেছেন তিনি। মনে মনে চিন্তাটা নেড়েচেড়ে দেখছেন। কাজে নামার আগে বারবার পরিকল্পনা ঝালাই করে নাও। কাজে নেমে গেলে তারপর আর কোনো চিন্তা নয়, শুধু কাজ করে যাওয়া। এটাই তার সর্বাবস্থার নীতি।

তাবুর দরজায় ছায়া দেখা গেল। নিশ্চয়ই দূত ফিরে এসেছে। দূত বাইরে থেকে ভেতরে আসবার অনুমতি চাইবার আগেই ভেতর থেকে অনুমতি ভেসে এলো,

'ভেতরে এসো।'

দূত ভেতরে ঢুকে একপাশে দাঁড়ালো। তার মুখের দিকে তাকালেন গিরিধারী। সংবাদবাহকের মুখে সংবাদের ছাপ থাকে। সংবাদ একেবারে মোক্ষম আঁচ করা না গেলেও সেখান থেকে সহজেই সংবাদের ধরণ আঁচ করা যায়। দূতের চেহারা বলছে, এখন পর্যন্ত যা হয়েছে ভালোই হয়েছে।

'বলো।'

'মহারাজ কারিকালা অপরাহ্নে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

বাবারে, বাক্যের কি বাহার। রাজা তার নিজের রাজ্যে এক ঈশ্বর বাদে কারো কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি শুধু আদেশ করেন। সেই আদেশের পালন করতে ব্রতী হলেন গিরিধারী। অপরাহ্নের আর বেশি বাকি নেই।

ওদিকে তখন দুটো চিন্তিত মুখ পুহারের রাজমহলে অপেক্ষা করছে। কারিকালার চোখ নির্লিপ্ত। চিন্তার ছাপ মুখে থাকলেও চোখে নেই। ইরাম পায়চারি করছেন, 'তুমি তো বুঝতেই পারছো, আমাদের রাজ্যের সমস্যা এখনো কাটেনি। সাতবাহন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে কেন এসেছেন বলতে পারো? কী মনে হয় তোমার?'

কারিকালা এখনো রাজনীতির একনিষ্ঠ ছাত্র, গুরু হয়ে উঠতে পারেনি, 'মনে হয় নতুন রাজার সাথে শুভেচ্ছা সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তেমন কিছু নয়।'

'না, কারিকালা। নতুন রাজাকে শুভেচ্ছা জানাতে কেউ এভাবে আসে না। তুমি যখন রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান করে সব রাজ্যে নিমন্ত্রণ পাঠাবে তখন সব রাজাই তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠাবেন। এই লোক এখানে অন্য উদ্দেশ্যে এসেছেন।'

'তবে কি সাতবাহন আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়? আমাদের রাজ্যের অবস্থা শোচনীয়। সহজেই তারা যুদ্ধে জিতে যাবে।'

'নাহ, যুদ্ধের অভিপ্রায় হলে প্রথমে সেনা নিয়ে আমাদের সীমায় আসতো। তারপর পাঠাতো দূত। মহামন্ত্রী কখনো যুদ্ধ অভিপ্রায়ে দূত হয়ে আসবেন না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর চিন্তা করে লাভ নেই। ওনাকে আসতে দেই। তারপর তার মুখ থেকেই শোনা যাবে কেন এসেছেন।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দূত এসে গিরিধারীর আগমনের খবর দিলো। এই ঘরেই শুরু হলো বাক্যালাপ।

'মহামন্ত্রী গিরিধারী অভিবাদন গ্রহণ করবেন। সাতবাহন রাজা সাতকর্ণী নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদে কুশল আছেন।'

গিরিধারী আন্তরিক হাসলেন, 'হ্যাঁ। মহারাজ সাতকর্ণী সুস্থ আছেন। চোলা রাজ্যের নতুন মহারাজ কারিকালাও আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন।'

কারিকালা মৃদু মাথা ঝাঁকালেন। ইরাম চলে গেলেন সোজা কাজের কথায়, 'ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেন আমাদের রাজ্যে এসেছেন, তা যদি আমরা জানতে পারি, তবে আমাদের সেবা করতে সুবিধা হয়।'

গিরিধারীর হাসি আরেকটু চওড়া হলো, 'সোজাসাপটা কথা আমার খুবই পছন্দ। আমি আসলে আপনাদের রাজ্যে সাম প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'সাম মানে সন্ধি। আমাদের রাজ্য থেকে আপনি কিছু নেবেন, বিনিময়ে আমাদের রাজ্যকে কিছু দেবেন। কিন্তু মহামন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের এই ভঙ্গুর অবস্থায় আমরা আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি? আর সত্যি বলতে কী, এই মুহূর্তে আপনাদের রাজ্যের কোনো ধরনের সাহায্য আমরা আশা করছি না।'

ইরামের কথায় আপত্তি করলেন না গিরিধারী। তার মুখের হাসিও মলিন হলো না, 'সাদা চোখে যখন পরিস্থিতি দেখছেন, তখন এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে আপনি যদি চিন্তাটা একটু গভীরে নিয়ে যান, তাহলে পরিস্থিতি বদলে যাবে। প্রথমে আমি আমাদের প্রস্তাবের কথাটা বলি। আপনাদের রাজ্য এখন গৃহযুদ্ধের কারণে অনেক টালমাটাল। এখানে বিষে বিষক্ষয় করতে হবে। যুদ্ধই এখন একমাত্র পারে আপনাদের রাজ্যকে শক্তিশালী করতে। যুদ্ধই পারে এখন মহারাজ কারিকালার সিংহাসনের ভিত শক্ত করতে।'

'যুদ্ধ!!' কারিকালা প্রায় আসন থেকে উঠে যাচ্ছিলেন, 'কার সাথে?'

ইরামের চোখেও একই প্রশ্ন।

'দেখুন, এখন আপনাদের রাজ্যের অবস্থা বড়োই খারাপ। সকল প্রভাবশালী লোকজন ষড়যন্ত্রের কারণে বাইরে আছেন। নতুন রাজার প্রতি রাজ্যের মানুষের ভরসা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখন কোনো ধরনের শক্ত পদক্ষেপই পারে সেই ভরসা আবার ফিরিয়ে আনতে। দুটো জিনিসই পারে রাজার অতীত মুছে দিতে। বীরত্ব আর অত্যাচার। আপনারা নিশ্চয়ই এখন অত্যাচারের পথ বেছে নেবেন না।'

ইরাম একটু ভাবলেন, তারপর আগের প্রশ্নই টেনে আনলেন, 'কিন্তু যুদ্ধ করার মতো কোনো প্রস্তুতি এবং সামর্থ্য আমাদের নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা কোনো কারণই নেই। যুদ্ধটা হবে কার সাথে? চেরা, পান্ড্য না-কি আপনাদের রাজ্য? আমাদের সীমানায় এখন এই তিন রাজ্যই আছে।'

'আরে না না। আমাদের দরজায় আপনাদের দিয়ে আক্রমণ করানোর জন্য নিশ্চয়ই আমি দূত হয়ে আসিনি। আপনাদের যুদ্ধ করতে হবে চেরা বা পান্ড্য রাজ্যের সাথে। তবে আমার কাছে থাকা খবর অনুযায়ী দুই রাজ্যই এখন সন্ধি অবস্থায় আছে। আপনাদের দুটো রাজ্যের সাথে একত্রে যুদ্ধ করতে হবে।'

শুকনো হাসি এবার ফুটে উঠলো ইরামের ঠোঁটে, 'এক রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করলেই এখন হেরে ভূত হয়ে যাবো, দুই রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে তো ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো রসিকতার জন্ম হয়ে যাবে।'

'না, হবে না। এখানেই সাম প্রস্তাবে আমাদের অবস্থান। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য এবং অস্ত্র সরবরাহ করে আপনাদের জয় নিশ্চিত করবো। চেরা আর পাণ্ড্য দুই রাজ্যই আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে। অত বড়ো যুদ্ধজয়ী বীর রাজাকে বরণ করে নিতে প্রজাদের মনে তখন আর কোনো দ্বিধা থাকবে না। তাছাড়া আরেকটা উপকারও আপনাদের হবে।'

'আরো উপকার?'

'হ্যাঁ। রাজদ্রোহীর একটাই শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড। নইলে রাজা নিরাপদ হন না। এই শাস্তি দিতেও হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনাদের অপরাধী রাজদ্রোহীরা এখনো বেঁচে আছে। এখন যদি আপনারা যুদ্ধে জড়ান তাহলে তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আপনাদের বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেবেন। যুদ্ধ জয় করে আপনারা তাদের প্রাপ্য শাস্তিও নিশ্চিত করতে পারবেন।'

'কিন্তু, এত সবে আপনাদের রাজ্যের লাভ তো বুঝতে পারলাম না। সামের নীতিতে আপনারা আমাদের থেকে কী নেবেন?'

'সেটা আমরা পরে চেয়ে নেবো। কিন্তু কথা দিচ্ছি, সেই বিনিময়েও আপনাদেরই লাভ হবে। আপাতত আপনাদের সমস্যাই সমাধান করি। আপনারা যখন যুদ্ধ জয় করবেন, সেনা গুছিয়ে নেবেন, তখন আমাদের কথায় আসা যাবে।'

গিরিধারী, ইরাম আর কারিকালা দুজনের চেহারা আড়চোখে দেখে নিলেন। তাদের চেহারায় স্পষ্ট সম্মতির ছাপ। কোনো কিনারা না পাওয়া নাবিক হঠাৎ মাটির দেখা পেলে তার চেহারাও এমনই হয়ে ওঠে।

ইরাম শেষ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু, চেরা আর পান্ড্যরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে কেন? আমরাই বা তাদের কোন হিসেবে আক্রমণ করবো?'

গিরিধারী উঠে দাঁড়ালেন, 'সে চিন্তা আপনাদের করতে হবে না। আপনারা যতটা পারেন সেনা প্রস্তুত করুন। আমাদের গুপ্ত খবর অনুযায়ী, এরই মধ্যে চেরা আর পান্ড্যরা মিলিত হয়ে আপনাদের আক্রমণ করার পায়তারা কষছে। আপনাদের আগ বাড়িয়ে কিছুই করতে হবে না। আপনারা প্রস্তুতি নিন। খুবই গোপনে। আমি আপনার রাজ্যে দুজন দ্রুতগামী দূত রেখে যাচ্ছি। এখন থেকে আমি নিয়মিত আপনার সাথে যোগাযোগ রাখবো।'

হাতজোড় করলেন গিরিধারী। তারপর দুজন প্রায় স্তম্ভিত মানুষকে রেখে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

২৬

ঠিক সন্ধ্যের আগে আগে। সূর্যদেব পৃথিবীর পশ্চিম সীমান্তে শেষবারের মতো নজর বোলাচ্ছেন অর্ধেক পৃথিবীর ওপর। ঠিক তখনই অনেকক্ষণ ধরে তেল চিটচিটে বিছানার ওপর পড়ে থাকা শরীরটার পাশে একটি হাতের দুটো আঙ্গুল একটু নড়ে উঠলো। এই দেহ সারাদিন এইভাবে বেকায়দায় পড়েছিল। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসছে। আলতো করে চোখ মেললো সে। সারা শরীরে কোনো সাড় পাওয়া যাচ্ছে না। কোনদিকে মাথা ঘুরিয়ে ঠিকমতো তাকাতে পারলো না সে। শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল। কোনমতে শরীরটা বেকায়দা অবস্থা থেকে সরিয়ে চিত করলো সে। এবার যেন একটু আরাম হলো। ঝিমঝিম করা অনুভূতি সারা শরীর জুড়ে। আর চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না। একটু পরেই অসিত আবার ঘুমিয়ে পড়লো। অবশ্য ঘুম না বলে জ্ঞান হারানোও বলা চলে। ওষুধের রেশ তখনো কাটেনি।

তার ঘুম পুরোপুরি ভেঙ্গে চেতনা ফিরে এলো পরদিন সকালে। পুরো ত্রিশ মুহূর্ত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে এরই মধ্যে। বিছানায় উঠে বসতেই প্রথম যে অনুভূতি তাকে জাঁকিয়ে বসলো তা হচ্ছে ক্ষিধে। এই অনুভূতির কোনো মানে বুঝলো না সে। একটু আগেই তো অনেক মিষ্টান্ন খেয়েছিল সে।

ক্ষিধের অনুভূতি পাত্তা দিলো না সে। ভাবতে চেষ্টা করছে আসলে কী হয়েছে। ঐ লোকটা সকালে এসেছিল। তাকে নিয়ে গাভী কেনার কথাও হয়েছিল। তারপর সে আর অঙ্গদ মিলে লোকটার আনা মিষ্টান্ন খেলো। তারপরের কথা আর কিছুই মনে নেই। সব ফাঁকা হয়ে গেছে।

রহস্যময় লোকটার খোঁজে আশেপাশে তাকালো সে। না, ঘরের মধ্যে কোথাও লোকটাকে দেখা গেল না। গাভী কেনার জন্য মুদ্রাগুলো বের করে গুনেছিল সে। সেই মুদ্রার থলে বিছানার নিচেই আছে। তার মাথা কেন ঝিমঝিম করছে আর আজব অনুভূতি কেন হচ্ছে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

অসিত ভাবছে সে আজ এই সকালেই ঐ আগন্তুকের সাথে দেখা করেছিল। আশেপাশে কোথাও অঙ্গদকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় বাইরে আছে।

বাইরে বেরিয়ে এলো সে। না, ঐ আগন্তুক অথবা তার ঘোড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অঙ্গদকেও কোথাও দেখা গেল না। অসিত বেশ কয়েকবার গলা চড়িয়ে অঙ্গদকে ডাকলো। কিন্তু সেই ডাকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এবার একটু চিন্তায় পড়লো সে। অঙ্গদ কখনো ঘর থেকে এত দূরে যায় না। আশেপাশের গাছে ফল আর পোকা খেতে যায়, আবার সে ডাকলেই ফিরে আসে। এমন তো কখনো হয় না।

এবার তার মনে একটু একটু সন্দেহের উদ্রেক হলো। অঙ্গদ নেই আবার সেই আগন্তুকও নেই। তার মন কু ডাকতে শুরু করেছে। কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না। না, নিজের চিন্তায় হবে না। এই গ্রামে একজনই আছেন যে তার কথা মন দিয়ে শুনবে।

উমা পিসি। তিনি কোনো উপায়ের কথা অবশ্যই বলতে পারবেন। আরো কয়েকবার অঙ্গদের নাম ধরে ডাকলো সে। কিন্তু ফলাফল আগের মতোই। কোনো সাড়া নেই।

ঘরে ঢুকে মুদ্রার থলিটা জায়গামতো লুকিয়ে রাখলো সে। তারপর দরজা ভেজিয়ে জোর কদমে হাঁটতে শুরু করলো পিসির বাড়ির দিকে। এখনো তার মাথা পরিষ্কার হচ্ছে না। পা রীতিমতো টলছে। দুর্বল পায়ে টলোমলো পা নিয়েই পিসির বাড়ির দিকে যাচ্ছে সে।

উমা পিসির সকালের রান্না ততক্ষণে শেষ। ছেলে আর শ্বশুরকে খাইয়ে নিজের অন্য কাজে হাত দিয়েছেন। এখন উঠানে শুকানোর জন্য শস্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন। পাখিদের চৌর্যবৃত্তিতে বাঁধা দিতে কড়া নজর রাখতে হচ্ছে। তখনই টলতে টলতে অসিত এসে ঢুকলো তার বাড়িতে।

অসিতের চেহারা বেশি ঘুমানোর ফলে বেশ ফুলে আছে। চোখের পাতা রীতিমতো ফুলে বুজে যাবার অবস্থা। ওকে দেখে পিসি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, শস্য পাহারা দেবার কথা ভুলে যান তিনি,

'কিরে, তোর চেহারার এই অবস্থা কেন?'

'বুঝতে পারছি না পিসি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর খুব দুর্বল লাগছে। আজ সকালেই আমার কাছে একজন এসেছিল। তখন অনেক খাবার খেয়েছি। ভরাপেটেই মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই ঘুমের মধ্যে কী হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ উঠে দেখি, লোকটা নেই, কোথায় যেন চলে গেছে। আর বিশ্বাস করবেন না পিসি, এই সকালে এত খাবার খেলাম, কিন্তু এখন আমার এত ক্ষিধে লেগেছে।'

অসিতের অসংলগ্ন কথাবার্তায় কিছুই বুঝতে পারলেন না উমা পিসি। তবে এটুকু তিনি বেশ বুঝতে পারলেন বড়ো কোনো ঝামেলা হয়ে গেছে অসিতের সাথে, 'তুই কি যে বলছিস কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না পিসি। কাল সন্ধ্যায় তোমার এখান থেকে খেয়ে যাবার পর রাতে আর খাইনি। আজ সকালবেলা বেশ ক্ষিধে লেগেছিল। এত কিছু খেলাম তখন। তবু ক্ষিধেতে পেট চিমসে যাচ্ছে। আমার কাছে সকালে যে লোকটা এসেছিল সেও উধাও হয়ে গেছে। অঙ্গদকেও আমি খুঁজে পাচ্ছি না পিসি।'

পিসির মুখ চিন্তিত হয়ে উঠলো আরো, 'তোর কথার মাথামুণ্ডু পাচ্ছি না। তোর নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে। তুই তো কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি আসিসনি। এসেছিলি পরশু সন্ধ্যায়।'

অসিতের মাথা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো। পিসি এসব কী বলছে। সে নাকি পরশু সন্ধ্যায় এই বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে আছে, সে এসেছিল কাল সন্ধ্যায়। তার মাথাটা আবার বেশ জোরে ঘুরে উঠলো। টলে পড়ে যাবার উপক্রম হতেই পিসি তাকে ধরে ফেললেন। জ্ঞান হারাবার আগে অসিত কেবল মৃদুস্বরে বললো, 'অঙ্গদকেও খুঁজে পাচ্ছি না পিসি।'

পিসি বাড়ন্ত দেহের অসিতের দেহের ভার বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না। ওকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। এক ছুটে চলে গেলেন ঘরের ভেতর। ভেতরে পবন

পাঠশালার পুঁথি নিয়ে নয়ছয় করছে। মাকে এমনভাবে ছুটে আসতে দেখে সে সব কাজ ফেলে সটান দাঁড়িয়ে গেল।

উমা পিসির গলায় আতঙ্ক, 'পবন বাবা, তুই তো সুকুমার দাদুর বাড়ি চিনিস।'

পবন মাথা নাড়লো। চেনে।

'তাহলে এক দৌড়ে সুকুমার দাদুর বাড়ি চলে যা। সুকুমার দাদুকে একেবারে সাথে করে নিয়ে আসবি। বলবি আমাদের বাড়ির অবস্থা অনেক খারাপ।'

পবন পরিস্থিতি না জানলেও মায়ের গলার আকুতি স্পষ্ট টের পেলো। এক ছুটে বেরিয়ে যায় সে।

পিসি জলের পাত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। আদিনাথ বাড়িতে নেই। সকাল সকাল জমিজমার তদবিরে বেরিয়েছেন। তিনি থাকলে কিছু একটা করতেন। তাকে এখন একটা খবর পাঠানো উচিত। কিন্তু বাড়িতে আর লোক নেই। আপাতত সেসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে অসিতের সেবায় মন দিলেন পিসি।

চোখেমুখে একটু জল ছিটিয়ে দিতে অসিত একটু নড়ে উঠলো কিন্তু চোখ মেললো না। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। মনে হচ্ছে বেশ আরাম করে অসারে ঘুমাচ্ছে। তবু পিসি থামলেন না। ঘর থেকে তেল এনে অসিতের হাতেপায়ে ভালো করে মালিশ করে দিতে লাগলেন তিনি। অসিতের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক।

বৃদ্ধ সুকুমার বৈদ্য পবনের মুখে খবর শুনেই ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। বৃদ্ধ শরীরে গতিতে চলা সম্ভব নয়। তবে গতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে তিনি পবনের সাথে এসে উপস্থিত হলেন পিসির বাড়িতে। সুকুমার বৈদ্যকে দেখেই মাথায় কাপড় দিলেন পিসি। ততক্ষণে তার চোখে জল গড়াচ্ছে, 'দেখুন না কাকা, ছেলেটা সকালে বাড়িতে এলো। এসেই নানা কথা বললো। কেমন যেন পাগল পাগল কথা। বলছিল সকালে খেয়েছে, তারপরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠে আর কিছুই মনে নেই। একসময় কথা বলতে বলতে আমার সামনেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কাকা। দেখুন না, কী হয়েছে।'

রোগীর আশেপাশের লোকজনের কৌতূহল, আবেগ এবং আর্তনাদ সামলানোর চেয়ে যে এমন সময়ে রোগী সামলানো বেশি জরুরি তা সুকুমার বৈদ্য জানেন। অসিত তখনো মাটিতেই শুয়ে ছিল। সুকুমার বৈদ্য নাড়িতে হাত রেখে চোখ বন্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ নাড়ি পরীক্ষা করে অসিতের চোখের পাতা টেনে ভেতরটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'এখন আগে ওর জ্ঞান ফেরাতে হবে কোনোভাবে। স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে।'

তীব্র ঝাঁঝালো কোনো গন্ধ শোকানোই এখন আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত। ঝাঁঝের চোটে স্নায়ু আবার সবল হবে। জ্ঞানও ফিরে আসবে। ফিরে আসলেই ওকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

'ঘরে রসুন আছে?'

সুকুমার বৈদ্যের প্রশ্নের উত্তরে পিসি সাড়া দিলেন, 'হ্যাঁ আছে। বাবার নাড়ি দ্রুত হলে সকালে দুই টুকরা খান মাঝেমাঝে।'

রসুন আনা হলে দ্রুতহাতে ছেঁচে ফেললেন সুকুমার বৈদ্য। দ্রুতহাতে সেই মণ্ড অসিতের নাকের সামনে ধরলেন। অসিত এবার বেশ ভালোভাবে নড়ে উঠলো। সাথে সাথে তার শক্ত হয়ে চেপে বসা চোয়াল একটু শিথিল হয়েছে। দ্রুতহাতে অসিতের মুখ হাঁ করিয়ে সেখানেও বেশ খানিকটা রসুনের মণ্ড ফেলে দিলেন তিনি। রসুনের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ আর স্বাদে জ্ঞান ফিরে এলো অসিতের। প্রবল বেগে কাশতে কাশতে উঠে বসলো সে।

কাজ শেষ। সুকুমার বৈদ্য এবার পথ্য বাতলালেন, 'এই দুই টুকরো রসুন কোনো কথা না বলে চিবিয়ে গিলে ফ্যাল। তাহলেই স্নায়ু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বৌমা, একটু জল আনো তো।'

অসিত যন্ত্রের মতো চিবিয়ে ঝাঁঝালো রসুন খেয়ে ফেললো। তার স্নায়ু আবার ফিরে আসছে স্বাভাবিক অবস্থায়।

এবার সুকুমার বৈদ্য রোগীর এবং পিসির কৌতূহল নিবারণে মন দিলেন, 'তুই কোনোভাবে শক্তিশালী কোনো ঘুমের ওষুধ অথবা চেতনানাশক খেয়ে ফেলেছিলি। তারপর অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস। তোর যা অবস্থা তা দেখে মনে হচ্ছে চব্বিশ মুহূর্তের বেশি ঘুমিয়েছিস তুই। এখন তোর জ্ঞান ঠিকমতো ফিরে এসেছে। আয়ুর্বেদে বেশ কিছু লতার রস আছে, সেগুলো খেলে মানুষের অবস্থা এমন হতে পারে।'

অসিত অবাক হলো, 'আরে না দাদু, পুরো একদিন আর একরাত আমি কী করে ঘুমাবো? আমি তো কাল সন্ধ্যায় পিসির বাড়ি এসেছিলাম।'

উমা পিসি আবারো শুধরে দিলেন, 'না রে অসিত। তুই কাল না পরশু সন্ধ্যায় এসেছিলি আমাদের বাড়িতে।'

পবন এদিকে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে সুকুমার বৈদ্যকে পৌঁছে দিয়েই আর সময় নষ্ট করেনি। ছুটেছে আদিনাথকে খবর দিতে। বড়ো কোনো ঝামেলা হয়েছে। অসিত দাদা মাটিতে শুয়ে আছে, মা নিশ্চয়ই একা সামলাতে পারবে না। দাদুকে লাগবে। নাতির মুখে সব শুনে আদিনাথ আর দেরি করেননি। দ্রুতপায়ে বাড়ি চলে এসেছেন। তিনি একা আসেননি, রাস্তায় গ্রামের অন্যান্য লোকজনকে পেয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

আদিনাথ এসেই ঘটনার ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। প্রথমেই সব শুনে নিলেন তিনি। তারপর অনুসন্ধান শুরু করলেন, 'তোর সাথে ঐ আগন্তুকের দেখা হলো কী করে?'

অসিত জবাব দেয়, 'খেলা দেখাতে গিয়ে দেখা হয়েছিল। আমাকে তার ঘোড়ায় করে অনেকবার গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল।'

'নাম কী?'

'নাম জানি না। কখনো জিজ্ঞেস করিনি। তবে আমার ঘরে অনেকবার এসেছিল। অঙ্গদকে কিনতে চেয়েছিল একবার। ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা দিবে বলেছিল। আমি বিক্রি করতে রাজি হইনি। লোকটা পরে অবশ্য আর জোরাজুরি করেনি। অঙ্গদকে কেনার কথা পরে আর কখনো বলেনি।'

আদিনাথ জীবন দেখেছেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ঐ আগন্তুকের লোভ ছিল অঙ্গদের ওপর। তিনি অসিতকে বোঝালেন, 'শোন, ঐ আগন্তুকের অঙ্গদের ওপর লোভ

ছিল। সে প্রথমে তোর সাথে সম্পর্ক ভালো করেছে। বিশ্বাস অর্জন করেছে। তারপর সুযোগ বুঝে খাবারের সাথে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে তোকে আর অঙ্গদকে। তুই আর অঙ্গদ দুজনেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি। তারপরের কাজ সোজা। তোকে ঘরে রেখে অজ্ঞান অঙ্গদকে নিয়ে সে সরে পড়েছে। এজন্যই এখন তুই অঙ্গদকে খুঁজে পাচ্ছিস না। অঙ্গদ আর এখন এখানে নেই।'

অসিত মুখ হাঁ করে মাটিতে বসে পড়লো। তার মনে হচ্ছে সে হয়তো আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আদিনাথ অসিতের সন্দেহ পুরোপুরি দূর করলেন, 'তুই আজ সকালে আগন্তুককে দেখিসনি। গতকাল সকালে দেখেছিস। আগন্তুক তোকে যে মিষ্টান্ন খাইয়েছিল তাতে মেশানো ছিল চেতনানাশক ওষুধ। সেটা খেয়ে তুই পুরো একদিন আর একরাত অচেতন হয়েছিলি। অঙ্গদকে নিয়ে যেতে ঐ লোকের কোনো সমস্যাই হয়নি।'

অসিতের চোখ থেকে তার অজান্তেই দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সে এখন সবই বুঝতে পারছে। আগন্তুক তাকে কখনোই সাহায্য করেনি। সে প্রথম থেকেই ছিল নিজের স্বার্থের চিন্তায়। প্রথম থেকেই অঙ্গদকে হাতাবার দিকেই নজর ছিল তার।

আদিনাথ আরো তথ্যের খোঁজে আছেন, 'তোর কাছে ঐ লোক নিজের নাম বলেনি। আচ্ছা দেখতে কেমন?'

'লম্বা। স্বাস্থ্য ভালোই। গালে একটা স্পষ্ট কাটা দাগ আছে। চেহারা আমাদের এদিকের লোকের মতোই।' অসিত একটু উৎসাহ ফিরে পায়।

'আচ্ছা, তুই বললি তার কাছে ঘোড়া আছে। ঘোড়া তো আমাদের এদিকের খুব বেশি মানুষের কাছে নেই। যাও আছে তাও সৈন্যদের কাছে। ঐ ঘোড়ার রং কী ছিল?'

'সাদা।'

আদিনাথের সাথে এক ক্ষেত্রমজুর এসেছিল। সে এবার বলে উঠলো, 'আরে সাদা ঘোড়ায় চড়া লোকটা। ও তো রাহু, পাশের গ্রামে বাড়ি। কাল সকালেও ওকে সাদা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের গ্রাম থেকে যেতে দেখেছি।'

সবার দৃষ্টি ফিরলো মজুরের দিকে। আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক বলছিস তুই? সাদা ঘোড়ার মালিকের নাম রাহু?'

'হ্যাঁ, কর্তা। পাশের গ্রামে থাকে। ছোটোবেলাতেই বাবা-মা মারা গেছে। তখন থেকেই সে বাড়িতে থাকে না। ভবঘুরে স্বভাব। বাড়ি আসে বছরে দুই-এক বার। আমি শুনেছিলাম সে পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে কাজ করে।'

'তুই কালকে ওকেই সাদা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের গ্রাম থেকে যেতে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ কর্তা। সকালে। আমাদের এদিকে তো ঘোড়া খুব একটা দেখা যায় না। সৈন্যদের ঘোড়ার দিকে নজর দিতে খুব একটা সাহস হয় না। তাই রাহুর ঘোড়া দেখলেই আমি মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। কাল সকালে ঘোড়ায় পিঠে বাঁধা কাপড়ে মোড়ানো কী একটা যেন ছিল। সবই আমি ভালো করে খেয়াল করেছি।'

আদিনাথ সব বুঝে মাথা নাড়লেন, 'ঘোড়ার গায়ে বাঁধা ওটা কী একটা যেন ছিল না রে। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে ওটা ছিল হয় একটা বাক্স অথবা খাঁচা।

অচেতন অঙ্গদকে ওটায় করেই নিয়ে গেছে সে। এবং তাকে এখন খুঁজতে গেলে পাশের গ্রামে পাওয়া যাবে না। সে অঙ্গদকে নিয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।'

অসিতের কাঁধে এবার সান্ত্বনার হাত রাখলেন আদিনাথ, 'তুই আর কখনো অঙ্গদকে দেখতে পাবি না। পশ্চিমের সমুদ্র অনেক দূর। সেখানে এই গ্রামের কোনো লোক কখনো যায়নি। তুই মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা গ্রামের সবাই মিলে সাহায্য করে তোকে একটা বানর কিনে দেবো। অবশ্য সে বানর হবে সাধারণ, অসাধারণ রঙ্গিন বানর না। তাতে ভালোই হবে। গরিবের ঘরে অসাধারণ জিনিস থাকতে নেই রে। শকুনের নজর পড়ে।'

উমা পিসিরও অঙ্গদের ওপর মায়া আছে। সব শুনে তার চোখ দিয়েও স্বতঃস্ফূর্ত অশ্রু বইতে লাগলো।

অসিত ওদিকে করছে অন্য কথা। রাহু অঙ্গদকে নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সে তার মুদ্রাগুলো নিয়ে যায়নি। তার কাছে এখন দুটো গাভী কেনার মুদ্রা আছে। সে ইচ্ছে করলেই এখন দুটো গাভী কিনতে পারে। রাঁধাকে বিয়ে করতে পারে। ওনারা সবাই মিলে তাকে নতুন বানর কিনে দেবে। সেটাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আবার নতুন করে খেলা দেখানো শুরু করা যাবে।

কিন্তু তবু তো অঙ্গদকে ভোলা যাচ্ছে না। তার মাথায় কেবল বাজছে তার বাবার মৃত্যুশয্যায় বলা কথাগুলো।

মুদ্রা দিয়ে আরেকটা বানর হয়তো কেনা যাবে, কিন্তু যে ভাইকে বাবা তার কাছে রেখে গিয়েছিলেন তাকে তো আর বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে না।

অসিতের কান্নামাখা মুখ ধীরে ধীরে কঠিন হতে শুরু করলো।

২৭

নৃত্য শব্দটা শুনলেই কেমন যেন মেয়েলি একটা অনুভূতি পুরুষ নারী উভয়ের মাঝেই ছড়িয়ে পড়ে। নৃত্য যেন খালি মেয়েদেরই ব্যাপার। নৃত্যকলার বর্ণনা যখন মন মাথাকে দেয় তখন মাথা সুন্দরী, সুচারু স্বাস্থ্যের অধিকারিণী, সুটৌল শরীরের নানা বাঁকের প্রদর্শনী, আর নানা অঙ্গভঙ্গি কল্পনা করে নেয়। লোকে ভুলে যায়, নটী নট ছাড়া অসম্পূর্ণ। স্বর্গসভায় অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরাদের পাশাপাশি গন্ধর্ব আর কিন্নররাও শামিল হয়। আসলে সৃষ্টির দুই শক্তি আছে। পুরুষ আর প্রকৃতি। সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের মাঝে এই দুই গুণই ভারসাম্য রেখে বিরাজ করে। এখানে লিঙ্গের কোনো প্রাধান্য নেই। সর্বকলার অধীশ্বর মহেশ্বরের আরেক নাম কিন্তু নটরাজ। তিনিই নৃত্যের প্রতিষ্ঠাতা। আবার তিনিই পিনাক ধনুকের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা দিয়েছেন। তার এক হাতে যেমন রুদ্রবীণা থাকে, আরেক হাতে থাকে ত্রিশূল। মানুষ যদিও নৃত্যের সাথে কামকে গুলিয়ে ফেলে। এই গুলিয়ে ফেলা সৃষ্টির আদি থেকেই হয়ে আসছে। রতি বড়োই শক্তিশালী।

তবে রতির বাকি অর্ধ মদনও কম শক্তিশালী নয়। তাই কে বলবে, নর্তকীর দিকে যেমন লোভী দর্শকের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে, তেমনি অন্যদিকে নর্তকের দিকেও হয়তো ডাগর আঁখি জোড়ার মুগ্ধ দৃষ্টি বর্ষিত হয়।

রুদ্রদেব অবশ্য এখন এতো কিছু ভাবছে না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সে কাজে লেগে পড়েছে। শিবের পূজা শেষ করে শরীর ঠিক করে নিয়েছে সে। তারপর শুরু করেছে নৃত্যাভ্যাস। প্রথম দিকে অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিল। তবে যতই চেষ্টা করছে ততই মনের ভেতর থেকে কৌশলগুলো উঁকি দিচ্ছে।

নৃত্যের অভ্যাসের কিছু সুবিধাজনক নিয়ম আছে। একজনকে মুখে এবং যন্ত্রে তাল পরিচালনা করতে হয়। যে অনুশীলন করবে তাকে সেই তালে শরীর পরিচালনা করতে হয়। এখানে তাল দেবার কেউ নেই। রুদ্রদেব নিজে নিজেই বোল উচ্চারণ করছে। আর সেইসাথে পায়ের জোরালো আঘাত চলছে ভূমির ওপর। যতক্ষণ পুরো শরীর তার ঘামে ভিজে না গেল ততক্ষণ সে থামলো না। একসময় পা ভারী হয়ে এলো, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেল, তখন আর না থেমে উপায় থাকলো না।

এবার স্নানের সময় হয়েছে। শরীর পরিষ্কার রাখা সুস্থতার পূর্বশর্ত। সুস্থ থাকলে শক্তির বিকাশ বেশ ভালোভাবে হয়।

আয়ুর্বেদে বেশ উচ্চ জ্ঞান আছে তার। সেই বিদ্যা ব্যবহার করে কিছু বিশেষ লতা বেঁটে একটা থকথকে তরল বানিয়ে নিয়েছে সে। এই তরলের গুণ অনেক। শরীর পরিষ্কার করে সেই সাথে আবার চামড়াও সতেজ করে। শরীরে একটা ফুরফুরে অনুভূতি হয়। কাছেই একটা ছোটো সরোবর আছে। আকারে ছোটো হলেও জল বেশ নির্মল। সেখান থেকেই ভালো করে স্নান সেরে নিলো সে।

খাবারের আপাতত কোনো অভাব নেই। তবে পরিশ্রম বেশি হলে শরীরের শুধু শস্য খাদ্যে চলে না। যোদ্ধা যখন কঠোর অনুশীলন করে, যুদ্ধ করে অথবা সন্নিকটের

যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় তখন বিশেষ কিছু খাদ্য খেতে হয় তাকে। আয়ুর্বেদিক কিছু রসও আছে সেই তালিকায়।

সবকিছু জোগাড় আগেই করা ছিল। খেতে বসলো সে। খাওয়ার মাঝপথে যখন পৌঁছল ঠিক তখন জঙ্গলের ভেতর থেকে পাখির ডাক শুনতে পেলো সে। ডাকটা তার চেনা। এই পাখি সে চেনে। তবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে পাখির ডাকে কোনো ছন্দ ছিল না। পাখি নিজের মনে ডাকেনি। কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটেছে জঙ্গলে।

জঙ্গলে দূর থেকে পরিস্থিতি বোঝার জন্য পাখির ডাকের বিকল্প নেই। সেই ডাক অনুসরণ করা আর সেই ডাকের সূক্ষ্ম তারতম্য বোঝার মতো কান আর দক্ষতা থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবে। যে ছন্দ ভালো করে বোঝে সেই ছন্দের সূক্ষ্মতম পতন বুঝতে পারে।

রুদ্রদেব খাবার রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। পাখির আরো কিছু অসংলগ্ন ডাক শুনতে পেয়েছে সে। তার মানে অবশ্যই জঙ্গলে কোনো বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। কোনো প্রাণীই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে না। যে-কোনো জায়গার ভারসাম্য নষ্ট করার প্রবণতা মানুষের মধ্যেই বেশি।

অর্পিত দায়িত্ব পালন আর অর্পিত বস্তুর রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম। যদিও বাবার সূত্রে সে একজন ব্রাহ্মণ, তবে অস্ত্রশিক্ষা করে সে অর্জন করেছিল ক্ষত্রিয় গুণ। তাই সে ঐ নিয়মই মেনে চলে। ধর্মের গুরুত্ব সবার আগে। পাত্রে পড়ে থাকা অবশিষ্ট খাবারগুলো ঢেকে রাখলো সে। তারপর বর্শা হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো।

পাখির ডাকটা জঙ্গলের বেশ ভেতর থেকেই এসেছিল। সেদিকেই ঘোড়া ছোটালো সে। এখনো কিছু ডাক শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জঙ্গলে কেউ এসেছে।

গাছের আড়ালের জন্য তিনজনের দলটাকে আগে থেকে দেখতে পাওয়া গেল না। রুদ্রদেব যখন তাদেরকে দেখতে পেলো তখন তাদের মধ্যকার দূরত্ব মাত্র বিশ হাত।

তিনজনের পরনেই মোটামুটি যুদ্ধসাজ। এক ঘোড়ায় টানা একটা ছোটো রথ আছে তাদের সাথে। সেটার গাঁয়ের খোপে নানা আকারের বর্শা আর তলোয়ার রাখা।

তিনজনের সামনে রুদ্রদেব মোটামুটি ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছে। তারা আকস্মিক আগমনে হতভম্ব হয়ে গেছে। এই জঙ্গলে এখন কাউকে দেখার আশা করেনি তারা।

তবে হতভম্ব ভাব কাটতে বেশি সময় লাগলো না। সর্দার মতো লোকটা একটু সামনে এগিয়ে এলো,

'কে রে তুই? এখানে কী করিস?'

তিনজনের কাছেই অস্ত্র বাদে কাঠ কাটার সরঞ্জাম আছে। শক্তপোক্ত কুড়াল আর কাটারি। সাথে দড়িও আছে।

ধীরে সুস্থে ঘোড়া থেকে নামলো রুদ্রদেব। অভদ্র প্রশ্নের উত্তরটা দিলো বেশ শান্ত স্বরে, 'আমি এখানে কী করছি সেটা এখন আলোচনার বিষয় নয়। আমি এই জঙ্গলের পাহারাদার। প্রশ্ন হচ্ছে এই জঙ্গলে তোমরা কেন অনধিকার প্রবেশ করেছো কেন? তোমাদের হাতের যন্ত্রগুলোই অবশ্য বলে দিচ্ছে তোমাদের এখানে আসার কারণ। সাথে তোমাদের পরিচয়ও দিয়ে দিচ্ছে।'

সর্দার চোখ সরু করে তার দিকে তাকালো, 'বাহ, তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। তুই আমাদের আসার উদ্দেশ্য জেনে গেছিস।'

'হ্যাঁ, জেনে গেছি। এবং সেই সাথে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে এই মুহূর্তে এই জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। সতর্ক করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমি সেই ধর্মই পালন করলাম। ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় ধর্ম জানো তো। সতর্কবার্তায় কাজ না হলে পরে আক্রমণ করা হবে। আশা করি সেই ধর্ম পালন করার মতো পরিস্থিতিতে তোমরা আমাকে ফেলবে না।'

সর্দার তার কথায় বিন্দুমাত্র কান দিলো না। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই স্যাঙাতের দিকে তাকালো, 'কিরে, তোরা কী করিস। কোনো কিছুরই তো কোনো খবর রাখিস না। এই জঙ্গলের নতুন পাহারাদার এলো, আর তোরা সেই কথা জানতেও পারলি না। এখন কাজে নেমে এসব ঝামেলা ভালো লাগে? আগে জানলে পাহারাদারের একটা ব্যবস্থা করে তারপর কাজে নামতাম। শুধু শুধু উটকো ঝামেলা।'

পেছনের একজন বলে ওঠে, 'সর্দার, পাহারাদারের ব্যবস্থা এখন করলেও তো হয়।'

রুদ্রদেব যা বোঝার বুঝে নিলো। হাতের বর্শাটা বাগিয়ে ধরে একটু এগোলো সে।

যতক্ষণ যুদ্ধের ক্ষণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ প্রতিপক্ষকে নিয়ে তামাশা করা যায় অথবা শ্রদ্ধা করা যায়। কিন্তু একবার যখন অন্তিম সময় সামনে আসে তখন সব উপহাস, তামাশা আর শ্রদ্ধা কর্পূরের মতো উবে যায়। তখন শুধু চোখে চোখ রাখা, আর রোদে অস্ত্র ফলার ঝলকানি।

রথের পাশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিলো তিনজন। একজন তলোয়ার তুলে নিয়েছে, বাকি দুজন বর্শা।

তিনজনের হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে তারা যুদ্ধে অভ্যস্ত। অস্ত্রও তাদের হাতে অনায়াসেই মানিয়ে গেছে। রুদ্রদেব একসময় অনেক বড়ো যোদ্ধা ছিল। তবে সেদিন আর এদিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এই তিনজনের বিরুদ্ধে তাকে যে একটা অসম লড়াই লড়তে হবে তা এখন সে বেশ বুঝতে পারছে।

ভয় পাচ্ছে রুদ্রদেব। তবে তার চেহারায় সেই ভয়ের ছাপ ফুটে উঠতে দিচ্ছে না। পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার এখন কোনো উপায় নেই।

প্রথম আক্রমণ করলো সর্দার। হাতের বর্শা বাগিয়ে খোঁচা দিলো রুদ্রদেবকে। সে খোঁচা রুদ্রদেবের গায়ে লাগলো না। নিজের হাতের বর্শার আঘাতে সে খোঁচা এড়িয়ে গেল সে। তবে আঘাতের চোটে পায়ের ভারসাম্য রাখতে পারলো না। পুরো শরীর টলে উঠলো। চিত হয়ে পড়া থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচালো সে।

প্রতিপক্ষের তিনজনেই হেসে উঠলো। সর্দার বর্শার ব্যবহারে খুব পাকা। সামনে থাকা এই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পাহারাদার কোনো সুযোগই পাবে না।

এবার আঘাত করলো রুদ্রদেব। তাচ্ছিল্যের সাথে সে আঘাত এড়িয়ে গেল সর্দার। সেই সাথে হাসতে হাসতে বর্শা দিয়ে খোঁচা দিলো রুদ্রদেবের হাঁটুর একটু ওপরে। সাথে সাথে তাজা রক্তে ভিজে গেল তার জামা। আঘাতের চোটে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না সে। আহত হাঁটু নিয়ে বসে পড়লো।

সর্দার এতক্ষণে প্রতিপক্ষের ক্ষমতার পুরো পরিচয় পেয়ে গেছে। তার চেহারা আর ঠোঁটে পুরোপুরি তাচ্ছিল্যের ভাব, 'কি ক্ষত্রিয় পাহারাদার। পাহারা দেবার শখ মিটে গেছে? ওঠ। এতো তাড়াতাড়ি ক্ষত্রিয় রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেলে চলবে কী করে?'

রুদ্রদেব কাঁপা পা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিছু করার নেই। পালানো যাবে না। তাকে লড়ে যেতে হবে। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

কাঁপা পা নিয়ে করা আরেকটা আঘাত আগের থেকেও সহজে ফিরিয়ে দিলো সর্দার। আবার রুদ্রদেবের শরীর ভূমির স্পর্শ পেলো। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগলো। বারবার আঘাত করা আর প্রায় প্রতি আঘাতেই ভূমিতে লুটিয়ে পড়া। প্রতিবারেই রুদ্রদেবের আঘাতের জোর আগের বারের চেয়ে কমে আসছে। সকালে অনুশীলনে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়েছে। এখন শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আর কৌশলের দীনতার কথা তো না বললেও চলে।

এই বিপদের মাঝেও তিন হাজার বছর আগের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল তার। সেদিনও এক বালক যোদ্ধা অসম যুদ্ধ করতে গিয়ে বারবার ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছিল। তবে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বালক হাল ছাড়েনি। বারবার উঠে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করেছে। তাকেও এখন উঠে দাঁড়াতে হবে।

পরেরবার আঘাত করতেই প্রত্যাঘাতে রুদ্রদেবের বর্শা দশ হাত দূরে ছিটকে গেল। নিরস্ত্র অবস্থায় আর উঠে দাঁড়ালো না রুদ্রদেব। আর কোনো আশা নেই। খালি হাতে কিছুই করা যাবে না। যে যোদ্ধা নিজের অস্ত্রই রক্ষা করতে পারে না, সে কীভাবে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে।

সর্দারের দুই চেলার একজনের ধৈর্যচ্যুতি হলো তখন, 'আর দেরি করবেন না। কাঠ কেটে আজকে আবার জায়গামতো যেতে হবে। সময়মতো কাঠ নিয়ে যেতে না পারলে আবার নানান বাহানা শুনতে হবে। এই ঝামেলা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

'আচ্ছা, বর্শাটা ধর। তলোয়ারটা দে। কাঠের সাথে কাপড়ে মুড়িয়ে এর লাশটাও নিয়ে যাবো।'

বর্শা বদলে তলোয়ার হাতে নিলো সর্দার। দেড় হাতের ধারালো ফলা রক্ততৃষ্ণায় চকচক করে উঠলো।

মাথা নিচু করে বসে আছে রুদ্রদেব। আরেকটু পরেই তার ঘাড় স্পর্শ করবে ধারালো ধাতু। হঠাৎ যেন অনেকদিন পরে তার মনে পড়লো অস্ত্রগুরুর সেই উপদেশ।

'বলো তো, ক্ষত্রিয়ের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র কী?'

'তলোয়ার?'

'না।'

'নিশ্চয়ই ধনুক।'

'না।'

'গদা।'

'না।'

'শক্তি।'

'না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই কোনো দিব্যাস্ত্র।'

'তাও না।'

'তাহলে? আর কোনো অস্ত্রের কথা তো মনে পড়ছে না।'

'ক্ষত্রিয়ের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র তার শরীর। যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ ক্ষত্রিয়ের আশা আছে।'

চোখ বন্ধ করলো রুদ্রদেব। প্রচণ্ড বিপদের সামনে পড়লে মানুষ অসম্ভব কাজ করে। খালি হাতের রণকৌশল সে চিন্তা করতে লাগলো প্রাণপণে।

সর্দারের তলোয়ার এগিয়ে আসছে। শেষবার আঘাত করবে। ফলা উর্ধ্বমুখী হলো, তারপর বাতাস কেটে নেমে এলো নিচে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! রুদ্রদেবের মাথা যেখানে থাকার কথা ছিল এখন আর সেখানে নেই। এক গড়ান দিয়েই সরে গেছে সে। তারপর লাফিয়ে উঠলো সন্তর্পণে। সেই সাথে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে আঘাত করলো সর্দারের কণ্ঠার ঠিক দুই আঙুল নিচে। বিদ্যুৎ গতির সে আঘাত সামলানোর কোনো সুযোগই পেলো না সর্দার।

মানুষের শরীরের সাতটি প্রধান মর্মস্থানের মধ্যে কণ্ঠার দুই আঙুল নিচের জায়গাটাও আছে। এই সাতটি মর্মস্থানের আঘাত খুবই বিপজ্জনক। এখানে আঘাত করলে আঘাতের ওজন অনুযায়ী কাজ হবে। এই কলার নাম মর্মকলা। মর্মে একটা ছোটো টোকা মানুষকে অচেতন করে দিতে পারে, মেরেও ফেলতে পারে।

তবে সর্দারকে সে যে আঘাত করেছে তাতে সে মরেনি, কেবল ঝড়ে ঝরে পড়া গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। রকমসকম দেখে সর্দারের দুই সঙ্গী ঘাবড়ে গেছে। খানিক আগের মৃতপ্রায় পরাজিত যোদ্ধা হঠাৎ দুপায়ে খাড়া হয়ে আছে। এখন আর তার হাঁটু এবং দেহ কাঁপছে না। তার চেয়েও বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনো এক মায়াবলে সেই যোদ্ধা সর্দারকে কাত করে ফেলেছে।

কর্তব্য স্থির করে দুজনে মিলে আক্রমণ করলো রুদ্রদেবকে। তবে শিবের সৃষ্টি করা জ্ঞান কালারি, পরশুরাম থেকে সরাসরি এই জ্ঞান পেয়েছিলেন তার গুরু, আর সেই গুরু থেকে এই জ্ঞান শিখেছে সে। সেই জ্ঞান এখন পুরোপুরি ফিরে এসেছে তার মধ্যে। দুজনের বর্শাই সে বেশ আরামে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর একজনের ঘাড়ের একটু নিচে তড়িৎ গতিতে আঘাত করলো। সেই আঘাত অতটা জোরালো না, তবে যথেষ্ট। একটু আগে সর্দারের যে পরিণতি হয়েছিল, এখন এক স্যাঙ্গাতের একই হাল হলো।

আরেকজনকে মর্মকলার আঘাত করলো না সে। কালারির কৌশলে মল্লযুদ্ধের মতো তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। সেই চেলার এখন আর নড়াচড়ার কোনো উপায় নেই।

'তোমাকে ওদের মতো অচেতন করিনি কেন জানো? তোমাকে অচেতন করে দিলে তোমাদের তিনজনকে এই জঙ্গল থেকে বের করবে কে? এখন ওদের দুজনের দেহ তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে। আরেকটা কথা, আর কখনো যদি তোমাদের এই জঙ্গলে দেখি, তবে সেদিনও তোমাদের দেহ এভাবেই পড়ে থাকবে। শুধু সেই দেহের মধ্যে প্রাণ থাকবে না।'

চেলাকে ছেড়ে দিতে সে মুখ বড়ো হাঁ করে দম নিতে লাগলো। দুজনের দেহ, অস্ত্রশস্ত্র আর কাঠ কাটার সামগ্রী রথে তুলে দিলো রুদ্রদেব। সর্দারের চেতন চেলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বসেছে রথের চালকের আসনে।

রুদ্রদেব আদেশ দিলো, 'যাও।'

রথ রওনা হয়ে গেল। নিজের ঘোড়ায় প্রসন্নচিত্তে চড়লো রুদ্রদেব। মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। নিজের ওপর অর্পিত সম্পত্তি আর দায়িত্ব রক্ষা করা গেছে। তবে এগুলো আনন্দদায়ক হলেও চিত্ত প্রসন্ন হবার কারণ আলাদা। সম্মুখ যুদ্ধকলার সবচেয়ে বড়ো বিদ্যা কালারি আবার তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে চলে এসেছে।

২৮

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই রাজ্য। দক্ষিণের প্রধান তিনটা রাজ্যের একটা হিসেবে মানা হয় এই রাজ্যকে। তবে সবচেয়ে কোণায় অবস্থিত এই রাজ্য বর্তমানে লালিত হচ্ছে একটু অবহেলায়। তেমন গুরুত্ব পায় না এখন আর ভারতের রাজনীতিতে। পূর্বপুরুষরা এখানে ঋণ আর দায়িত্ব উত্তরাধিকারে দিয়ে গেলেও সাহস, বীরত্ব আর দূরদর্শিতা ঠিকমতো দিয়ে যেতে পারেননি। তাই রাজ্যের সীমানা এখন কোনোমতে টিকে থাকলেও পাণ্ড্য রাজ্যের ভেতরটা এখন কেমন জানি ফাঁপা। প্রজারা অত শত না বুঝলেও দীনতা একটু হলেও টের পায়।

অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাণ্ড্য রাজ্যের অবস্থা চিরকাল এমন ছিল না। পান্ড্যদের বীরত্ব ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মহাভারতে পাণ্ড্যদের উল্লেখ আছে। পাণ্ডুদের সাথে আবার গুলিয়ে ফেলা যাবে না। দুটো আলাদা জিনিস। মহাভারতের সেই যুদ্ধে পাণ্ড্য রাজা প্রবীর যুদ্ধ করেছিলেন পাণ্ডবদের পক্ষে। সেই ঘোরতর আঠারো দিনের যুদ্ধের পনের দিন টিকে ছিলেন তিনি। তবে ষোলোতম দিনে গিয়ে আর পারলেন না। হত হন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হাতে। এছাড়া তখনকার দিকে পান্ড্যদের অপর এক পক্ষ কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই শোনা যায়।

বর্তমান মহারাজ ভালুদির মনে সেসব চিন্তা এখন আর কাজ করে না। আগের রাজাদের দম ছিল, তারা এসব কাজ করেছিলেন। তার দম নেই, একটু পরিশ্রমেই তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। সেসব শৌর্যময় অতীত চিন্তা করা এখন আর তার পোষায় না। সেসব এখন গালগল্প মনে হয়। কুরুক্ষেত্রে যেই হস্তিনাপুরের অধিকারের জন্য সারা ভারত লড়েছিল সেই হস্তিনাপুর রাজ্যের কোনো চিহ্ন এখন পৃথিবীতে নেই। এই সুদীর্ঘ তিন হাজার বছরে মানচিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। মানচিত্রের সাথে সাথে বদলেছে অর্থনীতি আর রাজনীতি। পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম। এখন আর পাগলের মতো বীরত্ব দেখানোতে রাজার সার্থকতা প্রকাশ করে না।

দাক্ষিণাত্যের রাজনীতির অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। ঝড়ের সময়ের শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। মহারাজ ভালুদি যখন রাজ্য হাতে পেয়েছেন তখন ঝড় পুরোদমে চলছে। তবে তার রাজ্য ছোটো হওয়াতে বেঁচে গেছেন তিনি। বড়োসড়ো ঝড়ের ঝাপটা লম্বায় ছোটো গাছের ক্ষেত্রে তেমন বিপজ্জনক নয়।

শৌর্যবীর্যময় রাজপুরুষেরা ঝড়ের চোখে চোখ রেখে লড়াই করেন। তারা প্রতিকূলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান। সেই উদ্যত রূপ দেখে মাঝেমাঝে ঝড়ের দম একটু হলেও কমে আসে। তবে ঝড়কে থমকে দেবার মতো সাহস মহারাজ ভালুদির নেই। প্রাণক্ষয়ের আশঙ্কা আছে যেসব কাজে সেসব কাজে তার ভীষণ আপত্তি।

তবে সাহস না থাকলেও লোভ তার ষোলোআনাই আছে। বীরের যেমন লোভ থাকে তেমনি কাপুরুষেরও থাকে। বীরের লোভকে আমরা মর্যাদার আসন দেই। বলি, বীরভোগ্যা বসুধা। কাপুরুষের লোভকে দেখি হীন চোখে। অযোগ্যের কোনো কিছু পাবার অধিকার নেই। তবে বাস্তবে এসব চিন্তা অর্থহীন। বাস্তবতার কাছে বীর আর

কাপুরুষের সংজ্ঞা কোনো কাজে আসে না। শুধু মানুষের ইচ্ছে আর সেই ইচ্ছে পূরণের পেছনে সুযোগ আর বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার নিয়েই বাস্তবের কারবার।

লোভের বশবর্তী হয়ে কাপুরুষোচিত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত একটা কাজ তিনি কিছুদিন আগেই করেছেন। দক্ষিণ ভারতের বর্তমানের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী রাজ্য চেরার সাথে সন্ধি স্থাপন করেছেন তিনি। অসম দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হলে যা হবার কথা তাই হলো। সেটাকে সন্ধি না বলে অর্থের কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়া সহজেই বলা যায়। অবশ্য তখন এই ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। সেই পদক্ষেপের কারণে এখন প্রজাদের জন্য দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সাথে অবশ্য রাজপ্রাসাদের বিলাসিতাও কয়েকগুণ বাড়ানো গেছে।

আজ বিকেলে চেরা মন্ত্রী ভেরাপ্পন তার রাজ্যে এসেছেন। খবর নিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর সাথে তেমন সাজরব নেই। লোকজনও তেমন নেই। তার মানে সফরটা গোপন। মন খচখচ করছে মহারাজ ভালুদির। ঘটনা কোনদিকে গড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। তার রাজ্যের অন্যসব ব্যবস্থার মতো গুপ্তচর ব্যবস্থাও যাচ্ছেতাই। তাই এখন আর তিনি রাজ্যের বাইরের খবর তেমন একটা পান না। খবর পেলে হয়তো কিছু আঁচ করা যেতো।

চেরা রাজ্যের সাথে তার সন্ধি সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক। বাণিজ্যিক কোনো কারণে মন্ত্রী ভেরাপ্পন গোপন সফর কেন দেবেন? সামনে কী অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যাচ্ছে না। তাহলে কি সন্ধি বাতিল করতে চান চেরা রাজা? তাহলে তো আবার ঘনিয়ে আসবে সর্বনাশ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চেয়ে আতঙ্কজনক আর কিছুই হতে পারে না।

ভেরাপ্পনের সাথে সাক্ষাৎ স্থির হয়েছে গভীর রাতে। তিনিও খবর দিয়েছেন মন্ত্রী ভীমসেনকে। নামে ভীমসেন হলেও বাহ্যিক আকারে দ্বিতীয় পাণ্ডবের সাথে তার কোন দিক দিয়েই মিল নেই। তবে তার ঘটে বুদ্ধি আছে। এক চোখে দেখতে পান না ভীমসেন। তিনি জন্ম প্রতিবন্ধী। দৃষ্টির অপারগতা ঈশ্বর পুষিয়ে দিয়েছেন মাথার ক্ষমতায়।

নষ্ট চোখের কারণে ভীমসেনের গতি একটু শ্লথ। আস্তে আস্তে হেঁটে মন্ত্রণাকক্ষে হাজির হলেন তিনি। যদিও মহারাজ ভালুদি জানতেন তিনি নিশ্চিত আসবেন তবু তাকে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ঠোঁট গলে।

ভীমসেনের সাথে মহারাজ ভালুদির সম্পর্ক আর পাঁচটা রাজা-মন্ত্রীর সম্পর্কের মতো খোলসে আটকে নেই। সম্পর্কটা একটু চলতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। কোন সম্ভাষণে গেলেন না ভীমসেন, 'মহারাজ, মন্ত্রী ভেরাপ্পনকে কি খবর পাঠানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তিনি আসছেন। আচ্ছা কী হয়েছে বলে মনে হয় আপনার? ওনার তো এখন আমাদের রাজ্যে আসার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমার মাথায়ও কিছু আসছে না। তবে অবশ্যই গুরুতর কিছু হয়েছে। আর ভাবতে যখন হবে তখন এমন সময়ে গুণীজনে সবচেয়ে খারাপটাই ভেবে রাখতে বলেছেন।'

'সবচেয়ে খারাপ মানে? আমি যা ভাবছি আপনি কি তাই ভাবছেন?'

দেবার অনেককিছু আছে।' এটুকু বলেই তিনি মহারাজ ভালুদির ক্ষত্রিয় ধর্ম জাগিয়ে তুলতে প্রবৃত্ত হলেন। একটাই উপায় আছে। নিজের রাজ সিংহাসন আর রাজ্যের প্রজাদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত কোন ক্ষত্রিয়ই সহ্য করবেন না।

'মহারাজ, আমাদের মুঝিরিস বন্দর নিঃসন্দেহে ভারতের সেরা বন্দর। এই বন্দর এখন শুধু আমাদের সমৃদ্ধির জন্যই কাজ করছে না, বরং এখন আপনাদেরকেও ধনী করছে। আপনাদের প্রজারা আমাদের দয়ায় খেয়েপরে বেঁচে নেই, আছে এই বন্দরের রোজগারে। কিন্তু সেই ঐশ্বর্যশালী বন্দরের ওপর প্রতিবেশীর নজর পড়েছে। বড়োলোক আর ক্ষমতাশালী সবসময় মনে করে, এই পৃথিবীর সব সম্পদে তারই অধিকার। এই পৃথিবীতে ঈশ্বর যেহেতু তাকে বড়োলোক করেছে তাই সব সম্পদে তারই অধিকার। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই বড়োলোক যে-কোনো কৌশল প্রয়োগ করে সেই সম্পদ হস্তগত করতে চেষ্টা করে।'

মহারাজ ভালুদি আর ভেরাপ্পন কিছুই বলছেন না, শুধু শুনে যাচ্ছেন, 'আর আমাদের জন্য এখন বড়োলোক প্রতিবেশী একজন নয়, রীতিমতো দুজন।'

মহারাজ ভালুদি যোগ করলেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি। সাতবাহন আর চোলা।'

'হ্যাঁ মহারাজ, সাতবাহন অথবা চোলা- এদের যেকেউই আমাদের মুঝিরিস বন্দর দখল করার জন্য আক্রমণ করতে পারে। আর এখানে শুধু করতে পারে বললে ভুল হবে। আমাদের কাছে গুপ্ত সংবাদ আছে, এরই মধ্যে সাতবাহন রাজ্য আমাদের রাজ্য আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

মহারাজ ভালুদি এতক্ষণে যেন একটু হালকা হলেন। এই তাহলে আসল ঘটনা। তাদের কোন দোষ নেই। কলকাঠি ভগবান অন্য কোথাও নাড়ছেন।

এবার মঞ্চে সংলাপ বলার পালা ভীমসেনের, 'মহারাজ ভালুদি, কথা বলার জন্য আপনার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।'

অনুমতি পাওয়া গেল।

'মন্ত্রী ভেরাপ্পনের ইশারার মানে হলো, সাতবাহন রাজ্য যখন চেরা রাজ্যকে আক্রমণ করে দখল করবে, তখন মিত্র রাজ্য হিসেবে আমাদেরকেও ছেড়ে কথা বলবে না।'

কথার খেই ধরলেন ভেরাপ্পন, 'একেবারে সঠিক কথা। আর যদিও ছেড়ে কথা বলে তাহলেও আপনাদের ক্ষতি যা হবার এমনিতেও হয়ে যাবে। তারা নিশ্চয়ই আমাদের মতো আপনাদের সাথে কোন ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি রাখবে না। এখন সাতবাহন রাজ্যকে আটকানো আপনার আমার দুজনের জন্যই দরকার।'

মহারাজ ভালুদির শঙ্কা আবার ফিরে এলো, 'কিন্তু আমাদের সৈন্যবল তো এতো বড়ো যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া অনেকদিন সৈন্যদের কোন মহড়াও দেইনি।'

'না দিলে তাড়াতাড়ি দিন মহারাজ। মহড়া দিন, অস্ত্রে ধার দিন, বর্মগুলোকে চকচকে করে নিন, সেনাপতিদের বিছানা ছাড়তে বলুন। সাতবাহনের সাথে আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। এর আগে অন্য কারো বিরুদ্ধেও আমাদের অস্ত্র ধরতে হতে পারে। বৈশ্য নীতি মেনে চলার দিন শেষ। আমাদেরকে আবার পূর্ণ ক্ষত্রিয় হয়ে উঠতে হবে।

মহারাজ ভালুদি মাথা একটু নাড়লেন, 'সাতবাহন ছাড়া আবার কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে?'

ভেরাপ্পন হাসলেন, 'এখন আপনি সব জেনে ফেললে কাজে মন দিতে পারবেন না। তারচেয়ে আমি যা বলছি মন দিয়ে তাই করুন। পদাতিক, অশ্ব, হস্তী সব প্রস্তুত করতে হবে। ধীরে ধীরে আপনি সবই জানতে পারবেন। দ্রুতগামী দূত এখন থেকে আমাদের মাঝে যোগাযোগ রাখবে।'

'আপনার কথামতোই কাজ হবে। এখন তাহলে আপনি অথিতিশালায় বিশ্রাম করুন।'

'নাহ, আমাকে অনুমতি দিন। আজ রাতেই প্রস্থান করবো।'

মহারাজ ভালুদি আর ভীমসেন দাঁড়াতেই ভেরাপ্পন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার কাজের তাড়া আছে।

মহারাজ ভালুদি আর ভীমসেন আবার বসলেন। এবার আর বসার ভঙ্গিতে একটু আগের জড়সড় ভাবটা নেই।

'কী বুঝলেন ভীমসেন?'

'রক্তপাত ছাড়া উপায় নেই। এবং তা দুই পক্ষেই হবে।'

'আর কিছু বুঝলেন না?'

'আর কী মহারাজ?'

'আবার যদি আমায় ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধে নামতে হয়, তবে এবার ক্ষত্রিয়ধর্ম ভালো করেই পালন করবো। ক্ষত্রিয়রা কখনো কারো মুখাপেক্ষী হয় না। এই যুদ্ধ যদি জিততে পারি তবে আমরা আমাদের অধিকার আদায় করে নেবো। আমরা আর চেরা রাজ্যের অনুগ্রহে বাঁচবো না। আমাদের সৈন্যদের রক্তের বিনিময়ে যেভাবেই হোক আমরা সম্মান আদায় করে নেবোই।'

ভীমসেনের চোখ আগ্রহে জ্বলে ওঠে।

'ভেরাপ্পনের কথা মতো আপনি আমাদের সেনাপতিদের খবর দিন। এখনই। আজ রাতেই আমি তাদের সাথে কথা বলবো। আর ভেরাপ্পন যা বলেননি তাও করবো আমরা।'

'সেটা কী?'

'আমাদের সেনাপতিদের সাথে সাথে আমাদের সব অথর্ব গুপ্তচরদেরকেও খবর দিন। বলে দিন, বসে বসে মাছি মারার দিন শেষ। আমরা যখন অন্য কারো থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাবো, তখন আসলে আমি তার কথামতোই চলছি। আমাদের টাটকা খবর দরকার। তাহলেই শতরঞ্চে আমরা শুধু সৈনিক হবো না, খেলোয়াড় হয়ে উঠবো। ভারতের পুরো রাজনীতির বর্তমান খবর আমি আমার মুঠোতে চাই।'

'আমি সবাইকে এখনই খবর দিচ্ছি মহারাজ।'

'সাবধানে। আমাদের তৎপরতার কথা যেন কেউ জানতে না পারে। এমনকি ভেরাপ্পনের কাছ থেকেও ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে মহারাজ।'

২৯

মন্ত্রী সারথীর সময় যে খুব খারাপ কাটছে তা বলা যাবে না। রাজঅথিতি হয়ে এসেছেন তিনি। রাজসেবাই পাচ্ছেন। আর তোশালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলনাহীন। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় দয়া নদীর টলমলে জলের ওপর দিয়ে বয়ে আসা স্নিগ্ধ বাতাস নিমেষেই শরীর জুড়িয়ে যায়। আর দয়া নদীর জলের দিকে তাকালেই যে কারো মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য।

তবে তার মন ভালো হচ্ছে না। তিনি যে উদ্দেশ্য আর চিন্তা নিয়ে এই রাজ্যে এসেছিলেন তার কিছুই পূরণ হয়নি। ভেবেছিলেন মহারাজ আসাকাকে পাঁচ মণ স্বর্ণের লোভ আর সাতবাহনের ভয় একসাথে দেখালেই তিনি কাত হয়ে যাবেন। আর তখনই তার পরামর্শ চাইবেন আর তিনিও তার ঠিক করে রাখা পরামর্শটা দেবেন। তবে সেরকম কিছুই হয়নি। মেরুদণ্ড আছে মহারাজ আসাকার। ভয় পাননি তিনি। তারও আর চালটা দেওয়া হয়নি।

আথিতেয়তায় কোন ত্রুটি আছে একথা কলিঙ্গের শত্রুপক্ষও বলতে পারবে না। তার জন্য সুবাসিত, বায়ুপূর্ণ বেশ বড়ো একটা কামরা বরাদ্দ আছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিচারক পরিচারিকারা যে-কোনো আদেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত। এমনকি তার রাতের নৃত্য, গীত এবং গোপন পিপাসা মেটানোর জন্যও বেশ কিছু পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। তার প্রমোদ ভ্রমণের জন্য একটা সার্বক্ষণিক প্রমোদতরী তোশালির রাজঘাটে সবসময় সজ্জিত থাকে। আজকে সকালে জলযোগের পর তিনি ঐ তরীতেই প্রমোদের সন্ধানে বেরিয়েছেন।

বেশ খানিকক্ষণ বায়ু সেবনের পর যখন চিত্ত শান্ত হলো না, তখন তিনি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাঝিদের ইশারা দিতেই তারা রাজঘাটের দিকে তরীর মুখ ফেরালো। বাতাসের টানে তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগলো তরী। রাজঘাটে নেমে পড়লেন তিনি।

পা বাড়ালেন অথিতিশালার দিকে। সময়ের সাথে সাথে মনের অস্থিরতা বাড়ছে। একটু আগেও তিনি ভেবেছিলেন প্রাতরাশের পর যদি নৌকায় বেড়িয়ে আসা যায় তাহলে ভালো লাগবে। এখন আবার মনে হচ্ছে অথিতিশালার নরম বিছানায় শরীরটা একটু কাত করতে পারলে একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু নরম বিছানায় তো আর স্বস্তি থাকে না, থাকে অন্য জায়গায়।

অথিতিশালার প্রবেশ দ্বারে দূত দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তিনি ওখানে পৌছতেই সে অভিবাদন জানালো, 'মহারাজ আসাকা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

কথাটা কানে আসা মাত্র শরীর জুড়ে যেন একটা শীতল আবেশ বয়ে গেল সারথীর। যাক, শঙ্কার সময়টা আর দীর্ঘ হলো না, 'কখন দেখা করতে বলেছেন আমাকে?'

'এখন মহারাজের সভা বসেছে। সভার কাজ শেষ হলেই আপনাকে দেখা করতে যেতে হবে। আপনি তৈরি থাকুন। সভা শেষ হলেই আমি আপনাকে নিতে আসবো।'

'আচ্ছা। মহারাজকে জানাবে, আমি তৈরিই থাকবো।'

প্রহরী চলে যেতেই বুকে জমে থাকা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে বের করে দিলেন সারথী। যাক, প্রতীক্ষার প্রহর ফুরাতে যাচ্ছে। হয় এসপার নয় ওসপার। কোন একটা চূড়ান্ত খবর মহারাজ নাহাপনার কাছে পাঠানো যাবে।

মহারাজ নাহাপনা আর খবর এই দুটো কথার সাথে সাথে আরও দুটো কথাও তার মনে উঁকি দিয়েছে। মহারাজ নাহাপনা তার পরিকল্পনার বাইরে কোন খবর মানে মহারাজ আসাকার অসম্মতির খবরটা নিশ্চয়ই শুনতে চাইবেন না। এটা মনে হতেই একটা অস্বস্তি চলে গিয়ে আরেকটা অস্বস্তি তার মনে জায়গা করে নিলো। পাঁচ মণ সোনার লোভে যদি কাজ উদ্ধার না হয়? যদি কলিঙ্গ রাজ আসাকা সারথী আর পশ্চিম শক রাজ্যের মূল উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারেন তাহলেই সমূহ বিপদ।

রাজসভা শেষ হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। প্রহরী যথাসময়ে এসে দাঁড়ালো তার দরজায়। চেহারা থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি দুশ্চিন্তার সকল ছাপ মুছে ফেললেন। তার ওজন তাকে ধরে রাখতে হবে। তিনি মহারাজ নাহাপনার প্রধান মন্ত্রী। শতরঞ্জের অনেক বড়ো গুটি তিনি। খেলার সময় সামনের খেলোয়াড় চেহারা দেখে আগাম চাল ধরে ফেলার চেষ্টা করেন। সে সুযোগ দেওয়াটা উচিত হবে না।

পাথরের মতো ভাবলেশহীন হয়ে গেল তার চেহারা। সমস্ত পোশাক শেষবারের মতো পরিপাটি করে নিলেন তিনি। এবার আলোচনায় সমাপ্তি টানা যাক।

মহারাজ আসাকা সভাস্থলে অনুপস্থিত। সভায় অনেকক্ষণ ধরে থেকে যে ক্লান্তি শরীরে ভর করেছিল সেটা দূর করতে অন্দরে গেছেন তিনি। উদিতনাথ সভাতেই ছিলেন, সম্পূর্ণ একা। তিনি সারথীকে দেখে হাসলেন, 'মহারাজ একটু অন্দরে গেছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

সারথী হাসলেন, 'সে হিসেবে আমার জন্য একটু ভালোই হলো। রাজা মহারাজারা সামনে থাকলে আমি আবার একটু অস্বস্তি বোধ করি। এখানে আপনিও মন্ত্রী, আমিও মন্ত্রী। আপনার সাথে কথা বললে অনেকটা নির্ভয়ে বলা যায়। মহারাজের সামনে তো একটা ভয় সবসময় কাজ করে। মাঝখানে একটা পর্দা থেকেই যায়।'

উদিতনাথও হাসলেন, 'মহারাজদের শরীরে এবং অবস্থানে একটা তেজ থাকে। সেই তেজের প্রভাবেই প্রজারা মিইয়ে যায়। আমরা যতই নিজেদের মন্ত্রী মন্ত্রী বলে বড়াই করি না কেন, আসলে তো আমরা রাজাদের প্রজা ছাড়া কিছুই নেই।'

'মহারাজ আসতে আসতে কি আমরা একটু আলোচনা সেরে নিতে পারি। অবশ্যই অনানুষ্ঠানিক আলোচনা। আমাদের প্রস্তাব সম্পর্কে আপনাদের মত কী?'

উদিতনাথ বুঝতে পেরেছেন সারথীর উদ্দেশ্য। মহারাজের আগমনের পূর্বেই তিনি আসলে মহারাজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন। সাবধানে এড়িয়ে গেলেন উদিতনাথ, 'আজ আর কোন আলোচনা হবে না। আজ সিদ্ধান্ত জানাবার দিন। আর সেই সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাবেন স্বয়ং মহারাজ। এখানে আমার কিছুই করার নেই। আমার অপারগতা ক্ষমা করবেন।'

সারথী বুঝতে পারলেন সময়ের আগে উদিতনাথের পেট থেকে কিছুই বের করা যাবে না। অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। সভার জমকালো পোশাকের বোঝা একটু হালকা করে মহারাজ আসাকা অন্দর থেকে ফিরে এসেছেন। মাথার ভারী রাজমুকুটের বদলে এখন হালকা একটা মুকুট চেপেছে। সভার ক্লান্তিও প্রক্ষালন কক্ষ থেকে অনেকটাই ধুয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

আলোচনা শুরু করতে বেশিক্ষণ সময় নিলেন না মহারাজ আসাকা, সরাসরি ঢুকে পড়লেন, 'মন্ত্রী সারথী, আপনাকে এখানে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, আপনার প্রস্তাবের ওজন অনেক। সেই প্রস্তাব কলিঙ্গের মাথার জন্য অনেক ভারী। সেই ভারী বোঝা মাথা থেকে বুঝে শুনে নামাতে একটু সময়ের তো দরকার ছিল।'

'না মহারাজ, আমার এই কদিনে কোন অসুবিধাই হয়নি। আর আপনার মাথায় কোন প্রস্তাবের বোঝা চাপানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বলতে পারেন আপনার এবং আমাদের দুজনেরই মাথার বোঝা কমানোর একটু চেষ্টা করেছি মাত্র।' সারথীর ভঙ্গি বেশ বিনীত।

'শুনুন, রাজনীতিতে আমাদের মাথা আপনাদের মতো না চললেও, একেবারেই যে অচল তা কিন্তু বলা যাবে না। পূর্বপুরুষদের রক্তের তো একটা প্রভাব আছে, তাই না। সেই রক্তের গুণ পুরোপুরি না পেলেও একটু হলেও আমি পেয়েছি।'

কোন দিকে আলোচনা গড়াচ্ছে বুঝতে পারলেন না সারথী। তিনি শুধু সায় দিয়ে গেলেন, 'তা তো অবশ্যই।'

'ভারতের লোক এখনো আমাদের বীরত্বের কথা মনে রেখেছে। সমস্ত উত্তর এবং মধ্য ভারত জয়ী বীর সম্রাট অশোক আমাদের এই কলিঙ্গের সীমান্তে এসেই থমকে গিয়েছিলেন। সেই মহাযুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু সেই সাথে কলিঙ্গের সেনা কড়া জবাব দিয়েছিল তাকে।'

'তা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই মহারাজ। মহাভারতের যুদ্ধের পর আর্যাবর্ত এতো বড়ো যুদ্ধ আর দেখেনি। তবে সবকিছুর শেষে কিন্তু সম্রাট অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। স্বাধীন রাজ্য কলিঙ্গ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল।' খোঁচাটা মারতে দ্বিধা করলেন না সারথী।

'হ্যাঁ, সেটা সত্য। কিন্তু ভুলে যাবেন না, এই যুদ্ধ অশোককে কেবল কলিঙ্গের অধিকারই দেয়নি, বরং তাকে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত করেছিল। আমরা কলিঙ্গবাসীরা এখন যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই যুদ্ধ আবার করতে পারবো। থাক সে কথা। এখন আপনি বলুন, মিত্রতার যে প্রস্তাব আপনি নিয়ে এসেছেন সেখানে তো দুই পক্ষেরই স্বার্থ থাকবে, তাই না?'

'জি মহারাজ। এক কথায় বলতে গেলে স্বর্ণের বিনিময়ে আপনি আপনার সেনাবাহিনী আমাদের এবং আপনার দুজনের স্বার্থেই ব্যবহার করবেন।'

'আরো সোজা করে বলতে গেলে আপনারা চাচ্ছেন যাতে আমরা আপনাদের হয়ে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কাজ করি, তাই না?'

সারথী কোন কথা বললেন না। মহারাজ আসাকার শেষ কথাটা তার পছন্দ হয়নি। মিত্রতার মিষ্টি আলোচনার মধ্যে একটু তিক্ত রস যেন ছড়িয়ে পড়লো। এমন আলোচনার মধ্যে হঠাৎ করে কেউ যদি 'ভাড়াটে' জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে তাহলে সুর কেটে যেতে বাধ্য। এখানেও তাই হয়েছে। আলোচনাটা একটু কড়া ধাতে চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন সারথী। সবচেয়ে বড়ো কথা, মহারাজ আসাকা তাদের আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন।

'না মহারাজ, আপনার একটু ভুল হলো। হয়তো আমিই ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি। আপনারা ভাড়াটে হবেন না, হবেন সাহায্যকারী। কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষে যত রাজা যোগ দিয়েছিলেন তারা ভাড়াটে হিসেবে কেউ আসেননি, এসেছিলেন ধর্মের পক্ষে সাহায্যকারী হিসেবে।'

ভূমিকার পরে এবার হুমকি দেবার পালা, 'মহারাজ, নিজের মতো করে, শুধু নিজের রাজ্য নিয়ে, কারো সাতে পাঁচে না থেকে বেঁচে থাকার দিন আর্যাবর্তে শেষ হয়ে গেছে। কেউই এখন আর এখানে নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারবে না। একপক্ষের মিত্র হতে হবে, আর আরেকপক্ষের শত্রু হতে হবে। আর এমনিতেও আপনার সাথে সাতবাহন রাজ্যের পূর্বশত্রুতা আছে। তাদের সাথে মিত্রতা কতটুকু করতে পারবেন সে আপনিই ভালো জানেন। আর যদি কোনমতে আপনি তাদের সাথে মিত্রতা করতেও পারেন তাহলেও আপনার কতটুকু লাভ হবে তা আপনি জানেন। কোন লাভই হবে না। সাতবাহন রাজ্য আপনাকে কিছুই দিতে পারবে না। আপনি হয়তো জানেন, আকারে বেশ বড়ো হলেও সাতবাহনের কাছে কোন সম্পদ নেই। ভাঁড়ে মা ভবানি।'

উদিতনাথ এবার যোগ দিলেন, 'সাতবাহনে যেমন সম্পদ নেই, তেমনি আমাদেরও নেই। আমাদেরকে আক্রমণ করার কোন কারণ নেই সাতবাহনের। সম্পদের জন্য সাতবাহন রাজ্য আপনাদের আক্রমণ করবে, করুক। সেটা আপনাদের সমস্যা। এখানে আমাদের নিরপেক্ষ হতে কোন বাধা আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আছে মহামন্ত্রী, বাধা আছে। সাতবাহনের রাজ্যের আকারের তুলনায় তার সেনা আগে অনেক শক্তিশালী ছিল নিঃসন্দেহে। সেই কথা এখন আর সত্য নয়। আর আমাদের রাজ্য ছোটো হলেও আমাদের মিত্রতা বেশ শক্তিশালী। পহ্লব আর উত্তর শক রাজারা আমাদের সাথে সন্ধি করার জন্য এক প্রকার মুখিয়েই আছেন। আমরা বলা মাত্রই তারা আমাদের সাহায্যে নিজেদের সৈন্য পাঠিয়ে দেবেন।

এখন চিন্তা করুন। যদি সাতবাহন আমাদের আক্রমণ করে তাহলে আমাদের বাহিনীর সামনে তার এই চলতি বাহিনীতে হবে না। আরো বড়ো সেনা লাগবে তাদের। আর আর্যাবর্তে সাতবাহনকে সাহচর্য দেবার মতো অবস্থা বর্তমানে দক্ষিণের কোন রাজ্যের নেই। এখন বাকি থাকলেন শুধু আপনারা। আপনাদের সেনার ওপর নজর পড়বেই সাতবাহনের। তারা বলে অথবা কৌশলে আপনাদের সেনা চাইবে। আমরাও তাই চাইছি। আমাদের সেনা দিলে আপনি ভালো বিনিময় করতে পারবেন। সাতবাহন সৈন্যের বদলে আপনাকে স্বর্ণ দিতে পারবে না। আমরা পারবো। এই সুযোগে নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করা দরকার আপনার।'

মহারাজ আসাকা উদিতনাথের দিকে তাকালেন, 'আমাদের নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। আপনি কী বলেন উদিতনাথ? আচ্ছা, প্রথম দিনের আলোচনার সময় তো মন্ত্রীমশায় আমাদের সেনার হিসেব দিয়েছিলেন, তাই না?'

'জি মহারাজ।'

'হিসেবটা যেন কেমন ছিল?'

উদিতনাথ বলতে উদ্যত হলেন। তাকে ইশারায় থামিয়ে দিলেন মহারাজ আসাকা, 'মহামন্ত্রী সারথীকে বলতে দিন।'

সেদিনের বলা হিসেব আবার বললেন সারথী, 'ষাট সহস্র পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী আর সাতশো হাতি।'

মহারাজ আসাকা মাথা নাড়লেন, 'আপনার গুপ্তচর একেবারে সঠিক খবর সংগ্রহ করেছে। তবে খবরটা একটু পুরানো। এখন আমাদের পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক আর আট সহস্র অশ্বারোহী আছে। হাতিও তিনশোর মতো বেড়ে এখন সহস্র ছুঁয়েছে। আর বুঝতেই পারছেন এই বাহিনী নিয়ে আমাদের কাউকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারো ভাড়াটে হওয়ারও দরকার নেই। আমাদের সমস্যা যখন আসবে তখন আমরা নিজেরাই সামলে নিতে পারবো। ক্ষত্রিয় শরণাগতকে রক্ষা করে, রাজ্য রক্ষা করে, তবে নিশ্চিত ভাবেই পাঁচ মণ স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ সেনাকে অন্য কারো মুখাপেক্ষী রাখে না।'

সারথী আর কিছুই বলতে পারলেন না। স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তাকে। মহারাজ নাহাপনার এই খবর শুনে মুখে যে বিরক্তি উৎপাদন হবে তা এখন থেকেই যেন দেখতে পাচ্ছেন সারথী। সেই মুখের সামনে দাঁড়ানোর ভীতিটাও ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে।

উদিতনাথ বললেন এবার, 'মহারাজের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। পাঁচ মণ স্বর্ণের বিনিময়ে কোন ক্ষত্রিয় রাজাই তার সৈন্য ভাড়ায় দেবেন না। এটা মর্যাদার প্রশ্ন। অবশ্য বাৎসরিক বিশ মণ স্বর্ণ পেলে আলাদা কথা।'

ঝট করে মুখ তুললেন সারথী। এরা আসলে প্রত্যাখ্যান করেনি। ব্যবসা করার চেষ্টা করছে।

মহারাজ আসাকা উদিতনাথের কথার খেই ধরলেন, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে, বিশ মণ স্বর্ণ ক্ষত্রিয়ের মন পরিবর্তন করতে পারে। মর্যাদার কথা ধরলে বিশ মণ স্বর্ণের বেলায় সেই মর্যাদা একটু বিসর্জন দেওয়াই যায়।'

সারথী এখন আর হতবুদ্ধি হয়ে নেই। তিনি শুনছেন।

'এবার আমাদের প্রস্তাব শুনুন মহামন্ত্রী সারথী। প্রতি বছরের শুরুতে বিশ মণ সোনা অগ্রিম দিয়ে দিতে হবে। তাহলেই আমাদের মাঝের সন্ধি বজায় থাকবে। আর এই চুক্তির আওতায় আমাদের সেনা শুধু আপনাদের চাহিদা মতো মোতায়েন করা থাকবে। কিন্তু যদি সম্মুখ যুদ্ধ করতে হয় তাহলে সেই যুদ্ধের ব্যয় হিসেবে বাড়তি স্বর্ণ লাগবে। এই হলো আমাদের প্রস্তাব।'

সারথী এবার হাসলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি বিশ মণ স্বর্ণের ব্যাপারে মহারাজ নাহাপনাকে রাজি করাতে পারবো। আপনি আপনার সেনা তৈরি করুন।'

সারথীকে আশ্বস্ত করলেন মহারাজ আসাকা, 'মেঘবাহন সাম্রাজ্যের সেনা সবসময় সজ্জিতই থাকে। আমরা যেকোনো সময়ে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত। আপনি কেবল মহারাজ নাহাপনার আদেশ আর বিশ মণ স্বর্ণ আমাদের রাজ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

৩০

আদিনাথের বাড়িতে একটা ভিড় জমে উঠেছিল। গ্রামের প্রায় সকল লোকজন এসে জড়ো হয়েছিল সেখানে। গ্রামের পরিবেশ সর্বদাই নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত। এমন জায়গায় একটু উত্তেজনার ছোঁয়া পেতে সবাই যে মুখিয়ে থাকবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

যে-কোনো ভিড়েই একটা প্রধান প্রভাবক থাকে কৌতূহল। ভিড় প্রথমে একজন থেকে দুইজন, দুইজন থেকে বহুজন হয় এই কৌতূহলের কারণেই। এখন কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়েছে। লোকজন জানতে পেরেছে অসিতের সাথে একটা বড়ো প্রতারণা করা হয়েছে। রাহু নামের পাশের গ্রামের এক বদমাশ অসিতকে অজ্ঞান করে তার বানর অঙ্গদকে চুরি করে পালিয়ে গেছে। সে চলে গেছে পশ্চিম সমুদ্রের পারে। সেখানে এই গ্রামের কারো যাওয়া দূরে থাক, সেই জায়গার সঠিক দূরত্ব এই গ্রামের জনশ্রুতির বিষয়।

কৌতূহল নিবৃত্ত হলেই অবশ্য ভিড়ের প্রধান আগ্রহ শেষ হয়ে যায়। অপ্রধান আরেকটা প্রভাবক বাকি থাকে। ঝামেলার একটা সমাধান করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া। এবং নাবালক অসিতের পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। গ্রামের দায়িত্ববান লোক হিসেবে তাদেরকেই একটা সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সেই সিদ্ধান্তও নিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাহুর কাছ থেকে বানর উদ্ধার করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তার চেয়ে সবাই মিলে চেষ্টা চরিত্র করে অসিতকে আরেকটা বানর কিনে দেওয়া হবে। সামনের পঞ্চায়েত বৈঠকেই এই বিষয়ে নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এরপর আর ভিড়ের কোন কাজ নেই। ভিড় পাতলা হতে শুরু করলো। সবারই বাড়িতে জমিতে নানা কাজ আছে। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পিসি, পবন আর আদিনাথ বাদে অসিতের পাশে আর কেউ থাকলো না। সবাই চলে যেতে পিসি একটু জড়সড় রূপ থেকে সাবলীল রূপে ফিরলেন। আর একটা রূপই আছে তার, মাতৃরূপ। উত্তেজনা কেটে যাবার পরেই তার মনে পড়েছে, অসিত একদিন একরাত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এবং এই সময়ের মধ্যে তার পেটে কিছু পড়েনি। খাবারের যোগাড়ে লেগে পড়লেন তিনি।

অসিতের কোনদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এতক্ষণ লোকে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক কথা বলেছে। তাকে সাহস দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে। কোনকিছুই তার কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করেনি। এখন সবাই চলে গেছে। সেটাও তাকে একটুও উদ্বেলিত করতে পারলো না। সে স্থির হয়ে দাওয়ার এক কোণে বসে আছে।

সবাই চলে যেতে আদিনাথ এবার একটু সুস্থিরে ভাবার অবকাশ পেয়েছেন। ভবিষ্যতে কী হবে তা কেইবা বলতে পারে। তবে অসিতের সমস্যার সমাধানের কথা তিনিই প্রথম সবাইকে বলেছিলেন। বানর কিনে দেবার কথা। প্রথমে সবাই সায় দিয়ে উঠলেও সেই সায় মিলিয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

লোকজনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই গ্রামের সমস্ত মানুষ গরীব। সারাক্ষণ পেটের ক্ষিধের বেড়ে চলা অনুভব করতে করতে সেই ক্ষিধে মেটানোর উপায়ের কথা

চিন্তা করেই কাটে তাদের। অধিকারী বাদে আর কারোই নগদ পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই। তবে ভীষণ চেষ্টা করলে হয়তো সম্ভব হতো। তবে সবার নির্বিঘ্নে কেটে পড়া দেখে তিনি বুঝে গেছেন, কেউই কিছু দেবে না। আর সামনের পঞ্চায়েতের বৈঠক বসতে বসতে এই ঘটনার উত্তেজনা অনেকটাই কমে আসবে। একটা প্রশিক্ষণের যোগ্য বানর কিনতে বেশ অনেকটা মুদ্রা লাগবে। অত মুদ্রা দূরে থাক তার অর্ধেকও তার কাছে নেই। তবে তিনি আর সবার মতো চিন্তা করছেন না। অসিতকে সাহায্য করার ইচ্ছা আর ষোলো আনা আছে। সেই উপায়ই ভাবতে লাগলেন তিনি বসে বসে।

পিসির দক্ষ হাত খাবার সাজাতে খুব বেশি সময় নিলো না। অসিতের সামনে থালা ভরা খাবার রাখলেন তিনি। বেশ কিছু গরম পদ আছে। সুঘ্রাণ ভেসে আসছে অসিতের নাকে। ইন্দ্রিয় যথেষ্ট শক্তিশালী। সেই সুঘ্রাণে অসিতের চেতনা ফিরে এলো। ক্ষিধের ইন্দ্রিয় তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো উপবাসের তীব্র যন্ত্রণা। মনের অনিচ্ছাতেও তার হাত খাবারের থালা স্পর্শ করলো।

কোন একটা কাজ করতে থাকলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। খেতে খেতে অসিত একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অঙ্গদকে হারানোর ব্যাপারটা যেন একটু হলেও পুরানো হয়ে এসেছে। পিসি পাশে বসে আছেন। পবন আবার উঠানে তার খেলা শুরু করেছে।

আরেকটা সমাধান মনে এলো আদিনাথের, 'আচ্ছা অসিত তোর কাছে জমানো কিছু পয়সা আছে না-কি?'

অসিতের মুখে খাবার। সে কথা বলার অবস্থায় নেই। পিসিই ওর হয়ে কথা বললেন, 'ওর কাছে কিছু মুদ্রা আছে বাবা। গত কিছুদিন অঙ্গদকে নিয়ে ও অনেক জায়গায় গেছে খেলা দেখাতে। রোজগার ভালোই হয়েছে। সেই মুদ্রাগুলো নিশ্চয়ই জমিয়ে রেখেছে।'

'তবে তো ও নিজেই এখন আরেকটা বানর কিনতে পারবে। প্রশিক্ষণ পাওয়া বানর কিনতে কত লাগবে তা তো আর জানি না। তোর কাছে কত আছেরে অসিত?'

অসিত এবারেও কিছু বললেন না, আগের মুখ থেকেই এলো জবাব, 'থাক, বাবা। বেচারা এখন একটু খেয়ে নিক। ওকে এখন আর এসব জিজ্ঞেস করবেন না। পরে ধীরে সুস্থে কথা বলা যাবে।'

আদিনাথের মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরছে। রাহু অসিতকে অজ্ঞান করে শুধু কি অঙ্গদকেই নিয়েছে। তস্কর হাতের কাছে এত জমানো মুদ্রা পেলে কি ছেড়ে যাবে।

কথাটা মনে এলেও এখন আর জিজ্ঞেস করলেন না আদিনাথ। বৌমার কথাই ঠিক। অসিতকে এখন নির্বিঘ্নে খেতে দেওয়াই ভালো। খেয়ে একটু বেশি করে জল খেয়ে নিলে ওর শরীর আর মন দুটোই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

দেখতে দেখতে থালা খালি করে দিলো অসিত। পিসি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে তার সামনে বেশ বড়ো এক পাত্র জল রাখলেন।

অসিত জল এক ঢোকে খেয়ে নিলো। ভেতরে নিশ্চিত তার তৃপ্তি নেই তবু তৃপ্তির একটা ঢেকুর তার গলা বেয়ে উঠে এলো। এবার কথাটা পাড়লেন আদিনাথ, 'আচ্ছা, তোকে কোথায় ওষুধ মেশানো খাবার খাইয়েছিলও রাহু?'

'আমার ঘরে।'

'আচ্ছা, তার মানে তোর ঘর থেকেই অঙ্গদকে চুরি করেছে সে।'

'আজ্ঞে।'

'সেই ঘরেই তো তোর পয়সা লুকানো ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো চিন্তার কথা। রাহুর কথা যা শুনলাম সে বাস্তব বোঝে এবং খুবই ধুরন্ধর। সে অঙ্গদকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাবার সময় তোর মুদ্রাগুলোকে কি আর ছেড়ে গেছে। আমার মনে হয় রাহু সেগুলোও নিয়ে গেছে।'

'না, পয়সাগুলো নিতে পারেনি। আমি ওগুলো ভালো করে বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তাই মনে হয় খুঁজে পায়নি।'

'অথবা, হতে পারে খুঁজতে যায়ওনি। সে জানতো, সময়ের সদ্‌ব্যবহার করতে হবে। কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে তোর ঘরে গিয়ে তাহলে তো সব পণ্ড হয়ে যেতো। তাই সে আর অন্য চিন্তা করেনি। অঙ্গদকে নিয়েই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েছে।'

'তাই হবে হয়তো। আমি আজ সকালে পয়সাগুলো দেখেছি। লুকানো জায়গায় ভালো করে রেখে এখানে এসেছি আমি।'

'যাক' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন আদিনাথ, 'একেবারে নিঃসম্বল তো হয়ে যাসনি। কিছু মুদ্রা আছে তোর কাছে। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ নেই। আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। তুই তো একা মানুষ। সমস্যা হবে না।'

পিসিও উৎসাহ দেন অসিতকে, 'বাবা তো ঠিক কথাই বলছেন । মানুষের জীবনে কতকিছু ঘটে যায়। মানুষ কি এজন্য বসে থাকে। থাকে না। পবনের বাবা যে এই অকালে চলে যাবেন, সেটা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?' পিসির গলা একটু ধরে আসে। তবে মুহূর্তেই সামলে নেন তিনি, 'তুই আবার নতুন করে সবকিছু শুরু কর। তোর কাছে কত পয়সা আছে রে?'

'দুশোটার মতো মুদ্রা। অঙ্গদকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে জমিয়েছিলাম।'

আদিনাথ মুদ্রা সংখ্যা শুনে যথেষ্ট আশ্চর্য হলেন, 'বাহ, এই কয়দিনে অঙ্গদকে দিয়ে খেলা দেখিয়ে এতো মুদ্রা জমিয়ে ফেলেছিস। দুশো মুদ্রায় তোর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই।' আদিনাথের আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক। তার সারা বছরের ফসল থেকে সংসার খরচ আর খাজনা মিটিয়ে পঞ্চাশ মুদ্রা টেকাতেই কষ্ট হয়ে যায়।

পিসি এবার কাজের কথায় এলেন, 'বাবা, আপনার কী মনে হয়? দুশো মুদ্রায় একটা বানর কেনা যাবে না?'

আদিনাথ এবার একটু গভীর চিন্তা করলেন, 'বানর নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানা কথা কানে আসছে। এমনিতে জংলী বানর হলে এই মুদ্রায় চার-পাঁচটা কেনা যাবে। কিন্তু জংলী বানর দিয়ে তো অসিতের কোন কাজ হবে না। ওর দরকার প্রশিক্ষিত বানর। সেটা দুশোতে আগে হলে সহজেই হয়ে যেত। এখন আবার এমন বানর না-কি পশ্চিমে আমদানি হচ্ছে। আর এসব ভারতীয় বানরের নাকি চাহিদাও অনেক। তাই দাম এখন অনেক বেড়ে গেছে। তবু খোঁজ নিয়ে দেখা যেতেই পারে।'

আগে এই কথাটা বলতে গেলে নিশ্চিত অসিতের মুখে লজ্জার ছাপ থাকতো। তবে এখন সেই ভাব এলো না, 'ঐ দুশো মুদ্রা বানর কেনার জন্য জমাইনি। অন্য কাজে লাগবে ওগুলো।'

আদিনাথ এবং পিসি দুজনেই এবার অবাক হয়েছেন। দুশো মুদ্রা সংখ্যায় অনেক। এতো মুদ্রার যোগ্য কোন পরিকল্পনা তো অসিতের থাকার কথা না।

পিসি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ দুশো মুদ্রা তোর কী কাজে লাগবেরে অসিত?'

'এগুলো দিয়ে দুটো গাভী কিনবো। একটা কালো, আরেকটা লাল।'

এই রহস্যও অবোধ্য ঠেকল পিসির কাছে। বানর না কিনে গাভী কিনে অসিত কী করবে?

'গাভী দিয়ে তুই কী করবি? তুই কি গাভী পালতে পারবি?'

অসিতের মনের জড়তা এখন একেবারেই নেই বললে চলে। বড়ো আঘাত মানুষের মনের বিশেষ অংশে বেশ প্রভাব ফেলে, 'গাভী তো আমি পালবো না পিসি।'

'তাহলে কে পালবে?'

'রাঁধা পালবে। রাঁধার মা নাকি রাঁধাকে বলেছেন দুটো গাভী যেই ঘরে আছে এই গ্রামের সেই ঘরেই রাঁধার বিয়ে দেবেন। এজন্য আমি দুশো মুদ্রা জমিয়েছি। একটা কালো গাভীর খুব শখ রাঁধার। আরেকটা কিনবো লাল।'

পিসি এবার ভীত মুখে অসিতের দিকে তাকালেন। তারপর মুখ টিপে একটু না হেসে পারলেন না। যে ছেলে এতো মুখচোরা ছিল, রাঁধার দিকে লুকিয়ে তাকানোর সাহসও পেতো না, সে কীভাবে অবলীলায় রাঁধার নাম মুখে আনছে, রাঁধাকে বিয়ের শর্ত নিয়ে কথা বলছে। চেহারা তার একটুও কাঁপছে না, গালে একটুও লালিমা ধরছে না।

তার মানে আঘাতটা অসিতকে বদলে দিয়েছে। সে এখনো অঙ্গদকে হারানোর শোক থেকে একটুও বেরোতে পারেনি।

পিসি তাড়াতাড়ি সায় দিলেন তার কথায়, 'বাহ, বেশ হবে তো। তাড়াতাড়ি যা, মুদ্রাগুলো নিয়ে আয়। আজই যাবি গাভী কিনে আনতে। আমি তোর সাথে কাউকে পাঠিয়ে দেবো। রাঁধার মায়ের কাছে আমি আজকেই যাবো পাকা কথা বলতে। তিনি রাজি হবেন, না হয়ে থাকতে পারবেন না। গ্রামের মেয়ে, মার অন্ধের যষ্টি, গ্রামের সবার সামনেই থাকবে, এতে কেউ আপত্তি করতে পারবে না।'

অসিত পিসির কথা শুনলো, কিন্তু তার মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না।

পিসি এবার রাঁধার নানা গুণ আর অসিতের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, 'রাঁধার মা অবশ্যই রাজি হবেন। আমার কথা ফেলতেই পারবেন না। তোর ভাগ্য অনেক ভালো। রাঁধার মতো একটা মেয়েকে বৌ হিসেবে পাবি। এতটুকুন মাত্র মেয়ে, কিন্তু ওর হাতের কাজ দেখে আমরা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যাই। ওর মতো ননী আর দই এই ইন্দ্রপুরে আর কেউ বানাতে পারে না। এমনকি ওর মাও পারে না। তোর কেনা দুই গাভীর দুধ দিয়ে রাঁধা অনেক কিছুই বানাবে, আর তুই সেগুলো নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাবি। তোদের দিন বেশ ভালোই কেটে যাবে। বাবা, আপনার কী মনে হয়? আমাদের অসিত আর রাঁধার জোড়া বেশ মিলবে, তাই না?'

আদিনাথ এতক্ষণ সবই শুনছিলেন। আলোচনার নতুন মোড়ে তিনি একটু ইতস্তত করছিলেন। বিয়ের কথায় তরুণদের সামনে বুড়ো থাকলে দুই পক্ষই একটু জড়সড় বোধ করে। তবে মত না দিয়ে পারলেন না তিনি, 'হ্যাঁ, বৌমা, ঠিকই বলেছ। রাঁধার মতো লক্ষ্মী মেয়ে এই গ্রামে আর একটাও নেই। আর আমাদের অসিতই বা কম কীসে?'

পিসি এবার তাড়া দিলেন অসিতকে, 'যা তাড়াতাড়ি পয়সাগুলো নিয়ে আয়। আমি এদিকে পবনকে পাঠাচ্ছি আমাদের একজন ভূমিদাসকে নিয়ে আসার জন্য। সে গাভী কেনার সময় তার সাথে থাকবে।'

অসিত আর দেরি করলো না। নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলো। ঘরে পৌঁছে দেখলো সব আগের মতোই আছে। না, কথাটা ঠিক হলো না। সব আগের মতো নেই। অঙ্গদ নেই।

বিছানার নিচে লুকানো জায়গা থেকে মুদ্রাগুলো বের করে নিলো সে। গাভী আনতে যেতে হবে। পথের সম্বল হিসেবে আরও কিছু জিনিস বেঁধে নিলো সে।

পবন ততক্ষণে একজনকে নিয়ে ফিরে এসেছে। উমা পিসি সেই ভূমিদাসকে নিয়ে পড়েছেন। দাসের বুদ্ধি বেশ মোটা। তাকে পুরোটা বুঝিয়ে দিতে পিসিকে অনেক কসরত করতে হচ্ছে।

এমন সময় অসিত গিয়ে উপস্থিত হলো। দুজনকে এবার একসাথে বোঝাতে শুরু করলেন পিসি। গাই কেনার সময় যা যা সুলক্ষণ ভালোভাবে বিচার করতে হবে, সেগুলো ভালো করে দুজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি। শেষের উপদেশটা বিশেষ ভাবে অসিতের দিকে গেল, 'মুদ্রাগুলো একটু সাবধানে রাখিস। পথে চোর ডাকাতের তো কোনো অভাব নেই।'

অসিতের চোখ তখনো ভাবলেশহীন, 'রাঁধার বাড়িতে আপনি কখন যাবেন পিসি?'

পিসি হাসলেন, 'আরে ছেলের দেখি তর সইছে না। একটু তো লজ্জা রাখ। এতো ভাবতে হবে না। তোরা বেড়িয়ে গেলেই আমি রাঁধাদের বাড়ি যাবো। এবার মা শক্তির নাম নিয়ে যাত্রা শুরু কর।'

'পিসি, রাঁধাকে আর রাঁধার মাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন। আমি অবশ্যই দুটো গাভী নিয়ে ফিরে আসবো।'

'হ্যাঁ, আমি তো সে কথাই বলতে যাবো। তুই তো গাভী নিয়েই ফিরে আসবি।'

'আমি শুধু গাভী নিয়েই ফিরবো না পিসি। আমাকে আরেকটা জিনিসও সঙ্গে করে আনতে হবে।'

পিসি বুঝতে পারলেন না, 'মানে? তুই আবার গাভীর সাথে কি আনবি?'

'অঙ্গদ। অঙ্গদকেও আমার সাথে করে নিয়ে আসতে হবে।'

অসিতের ঠান্ডা নিরুত্তাপ স্বর শুনে পিসি বুঝলেন অসিত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। এটা গরম মাথার সিদ্ধান্ত নয়, বরং ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনা। পিসির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো, 'তুই কি পাগল হয়েছিস অসিত? অঙ্গদ এই জীবনের মতো চলে গেছে। তুই কি শুনিসনি, রাহু অঙ্গদকে পশ্চিমের সমুদ্রে নিয়ে গেছে। সেখানে এই পর্যন্ত ইন্দ্রপুরের কেউ যেতে পারেনি। কেউ ঐ সমুদ্র চোখে দেখেনি। তুই কীভাবে যাবি? কীভাবে খুঁজে বের করবি রাহুকে?'

'ওসব কিছু জানি না পিসি। তবে এটুকু জানি আমাকে যেতে হবে। অঙ্গদকে যদি না খুঁজতে যাই, তবে বাকি জীবন আমি শান্তি পাবো না। যদি ওকে খুঁজতে গিয়ে মরেও যাই, তবু মনকে তো একটা সান্ত্বনা দিতে পারবো। আমাকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতে হবে।'

'তাহলে এই জীবনে রাঁধার কথা ভুলে যা। আমি কোথাও যেতে পারবো না, কারো সাথে কথা বলতে পারবো না। তোর যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যা।'

'রাঁধার বাড়িতে আপনার যাওয়া না যাওয়ার ওপর তো আমার হাত নেই। তবে পিসি, রাঁধা যদি আমার প্রেম হয়, তবে অঙ্গদ আমার কর্তব্য। ছোটো ভাইয়ের প্রতি মানুষ যে কর্তব্য পালন করে, আমাকে সেই কর্তব্যই পালন করতে হবে। রাঁধার মাকে কিছু না জানালেও চলবে। শুধু রাঁধা যাতে জানে, আমি আসবো, অবশ্যই দুটো গাভী নিয়ে ফিরে আসবো। সাথে অঙ্গদকেও ফিরিয়ে আনবো।'

'না, অসিত তুই পারবি না। রক্তে ক্ষত্রিয় হলেও এই গ্রামের সবার ক্ষত্রিয় স্বভাব অনেক আগেই চলে গেছে। এখন তুই জেদের বশে যাচ্ছিস বটে, কিন্তু পথে একটু হাঁটলেই বুঝবি, কী ভুল করেছিস তুই। জেদ আর জলন্ত অঙ্গার সমান। যার সাথে থাকে তাকেই পোড়ায়। অঙ্গদকে যেতে দে অসিত। পেছনে আর ছুটিস না। জেদ ছেড়ে দে অসিত, গাভী কিনে ফিরে আয়।'

'না পিসি, আমাকে যেতেই হবে। রাঁধার মাকে শুধু একটু অপেক্ষা করতে বলবেন। আমার জন্য এটুকু করলেই হবে।'

'রাঁধা বড়ো হয়েছে অসিত। বড়ো মেয়েকে মা আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবেন। ষোড়শী হবার আগেই যেভাবে হোক বিয়ে দিতে হবে তো।'

'রাঁধার ষোড়শী হতে আর কত বৎসর বাকি?'

'তিন বছর।'

'আমি তাহলে তিন বছরের মধ্যেই ফিরে আসবো পিসি। আর যদি না ফিরতে পারি তাহলে ধরে নেবেন, আমি আর ফিরবো না।'

পিসির চোখ এবার জল ছেড়ে দিলো, 'বাবা। তোকে আর পবনকে আমি কখনো আলাদা চোখে দেখিনি। তোকে সবসময় আমি ছেলের মতোই দেখেছি। তোকে এই বিপদের পথে ছেড়ে দিতে মন সায় দিচ্ছে নারে। আরেকবার ভেবে দেখ, সাধ্যের অতীত কাজ মানুষের করা উচিত না।'

'ভেবে দেখেছি পিসি। ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্যও আমাকে অঙ্গদের বিরহ ভুলিয়ে দিতে পারবে না। আমাকে যেতেই হবে। আর সাধ্য, আমার সামর্থ্যের পরিমাণ আমি জানি না, কিন্তু এবার হয়তো জানতেও পারবো।'

আগের বলা সতর্কবাণী আবার দিলেন পিসি, 'পয়সাগুলো সাবধানে লুকিয়ে রাখিস বাবা। কাউকে দেখাবি না এগুলো। চোর ডাকাতের তো আর অভাব নেই। সবসময় শক্তির নাম মনে রাখবি। সাবধানে থাকিস।'

'আচ্ছা পিসি।' এবার প্রণাম করলো অসিত পিসিকে। তারপর বেড়িয়ে পড়লো।

পিসির বাড়ি থেকে যখন সে বেড়িয়ে যাচ্ছে তখন তার কানে বাজছে ছোটোবেলায় রাধামাধব শাস্ত্রীর শেখানো কথাটা, 'শরণাগত, স্বজন, আর অধিকৃত বস্তু রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম।'

৩১

প্রতিষ্ঠানা রাজ্যে মহারাজ সাতকর্ণীর সময় কাটছে উৎকণ্ঠায়। তিনি যোদ্ধা। ছোটোবেলা থেকেই এই বিদ্যা তার আয়ত্তে আছে। একসাথে একের অধিক যুদ্ধ পরিচালনা করতেও তিনি কখনো বিচলিত হতেন না। বরং বেশ মজাই পেতেন সেই কাজে। তবে নতুন সৃষ্টি হওয়া এই পরিস্থিতিতে তিনি অনভ্যস্ত। এজন্যই এই উৎকণ্ঠা।

গিরিধারী রাজ্য ত্যাগ করার আগে দুজনের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। তিনি একটা কথা বেশ বুঝতে পেরেছেন, একটা সময় পর্যন্ত সৈন্য দিয়ে রাজ্য রক্ষা করা যায়, কিন্তু রাজ্য যখন আয়তনে বেশি বড়ো হয়ে যায়, তখন শুধু সৈন্যবলে কাজ হয় না। জমি ছোটো হলে জমিদারের লাঠিয়াল রক্ষা করতে পারে, কিন্তু জমির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে আর সেই লাঠিয়ালের দল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই নীতিশাস্ত্রে রাজাকে কেবল সৈন্যদল আর সেনাপতিদের পালন করার কথাই বলা হয়নি, সেই সাথে পণ্ডিত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন্ত্রীমণ্ডলের পৃষ্ঠপোষণের কথাও বলা হয়েছে। নিজের শৌর্যের ওপর তার কখনোই সন্দেহ ছিল না, তবে এখন তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কেবল অর্জুনের গাণ্ডীবই লড়েনি, কানাইয়ার মাথাও লড়েছিল।

গিরিধারী চোলা সফর করে ফিরে এসেছেন। এখন বসে আছেন তার সামনে, 'মহারাজ, চোলা মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। চেরা আর পান্ড্যের সাথে যুদ্ধ করবেন তারা।'

'কিন্তু আমরা তো জানতাম তাদের সৈন্যবল অনেক কম।'

'আমরা ঠিকই জানতাম মহারাজ। সৈন্যবলে তারা অনেক হীন।'

'তাহলে তারা একই সাথে দুই রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি হলো কেন?

'জি মহারাজ। তারা রাজি হয়েছে। আমি তাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছি।'

চোখ সরু হয়ে গেল মহারাজ সাতকর্ণীর, 'আমাদের কাছ থেকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার কথা বলেছেন? আমরা তো এমনিতেই সৈন্য সংকটে আছি। সেটা তো আপনি ভালো করেই জানেন। তারপরও আপনি তাদের যুদ্ধের জন্য সৈন্য সহায়তা দেবার কথা দিয়ে এসেছেন?'

'এটাই রাজনীতি মহারাজ। মাঝে মাঝে এভাবে একটু খেলতে হয়। শূন্যের মধ্য থেকে এখানে অনেক প্রতিশ্রুতির জন্ম হয়, আবার সেসব প্রতিজ্ঞা শূন্যেই মিলিয়ে যায়।'

'তারমানে, মিথ্যে আশ্বাস দেওয়াও রাজনীতি। যদি মিথ্যে বলে আমরা চোলাদের সৈন্য না পাঠাই তাহলে ওরা জিতবে কীভাবে? চোলাদের এই যুদ্ধে জেতা তো আমাদের পরিকল্পনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?'

'জি মহারাজ, আর বাড়তি সৈন্য ছাড়া চোলারা এই যুদ্ধ জেতা তো দূরের কথা, যুদ্ধ করতেই রাজি হবে না। দুপক্ষের সৈন্য সংখ্যায় একটা সমতা আনতে হবে না?'

'তা তো বটেই। কিন্তু আমরা সৈন্য আনবো কোথা থেকে?'

'দুশ্চিন্তা করবেন না মহারাজ। সৈন্য দেবো বলেছি, কিন্তু কবে দেবো, কীভাবে দেবো, তা তো আর বলিনি।'

সাতকর্ণী কিছুই বুঝতে পারলেন না, 'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

'মাথার ওপর আর চাপ দেবেন না মহারাজ। সবই আপনাকে বলবো। তবে এখন না। আপনার স্বাভাবিক কাজে তাহলে বিঘ্ন ঘটবে। এখন আপনি আমাকে বলুন, আপনার বিশেষ বাহিনী গঠনের কাজ কতটুকু এগোলো?'

'হ্যাঁ, তার প্রাথমিক কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। শারীরিক অবস্থায় সেই বাহিনী এখন প্রস্তুত। শস্ত্রশিক্ষাও শুরু হয়েছে। এখন তাদেরকে সর্বশস্ত্রবিশারদ করে গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে তাদেরকে অশ্ব আর হস্তীর পিঠে আরোহণে পারদর্শী করতে হবে। একেবারে শেষে দিতে হবে বুহ্য গঠনের বিদ্যা। তাহলেই এই বিশেষ বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠবে। তার জন্য আরো কিছুদিন সময় লাগবে। তবে আমার মনে হয় আমাদের ঠিক করে নেওয়া সময়ের আগেই তৈরি হয়ে যাবে এই বাহিনী।'

'জি মহারাজ। এই বিশেষ বাহিনীর নৈপুণ্যের ওপরে আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে।'

'বাহিনীর ব্যাপারটা আমি আর আমার সেনাপতিরা দেখছি। কিন্তু এবার আপনার ভূমিকা কী হবে গিরিধারী?'

'এখন আমার প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এবার শুরু হবে পরোক্ষ অবস্থান। এবার কাজ করবে কেবল দ্রুতগামী দূতেরা।

৩২

খড়্গপুর পর্যন্ত এসে কূল হারিয়ে ফেললো অসিত।

এদিকে এই নগর পেরিয়ে কখনো যায়নি সে। অঙ্গদকে নিয়ে খেলা দেখাতে গিয়ে পশ্চিমে এই নগর পর্যন্তই এসেছিল সে। এরপরের রাস্তা, গন্তব্য এবং যাতায়াতের উপায় সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।

নগরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে এখন। বাজার ভেঙ্গে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সূর্যের জোর কমে আসছে পশ্চিম আকাশে। লোকের এখন ঘরে ফেরার সময়। অসিতের ঘরে ফেরার উপায় নেই। তাকে যেতে হবে অনিশ্চিত পথে।

অঙ্গদকে নিয়ে এই নগরে এসেছিল খুব বেশিদিন হয়নি। আজ অঙ্গদ নেই। আর অঙ্গদের না থাকাই তার এবারের খড়্গপুর আসার কারণটাই বদলে দিয়েছে।

নগরের পশ্চিম দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিলো সে। এই রাস্তা ধরে একটু দূর যেতেই একটা নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলো সে। এটাই সিদ্ধি নদী। এই নদীর কথা সে নগরে এসে শুনেছিল। কখনো আসা হয়নি। নদীর ঘাট বেশ বড়ো। ঘাটে নানা রকমের আর আকারের বজরা বাঁধা আছে। ঘাটে কেবল বজরাই বাঁধার অনুমতি আছে। বাকি ছোটো রকমের নৌকাগুলোর জন্য সেই অনুমতি নেই। তাতে তাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। মাঝিরা যার যেখানে ইচ্ছে নৌকা ভিড়িয়ে ছোটো নোঙ্গর ডাঙ্গায় ফেলে রেখেছে। প্রতিদিন সিদ্ধি নদী দিয়ে অনেক লোক নানা কাজে এই খড়্গপুরে আসে। সারাদিনের কাজ শেষে এই নদী ধরেই আবার ফিরে যায়। সিদ্ধি নদী প্রস্থে তেমন বেশি না হলেও দৈর্ঘ্যে এবং গভীরতায় বিশাল।

ঘাটে বাঁধা বজরাগুলোর রমরমা অবস্থা দেখে ইতস্তত করতে লাগলো অসিত। সেদিকে এগোতে সাহস পেলো না। প্রত্যেক বজরাতেই অস্ত্রধারী বিশাল দেহের প্রহরী আছে। অস্ত্র হাতে থাকা মানুষকে অন্য মানুষ বিনা কারণেই ভয় পায়। বজরার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীদের বল্লমের ফলা এই পড়ন্ত আলোতেও বেশ চকচক করছে।

আর একটাই উপায় আছে সামনে। ঘাটের পাশে নদীর ধারে বেঁধে রাখা একটা ডিঙ্গির দিকে এগিয়ে গেল সে। এই নৌকার সামনে কোন প্রহরী নেই, থাকার প্রশ্নও ওঠে না। আপাত নিরীহ চেহারার এক লোক বসে বসে একমনে দাঁত পরিষ্কার করছে।

অসিত ধীরে ধীরে গিয়ে নৌকার সামনে দাঁড়ালো। কীভাবে কথা এগোবে তা মনে মনে ঠিক করে নিতে লাগলো সে। তবে তাকে কথা সাজিয়ে নেবার কষ্ট বেশিক্ষণ করতে হলো না। দাঁতের পরিচর্যা করতে থাকা লোকটা দর্শনে নিরীহ হলেও স্বভাবে নয়। নৌকার আশেপাশে অসিতের মতো একটা উটকো ঝামেলাকে সহ্য করতে পারলো না সে, রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলো, 'তোর এখানে কী রে? উঁকিঝুঁকি মারছিস কেন? নিশ্চয়ই চুরির মতলব। পিটিয়ে একেবারে পিঠের ছাল তুলে নেবো।'

অসিত রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। রীতিমতো কেঁপে উঠলো তার শরীর, 'আমিইইইই-ই চুরি করররররতে আসিনি।'

অসিতের তোতলামো আর ভয় পাওয়া দেখেও গলার স্বর এবং মনোভাবে কোন পরিবর্তন এলো না লোকটার, 'না বাবা, তুমি চুরি করতে আসো নাই। ষষ্ঠী পূজা করতে এসেছ। যাও, এখন ভাগো এখান থেকে।'

তাড়াতাড়ি সরে এলো অসিত। হাবেভাবে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে গড়াতে পারে। হয়তো দেখা যাবে শুধু কথা বলার অলসতা ত্যাগ করে লোকটা উঠে এসে অসিতের শরীরে নিজের কর্মদক্ষতার প্রমাণ দেবে।

অসিত সরে আসতেই একটু দূরের আরেকটা নৌকা থেকে একটা স্বর ভেসে এলো, 'এই এদিকে আয়। শুনে যা।'

অসিত ডাকের উৎসে তাকালো। একটা নৌকার আগায় বসে লোকটা তাকেই ডাকছে। এগিয়ে গেল সে।

'তোকে তো আমার চেনা চেনা লাগছে।' লোকটা ভ্রু কুঁচকালো। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে, 'এই তো মনে পড়েছে। কয়েকদিন আগে তুই খড়গপুর বাজারে বানরের খেলা দেখিয়েছিলি। বেশ সুন্দর তোর খেলা। রঙ্গিন বানরের খেলা। তুই একা কেন? তোর বানর কোথায়?'

অসিত সত্যি কথা বলল না, 'বানর আমার সাথে নেই।'

'বানর গেল কই?'

'বাড়িতে আছে। আমার ভাই খেলা দেখাচ্ছে।'

'এখানে কেন এসেছিস?'

'আমি পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে যাবো। ওখানে আমার একটা কাজ আছে। এখানে এসেছি ওখানে যাবার জন্য নৌকা ঠিক করতে।'

অবাক হলো মাঝি। কথাটা অবাক হবারই মতো। অবশ্য এখন অনেকেই ভাগ্যের খোঁজে পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে যাচ্ছে।

'কী বললি? কোথায় যাবি? পশ্চিম সমুদ্রে? সেখানে কি আর আমাদের এসব ছোটো ছোটো নৌকা যায় রে। সেখানে বড়ো বড়ো বণিকদের বড়ো বড়ো জাহাজ যায়। নৌকা পাবি না। তবে নৌকায় করে খানিকটা পথ যেতে পারবি। তারপরে হেঁটেও যাওয়া যায়, নৌকায়ও যাওয়া যায়।'

'এই নৌকাতে করে কি যাওয়া যাবে? যতটুকু যাওয়া যায় পশ্চিমে।'

'আমাদের এই নৌকায় যেতে পারবি না। এগুলো সব মালিকানার নৌকা। মালিকের মাল বয়। ভাড়ায় মানুষ নেয় না। নৌকা ভাড়া করতে হলে ঘাটের ঐদিকে যা।' একদিকে আঙ্গুল তুললো মাঝি, 'দেখছিস না, কতগুলো লম্বামতন নৌকা আছে। সেগুলো লোকজনকে ভাড়ায় নিয়ে যায়।'

'আচ্ছা।' লম্বামতন নৌকার দিকে এগোল অসিত।

লম্বামতন নৌকাগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালো সে। অনেক নৌকা আছে। নৌকাগুলো বেশ ছিমছাম। সামনে আর পেছনে দাঁড় বাওয়ার জায়গা। খোলের ওপর সারি সারি পাটাতন বসানো। সেখানে লোকের বসার সুবিধার জন্য চাটাইও বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

অসিত আশেপাশে তাকালো। নৌকাগুলো পাড়ের সাথে বাঁধা। মাঝিদের কাউকে আশেপাশে দেখা গেল না। একটা নৌকার সামনে বসে পড়লো সে। নৌকা যেহেতু বাঁধা আছে মাঝি একসময় না একসময় আসবেই।

এই নৌকাগুলোর মাঝিদের সারাদিন তেমন একটা কাজ থাকে না। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আখড়া। সকালে লোকজনকে নিয়ে আসার পর তারা নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে রাখে। নৌকায় সারাদিন বসে থাকার মতো বিরক্তিকর কাজটা না করে তারা চলে যায় খড়গপুর বাজারে। নৌকায় এমন কিছু থাকে না যেটা পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। খড়গপুরে ভালো খাবার, নেশা আর নানাবিধ বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। আর কিছু না হোক একটা আড্ডা আর কয়েক ভাড় ভাঙের শরবত বেশ কমদামেই পাওয়া যায়। আর এতেই সারাদিন বেশ ভালোই কাটে।

আধবুড়ো এক মাঝি নিজের ভাগের শরবত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলেছে নাকি আড্ডা তার কাছে বিরক্তিকর লাগছিল তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে তাকে আসতে দেখা গেল নৌকাগুলোর দিকে। বসে থাকলে এমনিতেই ঝিমুনি আসে, অসিতেরও এসেছিল, লোকটার ডাকে ভাঙলো।

'এখানে শুধু শুধু বসে আছিস কেন? খড়গপুরে যা, বাজারে যা। জগতের সব মজা সেখানে।' বুড়ো এখনো টলছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার।

'আমার খড়গপুরে কোন কাজ নেই। আমি পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে যাবো। শুনেছি এখান থেকে সেখানে যাবার নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। তাই বসে আছি।' অসিত বেশ স্পষ্ট করে বলে। নইলে মাতালের কানে কথা ঢোকানো মুশকিল।

মাঝি ঠিক বুঝতে পারে না, 'কোথায় যাবি বললি তুই?'

'পশ্চিমের সমুদ্র বন্দর।'

নদী থেকে এক আজলা জল তুলে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলো মাঝি। ভাঙের শরবতের নেশা একটু হলেও কাটলো, 'তুই পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে যাবি? এই নৌকায়?'

'হ্যাঁ।'

এবার হো হো করে হেসে উঠলো মাঝি, 'তোর কোন ধারণা আছে পশ্চিমের সমুদ্র বন্দর সম্পর্কে? জানিস সেটা কতদূর?'

'না, আমি জানি না। আমার কোন ধারণা নাই।'

'এখানের হাতে গোণা কিছু লোক আছে যারা জীবনে দুই-এক বার ওদিকে গেছে। সেখানে বড়ো বড়ো বণিকেরা যায়।'

এই কথা আগেও শুনেছে অসিত। সেই আলোচনায় সে গেল না। সোজা কথায় ফিরে এলো সে, 'তোমাদের নৌকা যাবে না সেখানে?'

'না, আমাদের নৌকা এতদূরে যাবে না।'

'কতদূর পর্যন্ত যাবে?'

'সন্ধ্যার দিকে রওনা দেবো আমরা। প্রথমে যাবো সীতাপুর। তারপর ভোর নাগাদ পৌছবে জয়নগর। এরপর সিদ্ধি নদীতে অনেক চর জেগেছে। আর আমাদের নৌকা যাবে না। তুই যদি যেতে চাস তাহলে জয়নগর পর্যন্ত যেতে পারিস।'

'তাহলে আমি পশ্চিমের বন্দরে যাবো কীভাবে?'

'তুই যদি আমার কথা ধরিস, তাহলে এই নৌকায় উঠে পড়। সন্ধ্যার পরে ছাড়বে নৌকা। জয়নগর অনেক বড়ো নগর। শুনেছি সেখানকার বেশ কিছু বড়ো বণিক পশ্চিমের বন্দরে যায়। সেই বন্দরের নাম সোপারা। বেশ বড়ো বন্দর। অনেক বড়ো বড়ো জাহাজ। বিদেশি বণিকেরাও আসে।'

অসিত একমনে গিলছে মাঝির বর্ণনা।

'তারপর শোন, সেখানের বণিকেরা অনেকে স্থলপথেও সোপারা যায়। তুই জলে অথবা স্থলে এক বণিক দলের সাথে ভিড়ে গেলেই হলো। পৌঁছে যাবি পশ্চিমের বন্দরে। বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

নৌকায় উঠে বসলো অসিত, 'নৌকা ঠিক কখন ছাড়বে।'

'যখন যাদেরকে নিয়ে এসেছি তাদের কাজ শেষ হবে। ও সন্ধ্যার আগে হবে না। তুই ভালো করে একটা কোণায় গিয়ে বস। সারারাত থাকতে হবে। একটা হেলান দেবার জায়গা যদি পাস তাহলে ঘুমাতে সুবিধা হবে।'

অসিত মাঝির কথা অনুযায়ী একটা কোণের দিকে এগোতে গেল। তখন মাঝির মনে পড়ে গেল সব চাইতে আবশ্যিক কথাটা। মনে হতেই অসিতের হাত আঁকড়ে ধরলো সে, 'তোকে আগেই বলে রাখি, আমাদের নৌকায় সীতাপুরের ভাড়া দুই মুদ্রা আর জয়নগরের ভাড়া চার মুদ্রা। তোর কাছে যদি পয়সা না থাকে তাহলে নেমে যা। কড়ি বিনে পার করার কোন ব্যবস্থা নেই। পরে পয়সা না দিতে পারলে কিন্তু শক্ত মার দেবো।'

'পয়সা আছে আমার কাছে।'

'আচ্ছা, তাহলে তো হয়েই গেল। একটা কোণায় গিয়ে এবার চুপ করে বসে থাক।'

অসিত এক কোণায় বসে পড়লো। মাঝি এবার চুপ করেছে। মনে হয় টুটে যাওয়া নেশাটা আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। নদীর ঝিরঝিরে বাতাস আর মৃদু দুলুনিতে অসিতের নিজেরও একটু আগে আসা ঝিমুনিটা আবার ফিরে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে সে ঝিমুনি রূপ নিলো নিঝুম নিদ্রায়।

তার ঘুম যখন ভাঙ্গল ততক্ষণে চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। নৌকা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে সিন্ধির বুক চিরে। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ধাতস্থ হতে একটু সময় নিলো অসিত। তারপর তার সব মনে পড়লো। সে এখন নৌকায় করে পশ্চিমের দিকে যাচ্ছে। আজ সারারাত নৌকায় কাটাতে হবে।

চোখ কচলাতে কচলাতে নৌকার চারপাশে এবার নজর বোলাল সে। নৌকা লোকে লোকারণ্য। কোনো জায়গা খালি নেই। এরা সবাই সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত। প্রায় সবাইই ঝিমুচ্ছে অথবা ঘুমাচ্ছে। শুধু দুজন মাঝির শরীরে কোনো ক্লান্তি নেই। একটানা দাঁড় বেয়ে চলেছে। একটু তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বুজল অসিত। ঘুম আসতে বেশি সময় লাগলো না।

সীতাপুর নৌকা থামলো ঠিক মাঝরাতে। এখানে বেশ কিছু লোক পয়সা দিয়ে নেমে গেল। মাঝিদের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙ্গেছে সবার। সেই নৌকা থামার পরে কারো পেটে কিছু পড়েনি। এই মাঝরাতেও সীতাপুরের ঘাটে বেশ কিছু দোকানে বাতি

জ্বালিয়ে খোলা রাখা হয়েছে। সেগুলো থেকেই লোকে নানা জিনিস কিনে খেলো। অসিতের কিছুই খেতে ইচ্ছে করলো না। সে নৌকায় বসে রইলো।

একেবারে ভোরে জয়নগরের ঘাটে নৌকা ভিড়লো। অসিতকে জাগালো মাঝি, 'ওঠো। জয়নগর চলে এসেছে। এরপরে আর নৌকা যাবে না। এখন চার মুদ্রা দিয়ে তাড়াতাড়ি নামো।'

থলির ভেতর থেকে অতি সাবধানে চারটা মুদ্রা বের করে আনলো অসিত, 'এটাই জয়নগরের ঘাট?'

'হ্যাঁ, এটাই জয়নগর।'

'পশ্চিমে যেসব ব্যবসায়ীরা যায় তাদেরকে কোথায় পাবো?'

'এখন এই ভোরে তাদেরকে কোথায় পাবি? সব এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। তুই এখন এই ঘাটেই বসে থাক। বেলা হলে এই পথে নগরের ভেতরে গেলেই ব্যবসায়ীদের দেখা পেয়ে যাবি।'

নৌকা থেকে নেমে পড়লো অসিত। নদীর জলে অনেকটা সময় নিয়ে হাতমুখ ধুলো সে। জয়নগরের নগর জেগে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

ক্ষিধেটা থেকে থেকে জানান দিচ্ছে। শরীরের অলসতার জন্য মাঝরাতে খায়নি সে। তবে তা উচিত হয়নি। খেয়ে নেওয়া দরকার ছিল। এখন খাবার কোথায় পাওয়া যাবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

জয়নগর বেশ বড়ো নগর। এখানে বাণিজ্যের জন্য সপ্তাহের বিশেষ একদিন অথবা দুদিন ঠিক করা নেই। প্রতিদিনই এখানে জমজমাট অবস্থা। সকালের প্রথম প্রহর পেরোবার আগেই জয়নগর বেশ ভালো করেই জেগে উঠলো।

অসিত ঘাট থেকে প্রবেশ করলো নগরে। খুব বেশি হাঁটতে হলো না। এত ভিড়, চাকচিক্য আগে কখনো দেখেনি সে। ক্ষণিকের জন্য তার উদ্দেশ্য মাথা থেকে উধাও হয়ে গেল। খড়গপুর এই নগরের কাছে কিছুই না।

লোকজন সব নিজের কাজে ব্যস্ত। অসিত সব ভুলে মানুষের ব্যস্ততা দেখতে লাগলো। একটু পরেই অবশ্য নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হলো সে। কিন্তু এই বিশাল বণিক নগরে তার কথা শোনার মতো কি কেউ আছে? কেউ কি তাকে সাহায্য করবে? তথ্য জানার জন্য অলস লোকই সবচেয়ে ভালো উৎস। তবে তেমন কাউকে এখানে দেখা যাচ্ছে না।

তবে অকর্মণ্য লোক পৃথিবীর সব জায়গাতেই থাকে। এখানে একটু কম আছে, তবু খুঁজতে খুঁজতে অসিত তেমন একজনকে ঠিকই পেয়ে গেল। এমন একজন একটা ঘরের বারান্দার একটা কোণায় বসে বসে লোকের কাজকর্ম দেখছিল। তার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'এখানে পশ্চিমের ব্যবসায়ীদের কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

লোকটা অসিতের দিকে বিরক্তমুখে তাকালো। এই প্রশ্ন শুনে শুনে সে অভ্যস্ত। এখন সবাই পশ্চিমে যেতে চায়। সেখানে গেলেই ভাগ্য ফেরে। পুরো আর্যাবর্ত মনে হচ্ছে শেষমেশ সমুদ্রে গিয়েই ডুববে।

'ওদিকে শেঠির আখড়া আছে। ঐ যে লাল দরজাটা দেখা যাচ্ছে সেখানে। ওখানে গেলেই লোক পেয়ে যাবে। শেঠি ব্যাবসা করে পশ্চিমে।'

অসিত আর অপেক্ষা করলো না। গিয়ে দাঁড়ালো লাল দরজার সামনে। বিশাল দরজা। ঢোকা তো দূর, এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেই ইতস্তত লাগে।

শেঠি দাঁড়িয়েছিলেন দরজার ঠিক সামনেই। অসিতকে খেয়াল করলেন তিনি। ছেলেটা কে, কী করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এগিয়ে এলেন তিনি,

'এই তুমি কে? এখানে উঁকিঝুঁকি মারছো কেন?'

অসিত হকচকিয়ে গেল। কী বলতে হবে ঠিক বুঝতে পারলো না। তারপর হরবরিয়ে বলল, 'আমি শেঠির সাথে দেখা করতে এসেছি। যিনি পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে ব্যাবসা করেন।'

'আমিই শেঠি। বলো এবার, আমার সাথে কেন তোমার দেখা করা দরকার?'

অসিত প্রণাম করলো, 'আমাকে যে করেই হোক পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে যেতেই হবে।'

শেঠির চোখেমুখে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো, 'শুধু তোমারই না ছোকরা, অনেকেরই এখন শখ হয়েছে পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে যাবার। সবাই ভাবছে, ওটা একটা মৌচাক। জগতের সমস্ত মধু আছে সেখানে। তা পশ্চিমের সমুদ্রে তো অনেক বন্দর আছে। বারিগাজা, সোপারা, কল্যাণ, মুঝিরিস। তোর কোন বন্দরে যেতে হবেই?'

অসিত ভয় পেয়ে গেল। শেঠির চেহারা কেমন যেন মারমুখী। ভয়ের সাথে সাথে ধন্ধেও পড়ে গেল সে। সবাই বলেছে রাহু পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে গেছে। সে স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছিল পশ্চিমের সমুদ্রে একটাই বন্দর। সেখানেই তাকে যেতে হবে। এখন তো হিসেব পুরো উল্টে গেছে। এত এত বন্দর। সে এখন কোথায় যাবে?

শেঠি অসিতকে নীরব থাকতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলেন, 'বুঝেছি। কিছুই জানো না। জানো খালি পশ্চিমে যেতে হবে। তার মানে আপাতত যে-কোনো একটাতে গেলেই হলো। শোনো, আজ আমার একটা নৌকা গোদাবরীর ঘাট থেকে রওনা দেবে রাজধানী প্রতিষ্ঠানার দিকে। ওখানে আমার জিনিস নামবে। ঐ নৌকায় কিছু লোক আছে যারা প্রতিষ্ঠানা পেরিয়ে সোপারায় যাবে। জায়গাটা বেশ দূরে। প্রতিষ্ঠানা থেকে প্রথমে যেতে হবে কালু নদী। তারপর সেখান থেকে উল্লাস নদী হয়ে ভাসাই খাড়ি। সেখানেই আছে সাতবাহন রাজ্যের প্রধান বন্দর, সোপারা। আমি বলি কি তুমি সেখানেই চলে যাও। যা করতে যাচ্ছো ওখানেই করতে পারবে।'

ভেবে কূল পাচ্ছে না অসিত। অবশেষে বুঝতে পারলো এখন তার সামনে আর কোনো উপায় নেই। রাহু কোন বন্দরে গেছে তা সে জানে না। ওদের সাথে গেলে অন্তত পশ্চিম সমুদ্রে তো পৌছানো যাবে। সিদ্ধান্ত নিলো সে,

'আমি যাবো ঐ দলের সাথে। আপনি একটু সাহায্য করবেন?'

'অবশ্যই করবো। দল ভারী হলে আমারই লাভ। আর দেরি করা চলবে না। চলে এসো আমার সাথে।'

অসিতকে নিয়ে নিজের আখড়ার পেছন দিকে হাঁটা শুরু করলেন শেঠি, 'আগেই বলে রাখছি, আমার নৌকাতে যাবি ঠিক আছে। কিন্তু মুফতে যেতে পারবি না। কাজ করতে হবে। আমার কর্মী হিসেবে যাবি, খাবার পাবি। একসময় ঠিক পৌছে যাবি সোপারা।'

'আমি কাজ করবো।'

দলের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। দলের কয়েকজনের সাথে অসিতকে পরিচয় করিয়ে দিলেন শেঠি। অসিতকে কাজও বুঝিয়ে দেওয়া হলো সাথে সাথে। কাজটা নেহাত সহজ নয়। তার কাঁধে চাপলো মস্ত এক বোঝা। জয়নগর থেকে গোদাবরী নদীর ঘাটের দূরত্ব নেহাত কম নয়। চার ক্রোশের মতো হবে।

রওনা দিলো দলটা। সবার সাথেই মস্ত বোঝা আছে। দলের গতি ধীর। সমস্ত দিনে চলতে হলো ওদেরকে। তারপর রাত্রিবেলা তাবু ফেলে বিশ্রাম। ঘাট পর্যন্ত যেতে পরদিন দুপুর পর্যন্ত চলতে হলো তাদেরকে। সবারই জিভ প্রায় বেড়িয়ে গেছে। অসিতের মনে হচ্ছে তার পিঠের হাড় আর কোনোদিন সোজা হবে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারার পর গোদাবরী থেকে ছাড়লো শেঠির বজরা। এত বড়ো নৌকা আগে কখনো দেখেনি অসিত। গোদাবরীর মতো এত বড়ো নদীও আগে কখনো দেখা হয়নি তার। স্রোতস্বিনী গোদাবরীর বুক চিরে এগিয়ে চলেছে নৌকা। নদীর দুই দিকে কত রকমের দৃশ্য। কত নগর, কত গ্রাম পেরিয়ে যেতে লাগলো।

মাল বয়ে নেওয়ার কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। তবে পুরোপুরি কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছে তা বলা যাবে না। ছোটোখাটো ফরমায়েশ খাটতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তাকে লাগিয়ে দেওয়া হলো দাঁড় টানাতে। কেউ জিজ্ঞেসও করলো না সে দাঁড় টানতে পারে কি না।

প্রথমে বেশ কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে ছন্দটা বুঝে নিলো সে। তারপর পেরিয়ে গেছে কত ক্রোশ রাস্তা তার কোনো হিসেব নেই। সাত দিন সাত রাত প্রায় অবিশ্রান্ত চলে ওরা অবশেষে পৌঁছল সাতবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠানায়। এর মধ্যে শুধু খাবার আর জল জোগাড়ের সময় ছাড়া বজরা থামেনি।

প্রতিষ্ঠানার পর গোদাবরী নদী দিয়ে আর যাওয়া যাবে না। এরপর গোদাবরী নদী চলে গেছে নাসিকের দিকে। বজরা থেকে সব মালামাল নামিয়ে নেওয়া হলো। এদের অধিকাংশ লোকেই প্রতিষ্ঠানায় থাকবে। সোপারা যাবে অল্প কয়েকজন।

সেই কয়েকজনের মধ্যে একজন তার দশাসই চেহারা আর বাজখাই গলার জোরে নেতা বনে গেল, 'শোনো সবাই। কালু নদী পর্যন্ত আমাদের হেঁটে যেতে হবে। প্রতিষ্ঠানা সাতবাহনের নতুন রাজধানী। এদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনো ভালো হয়নি। পথে চোর ডাকাতের আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তবে তোমাদের কোনো ভয় নেই, কালু নদী পর্যন্ত আমি পথটা খুব ভালো করেই চিনি। তোমাদের কোনো বিপদ হবে না। তবে কখনো যদি বিপদ আসে, তাহলে আমরা সবাই একসাথে থাকবো, কেউ পালাবো না। ঠিক আছে?'

সবাই সায় দিলো।

'তাহলে এখনই খাওয়াদাওয়া করে আমরা যাত্রা করবো কালু নদীর দিকে। দেরি করে লাভ নেই। সোপারায় যে আগে পৌঁছবে তার ভাগ্যই আগে খুলবে।'

৩৩

চেরা আর চোলা রাজ্যের সীমান্ত নগরী মহেন্দ্রগড়। আকারে ছোটো হলেও চোলা রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় এর গুরুত্ব অনেক। পশ্চিম দিক থেকে কেউ আক্রমণ করলে এই নগরের সেনারাই প্রথম ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। নগরের সৈন্য সংখ্যাও খুব বেশি না। তবে দেওয়াল আর দুর্গ দুর্ভেদ্য।

আগের থেকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা এখন বলতে গেলে বেশ শান্তই। এখন সবাই নিজেকে নিয়ে থাকে। আগের অবস্থা এমন ছিল না। আগের রাজারা উত্তেজনায় সবসময় টগবগ করে ফুটতেন। কোনো কারণ দরকার ছিল না তাদের। শুধু পেশি শক্তি প্রদর্শন এবং আপন সৈন্যবল পরীক্ষার জন্য তারা পাশের রাজ্য আক্রমণ করে বসতেন। বিচিত্র খেয়াল ছিল তাদের। মদিরা আর মক্ষীতে মজে থাকতেন তারা। তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এসব তাদের আর ভালো লাগতো না। বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেনাপতিকে বলতেন, 'সেনা তৈরি করো। দূত পাঠাও এই রাজার কাছে। আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো।'

এখন তাদের বংশধরদের রক্ত যথেষ্ট ঠান্ডা হয়েছে। অনেকে বলে বিক্রম কমে গেছে। তা হতে পারে, হয়তো সেটা কমেছে তবে সেই সাথে বিবেচনা যে অনেকগুণ বেড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহেন্দ্রগড় নগরী রক্ষা এবং পরিচালনার দায়িত্বে আছেন আদাভান। তিনি বলতে গেলে অনেকদিন ধরেই এখানে আছেন। দায়িত্ব পালনে তাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এর মধ্যে রাজধানীতে কত কিছু ঘটে গেছে। মহারাজ মারা গেছেন, কিশোর রাজা কারিকালার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ সিংহাসন দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহী মন্ত্রীদল। তবে তারা টিকতে পারেনি। মহারাজের পুত্র কারিকালা নিজের কাকা ইরামের সহায়তায় আবার মন্ত্রীদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। সেই খবরও তার কাছে এসে পৌছেছে।

বলতে গেলে রাজধানীর অবস্থা অত ভালো নয়। তবে সীমান্ত নগরীতে সেই অবস্থার আঁচ তেমন একটা লাগেনি। মন্ত্রীমণ্ডল এখন লাপাত্তা। তবে আদাভানের রক্তে রাজভক্তির কোনো কমতি কখনোই ছিল না। এই ঝড়ের সময়ে যদি তাকে কোনো পক্ষ বেছে নিতে হতো তাহলে তিনি যে নির্দ্বিধায় কারিকালার পক্ষে থাকতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনি তার বংশে একমাত্র মহেন্দ্রগড়ের রক্ষক নন। তার পূর্বপুরুষেরাও এই কাজেই ন্যস্ত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে সেই ছোটোবেলা থেকে এই নগরীর কত গল্প বংশানুক্রমে শুনেছেন তিনি। একটা সময় ছিল যখন শত শত প্রহরী এই দেওয়াল পাহারা দিতো। রাতদিন তীর ধনুকে জুড়ে রেখে শ্যেন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতো তীরন্দাজেরা। তাদের দৃষ্টি গলে একটা পতঙ্গও প্রবেশ করতে পারতো না চোলায়। মহেন্দ্রগড় নিয়ে গর্ব করতেন চোলা রাজারা।

আজ কোথায় সেই দিন? যদিও ভালোই হয়েছে। সবসময় ওরকম প্রস্তুত থাকলে মনে শান্তি আসে না। এরচেয়ে নির্ভেজাল জীবনই ভালো।

একা দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে সেসবই চিন্তা করছেন আদাভান। ক্ষত্রিয়রা এখন সবাই বৈশ্য হয়ে গেছে। অতর্কিতে এখন আর কেউ আক্রমণ করে না। আক্রমণ তো দূরের কথা, আক্রমণের আভাসও দেয় না, অন্য রাজ্যের সীমান্ত রেকিও করে না। এখন তার কাছে শত শত সৈন্য তো দূরের কথা, আছে মাত্র বাইশ জন সৈন্য। এদের অনেকেই আবার পরিবার নিয়ে থাকে মহেন্দ্রগড়ে। যুদ্ধের কাজ বাদে সব কাজই নিয়মিত করছে তারা। সকালে খাবার জোগাড় করছে, কৃষি কাজ করছে, বনে গিয়ে কাঠ আনছে। এরা যেন একপ্রকার ভুলেই গেছে, তারা ক্ষত্রিয় আর এই নগরী তাদের বাসের জায়গা না, বরং এই নগরীকে রক্ষার জন্যই তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে।

টিমটিম করে জ্বলা লণ্ঠনের সামনে বসে আছেন আদাভান। প্রাচীরের ওপরে আছেন এখন তিনি। এখান থেকে অনেকটা জায়গার ওপর নজর রাখা যায়। এখন তার সাথে আর কেউ নেই। তিনি একাই নজর রেখে চলেছেন।

হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে তার সারা শরীরে। অন্ধকারের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকান তিনি। আজ অন্ধকার তার পরিচিত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আজ রাতটা অন্য পাঁচটা রাতের মতো হবে না। মন অস্থির, অশান্ত হয়ে আছে। অস্থিরতার মাত্রাটা ক্রমেই বাড়ছে। আরও উদ্বেগের ব্যাপার হচ্ছে এমন অনুভূতি কেন হচ্ছে তার কোনো যুতসই কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মনের এমন অনুভূতিকে পাত্তা না দেবার মতো বোকা নন তিনি।

উঁচু প্রাচীরের ওপর থেকে সামনের অন্ধকারের দিকে আরেকবার মনোযোগ দিয়ে চোখ বোলালেন তিনি। রাতের আঁধার আজ অনেক ঘন হয়ে আছে যেন। না, কিছু একটা আছে। ব্যাপারটা আর কিছুক্ষণ পরেই শুধু তার চিন্তাতে সীমাবদ্ধ থাকলো না। নৈশব্দের জাল ভেদ করে একটা ক্ষীণ শব্দ যেন তার কানে এসে পৌঁছল। শব্দটা চিনতে পারলেন তিনি। না, কোনো ভুল নেই, পদশব্দ। বহুদিনের অনভ্যাস তার ক্ষত্রিয় সতর্ক দৃষ্টি আর কানের ক্ষমতা কমিয়ে দিলেও পুরোপুরি নিঃশেষ করতে পারেনি।

এই রাতের বেলা কোনো রকম আলো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে একটাই কেউ অথবা কারা এগিয়ে আসছে মহেন্দ্রগড়ের দিকে। আর ব্যাপারটা তারা গোপন রাখতে চাচ্ছে। তার মানেও একটাই হতে পারে। মহেন্দ্রগড়ের ওপর হামলা হতে যাচ্ছে।

নিমেষে চঞ্চল হয়ে উঠলো আদাভানের মস্তিষ্ক। এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমেই সবগুলো প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিতে হবে। এমনিতেও সন্ধ্যাবেলায় নিয়ম করে সব দ্বার বন্ধ করার নিয়ম থাকলেও উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ায় সতর্কতায় ঢিল পড়েছে। তাই এখন সবগুলো দরজা বন্ধ নেই।

প্রাচীরের উঁচু জায়গায় বড়ো শিঙ্গা রাখা আছে। অনেকদিন ব্যবহার না হওয়ায় ধুলো পড়েছে। সেই শিঙ্গায় যুদ্ধসুর বাজালেন তিনি। নগরীর লোকজন প্রথমে বুঝতে পারলো না এই সুরের গুরুত্ব। তবে দ্বিতীয় বার বাজতেই সেই সুর যেন একেবারে

তাদের বুকে এসে বিঁধল। সেই বাইশ জন সৈন্য যার যার কাজ আর আশ্রয় ছেড়ে বেড়িয়ে এলো প্রাঙ্গনে।

প্রাচীরের ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলেন আদাভান, 'তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রগড়ের সব দরজা বন্ধ করে দাও। সবাই একসাথে হাত লাগাও।'

সেনাপতির কণ্ঠে এমন আকুতি অনেকদিন শোনেনি তারা। এবার ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল তাদের মাঝে। সদর দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি তারা ছুটল অস্ত্রাগারের দিকে। সেই দরজা অনেকদিন না খোলাতে একেবারে এঁটে আছে। অনেক কসরত করে সেই দরজা খুলতে হলো। সেখানে যার যার ধুলোময় অস্ত্র আর সাজসজ্জার খোঁজে লেগে পড়লো তারা। সেগুলো খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হলো। তাতে নষ্ট হয়ে গেল বেশ খানিকটা মূল্যবান সময়।

আদাভান প্রাচীরের ওপর থেকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। পদশব্দ এখন অনেকটাই স্পষ্ট। তিনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছেন। শত্রুপক্ষ থেকে তীর ছুটে আসতে পারে। পদশব্দের রকমে ছন্দ আছে। এলোমেলো নয়। যদিও এখনো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যাচ্ছে এটা সৈনিকদেরই পায়ের আওয়াজ।

আদাভান প্রথমে লুটেরাদের কথা ভেবেছিলেন। হতে পারে কোনো দস্যুদল মহেন্দ্রগড়ে কম সৈন্য থাকার সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করতে চাইছে। কিন্তু এখন সে ধারণা ত্যাগ করলেন তিনি। লুটেরাদের চলাচলে এত ছন্দ থাকার কথা না। এত ধীর ভাবে জানান দিয়ে তারা আসে না। ঝড়ের মতো আসবে, ফাঁকফোকর পেলে ঢুকে পড়বে আর সব লুট করে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু, এটা সাধারণ লুটেরাদের লক্ষণ নয়। নিশ্চয়ই কোনো প্রশিক্ষিত সেনাদল ক্রমশ এগিয়ে আসছে মহেন্দ্রগড়ের দিকে।

অল্পক্ষন পরেই তার ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। রাতের আঁধারের মাঝে হুট করেই কতগুলো মশাল জ্বলে উঠলো। এতক্ষণ কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। মশালগুলো জ্বলে উঠতেই স্তম্ভিত আদাভান দেখলেন তার সামনে প্রায় চারশো সৈন্যের এক সুসজ্জিত সেনাদল দাঁড়িয়ে আছে। তারা চতুরঙ্গে সেজে আছে। হাতি, ঘোড়া, রথ সবই আছে তাদের সাথে। অস্ত্রশস্ত্রও কম নেই। সব প্রকারেরই আছে। এই বাহিনীকে আটকে দেওয়া দূরে থাক, সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই তার বাহিনীর নেই। এটা একেবারেই অসম লড়াই। এখন একমাত্র ভরসা মহেন্দ্রগড়ের দেওয়াল। দেওয়াল ভাঙ্গার জিনিসপত্র অথবা পাথর ছোঁড়ার কল তাদের কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

এগিয়ে আসতে থাকা সেনাদল নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে থেমে গেল। ততক্ষণে আদাভানের সেনাদল তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যে যা পেরেছে এবং পেয়েছে তাই নিয়ে এসেছে। তাদের সবার চক্ষু চড়কগাছ। এ আবার কী বিপদ।

মন শক্ত করে বাইশজনের সামনে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন আদাভান। সামনের সেনাদলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে আগে।

সেনাদল থেকে দুটো ঘোড়া এগিয়ে এলো। তাদের সাথে একটা মশাল। হাত তুলে একজনকে তীর ধনুক তৈরি রাখার সংকেত দিলেন আদাভান। আদেশ পালিত হলো সাথে সাথে। দুই ঘোড়সওয়ারই এখন তিরন্দাজদের তীরের লক্ষ্যে আছে।

দেওয়াল ঘেঁষা পরিখার পারে এসে দাঁড়ালো দুটো ঘোড়া। দুই ঘোড়সওয়ারের একজন নেমে এলো ঘোড়া থেকে। মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে দেওয়ালের ওপরের দিকে তাকালো, 'তোমাদের এই নগরীর দুর্গের সর্দার আদাভানকে খবর দাও। আমি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

স্বরটা স্পষ্ট এবং জোরালো। আদাভান উত্তর দিলেন, 'আমিই মহেন্দ্রগড়ের রক্ষক আদাভান। এবার নিজের পরিচয় দাও। আর সেই সাথে এটাও বলো, মহেন্দ্রগড়ের সীমানায় সেনা প্রবেশ করানোর সাহস তোমাদের হলো কী করে? কী উদ্দেশ্যে এমন গর্হিত কাজ করেছো তোমরা?'

'আদাভান। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমার পরিচয় একটু পরেই জানলাম। তবে আপনি যেহেতু ক্ষত্রিয় বীর তাহলে এটা তো অবশ্যই জানবেন, গর্হিত, নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করাই ক্ষত্রিয়ের কাজ, বীর যোদ্ধার কাজ। শক্তিশালী যদি সবসময় নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে তবে তো শক্তির এবং বীর্যের অপমান হয়। আমাদের অভিপ্রায় তো আপনার না জানার কথা নয়। এত বড়ো সেনা নিয়ে তো আমরা নেহাত মৃগয়া অথবা বিহারে বেরোয়নি। অবশ্যই যুদ্ধ করার ইচ্ছেতেই বেরিয়েছি। এটাই আমাদের ইচ্ছে।'

'যুদ্ধ করতে এসে থাকলে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। তবে এটা তো জানেন যুদ্ধ শুরু হবে সকালে। তখন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করাই ভালো হবে। রাত্রিকালে যুদ্ধ করা দস্যুবৃত্তি, নিয়ম বিরুদ্ধ। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

এবার উত্তরে হাসির শব্দ আগে ভেসে এলো তারপর কথা, 'আদাভান, আমি তো এর মধ্যেই আপনাকে একবার বলেছি, শক্তিমান নিয়মের ধার ধারে না। আর আরেকটা কথা এতক্ষণ জানাইনি, জানিয়ে রাখি, শক্তিমানের ধৈর্যও কম থাকে। তাই অবশ্যই সকাল পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো না। রাতেই যুদ্ধ হবে। একটু পরেই আক্রমণ শুরু করবো আমরা।'

'যুদ্ধের পরিপন্থী কাজ যদি তোমরা করো, তাহলে অবশ্যই উত্তর দেবো আমরা। তবে তখন আর তোমাদের যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করবো না। তোমরা তখন হয়ে যাবে দস্যু। তবে একটা কথা জেনে রেখো, আমার এই দেহে প্রাণ থাকতে মহেন্দ্রগড়ের মাটিতে একজন বহিরাগতের পাও পড়তে দেবো না। এটা নিশ্চিত।'

'দেখা যাক, ভবিষ্যতের কথা কেইবা বলতে পারে।'

'হ্যাঁ, ভবিষ্যতের কথা কেউই বলতে পারে না। তবে কর্ম বলে একটা কথা আছে। বর্তমানে যে অধর্ম করে ভবিষ্যতে তার কিছুতেই ভালো ফল লাভ হয় না।'

'রাজনীতিতে ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু নেই আদাভান। আপনি পুরানো লোক। আপনার তো কূটনীতির এসব ব্যাপার জানা থাকার কথা। অবশ্য সারা জীবন ছিলেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, রাজনীতির কথা আপনার মাথায় নাও ঢুকতে পারে।'

'যে কথায় ধর্ম-অধর্মের বিচার থাকে না, সেই কথা মাথায় না ঢোকাই ভালো। তাহলেই অন্তত শুদ্ধ চিত্তে চিতায় ওঠা যাবে। কথার বাণ যথেষ্ট চালিয়েছ। তোমাদের সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। যা করতে এসেছ তাই করো।'

নিচের ঘোড়সওয়ার জায়গা থেকে নড়ল না। আদাভান এবার বিদ্রুপের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমার কাছে কোনো প্রার্থনা আছে না-কি? কোনো সাহায্য লাগলে দেরি কোরো না, বলে ফেলো। আমাদের দুয়ারে যে দাঁড়ায় আমরা তার পরিচয় দেখি না। সে শত্রু হোক, অথবা মিত্র আমরা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। বলো, কী লাগবে?'

'না আদাভান, আমাদের কোনো সাহায্যের যাচঞা নেই। আমার মাথায় আসলে একটা নতুন বুদ্ধি এসেছে। এতেও পরিস্থিতি সামলানো যাবে।'

'তাই না-কি? কী সেই বুদ্ধি?'

'দেখুন, যুদ্ধ হলে ক্ষতি আপনার এবং মহেন্দ্রগড়েরই বেশি হবে। আমাদের এই বিশাল বাহিনী আপনাদের এই দেওয়াল বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না। এটা আপনিও ভালো করেই জানেন। তারপর আমরা মহেন্দ্রগড়ে প্রবেশ করবো। আপনি মরবেন, আপনার সাথের সেনারা মরবে, এমনকি আপনার মহেন্দ্রগড়ে থাকা বেসামরিক লোকজনও মরবে দেদারসে। অনর্থক এসব কাজ করার অবশ্য আমার কোনো ইচ্ছাই নেই। তারচেয়ে যুদ্ধ এড়াবার সবচেয়ে প্রাচীন উপায়টাই তো আমরা বেছে নিতে পারি।'

'সেটা কী?'

'সন্ধি, আদাভান, সন্ধি। আমরা সন্ধি করতে পারি।'

'আচ্ছা' কৌতুক এখনো সরেনি আদাভানের স্বর থেকে, 'তা সন্ধির শর্ত কী হবে?'

'আপনি এই মুহূর্তে মহেন্দ্রগড় আমাদের হাতে সঁপে দেবেন। তারপর আমাদের পক্ষ থেকে দূত হয়ে মহারাজ কারিকালাকে গিয়ে জানাবেন, আমরা এই দুর্গ দখল করে নিয়েছি। ব্যস, আপনার কাজ শেষ। এরপর যা করার কারিকালাই করবেন। আপনি যদি এই কাজ করেন তাহলে বিনিময়ে আমরা আপনার, আপনার সৈন্যদের আর বেসামরিক লোকজনের কোনো ক্ষতি করবো না। সবাইকে সুরক্ষিত অবস্থায় মহেন্দ্রগড় থেকে প্রস্থান করার ব্যবস্থা করে দেবো।'

এবার আদাভান হাসলেন, 'সন্ধির প্রস্তাবটা বেশ ভালো ছিল। এটা মানতেই হবে। তবে জানো কী, বুদ্ধিমান মানুষ নিজের ভালো বোঝে। সবসময় ভালোটাই বেছে নেয়। আর এখানে আমিও ভালোটাই বেছে নেবো।'

'তারমানে আপনি সন্ধিতে রাজি আছেন?'

'পুরোটা শুনে নাও। যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু ঘটে তাহলে আমার বীরগতি প্রাপ্ত হবে। তার মানে নিশ্চিত স্বর্গ। আর, কাপুরুষের মতো যদি আত্মসমর্পণ করি তাহলে নরক সুনিশ্চিত। তাহলে বলো, বুদ্ধিমান লোক কী বেছে নেবে? স্বর্গ, না-কি নরক? আমি এখানে স্বর্গই বেছে নিলাম।'

'তারমানে আপনি যুদ্ধ করবেন। মহেন্দ্রগড়কে নরক বানিয়ে হলেও নিজে স্বর্গে যাবেন। ঠিক আছে, আমরা আপনার কোনো স্বাদ অপূর্ণ রাখবো না। আপনার বীরগতি প্রাপ্ত হবার ব্যবস্থা করছি।'

ভূমি থেকে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো যোদ্ধা। তারপর কোমর থেকে তলোয়ার বের করলো। আদাভান সবই দেখলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। অত দূর থেকে তলোয়ার দিয়ে কী করবে?

ঘোড়ায় বসা লোকটা তলোয়ার দিয়ে একটা আশ্চর্য কাজ করলো। শূন্যে মাথার ওপরে এক পাক ঘোরালো তলোয়ারটা। মাথার ওপরের অদৃশ্য কিছু একটা কাটলো যেন।

ঠিক তখনই একটা তলোয়ার আদাভানের পিঠ দিয়ে ঢুকে বক্ষ বিদীর্ণ করে বের হলো। বিস্ফোরিত চোখে পেছনে ফিরলেন তিনি। আসলে নিচের ঘোড়সওয়ারের মাথার ওপর তলোয়ারের ঘোরানো ছিল সংকেত। তার বিশ্বাসঘাতক সৈনিক সেই সংকেত অনুযায়ীই কাজ করেছে। তলোয়ারটা একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। প্রাণত্যাগ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে বেশি সময় নিলেন না আদাভান। তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তার বীরগতি প্রাপ্ত হলো।

বাইশ জন সৈনিকের সবাই বিক্রি হয়ে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়নি। তবে এক্ষেত্রে বিশ্বাসী সৈনিকেরা তৈরি ছিল না। চোখের সামনে আদাভানকে লুটিয়ে পড়তে দেখে তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অস্ত্র তাদের হাতেই ছিল কিন্তু সেগুলোকে আর বাগিয়ে ধরা হলো না। সেই সুযোগটাই নিলো বিশ্বাসঘাতক সৈন্যরা। পলকেই বাকি বিশ্বাসী সৈন্যরা আদাভানের পথ ধরে অক্ষয় স্বর্গের পথে যাত্রা করলো।

নিচ থেকে ঘোড়সওয়ার এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে। এবার জানতে চাইলো, 'কাজ শেষ হয়েছে?'

'আজ্ঞে।'

'এখন তাহলে প্রবেশদ্বার খুলে দাও।'

শত্রুবাহিনী মহেন্দ্রগড়ে প্রবেশ করলো। অবশ্য এই কথায় একটু ভুল হলো। এই বাহিনীকে কোনোভাবেই শত্রুবাহিনী বলা যায় না। তারা যে নিশান বহন করছে তা এই চোলা রাজ্যেরই অনেক পুরানো চিহ্ন।

সৈন্যদল প্রবেশ করার পর পেছনে রাজকীয় অভিজাত পোশাক পরা কিছু লোকও প্রবেশ করেছে। তারা চোলা রাজ্যের বিতাড়িত মন্ত্রীদলের সদস্য। এরাই সক্রিয় ছিলেন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। এখন পরাজিত হয়েছেন ঠিকই তবে লক্ষ্য ত্যাগ করেননি।

সেনাধ্যক্ষ তাদের সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো, 'মহেন্দ্রগড়ের সব নিবাসীকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই রাজধানীর দিকে যাবে।'

'আদাভানের কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন একজন।

'আদাভান আর তার সাথের বিশ্বস্ত সৈন্যদের মেরে ফেলা হয়েছে। এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। যদিও আদাভানের মুখ দিয়ে মহারাজ কারিকালাকে খবর পাঠালে সবচেয়ে ভালো হতো। তার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু জানেনই তো, আদাভান কেমন একগুঁয়ে।'

'আচ্ছা। যা হবার তো হয়ে গেছে। কারিকালার কাছে খবর পৌঁছে যাবে।'

'মহেন্দ্রগড় এখন সম্পূর্ণ আমাদের দখলে। এখন বলুন কী আদেশ।'

মন্ত্রীমণ্ডলের নতুন নেতা এবার কথা বললেন। আগের নেতা রাজা হয়ে সবাইকে বিতাড়িত করেছিলেন। এবারে নতুন নেতাকে খুব হিসেব করে বাছাই করা হয়েছে। এবার ঐক্য ভাঙবে না।

'উত্তর আর পুবে আর দুটো ছোটো ছোটো সেনানিবাস আছে। তোমরা ঐ দুটোতে আজ রাতেই হামলা করবে। ঐ দুটোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত ভালো না। তোমাদের তেমন কষ্ট হবে না। মহেন্দ্রগড়ের সাথে সাথে ঐ দুটো সেনানিবাসও আমাদের অধিকারে নিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু, মহারাজ কারিকালা এই খবর পেলে তার বিশাল সেনা নিয়ে আমাদের প্রতিকার করতে আসবেন। তখন তো আমরা কোনো সুযোগই পাবো না। একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবো।'

নতুন নেতা এবার মুচকি হাসলেন। তিনি যা জানেন এই সেনাপতি তা জানে না, 'মহারাজ কারিকালা খবর অবশ্যই পাবেন। এবং তোমার কথা সত্য। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে তার সেনা পাঠাবেন। কিন্তু সেই সেনা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছবে না। আগেই তাদের অন্য যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে। আর সেই যুদ্ধে কারিকালা সম্পূর্ণ বিধ্বংস হবে। ভুলে যেও না, এই কাজে আমরা তেল না, কেবল অরণী কাষ্ঠ। আর মশালে তেলই পোড়ে, অরণী কাষ্ঠ নয়। আমাদের আর কিছুই করতে হবে না, শুধু মহেন্দ্রগড় দখল করে বসে থাকলেই চলবে। এটা শুধু বাঘকে গুহা থেকে বের করে আনার জন্য।

আমাদের এই মহেন্দ্রগড় দখল করে রাখাই আগুনে স্ফুলিঙ্গের জোগান দেবে। আর এই স্ফুলিঙ্গ আগুন জ্বালিয়ে দেবে পুরো দাক্ষিণাত্যে। যাও, এখন তুমি শুধু আদেশের পালন করো।'

'আজ্ঞে।'

৩৪

দলনেতাকে সবসময় সামনে থাকতে হবে। নেকড়ের দলের চলনে কিন্তু নিয়মটা অন্যরকম। সেখানে দলনেতা সবার পেছনে থাকে। এখানে স্বঘোষিত দলনেতা নিজে সামনে সামনে বুক ফুলিয়ে চলছে। চারপাশে দেখতে দেখতে চলছে সে।

অসিতের এখন হাঁটতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। জয়নগর থেকে গোদাবরীর ঘাটে আসতে তার পিঠে নিজের বোঝার সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের বোঝাও চেপেছিল। এখন আর সে বালাই নেই। যার যার বোঝা সে সে বহন করছে। এখানে দলনেতা আগেই হস্তক্ষেপ করে রেখেছে। বলে দিয়েছে, কোনোভাবেই কেউ কারো ওপর অন্যায় জোর কিংবা আবদার খাটাতে পারবে না।

বোঝা কম থাকায় এই দফায় দলের গতি বেড়েছে। দলনেতা এই পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। কাজে না হলেও অন্তত মুখে তো বটেই। অবশ্য এখন যে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা চলছে সেই জঙ্গল সম্পর্কে দলনেতা আগেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। এই জঙ্গলের কুখ্যাতি আছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে এই জঙ্গল যেভাবেই হোক পেরিয়ে যেতে হবে। কোনোভাবেই জঙ্গলের ভেতরে রাত কাটানো যাবে না। যদি আলো থাকতে থাকতে জঙ্গল পেরোনো না যায়, তাহলে সমূহ বিপদ হবার সম্ভাবনা। তখন সকাল পর্যন্ত আর ঘুমানো যাবে না। বিশ্রাম নেবার সৌভাগ্য কারো হবে না। সবাইকে সজাগ হয়ে পাহারা দিতে হবে।

দুপুরের খাবারের পর বিরতি দেওয়া গেল না। নষ্ট করার মতো সময় নেই। একটু বয়স্ক লোকজনের শরীর আর চলছে না। তবু কোনোমতে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তারা। কষ্ট সবারই হচ্ছে। তবুও শেষ রক্ষা হলো না। কপালের লেখা তো মেনে নিতেই হবে। সন্ধ্যার নামার যখন আর এক মুহূর্তের মতো বাকি তখনো জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরোতে পারলো না তারা। দলনেতা একটু দমে গেছে মনে হয়। তার অনুমান কাজ করেনি। তবে চলা থামানো না তারা।

সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসেছে। দলনেতা হাত তুলল, 'সামনে একটা জলের জোগান দেওয়ার পুকুর আছে। খোলা জায়গাও আছে। এখন আর সামনে এগোনো যাবে না। এখানেই আজকের রাতটা কাটাতে হবে।'

এই জঙ্গলে ঢোকার আগে দলনেতার বলা কথাটা একজনের মনে পড়ে গেল, 'কিন্তু এই জঙ্গলে নাকি ডাকাতের খুব উৎপাত। যদি আক্রমণ করে?'

'অশুভ কথা বোলো না তো। সবাই মিলে যেভাবেই হোক এই আপদ কাটিয়ে দিতে হবে।'

আরেকজন বলে উঠলো, 'তাহলে তো জঙ্গলের বাইরে আজকের দিনটা কাটিয়ে দিলেই চলতো। ঢোকার দরকার ছিল না। তাহলে কাল সকালে ঢুকলেই আরামে পার হওয়া যেতো।'

দলনেতা বুঝলো তার জ্ঞানের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। সে এবার নিজের পক্ষে যুক্তি দিলো, 'আমি জানি না বলতে চাচ্ছো? আমি সবকিছুই জানি। এই জঙ্গল

পেরোতে পাঁচ মুহূর্ত সময় লাগে। আমরা যখন রওনা দিলাম তখন সন্ধ্যার বাকি ছিল ছয় মুহূর্ত। তোমাদের গতি যে এত কম হবে সেটা তো আমি জানতাম না। তোমরা যে অলস মুরগির মতো হাঁটবে সেটাই বা কে জানবে।'

'আচ্ছা এই জঙ্গলে কি সত্যিই ডাকাতেরা আছে? না-কি আমরা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি?' একজন আবার সন্দেহ প্রকাশ করে সর্দারের জ্ঞানের ওপর।

সর্দার এবার চোখ পাকায়, 'এই জঙ্গলে ডাকাত নেই না। যাও, হাঁটতে থাকো তুমি। এই জঙ্গলের ডাকাতেরা শুধু পথিকের সবকিছু নিয়েই ক্ষান্ত হয় না। কাউকে জীবিত ছাড়ে না। কেন জানো? মালামাল আর মুদ্রা ওদের কী কাজে লাগে সবাইতো বুঝতেই পারছো। পথিকের মাথাগুলোও ওদের কাজে লাগে। সেই খুলিগুলো দিয়ে ওরা ভৈরবীর পূজা দেয়। ওগুলো দিয়েই নরমুণ্ড মালা তৈরি হয় ভৈরবীর জন্য।'

এবার কেউ অস্বীকার অথবা সন্দেহ প্রকাশ করতে পারলো না। একযোগে শিউরে উঠলো সবাই। অসিত বেশ ভয় পেয়েছে। ঐ ডাকাতের দল দেখা দিলে আর আশা নেই।

তবে সর্দারের গল্প এখনো শেষ হয়নি, 'এই জঙ্গলে কেবল যে ভৈরবীর ডাকাতেরাই আছে তা নয়। অন্যও অনেক কিছু আছে।'

ভয়ের চোটে কেউ কোনো কথা বলছে না। ভৈরবীর ডাকাতের চাইতে ভয়ংকর আর কী হতে পারে?

'অন্যও অনেক কিছু আছে যাদের চোখে দেখা যায় না। তারা যদি একবার কাউকে দেখে তাকেও আর চোখে দেখা যায় না।'

এরপর আর কারো মধ্যে পরামর্শ দেওয়া অথবা তর্ক করার ক্ষমতা অবশিষ্ট রইলো না। খোলা জায়গাটায় সবাই বসেছে। অন্ধকার এখন যথেষ্ট ঘন হয়েছে, তবে আলোকে একেবারে দূরে পাঠাতে পারেনি। রাতে এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তবে জল লাগবে। আগুন জ্বালানোর কাঠ লাগবে। ছোটো ছোটো দল বেঁধে সবাই এসব জোগাড়ে লেগে পড়লো। অসিতের কাঁধে পড়লো জল জোগাড়ের দায়িত্ব। খাবার প্রতিষ্ঠান থেকে জোগাড় করে আনা হয়েছে। নিঃশব্দ জঙ্গলে গাছের ডালে কুঠারের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শুকনো কাঠও কেটে জ্বালানোর উপযুক্ত করা হচ্ছে।

কয়েকটা চুলা জ্বেলে ফেলা হলো দেখতে দেখতে। চুলার সাথে সাথে বেশ কিছু বড়ো আগুনের কুণ্ডলী জ্বেলে দেওয়া হলো। সেই আগুন জ্বালা হলো এক বিশাল বৃত্তের পরিধির ওপর। বৃত্তের ভেতরে রান্না আর থাকার ব্যবস্থা। সব জোগাড় হয়ে যেতেই বৃত্তের ভেতরে ঢুকে পড়লো সবাই। মনে মনে সবাই একটা প্রার্থনাই করছে। প্রকৃতির ডাকে যাতে সাড়া দেওয়া না লাগে।

জঙ্গলের জানোয়ার আর অশরীরীদের থেকে নিরাপত্তা দেবে এই আগুনের বৃত্ত। তবে ডাকাতেরা আগুনের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করবে সে তা বলা যাচ্ছে না। তবে এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় কারো মাথায় এলো না।

দলনেতা আবার সবাইকে সতর্ক করে দিলো। দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে, 'রান্না হয়ে গেলে কেউই অপেক্ষা করবে না জানি। সবাই খেয়ে নেবো। তবে সারাদিনের ক্লান্তি মাথায় নিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। পালা করে অর্ধেক

মানুষ পাহারা দেবে। জঙ্গলের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। আর শুধু নজর রাখলেই চলবে না। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে সারারাত। নিয়মিত যারা জেগে থাকবে তাদের আগুনে কাঠের জোগান দিতে হবে। মনে রেখো, আগুন যেদিকে আগে নিভবে বিপদ সেদিক দিয়েই আসবে।'

খিদে অনুভূতিটা একটু আশ্চর্যের। পরিস্থিতি যেমনই হোক খিদে দেহে তার উপস্থিতি জানান দেবেই। সারাদিনের পরিশ্রমে কারো মধ্যেই রুচি আর খিদে কোনোটারই অভাব ছিল না। খাদ্য তৈরি হতে নিমেষে শেষ হয়ে গেল। বলতে গেলে রীতিমতো কাড়াকাড়ি করেই খেলো সবাই। অসিত প্রথমে একটু ইতস্তত করছিল, পরে বুঝতে পারলো সেটা করলে না খেয়েই থাকতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সেও কাড়াকাড়িতে হাত লাগালো।

অর্ধেক মানুষের পাহারা দেবার কথা বলেছিল সর্দার। তবে সেই উপদেশ সবাই মানবে বলে মনে হচ্ছে না। খাওয়া পেটে পড়তেই সবার চোখই ঢুলতে লাগলো। সেই ঘুমের তীব্র আমন্ত্রণ জঙ্গলের আর ডাকাতের ভয়কে মনে স্থায়ী হতে দিলো না। যা হবার হবে চিন্তা করে সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। তাদের ভর্ৎসনা করার কেউ নেই। সবার আগে সর্দারই চোখ বুজেছে। তবে শুধু তিনজন অনেক কষ্টে নিজেদের চোখ খুলে পাহারা দেবার কাজটা চালিয়ে যেতে লাগলো।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে নিশাচর পাখিরা বিচরণ করতে শুরু করেছে পূর্ণ মাত্রায়। তাদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ মাঝেমাঝেই নীরবতাকে বিদীর্ণ করছে। আগুনের ভেতরে কাঠের পুড়ে যাবার আওয়াজও মাঝে মাঝে চমকে দিচ্ছে জেগে থাকা মানুষগুলোকে। আর সেই সাথে জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভয়ংকর গর্জন। যারা জেগে আছে তারা তো বটেই এমনকি যারা ঘুমিয়ে আছে তারাও ঘুমের মধ্যে কিছুক্ষণ পর পর কেঁপে উঠছে।

পাহারাদারদের চঞ্চলতা কমে আসতে থাকে ধীরে ধীরে। স্নায়ু এমন উত্তেজনা খুব বেশি সময় ধরে নিতে অস্বীকার করে। আগুনে কাঠের জোগান দেবার সময়ের পার্থক্য বেড়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে অগ্নিকুণ্ডের উজ্জ্বলতা।

আলো যতই কমে আসতে থাকে ততই জঙ্গলের গাছগুলোর গায়ে সেই আগুনের ম্রিয়মাণ আলোর আভায় কিছু ছায়ার চলাচল শুরু হলো। শব্দ একেবারে হচ্ছে না বললেই চলে। যাওবা হচ্ছে তা হয়তো পাহারাদারদের কানে ঢুকলেও ঢুকতে পারতো, কিন্তু সেই তিন পাহারাদারও এখন ঘুমের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে। নিদ্রা প্রথমেই মানুষকে জিতেন্দ্রিয় করে দেয়। এখানে নিদ্রা এতটাই প্রভাব ফেলেছে তা শুধু পাঁচ ইন্দ্রিয় নয় বরং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চেতনার ক্ষমতাও হরণ করেছে।

ছায়াগুলো অন্ধকারের সাথে মিশে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আগুনের কুণ্ডলীর আলোয় তাদের ছায়া ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। সবার হাতেই আছে দড়ি আর অর্ধচন্দ্র ফলার ভয়ংকর দর্শন তলোয়ার।

অশরীরীর মতো চলাচল করলেও ছায়াগুলো অশরীরী নয়। যতই তারা আগুনের কাছাকাছি আসতে লাগলো ততই ছায়াতে কায়ার প্রভাব ঘন হতে লাগলো। খুব সাবধানে প্রায় নিঃশব্দে আগুনের কুণ্ডলীগুলো পেরিয়ে এলো তারা। খুব পরিকল্পিতভাবে তারা ঘুমন্ত পথিকদের ঘিরে দাঁড়ালো।

ভৈরবীর সাধকেরা এত বড়ো দলকে পারতপক্ষে আক্রমণ করে না। তবে একে রাতের বেলা, দুইয়ে গত দুই অমাবস্যায় মায়ের জন্য নরমুণ্ডের মালার ব্যবস্থা করা যায়নি। মালা দূরে থাক, মায়ের পায়ে একটা নরমুণ্ডের ভেটও দেওয়া যায়নি। দেবী নিশ্চয়ই রুষ্ট হয়ে উঠেছেন। আর মা রুষ্ট হলে ভীষণ বিপদ। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তাই আজ আক্রমণ না করে উপায় নেই। সর্বশক্তি জোগাড় করে এনেছে ডাকাতেরা। সবাই নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে। আজ ভৈরবী নিজের মালার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছেন। আজ নরমুণ্ডের বেশ বড়ো মালা পরানো যাবে ভৈরবীর গলায়।

দেখে মনে হচ্ছে না এদের সাথে ধনসম্পদ তেমন একটা আছে। তবে যা আছে এতেই চলবে। সর্দারের ইশারায় প্রথম আঘাত করলো এক ডাকাত। মুখ চেপে ধরলো তিন পাহারাদারের একজনের। বেশিক্ষণ গোঁ গোঁ করার সুযোগ পেলো না সে। ততক্ষণে তার গলায় চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ধারালো ফলা।

তবে এতক্ষণ যে নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল ডাকাত দল তাতে এবার একটু ভুল হয়ে গেল। গলায় পোঁচ মেরে ডাকাতটা ভেবেছিল লোকটা মরে গেছে। তাই সে আলগা করেছিল মুখের ওপর হাতের চাপ। তবে তখনো তার প্রাণবায়ু বেরোয়নি। মাটিতে পড়ে প্রাণ হারাবার আগে সে একবার চিৎকার করতে সমর্থ হলো।

যত ক্লান্তির ঘুমই হোক না কেন, যতই তা চেতন মনকে বিবশ করে দেক না কেন, অজানা ভয় মনের ভেতরে সবারই ছিল। পথিকের ঐ একবারের ক্ষীণ চিৎকারই যথেষ্ট ছিল সেই ভয়কে জাগিয়ে তোলার জন্য। সবাই এবার বেশ হুড়মুড় করে জেগে উঠলো। আর জেগে উঠেই তারা দেখল জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। কতগুলো ভয়ংকর দর্শন লোক ভয়ংকর তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের আগুনের কুণ্ডলীর ভেতর। লোকগুলোকে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো তারা। ডাকাতেরা আগুনের বাঁধা মানেনি। তারা ঘন জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে এসেছে এই ফাঁকা অংশে।

চোখ খুলতেই তারা আরেকটা কথা বুঝতে পেরেছে। ডাকাতদলের অবস্থান এবং তাদের থেকে রক্ষার উপায় সম্পর্কে দলনেতার কথা না ফললেও ডাকাতদের উদ্দেশ্য এবং কর্ম সম্পর্কে বলা তার প্রতিটি কথা ফলে গেছে। এরা এখানে শুধু সম্পদ কেড়ে নিয়ে ক্ষান্ত হবে না, আক্ষরিক অর্থেও যথাসর্বস্ব কেড়ে নেবে, মানে প্রাণও রেহাই পাবে না। এরই মধ্যে একজনের শিরশ্ছেদ করা হয়ে গেছে।

প্রাণের মায়া বড়ো মায়া, বলতে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মায়া। সবাই একসাথে লাফিয়ে উঠে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। যে দলপতি সবাইকে একসাথে থেকে লড়াই করার উপদেশ দিয়ে ঘুমাতে গিয়েছিল সেই ছুট লাগালো সবচেয়ে আগে।

ডাকাতেরা মানুষের এই স্বভাবের সাথে পরিচিত। তাদের দেখলে সবাই ছুটে পালায়। যদিও তাদের সবাইকে ঘুমের মধ্যে রেখে মারার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে তবু তারা হকচকিয়ে এলো না। পেছন থেকে তাড়া করে লোকজন মেরে ফেলার ক্ষমতা তাদের সহজাত।

যারা গভীর জঙ্গলের দিকে গেছে, ডাকাতদলের কয়েকজন ধীরেসুস্থে তাদের পিছু নিলো। এই অন্ধকারে ঘন জঙ্গলে চলার জন্য যে দক্ষতা দরকার তা এই পথিকদের নেই। তাদের আছে। তারা বেশিদূর যেতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়বে।

সবার ঘুম যে ভেঙ্গেছে তা নয়। কিছু মানুষ ঘুম থেকে জাগেনি। বলতে গেলে এই না জাগাটাই তাদেরকে জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর মুহূর্তের মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলো। ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই তারা আরও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। চিরজীবনের মতো। এই শয্যাই হয়ে গেল তাদের মৃত্যুশয্যা।

অসিত প্রথম দলে ছিল। চিৎকার শুনেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তার কপাল ভালো সে সবার থেকে একটু দূরে ঘুমিয়েছিল। সেও উঠে কোনোকিছু ঠিক করতে পারলো না। সহজাত চিন্তায় ছুট লাগালো। তবে সবার মতো সে ঘন জঙ্গলের ভেতরে ঢোকেনি। ফাঁকা জায়গা দিয়ে অন্যদিকে জঙ্গলের পাশ ঘেঁষে ছুটছে সে।

সেদিকে নজর গেল ডাকাত সর্দারের, 'ঐদিকে একজন গেছে। ওর পেছনে যাও একজন।'

এক ডাকাত বলে উঠলো, 'কিন্তু সর্দার, ও তো রাজমার্গের দিকে যাচ্ছে। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, যাই হয়ে যাক আমরা কখনোই রাজমার্গের ওপর উঠবো না। মহারাজের সাথে এটাই আমাদের অলিখিত চুক্তি।'

সর্দারের চোখ গরম হয়ে উঠলো, 'তুই কি আমাকে চুক্তি শেখাচ্ছিস? আমাদের কি কেবল একটাই চুক্তি আছে? আর চুক্তি নেই? আমরা এই মাসে কারো ওপরে হামলা করবো না বলে রাজাকে কথা দিয়েছি। না পারতে হামলা করেছি। এই ছেলে এখন যদি সবাইকে বলে দেয়? আর সেটা কথা না, সর্দারের মুখে মুখে কথা বলার সাহস কী করে পেলি তুই? আদেশের পালন কর তাড়াতাড়ি।'

আর কোনো কথা বলতে সাহস পেলো না ডাকাত। অসিতের পিছু নেয় ত্রস্ত পায়ে।

কোনদিকে ছুটছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই অসিতের। এই অন্ধকারে কোথায় যে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। অজান্তেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই জঙ্গলের অন্ধকারের ভেতর ঢোকা যাবে না।

ছুটতে ছুটতে রাজমার্গের ওপর চলে এলো অসিত। এতক্ষণে চোখে অন্ধকার একটু সয়ে এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে এটা একটা রাস্তা। অনেকদূর ছুটে এসেছে। অনভ্যাসে বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে। একটু দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালো সে নিরুপায় হয়ে। সাথের মালপত্র সব ওখানে ফেলে এলেও মুদ্রার থলিটা এখনো কোমরে গোঁজা আছে।

এই পর্যন্ত একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি সে। এটাও একটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এবার থেমে পেছন দিকে তাকালো সে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কি সে অসাধ্য সাধন করেছে? ভৈরবীর ডাকাতদের কবলে পড়েও তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে? চিন্তাটা মাথায় আসতেই ভয়টা একটু যেন কমে এলো তার।

তবে সে অনুভূতি বেশিক্ষণ অনুভব করার সুযোগ পেলো না সে। একটু পরেই সে ভয় ফিরে এলো দ্বিগুণ হয়ে। খানিক দূরেই পেছনে আর যেন পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন তীব্র বেগে ছুটে আসছে। তার হাতে মশালের আলো দেখতে পেলো সে। তাদের কারো কাছেই মশাল ছিল না। নিশ্চয়ই ডাকাত দলের লোক।

গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে আসতেই মশালধারীকে দেখতে পেলো সে। তাদের দলের কেউ নয়। এক হাতে মশাল, আরেক হাতে সেই ভয়ংকর তরোয়াল। ভুল ভেবেছিল সে। ডাকাতের হাত থেকে সে পালাতে পারেনি।

অসিত জানে না, সে নিজেই নিজের রাস্তা পেছনে থাকা ডাকাতের কাছে ফাঁস করে এসেছে এতক্ষণ। তার কোমরে বাঁধা মুদ্রার থলির ঝনঝন আওয়াজে পিছু নেওয়া ডাকাতের কোনো কষ্টই হয়নি তাকে খুঁজে বের করতে।

দম নেবার সময় আর পাওয়া গেল না। রাজমার্গ ধরে ছুটতে শুরু করলো সে। পেছনের ডাকাত লেগে রয়েছে ঠিক তার পেছনে।

অসিত বুঝতে পারছে, তার সময় শেষ হয়ে আসছে। এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো উপায় নেই। এই দুটো পা বেশিক্ষণ সায় দেবে না। সায় অনেক আগেই দিতো না, শুধু মনের জোরে পা এখনো চলছে। তবে সে তো আর অনন্তকাল চলবে না। কোনো না কোনো সময় সে থামতে বাধ্য হবে। আর তখনই তার ঘাড় স্পর্শ করবে ধারালো বক্র ফলা।

প্রাণের মায়া এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মায়া। অসিত সে মায়ায় নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে ছুটতে লাগলো। পেছনের ডাকাতের কানে এখনো তার কোমরের মুদ্রার থলির আওয়াজ যাচ্ছে। ডাকাতের মনেও সেই শব্দ লোভের জন্ম দিচ্ছে। ঝনঝন শব্দের মাত্রা শুনেই সে বুঝতে পারছে, মুদ্রার সংখ্যা নেহাত কম নয়। সে এখন একা এই শিকারকে ধাওয়া করছে। আর কেউ আসার আগেই শিকারকে হাত করতে পারলে এই মুদ্রার থলি পুরোটাই গিলে নেওয়া যাবে। কাউকে কোনো ভাগ দিতে হবে না। শুধু মায়ের ভাগটা সে দিয়ে দেবে। নরমুণ্ড।

যে কোনো ঘটনার পরিণতি আবশ্যক। অনন্তকাল ধরে কেউ ছুটতে পারে না, আবার কেউ কারো পিছুও নিতে পারে না। প্রকৃতি উপসংহার টানে নিজের মতো করে। এখানেও প্রকৃতি তার হাত বাড়িয়ে দিলো। রাজমার্গের ঠিক মাঝে একটা গর্তে পা আটকে গেল অসিতের। সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে তীব্র বেগে ধরাশায়ী হলো সে। ব্যথা পেয়েছে অনেক। তার গলার সুতীব্র চিৎকার সেটা জানান দিলো। পা বোধহয় ভেঙেই গেছে। তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করলো, কিন্তু পা কথা শুনল না। আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ততক্ষণে পেছনের ডাকাত তার কাছে চলে এসেছে। এক ঝটকায় আসুরিক শক্তিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অসিতকে চিত করে ফেললো সে। বুকে ডান পা দিয়ে একটা জোরালো চাপ দিলো।

বুকটা সাথে সাথে ফাঁকা হয়ে গেল অসিতের। পিসির কথা শুনলেই বোধহয় ভালো হতো। স্পষ্ট বুঝতে পারলো, সময় শেষ হয়ে এসেছে। মশালের আলোয় এখন সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চিৎকার করার ইচ্ছেও যেন হারিয়ে গেল তার। সে চেয়ে আছে ডাকাতের হাতের দিকে। তার গলার দিকে নেমে আসছে ধারালো অর্ধচন্দ্র ফলা।

৩৫

অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে সৈনিক। তার ভাগ্য ভালো। এই রাতের বেলা তাকে হয়তো তার নিজস্ব দুই পা ব্যবহার করেই ছুটতে হতো, তবে ঐ যে বললাম ভাগ্য, তার কারণেই একটা ঘোড়া কপালে জুটেছে তার। এই অন্ধকারে ঘোড়ার তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না ছুটতে। আলো একটু আছে। নক্ষত্রের আলো আর অর্ধচন্দ্র চাঁদের আভা সওয়ারকে নির্দেশ দিতে যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। তার ওপর এই রাস্তা সৈনিকের চেনা।

তবে এমনিতে এই রাস্তায় চললে সে ধীরেই চলতো। এত জোরে কখনোই ছুটতো না। পেছনে যে আতঙ্ক তাকে তাড়া করছে সেটাই কাজ করছে ঘোড়ার জোরে ছোটার প্রভাবক হিসেবে। ঘোড়ার শ্বাস আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে। এখনো ঘোড়ার তরফ থেকে কোনো ধরনের আপত্তিমূলক লক্ষণ দেখা যায়নি কিন্তু গরম ঘন শ্বাসের আওয়াজ সৈনিকের মনে চিন্তার উদ্রেক করছে। আতঙ্ক একটু কমতেই এদিকে নজর দিয়েছে সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা। অবশ্য প্রথমেই থামার কথা চিন্তা করলো না সে। সেই প্রবল আতঙ্ক তাকে থামতে দিচ্ছে না।

অথচ সন্ধেবেলাতেই সব ঠিক ছিল। প্রতিদিনের মতো খাওয়ার আয়োজন চলছিল। সবাই খেয়েদেয়ে নিদ্রা অথবা বিহারের আনন্দে মেতে ওঠার অপেক্ষা করছে। তার কপালে অত সুখ লেখা ছিল না। সৈনিক হিসেবে তার কপালে ছিল রাতের পাহারা। নিজের খাওয়াদাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে পাহারার জায়গায় বসেছিল সে। তাদের দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন আর ততটা ভালো নয়, এখন আর দুর্গটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তারপর এলো সেই প্রচণ্ড ঝড়। হ্যাঁ, একমাত্র কালবৈশাখী বললেই এর ছবি সঠিকভাবে আঁকা হয়। সেই প্রায় চারশো জন সৈন্য। যুদ্ধ হলে তারা তৃণখণ্ডের মতোই উড়ে যেতো। কিন্তু সে সময় এলো না।

তাদের বাইশ জন সৈন্য যা হাতে গোণা যায় কয়েক পলে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বিশ্বাসঘাতক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিশ্বাসী সবাই ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো। সবার আগে মারা গেলেন তাদের দলপতি আদাভান।

তারও তো সেই একই গতি হবার কথা ছিল। সবাইকে হত্যা করা শুরু হতে তার শরীর যেন একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তখনই নিজের গলায় ঠান্ডা ফলার স্পর্শ পেয়েছিল সে। অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ইষ্টনাম।

ঐ যে বলেছিলাম, ভাগ্য ভালো। আসলেই আজ তার ভাগ্য ভালো ছিল। সেই ঠান্ডা ফলা তার কণ্ঠ স্পর্শ করলো বটে কিন্তু কণ্ঠনালী চিরে দিলো না অন্যদের মতো। এক যাত্রায় হলো পৃথক ফল। তখনই সে বুঝেছিল তার যাত্রাপথ একটু হলেও বদলাবে।

একটা শীতল কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল তার কানে, 'যাও, তুমি বেঁচে গেলে। ঈশ্বর তোমার ভাগ্যে আজ মৃত্যু লিখেননি। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা রাজধানীতে যাবে। কারিকালা আর তার কাকা ইরামকে বলবে, সিংহাসন এতো ঠান্ডা জায়গা না, বেশ উষ্ণ জায়গা। আগুনের মতো। অযোগ্য লোক কালেচক্রে সিংহাসনে আরোহণ তো করতে পারে, কিন্তু বেশিদিন অবস্থান করতে পারে না। অচিরেই অযোগ্যকে সরিয়ে যোগ্যরা মানে সিংহাসনের প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিরা সিংহাসনে বসবে। ততদিন অবশ্য সে আমাদের হয়ে ঐ আসন পাহারা দিয়ে রাখতে পারে। রাখুক। সিংহাসন ঠিকমতো ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে রাখতে বলবে।'

নিজের সৌভাগ্যকে বেঁচে যাওয়া সৈনিক এখনো বিশ্বাস করতে পারেনি, এখনো ঠিকমতো পারছে না। তার এখনো মনে হচ্ছে, তার পেছনে এখনো কেউ আছে। আচমকা পেছন থেকে ছুটে আসবে তীর অথবা বর্শা, তার পিঠ ফুঁড়ে বুক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ঘোড়াটাও অনেকদিন রাতে এভাবে ছোটেনি। সেও আতঙ্কে ছিল। এজন্য প্রথম থেকে ছোটাতে সেও বিরাম দেয়নি।

তবে এক সময় শরীর আর চলতে চাইলো না ঘোড়ার। গতি একটু কমে এলো। সৈনিক লাগাতার লাগামে টান দিচ্ছে কিন্তু ঘোড়ার পা আর আগের মতো গতি তুলতে পারছে না।

টনক নড়লো সৈনিকের। স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ঘোড়ার দম ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। এবার আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া চলছে না। এখুনি বিশ্রাম না দিলে আরেকটু পর ঘোড়াটা একেবারে থেমে যাবে। সাথে সাথে শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে পরপারে যাত্রা করবে। এই নির্জন পথে সেটা হবে অনেক বড়ো বিপদের কারণ। তাকে এই রাতের বেলা তখন রাজধানীর দিকে বাকিটা পথ হেঁটেই যেতে হবে।

চিন্তাটা মাথায় আসার সাথে সাথে আর দেরি করলো না সৈনিক। তখুনি লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো। তারপর এক লাফে নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। ঘোড়াটা রাস্তার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখন। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো সে, ঘোড়াটা যাতে বসে না পড়ে। একবার বসে পড়লেই আর উপায় নেই।

এই পৃথিবীতে প্রার্থনায় যে একেবারেই কাজ হয় না তা নয়। মাঝে মাঝে হয়। ঘোড়াটা সামলে নিলো। বসে পড়লো না। তখনই জলের খোঁজ করতে লাগলো সৈনিক। দুজনের জন্যই এখন জল ভীষণ প্রয়োজন।

রাজমার্গের আশেপাশে সাধারণত জলের উৎস থাকে। এখানেও সৈনিকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। একটা ছোটো সরোবর পাওয়া গেল কাছেই।

দুজনে প্রাণ ভরে জল খেয়ে বিশ্রাম নিলো খানিক ক্ষণ। কিছু খাবার পেলে মন্দ হতো না। ঘোড়াটা পাশের একটা গাছের কয়টা পাতা দিয়ে জলযোগ সেরে নিয়েছে। সৈনিকের সে উপায় নেই। যা-তা তো আর খাওয়া যায় না।

রাজধানীর দিকে যাত্রা করলো আবার সৈনিক। এবার আগের তুলনায় বেশ ধীর গতিতে। রাজধানীতে পৌছতে পৌছতে প্রায় ভোর হয়ে গেল।

পুহারের সিংহ দরজায় পাহারার ব্যবস্থা অনেক শক্ত। তবে নিদ্রাদেবীর ক্ষমতা তার থেকেও বেশি। পুহারের সিংহ দরজার রক্ষীর চোখ সকালবেলায় লেগে এসেছিল। বাইরে থেকে এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের আওয়াজে ঘুম টুটে সচকিত হয়ে উঠলো সে। কোনো বড়োসড়ো বিপদের আশঙ্কায় চোখ মেলল সে পথের ওপর।

কিন্তু যে দৃশ্য সে দেখল তাতে ঘটনার কোনো কিছুই বোঝা গেল না। মাত্র একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। সদর দরজার একেবারে সামনে এসে ঘোড়াটা থামলো। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে আলগোছে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো দেহটা। তবে অচেতন হলো না। ওপরের দিকে আঙুল তুলে কি যেন একটা বলার চেষ্টা করলো ভূপাতিত সৈনিক। তবে ক্ষীণ কণ্ঠের সে আওয়াজ ওপর পর্যন্ত পৌছালো না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলো সৈনিক। তারপরে হাল ছেড়ে দিলো। উদ্ধত আঙুল সহ হাতটা একসময় হেলে পড়লো দেহের পাশে। ওপর থেকে রক্ষী ইশারার কিছুই এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, এখন এটাও বুঝতে পারলো না, আগন্তুক সৈনিক মারা গেছে না-কি অচেতন হয়ে গেছে।

অবস্থা গুরুতর। তবে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। এটা বিপক্ষের একটা ফাঁদও হতে পারে। রক্ষী ভালো করে তাকালো পুহারের নগরীর বাইরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। কিন্তু কিছুক্ষণ ভালো করে চোখ বুলিয়েও প্রান্তরের মাঝে কোনো নড়াচড়া দেখা গেল না। কোনো সেনার আক্রমণ তো দূরের কথা, একটা ঘাসও কোথাও নড়ছে না।

আবার নিচের সৈনিকের দিকে নজর দিলো প্রহরী। তার সাজপোশাক চোলার সৈনিকদের মতোই। তবে এক্ষেত্রে ছদ্মবেশ নিতে হলে যে কেউ তাই পরবে।

এমনিতে বড়ো দরজার কাছ থেকে সন্দেহজনক যাই দেখা যাক না কেন, বড়ো শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়াই নিয়ম। তবে রক্ষীর কাছে ঘটনা গুরুতর মনে হলেও তেমন একটা ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। এখন শিঙ্গা বাজালে অনর্থ হবে। এই ভর সকালে নগরীর সবাইকে শিঙ্গার শব্দ শুনিয়ে আতঙ্ক নিয়ে ঘুম ভাঙ্গাতে মন সায় দিলো না তার। তবে বসে থাকলেও তো চলবে না। সে ছুটল রক্ষীদলের প্রধানকে খবর দিতে।

রক্ষীদলের প্রধান ঘুম থেকে উঠেছেন বেশিক্ষণ হয়নি। তিনি ভালো করেই জানেন কে কোথায় পাহারা দিচ্ছে। প্রধান দ্বারের রক্ষীকে এত সকালে তার আবাসের দিকে ছুটে আসতে দেখে তিনি নিজেই বেড়িয়ে এলেন।

তিনি বিচক্ষণ লোক। বুঝলেন তড়িৎ কিছু করা দরকার। কয়েকজন রক্ষী নিয়ে তখনই গিয়ে হাজির হলেন সদর দরজায়। হ্যাঁ, ভুল নেই। অচেতন সৈন্য তাদের রাজ্যেরই।

আদেশ দিলেন রক্ষী প্রধান, 'তাড়াতাড়ি ওকে আর ওর ঘোড়া ভেতরে নিয়ে এসো। দেখে তো মনে হচ্ছে দুজনেরই ভালো চিকিৎসা প্রয়োজন।'

ঘোড়াটাকে তখনই রাজার আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হলো। আস্তাবলে ঘোড়ার চিকিৎসায় দক্ষ লোক আছে। আর সৈন্যের জন্য নিয়ে আসা হলো বৈদ্যকে।

বৈদ্য বেশ অভিজ্ঞ। রোগীর দেহে ক্লান্তির ছাপ সহজেই খুঁজে বের করে ফেললেন তিনি। নাড়ি ধরে বাকি কারণ বের করতেও বেশি সময় নিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই

যত্ন আর ওষুধের মিলিত প্রভাবে জ্ঞান ফিরে এলো সৈনিকের। চোখ খুলে অস্পষ্টভাবে আশেপাশের লোকজনকে দেখল সে। বুঝতে পারলো এখন আর কোনো ভয় নেই।

তবে জ্ঞানের সাথে সাথেই তার স্বাভাবিক বুদ্ধিও ফিরে এসেছে। একবার চোখ বন্ধ করে আবার খুলল সে। সে যেই খবর নিয়ে এসেছে তা সরাসরি মহারাজ কারিকালাকেই দিতে হবে। যাকে তাকে দেওয়া চলবে না। কে যে বিশ্বাসঘাতক আর কে যে বিশ্বাসী তা বোঝা এখন বেশ কষ্ট। তার গলা দিয়ে ক্ষীণ স্বর বেড়িয়ে এলো,

'মহারাজ কারিকালাকে কেউ খবর দিন। ওনার জন্য পশ্চিম সীমান্ত থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর আছে।'

কথাটা বলেই সৈনিক আবার চোখ বুজলো। এবার অবশ্য একটু ইচ্ছে করেই। রক্ষীদলের নেতা কালবিলম্ব না করে রাজভবনের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। কাউকে পাঠাতে মনে সায় দিচ্ছে না। অবশ্য স্বয়ং মহারাজার কাছে যেনতেন কাউকে পাঠানো যায় না।

পিতা বেঁচে থাকতে এমন সময়ে কারিকালাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। তখন সকালের প্রথম প্রহর পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটাতেন তিনি। তবে এখন পিতা নেই। জীবনে অনেক উত্থান পতন হয়ে গেছে। পলাতক জীবন কাটাতে হয়েছে, বন্দি জীবন কাটাতে হয়েছে, আর এখন রাজার দায়িত্বপূর্ণ জীবন কাটাতে হচ্ছে। তাই বিলাস স্বভাব এখন শরীর আর মন দুই জায়গা থেকেই বিতাড়িত হয়েছে। রক্ষী প্রধান যখন তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে তার ঘুমে থেকে ওঠা, যোগাভ্যাস, শরীর চর্চা, যুদ্ধকলার প্রশিক্ষণ, স্নান, অর্চনা হয়ে গেছে। এখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন প্রাতঃরাশের।

পরিপাটি পোশাকে রক্ষী প্রধানের সামনে দাঁড়ালেন মহারাজ কারিকালা। রক্ষী প্রধানের মাথা নিচু, 'মহারাজ, একটু আগে আমাদের একজন সৈনিক সদর দরজায় এসে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'মানে? সৈনিক অজ্ঞান হয়ে গেছে মানে? রাজধানীর সৈনিক?'

'না, বাইরে থেকে এসেছে?'

'কোত্থেকে?'

'সেটা এখনো জানতে পারিনি।'

'বলে যাও। তারপর?'

'আমরা চিকিৎসককে সাথে সাথে নিয়ে গেছিলাম ঐ সৈনিকের কাছে। ওর জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফিরতেই সে আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। তারপর আবার চোখ বুজেছে। আমার ধারণা, সৈনিক দক্ষিণ সীমান্ত থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।'

তড়িৎ চিন্তা করে ফেললেন মহারাজ কারিকালা, 'ওকে তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদে আনার ব্যবস্থা করো। সাথে চিকিৎসককেও আনবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ সৈনিকের সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

মহারাজের আদেশ পেতেই আর দেরি করলো না রক্ষী প্রধান। আদেশ পালনে রওনা দিলো।

রাজভবনে অথিতিশালায় আবার চিকিৎসক তার কাজ শুরু করলেন। রাজমহলের শয্যা, সেবা আর রাজবৈদ্যের ওষুধির গুণে এবার স্থির হলো সৈনিক। মহারাজ কারিকালাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে সে শয্যাত্যাগে উদ্যোগী হলো। তবে হাত নেড়ে মানা করলেন মহারাজ কারিকালা,

'না, উঠবে না। তুমি শুয়ে থাকো। সবাই কক্ষ ত্যাগ করো।'

মহারাজের আদেশ সাথে সাথে পালিত হলো। কক্ষে শায়িত সৈন্য ছাড়া আর মাত্র দুজন থাকলেন। মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম।

'এখন কেমন বোধ করছো?' মহারাজ কারিকালা জিজ্ঞেস করলেন।

'অনেক ভালো বোধ করছি মহারাজ।'

'থাক, তবু শুয়ে থাকো। এখন বলো, আমাকে কী সংবাদ দিতে চাও তুমি। আগে বলো, তুমি এসেছ কোত্থেকে?'

সৈনিক এরপরে যে জায়গার নাম বলল, সেটা শুনে দুজনের মুখেই চিন্তার ছাপ পড়লো। সেই জায়গায় একটা শক্ত দুর্গ আছে। এবং এই সৈন্য সেই দুর্গ থেকেই এসেছে। একটু কেঁপে উঠলো মহারাজ কারিকালার গলা, 'কী হয়েছে মহেন্দ্রগড়ে?'

'মহারাজ, সেই বিভীষিকার কথা মনে পড়লে আমার সারা শরীরে এখনো শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। কি ভীষণ সেই আক্রমণ। পলকের মধ্যেই আমাদের সব সৈনিক মারা পড়লো। আমাদের সৈনিকের মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্বাসঘাতক। আমিও মারা পড়তাম, শুধু আপনার কাছে খবর পৌঁছানোর জন্যই আমাকে জীবিত রেখেছে তারা। বলতে গেলে দূত হিসেবে আমার প্রাণ দান করেছে।'

'তুমি কি তাদেরকে চিনতে পেরেছ? তারা কার সৈনিক?' এবারে প্রশ্ন এসেছে মন্ত্রী ইরামের কাছ থেকে।

'মহারাজ, তারা আপনার পিতার মন্ত্রীমণ্ডলের সদস্য। তারা আপনার রাজ্য দখল করে নেবেন বলেছেন।'

'তারা কী বলেছে? একেবারে ঠিক ঠিক বলো।'

'তারা আপনার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। চোলা সিংহাসনে অযোগ্য লোককে সরিয়ে তারা যোগ্য লোক বসাবেন।'

ক্রোধে চোখ জ্বলে উঠলো মহারাজ কারিকালার, 'মহেন্দ্রগড়ের বাসিন্দাদের কী অবস্থা?'

'মহারাজ, আমি সেসব জানি না। তারা মহেন্দ্রগড় দখল করেছে। বিশ্বাসী সৈন্যদের মেরে ফেলেছে। অধিবাসীদের সাথে কী করেছে সেটা জানার আগেই আমাকে পাঠিয়ে দিলো এখানে।'

'আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম নাও। কাউকে এই ব্যাপারে কিছু বলবে না। আপাতত এখানেই থাকবে। আমার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে যাতে কেউ না আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

মন্ত্রী ইরাম মাথা ঝাঁকালেন।

কারিকালা আর ইরাম অথিতিশালা ত্যাগ করলেন। দুজনে কেউই কোনো কথা বলছেন না, কারো দিকে তাকাচ্ছেন না। কথা না বললেও তাদের মাথায় বনবন করছে চিন্তা।

রাজসভার কাছে মন্ত্রণাকক্ষে বসলেন দুজনে। ইরাম প্রথমে মুখ খুললেন, 'সাতবাহন মন্ত্রী গিরিধারীর কথাই তো দেখছি ফলে গেল।'

'তা তো ফলবেই কাকা। শত্রু, অগ্নি, ঋণ আর ব্যাধির শেষ যে রেখেছে তার ভাগ্যে সবসময় এমনই হয়েছে।'

খুশি হলেন ইরাম। বাহ, তার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজনীতির পাঠগুলো ভালোভাবেই মনে রেখেছে, 'কিন্তু তখন তো শত্রু সম্পূর্ণ নাশ করার উপায় আমাদের কাছে ছিল না। বিদ্রোহী মন্ত্রীরা তো পালিয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছিল। খুঁজেই পাওয়া যায়নি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো সেই বিদ্রোহীরা আবার শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে। মহেন্দ্রগড় দখল করে নিয়েছে তারা। তার মানে বলতে গেলে পুরো দক্ষিণ সীমান্ত এখন ওদের দখলে। আমাদের এখনই বড়ো সেনা সমাবেশ করে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। ওদেরকে এবার সমূলে বিনাশ করতে হবে।'

'ধীরে, বৎস, ধীরে। রাজনীতির খেলায় হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না। সেটা সবসময়ই ভুল হয়। ভাবতে হবে, এবং অবশ্যই মাথা ঠান্ডা করে।'

'কিন্তু এত ভেবে ভেবে যদি সময় পেরিয়ে যায়? সব ক্ষতি পোষানো যায় কাকা, কিন্তু চলে যাওয়া সময়ের ক্ষতি কখনো পোষানো যায় না।'

'তা ঠিক বলেছ। তবে ধৈর্যের গুরুত্ব কখনোই অস্বীকার করা যায় না। আচ্ছা, বলো তো, আমরা এখন কী জানি? ওরা দক্ষিণ সীমান্ত পুরোপুরি দখল করে ফেলেছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন কোনো বুদ্ধিমান লোক কী করবে? সৈনিকের কথার হাবভাব থেকে যা বুঝলাম, ওদের সৈন্য আছে কিছু। কিন্তু তা তো আমাদের রাজধানীর সেনাবলের তুলনায় কিছুই না।'

'হ্যাঁ। এবং বুদ্ধিমান লোক এই অবস্থায় সৈন্য সংগ্রহ করে আস্তে আস্তে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হবে। হয় অতর্কিতে নিজের কম সেনাবল নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করবে, নয়তো রাজাকে হত্যার জন্য গুপ্তঘাতক নিয়োগ করবে।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু ওরা এসবের কিছুই করলো না। ওরা আমাদের এক সৈনিককেই পাঠালো আমাদের খবর দিতে। সাথে জানিয়ে দিলো ওদের অবস্থান। এখন কথা হচ্ছে তারা বোকার মতো কাজ কেন করলো? তারা তো বোকা নয়।'

এবার মহারাজ কারিকালার ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ হলো। সত্যিই তো, এই চাল ওরা কেন দিলো?

'শোনো কারিকালা, ওরা তোমাকে দিয়ে যা করাতে চাচ্ছিল, তুমি আসলে ঠিক তাই করতে যাচ্ছিলে। ওরা চায় আমরা যাতে ওদেরকে তড়িঘড়ি আক্রমণ করি।'

'কিন্তু ওরা তা চাইবে কেন? আমরা আক্রমণ করলে তো ওদের বিনাশ নিশ্চিত।'

'হ্যাঁ, সেটাই হবে। কিন্তু তারা তো এমনি এমনি নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে না। তার মানে আমাদের চিন্তায় একটু ভুল হচ্ছে। হিসেব করতে পারছি না।'

'কী ভুল?'

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের সেনাবলের চেয়ে ওদের সেনাবল শক্তিশালী। তাই তারা আমাদের এভাবে আমন্ত্রণ করতে সাহস পাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়েছে তাদের সেনা অনেক কম।'

'কিন্তু, তাতেও তো হিসেব মিলল না। এত সৈন্য ওরা পাবে কোথায়?'

'মন্ত্রী গিরিধারীর একটা ভবিষ্যত বাণী ফলে গেছে। আরেকটা ফলতে অসুবিধা কী?'

'আরেকটা ভবিষ্যত বাণী?'

'হ্যাঁ। চেরা আর পান্ড্য মিলে আমাদের যে আক্রমণের কথা বলে উনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। এখন যা ঘটছে, তাতে মনে হচ্ছে ওনার এই কথাও ফলবে। আমাদের বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডলের দুঃসাহসের পেছনে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তারা নিশ্চয়ই চেরা এবং পান্ড্য রাজাদের কাছ থেকে ইন্দন এবং সাহায্য দুই-ই পেয়েছে। তাদের থেকেই তারা পেয়েছে সৈন্য আর অস্ত্র। আমরা যদি এখন যুদ্ধে যাই, তবে আমাদের তিন দল সৈন্যের মুখোমুখি হতে হবে। চেরা, পান্ড্য আর আমাদের বিদ্রোহী সেনাদল।'

'তাহলে তো এখন আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'আমরা অবশ্যই এখন যুদ্ধযাত্রা করবো না। তবে এখানকার সব খবর আমাদেরকে অতি সত্বর মহামন্ত্রী গিরিধারীকে পাঠাতে হবে। তারপর ওনার পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

গিরিধারীর কাছে খবর পাঠানোর উপায় হাতের কাছেই আছে। দ্রুতগামী দূতের হাতে পত্র প্রেরণ করা হলো। সাংকেতিকে লেখা এই পত্রের মানে গিরিধারী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। দুজন দ্রতগামী দূতকে দুই পথে পাঠানো হলো সাতবাহনে। একজনের হাত থেকে খবর বেহাত হলে অথবা কোনো বিপদে পড়লে আরেকজন অবশ্যই পৌছতে পারবে গিরিধারীর কাছে।

৩৬

তিন শ্রেণির লোক রাত জাগে। রোগী, যোগী আর ভোগী। এদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন। কেউ ঘুমাতে পায় না, কেউ ঘুমাতে চায় না আর কেউ ঘুমাতে যায় না।

রুদ্রদেব এখন পুরোপুরি সৈনিক হবার চেষ্টা করছে। তার হারানো যুদ্ধের জ্ঞান পাওয়ার জন্যই তার এখন যত চেষ্টা। তার এখন কোনোভাবেই রাত জাগার কথা নয়। তবে যোদ্ধাদের জীবনের একসময় যোগী জীবন পালন করতে হয়। এখন রুদ্রদেব সেই জীবনই পালন করছে। হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানের পূর্ণ পুনুরুদ্ধারে সে ব্যবহার করছে যোগ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর ধ্যানের উপযুক্ত সময়। এই সময় প্রকৃতি নীরব হয়ে যায়। মানুষের শরীরের যত চক্র আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চক্র এই সময় প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়। রুদ্রদেব এই সময়ে ধ্যানে মগ্ন থাকে। আজকে রাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অনেকক্ষণ ধরে পদ্মাসনে বসে আছে সে। চেষ্টা করছে ধ্যানের সর্বোচ্চ স্তর মানে সমাধিতে যেতে। তবে পারছে না। সেই পর্যায়ে যেতে আরো সময় প্রয়োজন।

এই নিঃশব্দের মধ্যে শব্দ অনেক দূর থেকে কানে আসে। সেই প্রবল নিঃশব্দের মাঝে অনেক দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে এলো তার কানে। প্রথমেই চোখ খুলল না সে, শুধু কান খাড়া করলো। আওয়াজটার উৎস এবং রকম ধরার চেষ্টা করছে। উৎস অনেক দূরে আর রকম দেখে মনে হচ্ছে অনেক মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করছে।

তাকে যে জঙ্গল রক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে আওয়াজ আসছে না। যদি তাই হতো তবে এই রাতে সে শব্দ আরও জোরালো হতো। তারমানে ঘটনা যাই হোক না কেন, এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকা তার দায়িত্বে পড়ে না। আবার ধ্যানে মন দিলো সে।

কিন্তু, এভাবে বেশিক্ষণ ধ্যানে বসে থাকা গেল না। তার জঙ্গলে না হোক, কিছু মানুষ তো বিপদে পড়েছে। এদিকে ডাকাতের উৎপাতের কথা তার কানে এসেছে। নিশ্চয়ই এই রাতে ডাকাতের হামলা হয়েছে। এছাড়া আর কিইবা বিপদ হতে পারে।

এখন সে যদি নিজের আবাসে বসে থাকে তবে সে স্বার্থপরের কাজ করলো। ভালো করে চিন্তা করলো সে পরিস্থিতি। এই মুহূর্তে অবশ্যই বিপর্যস্ত মানুষকে সাহায্য করাই উচিত তার। তার অভিশাপ পূর্ব জীবনে সে সবসময় স্বার্থপরের কাজই করেছে। নিজের ভালো ছাড়া আর কোনোকিছুই তার চিন্তায় ছিল না। স্বার্থ চিন্তা করেই সে পথ বেছেছে, দল বেছেছে। কখনো ধর্ম চিন্তা করে সেসব করেনি। এখন অভিশাপমুক্ত হয়েও সে যদি একই কাজ করে তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদের আর কী মূল্য রইলো।

না, আর বসে থাকা চলবে না। দ্রুত আসন ত্যাগ করলো সে। দ্রুতহাতে পরে নিলো পোশাক। তারপর সন্ধান করলো অস্ত্র। ধনুক, তীর আর বর্শা নিয়ে নিলো সে। সবরকম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। এই জঙ্গলে বেশ কয়েকবার ঘোড়ায় যাতায়াত করেছে সে। মাঝেমাঝে অন্ধকারেও চলেছে। সে আর ঘোড়া দুজনেরই রাস্তা চেনা আছে। সাথে যদিও কোনো মশাল নেয়নি সে, তবু তাতে কোনো সমস্যা হবে না।

চেঁচামেচির শব্দ এখন শুধু একটা জায়গা থেকেই আসছে না। আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে। তারমানে ডাকাতদল হামলা করে দলটাকে এক জায়গায় রাখতে পারেনি। এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে তারা। ঘটনাস্থলের দিকে ঘোড়া ছোটাল সে।

তবে কিছুক্ষণ পরেই আর লক্ষ্য ঠিক করতে পারলো না সে। সব চিৎকার থেমে গেছে। রুদ্রদেব এর মানে জানে। আতঙ্কিত মানুষের গলার চিৎকার একটা সময়েই থামে। যখন তার আতঙ্ক নিঃশেষ হয়, আর এই জায়গায় আতঙ্ক নিঃশেষ হবে একমাত্র মৃত্যু হলেই। ডাকাতরা কি তাহলে সবাইকে মেরে ফেলেছে? সেই সম্ভাবনাই বেশি।

আর ঘোড়া ছুটিয়ে লাভ নেই। ঘোড়া থামালো সে। ততক্ষণে রাজমার্গের অনেক কাছে চলে এসেছে তার ঘোড়া। আর কেউ বেঁচে না থাকার ভাবনাটা আস্তে আস্তে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে তার মনে। এখন আর ওদিকে গিয়ে লাভ কী? ডাকাতেরা এখন মৃতদেহ থেকে নানা রকমের সম্পদ অন্বেষণে ব্যস্ত হবে। প্রাণই যখন রক্ষা হলো না, তখন আর সেই সম্পদ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করার দরকার নেই।

নিজের কুটিরের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরালো সে। ঠিক তখনই একটা শব্দ কানে এলো তার। না, কোনো চিৎকার নয়। একটা পায়ের শব্দ। রাজমার্গের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে কেউ। একটা মৃদু ঝনঝন শব্দও তার কানে আসে। আশায় দুলে ওঠে তার মন। নিশ্চয়ই কেউ ডাকাতদলের হাত থেকে বেঁচে এদিকে আসছে। তবে সেই ঝনঝন শব্দের উৎস ঠিক ঠাহর করা গেল না।

রুদ্রদেব আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে রাজমার্গের দিকে ঘুরলো। আস্তে করে ঘোড়া হাঁটিয়ে উঠে এলো রাজমার্গের ওপর।

একটু পরেই ছুটন্ত অবয়বটা দেখতে পেলো সে। কেউ একজন ছুটে আসছে। আসলে একজন না দুজন। পেছনের জনের কাছে মশাল আছে। সেই লোকটা তাড়া করছে সামনের জনকে। মশালের আলোয় লোকটার ভীষণ চেহারা সহজেই দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ডাকাতদলের সদস্য।

সামনে যে ছুটে আসছে তার চেহারা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। শুধু অবয়বটাই বোঝা যাচ্ছে। তবে সেটুকু দেখেই রুদ্রদেব বুঝতে পারলো এই অবয়বের মালিকের বয়স খুব বেশি না।

ঠিক তখুনি সামনের অবয়বটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। নিশ্চয়ই কিছুতে হোঁচট খেয়েছে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেড়িয়ে এলো তার গলা দিয়ে। এবার নিশ্চিত হলো রুদ্রদেব। গলার স্বর বুঝিয়ে দিলো স্বরের মালিক এক কিশোর।

পেছনের ডাকাতটা বেশ জোরে ছুটে আসছে। কিশোর আবার উঠে দৌড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। রুদ্রদেব বুঝতে পারলো ছেলেটা পায়ে অনেক জোরালো চোট পেয়েছে। তাই আর ছুটতে পারেনি।

কথাটা রুদ্রদেব অত দূর থেকে বুঝেছে আর কাছে থাকা ডাকাতটা বুঝবে না, তা তো হতে পারে না। ডাকাতটাও সেটা বুঝতে পেরেছে। ছেলেটার কাছে এসে তাড়াহুড়া কমিয়ে ফেললো ডাকাত। এবার ডাকাতকে ভালো করে খেয়াল করলো রুদ্রদেব। মস্ত গোঁফ, তেলতেলে গোলগাল চেহারা, চোখ বড়ো বড়ো। এক হাতে মশাল, আরেক হাতে শোভা পাচ্ছে ভয়ংকর অর্ধচন্দ্র তলোয়ার। এরা ভৈরবীর ডাকাত। ডাকাতের মুখ

আস্তে আস্তে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ তাড়া করে শিকারকে বাগে পাওয়া গেছে। এবার খেলিয়ে খেলিয়ে মারতে হবে।

এই মুখভঙ্গি চেনে রুদ্রদেব। শত্রু পিপাসিত হয়ে উঠেছে রক্তের নেশায়। আর সেই নেশা ধরা দিলো ডাকাতের মুখে। সেই ছায়া স্পষ্ট চিনতে পারলো সে। তার চেহারাতেও এক রাতে এমন রক্তের নেশাছায়া পড়েছিল। হন্তারকের হাতের অর্ধচন্দ্র ফলা থামবে না। আঘাত হানবেই।

একটা প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ তার হাতে এসেছে। তবে দূরত্ব অনেক। আর সাথে যথেষ্ট আলোও নেই। কিছুই কি করা যাবে না?

অসিত তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে অর্ধচন্দ্র ফলার দিকে। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছে ফলা। একটু পরেই নেমে আসবে তীব্র বেগে। ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে মাথা।

ডাকাতটা তলোয়ার পুরোপুরি মাথার ওপর তুলে ফেললো। হাতকে একটু পরেই তলোয়ার নামানোর সংকেত দেবে সে। ঠিক তার আগের মুহূর্তে মাংসে ধ্যাচ করে ধারালো ফলা বেঁধার আওয়াজ ভেসে এলো অসিতের কানে। বিস্মিত চোখে তাকালো সে। এই আওয়াজ তো তার কানে আসার কথা না। কানে আসার আগেই তো তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবার কথা।

ডাকাতের হাতের তলোয়ার তখনো শূন্যে ঝুলছে। একটু পরেই শব্দ করে খসে পড়লো মাটিতে। আর ডাকাতের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে একটা বর্শা। মশালটাও তলোয়ারের পথ ধরে মাটিতে পড়েছে, কিন্তু নিভে যায়নি। ডাকাতও আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সেও প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

ভীত আতঙ্কিত ভাব কেটে গিয়ে অসিতের মাঝে এখন এসেছে হতভম্ব ভাব। এই বর্শা এলো কোত্থেকে? কে ছুঁড়ল? যেদিক থেকে বর্শাটা এসেছে সেদিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো সে। মশালের আলোর দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থাকাতে চোখ ধাধিয়ে গেছে তার। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলো না।

রুদ্রদেব ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। বর্শাটা ছোঁড়ার সময়ও সে জানতো না কাজটা সঠিক ভাবে করতে পারবে কি না। তবে পেরেছে। একটা সময় তার গুরুর আলয়ে বর্শা নিক্ষেপে তার সমতুল্য কেউ ছিল না। অতীতের সেই গুণের কথা স্মরণ করেই বর্শাটা ছুঁড়েছিল সে। অতীতের সেই গুণের ঝলক তার হাতে আবার ফিরে এসেছে। একেবারে নিখুঁত হয়েছে নিক্ষেপ। ঠিক যেখানে বেঁধাতে চেয়েছে সেখানেই বিঁধেছে। ডাকাতের প্রাণ পাখি এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

মশালের আলোয় আসতেই ঘোড়ায় বসা লোকটাকে দেখতে পেলো অসিত। তাতে তার ভীতি না কমে আরও বাড়লো। লোকটা সাধারণের চেয়ে যথেষ্ট লম্বা, যোদ্ধার মতো শরীর। গায়ে একটা পাতলা পোশাক, নিচে কোঁচা মারা কালো ধুতি পরনে। মাথায় কাপড়ের পট্টি বাঁধা, কোমরে একটা খাপে ভরা তলোয়ার।

রুদ্রদেব ঘোড়া থেকে নেমে এলো। তারপর অসিতকে তুলে দাঁড় করালো। কিন্তু না, অসিত দাঁড়াতেও পারছে না। গোড়ালির ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে বসলো তার। আবার রাজমার্গের ওপরে বসে পড়লো সে।

রুদ্রদেবের স্বরে চিন্তা, 'মনে হচ্ছে তোমাকে কোলে করেই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিতে হবে।'

অসিত কোনো উত্তর দিলো না। তার ভীতি এখনো কাটেনি। তার ওপর পায়ে তীব্র যন্ত্রণা। এক রাতের জন্য তার স্নায়ুর ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। এত ভীষণ অবস্থার সামনে সে আরেকদিন পড়েছিল। যেদিন অঙ্গদ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তবে স্নায়ুর ওপর চাপ হিসেব করলে আজকের রাতটাকে অবশ্যই এগিয়ে রাখতে হবে। এখনো যে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি তাই অনেক।

রুদ্রদেব অসিতকে এক ঝটকায় তুলে ফেললো। তাকে বসিয়ে দিলো ঘোড়ার পিঠে। চাপ লাগাতে আবার গোড়ালি টনটন করে উঠলো অসিতের। আবার দাঁতে দাঁত চেপে বসলো তার।

রুদ্রদেব নিজে যখন ঘোড়ায় উঠতে যাবে তখন রাজমার্গের ওপর আবার কিছু পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তাকাতেই দেখা গেল বেশ কিছু মশালের আলো।

অসিতকে আবার ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে নামিয়ে রাখলো সে। ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যদের কথা এতক্ষণ মাথায় আসেনি তার। এদিকে ওরা এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই নিখোঁজ সাথীর খোঁজে। মশালের সংখ্যা আর পায়ের আওয়াজ বলে দিচ্ছে ডাকাতের দল সংখ্যায় বেশ ভারী।

অসিতের মনে আবার ভয় ফিরে এলো। এবার কথা বলল সে, 'ডাকাতের দল তো এদিকেই আসছে।'

তীব্র গতিতে ভাবনা চলছে রুদ্রদেবের মাথায়। এতগুলো ডাকাতের সাথে লড়াই করার সামর্থ্য তার হয়তো আছে, কিন্তু বিনা কারণে ঝুঁকি নিয়ে এতজনের সাথে লড়াই করা কোনো কাজের কথা না। কোনো বুদ্ধিমান ক্ষত্রিয় তা করবে না। যুদ্ধ এড়াবার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কি না তা দেখতে হবে। তড়িৎ গতিতে সেই উপায়ও এসে গেল তার মাথায়। তার অনেকগুলো ভুলে যাওয়া ক্ষমতাগুলোর একটার কথা মনে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি অসিতকে কোলে তুলে রাজমার্গ থেকে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে এলো সে। তারপর ঘোড়াটাকেও শব্দ না করে নিয়ে এলো জঙ্গলের ভেতর। ডাকাতের দল ততক্ষণে অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে।

পালানো যাবে না। ডাকাতেরা তাদের সঙ্গীর দেহ এখানে আবিষ্কার করলে ফিরে যাবে না। প্রতিশোধ নিতে চাইবেই তারা। আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে লাভ নেই। এসব জঙ্গলের ডাকাতেরা অনেক ভালো অনুসরণকারী হয়। ঠিকই ওদের পিছু নিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবে। তারচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানো।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ডাকাতদল একা তাকে আর ল্যাংড়া ছেলেটাকে ভয় পাবে না। এই মুহূর্তে ভয় পাওয়ানোর একটাই উপায় আছে। আর তা হচ্ছে ছলনা।

ঘোড়ার পিঠে এবার জোরে চাপড় মারল রুদ্রদেব। আচমকা ভয় পেয়ে গেল ঘোড়াটা, ডেকে উঠলো বেশ জোরে। ওটার তীব্র হ্রেষা জংগলকে যেন চিরে দিয়েছে।

অবাক হয়ে লোকটার কাজ দেখছে অসিত। ঘোড়াকে দিয়ে চিৎকার কেন করাচ্ছে বুঝতে পারলো না। এখনই তো এদিকে ডাকাতেরা ছুটে আসবে। তবে পরক্ষণেই লোকটার কাজ দেখে তার চোখ ঠিকরে বেড়িয়ে আসার অবস্থা হলো। নিজের গলা দিয়ে একেবারে ঘোড়ার মতো বিকট আওয়াজ বের করলো লোকটা। না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল, এই আওয়াজ কোনো মানুষের গলা দিয়ে বেরিয়েছে। সে শুধু একটা ঘোড়ার আওয়াজ নয়, মনে হচ্ছে অনেকগুলো ঘোড়া একসাথে ডেকে উঠেছে। বার কয়েক এই কাজের পুনরাবৃত্তি করলো লোকটা।

সামনের ছুটন্ত ডাকাতদল থমকে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়ার ডাক ওদের কানে ভালমতোই পৌঁছেছে। এই রাতের বেলা রাজমার্গের ওপর এতগুলো ঘোড়া একসাথে ডেকে ওঠার কোনো কারণই নেই। তার মানে কোনো এক আশ্চর্য কারণে এখন এই সময়ে এখানে রাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা এসে পড়েছে। ডাকাতেরা সবচেয়ে বেশি ভয় করে রাজার সেনাদের। এদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। সর্দার কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চাইলো না, 'মনে হয় আশেপাশে রাজার সৈন্য আছে। আর তারা এদিকেই আসছে। আমাদের এখুনি পালাতে হবে। একটুও দেরি করা যাবে না।'

'কিন্তু সর্দার।' এক ডাকাত কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। বোধহয় দলছুট সঙ্গী সম্পর্কেই কিছু।

তাকে থামিয়ে দিলো সর্দার, 'বুঝেছি কী বলবি। যে গেছে তাকে এখন আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। তার কপালে যা আছে তাই হবে। একজনের জন্য পুরো দলকে আমি বিপদে ফেলতে পারবো না।'

এরপর আর কেউ কিছু বলল না। সবাই নিমেষে রাজমার্গ ছেড়ে ঢুকে পড়লো জঙ্গলের ভেতর। এতক্ষণ ওরা খুঁজছিল, এবার তাদেরকে পালাতে হবে। জঙ্গলে ঢোকার আগেই যে যার মশাল নিভিয়ে ফেলেছে। পালানোর সময় ওদের আর মশালের দরকার নেই। উল্টো মশালের আলো দেখলে রাজার সৈন্যরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।

রুদ্রদেব ডাকাতের জঙ্গলে ঢুকে পড়া এবং আলো নিভিয়ে দেওয়ার কাজটা বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখলো। হাসল সে। তার বুদ্ধি ভালোই কাজে দিয়েছে। আবার অসিতকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলো সে। এবার আস্তে আস্তে ফিরে গেলেই হবে। ঘোড়া হাঁটিয়ে সে নিয়ে গেল কুটিরের দিকে। ঘোড়া ছুটিয়ে নিলে আবার ছেলেটার পায়ে লাগবে।

কুটিরে আলোর ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞেস করা নিষ্প্রয়োজন, কোনো সাথী থেকে থাকলে এতক্ষণে ডাকাতেরা তাকে মেরে ফেলেছে। তবু কথোপকথন শুরু করার জন্যই জিজ্ঞেস করলো রুদ্রদেব, 'তোমার সাথে কেউ আছে? মানে কোনো আত্মীয়-স্বজন?'

'না, এখানে আমার সাথে কেউ ছিল না।'

'তার মানে তুমি একা ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গীদের এতক্ষণে ডাকাতেরা মেরে ফেলেছে। তা তোমরা যাচ্ছিলে কোথায়?'

'সোপারা। পশ্চিমের সমুদ্র বন্দর।'

মাথা নাড়লো রুদ্রদেব। সে নিজেও জায়গাটা ভালো করে চেনে না, 'তুমি আপাতত আমার এখানেই থাকো। বিশ্রাম নাও। সকালে ঘুম থেকে উঠলে তোমার সব কথা শুনবো।'

এবার অসিতের পায়ের দিকে নজর দিলো রুদ্রদেব। গোড়ালির অবস্থা খারাপ। বিশ্রীভাবে ফুলে আছে। টিপেটুপে একটু পরীক্ষা করে দেখল সে। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে ভাঙ্গেনি। এই জায়গায় ভাঙ্গলে সারতে অনেক সময় লাগবে। স্মৃতি হাতড়ে হাড় ভাঙ্গা আর মচকানোর আয়ুর্বেদিক ওষুধ আর চিকিৎসার সন্ধান করলো সে। মনে পড়েছে। তবে সেই ওষুধ খুঁজে বের করতে হবে সকালে।

'তুমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়।'

আচমকা এই মন্তব্যে অবাক হয়ে তাকাল অসিত। এই লোক কীভাবে বুঝেছে? ক্ষত্রিয়োচিত কোনো কাজ তো সে আর এরমধ্যে করেনি।

'অবাক হলে? কীভাবে আমি বুঝতে পারলাম? চার বর্ণের আলাদা আলাদা ক্ষমতা আছে। এটা জন্মের থেকে আসে। একমাত্র ক্ষত্রিয়রাই শারীরিক আঘাত অনেক বেশি মাত্রা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। তোমার পায়ের আঘাত বেশ মারাত্মক। কিন্তু তুমি বিনা আর্তনাদে, বিনা অনুযোগে এতক্ষণ সব সহ্য করেছো। স্পষ্টতই তোমার শরীরে ক্ষত্রিয় রক্ত বইছে।'

'হ্যাঁ। আমি ক্ষত্রিয়।'

'ক্ষত্রিয়, কিন্তু স্বভাবে বৈশ্য। এমন ক্ষত্রিয় যে কিনা দুর্গম যাত্রাপথে শস্ত্র বহন করে না, কিন্তু তার মুদ্রার থলির ঝনঝন আওয়াজ তার অবস্থান শত্রুদের কাছে জানান দেয়।'

অসিত এর জবাব দেয় না। রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ায়, 'তুমি ঘুমানোর চেষ্টা করো। আমি বাইরেই আছি।'

রুদ্রদেব বাইরে গেল। এতদিনে তার শাপ পুরোপুরি কেটেছে। সে এখন একজন সঙ্গী পেয়েছে।

৩৭

গিরিধারী মনোযোগ দিয়ে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছেন। এটা একটা পত্র। তার রেখে আসা চোলার দ্রুতগামী দূত পত্রটা নিয়ে এসেছে। চোলা রাজা কারিকালা এই পত্র পাঠিয়েছেন। দূতকে এর মধ্যেই জেরা করেছেন তিনি। চোলার রাজার পাঠানোর প্রমাণ হিসেবে তার সিলমোহর একেবারে জ্বলজ্বল করছে পত্রের নিচে। এই মোহর আগেও দেখেছিলেন তিনি। না, ভুল হবার জো নেই।

তবে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। দূত, গুপ্তচর, মন্ত্রী- রাজনীতির খেলায় যে কেউ যে-কোনো সময় বিক্রি হয়ে যেতে পারে। আরেকজন দূতের আসার কথা। তার জন্যই অপেক্ষা করছেন এখন তিনি।

অপেক্ষার অবসান হলো। দ্বিতীয় দূত এই মাত্র এসে পৌঁছেছে। খবর পেয়ে দূতকে ডেকে নিয়ে এলেন তিনি। দূতের হাবভাবের দিকে ভালো করে খেয়াল করলেন। তার মুখে কোনো অন্যায় করার পরের দুর্ভাবনা নেই, বরং অনেকদিন পর বাড়ি ফেরার আনন্দ আছে। পত্রটা রেখে দূতকে বিদায় করে দিলেন তিনি।

এসব গুরুত্বপূর্ণ পত্র আদানপ্রদানে গিরিধারীর নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। একাজে সবসময় দুইজন দূত নিয়োগ করেন তিনি। এই দুই দূত একজন আরেকজনকে চিনবে না। দুই দূত রওনা দেবে সম্পূর্ণ আলাদা রাস্তায়। কেউ যদি দূতকে লোভ দেখিয়ে ভুল খবর পাঠাতে চায়, তাহলে তাকে দুই দূতেরই খবর বদলে দিতে হবে। বাস্তবে যা অসম্ভব। কেউ যদি সেই অসম্ভব কাজটা করতে সমর্থ হয়, মানে দুই দূতেরই পত্র বদলে দেয় তাহলেও শেষ রক্ষা হবে না।

এই পত্র সাংকেতিকে লেখা। যে লিখেছে আর যে পড়বে দুজন ছাড়া এই পৃথিবীতে এই পত্রের মানে কেউ জানবে না। আর কেউ যদি আসল খবর না জানে, তাহলে সে সেটা গোপন করে তার খবর ঢুকিয়ে দিতে পারবে না।

দুটো পত্র বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করলেন তিনি। দুটোই একরকম। একেবারে চিহ্ন সহ। নিশ্চিত হলেন এখানে বাইরের কোনো শক্তি হাত দেয়নি।

এবার পত্রের মানে উদ্ধার করতে হবে। বৈদিক গণিতের একটা সুত্র ব্যবহার করে এই পত্রের মানে বের করতে হবে। সেই সূত্র থেকে আসল সংকেতটা বের করতে একটু সময় লাগলো। তবে খবরটা উদ্ধার করার পর হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। তার পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ হয়েছে। তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্র পরাজিত এবং বিতাড়িত মন্ত্রীমণ্ডল আবার চোলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আর অবশেষে তারা ঠিক সেই পথেই হেঁটেছে।

মহারাজকে এখনই খবরটা জানানো দরকার। বলদেবকে সরিয়ে মহারাজ তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই খবরটা দিয়ে তাকে ঠিক প্রমাণ করতে হবে, সেই সাথে নিজেকেও প্রমাণ করতে হবে।

মহারাজ সাতকর্ণী এখন রানির মহলে আছেন। এক দাসীকে ডেকে খবর পাঠালেন তিনি। রানির মহলে পুরুষ প্রবেশ নিষেধ। মহারাজের রানির প্রতি ভালোবাসা আছে, তবে তা আসক্তির পর্যায়ে নয়। কর্তব্যের ডাকে তিনি অবশ্যই তড়িৎ সাড়া দেবেন।

গিরিধারীর এই অনুমান মিথ্যে হলো না। দাসী কিছুক্ষণ পরে এসেই খবরটা দিলো। কমল শয্যা আর সুকোমল অঙ্গশোভা ছেড়ে মহারাজ উঠে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষের দিকে এগোচ্ছেন তিনি। দিনরাত এই মন্ত্রণাকক্ষ এখন তৈরিই থাকে। গিরিধারীও রওনা দিলেন সেদিকে।

মহারাজের সাজে এখনো রানির মহলের ছাপ রয়ে গেছে। দেরি না করে মহারাজকে সব খুলে বললেন গিরিধারী।

একটাও কথা না বলে সব শুনলেন মহারাজ, 'তার মানে মন্ত্রীমণ্ডল চোলার রাজ্যের সীমানায় আক্রমণ করেছে। তারা আপনার ধারণা মতোই বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু তাতে তো আর নতুন কিছু হয়নি। কিছুদিন আগেও তো মন্ত্রীরা ওখানে বিদ্রোহ করেছিল। তারপর রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করেছিল। পরে আবার মহারাজ কারিকালা নিজের আসন পুনুরুদ্ধার করেছে। এখন আবার বিদ্রোহ করেছে মন্ত্রীমণ্ডল। এখন তো আবার আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে। এতে আমাদের কী লাভ হবে সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।'

'আছে মহারাজ, আমাদের লাভ আছে। কারণ এর আগে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ওদের আভ্যন্তরীণ ছিল। তবে আমার ধারণা, এবারে ব্যাপারটা ওদের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ থাকবে না।'

'আচ্ছা। তাহলে এবার জবাব তো পাঠাতে হবে। আপনি কী লিখবেন?'

'মহারাজ, ওরা যে কথা শোনার জন্য আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে, সেই কথাই লিখবো আমি। ওদের জন্য ভরসার কথাই লেখা হবে। ওদের মন্ত্রীমণ্ডল কিন্তু এবার ওদেরকে গুপ্ত আক্রমণ করেনি। বরং সরাসরি আক্রমণ করে উস্কাচ্ছে। আমরা এখন সেই উস্কানি প্রশমিত করবো। এখন এই ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ থাকলে বলতে পারেন।'

'আমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। আমাদের মধ্যে এই সম্পর্কে যা আলোচনা হয়েছিল তা তো এখনো বদলানোর কোনো প্রয়োজন পড়েনি। তাই হোক। তবে সবকিছু নিয়ে আরেকবার বিচার করে নেওয়া উচিত। তির ধনুক থেকে বেড়িয়ে যাবার আগেই লক্ষ্য ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত। আমি শুধু এটুকুই জানি, তির কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তিরন্দাজ। তির যে পথে ছোঁড়া হয় ওদিকেই যায়।'

'হ্যাঁ, মহারাজ। সব আবার চিন্তা করে নেওয়া উচিত। তবে আমার মনে হচ্ছে এবার এই শতরঞ্জের খেলায় আমরা জিতে যাবো। সব এখন পর্যন্ত আমাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে। তবে, হ্যাঁ, চাল দেবার সময়গুলো ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে। সময়ের সাথে সমান তালে পথ চলতে হবে। আগের চাল পরে দিয়ে দিলে চলবে না।'

'হ্যাঁ। আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তা অবশ্যই সফল হতে হবে।'

গিরিধারী এবার আরেক প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, 'মহারাজ, আমাদের নতুন সেনাদলের কী অবস্থা? আপনি তো জানেন আমাদের পরিকল্পনার একটা বড়ো অংশ এই নতুন সেনাদলের ওপর নির্ভর করছে। এরা হবে বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। আপনার সেনাদলের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে আর্যাবর্তের সব রাজারাই জানেন। তারা সেই জানার ওপর ভিত্তি করেই তাদের ব্যূহ নির্মাণ করবেন। আর এই সেনারাই হবে তাদের জন্য চমক, তারাই আপনাকে যুদ্ধে জেতাবে।'

এবার নিজের পছন্দের আলোচনা পাওয়া গেছে। পিঠটা একটু সোজা হলো তার, 'হ্যাঁ, আমাদের নতুন নিযুক্ত সেনাপতিরা সব প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়েছে নতুন সেনাদের। এখন বারবার ঝালিয়ে নিয়ে একেবারে বিদগ্ধ হবার পালা। সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে।'

গিরিধারী আবার বললেন, 'আপনি মহারাজ ঐ সেনাবাহিনীর যত্নে আরও লোক নিয়োগ করুন। ওরাই হবে তুরুপের সবচেয়ে বড়ো তাস।'

'সেই কথা অনাগত ভবিষ্যত আমাদের জানাবে গিরিধারী। তবে চূড়ান্ত বিজয়ের আগে আমাদের ছোটো ছোটো বিজয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। ছোটো পথ না পেরিয়ে কখনো রাজমার্গে ওঠা যায় না। না হলে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন তো দূর, অত দূরে পৌঁছতেই পারবো না।'

'হ্যাঁ মহারাজ। যে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে সে নিচের রাস্তায় হোঁচট খায়।'

'এখন চোলা রাজা কারিকালাকে কী লিখবো সেটা নিয়ে চিন্তা করুন। এই সময়ে আমাদের পত্র তাদের সিদ্ধান্তে বড়ো ভূমিকা রাখবে।'

'আপনি তাহলে অন্দরে ফিরে যান মহারাজ। আমি একটু চিন্তা ভাবনা করে পত্র লিখছি। তাদেরকে সাহায্য করবো আমরা। যা আমি সশরীরে বলে এসেছিলাম।'

'ঠিক আছে।'

মহারাজ অন্দরে ফিরে গেলেন। উত্তর লিখতে বসলেন গিরিধারী। অনেক চিন্তা করে শব্দ বেছে নিলেন। দক্ষিণের ভাষা তিনি জানেন না। সংস্কৃত ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। পত্রে একেবারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এরপর সে আবার আগের কৌশল। দুজন বিশ্বাসী দূতকে ডেকে আনা হলো। আলাদা আলাদা দুজনকে একই পত্রের দুটি প্রতিলিপি দিয়ে দিলেন তিনি। খবরটা এবারও পাঠানো হলো গুপ্ত সংকেতে। সব কাজ সারতে সারতে রাত অনেক গভীর হলো। হোক। এসব কাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই। রাতেই দুই গুপ্তচরকে দুই পথে চোলা রাজ্যের দিকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

চোলা রাজ্যে মন্ত্রীরা বিদ্রোহ করার খবর কেবল সাতবাহন রাজ্যেই পৌঁছেনি। শুধু সাতবাহন রাজ্যই গুপ্তচর নিয়োগ করেনি পুরো ভারত জুড়ে। সব রাজারাই করেছেন। মোটামুটি সব রাজ্যেই এই খবর পৌঁছে গেছে।

সারথী আজ উজ্জয়িনীতে ফিরে এসেছেন। কলিঙ্গ থেকে এখানে আসতে পথশ্রম হয়েছে অনেক। মহারাজ নাহপনা এখনো বারিগাজা থেকে আসল রাজধানীতে ফেরেননি। সারথী এই সংবাদ পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন লম্বা সময় বিশ্রাম দরকার। নিজের বিশ্রাম শয্যায় শুয়ে শুয়ে মহারাজের অপেক্ষা করতে লাগলেন সারথী।

তবে খুব লম্বা সময় তিনি পেলেন না বিশ্রাম করার জন্য। সন্ধ্যার একটু পরেই মহারাজ নাহাপনা উজ্জয়ীনীতে প্রবেশ করলেন। সেনারা বেশ সতর্ক হয়ে পাহারা দিচ্ছে তাকে। তাদের পাহারা গলে একটা মাছিরও মহারাজের কাছে ঘেঁষার সামর্থ্য নেই। মহারাজকে রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের কাছে হস্তান্তর করে তারা বিশ্রামের জন্য চলে গেল সেনানিবাসে। এই কয়মাস বেশ ঝক্কি গেছে।

তবে মহারাজ নাহাপনা জানেন, তার আর বিশ্রাম নেওয়া হবে না। সারথী যে কলিঙ্গ থেকে ফিরে এসেছেন, সেই খবর তিনি আসা মাত্রই পেয়েছেন। তাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠানো হয়েছিল কলিঙ্গে। তার সাথে আলোচনা শেষ না করে বিশ্রামে মন বসবে না। আর কাজ বাকি রেখে অবসরে কোনো মজাও পাওয়া যায় না।

এবারের ব্যবসায়ের মৌসুম শেষ হয়েছে। আগামী মৌসুমের বাতাস বইতে শুরু করার আগেই আর্যাবর্তের সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাণিজ্যিক হিসেবে তিনিই এখন এই আর্যাবর্তের সম্রাট। আর এই অবস্থা কোনোভাবেই হারানো চলবে না। সকল বাহ্যিক হুমকি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে এই সময়ের মধ্যে।

অন্দরের আগে মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করলেন মহারাজ নাহাপনা। তার আসার খবর সারথী এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন। তাকেও মন্ত্রণাকক্ষে আসার হুকুম এর মধ্যেই জারি হয়ে গেছে।

মহারাজ নাহাপনা একাই এসেছেন। অ্যালেক সাথে আসেনি। অনেকদিন ধরেই সে মহারাজের সাথে সাথে থাকে। তবে এবার তাকে মহারাজ বারিগাজার সার্বক্ষণিক সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। অবস্থা অনেক খারাপ। বারিগাজার সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। তাই এখন থেকে অ্যালেক আর তার সেনা বারিগাজাতেই থাকবে।

মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকেই নিজের সজ্জা হালকা করায় মন দিলেন মহারাজ। প্রথমেই অস্ত্রশস্ত্র যা শরীরের সাথে আটকে আছে তা খুলে ফেললেন তিনি। তারপর খুলে ফেললেন শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। বাকি পোশাকের বাঁধনও আলগা করে দিলেন। একটু যেন আরাম পেলো শরীর। পথের যন্ত্রণা যেন একটু কমলো।

ততক্ষণে সারথী এসে তার জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে বসেছেন।

'সারথী, কলিঙ্গ রাজ্যটা তো ঘুরে এলেন। তা রাজ্যটা কেমন? মাঝে মাঝে বিহারে তো যাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, মহারাজ। তা যাওয়াই যায়। সত্যিই কলিঙ্গ দেখার মতো। তোশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার ভাষার কাজ না। আমি অপারগ। দয়া নদীর সৌন্দর্য এবং নৌবিহারের আনন্দ বেশ মনোহারি। আর স্থাপত্য সৌন্দর্যেও কলিঙ্গের তুলনা এই ভারতে মেলা ভার।'

হাসলেন নাহাপনা, 'আপনি যে একেবারে গদগদ হয়ে গেলেন সারথী। আপনার মন তো আবার বদলে যায়নি? আপনি কি কলিঙ্গে চলে যাবার চিন্তা করছেন না-কি?'

'না। সৌন্দর্যে আমাদের উজ্জয়ীনী কম কীসে।'

'তাই। ওসব চিন্তা করবেন না। সেনানীতিতে আমার মাথা ভালোই চলে কিন্তু আমাকে কূটনীতির পরামর্শ দেবার জন্য আপনার চেয়ে ভালো লোক তো এই শক রাজ্যে নেই।'

কথাটা উপহাসের সুরেই বলেছেন মহারাজ নাহাপনা। উপহাসের সুর গলাতে তুলেই উত্তর দিলেন গিরিধারী, 'না মহারাজ। আমি ধর্মনীতিতে সিদ্ধ না হতে পারি, রাজনীতিতে সিদ্ধ। আর জানেন তো, সিদ্ধপুরুষের সুরূপ অথবা কুরূপ দর্শনে কোনো ধরনের আসক্তি বা ঘৃণা কিছুই হয় না।'

'আপনি সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমি না সারথী। আমার তো বেশ ইচ্ছা করে মন ভরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে। সুরম্য কোনো নৌকায় করে নৌ বিহারে যেতে। আর আপনি তো বললেনেই তার জন্য তোশিলার দয়া নদীর কোনো তুলনাই নাই। কিন্তু তাতে একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা মহারাজ?'

'আমি মহারাজ নাহাপনা। এই মুহূর্তে আর্যাবর্তের সবচেয়ে ধনী রাজা। আমি তো আর বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও বেড়াতে যেতে পারি না। তবে'

'বলুন মহারাজ।'

'তবে কোনো রাজ্য যদি শক রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব করে, মিত্র হয়, তাহলে ঐ রাজ্যে মাঝে মাঝে বিহারে যাওয়া যেতে পারে।'

এবার মহারাজ নাহাপনার আলোচনার গতি এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন সারথী, 'কলিঙ্গের সাথে বন্ধুত্ব করাতে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি মহারাজ।'

মহারাজ নাহাপনার মুখ থেকে বিদ্রুপ এবং উপহাস দূর হয়েছে। সেখানে এখন গভীরতা, 'আমি কলিঙ্গ রাজ্যকে বন্ধু বানানোর জন্য আপনাকে পাঠাইনি সারথী। ঐ রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, প্রজা এবং সেনা কিনে নেবার জন্য আপনাকে পাঠানো হয়েছিল।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'সে ব্যাপারে বলুন।'

'আমাদের প্রস্তাবে কলিঙ্গ রাজ আসাকা রাজি নন। পাঁচ মণ স্বর্ণের বিনিময়ে তিনি তার সেনা আমাদের আদেশের অধীন করে দেবেন না।'

'তিনি রাজি হননি?' মহারাজ নাহাপনার চোখে চিন্তার ছায়া।

'না মহারাজ।'

'আচ্ছা।'

'তবে, উনি আমাদের প্রস্তাবের বিপরীতে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা যদি বাৎসরিক বিশ মণ সোনা ওনাকে দেই তবে উনি রাজি হবেন।'

'বাহ, তবে তাই হোক। আচ্ছা, ওনার সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের গুপ্তচর যে সংবাদ দিয়েছিল, তা কি সত্য?'

'জি মহারাজ। আমাদের চরদের দেওয়া খবরের থেকেও তার সেনার বল বেশি।'

'ঠিক আছে। কলিঙ্গ রাজের প্রস্তাবে আমি রাজি। বিশ মণ সৈন্য আর আমার আদেশপত্র তোশিলায় পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

আদেশপত্র নিজেই লিখতে বসলেন মহারাজ নাহাপনা। নীরবে সময়টুকু কাটালেন সারথী। পত্র লেখা শেষ হতেই সারথীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, 'আজ রাতের মধ্যেই সোনা আর আদেশপত্র কলিঙ্গে প্রেরণ করুন। আচ্ছা, যদি সোনা পাবার পরে কলিঙ্গ রাজ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে?'

'তা করবে না মহারাজ। কাঞ্চন মানুষের মনে উচ্চ লোভ তৈরি করে। আমাদের সাথে থাকলে, আমাদের আদেশ মানলে পরের বছরও বিশ মণ সোনা পাওয়া যাবে। এই লোভ মহারাজ আসাকা ছাড়তে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।'

'আচ্ছা, আপনি যান। এবার তাহলে অন্দরে গিয়ে স্নান-খাওয়া করি।'

বেরোতে উদ্যত হলেন সারথী। একটা কথা মনে পড়তে আবার ফিরলেন, 'মহারাজ, আরেকটা বিষয়।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'চোলা রাজ্য থেকে আমাদের গুপ্তচর একটা খবর এনেছে। চোলা রাজ্যের পরাজিত বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডল আবার বিদ্রোহ করেছে।'

'এটা নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু নেই। তাদের মন্ত্রী আর রাজার মধ্যে এই কুকুর বেড়াল খেলা চলতেই থাকবে। যতক্ষণ না এক পক্ষ সমূলে ধ্বংস হয়। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি আমার জানামতে সবসময় টালমাটাল থাকে। ওদিকে এখন নজর দেবার সময় নেই সারথী। আমাদের আগে নিজেদের দুর্গ পোক্ত করতে হবে। কলিঙ্গকে আমাদের পক্ষের দুর্গ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে সাতবাহনের বিরুদ্ধে। এটাই এখন আমাদের প্রথম কাজ।'

'জি মহারাজ।'

মন্ত্রণাকক্ষ থেকে প্রস্থান করলেন মহারাজ নাহাপনা।

শেষের গিঁটটা খুব সাবধানে বাঁধতে হয়। বেশি শক্ত হলে চলবে না, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পচন ধরে যেতে পারে। আবার বেশি ঢিল দিলে চলবে না, বাতাস ঢুকে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। এখানেই বিশেষজ্ঞের কাজ। জ্ঞান সবাই লাভ করতে পারে কিন্তু হাতযশ অন্য জিনিস। অভিজ্ঞতার সাথে সাথে ভগবানের আশীর্বাদও লাগে এখানে।

সকালে উঠেই প্রথমে অসিতের পায়ের অবস্থা আবার ভালো করে খেয়াল করেছে রুদ্রদেব। অসিত বলতে গেলে সারারাত না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। ফোলাটা আরও বেড়েছিল। পরীক্ষা করে কপালে চিন্তার ভাজ পড়েছিল রুদ্রদেবের। রাতে মনে হয়েছিল ভাঙেনি, কিন্তু সকালে রকমসকম দেখে সেই আত্মবিশ্বাস আর পাচ্ছে না। গতিক সুবিধার না।

জঙ্গল থেকে তখুনি ওষুধি খুঁজে এনেছে রুদ্রদেব। ওষুধের রস বের করে কাপড়ে ভিজিয়ে অসিতের গোড়ালি মুড়ে দিয়েছে। এরপর পায়ের নড়াচড়া কমাতে হবে। তাতে দুদিকে দুটো কাঠের টুকরা বেঁধে দিতে হবে। দুদিনে যদি ফোলা আর ব্যথা কমে যায়, তার মানে ভাঙেনি। আর দুদিন পরেও যদি ফোলা থাকে তাহলে কপালে দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ আছে অসিতের।

শেষ গিঁটটা বেঁধে উঠে দাঁড়ালো রুদ্রদেব, 'দুদিন তোমাকে এভাবেই থাকতে হবে। পা একেবারেই নাড়াতে পারবে না কিন্তু।'

পা নাড়ানোর তেমন কোনো ইচ্ছে অসিতের নেই, 'ঠিক আছে।'

সকালবেলাতেই অসিতকে নিয়ে পড়েছিল রুদ্রদেব। সকালের নিয়মিত কাজগুলো করা হয়নি। যোগাভ্যাস আর শস্ত্রের অভ্যাস করতে হবে। ঢিল দেওয়া যাবে না। বেলা যদিও বেড়ে গেছে তবু। তাড়াতাড়ি উঠানের মাঝখানে নির্ধারিত জায়গায় চলে গেল সে। তারপর নিয়ম মতো অভ্যাস শুরু করলো।

অসিতের ব্যথা এখনো একটুও কমেনি। লোকটার কাজকর্ম সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কেমন যেন ধীর-স্থির গতি, কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ কেমন মসৃণভাবে করে যাচ্ছে। মুখে কোনো চিন্তা নেই, কাল রাতের ঘটনার কোনো উত্তেজনা নেই। আগে এমন কাউকে দেখেনি সে। উঠানের এক কোণে অনড় বসে সে এখন তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের দিকে। রুদ্রদেব প্রথমেই শুরু করলো যোগাভ্যাস। সূর্য নমস্কার সেরে নিলো শুরুতেই। তারপর শুরু করলো অন্যান্য আসনগুলো।

অদ্ভুত সেসব আসন। দেখতে দেখতে অসিতের অবাক হওয়ার মাত্রা বাড়তে লাগলো। কেউ যে কারো শরীর নিয়ে এত আশ্চর্য ভঙ্গিমা করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রত্যেকটা আসনেই রুদ্রদেবের শরীর যেন এক একটা প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে। ময়ূরাসনে যেন একটা পেখম মেলা স্থির ময়ূর, শশাসনে ঠিক যেন গুটিসুটি মারা খরগোশ, ভুজঙ্গাসনে ঠিক যেন একটা ফনা তোলা কেউটে সাপ। আরও অনেক প্রাণী দেহে রুপান্তরিত হয়ে গেল রুদ্রদেবের দেহ। যোগাসন সম্পর্কে অসিতের

তেমন একটা জানাশোনা ছিল না। তাদের রাধামাধব শাস্ত্রী মাঝে মাঝে মন্দিরের চাতালে মাথা নিচের দিকে আর পা ওপরের দিকে দিয়ে শীর্ষাসনে থাকতেন। তবে রুদ্রদেবের একেবারে শেষ আসনটা দেখে অসিত একটু নিশ্চিন্ত হলো। এটা অতি সহজেই করা যাবে। শবাসন।

শবাসনে শুয়ে অসিতের দিকে দৃষ্টি গেল রুদ্রদেবের। অসিতের চোখের উদগ্র কৌতূহল তার চোখ এড়ালো না,

'এগুলো যোগাসন। তোমার যদি মনে হয়ে থাকে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে বলেই আমি এসব করছি তাহলে তুমি ভুল করছো। বিভিন্ন প্রাণী এবং বস্তুর অনুকরণে এসব করতে হয়। যে প্রাণীর অনুকরণে এসব করা হয় সেই প্রাণীর গুণাগুণ এবং স্বভাব তোমার মাঝে চলে আসবে। শারীরিক ভাবে ঐ প্রাণী যেসব কাজ করতে সক্ষম তুমিও সেসব করতে পারবে।' অসিতকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে বলল সে।

'শারীরিক আর মানসিক ত্রুটিগুলো?' অসিত জানতে চায়। কোনো প্রাণীর নকলে আসন করলে তার গুণাগুণ যেমন চলে আসতে পারে তেমনি দোষগুলোও তো চলে আসতে পারে।' একজন প্রায় অপরিচিত লোকের সাথে আলাপ জমাতে অসিতের তেমন সমস্যা হলো না। সে অঙ্গদকে নিয়ে অনেক জায়গায় খেলা দেখিয়েছে। খেলা দেখাতে গেলে অনেক অপরিচিত মানুষের সাথে নানা কথা বলতে হয়। তার ভেতরে সেই ভীতি আর নেই।

অসিতের কথায় হাসল রুদ্রদেব, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সেই সম্ভাবনাও আছে। তবে জানো কি, খারাপ গুণগুলো আয়ত্ত করার জন্য সাধনার দরকার হয় না। ইন্দ্রিয় সহজেই সাধনা ছাড়াই খারাপ গুণ টেনে নিতে পারে। আর যোগী আস্তে আস্তে সাধনায় হয়ে ওঠেন যোগীহংস। যে দুধ আর জলের মিশ্রণ থেকে কেবল দুধটাই তুলে নেবে। আর জলটা যেখানেরটা সেখানেই পড়ে থাকবে।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলো না অসিত। বলা ভালো ঠিকভাবে বোঝার চেষ্টাও করলো না। সে জিজ্ঞেস করলো, 'অনেক আসন তো করলেন।' তারপরের প্রশ্নটা যদিও উপহাসের মতো শোনালো, তবে উপহাস করে বলেনি অসিত, 'আপনার আসনের মধ্যে বানরাসন নেই?'

রুদ্রদেব ঠিক বুঝতে পারলো না, 'কী আসন বললে?'

'বানরাসন। মানে বানরের অঙ্গভঙ্গি।'

এবার বুঝতে পারলো রুদ্রদেব। সাথে সাথে হো হো করে হেসে উঠলো সে, 'না নেই। এমন কোনো আসনের অনুশীলন আমি করিনি। পৃথিবীতে সবকিছুরই সীমাবদ্ধতা আছে। যদিও যোগের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একসময় অসীমের সাথে মিশে যাওয়া তাও এখানে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। বাঁদরামি বোধহয় স্বয়ং আদিযোগী মহাযোগীরও অসাধ্য।' কথাটা বলেই নিজেকে সামলে নিলো রুদ্রদেব। না, আদিযোগীর অসাধ্য কিছুই নেই। তিনি নিশ্চয়ই বানরের মধ্য থেকেও ভালো কিছু বের করে আনতে পারবেন।

বাঁদরের কথা অঙ্গদের কথা মনে পড়েছে দেখেই বলেছে অসিত। রুদ্রদেব চুপ করে যেতেই সে আর কোনো কথা বলল না। একমনে ভারী হৃদয়ে তাকিয়ে রইলো মাটির দিকে।

অসিতের এই আচমকা চুপ হয়ে যাওয়াটা নজর এড়ালো না রুদ্রদেবের। শবাসনে থেকে এত কথা বলা উচিত নয়। সেও আর কোনো কথা বলল না। শবাসনে যখন বিশ্রাম সম্পূর্ণ হলো তখন সে উঠে এলো। বসলো একেবারে অসিতের পাশে, 'কাল রাত থেকে আমার নজর তোমার পায়ের দিকেই ছিল। অবশ্য যে ঘটনার ভেতর দিয়ে তুমি গিয়েছিলে তা থেকে বেরোতেও তোমাকে একটু সময় দিতে চেয়েছিলাম। তোমার কথা তো কিছুই শোনা হয়নি। তুমি কোত্থেকে এসেছ, কেন এসেছ, কোথায় যাচ্ছ কিছুই তো জানি না। ডাকাতের কবলেই বা পড়লে কীভাবে? বলো দেখি। কেন যেন মনে হচ্ছে বলার মতো খুব সুন্দর একটা গল্প আছে তোমার কাছে।'

অসিত এবার একটু ইতস্তত করে। এই লোক তার সাথে এতটা উন্মুক্ত হয়ে কথা বলছে কেন? তার কিছুদিনের আগের অভিজ্ঞতা এত ভালো না। সেই লোকও এভাবেই মিষ্টি করে কথা বলতো। এখন আর চট করে কাউকে বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছে না সে।

রুদ্রদেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। এখন আর কিছুই বলল না, জোর করলো না। ছেলেটা এখনো সহজ হয়নি। আর মানুষকে সহজ করতে হলে সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় এক সাথে খাবার খাওয়া।

রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ালো, 'দাঁড়াও। তোমার গল্প পরে বললেও চলবে। এখন আগে কিছু খাওয়া দরকার। প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। তোমারও নিশ্চয়ই লেগেছে। কিছু খাবার নিয়ে আসি। খেতে খেতে গল্প জমে ভালো।'

জঙ্গলের আর চাকুরি প্রদানকারীর মিলিত দানে খাবারের আয়োজন ভালোই। তাজা সবজি আর সেদ্ধ শস্য।

খেতে খেতে মন স্থির হয়ে এলো অসিতের। গল্প বলতে শুরু করলো সে। কাল রাতে এই লোক তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তার গল্প শোনার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য প্রাণ রক্ষা নিশ্চয়ই যথেষ্ট।

রুদ্রদেব গল্প শুরু হতে একটা কথাও বলল না। একমনে শুনে যাচ্ছে কেবল। সাথে কেবল আস্তে আস্তে মুখ চলছে। খাওয়া শেষ হবার পরেও গল্প শেষ হলো না। অনেকক্ষণ চলল। অঙ্গদের হারিয়ে যাবার আর নিজের গ্রাম ছেড়ে আসার বর্ণনা দিতে গিয়ে অসিতের গলা বেশ ভারী হয়ে এলো।

রুদ্রদেব গল্প শেষ হবার পর কথা বলল, 'এখানে তোমার ভয় পাওয়ার তেমন কিছু নেই। এখানে ডাকাত আসবে না সে কথা বলছি না, তবে আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমার কাছে তেমন কিছুই নেই। আর যদি চলেও আসে তাহলে মোকাবেলা করা যাবে।'

অসিত অনেকক্ষণ ধরে গল্প বলেছে। একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছে তার গলা। এবার তার মনে ইচ্ছে জেগেছে গল্প শোনার। সামনে লোকটা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই তার

বেশ কৌতূহল হচ্ছে, 'আমার গল্প তো শুনলেন। এবার আপনার কথা বলুন। আপনি এই জঙ্গলের পাশে একা একা থাকেন। কেন থাকেন? আপনার পরিবারে কেউ নেই? আপনার আসল বাড়ি কোথায়? এখানেই?'

একসাথে অনেক প্রশ্ন করা হয়ে গেছে।

রুদ্রদেব একটু হাসলো, 'গল্প সবারই থাকে, আমারও আছে। তবে জানো কি, আমার গল্পটা তোমার গল্পের মতো এত রোমাঞ্চকর না, শুনে মজা পাবে না। তবে কাহিনি অনেক বড়ো। এতো বড়ো কাহিনি বলে সময় নষ্ট করা উচিত হবে বলে মনে করি না। আমার বাড়ি এই কুটিরেই। এই সংসারে আমি বাদে আমার আর কেউ নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। পূর্ণ সন্ন্যাসী জীবন।'

'পুরোই আমার মতো অবস্থা। তিন কূলে কেউ নেই। তবে আমার রক্তের সম্পর্কের কেউ না থাকলেও মায়ের মতো এক পিসি আছে। আর ভাইয়ের মতো ছিল একজন। কিন্তু...'

রুদ্রদেব ততক্ষণে অসিতের কাহিনি পুরোটা জেনে গেছে। অঙ্গদ নামে তার একটা বানর ছিল। তাকে অসিত নিজের ভাই মনে করে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। এই সমাজে পশুপাখিকে অনেক উঁচু অবস্থান আগে থেকেই দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে বানরের রামের পরম ভক্ত হবারও নজর আছে।

খাবারের পরে সাথে সাথে শারীরিক কোনো কাজ করা ক্ষতিকর। একটু বিরতি মানে বিশ্রাম নিয়ে অস্ত্রচর্চা শুরু করতে হবে। সেই বিরতিতে রুদ্রদেব অসিতের সাথে কথা চালিয়ে গেল,

'তোমার পরিকল্পনা করা হয়নি। যদিও তোমার ব্যাপারে মত দেওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই, তবু বলছি, যে চিন্তা করে তুমি ঘর থেকে বের হয়েছ তাতে সমস্যা ছিল। তাই তুমি সরাসরি এসে ডাকাতের খপ্পরে এসে পড়েছ।'

'মানে? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? গ্রামের সব লোকেই তা বলেছিল। অঙ্গদকে খুঁজতে বেরোনো তোর বড়ো ভুল হচ্ছে। এখন আপনিও বলছেন আমার ভুল হয়েছে। আপনারও নিশ্চয়ই মনে হয়, দুটো ভালো দেখে গাভী কিনে রাঁধাকে বিয়ে করে আমার গ্রামে থেকে যাওয়াই উচিত ছিল?'

'সত্যি বলতে কী, এটা করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো। শান্তিতে থাকতে পারতে। এই পৃথিবীতে শান্তির চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত আর কিছুই নেই। গৌতম তাই বলেছেন। যা সম্বল আছে, সব বিলিয়ে দাও। যা কিছু আছে, সব চলে যেতে দাও। কিছুই আঁকড়ে ধরে রেখো না। তাহলে শান্তি আসবে জীবনে, আর থেকেও যাবে।'

অসিত গৌতমের উচ্চমার্গের কথা ঠিক বুঝতে পারে না, 'এটা আবার কেমন কথা? মানুষের জীবন ধারণের অবলম্বন, স্বজন, আত্মীয়, বৌ, যেই চলে যেতে চায় চলে যেতে দিতে হবে? চোর, খুনি, ধাপ্পাবাজ কাউকেই আটকাবো না? কারো বিচার নেই? সবাইকে চলে যেতে দেবো? তাহলে এই পৃথিবী চলবে কীভাবে?'

অসিতের কথায় যুক্তি আছে। আর কাঁচা হলেও যুক্তি যুক্তিই। এই যুক্তি দেবার ক্ষমতা, তর্ক করার ক্ষমতা নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করা ছাড়া অর্জন করা যায় না। রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি ছোটোবেলায় গুরুকুলে গিয়েছিলে?'

'না, আমি কোনো গুরুকুলে পড়িনি। আমাদের গ্রামের মন্দিরের পুরোহিত রাধামাধব শাস্ত্রীর কাছে মন্দিরে পড়তাম। তিনি জোর করে ধরে নিয়ে আমাদের পড়াতেন। সেখান থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। বেশির ভাগই মনে নেই।'

'তাহলে তো অনেক কিছুই তোমার জানা থাকার কথা। যদিও নীতিশাস্ত্র এবং জীবনে কী করতে হবে সেটা বোঝার শিক্ষা অর্জন করতে হলে আরও পড়াশোনা করতে হয়। আরেকটু বেশি বয়স পর্যন্ত গুরুকুলে থাকতে হয়। সেই শিক্ষা না থাকাতেই তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করতে পারোনি।'

'কী ভুল হয়েছে আমার?'

'তোমার চোখ রাখা হয়নি। ভুল জায়গায় নজর দিয়েছ তুমি। যেহেতু এটা একটা কাজ, তাই শাস্ত্রে কাজ করার উপায় সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তাই তোমাকে মনে রাখতে হতো।'

'কী সেটা?'

'কর্মযোগ।'

'বুঝলাম না।'

'বলছি। এখানে তোমাকে কর্মযোগের নীতি পালন করতে হতো। তোমার এখানে ভুল হচ্ছে, তুমি দৃষ্টি রেখেছিলে লক্ষ্যের দিকে। কিন্তু সেই লক্ষ্যের কাছে পৌঁছতে যে পরিকল্পনা প্রয়োজন, যে পথ অবলম্বন করতে হবে, সেদিকে তোমার নজর একেবারেই ছিল না। তেমন গুরুত্ব পরিকল্পনায় দাওনি। তুমি কেবল অঙ্গদকে পাবার কথাই চিন্তা করেছিলে, তাকে পেলে কী কী করবে আবার সে চিন্তা করেছিলে, কিন্তু পথে বেরিয়েছ কোনোকিছু না জেনেই, অন্ধের মতো। সেজন্যই বিপদে পড়ে গেছো। কিন্তু লক্ষ্যের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারোনি।'

'তাহলে আমি কী করতাম?'

'কর্মযোগ সম্পর্কে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক কথাই বলেছিলেন। তোমার যদি এক চোখ লক্ষ্য অর্জন করার পর কী উদযাপন করবে সেই চিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকে, তাহলে আর একটা চোখই বাকি থাকে পথ চলার জন্য। সেটা ঠিক ভাবে হয় না। এজন্যই কর্মফল চিন্তা না করে কর্ম করার দিকেই পূর্ণ নজর দিতে হবে। আসল সত্যিটা হচ্ছে, কর্মফলের কথা চিন্তা না করলেই কর্মে সফল হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। এখানে তোমার অন্ধভাবে অঙ্গদের দিকে না ছুটে কোন পথে যেতে হবে, সেই পথে কী কী বাঁধা আছে, সেই বাঁধা সরানোর জন্য কী কী করতে হবে সেসব নিয়ে ভাবা উচিত ছিল। এখানেই তোমার ভুল হয়েছে।'

এত বড়ো তত্ত্বকথা অসিত যে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে তা বলা যাবে না। সে চুপ করে গেল। রুদ্রদেবের বিরতির সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখন চর্চার দ্বিতীয় ভাগ শুরু করতে হবে। প্রস্তুত হয়ে নিলো সে।

দ্বিতীয় ভাগে শস্ত্রবিদ্যার চর্চা। যোগাসনের চেয়ে এই চর্চা দেখা বেশি উত্তেজনাকর। উঠানের কোণায় আগের জায়গাটায় বসে যুদ্ধকলার চর্চা দেখতে লাগলো অসিত। বলাই বাহুল্য, সারা জীবন ইন্দ্রপুরে কাটিয়ে এমন যুদ্ধকলার প্রদর্শনী সে কখনো দেখেনি।

প্রথমে তলোয়ার নিয়ে শুরু করেছিল রুদ্রদেব। নানা রকমের আঘাত, নানা ভঙ্গিমায় রক্ষণ, আর একসাথে অনেক যোদ্ধার সাথে একই সাথে যুদ্ধ করার কৌশল ঝালিয়ে নিতে লাগলো সে। তলোয়ারের চর্চার পর একে একে বর্শা, ধনুক আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের কৌশলও চর্চা করা শেষ হলো।

অসিত পুরো চর্চাটাই বলতে গেলে দম বন্ধ করে দেখেছে। সে সবচেয়ে অবাক হয়েছে রুদ্রদেবের ধনুর্বিদ্যার চর্চায়। রুদ্রদেব চর্চার মধ্যে একবার একই সাথে তিনটা তির ছুঁড়েছে। তার মুখ সম্পূর্ণ হাঁ করে দিয়ে তিনটা তিরই আলাদা আলাদা তিনটা নির্ধারিত লক্ষ্যে বিঁধেছে।

মুখের হাঁ সম্পূর্ণ প্রসারিত করে অসিত বুঝতে পারলো সে ভুল করেছে। এরপরে চোয়াল আর প্রসারিত হবার উপায় নেই। বিস্ময় হজম করার আর কোনো উপায় পাচ্ছে না শরীর। এবার রুদ্রদেব তুলে নিলো একই সাথে পাঁচটা তীর। তারপর একই সাথে ছুঁড়ে দিলো সবগুলো। একই ফলাফল হলো। পাঁচটা তিরই গিয়ে বিঁধল পাঁচটা নির্ধারিত লক্ষ্যে।

শস্ত্র চর্চা শেষ হলো। রুদ্রদেবের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। স্নান করার আগে শরীর জুড়িয়ে নেবার জন্য আবারো বিশ্রামে বসলো সে।

অসিত একেবারে গুণমুগ্ধ এবারে, 'আপনি তো অনেক বড়ো যোদ্ধা। যদিও কাল রাতেই আপনার বর্শা নিক্ষেপ দেখে আমার তা বোঝা উচিত ছিল। আমি এভাবে যুদ্ধ করতে আর আউকে দেখিনি।'

'যুদ্ধ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি এখানে কোনো যুদ্ধ করিনি। যুদ্ধকলার অনুশীলন করছিলাম মাত্র। যুদ্ধ না করতে হলেই ভালো।'

এরপর অসিতের দুহাতের তালু আর আঙুলগুলো পরীক্ষা করলো রুদ্রদেব, 'তুমি কেবল নামে আর জন্মের হিসেবে ক্ষত্রিয়। তোমার হাত স্পষ্ট বলছে তুমি কখনো শস্ত্র ছুঁয়েও দেখোনি। আমার তো মনে হয় না, তুমি কখনো কোনো ক্ষত্রিয় যোদ্ধাকে চোখের সামনে দেখেছ।'

'আপনার এই ধারণা ভুল। আমি দেখেছি। আমাদের গ্রামে রাজার সৈনিক আছে। তাদের দেখেছি। আমাদের গ্রামেই এক যোদ্ধা আছে। সে যুদ্ধ করে স্বয়ং রাজার বাহিনীতে।'

'আচ্ছা, তাহলে তো ভালোই অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার।'

অঙ্গদকে খুঁজতে যাবার চিন্তা আবার পেয়ে বসলো অসিতকে। তবে এখন পায়ের যা অবস্থা তাতে কোথাও যাওয়া সহজে সম্ভব হবে না। আর রুদ্রদেবের কথাও ঠিক। তাকে আরও ভালো করে ভাবতে হবে। আর এখন তার একটা আশ্রয় দরকার। আশ্রয় হিসেবে এই পৃথিবীতে রুদ্রদেবের এই কুটির থেকে ভালো জায়গা এখন তার জন্য নেই।

রুদ্রদেবের যুদ্ধকলা দেখে একটা ইচ্ছে তার মনে উঁকি দিচ্ছে। ওনার কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে পারলে মন্দ হতো না। রাহুর সাথে দেখা হলে একটা সংঘর্ষ তো হবেই। শিখে নিলে কাজে লাগবে।। আর তার শিষ্য হিসেবে এখানে থাকতেও

পারবে। আর চোখের সামনে এমন কলা দেখলে যে-কোনো ক্ষত্রিয়ের রক্তেই সেই বিদ্যা শেখার তীব্র টান জাগবে।

প্রস্তাবটা অসিতের কাছ থেকে সরাসরি এলো, 'আমাকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবেন?'

রুদ্রদেব মনে মনে হাসল। নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় রক্তে জোয়ার এসেছে। তারও এতদিনে একজন সঙ্গী হয়েছে। সে এই সঙ্গী হারাতে চায় না, 'হ্যাঁ। অবশ্যই শেখাবো। ক্ষত্রিয়কে শিক্ষা দেওয়া যে-কোনো সামর্থ্যবান যোদ্ধার কর্তব্য। তবে, তাহলে তোমার অঙ্গদকে খুঁজতে যাবার কী হবে? অস্ত্রবিদ্যা তো আর রাতারাতি শেখা যাবে না। সময় লাগবে।'

'সেই উপায় তো আপনিই বললেন। অন্ধের মতো কিছু না বুঝে অঙ্গদের পেছনে ছুটলে কোনো লাভ হবে না। ভালো করে পরিকল্পনা করতে হবে। আর পরিকল্পনা করার সময় আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাতে সেই পরিকল্পনা শক্ত হবে। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময় আসা পর্যন্ত আমি যুদ্ধবিদ্যা শিখবো।'

'কিন্তু, একটা সমস্যা আছে। আমার কাছে কোনো বাড়তি অস্ত্র নেই। অস্ত্রবিদ্যা শিখতে হলে তো অস্ত্র লাগবে।'

'আপনার অস্ত্র দিয়ে শিখলে হবে না?'

'না অসিত। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, যোদ্ধার শস্ত্র তার কাছে নিজের অঙ্গের মতো। একজনের অঙ্গ যেমন আরেকজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তেমনি এক যোদ্ধার শস্ত্র আরেক যোদ্ধা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এজন্যই বড়ো যোদ্ধাদের নিজস্ব অস্ত্র এবং সজ্জা ছিল। তারা সেটাই ব্যবহার করতো সবসময়।

কারণ আরেকটাও আছে। আমার অস্ত্র দিয়ে তুমি শিখতে পারবে না। তোমার হালকা অস্ত্র লাগবে। ধীরে ধীরে অস্ত্রের ওজন বাড়াতে হবে।'

'তাহলে আমি শিক্ষার জন্য অস্ত্র কোথায় পাবো?'

'পাবে। জায়গা আছে। আর উপায়ও তোমার কাছেই আছে।'

'মানে?'

অসিতের কোমরের দিকে ইশারা করলো রুদ্রদেব, 'ভেবে দেখো। রাঁধার জন্য গাভী কেনার মুদ্রা দিয়ে তোমাকে এখন শিক্ষার জন্য অস্ত্র কিনতে হবে। আমার কাছে কোনো মুদ্রা নেই। এটাই এখন তোমার সমস্যার একমাত্র সমাধান।'

৩৯

চোলা রাজ্যে গিরিধারীর পাঠানো পত্র এসে পৌঁছেছে। এখন একমনে সেটার দিকেই তাকিয়ে আছেন মন্ত্রী ইরাম। মহারাজ কারিকালা তার ঠিক সামনেই বসে আছেন। গিরিধারী পত্রের সংকেত উদ্ধারে যে যে কাজ করেছিলেন সেই কাজগুলো এখন ইরামকেও করতে হচ্ছে। গিরিধারীর পাঠানো দুটো পত্রই তার হাতে এসে পৌঁছেছে। না, পথে কোনো সমস্যা হয়নি। সাতবাহনের সংবাদ কোনোরূপ বদলে যাওয়া ছাড়াই এসে পৌঁছেছে এখানে।

মহারাজ কারিকালা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এখানেই বয়সের পরিপক্বতার ব্যাপার। দায়িত্ব যতই বড়ো হোক না কেন, এখনো তো আসলে তিনি নবযুবক, 'আর কতক্ষণ লাগবে কাকা?'

'এইতো। হয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েকটা শব্দ।' উত্তর দেন ইরাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ হয়। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারেন কারিকালা। তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠলেন ফলাফল জানতে।

'মন্ত্রী গিরিধারী আমাদের অতি সত্বর সৈন্য সজ্জা করতে বলেছেন। তবে সৈন্য যাত্রা করতে নিষেধ করেছেন। এখন আমাদের সেনাকে নিয়ে তৈরি হয়ে রাজধানীতেই থাকতে বলেছেন।'

'সৈন্য সজ্জা তো আমাদের করাই আছে। আমাদের সেনা তো এখনো সজ্জাচ্যুত হয়নি।'

'হ্যাঁ, প্রতিদিনই মহড়া হচ্ছে এখন।'

'হ্যাঁ। বেশিদিন তো হয়নি এই সেনাদল যুদ্ধ করে বিদ্রোহী সৈন্যদের হারিয়েছে। বিদ্রোহীদের রাজ্যছাড়া করলো। খালি কি কাজে মানাই করেছেন তিনি, নাকি কিছু করতে বুদ্ধিও দিয়েছেন?'

'না, তেমন কিছু লেখেননি।'

'মানে, আমরা তো এখন আর যুদ্ধযাত্রা করবো না। কিন্তু, কখন করবো সেটা নিয়ে কি কিছু বলেছেন?'

'না, শুধু বলেছেন, এখনো সময় আসেনি। প্রথম চাল শত্রুপক্ষের থেকে আসাই ভালো হবে। সেই চাল দেখেই আমরা চাল ঠিক করবো। আর সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

কারিকালার এখনো গিরিধারীর দেওয়া বুদ্ধিটা পছন্দ হচ্ছে না, 'আমাদের জন্য কি তাই ভালো হবে? বিদ্রোহীদের গুছিয়ে নেবার জন্য সময় এবং সুযোগ দেওয়াটা কোন ধরনের কূটনীতি তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চুপ করে রইলেন ইরাম। কিছুক্ষণ। আসলে কারিকালার উত্তেজনা থিতিয়ে যাবার সময় দিলেন, 'আমার মনে হয় গিরিধারী কোনোকিছু না বুঝে আমাদের কাছে এই খবর পাঠাননি। তিনি বুঝে শুনে বুদ্ধিটা দিয়েছেন। যেহেতু আমরা তার সাথে সন্ধি করেছি আর তার থেকে সাহায্যের আশ্বাসও পেয়েছি, তাই তার মতামত অবশ্যই আমাদের

গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত। আর তার সাহায্য নেওয়া ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই।'

'আরেক রাজ্যের মন্ত্রীর পরামর্শে চলাটা তেমন বীরত্বের কাজ তো নয় বটেই, বরং সেটা তেমন বুদ্ধিমানের কাজও নয়। আমরা কি তাহলে এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না-কি?'

'গিরিধারী কিন্তু তার সংবাদে আমাদেরকে একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলেননি।'

'তবে? কী কাজ করতে বলেছেন তিনি?'

'তিনি সীমান্তে আমাদের গুপ্তচর ব্যবস্থা জোরদার করতে বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন। আমাদেরকে আরও কিছু গুপ্তচর সীমান্তে পাঠাতে হবে। বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডল আর তার সেনাদের কব্জা করা নগরগুলোর ওপর নজর রাখতে হবে রাত-দিন। সীমান্তের ওপাশে কোনো সেনা জড়ো হচ্ছে কি না, কোনো ভিন রাজ্যের সেনা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কি না, তাও আমাদের গুপ্তচরেরা রাত-দিন খেয়াল রাখবে। তিনি এমনটাই বলে দিয়েছেন।'

রাজ্য অগোছালো থাকলে গুপ্তচর ব্যবস্থা সংগঠিত থাকার কোনো কারণ নেই। স্বাভাবিক প্রশ্নই করলেন কারিকালা, 'আমাদের গুপ্তচর ব্যবস্থার এখন কী অবস্থা?'

'সত্যি বলতে কী, খুব একটা ভালো না।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

'মহারাজের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রভাব আমাদের গুপ্তচর ব্যবস্থার ওপরেও পড়েছিল। বলতে গেলে আমাদের বিছানো জাল পুরোপুরি ছিঁড়ে গিয়েছিল। নতুন একটা ব্যবস্থা আমি এখন দাঁড় করাতে চেষ্টা করছি, কিছু কিছু জায়গায় পুরানো লোকজন ফিরিয়েও আনতে পেরেছি, তবে তা যথেষ্ট বলা যাবে না। আগের অবস্থা ফিরে পেতে এখনো আমাদের বেশ একটু সময় লাগবে।'

'কিন্তু এখন তো আমাদের হাতে সময় নেই। সীমান্তে দেরি না করে যথেষ্ট পরিমাণ গুপ্তচর পাঠাতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু, এটা তো আর বাজার সরকার অথবা পাখাওয়ালা বাছাই করার কাজ নয়। গুপ্তচর হতে হলে একজনকে একই সাথে বিশ্বস্ততা সহ নানা রকম গুণ অর্জন করতে হয়। তেমন লোক তো আর রাতারাতি পাওয়া যাবে না। রাজনীতিতে গুপ্তচরের মূল্য অনেক। যোগ্য লোক না পাঠালে বেশির ভাগ খবরই আসবে ভুল। আর ভুল-ভাল খবর এরকম সময়ে বেশ ক্ষতি করতে পারে। শত্রুর সতর্ক নজর অবশ্যই আমাদের গুপ্তচরদের খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে।'

'কাকা, যা বলছেন সব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এসব সমস্যার কথা না ভেবে এখন আমাদের সমাধানের পথ বের করা উচিত। রাজনীতির কৌশলে এমন কোনো গুপ্তচর ব্যবস্থা কি নেই, যা এমন সময়ে নবিশদের কাছ থেকে ভুল খবর পাওয়া আটকাতে পারে?'

'গুপ্তচর ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ নামে একটা ব্যবস্থা আছে। এখানে গুপ্তচরদের জালের মতো না রেখে কাছের কাণ্ডে ডালের মতো রাখতে হয়। প্রত্যেকটা ডাল কাণ্ডের সাথে লেগে থাকবে, কিন্তু একটা ডালের সাথে আরেকটা ডালের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এটা এমন একটা গুপ্তচর সংগঠন ব্যবস্থা, যেখানে কোনো তথ্যের জন্য শুধু একজন

গুপ্তচরের ওপর আস্থা রাখা হয় না। একই খবর এখানে পারস্পরিক সম্পর্কহীন কয়েকজন গুপ্তচর দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। পরে ভালো ভাবে বিচার করে সেই খবরের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। যখন বিশ্বাসযোগ্য গুপ্তচরের সংখ্যা কম থাকে, দক্ষ গুপ্তচরের সংখ্যাও কমে যায়, খবর হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা সংগ্রহ করতে হয় বেশ দ্রুত, তখন চাণক্যাদি রাজনীতিকেরা এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে বলেছেন।'

'তাহলে তাই হোক কাকা। সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করুন।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তবে সেখানেও একটা ছোটো সমস্যা থেকেই যায়। একটা ছোটো কিন্তু আছে।'

'কী সমস্যা আবার কাকা?'

'আমি অনেক পড়েছি। রাজকার্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকার কারণে সময় পেতাম অনেক বেশি। পড়েছি আর চিন্তা করেছি। সেই চিন্তা থেকেই বলছি। এই গুপ্তচর ব্যবস্থায় বিশ্বস্ত গুপ্তচর কম লাগে তা ঠিক, কিন্তু একেবারেই যে লাগে না, তা তো না। এই বৃত্তের কেন্দ্রে যে থাকবে তাকে কিন্তু হতে হবে একেবারে বিশ্বাসী। তাকে থাকতে হবে সবসময় শত্রুর ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখতে হবে কেন্দ্র।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তাতে সমস্যা কী?'

'কেন্দ্রে থাকার মতো বিশ্বাসী লোক এখন কোথায় পাবো? এই সময়ে কাউকেই ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। বিশেষ করে এত বড়ো একটা কাজের জন্য।'

সমাধান মহারাজ কারিকালার কাছে নেই, 'তাহলে উপায়?'

'উপায় এখানে একটাই। যার ওপর রাজার সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস আছে, যে-কোনো অবস্থাতেই রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তাকেই এখানে কেন্দ্রের দায়িত্ব দিতে হবে।'

'তেমন লোক কি আমাদের হাতে আছে?'

'হ্যাঁ। আছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভরসা করতে পারে কার ওপর? তার নিজের ওপর। কেন্দ্র হিসেবে যদি এখানে আমরা দুজনে কাজ করতে পারি তাহলেই আর কোনো সমস্যা নেই। আমরাও নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো।'

হাসি ফুটল কারিকালার মুখে, 'তার মানে, এখন রাজ্যের রাজা আর মন্ত্রীকে গুপ্তচর হতে হবে?'

'হ্যাঁ। এবং তা হতে হবে খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের দুজনকেই যেতে হবে। আমাদের ভেতরের দায়িত্বও আমি ঠিক করে ফেলেছি। দুটো কেন্দ্র গঠন করবো আমরা। আমি কাজ করবো বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডলের দখল করা নগরের খবর সংগ্রহের কেন্দ্রে। আর তুমি কাজ করবে সীমান্তের অন্যান্য জায়গায় সেনা তৎপরতার খবর সংগ্রহের কেন্দ্রে। আমাদেরকে রাজধানী থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু রাজা আর মন্ত্রী যদি এমন সময়ে রাজধানী ত্যাগ করেন তাহলে রাজ্য সামলাবে কে? এমন ভাঙাচোরা পরিস্থিতিতে সেটা নিশ্চয়ই উচিত হবে না।'

'রাজ্য সামলাবে তোমার সেনাপতি। আমরা যে এই কাজে যাচ্ছি তা কাউকেই জানানো চলবে না। আমাদের রাজসভা স্থগিত। যা একটু চলে তাও বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা প্রাসাদ থেকে বেরোবো একদম পূর্ণ ছদ্মবেশে। এখন সেনাপতিকে খবর

দিতে হবে। তার সাথে আলোচনা করে আমাদের বেশ কিছু চৌকস সেনা বেছে নিতে হবে আমাদের বাড়তি গুপ্তচর হিসেবে।'

ছদ্মবেশ ধরতে বেশ লাগে কারিকালার। কেমন একটা রোমাঞ্চকর খেলা খেলা ব্যাপার আছে এতে। আগেও মোটামুটি এই বিদ্যা শিখেছিলেন তিনি, তবে আত্মগোপনের সময়গুলোতে এই বিদ্যা একেবারে ব্যবহারিকভাবে ঝালিয়ে নিতে পেরেছিলেন তিনি। এবার আবার পাওয়া যাবে সেই মজা।

গিরিধারীর পত্রের প্রথম অংশ শুনে ভেবেছিলেন একেবারে হাত-পা গুটিয়েই বসে থাকতে হবে। তবে এখন হাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ এসেছে। কিছু না করে বসে বসে নিরীক্ষণে ভীষণ আপত্তি তার।

একটা আশঙ্কা তখনই উঁকি দিলো মহারাজ কারিকালার মনে, 'আচ্ছা কাকা, আমরা যে সেনাপতির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে চলে যাবার কথা ভাবছি, যদি রাজ্য আবার বেহাত হয়ে যায়? তাহলে তো আরও বিপদ। যদি মন্ত্রীদের মতো সেনাপতিরও মতিভ্রম হয়?'

'তা হতেই পারে। সে তখন দেখা যাবে। কোনো বড়ো কাজ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে, নিজের কাঁধে সবকিছু না রাখা। নিজের কাঁধে সবকিছু রাখতে গেলে সেক্ষেত্রে কাঁধ এবং বোঝা কারো জন্যই সুখকর কিছু হয় না। এখানে দায়িত্ব বন্টন করতেই হবে। কোনো একজনের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া চলবে না। আবার নিজের কাঁধেও সম্পূর্ণ ভার রাখা যাবে না। আমরা একবার যখন সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছি তাহলে আর ভয় কী। সেনাপতি যদি মন্ত্রীদের মতো কাজ করে তাহলে আমাদেরকে আরেকবার সেনাপতির হাত থেকে রাজ্য উদ্ধার করতে হবে। আমরা সেও পারবো। এখন অহেতুক নেতিবাচক আলোচনা আর ভয় ত্যাগ করে কর্তব্য করার সময় এসেছে। চলো, সেনাপতির সাথে কথা বলে আগে গুপ্তচর হবার যোগ্য কিছু লোক বাছাই করি।

মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেড়িয়ে যান দুজনে। সামনে বিরামহীন পরিশ্রমের কাল উঁকি দিচ্ছে।

দূত শুধু সাতবাহন আর চোলার মাঝেই আসা যাওয়া করছে না। প্রত্যেক রাজ্যেরই গুপ্তচর আছে। এবং তারা এখন তাদের পরিবারকে খুব একটা সময় দিতে পারছে না। ওপরে ওপরে বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে এই চোঙা আকারের মানচিত্রের হাল বেশ বেসামাল। এই টালমাটাল সময়ে সবচেয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে এই গুপ্তচরদের।

সাতবাহন থেকে চোলাতে দ্রুতগামী দূতেরা বেশ দ্রুত সময়ে যেতে পেরেছে। একটা পত্র ছাড়া তাদের কাছে বহন করার মতো আর কিছুই ছিল না। তবে শক রাজ্য থেকে যে দূতেরা কলিঙ্গতে আসছিল, তাদের কাছে বেশ বড়ো একটা বোঝা ছিল। তাই তারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কলিঙ্গের পথটা তাড়াতাড়ি পার হতে পারলো না। রাস্তাও বেশ খানিকটা বেশি। সেই বড়ো এবং ভারী বোঝাকে আর্যাবর্তের একেবারে পশ্চিম সীমান্ত থেকে পুব সীমান্তে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

'তারা এসে গেছে মহারাজ' উদিতনাথ নিজেই এসেছেন খবর দিতে। এই খবরটা দিলে সংবাদদাতার ওপর মহারাজ নিশ্চয়ই খুশি হবেন। সেই সৌভাগ্য অন্য কাউকে দিলেন না তিনি।

'তার মানে হচ্ছে, ওরা আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।'

'জি মহারাজ।'

'প্রথমে বেশ ফাঁকি দিয়ে কাজটা সেরে নিতে চেয়েছিল তারা। ভেবেছিল মাত্র পাঁচ মণ সোনা দিয়ে আমাদের এত বড়ো শক্তিশালী বাহিনী কিনে নেবে।'

'জি মহারাজ। ভেবেছিল, আমরা বাণিজ্যে দুর্বল, অনেকদিন সোনার মুখ দেখি না, আমরা অবশ্যই সোনার কাঙ্গাল। আর মাছ যখন খুবই ক্ষুধার্ত হয় তখন টোপের মান আর আকার যেমনই হোক টোপটা গিলে ফেলে। ওরা ভেবেছিল আমরাও শোনা মাত্র গিলে ফেলবো।'

'ওদের ধারণা ভুল ছিল।'

মন্ত্রী উদিতনাথ বুঝতে পারছেন, মহারাজ আসাকার মনে আবার মেঘবাহনদের প্রাচীন গৌরবময় ক্ষত্রিয় চেতনা ফিরে আসছে, 'ঠিক বলেছেন মহারাজ। আমাদের কোষাগারের চাকচিক্য শকদের চেয়ে কম হতে পারে, আমাদের প্রাসাদের আলোর রোশনাই ওদের চেয়ে কম উজ্জ্বল হতে পারে, আমাদের সাজসজ্জা বেশ মলিন হতে পারে, কিন্তু এটা তো ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের মর্যাদা কী। আমরা মেঘবাহনেরা কখনো কারো মুখাপেক্ষী ছিলাম না। কেউ আমাদের দুর্বল ভেবে সুযোগ নিতে এলে তাকে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হবে মহারাজ। আমাদের অভাব থাকতে পারে, তবে আমরা কাঙ্গাল না।'

'হ্যাঁ, আমি সোনার কাঙ্গাল না। তবে স্বার্থ বুঝে সঠিক মূল্যে ব্যাবসা করার অধিকার তো সবারই আছে।'

'তা তো অবশ্যই মহারাজ।'

'আমার সুসজ্জিত সেনার সঠিক দামই আমি নির্ণয় করেছি। আর আমাদের শর্তে এটাও বলা ছিল, যদি তাদের কথায় আমাদের যুদ্ধ করতে হয় তাহলে যুদ্ধের খরচের জন্য বাড়তি সোনা লাগবে, তাই না?'

'জি মহারাজ।'

'এখন বলুন, ওদের দূত কী খবর নিয়ে এসেছে? তারা কি আবার বিশ মণ স্বর্ণের প্রস্তাবের বদলে দরাদরি করতে চায়?'

'না মহারাজ, দরাদরি করার কোনো ইচ্ছেই তাদের নেই। আমরা তো তাদেরকে সেই সুযোগই দেইনি। তারা সম্পূর্ণ বিশ মণ স্বর্ণই পাঠিয়েছে। আমি নিজে রাজ জহুরিকে নিয়ে সেসব পরীক্ষা করে মেপে দেখেছি। আমাদের দাবি করা স্বর্ণের সাথে সাথে তাদের তরফ থেকে একটা পত্রও এসেছিল। সেখানে কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে আমাদের জন্য। আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছি। অনুমতি পেলে সেই পত্র খুলে দেখবো।'

হাত তুলে মন্ত্রী উদিতনাথকে থামালেন মহারাজ আসাকা, 'পত্র পরে পড়লেও চলবে।' ততক্ষণে লোভ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে তার চোখে। মহারাজের সমগ্র চেহারায় উজ্জ্বলতা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। সেদিন কেবল পাঁচ মণ আর বিশ মণ স্বর্ণ নিয়ে একটু দর কষাকষি হয়েছিল, কিন্তু সশরীরে সেই স্বর্ণ কলিঙ্গে ছিল না। আজ সেই স্বর্ণ তার প্রাসাদেই আছে। ইছে করলেই সেটা তিনি ছুঁয়েও দেখতে পারেন। এই স্বর্ণের একমাত্র মালিক এখন তিনি।

'ঐ বিশ মণ স্বর্ণ এখন কোথায় আছে উদিতনাথ?'

উদিতনাথ মহারাজ আসাকার দিকে ভালো করে তাকালেন। মহারাজের এমন মুখ আগে কখনো দেখেননি তিনি। ঘোর লাগা তার দুই চোখ, 'মহারাজ, সেই স্বর্ণ আমি কোষাগারে রেখে এসেছি।'

'কেন? কেন আপনি আমার স্বর্ণ আমার অনুমতি ছাড়া কোষাগারে রাখতে গেলেন? কেন যখন এসেছে তখনই আমার সামনে উপস্থিত করলেন না? আমি এখনই কোষাগারে যাবো।'

'কিন্তু মহারাজ'

'কোনো কিন্তু নেই। উদিতনাথ, আমি এখনই যাবো কোষাগারে।'

সভা কক্ষ ত্যাগ করলেন মহারাজ আসাকা। তার পদক্ষেপগুলো এলোমেলো, ঘোরলাগা। অনেক পরিমাণ সুরা পান করলে মানুষের এই দশা হয়। কিন্তু তার পদক্ষেপ এলোমেলো হলেও গতি বেশ দ্রুত। উদিতনাথ এমন অবস্থায় মহারাজকে একা ছাড়তে পারেন না। তিনিও মহারাজের পিছু নিলেন। মহারাজ আসাকার সাথে তাল মেলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে।

বলতে গেলে এক প্রকার ছুটেই মহারাজ আসাকা কোষাগারের দরজায় পৌছলেন। কোষাগারের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরা মহারাজের অসময় উপস্থিতি এবং রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেল। উদ্ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে উঠলেন মহারাজ আসাকা, 'কোষাগারের দরজা খুলে দাও। তাড়াতাড়ি।'

মহারাজের আদেশ পালিত হতে সময় লাগলো না। দরজা খোলা হতেই কোষাগারে ঢুকে পড়লেন মহারাজ আসাকা।

চৌকো সোনার টুকরাগুলো এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা আছে। একটা কাপড়ে ঢাকা। কাউকে বলতে হলো না, মহারাজ বুঝতে পারলেন ওখানেই আছে কাঞ্চন। এক টানে কাপড়টা সরিয়ে ফেললেন তিনি। দ্যুতিতে ঝিকমিক করে উঠলো শুদ্ধ সোনা। চোখ যে ধাধিয়ে দেবে। মহারাজ চিৎকার করে উঠলেন, 'কলিঙ্গের জৌলুশ ফিরে এসেছে। আবার চাকচিক্যে ভরে উঠবে কোষাগার, প্রাসাদ, রাজা, প্রজা।'

উদিতনাথের দিকে তাকালেন তিনি, 'দেখলেন উদিতনাথ, আমাদের কোষাগার কেমন ভরে উঠেছে।'

'হ্যাঁ মহারাজ। বিশ মণ স্বর্ণ কম তো নয়।'

চৌকো সোনার টুকরায় সাবধানে হাত বুলাতে লাগলেন মহারাজ আসাকা। খুব সাবধানে, যেন ওগুলো কাঁচের টুকরা। একটু অসাবধান হলেই ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

'এবার ওদের পত্র পাঠ করুন উদিতনাথ। এবার আর ওদের কথা শুনতে তেমন সমস্যা নেই। পেটে খেলেই পিঠে সয়।'

পত্রের মোহর দেওয়া বাঁধন খুলে ফেললেন উদিতনাথ। তারপর গোটানো গাছের ছাল মেলে ধরলেন চোখের ঠিক সামনে। বেশি সময় নিলেন না। চট জলদি চোখ বুলিয়ে নিলেন। মহারাজ পুরো পত্র নিশ্চয়ই শুনতে চাইছেন না। তিনি কেবল জানতে চাইছেন মূলভাব।

পত্র পড়তে পড়তে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল উদিতনাথের। তার চোখেমুখে একই সাথে ভয় আর অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে।

তখনো স্বর্ণে হাত বোলানোতে ব্যস্ত আছেন মহারাজ আসাকা। একটু পরেই তার নজর পড়লো স্তম্ভিত উদিতনাথের ওপর, 'কী হয়েছে উদিতনাথ? আপনি এমন করে থ মেরে গেলেন কেন? পত্রটা পড়েছেন?'

'জি মহারাজ। আর এই পত্রে এমন কথা লেখা আছে যা শুনলে আপনার শরীরও স্তম্ভিত হয়ে যাবে।'

'কী লেখা আছে পত্রে? তাড়াতাড়ি বলুন উদিতনাথ।'

'মহারাজ। শকরাজার নির্দেশ বেশ সোজা। তার পাঠানো যে বিশ মণ স্বর্ণে আমাদের কোষাগারের চাকচিক্য আবার ফিরে এসেছে, সেই বিশ মণ স্বর্ণের বিনিময়ে অতি সত্বর আমাদের সেনাকে সাতবাহনদের রাজধানী অমরাবতীর সীমান্তে মোতায়েন করতে বলেছেন। এটাই তাদের আপাতত ও একমাত্র শর্ত।'

বজ্রপাত হলও যেন মহারাজ আসাকার মাথায়, 'কিন্তু এমন তো কথা ছিল না। যুদ্ধ বাঁধলে আমার সেনা শকদের পক্ষে যুদ্ধ করবে এমনটাই তো ভেবেছিলাম আমরা। তাদের মন্ত্রীর সাথে তো এমনই কথা হয়েছিল। কিন্তু অমরাবতীর সীমানায় সেনা মোতায়েন করলে তো সাতবাহনের সাথে আমাদের সরাসরি যুদ্ধ বাঁধবে। আর সাতকর্ণীর সেনারা আমাদের একেবারে চুরমার করে দেবে।'

খেই ধরলেন উদিতনাথ, 'হ্যাঁ মহারাজ। এই সর্বনাশের পথে পা বাড়ানো উচিত হবে না। শকের দূতেরা এখন রাজ্য ত্যাগ করেনি। আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছে। আপনি তাদের দিয়ে এই স্বর্ণ আবার শক রাজা নাহাপনার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

'না উদিতনাথ।' রীতিমতো আর্তনাদ বেড়িয়ে এলো মহারাজ আসাকার মুখ থেকে, 'এই সমৃদ্ধি কত দিন পর আমাদের আছে এসেছে। এই বৈভব আমি এত সহজে ত্যাগ করতে পারবো না। আমি সেনাও মোতায়েন করবো না, স্বর্ণও ফেরত দেবো না।'

'মহারাজ, শঠতা এবং চুক্তির প্রতিকূলে কাজ করা রাজধর্মের প্রতিকূল। এই কাজ করলে আপনার এবং কলিঙ্গ রাজ্যের সম্মান একেবারে মাটিতে মিশে যাবে। স্বর্ণও আর পাবেন না আপনি। বিশ মণ স্বর্ণের জন্য সম্মান বিসর্জন দিলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে। বিশ মণ স্বর্ণের বিনিময়ে পুরো রাজ্যের আত্মসম্মান কোনোভাবেই ত্যাগ করা চলে না। আপনি তাদের স্বর্ণ ফিরিয়ে দিন।'

'না। যুদ্ধে আমি ভয় পাই না। মেঘবাহনরা কখনোই পায়নি। আমাদেরকে তো আর সরাসরি আক্রমণ করতে বলা হয়নি। আমরা শুধু সীমান্তে শিবির ফেলবো। আর খবর আছে মহারাজ সাতকর্ণী এখন প্রতিষ্ঠানায় থাকেন। অমরাবতীর দিকে তার তেমন নজর নেই।'

উদিতনাথ হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকেন মহারাজের দিকে। পুরো রাজ্যকে এখন লোভের শিকার হতে হবে। মহারাজ আসাকা তাকে প্রশ্ন করেন, 'কলিঙ্গের ঐশ্বর্য ফিরিয়ে আনার এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় জানা আছে আপনার?'

মাথা নাড়লেন উদিতনাথ, 'নেই।'

'তাহলে এখন যান। সব সেনাপতিদের খবর দিন। বলে দেবেন, আজ সেনাধ্যক্ষ নির্ধারণ করা হবে। তদের বলুন, আরামে থাকার দিন শেষ। বাহিনীর তোশিলা ছেড়ে যাবার সময় চলে এসেছে।'

আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হলেন উদিতনাথ।

'পিতা, আপনি কী শুনতে পাচ্ছেন?'

পিতা ধ্যানমগ্ন ছিলেন, 'বলো?'

'আমি কি আপনার পুত্র নই?'

'এই কথা বলছো কেন পুত্র? কিছুই তো তোমার অজানা নেই। সব জেনেশুনে কেন তোমার মনে এই প্রশ্নের জন্ম হলো? মহাদেবের কাছ থেকে কত যাগযজ্ঞের পর তোমাকে আমরা লাভ করেছি। তুমি শুধু আমাদের প্রেমের ফসল নও, তুমি আমাদের সাধনার ফল। তুমি আমার সারা জীবনের যজ্ঞফল। স্বয়ং মহাদেবের আশীর্বাদ।'

'হ্যাঁ, পিতা। তা আমি জানি। তবু মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। আমিই আপনার পিণ্ডদানের অধিকারী। তবে বলুন পিতা, আমি কি আপনার জ্ঞানের অধিকারী নই?'

'মানে?'

'মানে আপনি জানেন পিতা। আমি কেন এই কথা বলছি তা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। স্বয়ং পরশুরাম তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ অংশ আপনাকে দান করেছেন। আপনার সব সম্পত্তির সাথে সাথে আপনার সেই জ্ঞানের ওপরও উত্তরাধিকার সূত্রে আমার অধিকার। কিন্তু কেন আমি সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত? কেন আপনার মতো শিক্ষাগুরু থাকতে আরেকজন হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ? সেই রাজকুমার তো আস্তে আস্তে আপনার সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। আমি এখনো অর্ধেকও শিখতে পারলাম না।'

'পুত্র ভুলে যেও না, তুমি যেমন আমার পুত্র, তেমনি আমার প্রত্যেক শিষ্যই আমার কাছে পুত্রসম। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি আমার সমস্ত শিষ্যকে আজীবন এক চোখে দেখবো। যার যে যোগ্যতা তাকে ঠিক তা অনুযায়ী শস্ত্র শিক্ষা দেবো।'

'পিতা, শিষ্য পুত্রের মতো, কিন্তু সে তো আর পুত্র নয়। আপনি কি চান শিক্ষা শেষে যখন আমরা ক্ষত্রিয় কর্মে প্রবৃত্ত হবো, তখন আপনার সবচেয়ে প্রিয় এবং যোগ্য শিষ্য আমাদের সবার প্রভু হোক। সে আমাদের সবার ওপর ছড়ি ঘোরাক? আমি আপনার পুত্র হয়েও সারাজীবন তার দাস হিসেবে বেঁচে থাকি?'

'তা কেন হবে পুত্র? তুমি তো তাদের গুরুপুত্র। তার ওপর ব্রাহ্মণ। সেই হিসেবে আমার সকল ক্ষত্রিয় শিষ্যের কাছ থেকে আজীবন সম্মান পাবে। শাস্ত্রে তো গুরুপুত্রের সম্মান সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। সেসব তো আর তোমার অজানা নয়। এটাই তো শাস্ত্রের বিধান।'

'না পিতা। রাজা রাজগুরুকে সম্মান করেন ঠিক আছে। কিন্তু সেই গুরুও জানেন তিনি আসলে রাজার ভিক্ষায় বেঁচে আছেন। তার সম্মান আসলে রাজার অনুগ্রহ। আমি কোনো শাস্ত্রের বিধান থেকে সম্মান লাভ করতে চাই না, আমি আমার যোগ্যতা দিয়ে সম্মান লাভ করতে চাই। আমি হতে চাই রাজা, চক্রবর্তী। আমি যে রাজা হবো সেই বচন আপনিই কিন্তু আমাকে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ পুত্র। সেই আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। সেজন্যই আমি হস্তিনাপুর এসেছি। তোমার জন্য রাজ্যই আমি গুরুদক্ষিণা হিসেবে শিষ্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেবো।'

'সেই দয়ার দান আমি নিতে চাই না পিতা। আমি নিজের যোগ্যতায় নিজের বাহুবলে রাজ্য জিতে নেবো।'

'তাহলে বলো পুত্র তোমার কী ইচ্ছে। এখন আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনি আপনার সকল যুদ্ধ জ্ঞান আমাকে দান করুন। আপনার সকল দিব্যাস্ত্র যা আপনি পেয়েছিলেন পরশুরামের থেকে, আমাকে দান করুন।'

'তা সম্ভব নয় পুত্র। পরশুরাম ইচ্ছে করে বা এমনিতেই আমাকে সেসব দান করেননি। আমি নিজের ধ্যান বলে সেসব দিব্যাস্ত্র পেয়েছি। তিনি শুধু আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই ভীষণ সাধনার সিকিভাগও তুমি করোনি। আমি তোমাকে সেসব অস্ত্রেরই শিক্ষা দেবো যা তুমি আসলে গ্রহণ করতে পারবে। সব শস্ত্র গ্রহণ করার ক্ষমতা সব মানুষের শরীর এবং মনের থাকে না।'

'আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য এসব বলছেন আপনি পিতা। আপনার পুত্র হিসেবে কি তাহলে আমি কিছুই লাভ করতে পারবো না?'

পিতা একটু ক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর চোখ তুললেন, 'যদিও পক্ষপাত হবে, তবু আমি তোমার জন্য আমার প্রতিজ্ঞায় একটু ঢিল দেবো। যাও, আমি তোমাকে বরদান হিসেবে যে-কোনো একটা দিব্যাস্ত্রের জ্ঞান দান করবো। তুমি তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো একটা দিব্যাস্ত্র বেছে নাও। বাকি দিব্যাস্ত্র তোমাকে সাধনা ও যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করতে হবে। তবে তোমার মধ্যে ভোগ ভাব অত্যন্ত প্রবল। সেসব তুমি গ্রহণ করতে পারবে না। তবে তুমি মহারথী হবে। এখন বলো, তুমি কোন দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করতে চাও?'

'ব্রহ্মাস্ত্র।'

বৃদ্ধ অস্ত্রগুরু ব্রাহ্মণ পিতা এ কথায় স্তম্ভিত হলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র! তুমি কি জানো তুমি কি বলছো? বদ্ধ পাগলেও এমন প্রলাপ বকে না। প্রবল ব্রহ্মচর্য আর তীব্র ব্রহ্মের সাধনা যদি কোনো নর বহুদিন ধরে একনিষ্ঠে করে তবেই লাভ করতে পারে এই অস্ত্র। তোমাকে আমি এমনিতে এই অস্ত্রের জ্ঞান দিতে পারবো না। তুমি অন্য অস্ত্র নাও। বায়ব্যাস্ত্র নাও, আগ্নেয়াস্ত্র নাও অথবা গ্রহণ করো বরুনাস্ত্র।'

'আপনি এইমাত্র আমাকে বচন দিয়েছেন পিতা। এখন আপনি তা লঙ্ঘন করতে পারেন না। আপনি আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান দান করুন। এটাই আমার আপনার কাছে একমাত্র চাওয়া। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি এরপরে অন্য কোনো দিব্যাস্ত্রের জন্য আমি যোগ্যতা ছাড়া আপনার সামনে এসে দাঁড়াবো না। আপনার কাছে আর কখনো অন্যায় আবদার করবো না।'

'আমি আমার বচন লঙ্ঘন করবো না পুত্র। আমি জানি এই কাজে তোমার ক্ষতিই হবে। তবু আমি তোমাকে এই জ্ঞান দান করবো। জেনেশুনেই ক্ষতি করবো নিজের পুত্রের। তবে যুদ্ধের একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, যে অস্ত্র যোদ্ধার বশে থাকে তা নিক্ষিপ্ত হলে শত্রু সংহার হয়। আর যে অস্ত্র যোদ্ধার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তা একসময় সে

মালিককেই সংহার করে। নাও পুত্র, এখনো তুমি ব্রহ্মাসনে বসো। গ্রহণ করো, ত্রিভুবনের অনন্য এই অস্ত্রের রীতি।'

তখনই চোখটা খুলে গেল রুদ্রদেবের। স্বপ্নটা শেষ হওয়া মাত্র যেন তার ঘুম আজকে না ভাঙ্গার পণ করেছিল। অনেকদিন পর আজ আবার স্বপ্নটা দেখল সে।

এমনিতে ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। তবে আজ তা হয়নি। সূর্যদেব প্রায় উঠে গেছেন। তার আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে।

পাশের বিছানার দিকে তাকালো সে এবং অবাক হলো। বিছানাটা যে খালি থাকবে এই সময়ে তা সে চিন্তা করেনি। অসিত উঠে পড়েছে। কেন এত সকালে উঠেছে তা বোঝা গেল না। শয্যা সেরে ঈশ্বর স্মরণ করে বাইরে বেড়িয়ে এলো সে।

সেদিনের রাতের ডাকাতের ঘটনার পরে এরই মধ্যে আরও দুই রাত পেরিয়ে গেছে। অসিতের মনে আছে রুদ্রদেবের কথা। দুই দিন পরেই জানা যাবে ওষুধ কাজ করেছে কি না। যদি কাজ করে তাহলে হাড় ভাঙ্গেনি। কাল রাত থেকেই সে অপেক্ষা করছিল এই দুই দিন শেষ হবার জন্য। উত্তেজনায় ভালো করে ঘুমই আসেনি। ভোরেই উঠে পড়েছে সে।

রুদ্রদেব বাইরে বেড়িয়ে অসিতকে দেখতে পেলো। হ্যাঁ, বসে আছে সে। আজ সকালেই সূর্য ওঠার সাথে সাথে পট্টি খুলে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করার কথা।

রুদ্রদেব এসে বসলো অসিতের ঠিক সামনে। সূর্য রশ্নি ততক্ষণে স্পর্শ করেছে ছোটো উঠানটা, 'পট্টিটা খুলে ফেলো। দেখি কী অবস্থা।'

অসিত ঠিক এই কথার অপেক্ষাতেই ছিল। রুদ্রদেবের দেখানো উপায়ে খুলে ফেলতে লাগলো বাঁধন। প্রথমেই দড়ির বাঁধন খোলার পরে কাপড়ের সন্ধান পেলো সে। কাপড় খুলে পা মুক্ত করতে লাগলো। নড়াচড়ায় তেমন একটা অসুবিধা হচ্ছে না তার। ব্যথা একেবারে নেই বললেই চলে।

পুরো পা উন্মুক্ত হতেই এবার হাত লাগালো রুদ্রদেব। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বেশ কিছু জায়গায় টিপে দেখল। না কোথাও ব্যথা নেই, ফোলা নেই, 'তোমার ভাগ্য বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। ভাঙ্গেনি, শুধু একটু মচকেছিল। এখন সেরে গেছে। ওষুধি তার কাজ বেশ ভালোভাবেই করেছে। তুমি এখন একেবারে ঠিক আছো।'

কথা আর বাড়ালো না রুদ্রদেব। এমনিতেই আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জঙ্গলের দিকে তড়িঘড়ি হাঁটতে শুরু করলো সে। অসিতও জেনে গেছে তার পায়ে কোনো সমস্যা নেই। দুই দিন ধরে বসে ছিলসে। আর সেভাবে থাকার ইচ্ছে নেই। সেও রুদ্রদেবের অনুগামী হলো।

থেমে গেল রুদ্রদেব, 'তুমি আমার পেছনে আসছ কেন? এখন আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সেখানে তোমার কোনো সাহায্য দরকার হবে না। বরং সেখানে কেউ সাহায্য করতে এলেই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'প্রাকৃতিক কাজ সারতে। সেই কাজটা একা সারাই ভালো।' হাসল রুদ্রদেব।

লজ্জা পেলো অসিত, 'আচ্ছা, আমি বুঝতে পারিনি।' পরক্ষণেই সে বুঝল প্রকৃতি কেবল রুদ্রদেবকে একা ডাকে না, সবাইকেই ডাকে, 'কিন্তু, আমারও তো যাওয়া প্রয়োজন।'

'জানি। প্রথম দুদিন অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকলেও এভাবে তো আর চলবে না। তোমার জন্য তাই আমি একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করেছি। ঐদিকে একটা গর্ত খুঁড়েছি তোমার জন্য। সেখানে জলেরও ব্যবস্থা আছে। কুটিরের ডানপাশ দিয়ে জঙ্গলের একটু ভেতরে গেলেই তুমি সেই গর্ত পেয়ে যাবে। যাও, সেখানেই কাজটা সেরে এসো।'

প্রাকৃতিক কাজ শেষ হলো দুজনেরই। এবারে আজকের দিনের কাজগুলো ঠিক করে নিতে হবে। রুদ্রদেব ততক্ষণে সেই পরিকল্পনা গুছিয়ে এনেছে, 'তোমার পায়ের ব্যথা তো ভালো হয়ে গেছে। চলাফেরায় তোমার আর সমস্যা হবে না। চলো, আমরা প্রথমে তোমার প্রশিক্ষণের অস্ত্রগুলো কিনে নিয়ে আসি। কাজ ফেলে রাখা ভালো নয়। তুমি যেহেতু যুদ্ধবিদ্যা শিখবে বলে মনস্থির করেছো, তাই আমাদের কাজটা শুরু করে দেওয়াই উচিত। যত তাড়াতাড়ি শুরু করবে, তত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে। এরচেয়ে সত্য কথা পৃথিবীতে খুব একটা নেই।'

অসিতের রাজি না হবার কোনো কারণ নেই, 'চলুন।'

'দাঁড়াও, আমার অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখে আসি। এমনিতেও আমার শেকল বন্ধন অত সহজে খোলা যাবে না, তবে এই দুর্বল কুটিরে ঢুকতে চোরের শেকল বন্ধন না খুললেও চলবে। আরও নানা উপায় আছে। কিছু ফল নিয়ে নিই। খেতে খেতে যাওয়া যাবে।'

ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ থাকলেও হেঁটে যাচ্ছে দুজনে। ঘোড়াও হাঁটছে তাদের সাথে। নগর এখান থেকে বেশি দূরে না। সকালে শরীর চর্চা হয়নি। হাঁটলে কলকজা একটু নড়াচড়া হবে। সকালের প্রথম প্রহর যখন শেষ হয় হয়, তখন তারা নগরে পৌঁছল।

কামার সকাল সকালই তার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সকাল সকালই এই কাজ করার নিয়ম। রোদের তাপ বেড়ে গেলে হাপরের পাশে বসা রীতিমতো নরকের যন্ত্রণা। কোনো কামারই খুব বেশি কাজের চাপ না থাকলে হাঁপরের সামনে বসে না। রোদ চড়ে গেলে অন্য কাজ করে।

ওরা যখন পৌঁছেছে তখন কামার মাত্র এক দফা আজ শেষ করে কয়লার আঁচ থেকে দূরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। রুদ্রদেবকে দেখে চিনতে পারলো সে। কদিন আগেই এই লোক কাঠমিস্ত্রিকে নিয়ে এসেছিল। অনেকগুলো অস্ত্র আর তির বানাবার সরঞ্জাম কিনে নিয়ে ফিরে গেছে। এই লোক ঐ কাঠমিস্ত্রির নতুন পাহারাদার।

'কী খবর তোমার? আবার এলে যে? দেখেশুনে তো সেদিন ভালো দেখে অনেক অস্ত্র কিনে নিয়ে গিয়েছিলে। সেগুলো কি যুদ্ধে ভেঙ্গে ফেলেছ না-কি? তেমন কোনো যুদ্ধ এই দিকে হয়েছে বলে শুনিনি। নাকি জঙ্গলের গাছের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভেঙ্গেছ সেগুলো?'

বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না রুদ্রদেব। জবাব দিলো হাসি মাখা মুখে, 'না, আপনার অস্ত্রের তুলনা নেই। সোমগড়ের অস্ত্র আর তার কারিগর দুটোই বিখ্যাত। সেই অস্ত্র কি

আর এত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারে। আপনার কাছ থেকে যে অস্ত্র নিয়ে গেছি তা দিয়ে জংগলের গাছের সাথে আরও হাজার বছর যুদ্ধ চালানো যাবে।'

'তাহলে আবার আমার এখানে এলে কী মনে করে?'

'আপনি একটা কথা ঠিক ধরেছেন। আপনার এখানে আমি অস্ত্র কিনতেই এসেছি। তবে আমার জন্য না, এই ছেলের জন্য।'

এবার অসিতের দিকে নজর গেল কামারের, 'বাহ, বেশ। এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে শাগরেদ জোগাড় করে ফেলেছ। কিন্তু এবার তো সাথে তোমার মালিককে দেখছি না। অস্ত্র কিনবে ভালো কথা, কিন্তু সেই অস্ত্রের পয়সা দেবে কে?'

'পয়সা নিয়ে আপনি ভাববেন না। এই পয়সা মালিক দেবেন না। আমাদের কাছে পয়সা আছে।'

'আচ্ছা, তাহলে তো আরও বেশ। এবার বলো, কী কী অস্ত্র লাগবে?'

'তলোয়ার, ধনুক, বর্শা, গদা। আর সবগুলোই দুটো করে।'

কথাটা শুনে এবার একটু অবাক হলো অসিত। শুধু শুধু দুটো করে কিনে পয়সা নষ্ট করার দরকার কী। রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে নিচু স্বরে বলল সে, 'দুটো করে কেন? একটা করে কিনলেই তো আমার শিক্ষার কাজ হয়ে যাবে।'

কামার কথাটা শুনতে পেয়েছেন। রুদ্রদেব কেন দুটো অস্ত্র চেয়েছে সেটাও কামার ভালোই বুঝতে পেরেছেন। তাই ব্যাখ্যাটা রুদ্রদেবের কাছ থেকে না এসে কামারের আছ থেকেই এলো, 'না বাবা, একটাই হবে না। সব দুটো করেই লাগবে। তার মধ্যে একটা থাকবে আসল অস্ত্র। যা দিয়ে যোদ্ধারা আসল যুদ্ধে লড়াই করে। আরেকটা হালকা অস্ত্র। প্রথম প্রথম প্রশিক্ষণের কাজে লাগবে সেটা। ওগুলো দিয়ে লড়াই করা চলবে না। ওগুলো শুধু শেখার কাজে লাগবে।'

রুদ্রদেব একমত হলো, 'একদম ঠিক।'

দুটো করে অস্ত্র কেনা হতে অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে গেল। তবে এখনো কিছু পয়সা বাকি আছে। রুদ্রদেব সেগুলোর দিকে তাকালো। অনুমান করতে চেষ্টা করলো পয়সার সংখ্যা, 'তোমার এখনো বেশ কিছু পয়সা বেঁচে আছে। একটা চিন্তা এসেছে আমার মাথায়।'

অসিত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী।' প্রশ্নটা করেই সে মুদ্রার থলির দিকে তাকায়।

'একটা ঘোড়া কিনলে কেমন হয়?'

অসিতের বিস্ময় মাত্রা ছাড়ায়, 'ঘোড়া! আমি ঘোড়া কিনবো!'

'হ্যাঁ, তা তো কিনতেই হবে। যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু স্থান পদাতিকের। তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে, হেঁটে, দৌড়ে যুদ্ধ করে। কোনো বাহন না থাকলে তুমি সবচেয়ে নিচু শ্রেণির যোদ্ধা বলেই পরিগণিত হবে।'

'বাহন?'

'হ্যাঁ। ঘোড়া, হাতি অথবা রথ। হাতি অথবা রথ কেনার সামর্থ্য এখন আমাদের নেই। ঘোড়া কেনা যেতে পারে। আসলে যে যোদ্ধা ঘোড়া চালনায় নিপুণ না, সে আসলে খোঁড়া। ঘোড়া বলতে গেলে যুদ্ধের একটা অস্ত্রই বলা যায়।'

'যে পয়সা বাকি আছে তাতে কুলাবে?'

'মনে হয় হয়ে যাবে। সোমগড়ে ঘোড়ার দাম তেমন একটা বেশি না। আর তেমন তেজী ঘোড়া না কিনলেও চলবে। কাজ চললেই হলো।'

ঘোড়া বিক্রেতাও রুদ্রদেবকে চিনতে পারলো। সেদিন রুদ্রদেব তার থেকেই ঘোড়া কিনেছিল। অনেক দেখেশুনে অসিতের জন্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে একটা মোটামুটি সুলক্ষণ যুক্ত একটা ঘোড়া পাওয়া গেল।

তবে ঘোড়া নিয়ে আসার সময় হলো বিপত্তি। অসিত ঘোড়ায় চড়তে জানে না। আর ঘোড়াটাও দুজন অচেনা লোক আর একটা অচেনা ঘোড়ার সাথে হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। রাস্তায় নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় সেই ঘোড়া। সোমগড় থেকে ফিরতে অনেক সময় লাগলো। নতুন কেনা ঘোড়াটা রুদ্রদেব যখন কুটিরের বারান্দায় বাঁধলো ততক্ষণে দিনের আলো বেশ কমে এসেছে।

রুদ্রদেব ফিরে এসেই তার ঘোড়া নিয়ে বেড়িয়ে গেল। সারাদিন বাইরে বাইরে কেটেছে। এবার জঙ্গলটা একটু দেখা দরকার। সেদিনের ঘটনার পর যদিও তস্করের দল আর আসতে সাহস করবে বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। একটু দেখে আসা যাক।

অসিত সারাদিনের ক্লান্তি কাটাতে শুয়ে পড়েছে। রুদ্রদেবের জঙ্গল পরিদর্শন করে আসতে আসতে সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এলো। জলের ঘড়া এক চুমুকে সাবাড় করে দিলো সে, 'আজ অনেক হয়েছে। এখন আর কোনো কাজ নয়। খেয়ে শুয়ে পড়বো দুজনেই। কাল সকাল থেকে তোমার শিক্ষা শুরু হবে।'

আজ শিক্ষা শুরু করার কোনো ইচ্ছে অসিতের মনে বেঁচে নেই। কোনোমতে খেয়ে শুয়ে পড়লো সে। আর সেই ঘুম ভাঙ্গলো রুদ্রদেবের হাতের ধাক্কায়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত। রুদ্রদেব নির্দেশ দিলো, 'যাও, প্রাকৃতিক কাজ সেরে এসো।'

ভোরের আলো একটু ফুটেছে। রুদ্রদেব আর অসিত মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

'নত হও অসিত। আমাকে প্রণাম করো। গুরুভক্তি আর সমর্পণ মনের মধ্যে না জাগাতে পারলে তুমি শিক্ষা সম্পূর্ণ করা তো দূরের কথা, ঠিক ভাবে আরম্ভই করতে পারবে না।'

রুদ্রদেবের গলার গভীরতা টের পায় অসিত। বুঝতে পারে সময়ের গুরুত্ব। রুদ্রদেবকে প্রণাম করে সে।

'এবার তোমার শিক্ষা শুরু হবে। মনে রাখবে, শিক্ষার মূলমন্ত্র দুটো। যে-কোনো সন্দেহে সাথে সাথে প্রশ্ন করবে, আর সন্দেহ না থাকলে সর্বদা গুরু আজ্ঞা পালন করবে।'

দুটো কথা কেন যেন পরস্পর বিরোধী মনে হয় অসিতের। তবে কোনো মন্তব্য করার মতো অবস্থায় নেই সে। নত মুখে সে মেনে নেয় রুদ্রদেবের উপদেশ।

'যাও, এবার শস্ত্র তোলো।'

অসিতের জন্য কাল যে অস্ত্রগুলো কেনা হয়েছে সেগুলো উঠানের একপাশে জড়ো করে রাখা আছে। অসিত ভুলে ভারী তলোয়ারে হাত দিলো। হাতল ধরে টান দিলো সে। এক হাতে তুলতে পারলো না। দুই হাতের সাহায্য নিতে হলো।

রুদ্রদেব হাসল, 'ওটা রেখে দাও। এখনো ওটা ধরার সময় আসেনি। এখন তুমি হালকা তলোয়ারটাই তোলো।'

সেটা তুলতে খুব একটা কষ্ট হলো না অসিতের। এবার পরীক্ষার পালা, 'অসিত, দুই হাতে তলোয়ার শক্ত করে ধরে মাথার ওপরে ওঠাও।'

আদেশ পালন করলো অসিত।

অসিত তলোয়ার মাথার ওপরে তুলতেই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রুদ্রদেবের শরীরে। নিজের তলোয়ার দিয়ে সে সজোরে আঘাত করলো অসিতের তরোয়ালে।

অসিত একদমই প্রস্তুত ছিল না। আঘাতের তোড়ে সে প্রায় সাত আট হাত পিছিয়ে গেল। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। চিত হয়ে পড়েছে। তলোয়ারও ছিটকে হাত থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে।

হতাশার একটা শ্বাস বেরিয়ে এলো রুদ্রদেবের গলা থেকে। এই ছেলে নামেই ক্ষত্রিয়। অস্ত্র জীবনে ছুঁয়েও দেখেনি। শরীরের শক্তি বাড়াবার কোনো চর্চাই এই জীবনে করেনি। তার অনুমান পুরোপুরি মিলে গেছে।

আচমকা পরীক্ষার ফল জানালো রুদ্রদেব, 'তোমার সব অস্ত্র নিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে এসো।'

'কেন?'

'তোমার শরীর এখনো অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত হয়নি। আর অযোগ্য শরীরে অস্ত্র ধারণ করলে কী হয় সেটা আমার থেকে ভালো কেউ জানে না।'

অস্ত্রগুলো ঘরে রেখে এলো অসিত, 'তাহলে আমি এখন কী শিখবো?'

'প্রথমে কিছু যোগাসন, তারপরে নৃত্য।'

'মানে? তাহলে যুদ্ধবিদ্যা শেখার কী হবে?'

'ওগুলো দিয়েই নবিশের যুদ্ধবিদ্যা শেখা শুরু হয়।'

৪১

পান্ড্য রাজ্যে বলতে গেলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে কিছুদিন ধরে। যে নগরে প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসা যাওয়া করে সেখানে হট্টগোল নিয়ে লোকে মাথা ঘামায় না, কিন্তু ক্ষুদ্র নির্জন গ্রামে একজনের চিৎকার সাড়া ফেলে দেয়। কোনো ঝামেলাবিহীন পান্ড্য রাজ্যে এখন যেন কর্মের ধুম লেগেছে।

তবে সবই হচ্ছে ভেতরে ভেতরে, ওপরে তার কোনো ছাপ নেই। সমুদ্রের ধারে এক পাহাড়ের আড়ালে বেশ গোপনীয়তার সাথে সেনা জড়ো করার কাজ শুরু হয়েছে। সেনারা সেখানে শুধু জড়োই হচ্ছে না, প্রশিক্ষণও চলছে তাদের পুরোদমে। সেনাদলের আকৃতি বাড়ছে আস্তে আস্তে। সব সৈনিকদের অবসর ভেঙ্গে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

খুব বেশিদিন হয়নি পান্ড্য মহারাজ ভালুদি আর মন্ত্রী ভীমসেন আলোচনায় বসেছিলেন। তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন চেরা রাজ্যের। তাহলে আর এত বড়ো সেনাদল পালন করে লাভ কী। সেনা পালনের ব্যয় অনেক। সামনে তেমন কোনো যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ করতে মহারাজ ভালুদির তেমন ইচ্ছেও নেই। তবে সেনাবাহিনী তো রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাখতেও হবে। একেবারে বিলোপ করা যাবে না। তখনই মন্ত্রী ভীমসেন বুদ্ধিটা দিলেন।

সেনাবাহিনীর অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। দুই-তৃতীয়াংশ সেনাকে ছাটাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাড়িতে। তারা কেউ কেউ ক্ষেত্রজীবী হয়েছে, কেউ বা পৈতৃক পেশার জিনিসপত্র ঘরের কোণা থেকে বের করে নিয়েছিল। অবশ্য তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধির মাত্রা একটু বেশি তারা আরও সহজ এবং কার্যকর উপায় খুঁজে বের করেছিল। অস্ত্রও আছে, তারা চালাতেও জানে, দস্যুদল গঠন করতে খুব একটা চিন্তা করতে হয়নি তাদের। পুরো রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া সেনার সদস্যদের আবার জড়ো করতেই এখন সিংহভাগ সময় ব্যয় হচ্ছে।

মহারাজ ভালুদি আজ এখানে এসেছেন সৈন্যদের প্রশিক্ষণ তদারক করার জন্য। সে উপলক্ষে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। অনভ্যাসে সব ধরনের বিদ্যা হ্রাস পায়। সেনাদের যেমন অস্ত্র চালানোর অভ্যাসে মরচে ধরেছে তেমনি প্রশিক্ষকেরাও প্রশিক্ষণ দেবার অনেক নিয়ম ভুলে গেছেন। সৈনিকরা কিছুতেই এখন একজন আরেকজনের সাথে তাল মেলাতে পারছে না।

খুব বেশিক্ষণ সৈন্য দলের এই দুরবস্থা দেখতে পারলেন না মহারাজ ভালুদি। মনের হতাশা বাইরে বেরিয়ে এলো তার, 'এরা তো যুদ্ধবিদ্যা একেবারেই গিলে ফেলেছে। এই বাহিনী নিয়ে তো শিকারেই যাওয়া যাবে না, যুদ্ধ কীভাবে করবো? এক কাজ করুন, যাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, তাকে সেখানেই রেখে আসুন।'

মন্ত্রী ভীমসেন ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, 'চিন্তা করবেন না মহারাজ। অনেক দিন পরে এসব করছে তো। পুরানো অভ্যাস ফিরে পেতে একটু সময় তো লাগবেই।'

বলছেন। কদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। তা হলেই ভালো। যেমন করেই হোক আমাদের সেনাদলের মান ফিরিয়ে আনতে হবে। কখন আবার মন্ত্রী ভেরাপ্পন চলে আসেন তার ঠিক নেই। দর কষাকষির সময় পণ্যের মান খারাপ থাকলে তো আর ভালো দাম পাওয়া যাবে না।'

'জি মহারাজ, তা ঠিক বলেছেন।'

মহারাজ ভালুদি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সৈন্যদের কসরত দেখলেন। তাতে তার হতাশার মাত্রা আরও বাড়লো। কসরতের মাঠ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন তিনি। এবার অন্য দিকে নজর দেওয়া দরকার। ভীমসেনের দিকে তাকালেন তিনি, 'আমাদের অস্ত্রাগারের কী অবস্থা? খবর নিয়েছেন? এই সৈন্যদের মতো অবস্থা হলে তো আমার সন্ন্যাসে যেতে হবে।'

'মহারাজ, গত দুইদিন আমি প্রধান সেনাপতির সাথে অস্ত্রাগার পরিদর্শনেই সময় কাটিয়েছি।'

'ভালো করেছেন। এখন বলুন, সেখানের কী অবস্থা। জানি দুঃসংবাদ শোনাবেন। তবে একটু বুঝেশুনে। দুঃসংবাদের মাত্রা যাতে একটু কম হয়।'

'কথাটা মন খারাপ রেখেই বলছি, আপনাকে খুব একটা আশার সংবাদ শোনাতে পারছি না। দীর্ঘ কাল ওসব অস্ত্রে কেউ হাত দেয়নি। ব্যবহারও করেনি, পরিষ্কারও করেনি। যা হবার তাই হয়েছে। বেশির ভাগ অস্ত্রেই মরিচা ধরেছে। সেনাপতি সবই পরীক্ষা করেছে। কিছু হয়তো ঘষেমেজে ব্যবহার করা যাবে, তবে বেশিরভাগই ফেলে দিতে হবে।'

'কী বলছেন এসব? তবে তো অস্ত্রশস্ত্র নতুন করে বানাতে হবে। অস্ত্রশালার কামারদের সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তো?'

'সেখানেই তো গণ্ডগোল মহারাজ। সেই উপায় তো আর নেই।'

'কেন?'

'তাদেরও তো আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আমি লোক পাঠিয়েছি আবার তাদেরকে ডেকে আনতে।'

দুঃখের হাসি হাসলেন মহারাজ ভালুদি, 'শাস্ত্রের নিষেধ না মানলে এমনই হয়। যে সেনাকে শাস্ত্রে রাজার মস্তিষ্ক বলা হয়েছে, আমি সেই সেনাকেই ত্যাগ করে বসে আছি।'

এই কথার জবাবে ভীমসেন কিছুই বললেন না। বলার উপায় নেই। সেই সময়ে যথার্থ মন্ত্রীর কাজ করতে পারেননি তিনি। তার উচিত ছিল সঠিক উপদেশ দেওয়া, কিন্তু তিনিও কেবল হা তে হা মিলিয়েছেন। অবশ্য তখন তার কাছেও অদূর ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল।

'কখন ডাক আসে জানা নেই ভীমসেন। তার আগেই আমাদের যেটুকু পারা যায় প্রস্তুতি সেরে নেওয়া উচিত।'

'আমি সেই ব্যাপারে আশাবাদী মহারাজ। আমরা কাজ শুরু করেছি। সব জায়গাতেই যথোপযুক্ত সংখ্যক লোকজন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'এখন চলুন, প্রাসাদে ফেরা যাক। সৈনিকেরা এখানে তাদের শরীরের জট ছাড়াক। আজ থেকে আমিও আমার ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ স্থানে শরীরের মরচে ঝেড়ে

ফেলবো। আপনিও বসে থাকবেন না। যুদ্ধে যেহেতু যেতেই হবে আপনিও একটু ঝালাই করে নেবেন।'

'আজ্ঞে মহারাজ, চলুন।'

এই প্রাসাদ রাজধানী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আসলে একে প্রাসাদ না বলে সমুদ্রের তীরের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ বললেই বেশি মানাবে। মহারাজ ভালুদি আর ভীমসেন দুর্গে প্রবেশ করলেন। দুর্গে এখন লোকজন একেবারেই নেই। তারা সোজাসুজি চলে গেলেন দুর্গের প্রশিক্ষণ স্থানে। অনেকদিন পরে অস্ত্রে হাত দিলেন দুজনেই। কেউই তেমন একটা সুবিধা করতে পারলেন না। অনভ্যাসে দুজনের শরীরই অল্প সময়ের মধ্যে ঘাম ছেড়ে দিলো ঢলের মতো। হাত বেশ তেলতেলে হলো সেই ঘামে, অস্ত্র বারবার ফস্কে যেতে চাইছে।

'আজকে তাহলে এটুকুই থাকুক ভীমসেন। যা অবস্থা, মনে হচ্ছে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিজেই মরবো।'

ভীমসেনের বাদ দেবার ইচ্ছা ষোলো আনা। অনেক আগ থেকেই দম পাচ্ছিলেন না তিনি। মহারাজ বলতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

গা থেকে ঘামের চিহ্ন দূর করতে আরও কিছুক্ষণ সময় ব্যয় হলো। শরীর সুস্থির করে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসলেন দুজনে। তবে শরীর সুস্থির হলেও মন হলো না। মহারাজ ভালুদির মাথায় নানান চিন্তা ঘুরছে।

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই ভুলে গেলাম ভীমসেন। স্নান আর খাবারের আগে সেই আলোচনাটা একবার করে নিলে ভালো হতো।'

'বলুন মহারাজ। কোন ব্যাপার বাকি আছে?'

'আমাদের গুপ্তচরদের কী খবর? সৈন্য আর কামারদের মতো কি তাদেরকেও আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম না-কি?'

'না মহারাজ। এখানে আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। বাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে দুজনেই ভুলে গিয়েছিলাম বিষয়টা। শেষে আর বাস্তবায়ন হয়নি। এই জায়গায় আমাদের তৎপরতা আমাদের একটু কম ছিল। সেটাই হয়েছে শাপে বর।'

'যাক, বাঁচা গেল। তা সবাইকে তো নানান রাজ্যে পাঠানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ মহারাজ। শুধু তাই নয়, কাছাকাছি যাদের পাঠিয়েছি তারা অনেকেই তাদের খবর সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে।'

'বাকিদের কী হলো?'

'কেউ কেউ একটু দূরের রাজ্যে গেছে। তাদের আসতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।'

'আচ্ছা, তা লাগুক। যারা ফিরে এসেছে তাদের সাথে কথা বলেছেন? তারা কি খবর নিয়ে ফিরে এসেছে?'

'জি মহারাজ, কথা বলেছি। খবর মোটামুটি ভালোই সংগ্রহ করেছে। চেরা আর চোলা রাজ্যের প্রায় সবাই-ই ফিরে এসেছে। শক, কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, কোশলের দূতেরা এখনো আসেনি।'

'যারা ফেরেনি তাদের কথা আপাতত থাকুক। যারা ফিরে এসেছে তারা কী খবর এনেছে তাই জানা দরকার।'

'বলছি মহারাজ। রাজধানীতে ওদের সাথে কথা বলেই আমি আপনার সাথে দেখা করতে এখানে এসেছি।

সাতবাহন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন অনেক খারাপ। ওপরে ওপরে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সেখানের প্রজারা এখনো কিছু বুঝতে পারছে না। তাদের ওপর এখন শুধু চাপানো হচ্ছে কিছু বাড়তি কর। কিছু কিছু জায়গায় দেবোত্তর আর জনগণের জন্য বরাদ্দ সম্পত্তিকে রাজসম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। দূতের কাছ থেকে সব শুনে মনে হলো, সৈন্য বল যাই থাকুক, খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে সাতবাহনের ওপর।'

'কারণ কী হতে পারে এই অবস্থার?'

'বাণিজ্যে সবকিছু বাজি ধরেছিলেন মহারাজ সাতকর্ণী। আর সেই বাজিতে তিনি খুব বাজে ভাবে হেরে গেছেন। তার কোনো বন্দরের ব্যাবসার অবস্থাই ভালো না। সোপারা ওদের সবচেয়ে সজ্জিত বন্দর। সেটা লাভ তো দূরের কথা প্রহরী আর অন্যান্য রাজ ব্যয়ের মুদ্রাই তুলতে পারছে না।'

'তাহলে তো চেরা মন্ত্রী ভেরাপ্পন ভুল কিছু বলেননি। এমন অবস্থা হলে তো মহারাজ সাতকর্ণী বেপরোয়া হবেনই। তিনি এখন ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনার অধিকারী। স্বভাবতই তিনি মনে করবেন, সব সোনার ওপর তারই অধিকার। আমি হলেও এখানে তাই মনে করতাম।'

'হ্যাঁ মহারাজ। আমারও তাই মনে হয়। মহারাজ সাতকর্ণী বেপরোয়া হয়ে উঠবেন। যদিও এখন পর্যন্ত তেমন কোনো লক্ষণ দেখেনি আমাদের গুপ্তচর। উল্টো দেখেছে এক অদ্ভুত জিনিস। মহারাজ সাতকর্ণী কৃষি কাজের সম্প্রসারণে কাজ করা শুরু করেছেন। পুরো রাজ্য থেকে সমর্থ লোকদের নিয়ে গিয়ে রাজ ভূমিতে মসলার চাষ করাচ্ছেন।'

মহারাজ ভালুদির মুখ চিন্তিত হলো, 'কিন্তু এই ব্যাপারটা তো আর খাপে খাপে মিলছে না।'

'মহারাজ সাতকর্ণী মনে হয় এবার বেশি করে মসলা ফলাতে চেষ্টা করছেন। দাম কমিয়ে দিয়ে বণিকদের কব্জা করার বুদ্ধি। আমাদের এদিককার সাথে তাহলে তো তীব্র প্রতিযোগিতা হবে।'

'কিন্তু তা তো এতো সহজ নয় ভীমসেন। মধ্য ভারতের জমি শস্যের জন্য ভালো। তবে সব ধরনের মসলার জন্য ভালো না। আমাদের এদিকে বেশ কিছু বিশেষ মসলা ফলে, সেটা তো আর তিনি চাষ করাতে পারবেন না। করলেও ফলন ভালো হবে না। আচ্ছা, সেই চিন্তা পরে করছি, বাকি রাজ্যের খবর কী?'

'চেরা রাজ্যের অবস্থা আমাদের মতোই। আমরা যেমন যুদ্ধের চিন্তা পুরোপুরি বাদ দিয়েছিলাম তেমনি চেরা মহারাজ চেরাল উথিয়ানেরও যুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। এখন তার মনে হঠাৎ করে যুদ্ধের চিন্তা উদয় হয়েছে। তাদেরও

যুদ্ধের প্রস্তুতি জোরেশোরে চলছে। তবে সেই প্রস্তুতির গতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।'

'তা তো হবেই। তারা যুদ্ধের চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আমাদের মতো তো আর সেনা নিশ্চয়ই বাড়ি পাঠিয়ে দেননি। চোলাদের কী অবস্থা?'

'চোলা রাজ্যে এরই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। এবং সেই খবরই এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজ কারিকালা এখন চোলার সিংহাসন সামলাচ্ছেন। মহারাজ এখনো যৌবনে ঠিকমতো পা দেননি। তার বাবার সন্দেহজনক মৃত্যুর পর মন্ত্রীমণ্ডল বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহ সফলও হয়েছিল। কয়দিন তারা ক্ষমতায় ছিলেন। পরে কারিকালা তার কাকা ইরামের সহায়তায় বিদ্রোহীদের দমন করেন। কাকা ইরাম ইচ্ছে করলে নিজেও সিংহাসনে বসতে পারতেন, তবে সেই লোভ ত্যাগ করে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছেন। আমাদের গুপ্তচর খবর এনেছে, ঝামেলা এখনো মেটেনি, সম্প্রতি মন্ত্রীমণ্ডল আবার সীমান্তে বিদ্রোহ করেছে।'

'তার মানে এক কথায় চোলা রাজ্যের অবস্থা বেশ টালমাটাল। সাতবাহন রাজ্য ওদিকে কৃষিকাজে মন দিয়েছে। তাহলে আমাদের আক্রমণ করবে কে? আমরাই বা যুদ্ধ করতে যাবো কার সাথে?'

'আমাদের কীভাবে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে তা জানি না মহারাজ। তবে সেটা জানতে আমাদের খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।'

'কেন? খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না কেন?'

'আজ সকালে রাজধানী থেকে দূত এসেছিল। চেরা মন্ত্রী ভেরাপ্পন আমাদের রাজধানীতে এসে পৌঁছেছেন কাল বিকেলে। আপনি যে এখানে এটা তিনি জানতেন না। রাতে তিনি রাজধানীতেই বিশ্রাম নিয়েছেন। আজ সকালে এই দুর্গের দিকে সৈন্য সাথে নিয়ে তার রওনা দেবার কথা।'

'আরে এক কথাটাই তো আপনার সবচেয়ে আগে বলা উচিত ছিল। তিনি তো আর অল্পক্ষণ পরেই এখানে চলে আসবেন।'

'জি মহারাজ।'

প্রাচীরের পাশে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ ভালুদি। দুর্গের পথে বেশ দূরে বালি উড়িয়ে কয়েকটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে।

মন্ত্রী ভীমসেনও উঠে দাঁড়িয়েছেন মহারাজের পাশে, 'আমার মনে হয় উনি এসে পড়েছেন মহারাজ।'

'হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এখনো তো আমাদের সেনা তৈরি হয়নি। এখন তাহলে আমি তাদের কী জবাব দেবো? দর কষাকষির যে চিন্তা আমি করে রেখেছিলাম তাও তো ঠিকভাবে এখনো সাজিয়ে নেইনি।'

'সাজিয়ে নিন মহারাজ। নিজের ভালো সবাই বোঝে। আর উনি যদি সেনাদের সম্পর্কে কথা বলেন তাহলে আমরা সত্যিই বলবো। এত অল্প সময়ের মধ্যে তো আর এতো বড়ো সেনা তৈরি করা যায় না। আরেকটু সময় তো লাগবেই।'

মহারাজ ভালুদি সম্মতি দিলেন। আবার ডুবে গেলেন নিজের চিন্তায়।

মন্ত্রী ভেরাপ্পনের সাথে তাদের বৈঠকে বসতে হলো কিছুক্ষণ পরেই। যে প্রশ্নের ভয় দুজনেই এতক্ষণ করছিলেন মন্ত্রী ভেরাপ্পন কুশলাদি জানার পর হাসি মুখে ঠিক সেই প্রশ্নটাই করলেন, 'আপনাদের সেনা সজ্জার কী অবস্থা এখন?'

প্রশ্নের উত্তর সযত্নে এড়িয়ে গেলেন মহারাজ ভালুদি, 'আমাদের শত্রু কি আক্রমণ করে ফেলেছে? কোন সীমান্তে আছে তাদের সেনা?'

ভেরাপ্পন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন মহারাজ ভালুদির এড়িয়ে যাওয়াটা। বুঝলেন তাদের সেনা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি, 'না মহারাজ, শত্রু এখনো আমাদের আক্রমণ করেনি। আমরাও আমাদের পরিকল্পনা একটু বদলে নিয়েছি। আমরা এখন আর শত্রু আক্রমণ করার আশায় বসে থাকবো না।'

'তাই না-কি?' মহারাজ ভালুদি একটু আগ্রহী হয়ে উঠলেন, একটু চিন্তাও ঝিলিক দিলো তার মুখে, 'তার মানে এখন আর আমাদের সৈন্যের দরকার নেই আপনাদের, তাই তো?'

'না মহারাজ, অবশ্যই দরকার আছে। আমরা পরিকল্পনা বদলে ফেলেছি; একবারে বাদ দিয়ে দেইনি। আপনাদের সেনা এখনও আমাদের পরিকল্পনার সফলতার জন্য আবশ্যক। তবে এবার আমরা আর শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকবো না। এবার আমরা নিজেরাই আক্রমণে যাবো।'

'মানে? আমরা সরাসরি আক্রমণ করবো? কিন্তু আমরা কোন রাজ্য আক্রমণ করবো? আপনার কথা অনুযায়ী তো আমাদের শত্রু ছিল দুটো। সাতবাহন আর চোলা।'

'হ্যাঁ মহারাজ। একেবারে ঠিক বলেছেন। আমাদের শত্রু দুটো। আর এবারের পরিকল্পনায় দুটোকেই একসাথে জব্দ করবো।'

'কীভাবে? একটু ভেঙ্গে বলুন। আমাদেরকে আর অন্ধকারে রাখবেন না।'

'হ্যাঁ, বলছি। আপনার জানা আছে কি না জানি না, চোলা রাজ্যের অবস্থা কিন্তু এখন অনেক খারাপ। কদিন আগে বিদ্রোহ হয়েছিল, সেই ধাক্কা সামলে রাজা এখনো ঠিকমতো বসারও সুযোগ পাননি, এরই মধ্যে আবার বিদ্রোহ হয়ে গেছে চোলায়। মন্ত্রীমণ্ডল বিদ্রোহ করেছে চোলার সীমান্তে। এবং ঠিক এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। এবার অনায়াসে চোলা বিজয় করা যাবে। বিদ্রোহীরা অবশ্যই আমাদের সাথে হাত মেলাবে। চোলা মহারাজ কারিকালার এবার সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

'কিন্তু, আমাদের সেনাদল তো এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। আমাদের যুদ্ধযাত্রার জন্য আরও কিছু সময় প্রয়োজন।' কোন রাখঢাক রাখলেন না মহারাজ ভালুদি।

'আপনাদের সেনার অবস্থা যে এখনো যুদ্ধের উপযুক্ত হয়নি তা আমি ভালো করেই জানি মহারাজ। সময় আপনি পাবেন। এত তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আমাদের সেনাও এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। তবে আমি আপনাকে বলবো, যত তাড়াতাড়ি পারেন সেনা তৈরি করে ফেলুন।'

মহারাজ ভালুদি এবার আর কিছুই বললেন না। তার চেহারায় হঠাৎ করে রাজ্যের চিন্তা ভর করেছে।

মন্ত্রী ভেরাপ্পন তাকে ভরসা জোগালেন, 'সাফল্য নিয়ে মনে কোনো ধরনের দ্বিধা রাখবেন না মহারাজ। জয় আমাদের হবেই। শুধু যে আমাদের সেনা মিলিত হয়ে আক্রমণ করবে তা নয়। চোলা বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডলের সৈন্যরা আমাদের সাথে অবশ্যই যোগ দেবে। সাথে আরও আছে। আপনি হয়তো জানেন, আমাদের এই তিন বড়ো রাজ্যের মাঝে কিছু ছোটো ছোটো স্বাধীন অঞ্চল আছে। ছোটো হলেও তাদের মিলিত শক্তি নেহাত কম না। এগারোটা স্বাধীন অঞ্চল আছে সেখানে। সেই এগারো রাজ্যের প্রধানরাও আমাদের পক্ষেই যুদ্ধ করবে।'

মহারাজ ভালুদি মুখ খুললেন, 'আমি তা নিয়ে চিন্তা করছি না। তবে আমাদের সেনার বদলে আমার একটা প্রস্তাব ছিল। বলতে পারেন আমাদের সেনা গঠন করার একটা খরচ। সেই প্রস্তাবটা আপনার বিবেচনায় দিতে চাই।'

'নিঃসংকোচে বলুন। আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবো আমরা।'

'আচ্ছা। শুনুন। মুঝিরিস আপনাদের বন্দর, আপনাদের গর্ব। মসলার জন্য পশ্চিমের বণিকদের কাছে এরচেয়ে ভালো কোনো গন্তব্য নেই। হরেক রকমের মসলা আপনারা বিক্রি করেন। তার মধ্যে লবঙ্গ আর গোলমরিচ আমাদের এদিকে ভালো হয়। আমরা সেই মসলা আপনাদের বন্দরে পাঠাই। আপনাদের মাধ্যমে বিক্রি করি। আপনাদের মুঝিরিস বন্দরে আমাদের জাহাজ যায় নিয়মিত।'

'হ্যাঁ। এটাই আমাদের মধ্যে চুক্তি। বদলে আপনারা তো বেশ ভালো স্বর্ণের ভাগ পান। হিসেব নিয়ে কোনো গণ্ডগোল হয় না। আপনার লোকও আছে হিসেব রাখার জায়গায়।'

'তা আছে। তবে এবার আমরা নিজেরাই ব্যাবসা করতে চাই।'

'মানে!' ঠিক বুঝতে পারলেন না ভেরাপ্পন।

'আমরা আর আপনাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাই না। আমরা মানে পান্ড্য রাজ্য এখন থেকে পূর্ণ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা চাই।'

মহারাজ ভালুদির হঠাৎ রূপ বদলে শুধু ভেরাপ্পনই অবাক হলেন না, ভীমসেনও হতবাক হয়ে গেলেন। মহারাজ এসব কী বলছেন। এই প্রস্তাবের কথা তো তার সাথেও আলোচনা করেননি মহারাজ।

ভেরাপ্পনের গলা এবার সতর্ক, 'মহারাজ, আপনার প্রস্তাবের কথাটা সরাসরি বলুন। কথা ঢেকে রাখবেন না।'

'বলছি। আপনারা এখন থেকে আর মুঝিরিস বন্দরে গোলমরিচ আর লবঙ্গ বিক্রি করবেন না। পশ্চিমের যেসব ব্যবসায়ীরা এই দুটো মসলা কিনতে আপনাদের বন্দরে আসবেন তারা সেগুলো কিনতে পারবেন না। তাদের আসতে হবে আমার বন্দরে। আপনারা এই দুই মসলার বিক্রয় সত্ত্ব আমাদের দিয়ে দেবেন। আপনাদের রাজ্যের গোলমরিচ আর লবঙ্গও আমাদের মাধ্যমেই বিক্রি করবেন। আমরা আপনাদের আগের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণের ভাগ দেবো। পাশার দান উল্টে দিতে যদি আপনি রাজি থাকেন তাহলেই আমি আপনাকে আমাদের সেনা দেবো। নইলে না।'

ভেরাপ্পন বেশ বুঝতে পারছেন পরিস্থিতি। সময়ের সুযোগ নিতে চাইছেন মহারাজ ভালুদি। এই সুযোগে স্বাধীন ব্যবসায়ী হতে চাইছেন। আগের সন্ধি শুধু ভাঙ্গতেই চাইছেন না, পুরো উল্টে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু এই সময়ে পান্ড্যের সেনা না হলেও তাদের চলবে না। আচ্ছা, দেখাই যাক। দুই মসলার বাজার নিয়ে মহারাজ ভালুদি কতটুকু ব্যাবসা করতে পারেন।

'ঠিক আছে মহারাজ। আমি আপনার শর্তে রাজি। আপনি যদি মুখিরিসের মতো ব্যবস্থাপনা করতে পারেন তাহলে করবেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমার মনে হয় না পশ্চিমের ব্যবসায়ীরা এত দূরে দক্ষিণের বন্দরে দুটো মসলার জন্য আসবে। শেষে আপনার ক্ষতিই হবে।'

'সেটা আমি বুঝবো। আমাদের সেনার দাম হিসেবে আমাদেরকে দুটো পণ্যের অধিকার দিতে হবে। তাহলে শুধু এবার নয়, সেনা যখন চাইবেন তখনই পাবেন। আমার এই শর্তের বিনিময়েই আমি সেনা দেবো।'

ভেরাপ্পন এবার একটু ঝুঁকে এলেন মহারাজ ভালুদির দিকে, গলার স্বরও যথেষ্ট নিচু হয়ে এলো, 'আপনি শুধু আপনার সৈন্যকে আমার কথা অনুযায়ী চালনা করবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার চাওয়ার থেকেও আপনার পাওয়ার পরিমাণ বেশি হবে।'

মুচকি হেসে সম্মতি জানালেন মহারাজ ভালুদি।

'এই কথাটা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

অসিতের মন্তব্যে ভ্রু একটু কুঁচকে গেল রুদ্রদেবের। এরই মধ্যে সে অসিতের গুরুদেবের দায়িত্ব লাভ করেছে। গুরুর দায়িত্ব অনেক। শিষ্য যদি বিপথে যায় তবে তার দায় অনেকটাই গুরুর ওপর বর্তায়। গুরু তো কেবল শিষ্যকে শস্ত্রশিক্ষাই দেন না, তাকে জীবন শেখান, ঈশ্বর শেখান, আলো-অন্ধকার শেখান। ছাত্রকে জ্ঞান দান করা গুরুর আসল কাজ না, বরং ছাত্রের মনকে জ্ঞান গ্রহণ করার উপযুক্ত করাই তার মূল কাজ।

আজ সকাল থেকে অসিতকে শস্ত্রবিদ্যার পাশাপাশি শাস্ত্রের শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। যুদ্ধ শিক্ষা অসিতকে অস্ত্র চালনা শেখাবে, আর শাস্ত্র শেখাবে কখন, কোনদিকে অস্ত্র চালাতে হবে। সেই শাস্ত্র শেখানোর এক পর্যায়েই এই মন্তব্য করেছে অসিত।

'এই কথার মধ্যে কি বুঝতে পারোনি?' রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে।

'এই যে আপনি বললেন মানুষ তার কর্মের ফল ভোগ করে। এজন্য বুঝেশুনে কর্ম করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সোজা কথা। যেমন কর্ম তেমন ফল।'

'মানুষ যদি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবেই তার পুনর্জন্ম হয়, তাই তো?'

'হ্যাঁ, পূর্ণ মুক্তি হয় না।'

'তাহলে পূর্ণ মুক্তি পাবার উপায় কী?'

'যতদিন জীবাত্মা ভাবে নিজেই কর্ম করছে, ততদিন এই কর্মের ফল তাকেই ভোগ করতে হয়। জন্ম থেকে জন্মান্তরে। যতদিন সে কর্মফলের আশা মনে পুষে রাখে ততদিন তার মুক্তি হয় না, পরমাত্মার সন্ধান লাভ করতে পারে না। আর পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া, তার সাথে একাত্ম হওয়াই প্রত্যেক জীবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। শাস্ত্রের এটাই সারকথা।'

অসিত শাস্ত্রের সারকথা সাবধানে এড়িয়ে গেল, 'হ্যাঁ, এটা তো এর মধ্যেই শুনেছি। সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহলে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, আমাদের প্রথম জন্ম কীভাবে হলো? প্রথম জন্মের আগে তো আমাদের কোনো কর্ম ছিল না। তাই কর্মফল থাকারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলে সেই জন্মের পেছনে কারণ কী? প্রত্যেক জীবের প্রথম জন্ম কীভাবে হয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে যথেষ্ট চমৎকৃত হলো রুদ্রদেব। পরমুহূর্তে হাসিতে ভরে গেল তার মুখ, 'বেশ ভালো প্রশ্ন করেছো তুমি। আমি খুব সন্তুষ্ট। তবে এই প্রশ্ন করার ক্ষমতা তোমার হলেও আমার হিসেবে এর উত্তর জানার মতো স্থিতি এখনো আসেনি। সময় হোক। তখন এই প্রশ্নের উত্তর আমি অবশ্যই দেবো।'

আবার শাস্ত্র পাঠে মন দিলো অসিত। ততক্ষণে ভোরের আলো ভালো করে ফুটে গেছে। এবার শাস্ত্র শিক্ষা রেখে শস্ত্র শিক্ষা করার সময়। রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ালো, 'আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। এখন উঠানে যাও।'

শাস্ত্র গুছিয়ে রেখে প্রণাম করলো অসিত। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো। সাথে করে হালকা অস্ত্রগুলো নিয়ে আসতে ভুল করলো না।

অসিতের হাতের অস্ত্র দেখে ভ্রূকুটি করলো রুদ্রদেব, 'তোমাকে না কাল বলেছিলাম, শস্ত্র আপাতত ঘরে রেখে তারপর উঠানে আসতে। আজ আবার এসব বের করে এনেছ কেন?'

অসিতের কালকের কথা মনে পড়লো। সে ভেবেছিল কাল হতাশা আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ঐ আদেশ দিয়েছিল রুদ্রদেব। বলেছিল শস্ত্র ছাড়াই তার শস্ত্র শিক্ষা হবে। ভেবেছিল, তাই আবার হয় না-কি। কিন্তু আজও রুদ্রদেবের কথার ভাব তেমন একটা পাল্টায়নি। অসিত কী করবে ভেবে পেলো না। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শস্ত্রের বোঝা মাথায় নিয়ে।

নিশ্চিত হতে না পেরে প্রশ্ন করলো সে, 'অস্ত্রগুলো কি তাহলে ভেতরে রেখে আসবো?'

'হ্যাঁ, কালকে তো তাই বলেছিলাম। কানে কথা ঢোকেনি?'

অসিত আর কিছুই বলল না। নত মুখে অস্ত্রগুলো আবার যথাস্থানে রেখে এলো।

'এবার তাহলে কী করবো?' ভেতরে ভেতরে একটু অপমানিত বোধ করছে সে। আর মানুষের ভেতর অপমান ক্রোধের জন্ম দিতে তেমন একটা সময় নেয় না। অসিতের প্রশ্নের সুরে ক্রোধ বেশ ভালোভাবেই মিশে আছে।

সেই সুরে কান দিলো না রুদ্রদেব, 'সেটাও তো তোমাকে কালকেই বলে দিয়েছি। এখন তোমার নৃত্যকলা শিক্ষা শুরু হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমাদের হাতে সারাদিন সময় নেই। তোমার শিক্ষা শেষ হলে আমাকে আবার গুরু থেকে ছাত্র হয়ে যেতে হবে।'

'আপনি কি অস্ত্রগুরু? না-কি নৃত্যকলার শিক্ষক?'

কৌতুক খেলে গেল রুদ্রদেবের গলায়, 'নৃত্যকলা সম্পর্কে তো তোমার অনেক জ্ঞান দেখছি।'

'জানি না আবার। মন্দিরের মেয়েরা নৃত্যে পটু হয়। তারা নানান অলঙ্কার পরে, সোনালি রুপালী বস্ত্র পরে। আমি দেখেছি। তাদের কোমরের বিছা আর পায়ের নূপুরের ছন্দ অনেক সুমধুর শোনায়। আমি সেটাও শুনেছি। নৃত্যই যদি শিখবো তাহলে আপনি আমাকে অস্ত্র কিনে না দিয়ে ওসব অলংকার আর পোশাক কিনে দিলেই তো পারতেন।'

রুদ্রদেব অসিতের সাথে ঐকতানে রেগে গেল না। গুরুর কাজে রেগে যাওয়া বারণ, 'তোমাকে কে বলেছে নৃত্য কেবল মেয়েরাই করে?'

'এখানে আবার বলাবলির কী আছে। এটা তো সবাই জানে। আমাদের মন্দিরে শিব চতুর্দশীর সময় তো মেয়েরাই নাচে। কোনো ছেলে অথবা পুরুষকে তো কখনো নাচতে দেখিনি আমি।' আরেকটা উদাহরণ সাথে সাথে মাথায় চলে এলো তার, 'আপনি জানেন, আমাদের গ্রামে এক যোদ্ধা আছে, সে রাজার সেনাদলে থাকে। আমি

তো ছোটোবেলা থেকেই ওকে চিনি। কই সে যে এত বড়ো যোদ্ধা, কখনো তো তাকে নাচতেও দেখিনি, নাচ শিখতেও দেখিনি।'

নৃত্যের বর্ণনার শেষ পর্যায়ে অসিত শরীরকে একেবারে বাঁকিয়ে একটা ব্যাঙ্গাত্তক নৃত্যের ভঙ্গি করলো। ব্যাঙ্গার্থে করা সেই ভঙ্গি নাচের কোন মুদ্রা তা ঠিক বোঝা গেল না, তবে সেই ভঙ্গির সাথে শাখামৃগের গাছের ডালে চলাচলের ভালোই মিল খুঁজে বের করা যায়। না হেসে পারলো না রুদ্রদেব।

রুদ্রদেবকে হাসতে দেখে রাগ আরও বাড়লো অসিতের, 'আপনি হাসছেন কেন? আমি কি কোনো হাসির কথা বলেছি?'

রুদ্রদেব হাসি সংযত করলো, 'না, হাসির কথা বলোনি। তবে স্বীকার করতেই হবে, তোমার অঙ্গভঙ্গিতে হাসির যথেষ্ট উপাদান ছিল। তোমাদের মন্দিরের মেয়েরা কি এভাবেই নাচতো না-কি? কিন্তু এসব তো কোনো নৃত্য কৌশলের মধ্যে পড়েনি। এসব কার কাছ থেকে শিখেছ? আমার মনে হয় অঙ্গদের কাছ থেকে।'

রুদ্রদেবের বিদ্রুপ বুঝতে পারলো অসিত। আর কিছুই বলল না সে। একমনে এক কোণায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

না, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। এবার বিদ্রুপ আর উপহাস বাদ দিয়ে মূল আলোচনায় ঢুকে পড়লো রুদ্রদেব, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, তোমার গ্রামের ঐ রাজার দলের সৈনিক কখনো নৃত্যকলার চর্চা করেনি, তাই তো?'

'হ্যাঁ, করেনি।'

'তাহলে একটা কথা জেনে রেখো, ঐ যোদ্ধা যতই রাজার দলে থাকুক না কেন, সেনাপতি, মহারথী হয়ে গেলেও, তার শস্ত্র শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হওয়া তো দূর, ভালো করে শুরুই হয়নি। সেই যোদ্ধা তোমাদের গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ ক্ষত্রিয় তাকে আমি কিছুতেই বলতে পারছি না।'

'আপনি না বললে তো আর সত্যি মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার নিজের চোখে দেখা। ওকে আমি তলোয়ার চালাতে দেখেছি, ধনুক চালাতে দেখেছি। আমাদের গ্রামে কেন, আশেপাশের দশ গ্রামের এমন করে চালাতে কেউ পারে না। আপনি পড়ে আছেন নৃত্য নিয়ে, যা কেবল মন্দিরের দেবদাসীদেরকেই মানায়।'

রুদ্রদেব ক্রোধজিৎ। এর মানে অনেকে ভুল করে। ক্রোধজিৎ মানে যে কখনো ক্রোধান্বিত হয় না, তা নয়, আসলে সে জানে কখন ক্রোধ দেখাতে হবে। এবার ক্রোধের অভিনয় করতেই হলো রুদ্রদেবকে, 'মুখে লাগাম দাও অসিত।'

রুদ্রদেবের কণ্ঠের কাঠিন্যে এবার থতমত খেলো অসিত।

'মন্দিরে দেবদাসীরা নাচে। সে নৃত্য দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য। পানশালায় লোকে সুরার নেশায় মত্ত হয়ে গণিকার নৃত্য দেখে পরম আনন্দ লাভ করে, সেটাও নৃত্য। তুমি জানো না, নৃত্যের কত ভাগ আছে। নৃত্যের নানা উদ্দেশ্য আছে। তুমি দেবদাসীদের নৃত্য তো দেখেছো, কিন্তু কখনোই সেই নৃত্যের ভাষা বুঝতে পারোনি।'

রুদ্রদেবের রেগে যাওয়া বুঝতে পেরেছে অসিত। তার চোখ নত হয়ে এলো। মনে পড়লো, কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। রুদ্রদেব তার গুরুদেব।

'শোনো অসিত, প্রকৃতি সৃষ্টির নারী শক্তি। পুরুষের সাথে প্রকৃতি মিললেই সৃষ্টি হয়। আর দেবদাসীরা সেই নৃত্যের মাধ্যমে প্রকৃতির নানা উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে। নৃত্যের মাধ্যমে প্রকৃতি তথা মহাশক্তির পূজা করে তারা। আর তুমি সেখানে কেবল শরীর বাঁকানো দেখেছ। তোমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অজ্ঞানী দুশ্চরিত্র লোকে তাই মনে করে।

যে নৃত্যকে তুমি মেয়েদের শরীরের অলংকার বলে অবজ্ঞা করলে, মেয়েলি বলে তুচ্ছ করলে, জানো সেই কলার আবিষ্কার কে করেছে?'

অসিত মাথা নাড়ল। জানে না।

'স্বয়ং মহাদেব শংকর। তিনি আদিযোগী, তিনিই আবার নটরাজ। তোমার এই ভুল ধারণা সর্বপ্রথম ত্যাগ করো। এই মুহূর্তে। পৃথিবীর সব কাজেই মিশে আছে এই ছন্দ। যুদ্ধও তোমাকে ছন্দের ভেতরে থেকেই করতে হবে। তলোয়ারের চালনায় ঝলকে ওঠে ছন্দ, ধনুকের ছিলা তির ছোঁড়ার পড়ে ছন্দে আন্দোলিত হয়। এসব শস্ত্রের ছন্দের সাথে যখন মানুষের শরীরের ছন্দ ঐকতানে মিলে যায়, তখন সেই মানুষ যোদ্ধা হয়ে ওঠে। অস্ত্রের ছন্দের সাথে শরীরের ছন্দকে মেলাতে হবে তোমাকে। আর শরীর এই ছন্দের স্বরূপ শিখতে পারে এই নৃত্যকলা থেকে।'

এবার অসিত একটু লজ্জিত হয়। তার মাথায়ও একটু একটু করে প্রবেশ করতে শুরু করেছে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা।

'তুমি আমার কথাতে নৃত্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ কি পারোনি, সেটা বড়ো কথা নয়। কথা হচ্ছে, তোমার যদি গুরুর কথা এবং নির্দেশে আস্থা না থাকে, তাহলে কখনোই তুমি পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে পারবে না। প্রথমে আমার প্রতি তোমার পূর্ণ সমর্পণ প্রয়োজন। এবং আমার মনে হচ্ছে এই কাজে তোমার ভীষণ আপত্তি আর তোমার দ্বারা হবেও না।'

পরিস্থিতি আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। এবার ভয় পেয়ে গেল অসিত। ভাবসাবে মনে হচ্ছে এখন এই লোক তাকে শস্ত্র বিদ্যা শেখাতে অস্বীকার করে বসতে পারে। সে শশব্যস্ত হলো, 'না, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার আপনার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে। নৃত্যের স্বরূপ আমি বুঝতে পারিনি। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আর কখনো আপনার অবাধ্য হবো না। আপনি যে আজ্ঞা করবেন এখন থেকে বিনা বাক্যে আমি তা পালন করবো।'

রুদ্রদেব প্রসন্ন হলো, 'ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ তো বেলপাতা। হাতের অঞ্জলিতে তিনপত্র বেলপাতা তুলে নাও।'

আদেশ পালন করলো অসিত।

'এবার শিবলিঙ্গে এই পাতা অর্পণ করো। তারপর একেবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভক্তি ভরে প্রণাম করো। নটরাজের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হোক তোমার নৃত্য শিক্ষা।'

প্রণাম সেরে রুদ্রদেবের সামনে এসে দাঁড়ালো অসিত। রুদ্রদেব ওদিকে তৈরি। একটা শক্ত কাঠের সরু দণ্ড আর একটা কাঠের পাটাতন তার হাতে আছে। উঠানের

ঠিক মাঝখানে জিনিসগুলো সামনে রেখে জোড়াসনে বসলো সে। পাটাতনটা মাটিতে রেখে দণ্ডটা হাতে নিলো।

'কোমরে দুই হাত দাও।'

আবারও আদেশ পালন করলো অসিত।

'এবার আমি এই দণ্ড দিয়ে নিচের পাটাতনে আঘাত করবো। সেই আঘাতে উৎপন্ন শব্দ হবে। প্রথম শব্দে তুমি ডান পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করবে। আর পরের আঘাতে বাম পা দিয়ে আঘাত করবে ভূমিতে। এভাবেই চলতে থাকবে।'

রুদ্রদেব আঘাত করলো পাটাতনে। শব্দের সাথে সাতে অসিতের পাও আঘাত করলো মাটিতে। ছন্দের লয় মাঝেমাঝেই নিয়ম অনুযায়ী বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে রুদ্রদেব। কাজটা যতটা সহজ মনে হয়েছিল আসলে ততটা না। বেশ শ্রমসাধ্য। অসিতের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। আবার ধীর লয়ের থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগলো রুদ্রদেব। এবারে দ্রুতলয়ে কয়েকবারের বেশি আর পা চালাতে পারলো না অসিত। মাটিতে বসে পড়লো আর্তনাদ করে। সাথে সাথে চেপে ধরেছে দুই পা।

'ব্যস, এটুকুতেই শক্তি ফুরিয়ে গেল? স্ত্রীদের কলা বলে তো অবজ্ঞা করেছিলে, এখন দেখলে তো স্ত্রী কলা এত সহজ নয়। শক্তি আর সামর্থ্যের প্রয়োজন এখানেও বেশ ভালোভাবেই আছে।'

একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলো রুদ্রদেব, 'তবে তোমাকে জানানোর জন্য বলছি, কথাটা বলা উচিত হচ্ছে না। প্রথম দিন হিসেবে তুমি খুব একটা খারাপ করোনি। বেশ প্রশংসনীয় চেষ্টা। আনাড়ি কেউ প্রথম দিন এতটা পা চালাতে পারে না। যদিও এখনো তোমাকে অনেকটা পথ পার হতে হবে। যাও, খাবার রাখা আছে ঘরে, খেয়ে নাও। এবার আমি আমার চর্চা শুরু করবো।'

খেতে খেতে রুদ্রদেবের চর্চা দেখতে লাগলো অসিত। যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে সে। একটা মানুষের শরীর এত ক্ষমতাধর কী করে হয়।

তলোয়ার আর অন্যান্য শস্ত্রের অভ্যাসের পর এবার ধনুক হাতে নিলো রুদ্রদেব। সব অস্ত্রের চর্চা অসিতের সামনে বসে করা গেলেও ধনুকের চর্চা অসিতের চোখের সামনে করা যাবে না। বিশেষ কারণ আছে। ধনুকের চর্চায় ইদানিং কিছু দিব্য জ্ঞানের চর্চাও করছে সে। সেগুলো তো আর অসিতকে দেখানো চলবে না।

অসিতের কাছে গেল সে, 'শোনো, এখন তোমাকে আরেকটা কাজ করতে হবে।'

অসিত উঠে দাঁড়াতে গেল, তাড়াতাড়ি বাঁধা দিলো রুদ্রদেব, 'না না, তোমাকে উঠতে হবে না। বসে বসে কাজ। আমিই ব্যবস্থা করছি।'

ঘর থেকে একটা কালো কাপড় নিয়ে এলো রুদ্রদেব। বেশ সাবধানে সেটা বেঁধে দিলো অসিতের চোখে।

'চোখ বেঁধে দিচ্ছেন কেন?'

'শোনো, দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত সময় যদি তুমি চোখ এভাবে কালো কাপড়ে বেঁধে রাখো, তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে। কালো কাপড়েই এই কাজ ভালো হয়।

এমন কথা কস্মিন কালেও শোনেনি অসিত, 'তাই না-কি। এভাবে কি আসলেই দৃষ্টি শক্তি প্রখর হয়?'

আবার কপট রাগ ফিরে এলো রুদ্রদেবের গলায়, 'তুমি আবার গুরুর ওপর সন্দেহ করছ? আস্থা হারাচ্ছো আবার আমার ওপর থেকে?'

অসিত ভয় পেয়ে গেল, 'না না, আস্থা হারাচ্ছি না। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। প্রতিদিন এক মুহূর্ত চোখ বেঁধে বসে থাকবো।'

'হ্যাঁ, তাই থাকবে। এখন বসো। আমি সময়ের হিসেব রাখছি।'

রুদ্রদেব একটু হেসে ধনুক তুলে নিলো। আজ পঞ্চশরের চর্চা করবে সে। ধনুক থেকে সে একটা তীরই ছুঁড়বে কিন্তু সেই শর ধনুক থেকে নির্গত হওয়া মাত্র পাঁচ ভাগ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, পাঁচটি শর বিঁধবে পাঁচটা আলাদা আলাদা লক্ষ্যে।

বেশ কিছুক্ষণ পঞ্চশর ছোঁড়া অভ্যাস করলো রুদ্রদেব। প্রথম প্রথম দুই একটা এদিক ওদিক গেলেও শেষ পর্যন্ত ছোঁড়া সবগুলো শরই সঠিক লক্ষ্য ভেদ করলো। সন্তুষ্ট হয়ে প্রণাম করে ধনুক রাখল সে।

এবার অসিতের দিকে নজর দেবার পালা। সে এখনো চোখে কালো কাপড় দিয়ে বসে আছে। রুদ্রদেব মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল, 'এবার কাপড় খুলে ফেলো। এক মুহূর্ত সময় পার হয়েছে।'

কাপড় সরাতেই আলোতে যেন চোখ ধাধিয়ে গেল অসিতের। কয়েক বার কচলে আর পিটপিট করে চোখে আলো সইয়ে নিলো সে।

'চলো, এবার স্নান করার পালা। বাকি শিক্ষা শুরু হবে আবার বিকালে।'

স্নান-খাওয়া-বিশ্রাম শেষে বিকেলে আবার শিক্ষা শুরু হলো। একটা এক তারের বাদ্যযন্ত্র কোত্থেকে যেন নিয়ে এসেছে রুদ্রদেব। তাই দিয়ে অসিতকে সাত স্বর বাজানোর শিক্ষা দেওয়া শুরু করলো। এই শেখারও মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারলো না অসিত। তবে চেষ্টা চালিয়ে গেল সে। সাথে সাথে চলছে রুদ্রদেবের উপদেশ, 'নাহ, হচ্ছে না, এভাবে না, বেসুরো হচ্ছে। ষড়জের স্বর ঠিকমতো আসছে না। তারটা আরেকটু কম টেনে ধরো। তারপর ছাড়ো। না না, এবার একটু বেশিই ঢিল দিয়ে ফেলেছ। আরেকটু টান বাড়াও।'

চলতে লাগলো অসিতের এক তারে সাত স্বর বাজানো শেখার প্রক্রিয়া।

৪৩

অমরাবতী যে তার আগের জৌলুশ হারিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একসময় সাতবাহন রাজ্যের রাজধানী ছিল এই নগর। এখনো তার নানা লক্ষণ রয়ে গেছে, তবে তা বার্ধক্যে আক্রান্ত দেহের মতো, কায়ার আকার ঠিক থাকলেও কোনোভাবেই যৌবনের সেই জোয়ার আর তাদের মধ্যে থাকে না। রাজা যে রাজধানী ত্যাগ করেন সেই রাজধানী আস্তে আস্তে সাধারণ নগরে পরিণত হয়। এই রাজ্যও এখন রাজধানী থেকে পরিণত হয়েছে ঐশ্বর্যময় অতীত সমৃদ্ধ সাধারণ নগরে।

রাজ্যের সবকিছুই এখন চলছে পশ্চিম সীমান্তে। এদিকের নগরের গুরুত্ব কমে গেছে, সেই সাথে পুবের সীমান্তের গুরুত্বও কমে গেছে একই তালে। সাতবাহন রাজ্যের পুব সীমান্তের সীমান্ত চৌকিগুলোর অবস্থা বেশ দীন হয়ে আছে অনেকদিন ধরেই।

রাজবীর কখনোই সৈনিক হিসেবে অত চৌকস ছিল না। রাজার সেনাদলে ভাগ্যচক্রে ঢুকে পড়েছিল সে। কোনোভাবে ঢুকে পড়লেও সৈন্যদলে তার পরের ধাপ গুলো পেরোতে হয় নিজের যোগ্যতা দিয়ে। সেখানে সে বরাবরই পেছনের সারিতে অবস্থান করতো। তাই প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তার এখন পর্যন্ত সৈনিক জীবন নানা সীমান্ত চৌকিতে পাহারা দিতে দিতেই কেটেছে। কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়া হয়নি তার। এতে যে তার খুব একটা মনঃকষ্ট আছে তা নয়। যুদ্ধে না যাওয়াতে ভালোই আছে। নামের 'বীর' অংশটা যে কখনো প্রমাণ করার সুযোগ পাওয়া যায়নি সেটা নিয়েও খুব একটা চিন্তা করে না সে।

সত্যিই সেটা নিয়ে তার তেমন দুঃখ নেই। তার রাজ্যের রাজা এত এত যুদ্ধ করছেন, এত এত সেনা যাত্রা হচ্ছে, কিন্তু সে কেবল সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশ্য বীর খেতাব প্রমাণ করার জন্য নিজের শস্ত্র নিয়ে আরেকজন সৈন্যের শস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে হয়। এই জায়গাতে তার বরাবরই আপত্তি। বলতে গেলে সে ভয় পায়। সে বুদ্ধিমান মানুষ। নিজের সামর্থ্য বোঝে। সে জানে, নিজে সে অত্যন্ত নিচু মানের সৈনিক। নির্বিষ সীমান্তে প্রহরী সৈন্য হয়ে থাকাটাই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল। বিনা কাজে টাকা রোজগার করার এটাই সহজ উপায়। ঈশ্বরের কৃপায় তার মনের ইচ্ছা কখনোই বিফল হয়নি।

আজ একেবারে সকাল সকাল সীমান্তের একটা চৌকিতে তার পাহারা দিতে যাবার কথা। এখানে কলিঙ্গ আর সাতবাহন রাজ্যের সীমান্ত। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক তেমন ভালোও না, খারাপও না। অবশ্য সাতবাহনকে এখন আর কোনো রাজ্যই অতটা ভালো চোখে দেখে না। দিনের মধ্যে গুটিকয়েক লোক সীমান্তের এপার ওপার যায়। তারা কেউ এত সকালে আসবে না। তাদের জন্য এত পুঙ্খানু সময় মেনে চলার কিছু নেই। তাই একটু ইচ্ছে করে আর একটু শরীরের বশে ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছে সে। প্রাচীরের ওপরের নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াতে এখনো অনেক দেরি।

সকালের নির্ধারিত স্থানে অনেকটা সময় নিয়ে প্রাতঃকর্ম সারলো সে। কিছুটা স্বভাবে আবার কিছুটা প্রয়োজনে। কাল রাত থেকেই পেটটা ভালো যাচ্ছে না। সকালের

এই স্থানে রাতেই আলো নিয়ে বারকয়েক আসতে হয়েছিল তাকে। মাংস খাওয়া সমাজে নিষিদ্ধ হলেও লুকিয়ে খায় সে। কাল রাতেও নিষিদ্ধ আসর বসেছিল। পোড়ানো মাংসটা কাল রাতে একটু বেশিই পুড়ে গিয়েছিল মনে হয়। বের হবার সময় অনেকটা শক্তি খরচ করতে হচ্ছে।

কাজ সেরে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হলো সে। পরিষ্কার হবার কাজে অনেকটা সময় ব্যয় হলো। তারপর অবশেষে হেলেদুলে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালো। এই জায়গাটা প্রাচীরের ওপরের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানে পাহারা দেবার সময় সবসময় হাতে বর্শা রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। তবে এসব বলে দেওয়া নিয়মের ধার কখনো ধারে না সে। বর্শা অনেকটা দূরে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। সে নিজেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন অপেক্ষা কেবল ঝিমুনি আসার। তাহলেই সময়টা পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করা হবে।

তবে রাজবীরের ঝিমুনি এলো না আজ সকালে, তার বদলে বেশ কিছু ধুলো সীমান্তের বাইরে থেকে উড়ে সাতবাহন সীমানায় ঢুকল। ধুলো নজরে পড়তেই ধুলোর উৎসের দিকে নজর গেল প্রহরীর।

এই সীমান্ত পাহাড়ের খাড়া ঢাল দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে। দুইপাশে দুটো খাড়া দেওয়াল, মাঝখানে বয়ে গেছে জলের সরু ধারা। ওপাশের দেওয়ালের মালিক কলিঙ্গ। সেই ওপাশের পাহাড় থেকেই ধুলো উড়ে আসছে। আর নিশ্চিতভাবেই কোনো ঝড় বইছে না। রৌদ্রোজ্জ্বল এই সকালে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

পাহাড়ের ঢালে ভালো করে চোখ মেলে ধরল রাজবীর। একটু পরেই ঘটনা নজরে পড়লো তার। আর তখনই তার মুখ একেবারে হা হয়ে গেল। সে কখনোই যুদ্ধে যায়নি। ছোটো ছোটো কিছু সেনাদল জীবনে দেখেছে সে, কিন্তু এত বড়ো সুসজ্জিত সেনাদল কখনোই দেখেনি সে। এমনকি কখনো তার কল্পনাতেও এত বড়ো সেনাদল আসেনি।

তড়িৎ চিন্তা চলছে তার মাথায়। কলিঙ্গ সীমানায় এত বড়ো সেনা রঙ্গখেলা দেখাতে আসেনি। একটাই কারণ হতে পারে। যুদ্ধযাত্রা। আর এতক্ষণে নিজের অবস্থা বুঝতে পারলো সে। এত বড়ো সেনা আর সাতবাহন সীমান্ত দুর্গের মধ্যে একমাত্র সেই দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হলো একটু আগে প্রাকৃতিক কাজে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি, হলে এখন আবার তলপেটে এই চাপ এলো কোথেকে?

এখনো ঠিকমতো নড়তে পারছে না সে। সারা শরীর জুড়ে বোধের অজ্ঞাত তীব্র ভয় ছড়িয়ে পড়েছে তার। একটু পরেই সাড় ফিরে পেলো শরীর। একটু দূরের হেলান দিয়ে রাখা বর্শা আর পাহারার নির্ধারিত স্থান ফেলে রেখে ছুট লাগালো সে।

খানিক পরেই দুর্গের সকল জাগ্রত সৈনিক এসে জড়ো হলো প্রাচীরের ওপরে। রাজবীর ছুটে সবাইকে খবর দিয়েছে। দুর্গ প্রধান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সেনাদলের দিকে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সাতবাহন রাজ্যকে এই সময়ে ভারতের কোনো রাজ্য আক্রমণ করার সাহস কীভাবে করে।

মাথায় আসা এই চিন্তাটা ঝেড়ে মাথা থেকে বিদায় করলেন তিনি। কারণ ভাবার সময় নয় এখন, পরিকল্পনা করতে হবে। সরাসরি এই দুর্গ এই সেনা আক্রমণ করতে পারবে না। এখানে পাহাড়ের ঢাল অনেক খাড়া। তবে এই উপায়ে নিশ্চিত হবার উপায়

নেই। এত বড়ো সেনার কাছে এসব বাঁধা কোনো কাজেই আসবে না। পাহাড়ি ঢালের পরেই সমুদ্র। সেই সমুদ্রের তীর ঘুরে যদি এই বাহিনী আসে তাহলে তাদের ঠেকানোর কোনো উপায় থাকবে না। সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়া নাও লাগতে পারে। একটু পরেই পাহাড়ি ঢাল খাড়া থেকে একটু হেলে আছে। চেষ্টা করলে সেখান দিয়েও সেনা এগোতে পারবে।

আরেকটা চিন্তা খেলে গেল তার মাথায়। এত বড়ো সেনা নিশ্চয়ই তার এই ছোটো দুর্গ আক্রমণ করতে আসেনি। তাদের লক্ষ্য নিশ্চয়ই অমরাবতী। তাহলে এই দুর্গ আক্রমণ না করেও সেদিকে সেনা যাত্রা করতে পারবে।

গুপ্তচর অথবা রাজধানী থেকে কোনো খবর অথবা এমন কোনো আভাস পাননি তিনি। কোনোরকম আভাস না দিয়েই এত বড়ো সেনা কীভাবে আক্রমণ করে। তবে যাই হোক তাকে সেরা উপায়টাই বের করতে হবে।

'এখনই সব সৈন্যকে এখানে চাই আমি। যারা রাতের পাহারা শেষ করে ঘুমাচ্ছে তাদেরকে তুলে আনো। রান্নাঘর আর ভাড়ারের দায়িত্বে যেসব সেনা আছে তাদের নিয়ে আসতেও ভুলবে না। সব ঘোড়া আর রথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করো তাড়াতাড়ি।'

আগেই পিঠটান দেবার উপায় ঠিক করে রাখতে হবে।

পরের আদেশটা দিলেন তিনি, 'প্রত্যেক তিরন্দাজ ধনুক আর তির ভর্তি তূণ নিয়ে প্রাচীরের ওপর তিন হস্ত অন্তর দাঁড়াও। সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবে। তবে আমার আদেশ না পেলে কেউই তূণ থেকে তির তুলে নেবে না।'

তবে তিনি ভালো করেই জানেন, এসবে কিছুই হবে না। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। তিনি তার সবচেয়ে বাজে সৈনিকের দিকে তাকালেন এবার।

দুর্গ প্রধান রাজবীরের দিকে তাকাতেই সে প্রমাদ গুনল। এই অবস্থায় তিনি তার দিকে কেন তাকাচ্ছেন? তাকে আবার কী করতে বলে কে জানে।

'রাজবীর।'

'আজ্ঞা করুন।'

'তুমি এক্ষুনি এই দুর্গ ত্যাগ করবে।'

এরচেয়ে মধুর বাক্য মনে হয় সহসা শোনেনি সে। বাসর রাতের প্রেমালাপের চেয়েও মধুর এই বাক্য। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে যাবার স্বস্তি প্রকাশ পেলো তার গলায়, 'যথা আজ্ঞা।'

'আরে আগে পুরোটা শোনো। তোমাকে এখনই ঘোড়ায় চড়ে রাজধানী অমরাবতীতে যেতে হবে। দুর্গের ঘোড়াশালের সহিসকে বলো তোমাকে যাতে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটা দেওয়া হয়। সেটা নিয়ে ছুটে এখনই অমরাবতীতে যাবে তুমি। খবরদার, পথে কোথাও দাঁড়াবে না। খবরটা অমরাবতীতে পৌছে দিয়ে তবেই বিশ্রাম নেবে।'

কাজের দায়িত্ব পেয়েও মন খুশি হয়ে উঠলো তার। এই সেনার সামনে থাকার চেয়ে ঘোড়া ছোটানো অনেক সহজ। সে আর কালক্ষেপণ করলো না। সহিসের কাছ থেকে ঘোড়া বুঝে নিয়ে তীব্র বেগে ছুটিয়ে দিলো রাজধানীর দিকে।

বলদেব অমরাবতীর দায়িত্ব অনেকদিন ধরেই পালন করছেন। প্রথম প্রথম বেশ অপমানিত বোধ করেছেন তিনি। মঞ্চ থেকে নাটকের মাঝে যদি কোনো অভিনেতাকে

নামিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটাই স্বাভাবিক। তবে জীবনে কম তো হলো না। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের উচ্চাশার সাথে সাথে মান অপমানের বোধও যেন অনেকটা কমে আসে। লাঞ্ছনা গঞ্জনা তখন সহজেই সহ্য করা যায়। যাই হয়ে যাক, কী আর আসে যায়।

কদিন আগেও তিনি মহারাজ সাতকর্ণীর পরে সাতবাহন রাজ্যের মাথা ছিলেন। এই রাজ্যের সব কাজে তার বুদ্ধিই কাজ করতো। এখন তিনি নিজেও ব্রাত্য, হয়েছেন এই ব্রাত্য রাজধানীর রক্ষক। গিরিধারী নামের এক ব্রাহ্মণ এখন মহারাজ সাতকর্ণীর মহামন্ত্রী। এখন কেবল অলস বসে থেকে শেষ সময়ের অপেক্ষা করা।

তার একান্ত প্রহরী এসে দাঁড়ালো, 'মহামন্ত্রী বলদেব, পূবের কলিঙ্গ সীমান্তের দুর্গ থেকে একজন সৈনিক এসেছে। সে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

'হ্যাঁ, আমি সাক্ষাৎ করবো।' যাক, অনেকদিন পর কেউ তো এলো তার সাথে দেখা করতে। তবে প্রহরীর একটা ভুল হয়েছে, 'তার আগে তুমি আমার সম্বোধনটা ঠিক করো। আমি এখন আর সাতবাহনের মহামন্ত্রী না। বরং বলতে পারো আমি এখন এই অমরাবতীর বুড়ো পাহারাদার।'

দূত কিছু বলল না। শুধু নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

'যাও। ঐ সৈনিককে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

রাজবীরকে একবার দেখেই বলদেবের ভ্রূ কুঁচকে এলো। দৃষ্টির ক্ষমতা কমে গেলেও লক্ষণ বিচারের ক্ষমতা এখনো লোপ পায়নি। সামনে দাঁড়ানো সৈনিকের অবস্থা তথৈবচ, 'তোমাকে দেখেই ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারছি আমি। তোমার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। বোঝাই যাচ্ছে খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এসেছ তুমি। তার মানে ঘটনা বেশ গুরুতর। আর দেরি কোরো না। কী হয়েছে শীঘ্র বলো।'

রাজবীর জীবনে খুব বেশি ঘোড়ায় দীর্ঘ যাত্রা করেনি। তার দেহ তখনো পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। কোনোমতে একটু দম নিয়ে নিলো সে, 'একটা বিশাল সেনা আজকে আমাদের সীমান্তে দুর্গের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।'

'কী বললে? বিশাল সেনা?'

'আজ্ঞে।'

'কী বলো? তুমি কি নিজ চোখে দেখেছো?'

'আজ্ঞে, আমিই প্রথম দেখেছি।' এবার গলায় একটু দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ তার।

'দেখেছো যখন তখন সেনার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

এবার বিপদে পড়লো রাজবীর। সে সেনাকে প্রথম দেখেছে সত্য, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখেনি। তাড়াতাড়ি স্মৃতি হাতড়াল সে, যেটুকু মনে পড়লো তাই বলল, 'হাজার হাজার সৈন্য ছিল সেখানে। তাদের চলাফেরায় ধুলোয় আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবার জোগাড়। ঘোড়াও ছিল অনেক। দুর্গের দেওয়াল ভাঙ্গার পাথর ছোঁড়ার যন্ত্রও ছিল অনেক।'

'হাতি ছিল না?'

প্রশ্ন শুনে মনে পড়লো রাজবীরের, 'হ্যাঁ, ছিল তো। শত শত হাতি।'

এবার সন্দেহ দূর হলো বলদেবের। তিনি এবার স্পষ্ট ধারণা করতে পারছেন এই সেনাদল সম্পর্কে। আর কারো নয়, এটা স্বয়ং কলিঙ্গরাজের পাঠানো সেনা। কিন্তু কেন?

বহু আগে কলিঙ্গ রাজা মহারাজ খারবেল সাতবাহন আক্রমণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেসব তো অনেক আগের কথা। এখন তো আর কোনো বৈরি ভাব কারো মধ্যেই নেই। তাহলে কী উদ্দেশ্যে কলিঙ্গের সেনা আজ সাতবাহনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে?

'সৈনিক, ওরা কি আমাদের দুর্গ আক্রমণ করেছে?'

'না, আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তো কিছুই করেনি। তবে এতক্ষণে মনে হয় আক্রমণ করে দুর্গ ধ্বংস করে ফেলেছে।'

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। সেনাদের অথিতিশালায় বিশ্রাম নাও।'

বলদেব এর পরের কর্তব্য জানেন। যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিষ্ঠানায় খবর পাঠাতে হবে। অমরাবতীর সেনা শক্তি এখন খুবই কম। সেনাপতিও তেমন দক্ষ নয়। তবে আক্রমণ এলে প্রতিরোধ তো করতে হবে। তাদের কাছে যে পরিমাণ সৈন্য আছে তাই নিয়েই নগর রক্ষা করতে হবে। দুটো কাজ করার জন্যই তৈরি হলেন তিনি।

এক ঘোড়া দিয়ে খবর পাঠালে দেরি হয়ে যাবে। এরকম খবর পাঠাতে হয় ঘোড়ার শ্রেণির মাধ্যমে। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে এক সেনানিবাসে খবর পৌছাবে। সেখান থেকে আরেকজন তাজা ঘোড়া আর খবর নিয়ে রওনা দেবে। এভাবেই একের পর এক তাজা ঘোড়ার পিঠে করে খবর পৌছে যাবে মহারাজ সাতকর্ণীর কাছে। তবু দিন তিনেক লেগে যাবে। অন্য উপায়টাও ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পায়রা ব্যবহার করতে হবে। সেখানে একদিনের মধ্যেই খবর পৌছে যাবে।

অমরাবতী থেকে উড়িয়ে দেওয়া হলো পায়রা। একদিনের মধ্যেই সেই খবর গিয়ে পৌছল প্রতিষ্ঠানায়।

খবর সহজ ভাষায় লেখা। সেই পত্র পড়ে মন্ত্রণায় বসলেন মহারাজ সাতকর্ণী আর গিরিধারী।

সাতকর্ণী উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন, 'গিরিধারী, বলদেব যে সেনার বর্ণনা এই খবরে পাঠিয়েছেন, সেই সেনা কলিঙ্গের। সেই সেনা তো অতি সহজেই অমরাবতী দখল করে ফেলতে পারে। তাহলে অমরাবতীর সুরক্ষার জন্য তো আমাদের অতি সত্বর সেনা নিয়ে সেদিকে যাত্রা করা উচিত।'

'না, মহারাজ। আগে শত্রুর চালের পেছনে কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। শত্রু কেন এই কাজ করেছে? আমার মনে হচ্ছে শত্রু যা চাইছে আপনি ঠিক তাই করতে যাচ্ছেন।'

'কী বলছেন আপনি? অমরাবতী আমাদের আদি রাজধানী। সেই নগরের রক্ষা অবশ্যই করতে হবে। সাতবাহনের শক্তির ভিত্তি সেই নগর। তার পতন হলে তো আমার রাজ্যেরই পতন হয়ে যাবে।'

'না মহারাজ, অমরাবতীর পতন হলে আমাদের পতন হবে না। কলিঙ্গ রাজ আমাদের সীমান্তে সেনা পাঠিয়েছেন ঠিক। তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি, সেই সেনা কেবল আমাদের সীমানায় অবস্থান করবে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রবেশ অথবা রাজধানীতে আক্রমণ আপাতত করবে না। এখনো সময় আসেনি।'

সাতকর্ণী অবাক হলেন, 'সময়? কী সময় হবার কথা বলছেন? তারা এত বড়ো সেনা আমাদের সীমানায় কেবল দেখানোর জন্য এনেছে? আক্রমণ করবে না?'

'আমি তা বলিনি মহারাজ। ওরা আক্রমণ করবে। তবে এখন না। ভেবে দেখুন, খবরে কী লেখা আছে। ওরা যদি আক্রমণ করতো তাহলে সহজেই সমুদ্র তীর ধরে এসে দুর্গ আক্রমণ করতো। অথবা পশ্চিম ঢাল ধরে এসে অমরাবতীর দিকে এগোতে পারতো। বলুন মহারাজ, তারা সেসবের কিছুই না করে কেন আমাদের দুর্গের সামনে এত বিশাল সেনা নিয়ে সমাবেশ করেছে? কেন?'

'কেন করেছে তা আমি কী করে বলবো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মানে হলো, আমার মনে হয়, শত্রু আমাদের ঘাড়ে তাদের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করাতে চাইছে। তারা আমাদের বলতে চাইছে যখন ইচ্ছা আমরা তোমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পারি। আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ব্যস্ত রাখতে চাইছে তারা। একটু ভালো করে চিন্তা করুন মহারাজ, কলিঙ্গ রাজা আসাকার মতো নির্ঝঞ্ঝাট রাজা হঠাৎ তার সেনা আমাদের সীমানায় কেন পাঠালেন? তিনি তো একটা কথা ভালো করেই জানেন, তার সেনা যত বড়োই হোক না কেন, আমাদের মূল সেনার আকারের তুলনায় তুচ্ছ। নিজ থেকে আচমকা এই হটকারী সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না।'

'এই কথার মানে?'

'তার মানে হচ্ছে কেউ নিশ্চয়ই তাকে লোভ দেখিয়েছে অথবা তাকে কোনোরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। সেই সাহায্য সম্পূর্ণ রূপে না পেলে তারা সরাসরি আক্রমণ করবে না। আমাদের এখানে খুব সাবধানী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত। অবশ্যই কলিঙ্গ রাজা আমাদের শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছেন।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'তাহলে এখন আমরা কী করবো গিরিধারী?'

'মহারাজ, শতরঞ্জে এখন শত্রু আগে চাল দিচ্ছে। আর আমরা দিচ্ছি পরে। আগে চাল দেবার সুবিধা আছে। প্রতিপক্ষ থেকে কিছুটা সময় এগিয়ে থাকা যায়। তবে পরে চাল দেবারও একটা সুবিধা আছে। তখন প্রতিপক্ষের চাল দেখে নিয়ে নিজের চাল ঠিক করে নেওয়া যায়। এখানে প্রতিপক্ষের চাল মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের এখানে আর দেরি করলে চলবে না। এবার আমাদের চাল দেবার পালা।'

'কী চাল দেবো আমরা?'

'শতরঞ্জে ওরা ওদের গুটি সাজিয়ে ফেলেছে। এবার আমাদের সাজানোর পালা। তারপর শুরু হবে আসল খেলা।'

৪৪

নৃত্য বেশি ভালো লাগছে অসিতের তা ঠিক বলা যাবে না। তবে মাঝে মাঝে মানুষকে অপছন্দের কাজ মনোযোগ দিয়ে করতে হয়। এটাও একটা গুণ যা মানুষকে অর্জন করে নিতে হয়। সে তাই করছে।

তবে ছাত্রের উন্নতি ছাত্রের চেয়ে গুরু বেশি বুঝতে পারেন। দেখতে দেখতে হাতের প্রসারণ, ছন্দ আর পায়ের নড়াচড়ার নিয়ন্ত্রণে অসিতের জড়তা অনেকটাই কেটে গেছে। রুদ্রদেব বুঝতে পারছে এবার অসিতের শিক্ষা একটু সামনে এগোতে দেওয়া যায়।

এবার দেহতত্ত্বের আরও গভীরে প্রবেশ করাতে হবে ছাত্রকে। রুদ্রদেব প্রশ্ন করে,

'শোনো, ভূত বলতে তুমি কী বোঝো?'

এমনিতেই এই নির্জন জঙ্গলের ধারে তারা দুই প্রাণী বাদে আর কেউ থাকে না। সেই জায়গায় এমন আলোচনা করা নিশ্চয়ই উচিত হচ্ছে না। সন্দিগ্ধ চোখে ভূত সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করলো অসিত, 'অন্ধকার অমাবস্যার রাতে বট, অশত্থ, তেঁতুল অথবা পিপুল গাছের নিচ দিয়ে চলাফেরা করার সময় অতি মূর্খ কিন্তু সাহসী লোকের ঘাড়ে যেই জিনিসটা চাপে তাই ভূত।'

'বাহ, ভূত সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখা যাচ্ছে বেশ গভীর।'

অসিত এবার উৎসাহ পেলো, 'ভূতের মধ্যে আবার পুরুষ মহিলা ভাগও আছে। মহিলা ভূতেরা আবার ঘাড়ে চাপার জন্য মহিলাদের বেশি পছন্দ করে। ভর দুপুরে বা বারবেলায় যদি কোনো মেয়ে খোলা চুলে থাকে তাহলেই আর উপায় নেই, ঘাড়ে চাপলো মহিলা ভূত।'

রুদ্রদেব এবার হালকা গলায় মত দিলো, 'তোমার কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো দ্রৌপদীকে অনেক ভূতে ধরেছিল।'

'মানে?' এই হঠাৎ চলে আসা প্রসঙ্গ অসিত ঠিকমতো বুঝতে পারে না।

'তুমি দ্যুত সভার কথা শুনেছ?'

না বোধক মাথা নাড়ে অসিত।

'দ্যুত সভায় পাণ্ডবদের হারিয়ে কৌরবেরা তাদেরকে বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিল। সেখানেই হয়েছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। সেই সভায় দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন এই অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া হবে, ততদিন তিনি চুল বাঁধবেন না। এরপর প্রায় তের চৌদ্দ বছর তিনি চুল বাঁধেননি। তোমার হিসেবে তার ঘাড়ে খোলা চুল থাকার কারণে অনেক ভূত চাপার কথা।'

অসিত আর কোনো কথা বলে না। ভূত মানে কী তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আর সে যা জানে তা জবাবে বলেছে।

'পঞ্চভূত বলতে কী বোঝো তুমি?' এবার ভূতকে পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিলো রুদ্রদেব।

এবার বুঝতে পেরেছে অসিত, 'ও আচ্ছা, আপনি এতক্ষণ এই ভূতের কথা বলছিলেন। পঞ্চভূত। মানে পাঁচ উপাদান। এটার কথা তো আপনি সেদিন বলছিলেন।

পাঁচ উপাদান দিয়েই এই সৃষ্টি হয়েছে। সবকিছুতেই মিশে আছে এগুলো। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। প্রথমেই পঞ্চভূতের কথা বলে দিলেই পারতেন।'

আসল আর নকল ভূতের প্রসঙ্গে আর গেল না রুদ্রদেব। শিক্ষার পরবর্তী ধাপ আরম্ভ করলো, 'সেই পাঁচটি উপাদানের নামও বলেছিলাম। মনে আছে?'

মাথা চুলকে নিলো অসিত, 'না, ঠিক মনে নেই।'

'আচ্ছা, আবার বলছি। শোনো, এবার আর ভুলবে না কিন্তু। অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী আর জল।'

বিড়বিড় করে কয়েকবার সবগুলো উপাদানের নাম আউড়ে নিলো অসিত, 'হয়েছে। এবার আর ভুল হবে না।'

'এবার আরও মনোযোগ দাও। তোমাকে আগের পাঠ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এখন এসব বলিনি আমি। এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে।'

অসিত মনোযোগ দিলো।

'আমাদের শরীরের দুই হাতেই পাঁচটি করে আঙুল আছে। আর এই পাঁচটি আঙুল এই পাঁচ উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে। নৃত্য এবং যোগশাস্ত্রে এই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের যুদ্ধকলাতেও এই তত্ত্বের গুরুত্ব আছে। ভালো করে মনে রাখো, বুড়ো আঙুল অগ্নির, তর্জনী বায়ুর, মধ্যমা আকাশের, অনামিকা পৃথিবীর আর কনিষ্ঠা জলের প্রতিনিধিত্ব করে। এই নাও।'

একটা পাতার ওপর বেশ কালো ঘন একটা তরল অসিতের দিকে এগিয়ে দিলো সে।

জিনিসটা কী বুঝতে পারলো না অসিত। এর আগে এমন কিছু দেখেনি সে, 'এটা দিয়ে কী করবো?'

'এটা কালি। কালি দিয়ে মানুষ কী করে তা তো জানো।'

'লেখে।'

'হ্যাঁ, তুমি কি লিখতে পারো?'

'পারি।'

'তাহলে লেখো। আমি যেভাবে বললাম সেভাবে প্রতিটা আঙুলে পঞ্চভূতের নাম লিখবে। বৃদ্ধাঙ্গুলে লিখবে অগ্নি, তর্জনীতে বায়ু, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখনই লিখে ফেলো। এই কালি সাতদিন আঙুলে থাকবে। কিছুতেই উঠবে না। তুমি সব কাজ করতে পারবে। ঘষো, ধোও, মোছ, কিছুতেই কিছু হবে না। সাতদিন পরে আস্তে আস্তে মুছতে শুরু করবে কালি। আশা করি এই সাতদিনে এই পাঁচটা নাম আর তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আঙুলের সূত্র তোমার একেবারে অন্তরে গেঁথে যাবে।'

নিজের পাঁচ আঙুলে কালি দিয়ে স্পষ্ট করে পঞ্চভূতের নাম লিখল অসিত। রুদ্রদেব লেখা শেষ হতেই কালির ওপর ফুঁ দিলো। দেখতে দেখতে একেবারে শুকিয়ে গেল কালি।

'হ্যাঁ, এবার হয়েছে।' রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হলো।

'শিক্ষা আজকের মতো শেষ হবার সময় হলেও শেষ হয়নি। আজকে তোমাকে আরেকটা পাঠ শেখাবো। মুদ্রার পাঠ।'

অসিত মুদ্রার কথা শুনে একটু উদাসীন হয়। তার কাছে কতগুলো মুদ্রা ছিল। দুটো গাভী সহজেই কেনা যেতো, 'মুদ্রার পাঠ কী করে শিখবো? আমার কাছে যত মুদ্রা ছিল সেসব তো সেদিন অস্ত্র কিনে খরচ করে এসেছি। সাথে আবার কিনেছি ঘোড়া।'

'আরে দূর, এই মুদ্রা সেই মুদ্রা নয়। আমি নাচের মুদ্রার কথা বলছি। আজকে তোমাকে নানা রকমের হাতের মুদ্রা শেখাবো।'

'ও আচ্ছা, নাচের মুদ্রা। আপনি আসল মুদ্রার কথা বলেননি।'

এবারও আসল আর নকলের পার্থক্যের মধ্যে গেল না রুদ্রদেব, 'নৃত্যে হাতের নানা রকম মুদ্রা আছে। নানা মুদ্রার নানা নাম। আজকে তোমাকে এক হাতের নানা মুদ্রা শেখাবো। মনোযোগ দাও।'

নাচের মুদ্রা শিখতে ভেতর থেকে আগ্রহ অনুভব করলো অসিত। সে তৈরি হলো।

রুদ্রদেব প্রথম মুদ্রাটা দেখালো, 'এই মুদ্রার নাম পতাকা। গুরুদেবকে তুমি আশীর্বাদ দিতে দেখেছো কখনো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে মনে করো তুমি আশীর্বাদ দিচ্ছো। ডান হাতের কব্জি হাতের দিকে যতটুকু পারো মুড়ে নাও। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলের ঠিক মাঝ বরাবর ভাজ করো।'

রুদ্রদেব মুখে যতটা সহজে বলে যাচ্ছে, করতে গিয়ে অসিত টের পেলো, কাজটা খুব একটা সোজা নয়। কাজটা করতে গিয়ে বুড়ো আঙুল আর কব্জিতে বেশ জোর টান লাগলো। বেশিক্ষণ হাত ঐ ভঙ্গিতে রাখতে পারলো না সে।

'আচ্ছা আস্তে আস্তে ভঙ্গি ধরে রাখতে পারবে। এবার আরেকটা দেখো। পতাকা মুদ্রার সাথে এর তেমন পার্থক্য নেই। নাম ত্রিপতাকা। সমস্ত অংশটা পতাকা মুদ্রার মতোই। শুধু পতাকা মুদ্রাটা ধরে অনামিকা মাঝখান বরাবর ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করবে।'

হয়েছে। বুড়ো আঙুলই ঠিকমতো বাঁকে না এখন আবার বুড়ো আঙুলের সাথে অনামিকাও বাঁকাতে হবে। চেষ্টা করতে গিয়ে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে গেল অসিতের। কোনোভাবেই অনামিকা বাঁকতে চায় না। যদিও বা অনেক কষ্টে বাঁকে, সাথে সাথে কনিষ্ঠা ডানদিকে হেলে পড়ে। কোনোভাবেই সোজা থাকতে চায় না। অনেক বার চেষ্টা করার পর পুরোপুরি না হলেও কোনোমতে পার পেলো সে।

এভাবে একের পর এক বেশ কিছু মুদ্রা অসিতকে শেখাল রুদ্রদেব। অসিতের নাভির শ্বাস নেবার তীব্রতাও বাড়তে লাগলো ক্রমশ। ময়ূর মুদ্রা, যাতে অনামিকা বুড়ো আঙুলকে স্পর্শ করে, বাকি আঙুলগুলো টানটান হয়ে সোজা থাকবে। আরালা মুদ্রা, যাতে অনামিকা স্পর্শ করে বুড়ো আঙুলকে, আর বাকি আঙুল অর্ধনমিত থাকবে। তোতা পাখির মস্তক মুদ্রাটি বেশ কঠিন। তবে রুদ্রদেব সহজেই তা করলো। এতে মধ্যমা আর কনিষ্ঠা সোজা রেখে বাকি আঙুল গুলো অর্ধেক বাঁকাতে হবে। এই মুদ্রা কোনোভাবেই সঠিক ভাবে করতে পারলো না অসিত। এরপর এলো চন্দ্রকলা মুদ্রা। এটা বেশ সোজা। অসিতের বিশেষ একটা বেগ পেতে হলো না।

এক হাতের মুদ্রা প্রথম দিন শেখানো হলো। কয়েকদিন সেগুলো চর্চা করার পর সময় এলো দুই হাতের মুদ্রা শেখার। সেগুলোও বেশ কয়েকদিন চর্চা করলো অসিত।

এরপর পুরো শরীরের মুদ্রা। নৃত্যের পুরো শরীর ভঙ্গি চর্চা করতে হলে প্রথমেই করতে হয় মহাদেবের বারো মৌলিক ভঙ্গির চর্চা। মহাদেবের একেকটা নাম আর

বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এসব মুদ্রা। নীলকণ্ঠ, নাগেন্দ্র, নটরাজ, পশুপতি, জটাধারী, গঙ্গাধর, ত্রিনেত্র, নন্দীশ্বর, নটেশ, শম্ভু, শশীধর এবং আদিযোগী। এই বারো ভঙ্গিমা বেশ ভালো করে দেখিয়ে দিতে লাগলো রুদ্রদেব অসিতকে। বারবার অসিতের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে লাগলো। একেকটা ভঙ্গিমায় একদৃষ্টে অনেকক্ষণ থাকার ক্ষমতা অর্জন করার আগ পর্যন্ত অসিতকে এই ভঙ্গিমাগুলো চর্চা করে যেতে হলো।

নৃত্য প্রশিক্ষণের সব রকমের মুদ্রায় আস্তে আস্তে দক্ষ হতে লাগলো অসিত। এখন আর তার মনে আগের মতো নৃত্যের প্রতি অনীহা নেই। নৃত্যের ছন্দে শরীর যে আনন্দ লাভ করে, সেই আনন্দের অনুভূতি এখন পেতে আরম্ভ করেছে সে। যদিও আসল যুদ্ধবিদ্যা শেখার ইচ্ছে এখনো তার মনে ষোলো আনাই আছে। মনটা কেমন যেন করে।

সেদিন সকালেও সবগুলো মুদ্রা একে একে অনুশীলন করলো সে। তারপর একেবারে শেষে শুরু করলো শিবের বারো ভঙ্গিমা অনুশীলন করা। রুদ্রদেব এখন আর একমনে তার দিকে তাকিয়ে তাকে নানা নির্দেশ দেয় না। সেও তার সাথেই অনুশীলন করছে। তবে চোখ মেলা আছে অসিতের অনুশীলনের ওপর। না, আজকে কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না। আগের থেকে আসন আর ভঙ্গিমাগুলোর স্থায়িত্ব আর ভারসাম্য দুইই বেড়েছে।

কয়েকবার অনুশীলন করে অসিত অনুযোগ করে, 'আমার মনে হয় নৃত্যের এই আসনগুলোর শিক্ষা আমার সম্পন্ন হয়েছে।'

রুদ্রদেব তার অনুশীলনে একটু বিরতি দিলো, 'তোমার এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয়। এবং অবশ্যই অন্যায় কিছু নয়। তবে একটা ব্যাপার তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার কোনো শেষ নেই। স্বয়ং নটরাজ শিব এই নৃত্যকলার আবিষ্কর্তা। ত্রিদেবের বাকি দুই দেব ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু অনেক চেষ্টা করেও সেই শিবের কোনো তল খুঁজে পাননি। তেমনি তার সৃষ্টি করা বিদ্যারও কোনো তল নেই।'

অসীম বিদ্যার প্রতি কোনো বিশ্বাস অসিতের আছে তেমন কিছু তার মুখ দেখে বোঝা গেল না।

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে হয় কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না অথবা মেনে নিতে পারছ না। ঠিক আছে প্রমাণ দেখাচ্ছি। একবার নটরাজ ভঙ্গিমায় দাঁড়াও তো।'

অসিত আদেশ পালন করে। নটরাজ ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। এখানে পুরো দেহের ভার থাকে একটা পায়ের পাতার ওপর। বাকি দুই হাত এবং এক পা শূন্যে বিশেষ ভঙ্গিমায় বাঁকিয়ে রাখতে হয়। অসিত শরীরে ছন্দ খেলিয়ে সেই ভঙ্গিমায় দাঁড়ালো।

রুদ্রদেব বেশ খুশি হলো, 'বাহ, একদম নিখুঁত। এবার আরেকটা কাজ করো। তোমার পুরো শরীরের ভার তো এখন এক পায়ের ওপর। এখন তোমার পুরো শরীরের ভার সেই পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর নিয়ে এসো। এই ভঙ্গিমায় তোমার পুরো শরীরের ভার শুধু তোমার বুড়ো আঙুলের ওপর রাখার চেষ্টা করো।'

শুনে এবার থমকে গেল অসিত। এক পায়ের ওপর ভারসাম্য রাখতেই এই ভঙ্গিমায় জান বেরিয়ে যাবার জোগাড়। সেখানে শুধু বুড়ো আঙুলের ওপর কীভাবে ভারসাম্য রাখবে। সে কীভাবে কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

রুদ্রদেব অসিতের ইতস্তত ভাব খেয়াল করলো, 'কী হলো। চেষ্টা করে দেখো। বুড়ো আঙুলের ওপর ভার নাও।'

একটু চেষ্টা না করে যে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এই শিক্ষা এতদিনে পেয়ে গেছে অসিত। এবার সে চেষ্টা করলো। আস্তে আস্তে গোড়ালি তুলে ফেললো সে। তার পুরো দেহের ভর এখন মাত্র এক পায়ের পাঁচ আঙুলের ওপর। কিন্তু তারপর এগোতে গিয়েই হলো বিপত্তি। বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই পুরো শরীর কেঁপে উঠলো তার। সাথে সাথে তার ভারসাম্য নড়ে গেল। ভারসাম্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করলো সে। তবে শেষ রক্ষা হলো না। পুরো দেহ কাঁপিয়ে ধুলোয় পড়ে গেল সে। অসিতের জন্য ঘটনাটা যথেষ্ট অপমানজনক হলেও রুদ্রদেবের মুখে বেশ জোরালো হাসি ফোটাল তা।

রুদ্রদেবের হাসি অসিতের গায়ে যেন লবণ দিয়েছে। তামাশার পাত্র হতে কারোই ভালো লাগে না। ক্ষেপে উঠলো অসিত, 'আপনি আসলে আমার সাথে তামাশা করেছেন। উপহাসের পাত্র বানিয়েছেন আমাকে। নটরাজ ভঙ্গিতে শুধু বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়ানো অসম্ভব। এটা কেউই পারবে না।'

'একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছ। আমি মজা পেয়েছি তোমার কাজে। তবে সত্যি বলছি, মজা পাওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে তোমার শেষ কথাটা যে ভুল তা এখনই প্রমাণ করছি।'

রুদ্রদেব নিজেই এবার দাঁড়ালো নটরাজ ভঙ্গিমায়। কোন অসুবিধা আর কাঁপাকাঁপি ছাড়াই নিজের দেহের ভার নিয়ে এলো বুড়ো আঙুলের ওপর, 'কী বুঝলে?'

কী আর বুঝবে। হাঁ হয়ে গেল অসিতের মুখ রুদ্রদেবের কর্মকাণ্ড দেখে। তার মানে এভাবে দাঁড়ানো সম্ভব।

'শোনো অসিত, শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অমোঘ সত্যি কথাটা জেনে রাখো। তুমি কোনো কিছুই পুরোপুরি শিখতে পারবে না। কারণ, পৃথিবীর কোনো গুরুই সবকিছু পূর্ণ জানেন না যে তোমাকে শেখাবেন। তার মানে সবকিছু শিখে ঈশ্বরের মতো শ্রেষ্ঠ তুমি হতে পারবে না, এজন্যই ঈশ্বর একমেবাদিতিয়ম। শ্রেষ্ঠ কেউই হতে পারে না, শ্রেষ্ঠ কথাটা আপেক্ষিক। তুমি যা পারো তা হচ্ছে নিজের কাজ এবং চর্চা ঠিকমতো করে কেবল উত্তম হবার চেষ্টা করতে। নিজের উন্নতি প্রতিদিন করতে পারাটাই কেবল মানুষের নিজের হাতে আছে। আর তোমার সামর্থ্য যাই হোক না কেন, সৎসাহসের সাথে সুপথে সেই সামর্থ্যের সর্বোত্তম প্রয়োগ করাতাই বীরত্ব, সেটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত তোমার।'

অসিত তবু নিজের অপমান ভুলতে পারছে না। কেউই পারে না। অপমানিত ব্যক্তি সবচেয়ে অপছন্দ করে উপদেশ শুনতে। রুদ্রদেব সেটা বুঝতে পারলো শতভাগ। অসিতের মনোভাব ঠিক করা প্রয়োজন, 'যাও, ঘর থেকে তোমার অস্ত্রগুলো নিয়ে এসো। ভারী গুলো না, হালকা গুলো।'

নিমেষে অসিতের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তড়িৎ গতিতে ঘরে ঢুকে গেল সে। বেরিয়ে এলো অস্ত্রের বোঝা নিয়ে।

'প্রথম দিনের কথা মনে আছে অবশ্যই তোমার। সেদিনের মতো তলোয়ারটা হাতে নাও। তারপর দুহাতে ঠিক সেদিনের মতো মাথার ওপরে তুলে ধরো।' বলতে বলতে রুদ্রদেবও তার তলোয়ার হাতে তুলে নিয়েছে।

অসিত তরোয়াল মাথার ওপরে তুলে ধরতেই ঠিক সেদিনের মতো নিজের তরোয়াল দিয়ে আঘাত করলো রুদ্রদেব। ঠিক সেদিনের মতো। তবে ফলাফল প্রথম দিনের মতো হলো না। একটু কেঁপে উঠে পেছনে হেলে গেল অসিতের দেহ। তবে পর মুহূর্তেই নিজের শরীর সামলে সোজা করে ফেললো অসিত। তলোয়ার মাথার ওপর বাগিয়ে ধরল আবার।

তবে এবারে রুদ্রদেব আর আঘাত করলো না, 'দেখতে পেলে পরিবর্তন? প্রথম দিন আমি এরচেয়েও আস্তে আঘাত করেছিলাম। আর তাতেই তোমার তলোয়ার আর তুমি দুই-ই ছিটকে পড়েছিলে।

তোমাকে এতদিন আমি নৃত্যকলা শেখাচ্ছিলাম। তবে সেসব তুমি অলংকার পরে নাচবে সেই উদ্দেশ্যে না। এগুলো যুদ্ধকলারই অংশ। সেসব অনুশীলন করে তোমার শরীর এখন তৈরি হয়েছে। এবার তোমার শস্ত্র হাতে অনুশীলন শুরু হবে।'

লজ্জিত হলো অসিত। এতদিন সে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, শুধু তাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুলই বুঝেছিল।

'এখন থেকে তোমার জন্য শিবের বারো ভঙ্গির চর্চা বদলে যাবে। তলোয়ার হাতে সেই ভঙ্গিমাগুলোর চর্চা করবে। কীভাবে করবে আমি একবার করে সবগুলো ভঙ্গিমা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে খেয়াল করো। নিজের তরোয়ালকে এবার নিজের শরীরের একটা অংশ বানিয়ে ফেলতে হবে তোমাকে। তোমার হাতের একটা বর্ধিত অংশ হয়ে উঠবে সেটা। নয়তো নিজের শরীর নিজেই কেটে ফেলবে।'

রুদ্রদেব সবগুলো ভঙ্গিমা একবার করে দেখিয়ে দিলো। যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েই দেখছে অসিত। সকালের শিক্ষা সেখানেই সমাপ্ত হলো।

বিকেলে আবার শুরু হলো সংগীত শিক্ষা। তার টেনে টেনে সবগুলো স্বর তোলা এখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি অসিতের। দুই একটা এদিক ওদিক হয়েই যায়।

তার বাজানো বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলো রুদ্রদেব, 'নৃত্যকলায় তোমার হাত মোটামুটি পেকেছে। তাই তলোয়ার হাতে নেবার সুযোগ হয়েছে তোমার। কিন্তু যতদিন এই যন্ত্রে সঠিক টান আর টোকায় তুমি সপ্তসুর নিখুঁতভাবে না বাজাতে শিখছ, ততদিন তোমাকে আমি ধনুক হাতে নেবার অনুমতি দেবো না।'

এই কথা শুনে আরও নিবিষ্ট মনে সংগীত সাধনায় মন দিলো অসিত।

৪৫

মানুষের জীবন সবসময় সরল পথে চলে না। পৃথিবীর কোনো পথই সরল নয়। পথে বাঁক আসে, তেমাথা আসে, চৌমাথা আসে।

চেরা রাজ মহারাজ উথিয়ানের সরল জীবন এখন নানা জটিলতায় ভরে গেছে। রাজাদের জীবন যদিও কখনোই সরল হয় না, তবু মহারাজ উথিয়ান তার পরিকল্পনাতেই জীবন চালাচ্ছিলেন। এখন সেই পরিকল্পনা ভেঙ্গে পড়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরে তাকে বাণিজ্যিক উপদেষ্টাদের চেয়ে সেনাপতিদের সময় দিতে হচ্ছে বেশি। নিয়মিত তাদের সাথে আলোচনা করতে হচ্ছে। অনেক চিন্তা করেছেন তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে, কিন্তু প্রতিবারেই তিনি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, ভেরাপ্পনের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কথামতো কাজ না করে উপায় নেই।

সারা জীবন তিনি বিশ্বাস করেছেন, যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই এখন ওসব এড়িয়ে চলা যায়। সেই যুদ্ধই এখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

মহারাজ উথিয়ানের যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ভাব আছে সত্য, তবে তাই বলে তার যুদ্ধকলা সম্পর্কে জ্ঞান কম আছে তা কিন্তু নয়। ছোটোবেলায় তিনি যখন নিজে নিজে চিন্তা করতে পারতেন না, তখনই তার বাবা তাকে ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে তাকে অর্থ শাস্ত্রের সাথে সাথে যুদ্ধ শাস্ত্রও বেশ গভীরভাবে চর্চা এবং অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেবার সাথে সাথে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজানো হয়ে গেছে। সকল সেনাপতিকে তিনি দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। আজ পুরো সেনা পরিদর্শনে যাবার কথা আছে তার।

সেনাপতিরা সবাই এরই মধ্যে চলে এসেছে। সভাকক্ষে আজ আর রাজসভা বসেনি। তার বদলে মন্ত্রণাকক্ষে বসেছে যুদ্ধসভা।

'মহারাজ, আমাদের সেনাবাহিনী এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। আমাদের সেনার সাথে এখন এগারো স্বাধীন ছোটো রাজ্যের সেনাও যোগ দিয়েছে। মিলিত সেনাবাহিনী একসাথে মহড়া দিচ্ছে এখন। তাদের সেনারা যথেষ্ট যোগ্য। আমাদের সাথে তাল মেলাতে খুব বেশি সমস্যা হবে না। এখন আমরা যদি আক্রমণ করি তাহলে চোলাদের অতি সহজেই হারিয়ে দেবো।'

প্রধান সেনাপতির কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মহারাজ উথিয়ান। সেনাপতি তার সেনা সম্পর্কে এমনই বলবে। সেনাপতিদের আত্মবিশ্বাসে কখনোই ঘাটতি হয় না। তবে কোনো কিছু পরখ না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া মহারাজ উথিয়ানের স্বভাব নয়। তিনি পরখ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, 'বাহ্, সবকিছু তৈরি। সেনাপতি হিসেবে আপনার স্বরের এই আত্মবিশ্বাস আমাকে বেশ সন্তুষ্ট করেছে। তবে আপনার প্রস্তুতি আমি একবার নিজ চোখে দেখে নিতে চাই।'

'অবশ্যই মহারাজ। আজ যে আপনি যাবেন তা তো আমরা সবাই জানি। চলুন, আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সজ্জিত অবস্থায় প্রশিক্ষণ ভূমিতে আছে। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে তারা।'

'হ্যাঁ, চলুন তাহলে। খুব বেশি দেরি করা উচিত হবে না।'

সবাই মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে সেনাসজ্জাস্থলের দিকে রওনা দিলেন। জায়গাটা রাজপ্রাসাদ থেকে খুব বেশি দূরে না। পৌঁছাতে কোনো বাহনের দরকার পড়লো না। হেঁটেই গেলেন সবাই।

সেনার সামনে একটা বেদির ওপর দাঁড়িয়ে একবার পুরো সেনার ওপর নজর বোলালেন মহারাজ উথিয়ান। যুদ্ধে মনোযোগ না থাকলেও রাজশাস্ত্র অনুযায়ী কখনোই সেনাকে হেলাফেলা করেননি তিনি। সব সময় উপযুক্ত অর্থের জোগান দিয়ে গেছেন সেনার রক্ষণাবেক্ষণে। তার সেই খরচের ফলও তিনি এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। হাতি, ঘোড়া, পদাতিক, অস্ত্রশস্ত্র, নিশান, যুদ্ধবাদ্য- কোনো কিছুরই অভাব নেই সেখানে। এই সেনাবাহিনী বর্তমানে ভূ-ভারতে অদ্বিতীয় সে কথা বলা যাবে না, তবে যে-কোনো রাজাই তার নিয়ন্ত্রণে এমন বাহিনী দেখে সন্তুষ্ট হবেন। যে-কোনো বাহিনীর সাথেই এই বাহিনী পাল্লা দিয়ে লড়তে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রধান সেনাপতির আত্মবিশ্বাস এখন তার মধ্যেও একটু একটু করে সঞ্চারিত হচ্ছে।

তবে নীতিশাস্ত্রের একটা পাঠের কথা মনে পড়লো তার। সবসময় ওপরের চাকচিক্য দেখে ভেতরের অবস্থা আঁচ করা যায় না। গভীরে পরখ করে নেবার দরকার হয়। এবার সেই পরখ করার কাজ শুরু করলেন মহারজা উথিয়ান।

প্রথমে আক্রমণের জন্য তিরন্দাজদের তৈরি হবার হুকুম দিতে সেনাপতিকে আদেশ দিলেন তিনি। সেনাপতি ইশারা দিলেন হাতে। সাথে সাথে আদেশ পালিত হলো। এরপরের ধাপে তিরন্দাজদের সরে যেতে বলা হলো। তাদের করে দেওয়া ফাঁকা স্থান দিয়ে পেছন থেকে সামনে এগিয়ে আসার ইশারা দেওয়া হলো ঘোড়সওয়ারদের। সেই আদেশও পালিত হলো সাথে সাথে। তারপর একে একে রথীরা বেরিয়ে এলো তাদের পথ দিয়ে। সবশেষে হস্তী বাহিনী বেরিয়ে চতুরঙ্গের মহড়া আপাতত সম্পন্ন করলো।

সেনাপতি কাজটা শেষ হয়ে যেতেই ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছেন মহারাজের দিকে। দেখলেন মহারাজ উথিয়ান একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেনার দিকে। সেই তাকিয়ে থাকাই বলে দিচ্ছে, সেনার প্রত্যেকটা নড়াচড়া তিনি বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। একটু পরে মহারাজ উথিয়ান ফিরতি চাহনি দিলেন সেনাপতির উদ্দেশ্যে, 'আপনার সেনা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি প্রধান সেনাপতি। আপনি কি তা ধরতে পেরেছেন। অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে সুখে থাকা যায় সত্য, কিন্তু তাতে সফল হওয়া খুব একটা যায় না।'

সেনাপতি মোটামুটি ভয়ার্ত স্বরে বললেন, 'মহারাজ, আমাদের সেনা তো প্রত্যেক আদেশের পালন করেছে।'

'হ্যাঁ, আমাদের সেনারা প্রত্যেক আদেশের পালন করেছে সত্য, তবে ঠিকমতো পালন করতে পারেনি। আর এই পালন করা আর ঠিকমতো পালন করার মধ্যেই যুদ্ধের হারজিত নির্ভর করবে।'

'মহারাজ, আমাদের সেনার জন্য কোনো মূল্যবান উপদেশ যদি দিতেন। আমাদের ভুলটা ধরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই আমরা শুধরে নেবো।'

'আচ্ছা, আমি আমার মতামত দিচ্ছি। আপনার তিরন্দাজরা এক সারিতে এসে তৈরি হতে যে সময় নিয়েছে তা স্বাভাবিক সময়ের দ্বিগুণ। তারপর তারা যখন সরে গিয়ে পদাতিকদের জন্য জায়গা করে দিয়েছে, তখন তারা বেশি সময় নিয়েছে। তারপর আসুন পদাতিকদের কথায়। অশ্ব আর হস্তীবাহিনীর নড়াচড়া নিয়ে আমার তেমন কিছুই বলার নেই, ঠিকই মনে হয়েছে, তবে পদাতিকদের গতি যথেষ্ট মন্থর। আপনার সবচেয়ে উন্নতি করতে হবে তিরন্দাজদের ক্ষেত্রে। যখন তিরন্দাজরা সবার পেছনে চলে যাবে তখন কিন্তু তাদের কাজ শেষ না। তখন নিজের সৈন্যদের ওপর দিয়ে তাদেরকে তীর ছুঁড়তে হবে বিপক্ষ দলের দিকে। তার মানে তখন তাদের দূরগামী ধনুক হাতে নিতে হবে। কিন্তু তারা আগের ধনুকই হাতে রেখে দিয়েছিল। তিরন্দাজদের আরও প্রশিক্ষণ দরকার সেনাপতি। আমি কি ঠিক বলছি। নাকি আপনি দ্বিমত করবেন?'

মহারাজের সাথে দ্বিমত করার প্রশ্নই ওঠে না, 'না মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

'আচ্ছা, এতক্ষণ তো আমি আক্রমণ দেখলাম। এবার আপনার সেনার অন্যান্য গুণাবলীও একটু দেখি। আপনি যেভাবে বললেন তাহলে তো মনে হচ্ছে আপনার সেনা সব ধরনের ব্যূহ রচনার শিক্ষা পেয়ে গেছে।'

'অবশ্যই মহারাজ। আদেশ পেলে এই সেনা নিমেষে যে-কোনো ব্যূহ গঠন করতে পারে। আর সেই ব্যূহ অক্ষত রেখে চারদিকেই নড়াচড়া করতে পারে। আমি নিজে বিশেষ যত্ন নিয়ে সেনাকে ব্যূহের শিক্ষা দিয়েছি।'

এবার আর সেনাপতির আত্মবিশ্বাসে মজলেন না মহারাজ উথিয়ান। ঠান্ডা স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, দেখা যাক।'

এবার সৈন্যদের ব্যূহ রচনার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। শঙ্খের ধ্বনিতে সৈনিকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সংকেত। সাথে ঢাক সহ নানা বাদ্যযন্ত্র আছে। সেগুলোও কখনো কখনো বেজে বিশেষ সংগীতের তাল সৃষ্টি করছে। তবে সেই সংগীতে মন ভরে ওঠে না, বরং পিলে চমকে যায়। একে একে এদিক সেদিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সৈন্যরা নানা রকমের ব্যূহ তৈরি করছে।

সামনে যদি কোনো বিপদ থাকে তাহলে মকর ব্যূহ সবচেয়ে ভালো উপায়। প্রথমেই সেই ব্যূহ তৈরি করতে সচেষ্ট হলো সৈন্যরা। তারপর পাশ থেকে আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বজ্র ব্যূহ রচনা করলো তারা। চারদিক থেকে বিপদ এলে সর্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করতে হয়, সেই ব্যূহও রচনা করলো তারা। এরপর একে একে অনেক বিশেষ ব্যূহ বিশেষ সংকেত পাওয়া মাত্র রচনা করলো সৈনিকেরা।

মহারাজ উথিয়ান সব সংকেত সম্পর্কেই জানেন। সংকেতের সাথে সাথে ব্যূহ রচনার প্রক্রিয়াটা পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন তিনি।

'ব্যূহ রচনায় এই সেনাদল বেশ ভালো।' মন্তব্য করলেন তিনি, 'ঢাকের তালে আর শঙ্খের ধ্বনিতে ঠিকমতো সাড়া দিয়েছে তারা। সময়ের ব্যবহারও বেশ ভালো। তবে একেবারে নিখুঁত হয়েছে ব্যূহগুলো, সেকথা বলা যাবে না।'

প্রধান সেনাপতি মহারাজের বাকি মন্তব্য শোনার জন্য কান একেবারে খাড়া করে রেখেছে।

'কিছু কিছু সৈনিক কিছু কিছু ব্যূহে জায়গা বেছে নিতে ভুল করেছে। মকর ব্যূহ রচনায় তাই মকরের পেট ভেতরের দিকে একটু চেপে গেছে। শকট ব্যূহে চলার জন্য শকটের দুই চাকার আকার একরকম হওয়া বিশেষ দরকার। এখানে শকটের দুই চাকার ব্যাস সমান হয়নি। বজ্রের আকারও পুরোপুরি ইন্দ্রের বজ্রের মতো হয়েছে বলে মনে হয় না। একমাত্র সর্বতোভদ্র ব্যূহ দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এটা একেবারে নিখুঁত হয়েছে।'

'মহারাজ যদিও সৈন্যদের ব্যর্থতার দায় পুরোপুরি আমার, কোনো অজুহাত আমার এখানে দেওয়া উচিত নয়, তবু অভয় দিলে একটা কথা বলি?' প্রধান সেনাপতির গলা একটু হতাশ।

'বলুন।'

'মহারাজ আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, ঐ এগারো স্বাধীন ভূমি অধিকারীর সেনারা আমাদের সাথে সদ্য যোগ দিয়েছে। তারা এখনো আমাদের সৈন্যদের সাথে তাল মেলাতে পারছে না। তারা চেষ্টা করছে কিন্তু এখনো ব্যূহে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না।'

'বুঝলাম। এটা কোনো অজুহাত নয়, আসলেই একটা কারণ। কিন্তু এই সমস্যা তো আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, তাই না? তাদেরকে আরও তীব্র প্রশিক্ষণ দিন। আমার কথা যদি শোনেন, নতুন সৈনিকদের যারা ব্যূহে দক্ষ নয় তাদের ব্যূহের বাইরের দিকে না রেখে মাঝের দিকে রাখবেন।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'কাজ ভালো করে শুরু করে দিন। আমি সাত দিবস পরে আবার আসবো। তখন যেন আপনার সেনাদের আক্রমণে এবং ব্যূহ রচনায় কোন ধরনের খুঁত না থাকে।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো মহারাজ।'

'আরেকটা কথা, আপনি মনে করবেন না আমি আপনার সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। আপনি যথেষ্ট যোগ্য। তবে এই সেনাযাত্রায় আমিই সেনাপতির পদে থাকবো।'

'আপনি যুদ্ধে যাবেন মহারাজ?' প্রধান সেনাপতির কণ্ঠে অবাক হওয়ার ছাপ স্পষ্ট।

'হ্যাঁ, সেনাপতি। আমার রাজ্যের সম্পূর্ণ সেনাদল যুদ্ধে যাবে। যদি তাদের সাথে না থেকে রাজধানীতে বসে থাকি তবে উৎকণ্ঠায় আমি ঠিক শ্বাস নিতে পারবো না। আর সেনারাও আমাকে সাথে পেলে উদ্দীপ্ত হবে বলেই আমার ধারণা। এজন্যই আমাকে যেতে হবে।'

'ঠিক বলেছেন মহারাজ। আপনি যুদ্ধে গেলে আমাদের সবার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।'

রঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন মহারাজ উখিয়ান। প্রাসাদের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন রক্ষী বেষ্টিত হয়ে।

প্রাসাদে এসেই খবরটা পেলেন তিনি। না, বিশ্রাম নেওয়া যাবে না। জরুরি সময়ে নিয়ম মানা যায় না। ভেরাপ্পন ফিরে এসেছেন। ইদানীং নানা কাজে হরিণের মতো ছোটাছুটি করছে ভেরাপ্পন। বেশ সন্দেহপ্রবণ মন তার। কারো ওপরে ভরসা করেন না।

একটু জরুরি অথবা গোপন কাজ হলেই সেটা নিজে করে। একা মানুষ, এবং একই সাথে চেরা এবং পান্ড্য দুই রাজ্যই সামলাতে হচ্ছে তাকে। ভেরাপ্পনের সাথে কথা বলা দরকার।

এদিকে প্রহরী এসে খবর দিলো, ভেরাপ্পন তার সাক্ষাৎ প্রার্থী। তার অনুমতি পেলেই দেখা করতে আসবেন।

'ওনাকে নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ পরেই নতুনভাবে তৈরি হয়ে দিনে দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রণাকক্ষে এসে বসলেন মহারাজ উথিয়ান। ভেরাপ্পন ঠিক সামনে বসে আছেন।

'সব কথা পরে হবে, আগে বলুন ভেরাপ্পন আপনার শরীরের কী অবস্থা?'

'আমার শরীর বেশ ভালো আছে মহারাজ।'

'তা ঠিক। আপনার গতি তো ঠিক মৃগের মতো হয়ে গেছে। চোখে হয়তো অতি কষ্টে দেখা যায়, কিন্তু কোনোভাবেই অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। বেশ কিছুদিন তো আপনি শুধু আসা যাওয়া করছেন। বলুন, কী খবর এখন। কী চলছে এখন আপনার মাথায়?'

'মহারাজ মাথায় কিছু ঘটানোর দিন শেষ। মাথা ছেড়ে এখন আমাদের মাঠে নেমে যাবার সময় চলে এসেছে।'

'মানে হচ্ছে, এখন আমাদের যুদ্ধযাত্রা করতে হবে, তাই তো?'

'আজ্ঞে মহারাজ। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। চোলা রাজ্যে আবার গৃহযুদ্ধের সূচনা কয়েকদিন আগেই হয়ে গেছে। চোলার বিদ্রোহী মন্ত্রীমণ্ডল এখন পুরো দক্ষিণ সীমান্ত অধিকার করে আছে। আমি দুটো জায়গায় গিয়েছিলাম। বিদ্রোহী মন্ত্রীদের সাথে কথা হয়েছে আমার। তারা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। এখন আমাদের সেনার অপেক্ষাতেই আছে তারা। তাদের সাথে যোগ দিতে এখনই আমাদের যাত্রা করা উচিত।'

'কিন্তু, আমাদের দিকটাও তো আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমরা এখনো সম্পূর্ণ তৈরি হইনি। আমাদের সেনাদের পূর্ণ প্রস্তুতিতে এখনো সাতদিন সময় লাগবে। সাতদিন গত হবার পর আটদিনের দিন সকালে মা ভবানীর পূজা করে আমি সেনা নিয়ে নগর থেকে বের হবো।'

ভেরাপ্পনের ভ্রু কুঁচকে গেছে, 'কিন্তু মহারাজ, সাত দিন তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। সময় এখন অনেক মূল্যবান।'

'দেরি হলেও কিছু করার নেই। সাতদিনের আগে সেনাদলের প্রস্তুতি সম্ভব নয়। আর অপ্রস্তুত সেনাদল নিয়ে আমি কোনোভাবেই যুদ্ধযাত্রা করবো না। আজ থেকে সেনাপতিদের সাথে আমি নিজে সেনাদলের প্রশিক্ষণ তদারক করবো। আপনি ওদিকে খবরটা পাঠিয়ে দিন। সাত দিনের বেশি দেরি হবে না।'

খানিক চিন্তা করলেন ভেরাপ্পন, তারপর নিজের মত দিলেন, 'ঠিক আছে মহারাজ। আমি আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রীদের জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

'হ্যাঁ, জানিয়ে দিন। আরেকটা কথা মনে হয় ভুলে যাচ্ছেন আপনি।'

'কোন কথা মহারাজ?'

'পান্ড্য রাজার সেনারা আমাদের সাথে কবে যোগ দেবে?'

'মহারাজ মন্ত্রীদলের সাথে দেখা করে আমি পান্ড্য রাজ্যে গিয়েছিলাম। আমাদের সৈন্যের প্রস্তুতি এখনো শেষ হয়নি, তেমনি সেখানের সেনার প্রস্তুতির অবস্থাও তেমন ভালো না। তারা পুরোদমে কাজ চালাচ্ছে। তাদেরও সাতদিনের মতো লাগতে পারে।'

'আচ্ছা, পান্ড্য সেনাকে আমাদের সাথে নিয়ে যুদ্ধে যাবার একটা কারণ আছে ভেরাপ্পন।'

'কী কারণ মহারাজ?'

'আমাদের সেনা, এগারো স্বাধীন ভূমি অধিকারীর সেনা আর বিদ্রোহী মন্ত্রীদের মিলিত শক্তির কাছে চোলা সেনা স্রেফ উড়ে যাবে। কিন্তু তবু আমি পান্ড্য সেনা নিয়ে যেতে চাই।'

'শক্তি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ। কিন্তু শক্তি বাড়াবার কারণ এখানে আলাদা। প্রথম কারণ হচ্ছে পান্ড্য রাজার বশ্যতা স্বীকার। তার সেনা আমাদের দিলেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে মেনে নেওয়া যাবে। এর আগে নয়।'

পান্ড্য রাজার বলা শর্তটা মনে পড়ে গেল ভেরাপ্পনের। এই শর্তে মহারাজ উথিয়ান কখনোই রাজি হবেন না। পাণ্ড্য রাজা বশ্যতা পুরোপুরি স্বীকার করা দূরে থাক ওদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে চাইছেন। পরিস্থিতি সাবধানে মোকাবেলা করতে হবে। এখনই মহারাজকে সব জানানো যাবে না।

'আরেকটা কারণ বলছি। এমনিতে পাণ্ড্য সেনা ছাড়া বাকি মিলিত সেনাবাহিনী যথেষ্ট বড়ো হবে। তবু হয়তো এই বাহিনীর সামনে কারিকালা যুদ্ধ করার একটা সুযোগ নেবে। কিন্তু পান্ড্য সেনা আমাদের সাথে থাকলে তিনি কোনোভাবেই যুদ্ধ করবেন না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন তিনি খুঁজবেন আত্মসমর্পণ এবং শর্ত সাপেক্ষে সন্ধির পথ। আর আপনি তো জানেনই, যে-কোনো উপায়ে আমি যুদ্ধের রাস্তা এড়াতে চাই। লড়াই এড়িয়ে চোলাকে বশে আনতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

'বেশ ভালো পরিকল্পনা করেছেন মহারাজ। পান্ড্য সেনা যথাসময়ে যুদ্ধে আমাদের সাথে যোগ দেবে। আমরা দক্ষিণ দিক দিয়ে চোলা রাজ্যে প্রবেশ করবো। আর সেদিক দিয়ে চোলা আর পাণ্ড্য একেবারে কাছাকাছি। পান্ড্যদের আমাদের চেয়ে কম রাস্তা পার হতে হবে। ওরা তাহলে প্রস্তুতি নিতে থাকুক। আমি খবর রাখছি। আমরা যাত্রা করবো আগে। তারপর একেবারে সঠিক সময়ে পান্ড্য সেনা আমাদের সাথে যোগ দিলেই চলবে।'

'হ্যাঁ। পান্ড্য বাহিনীকে আর উল্টো আসার দরকার নেই। বিদ্রোহী মন্ত্রীদের সাথে সাথে পাণ্ড্য রাজার কাছেও আমাদের সাতদিন পরে সেনাযাত্রার করার খবরটা পাঠিয়ে দিন।'

'যথা আজ্ঞা মহারাজ। আমি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

৪৬

এই কাজটায় অসিতের বরাবরই আপত্তি। অন্যান্য ক্ষেত্রে আগ্রহের কমবেশি হয়। কোথাও আগ্রহ বেশি থাকে, কোথাও আবার আগ্রহ কম থাকে। এই জায়গায় তার কোনো স্তরের আগ্রহই নেই। বরং আছে তীব্র ভয়। সেই ভয় মনে জেগে উঠতেই তার আপত্তি করতে ইচ্ছে করে।

তবে রুদ্রদেবকে এসব বলে কোনো লাভ নেই। সে এসব শোনার পাত্র নয়। মানুষ মাত্রই জীবনে ভয়ের নানা বস্তু থাকবে। আর সেই ভয়গুলোকে অতিক্রম করেই পূর্ণ সাহস অর্জন করে নিতে হয়।

ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। ঘোড়ায় চড়তে হবে অসিতকে। রুদ্রদেব আজ সকাল সকাল অসিতকে নিয়ে এসেছে জংগলের লাগোয়া একটা ছোটো মতন মাঠে। অসিতের ঘোড়াটাও নিয়ে আসা হয়েছে। সকাল থেকেই অনেকবার একটা কথা বলে যাচ্ছে রুদ্রদেব, 'যে যোদ্ধা ঘোড়ায় চাপতে জানে না সে আসলে খোঁড়া।'

ঘোড়ার প্রতি ভয়টা আসলে অসিতের ছোটোবেলা থেকেই। তাদের গ্রামে কারোই ঘোড়া ছিল না। সৈন্যরা মাঝে মাঝে গ্রামে আসতো ঘোড়া নিয়ে। তখন সে ঘোড়া দূর থেকে দেখত। কি তেজী প্রাণী। সৈন্যদের ভয় করার কথা কেউ কাউকে শেখায় না, সেই ভয় সবার মধ্যে এমনিতেই থাকে। অসিতের ক্ষেত্রে সৈন্যদের প্রতি মনের ভেতরে বাসা বেঁধে থাকা ভয়টা আস্তে আস্তে সৈন্যদের ঘোড়ার প্রতিও সঞ্চারিত হয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই তার কাছে ঘোড়া হচ্ছে ভয়ংকর লোক; মানে সৈন্য এবং ডাকাতের সহযোগী।

এবারই প্রথম নয়। নানা শিক্ষার সাথে সাথে এর আগেও কয়েকবার অসিতকে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল রুদ্রদেব। তবে সেই অভিজ্ঞতা অসিত, রুদ্রদেব কিংবা ঘোড়া কারো জন্যই সুখকর ছিল না। অনেক চেষ্টার পরেও ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতে পারেনি অসিত। পিঠে ওঠার ক্রমাগত চেষ্টায় ঘোড়া যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল। সেই বিরক্তির যোগ্য প্রতিদান হিসেবে একটা মোক্ষম লাথি কষিয়েছিল উত্থানকারীর উদ্দেশ্যে। আঘাতটা মোক্ষম হলেও আঘাত যে জায়গায় করা হয়েছিল তা মোক্ষম ছিল না। উরুতে লেগেছিল। ভাগ্য ভালো। আর পাঁচ আঙুল ওপরে লাগলেই হয়েছিল। অসিতের যন্ত্রণাকাতর মুখের আর্তনাদ আর রুদ্রদেবের অট্টহাসিতে শেষ হয়েছিল সেদিনের শিক্ষা। ঘোড়ার প্রতি ভয় এমন ঘটনার পর কাটার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সেদিনের আঘাতের ব্যথা পুরোপুরি যায়নি। এখনো একটু একটু আছে। স্বভাবতই ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল অসিত। রুদ্রদেব একটু দূর থেকে তাকে সাহস জোগাল, 'ভয় পেয়ো না। এবার তুমি অবশ্যই পারবে। কয়েকদিনের মধ্যে অনেক কিছুই বদলে গেছে। এখন তোমার শরীরের ভারসাম্যের অবস্থা অনেক ভালো।'

শরীরের ভারসাম্য মনের বিশ্বাস মাঝে মাঝে বাড়িয়ে দেয়। এগিয়ে গেল অসিত। তার উত্তেজনা একটু একটু রুদ্রদেবের মাঝেও ছড়িয়েছে। পেছন থেকে কথা বলে যাচ্ছে সে, 'যা বলেছি মনে রাখবে। প্রথমে ওর গলায় হাত দাও। আলতো করে বুলাও। ওর কানের কাছে নিচু স্বরে কথা বলো।'

'কী কথা বলবো?'

'আরে যা খুশি বলো। ঘোড়া কি তোমার কথা বুঝতে পারবে? ও শুধু তোমার গলার আন্তরিকতা অনুভব করবে। তখনই ভরসা করবে তোমাকে। ছোটোবেলায় শোনা গল্প, রূপকথা, কাহিনি যা মনে আসে তাই বলে দাও। তবে অবশ্যই স্বর নামিয়ে। তখন সে তোমাকে আস্তে আস্তে বন্ধু ভাবতে শুরু করবে।'

অসিত হাত দিলো ঘোড়ায় গলায়। কম্বলের মতো মসৃণ তুলতুলে গলায় হাতটা বোলাতে লাগলো আস্তে আস্তে। তবে কোনো গল্প, কাহিনি তার মাথায় আসছে না। তার বদলে মাথায় যা ঘুরছে সেটাই নিচু গলায় বলতে শুরু করলো সে, 'সত্যি বলছি, তোমার পিঠে ওঠার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। শুধু শুধু তোমাকে কষ্ট দেওয়া কেন। তবে আর যাই করি গুরুর আদেশ তো আর অমান্য করা যাবে না। আমাকে কাজটা করতেই হবে। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে। আর সেই সাথে একটা অনুরোধ করছি, আর যাই করো, দয়া করে সেদিনের মতো লাথি মেরো না। খুব লাগে।'

গলায় হাত বোলানোতে আরামে মৃদু শব্দ করে উঠলো ঘোড়াটা। রুদ্রদেব এই স্বর ভালো করেই চেনে, 'হ্যাঁ, এবার সময় হয়েছে অসিত। ওর বাম দিকের পাদানিতে তোমার বাম পা রাখো। তারপর এক ঝটকায় উঠে পড়ো পিঠে। খেয়াল রাখবে, যাতে ও চমকে না যায়। আর ভালো করে খেয়াল রাখবে, তুমি যাতে একেবারে ওর পিঠের চামড়ার আসনের ওপরেই বসো। খবরদার চামড়ার ওপর ভর দিয়ো না, তাহলে ভীষণ ব্যথা পাবে ঘোড়াটা। তোমাকে ছিটকে ফেলে দেবে।'

পিঠের আসনের সামনের অংশটা বাম হাতে বেশ জোরে আঁকড়ে ধরল অসিত। তারপর পাদানিতে পা রাখল রুদ্রদেবের উপদেশ অনুযায়ী। তারপর বাম পায়ে শরীরের সম্পূর্ণ ভর চাপিয়ে ডান পা ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে অর্ধচন্দ্রে ঘুরিয়ে একবারেই আসনে বসে পড়লো সে।

কাজটা করে ঠায় বসে রইলো অসিত। সে দম নিতে ভুলে গেছে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, সে একটা জলজ্যান্ত পূর্ণবয়স্ক ঘোড়ার পিঠে একা বসে আছে। এমনটা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি সে। তবে কাজ এখনো শেষ হয়নি। পেছন থেকে রুদ্রদেব এখনো পরামর্শ দিয়েই চলেছে, 'এখন একটুও নড়াচড়া করবে না। ও এখন কিছুই বুঝতে পারছে না। ওকে শান্ত হতে সময় দাও। তোমার ওজনের সাথে আগে ও অভ্যস্ত হোক। আবার আগের মতো ধীর লয়ে ফিসফিস করে কথা বলো।'

আবার ফিসফিস করে অনুরোধ করতে লাগলো অসিত, 'আগের অনুরোধ রেখেছ এজন্য ধন্যবাদ। তোমার পিঠে বসতে দিয়েছ এজন্য আরেকবার ধন্যবাদ। এখন আরেকটা অনুরোধ করছি। দয়া করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠো না। তাহলে আমাকে একেবারে চিতকাত হয়ে পড়তে হবে।'

ঘোড়াটা এবার মাথা নিচু করে একটা শ্বাস ছাড়লো। রুদ্রদেব এবার হাততালি দিয়ে উঠলো। তার গলার স্বরের আবদ্ধ ভাবটাও এখন আর নেই, 'এবার হয়েছে। ঘোড়াটা তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে অসিত। এবার তুমি স্বাভাবিক হয়ে বসো। এখন আর তোমাকে ও পিঠ থেকে ফেলে দেবে না।'

লাগাম আর আসন রুদ্রদেবই ঘোড়ার পিঠে আর মুখে বেঁধে দিয়েছিল। এবার অসিতের আসল প্রশিক্ষণে প্রবেশ করার সময়, 'শোনো অসিত, এই ঘোড়াকে তার মালিক আগেই নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া কীভাবে আরোহীর ইশারায় চলবে এই ঘোড়া তা জানে। আমাদের আর নতুন করে কিছুই করতে হবে না। তবে তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। সেই ইশারাগুলো এখন তোমার শেখার পালা। ঘোড়ার গতির সাথে তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে। মনে রাখবে ঘোড়াকে নির্ভুল নির্দেশনা না দিতে পারলে ঘোড়া কিন্তু নিজেও পড়ে মরবে, তোমাকেও মারবে।'

প্রাথমিক নির্দেশগুলো শেখাতে শুরু করলো রুদ্রদেব। কীভাবে ঘোড়ার পেটে পায়ের চাপ দিয়ে ঘোড়াকে সামনে পেছনে নিতে হয়, কীভাবে লাগামের টানে ঘোড়ার মুখ নানা দিকে ফেরাতে হয়। ঘোড়ার মুখ যেদিকে ফিরবে ঘোড়া ঠিক সেদিকেই হাঁটবে অথবা ছুটবে।

সব আস্তে আস্তে মনে গেঁথে নিতে শুরু করলো অসিত। কয়েকবার ঘোড়া নিয়ে দুলকি চালে মাঠ প্রদক্ষিণ করে আসলো সে। আস্তে আস্তে তার ভয়ের অনুভূতি কেটে যেতে শুরু করলো। আর তারপরই সে অনুভব করলো, এমন ভালো অনুভূতি তার জীবনে খুব কমই এসেছে। স্বাধীনতা শব্দটা নিয়ে কখনোই ওভাবে চিন্তা করেনি সে। তবে এখন সে যা অনুভব করছে তা যদিও পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, তবে স্বাধীনতার একটু আভাস তো বটেই। ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে চলার সময় সামনে থেকে আসা বাতাসের ঝাপটা যখন তার চুল দুলিয়ে দিচ্ছে, সেই হাওয়ার ঝলককে স্বাধীনতা বললেও বলা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ সেদিনের মতো শেষ হলো। শেষ করার সময় রুদ্রদেব অসিতকে ঘোড়ার লাগাম এবং জিন খোলা আর পরানো শেখালো। কয়েকবার সেসব কৌশল অনুশীলন করলো অসিত। এবার ঘোড়াকে মাঠে চড়তে দিয়ে মাঠের একপাশে বসলো দুজনে। এতক্ষণ অসিত টের না পেলেও পরিশ্রম হয়েছে তার। পুরো শরীরে ঘামের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

রুদ্রদেব আজকের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করলো, 'তোমার ঘোড়ায় চড়া খুবই সাবলীল। ভালোই চালিয়েছ। তোমার একেবারে পাকা ঘোড়সওয়ার হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না। সবচেয়ে কঠিন কাজটা কিন্তু তুমি করেই ফেলেছ। ঘোড়ার সাথে বন্ধুত্ব করা শিখে ফেলেছ।'

অসিতের মুখে একটু লাজুক হাসি, 'প্রথম প্রথম ভয় পেলেও শেষে ঘোড়া চালাতে কিন্তু খুবই মজা লেগেছে।'

'হ্যাঁ, কাজটা মজারই। নিজের স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেকগুণ বেশি গতিতে চলাচল করার মজাই আলাদা। আস্তে আস্তে এই ঘোড়া তোমার অঙ্গ হয়ে উঠবে। ঘোড়া

ছেড়ে বেশি দূর তুমি থাকতে পারবে না। তবে একটা কথা জেনে রেখো, ঘোড়াকে কিন্তু শুধু লাগাম দিয়েই চালানো যায় না।'

'তাই না-কি? আরও কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে। কী সেটা?'

'আসলে প্রকৃত অশ্ব বিশারদ ঘোড়ার লাগামে কখনো টান দেন না। তুমি যদি কোনো ঘোড়ার পিঠে অনেক দিন চাপো তাহলে সেই ঘোড়ার সাথে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হবে তোমার। তখন ঘোড়া তোমার মনের কথা এমনিতেই বুঝে নেবে। তোমার মন যেদিকে যেতে যাইবে ঘোড়া সেদিকেই নিজের গতি ঠিক করবে। তোমার ইচ্ছে মতো ছুটবে, নড়াচড়া করবে।'

'তাই আবার হয় না-কি? ঘোড়া তো মানুষের ভাষাই বোঝে না। একটু আগে আপনিই তো বললেন। ভাষা না বুঝলে চিন্তা কী করে বুঝবে?'

হেসে উঠলো রুদ্রদেব, 'ভাষা বোঝে না বলেই তো তারা অনুভূতি বুঝবে, চিন্তা বুঝবে। ঈশ্বর তাদেরকে বোবা করে পাঠিয়েছেন, সেজন্যই অন্যভাবে আমাদের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে তাহলে একজন ঘোড়সওয়ারের গল্প বলি। গল্পটা কিন্তু অনেক আগের গল্প। প্রায় তিন হাজার বছর আগের।'

অসিত আগ্রহী হলো। ঘোড়া সম্পর্কিত সবকিছু শুনতেই তার এখন ভালো লাগছে।

'নকুলের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ। শুনেছি। নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু কোথায় কীভাবে শুনেছি তা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'ছোটোবেলায় যখন মহাভারতের গল্প শুনেছ তখনই এই নাম শুনেছ তুমি। পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব ছিল এই নকুল। পাঁচ জনের মধ্যে তার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। সে ঘোড়াকে খুব আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। আসলে সে ঘোড়াকে সম্মোহন করতে পারতো।'

'সম্মোহন?'

'হ্যাঁ। সম্মোহন মানে হলো কোনো কিছুর নিজের চিন্তা ভাবনা পুরোপুরি লোপ করে দিয়ে তাকে নিজের ভাবনা দিয়ে চালিত করা। নকুল যে-কোনো ঘোড়াকে নিজের চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর অথবা স্পর্শ দিয়ে সম্মোহন করতে পারতো। দূর থেকেও কোনো ঘোড়াকে সে নিজের আদেশ মানতে বাধ্য করতে পারতো। অনেক সময় প্রতিপক্ষ সৈন্যের ঘোড়াকে সে দূর থেকে সম্মোহন করতো। তখন সেই ঘোড়া তার আদেশ পেয়ে আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে লাথি মেরে একেবারে থেঁতলে দিতো।'

'এসব তো কল্পকথা। গল্পের ভেতরে তো অনেক কিছুই তো বলে মানুষ। কিন্তু বাস্তবে তো এসব একেবারে অসম্ভব।'

মুচকি হাসলো রুদ্রদেব, 'মহাভারত কি কল্পকাহিনি?'

'না তো আবার কী। এত আগের কাহিনী মানুষ কী করে জানবে। সেই যুগের আসল গল্প কে বলবে?'

মুচকি হাসিটা রুদ্রদেবের মুখে এখনো ঝুলে রয়েছে, 'আচ্ছা, সেই কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। চলো, এখন খুব জোর ক্ষিধে পেয়েছে। তোমারও নিশ্চয়ই পেয়েছে। এবার খেতে বসার পালা।'

খেতে বসলো দুজনে। অসিত দুজনের থালায় বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলো। তার নিজের থালায় বেশ কিছু নতুন উপাদান আছে যা রুদ্রদেবের থালায় অনুপস্থিত।

'এগুলো কী খাবার?'

'এগুলো নতুন খাবার। এখন থেকে প্রতিদিন নিয়ম করে এসব খাবার তোমাকে খেতে হবে। আমি আজ ভোরবেলা জঙ্গল থেকে এসব খুঁজে এনেছি।'

'আপনার থালায় তো এসব নেই।' অসিতের ভেতরে একটু সন্দেহ। খাবারের ব্যাপারে সে মন থেকে সতর্ক। একদিন এমন খাবার খেয়েই তার আজকে এই দশা।

'এগুলো তোমার জন্য। কাল থেকে তুমি আসল শস্ত্র হাতে যুদ্ধ শিক্ষা শুরু করবে। শস্ত্র হাতে নিলে বাহুতে বাড়তি শক্তি লাগবে। আর যুদ্ধ করতে হলে শরীরের প্রত্যেকটা অংশকে সুগঠিত হতে হয়, শক্তিশালী হতে হয়। তোমার শরীরে শক্তির এখনো যথেষ্ট অভাব আছে। যোগাভ্যাস তোমার শরীর সুগঠিত করবে ঠিক কিন্তু প্রয়োজনীয় শক্তি কিন্তু জোগান দিতে হবে বাইরে থেকে। সেই শক্তির জন্যই এখন থেকে এসব তোমাকে খেতে হবে। নিয়মিত।'

'আপনিও খান। আপনার কি শক্তির প্রয়োজন নেই?'

'শক্তির প্রয়োজন সবারই আছে। তবে আমার শরীরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত আছে। তোমার মতো শক্তি আচমকা বাড়ানোর দরকার নেই আমার। এই ভেষজ ওষুধি শুধু তোমারই দরকার।'

আর কোনো কথা বলতে পারলো না অসিত। খেতে শুরু করলো। নতুন খাবারগুলোর একটা একটু মুখে দিয়েই মুখটা বিকৃত হয়ে গেল তার। এই খাবার তাকে শক্তি হয়তো দেবে তবে স্বাদ একেবারেই দিতে পারবে না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রুদ্রদেব নিজের খাবারে মন দিলো, 'তোমার মুখের কী অবস্থা হয়েছে তা তো তুমি দেখতে পাওনি, আমি পেয়েছি। এই বিকৃত স্বাদের জন্যই আমি দরকার ছাড়া এসব খাবার খাই না।'

খাওয়া শেষে ঘোড়ায় চড়ে সোমগড়ের দিকে রওনা দিলো ওরা। নগরে যাওয়া প্রয়োজন। শস্য শেষ হয়ে এসেছে। কাঠের কারিগরের কাছ থেকে বরাদ্দ আনতে হবে।

সোমগড় পৌঁছে শস্য সংগ্রহ করে ঘোড়ার পিঠে চাপালো রুদ্রদেব। কাঠের কারিগর অসিতকে দেখে কিছুই বলেনি। একজনের বদলে জঙ্গল দুজন পাহারা দিচ্ছে এতেই সে খুশি।

রুদ্রদেব প্রস্তাব দিলো, 'চলো, আজ নগরের খাবার দোকান থেকে কিছু খেয়ে যাই। অনেকদিন ধরে আমরা একই জিনিস খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের জিভ নিশ্চয়ই আমাদেরকে চরম অভিশাপ দিচ্ছে।'

অসিতের এই প্রস্তাবে আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। তার মুখে এখনো আজকের খাওয়া নতুন খাবারের বিদঘুটে স্বাদটা রয়ে গেছে। নতুন কিছু খেলে সেই স্বাদটা হয়তো একটু দূর হবে। সে সানন্দে রাজি হলো।

সোমগড়ে ভালো খাবারের দোকান একটাই আছে। বাকিগুলো ছোটো ছোটো। বসে খাবার ব্যবস্থা নেই। এই দোকানে মাটিতে মাদুর পেতে খদ্দেরদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভেতরে অনেক লোকজন। ঢুকে এক কোণায় একটু জায়গা পেয়ে বসে পড়লো ওরা দুজনে।

ভেতরে বসে থাকা লোকজন কেউই তেমন কিছু খাচ্ছে না। তবে সবাই মিলে গোল হয়ে আড্ডা জমে উঠেছে বেশ। অবশ্য আড্ডা বললে ভুল হবে, বলা যায় সবাই গোল হয়ে একজনকে ঘিরে বসে আছে। সবার মধ্যমণি হয়ে বসে থাকা লোকটা নানা গল্প বলছে আর সবাই গোগ্রাসে তাই গিলছে। মাঝে মাঝে কৌতূহলী জনতা নানা প্রশ্ন করে একবার শোনা তথ্য আবার শুনছে।

সেদিকে নজর দিলো না রুদ্রদেব আর অসিত। গল্প শোনার চেয়ে খাবারে দুজনের মন টানছে বেশি। দোকানিও গল্প শুনছে বেশ মন দিয়ে। অনেক কষ্টে দোকানির মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল।

বিরস মুখ দোকানির, 'কী লাগবে?'

'কিছু মিষ্টি আর ক্ষীর। দুজনের জন্য আনবেন।'

খাবার আনতে কিছুটা সময় লাগবে। অসিত সময় কাটানোর জন্য গল্প শুরু করলো, 'আচ্ছা, আপনি সব সময় কপালে কাপড় বেঁধে রাখেন কেন? আমি দেখেছি, ঘুমানোর সময়ও খোলেন না। আসলে এতদিনে আমি কখনো আপনাকে এই কাপড় বাঁধা ছাড়া দেখিনি।'

রুদ্রদেবের মুখ একটু শক্ত হয়ে এলো প্রশ্নটা শুনে। পরক্ষণেই তার চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এলো, 'আমার আসলে একটা শপথ আছে। প্রতিজ্ঞাও বলতে পারো। যতদিন সেই শপথ পূরণ না হবে ততদিন মাথায় কাপড় বেঁধে রাখার প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। এজন্যই তুমি আমাকে কখনো এই কাপড় ছাড়া দেখোনি। কারণ আমি কখনো এই কাপড়টা খুলি না।'

খাবার চলে এসেছে। স্বাদ যথেষ্ট ভালো। বহুদিন পড়ে সুস্বাদু খাবার পেয়ে দুজনের কেউই আর দেরি করলো না। বেশ মনোযোগ দিয়ে খেতে শুরু করলো। তবে একটু পরেই ঘরের মাঝখানের মধ্যমণির কথাতে মনোযোগ না দিয়ে আর পারা গেল না। গল্পকথক বলছে,

'আমি যে কত জায়গা ঘুরেছি তা তোমরা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। মুযিরিস, সোপারা, কল্যাণ, বারিগাজা- কোথায় যাইনি আমি। কত বড়ো বড়ো সব বন্দর। সেসব জায়গায় কত রকমের ব্যাবসা, কত রকমের লোকজন। পশ্চিমের সেসব লোকদের তোমরা যদি একবার দেখতে। সেই বিদেশিদের চেহারা আমাদের মতো নয়। গায়ের রং একেবারে ফরসা, লালচে। কারো কারো চোখ নীলচে, একেবারে জ্বলজ্বল করে। তাদের সাথে থাকে থলি ভর্তি সোনা, যা দেখে ভালো লাগে তাই পটাপট কিনে ফেলে।'

সবাই অবাক হয়ে শোনে তার কথা। আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা শেষ হয় না, 'আরে এবার পশ্চিম বন্দর থেকে আসার আগে এমন এক জিনিস দেখেছি যা তোমরা কখনো দেখা তো দূর, কল্পনাও করতে পারবে না। বলো তো সবাই, বানরের রং কেমন?'

একেকজন একেক মত দিলো। কালো, ধূসর, ছাই, পোড়া মুখ সাদা হনুমান। বানরের প্রসঙ্গ আসতেই অসিত আর রুদ্রদেবের কান একেবারে খাড়া হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ' গল্পকথক গল্পের খেই ধরে, 'সেটাই তো আমরা জানি। আমিও তাই জানতাম। কিন্তু তাহলে আর গল্প হবে কীভাবে? এবার আমি পুরো অন্য রকম এক বানর দেখে এসেছি। সে বানরের চামড়া রঙ্গিন। অনেকগুলো রং গুলে যেন কেউ তার সারা গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য হয়ে যাবে যে কেউ দেখলে। ওর মালিকের সাথেও কথা বলেছি আমি। রং একেবারে আসল। বাইরে থেকে লাগানো হয়নি। অনেকেই পরীক্ষা করে দেখেছে।'

অসিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই বানর যে অঙ্গদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুরো ভূ-ভারতে এমন বানর আর একটাও নেই। রুদ্রদেব তাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো, 'এখন কিছু বোলো না। কিছুই কোরো না। নীরবে খেয়ে যাও, আর শুনতে থাকো।'

সমবেত কণ্ঠে ততক্ষণে আওয়াজ উঠেছে, 'কোথায় দেখেছেন আপনি ঐ বানর?'

গল্পকথক এবার উত্তর দিলো, 'শকদের বাণিজ্যিক বন্দর বারিগাজায়। তোমরা যদি কখনো সেখানে যাও তাহলে বানরের মালিককে সেখানেই পাওয়া যাবে। লোকটার গালে একটা বড়ো কাটা দাগ আছে। মালিককে দুটো মুদ্রা দিলেই সেই বানর দেখতে পাবে তোমরা। তবে এখন গেলে সেই রঙ্গিন আশ্চর্য বানরের দেখা তোমরা পাবে না। বাণিজ্যিক মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। বারিগাজা বন্দর এখন বন্ধ। আবার বাণিজ্য মৌসুম শুরু হলে যেতে পারবে।'

রুদ্রদেব অসিতের দিকে নজর দিলো। অসিত পাথরের মতো বসে আছে। গল্প কথক অঙ্গদের কথা শুরু করার সময় ওর থালার খাবার যে অবস্থায় ছিল এখনো সে অবস্থাতেই আছে।

৪৭

মহারাজ সাতকর্ণী মন্ত্রী গিরিধারীর সাথে বসেছেন মন্ত্রণায়। গিরিধারীর মুখ যথারীতি প্রসন্ন। মহারাজ এতটা শান্ত থাকতে পারছেন না। সারা জীবন তিনি সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, সব সময় শত্রুকে কোণঠাসা করে রেখেছেন, বিপক্ষের থেকে এগিয়ে ছিলেন এক কদম। কিন্তু এখন আর পরিস্থিতি তেমন নেই। মানুষ নিজের বৃত্তের বাইরে উপস্থিত হলে একটু অসহায় অনুভব করবেই। তা সে যতই ক্ষমতাবান হন না কেন।

'গিরিধারী, আপনি বলেছিলেন, ঠিকমতো গুটি সাজাবেন। কিন্তু আমি সেরকম কোনো লক্ষণ দেখছি না। আমরা কিছুই না করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি। ওদিকে কলিঙ্গের ভীষণ সেনা আমাদের ঠিক ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে।'

মহারাজ সাতকর্ণীর অস্থির স্বর, কণ্ঠের তাড়া গিরিধারীকে খুব একটা বিচলিত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। তার শান্ত মুখ মহারাজকে আশ্বস্ত করলো, 'মহারাজ মনে হয় নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে পস্তাচ্ছেন?'

'কোন সিদ্ধান্ত?'

'আমাকে মহামন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত। আপনি মনে হচ্ছে এখন আর আমার ওপর ঠিক ভরসা রাখতে পারছেন না।'

'গিরিধারী, কথাটা ভরসা রাখতে পারার নয়। আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচলিত হচ্ছি না। তবে আমি এই পরিস্থিতিতে এখন আর অন্ধকারে থাকতে পারছি না। বলদেবকে সরিয়ে আপনাকে দায়িত্ব আমি আপনার ওপর ভরসা না থাকলে দিতাম না। কিন্তু, আপনি যে কাজ করবেন বলেছিলেন তা ঠিকমতো করতে পারছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। প্রতিপক্ষ ওদিকে অনেক এগিয়ে গেছে। চোলাদের নিয়ে আমরা যে পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম তা এখনো আগের জায়গাতেই আছে। কোনো উন্নতি নেই। জানি, আমি অধৈর্য হয়ে উঠছি, এবং রাজার জন্য ধৈর্য অনেক বড়ো গুণ। কিন্তু, অতিরিক্ত ধৈর্যকে গুণীজনেরা স্থবিরতা বলেছেন।'

'মহারাজ। আমরা অকারণ ধৈর্য ধরছি না। আর সময় এখনো আমাদের হাতেই আছে। একেবারে ফসকে যায়নি। আমি আপনাকে মিথ্যে আশা দেবো না। একেবারে নিশ্চিত হতে বলবো না। যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছুই হয়ে যেতে পারে। তবে আমার মনোযোগ আর নিষ্ঠার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন মহারাজ। যখন কোনো কিছু আমার হাতের বাইরে চলে যাবে তখন আমি নিজে থেকেই আপনার সাহায্য চাইবো। আপনাকে অন্য লোকের সাহায্য নিতে বলবো।'

'হ্যাঁ, সেই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত আছি। আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের গোপন সেনাবাহিনী এখন সম্পূর্ণ তৈরি।'

'এটা অবশ্যই আমাদের জন্য বেশ আনন্দের সংবাদ। এই সেনাবাহিনী কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার একটা বেশ বড়ো অংশ। এই কথা আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি, আবারো বলছি, এই গোপন সেনাই আপনাকে আসল যুদ্ধটা জেতাবে।'

'হ্যাঁ। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অংশ সেনাবাহিনী এখন যে-কোনো যুদ্ধে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এখন আমরা এই বাহিনীকে চোলা রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। কারিকালার এই মুহূর্তে মুখের কথার ভরসার চেয়ে সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন বেশি। আমাদের সেনাকে এখানে অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সেনা যাত্রা করবে অত্যন্ত গোপনে। তাই সময়ও লাগবে বেশি। তাহলে সেনা আমরা রওনা করে দেই?'

গিরিধারী এই ব্যাপারে কোনো মতামত দিলেন না। তিনি প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন, 'আপনার এই বাহিনীর জন্য সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন মহারাজ?'

মহারাজ সাতকর্ণী এই প্রশ্নে একটু অবাক হলেন। গিরিধারী সেনা অথবা যুদ্ধ নিয়ে সরাসরি কখনো কথা বলেন না, 'না, এখনো বেছে নেওয়া হয়নি। প্রশিক্ষণ আর অন্যান্য কাজের জন্য সেনাপতি আগেই কাজ করছে। তবে সর্বাধিনায়ক তো বেছে নেওয়া হবে যুদ্ধ করার সময়। আমার যোগ্য সেনাপতির তো অভাব নেই। তারা সবাই নানা যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় বেশ ঋদ্ধ। ওদের মধ্য থেকে যোগ্যতম একজনের হাতেই দিবো এই বাহিনীর দায়িত্ব।'

গিরিধারী একমত হলেন না, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না মহারাজ। আপনার কাছে অনেক সেনাপতি আছে নিশ্চিত, তবে এই বিশেষ বাহিনীর দায়িত্ব নেবার মতো সেনাপতি কি আপনার বাহিনীতে আছে? আমার মনে হচ্ছে একটু ভালো করে খুঁজতে হবে।'

সেনাবাহিনী মহারাজ সাতকর্ণীর গর্বের জায়গা। গিরিধারীর মন্তব্যে তার ঠিক আত্মসন্মানে আঘাত লাগলো। নিজের সেনা সম্পর্কে কোনো ধরনের দুর্বলতার কথা তিনি কখনোই শুনতে পারেন না, 'যা বলছেন তা কি আপনি ভেবে বলছেন গিরিধারী?'

'যথেষ্ট ভেবেই বলেছি।'

এবার আর ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব হলো না মহারাজ সাতকর্ণীর পক্ষে, 'আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যার কি বোঝেন? আমাদের সেনাপতিরা কি পারে সেটা আমি জানি। কত কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই কেউ একজন আমার সেনায় সেনাপতি হতে পারে। তারা সর্ব শস্ত্রে পটু, সর্ব ব্যূহ বিশারদ আর সাহসে একেকজন ঠিক সিংহের সমতুল্য। স্বয়ং আমি সেনাপতিদের শিক্ষা তদারক করি। আপনার মনে হয় এসব জানা নেই।'

'আমি এসব জানি মহারাজ।'

'তাহলে? কেন এমন একটা মন্তব্য করলেন? আমার সাধারণ সেনার মাঝেও যদি কোনো খুঁত থাকে তাহলে সে বাদ পড়ে যায়। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, সেনাপতিদের বাছাই কীভাবে করা হয়। এমন তীক্ষ্ণ চোখ পেরিয়ে যারা আসে তারা কি অযোগ্য হতে পারে?'

'মহারাজ, আপনি আমার কথাটায় ভুল বুঝেছেন। আমারও আপনাকে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল। সরাসরি মন্তব্য করা উচিত হয়নি। আমি আপনার সেনাপতিদের অযোগ্য বলিনি। তারা অবশ্যই সব ধরনের যুদ্ধকলায় বিশারদ। তবে, ঐ যে বললাম, এই সেনাদল নিয়ে আমার বিশেষ একটা পরিকল্পনা আছে। আর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আপনার সেনাপতিরা ঠিক যোগ্য নন। আবারও বলছি মহারাজ, আমি তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না, তবে এখানে আমার উদ্দেশ্য একটু আলাদা, আর সেই আলাদা উদ্দেশ্য পূরণে আলাদা গুণসম্পন্ন লোক দরকার।'

মহারাজ সাতকর্ণীর অবাক হবার মাত্রা আরও বেড়েছে, 'কী উদ্দেশ্য গিরিধারী?'

গিরিধারী এবার কিছু বললেন না। এই আলোচনা এত তাড়াতাড়ি করার তার কোনো ইচ্ছে ছিল না।

'আমার কথার জবাব দিন। আপনার কী বিশেষ উদ্দেশ্য এই বাহিনীকে ঘিরে? কী সেই পরিকল্পনা? আপনার কথায় আমি এখানে অনেক সময়, অর্থ আর চেষ্টা ব্যয় করেছি। আমার তহবিলে এখন মুদ্রা, স্বর্ণ নেই বললেই চলে। খরচ করতে আমার বেশ কষ্ট হয়েছে।

এতদিন আমি জানতাম, আমরা এই বাহিনী চোলা রাজাকে সাহায্য করতে পাঠাবো। আর এখন আপনি বলতে চাইছেন আমার এই বাহিনী চোলাদের সাহায্য করতে পারবে না। আমার এখন নতুন সেনাপতি দরকার। কেন তারা দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ করতে পারবে না? ঐ দক্ষিণ ভারতের যোদ্ধারা কি যুদ্ধের শাস্ত্রে আমাদের থেকেও বেশি পাকা? তারা কি আমাদের থেকেও বেশি জানে?'

'না, মহারাজ, তা নয়।'

'তাহলে আমার সেনারা পারবে না কেন? সবকিছু বুঝিয়ে দিন আমায়। এখনই।'

'মহারাজ, সময় এখনো আসেনি। তবে আপনি যেহেতু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন তাই আমি আর চুপ থাকবো না।

এই বাহিনী শুরুতে আমি আমাদের শক্তি বাড়াতেই তৈরি করতে বলেছিলাম। তখন এই বাহিনীকে আমার চোলাদের সাহায্যে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনি কাজ শুরু করার আগে পরিকল্পনা করতেই পারেন, কিন্তু পৃথিবীর কোনো পরিকল্পনাই ধ্রুব নয়। আপনাকে কাজ শুরু করার পরে অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে সেই পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হবে। তাই আমিও আমার পরিকল্পনায় একটু বদল এনেছি।'

'আপনার পুরানো পরিকল্পনাই তো আমি জানতাম। এখন নতুন করে আবার কী পরিকল্পনা করেছেন?'

গিরিধারী জানেন, এটা মহারাজকে বলার এটা যোগ্য সময় নয়। তবে আজ কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সময় আসা পর্যন্ত কিছু কিছু পরিকল্পনা গোপন রাখতে হয়। আজ তার বাকচাতুরি মহারাজের কাছে কোনো কাজে আসছে না। ঝাঁপি তো খুলতেই হবে।

তবে, এবার ভাগ্য সহায় হলো তার। প্রকৃতি হয়তো চায়নি গিরিধারী আজকে এই কথা বলুক। তার কথা বলা বন্ধ করে দিলো মন্ত্রণাকক্ষের ঠিক বাইরে ভারী পদশব্দ আর বর্শার ঠকঠক আওয়াজ। মহারাজ সাতকর্ণী সেদিকে মন দিলেন, মন্ত্রণাকক্ষে কারো আসার নিয়ম নেই। শুধু বিশেষ কাজে একজন বিশেষ প্রহরীই আসতে পারে।

সেই বিশেষ প্রহরীর মুখ দেখা গেল দরজায়। প্রসঙ্গ পাল্টানোর সুযোগ পেয়ে এক পলও সময় নষ্ট করলেন না গিরিধারী, 'কী হয়েছে? এই সময়ে এখানে কেন এসেছ?'

নতমুখে জবাব দিলো প্রহরী, 'ক্ষমা করবেন মহারাজ। দক্ষিণের এক গুপ্তচর এইমাত্র আমাদের রাজ্যে ফিরে এসেছে। সে এখনই আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে মহামন্ত্রী। একটুও দেরি করতে চাইছে না। বলছে বিশেষ সংবাদ আছে। তাই আর না থাকতে পেরে আপনাকে খবর দিতে এসেছি।'

প্রসঙ্গ ছেড়ে কেটে পড়ার এমন সুযোগ ঠিক ছাড়তে চাইলেন না গিরিধারী, 'মহারাজ। গুপ্তচর দক্ষিণ থেকে এসেছে। মানে নিশ্চয়ই চোলা থেকে। আর চোলার যে-কোনো গুপ্তচরের খবর আমাদের জন্য এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার এখনই যাওয়া উচিত মহারাজ। আজ্ঞা দিন।'

কিন্তু মহারাজ সাতকর্ণী এত সহজে গিরিধারীকে ছাড়তে নারাজ, 'না গিরিধারী, এখন আমি আপনাকে আর সে আজ্ঞা দিতে পারছি না। আমি আপনাকে বলেছি, আমি আর অন্ধকারে থাকবো না। শোনো প্রহরী, তুমি ঐ গুপ্তচরকে তাড়াতাড়ি এই কক্ষে নিয়ে এসো। ঐ চর কী খবর নিয়ে এসেছে তা এই ঘরে আমরা দুজনে একসঙ্গেই শুনবো।'

গিরিধারী বিরোধিতা করার সাহস পেলেন না, 'যাও প্রহরী। মহারাজের আজ্ঞা যথাযথ পালন করো।'

প্রহরী দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো। গুপ্তচরকে এখন এই ঘরে নিয়ে আসতে হবে। এই ঘরে কাউকে আনার প্রক্রিয়া অনেক জটিল। প্রাসাদের এই মন্ত্রণাকক্ষ বেশ গোপন জায়গা। খুব কম লোকেই এই কক্ষের সঠিক অবস্থান জানে। এমনকি স্বয়ং রানিও এই কক্ষের অবস্থান জানেন না। গুপ্তচরকে আনতে হবে চোখ বেঁধে। এবং সেই সাথে অবশ্যই শূন্যে তুলে।

শূন্যে তুলে আনার দরকার আছে। এই গুপ্তচরেরা অনেক দক্ষ এবং চালাক হয়। শুধু চোখ বেঁধে আনলে পা গুণে গুণে কক্ষের অবস্থান নির্ণয় করে ফেলতে পারে। তাদের সাথে কোনো ধরনের অসাবধানতা চলবে না।

সব নিয়ম মেনে গুপ্তচরকে মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে আসতে বেশ খানিকটা সময় ব্যয় হয়েছে।

মহারাজ সাতকর্ণীকে প্রণাম করলো গুপ্তচর। মহারাজ জানতে চাইলেন, 'বলো দূত, দক্ষিণ থেকে কী খবর নিয়ে এসেছ?'

'মহারাজ আমি এবং আমার সাথের বাকি গুপ্তচরেরা দক্ষিণের তিন রাজ্যেই গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সব খবর নিয়ে এসেছি।'

এবার গিরিধারী জানতে চাইলেন, 'চেরা রাজ্যের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তাদের প্রস্তুতি শেষ। তাদের সেনাদের ঘরে খোঁজ নিয়েই জানতে পেরেছি। ঠিক সাতদিন পরে চেরা রাজ্যের সেনা যাত্রা করবে চোলা রাজ্যের দিকে। এবং তারা কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে তাও জানা গেছে। দক্ষিণ দিক দিয়ে।'

গিরিধারী মন্তব্য করলেন, 'সেটা জানার জন্য তো আর বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। দক্ষিণ দিকের সীমানায় আছে বিদ্রোহী মন্ত্রীদল আর তাদের সেনারা। সেখান দিয়েই আক্রমণ করবে পান্ড্য সেনা। তাই তারাও সেদিক দিয়েই যাবে। সাত দিন পরে যে সেনা রওনা দেবে এই খবর তুমি কবে পেয়েছ?'

'তিন দিন আগে। খবরটা পেয়েই আমি প্রতিষ্ঠানার দিকে যাত্রা করেছিলাম। তিন দিন লেগেছে আসতে।'

'তার মানে সাত দিন পরে চেরা সৈন্য যাত্রা করবে। তার মধ্যে তিন দিন পেরিয়ে গেছে। তার মানে আজ থেকে চার দিন পরে ভোর বেলা সৈন্য যাত্রা করবে।'

'আজ্ঞে। মাতা ভবানীর পূজাও করবে তারা। পূজার প্রস্তুতি চলছে।'

'ঠিক আছে। এবার তুমি যাও। বিশ্রাম নাও।'

আবার সব নিয়ম মানার পালা। যে উপায়ে প্রহরী গুপ্তচরকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে উপায়েই চরকে অথিতিশালায় পৌছে দেওয়া হলো।

বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন গিরিধারী, 'মহারাজ, যে সময়ের আসার জন্য আমরা অধীর অপেক্ষা করেছিলাম তা চলে এসেছে। এবার আমাদেরকে নড়াচড়া করতে হবে। এতদিন ধরে যে পরিকল্পনা ভেজেছি তা এবার কাজে লাগানোর পালা।'

মহারাজ সাতকর্ণী ভ্রু কুঁচকে তাকালেন গিরিধারীর দিকে, 'সময় চলে এসেছে মানে? আমি তো যতটুকু বুঝতে পারলাম সময় বেশ আগেই চলে গেছে। আমাদের হাতে কোনো উপায় নেই, সময় নেই। চারদিন পরে চেরা বাহিনী চোলায় আক্রমণ করবে।'

'আক্রমণ করবে না মহারাজ, যাত্রা করবে।'

'ঐ হলো। সৈন্য যখন যাত্রা করে তখন থেকেই তার আক্রমণের কাল শুরু হয়ে যায়।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'চোলারা দক্ষিণ সীমান্তে গিয়ে নিশ্চয়ই যোগ দেবে মন্ত্রীমন্ডলের সেনার সাথে। আর তারপর তারা কি দেরি করবে? করবে না। আমি হলে করতাম না। মিলিত বাহিনী নিয়ে তারা আক্রমণ করবে চোলা রাজধানী। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনোভাবেই এঁটে উঠতে পারবে না কারিকালা। পারবে?'

'না মহারাজ। মহারাজ কারিকালা পারবেন না।'

'এখন তাহলে বলুন, আমাদের সেনা এই অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে পৌছাবে চোলা রাজ্যে। কীভাবে সাহায্য করবে তাদের? এখান থেকে সেনা চোলা রাজ্যে পাঠানো কম করে হলেও মাস খানেকের ধাক্কা। আর পনের দিনের মধ্যেই চেরা সৈন্য পৌছে যাবে রাজধানীতে। বাকি পনের দিন কীভাবে মহারাজ কারিকালা ঐ সেনা আটকে রাখবেন? কোনো উপায় জানা আছে আপনার?'

'না মহারাজ। ওরকম সময়ে কী করতে হয় জানা নেই।'

'আমার মতে আপনি পুরো ব্যাপারটাই ঘেঁটে দিয়েছেন গিরিধারী। আমরা চোলা রাজ্যকে যুদ্ধে সাহায্য করার বচন দিয়েছিলাম। আমরা মানে আমি। আর ক্ষত্রিয়ের বচনের মানে আপনি জানেন না বলবেন না। অবশ্যই জানেন। আমার গায়ে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কলঙ্ক লাগতে যাচ্ছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

গিরিধারী তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনার বচন লঙ্ঘন হবার আগে আমার প্রাণ চলে যাবে। সেই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন মহারাজ। প্রতিষ্ঠানা থেকে আমাদের বিশেষ বাহিনী আমরা পাঠাবো না। সে কথা ঠিক। তবে আমরা চোলা রাজ্যে সাহায্য অবশ্যই পাঠাবো। এবং তা ঐ পনের দিনের মধ্যেই।'

'যুদ্ধে সেনা না পাঠিয়ে আপনি কী সাহায্য পাঠাবেন? সেনার কোনো বিকল্প কি আছে এখানে? নেই। সব জায়গায় বুদ্ধি চলে না গিরিধারী। কিছু কিছু জায়গায় বলই একমাত্র উপায়।'

'যুদ্ধে সেনার বিকল্প নেই মহারাজ। তবে মহারাজ এই পৃথিবীতে যে-কোনো কাজেই বুদ্ধিরও কোনো বিকল্প নেই। আমি সাহায্য পাঠাবো। আপনি ভাববেন না।

আপনি এখন বিশ্রাম নিন মহারাজ। আমার এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সেগুলো সারতে হবে। দয়া করে এবার আমাকে আজ্ঞা দিন।'

মহারাজ সাতকর্ণী হাল ছেড়ে দিলেন, 'আজ্ঞা দিলাম। ভরসা রাখলাম আপনার ওপর।'

'ধন্যবাদ মহারাজ। আপনি তো জানেনই দ্বারকা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষকেই সাহায্য করেছিল। একদিকে ছিল দ্বারকার সম্পূর্ণ নারায়ণী সেনা। আর অন্য পক্ষে ছিলেন শুধু শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন কিন্তু সেই মহা সেনা বেছে নেননি, তিনি বেছে নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। বলের চেয়ে বুদ্ধির ওপরেই আস্থা রেখেছিলেন সেই বীর।'

'কথায় আপনার সাথে পারা যাবে না, সে আমি আগে থেকেই জানতাম।'

যেতে উদ্যত হলেন গিরিধারী, তখন পেছন থেকে ডাকলেন মহারাজ, 'আচ্ছা আরেকটা কথা।'

গিরিধারী ফিরে দাঁড়ালেন, 'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আপনি না-কি রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে একশো জনের ওপর তাঁতি রাজধানীতে ডেকে এনেছেন। সাথে সূত্রকারও আছে অনেক।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমি এখন তাদের কাছেই যাচ্ছিলাম। তাদের সাথেই কাজ আছে। আজ রাতেই তাদের হাতের কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা। সবাইকে পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে মাল বুঝে নিতে হবে। রাজকোষ থেকে মুদ্রা নিয়ে নিয়েছি।'

'আবারও খরচ' মহারাজের কণ্ঠে হতাশা, 'এত এত তাঁতি আর সূত্রকার দিয়ে কী তৈরি করাচ্ছেন আপনি?'

'মহারাজ, আমাদের বিশেষ বাহিনীর জন্য যুদ্ধ পোশাক তৈরি করাতে হবে না? তাঁতিরা সেগুলোই তৈরি করছে।'

'আচ্ছা, এটা একটা ভালো কাজ হয়েছে। বাহিনী তৈরি। এখন তাদের পোশাকও তৈরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন আপনি যান। তবে আমি একটা কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সাতবাহন মহারাজ সাতকর্ণীর বচন যাতে কোনোভাবেই ভঙ্গ না হয়।'

'অবশ্যই মহারাজ। তা কোনোভাবেই হবে না।'

আর অপেক্ষা করলেন না গিরিধারী। আবার কী প্রশ্ন করে বসেন মহারাজ।

সরাসরি নদীর ঘাটে চলে এলেন তিনি। তাঁতিদের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তাদের পয়সাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারটে নৌকাতে কাপড়গুলো বোঝাই করা হয়ে গেছে। এখন এগুলো যাত্রা করবে অমরাবতীর উদ্দেশ্যে। স্থল পথ থেকে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে নৌ পথে।

কৃষ্ণা নদীতে ভাসলো চারটা সাধারণ বাণিজ্য তরী। তরী সাধারণ হলেও যেই মালামাল বহন করছে তা কিন্তু সাধারণ নয়। অপসৃয়মান তরীগুলোর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছেন গিরিধারী। তিনি কি মিথ্যে বলেছেন মহারাজকে। সরাসরি না বললেও কৌশলগত মিথ্যে যে বলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পোশাক তাদের বিশেষ বাহিনীর জন্যই তৈরি করা হয়েছে, তবে সেই বিশেষ সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠানার নয়, অন্য জায়গার।

সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সত্যিটা জানলে মহারাজ সাতকর্ণীর গর্বিত ক্ষত্রিয় মন অবশ্যই বিরোধিতা করতেন।

৪৮

সোমগড়ের সেই খাবারের দোকানে বসে অসিত রুদ্রদেবের কথার পুরোপুরি পালন করেছে। একটা কথাও বলেনি সে। শুধু কথা যে বলেনি তা নয়, যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

রুদ্রদেবের নির্দেশে সে চুপ করে গিয়েছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তীব্র ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল তার। এত কষ্টের ফল অবশেষে মিলেছে। অঙ্গদের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেই গল্প কথকের কাছ থেকে সংবাদটা শোনার পর অনেকদিন পরে খেতে পাওয়া মিষ্টান্ন আর ক্ষীরের বাটি তার সামনে অনাদরেই পড়েছিল।

রুদ্রদেব সবকিছু বুঝতে পেরেছিল। তবে কোনোভাবেই অসিতকে আর ঘাঁটায়নি। মানুষের মনে মাঝে মাঝে যে তীব্র ঝড় বয়ে যায় তার সাথে বেশ ভালো পরিচয় আছে রুদ্রদেবের। সেই ঝড়ের সাথে মানুষকে নিজেকেই লড়তে হয়। বাইরে থেকে সান্ত্বনা দেওয়া মানে তখন সেই ঝড়ের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া।

তাই বলে এতদিন পরে পাওয়া এত এত সুখাদ্য নষ্ট করতেও দেয়নি সে। নিজের বাটি শেষ করার পরে নজর দিয়েছে অসিতের বাটির দিকে। সে দুটো খালি করার পর দোকানিকে মুদ্রা বুঝিয়ে দিয়ে সোমগড় ছেড়েছে দুজনে।

কুটিরে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত অসিত পুরো রাস্তায় একটাও কথা বলেনি। আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। অসিত কুটিরে ফিরেও নিশ্চুপ। রুদ্রদেবের দিকে সে ফিরেও তাকালো না। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে সে। নিজের যৎসামান্য যা কিছু ছিল সেগুলোই ব্যস্ত হাতে গুছিয়ে নিয়েছে সে। নীরবে তার কর্মকাণ্ডে খেয়াল রাখছে রুদ্রদেব। কিছুই বলছে না। অসিতকে সে নিজের কাজ করতে দিলো।

সবকিছু গোছানো শেষ হতেই বিছানায় বসে পড়লো অসিত। সঙ্গীকে পাত্তা না দিয়ে সবকিছু গোছানো যায়, তবে সঙ্গীকে পাত্তা না দিয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করা এত সহজ নয়। এবার রুদ্রদেবের দিকে তাকালো সে।

এই অপেক্ষাতেই ছিল রুদ্রদেব। এবার মন্তব্য করলো, 'বাহ্, তোমার হাতের গতি প্রশংসার যোগ্য। গোছগাছ শেষ। এজন্যই বলে পথচারীর জিনিসপত্র যত কম হবে ততই ভালো। গুছিয়ে নাও চটপট, বেরিয়ে পড়ো চটপট।'

অসিত কোনো মন্তব্য করলো না। কিছু বলার দরকার নেই। রুদ্রদেব নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে।

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার সবকিছু গোছানো হয়নি। এখনো এই ঘরে তোমার অনেক জিনিস রয়ে গেছে।'

এবার নীরবতা ভাঙলো অসিত, 'কী রয়ে গেছে?'

'যাক, তোমার মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। আমি তো ভেবেছিলাম কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেতে আরও সময় লাগবে।

দেখো, আমি জানি এখন তোমার মনে কী চলছে। তোমার মনের অবস্থা আর তোমার নেওয়া সিদ্ধান্ত দুই-ই আমি বুঝতে পারছি। তুমি সোমগড় থেকে এসে একটুও

দেরি করোনি। সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছ। নিশ্চয়ই এই রাতেই তোমার বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে।'

'রাতে যেতে পারলেই ভালো হতো।'

'আচ্ছা। তার মানে একটু বুদ্ধি এখনো বাকি আছে তোমার। এই অন্ধকারে বিপজ্জনক রাস্তায় নামা উচিত হবে না। তবে সকাল হতেই তোমাকে এখানে বেঁধেও রাখা যাবে না। বেরিয়ে পড়বে। তাই তো?'

'হ্যাঁ। আমি সকালেই এখান থেকে চলে যাবো। এখন আপনি বলুন আর কী জিনিস গোছানো বাকি আছে আমার?'

'তোমার অস্ত্রশস্ত্র। ওগুলো গোছানো হয়নি। অনেকগুলো মুদ্রা খরচ করে ওগুলো কিনেছ তুমি। সেগুলো তো আর ফেলে যাওয়া যাবে না। যদিও তোমার শস্ত্র শিক্ষা শুরুই হয়নি ঠিকমতো। ওগুলো তোমার কাছে থাকা আর একটা মরা গাছের কোটরে থাকা একই কথা।

আচ্ছা, তোমার ঘোড়াও তো আছে। তবে আমার মনে হয় সেটা তুমি এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। এখনো ঘোড়া চালনায় তুমি পাকা নও। এসময়ে লম্বা পথে ঘোড়ায় তুমি ঠিক সুবিধা করতে পারবে না। আমার হিসেবে কাল সকালে এই কুটির ছাড়ার সময় তোমাকে ঘোড়াটাও রেখে যেতে হবে।'

'ঘোড়া আপনি রেখে দিন। তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি পায়ে হেঁটেই বারিগাজা চলে যাবো। তারপর ওখান থেকে খুঁজে বের করবো রাহুকে। অঙ্গদকে নিয়ে ফিরে আসবো।'

'আচ্ছা, ভালো কথা। কিন্তু পথের খরচ তুমি জোগাড় করবে কোত্থেকে? যতটুকু জানি অস্ত্র আর ঘোড়া কিনে তোমার সাথে থাকা সব মুদ্রা শেষ হয়ে গেছে।'

এই কথাটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে অসিতের গো তাকে অসুবিধাটা উড়িয়ে দিতে সাহায্য করলো, 'একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো আমি। আমাকে যে করেই হোক বারিগাজা যেতেই হবে অঙ্গদের কাছে।'

'কিন্তু ওখানে লোকটা কী বলছিল, সেটা শুনেছিলে তো? বারিগাজা বন্দরের বাণিজ্য মৌসুম এখন শেষ। এখন আর তারা বন্দরে বাইরের কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তুমি যদি কোনোভাবে বারিগাজায় পৌঁছেও যাও, তাহলে তুমি সেখানে ঢুকবে কীভাবে?'

'জানি না। শুধু জানি আমাকে যে করেই হোক যেতে হবে। কোনো না কোনোভাবে ঠিকই ঢুকে পড়বো।'

রুদ্রদেব মুচকি হাসলো, 'শোনো অসিত, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। তুমি এখানে বোকার মতো করে ভাবছ, বোকার মতো করেই কথা বলছ। বুদ্ধিমান লোক কখনো 'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই', 'জানি না', 'ঈশ্বর দেখবেন', 'সব ঠিক হয়ে যাবে' এসব বলে কোন কাজে নামে না। সেটাই এখানে তুমি করছ।

গুরু হিসেবে আমি তোমার দায়িত্ব নিয়েছি। আর গুরুর দায়িত্ব কেবল একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্র অথবা বিদ্যা শেখানো নয়। আসল গুরু শিষ্যকে চিন্তা করতে শেখান, তাকে জীবন কীভাবে যাপন করতে হবে তার শিক্ষা দেন। আমিও তাই করতে চাই অসিত।

তুমি এখন এই কথা শোনার অবস্থায় নেই বুঝতে পারছি। তবু তোমাকে আমার কথা মেনে নিতে হবে। এটা তোমার বারিগাজা যাবার প্রশস্ত সময় নয়। কীভাবে করবে

জানি না কিন্তু কিছু সময়ের জন্য আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরে নিলাম তুমি বারিগাজায় পৌছালে, অবশ্যই কোনোমতে, সেই কোনোমতেই ভেতরেও ঢুকলে। ধরে নিলাম তোমার ভাগ্য অনেক ভালো এবং তাই অঙ্গদকেও খুঁজে পেয়ে গেলে। কিন্তু তাকে নিজের সাথে নিয়ে আসবে কীভাবে? কীভাবে মুক্ত করবে তাকে?'

অসিত কিছুই বলতে পারে না। এতদূর চিন্তাই করেনি সে।

'যে লোক অঙ্গদকে তোমার কাছ থেকে চুরি করেছে, অঙ্গদ হয়তো এখন তার কাছেই আছে। অথবা এমনও হতে পারে সে এরই মধ্যে অঙ্গদকে কারো কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তাহলে এখন যে অঙ্গদের মালিক সে কি তুমি বললেই অঙ্গদকে তোমার হাতে দিয়ে দেবে? দেবে না। এই পৃথিবীতে কেউই দেয় না।'

'আমার অঙ্গদকে আমি নিয়েই আসবো।'

'কিন্তু কীভাবে অসিত? কী উপায়? তোমার কাছে কোনো উপায় নেই। কারো কবল থেকে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হলে তোমাকে কেবল সাহসী আর বেপরোয়া হলেই হবে না, সেই সাথে সাথে সামর্থ্যও থাকতে হয়। সাহস তোমাকে হয়তো সাহায্য করবে, তবে কাজের সময়ে আসল কাজটা এই সামর্থ্যই করে। তোমার ভেতরে অধিকার ছিনিয়ে আনার সামর্থ্য এখনো জন্ম নেয়নি।'

'কবে জন্ম নেবে?'

'সময় হলে। বুদ্ধিমান লোক সব সময় সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে। এখানে আমার মতে তোমারও তাই করা উচিত।'

অসিত ফোঁস করে ওঠে। জানে রুদ্রদেব যা বলছে তাই ঠিক, কিন্তু সেই যুক্তির সাথে একমত হবার মতো মনের অবস্থা এখন তার নেই।

রুদ্রদেব আবার বোঝালো, 'শোনো অসিত। মানুষ যখন নিজে কোনো একটা স্বপ্নের পেছনে ছোটে, কোনো কিছু অর্জন করার জন্য খুব চেষ্টা করে, তখন তাকে খুব ধৈর্যশীল হতে হয়। তখন মানুষ কষ্ট করে হয়তো ধৈর্য ধরতে পারে। কিন্তু তার বহুল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যখন তার চোখের সামনে চলে আসে, গন্তব্য যখন থাকে তার চেয়ে একটু দূরে তখন তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ খুবই কঠিন হয়। অনেকদিন পরে যখন অভীষ্টের দেখা মেলে তখন মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় চঞ্চলতা।

আর এই চঞ্চলতাই তাকে দিয়ে তখন অনেক ভুল করায়। এজন্যই অধিকাংশ মানুষের তরী তীরে এসেই ডোবে। এখানে তুমি ঠিক তাই করছ। তুমি সব সিদ্ধান্ত মাথা থেকে সরিয়ে দাও। যোগাসনে বসো। এতদিন তোমাকে প্রাণায়ামের যেসব উপায় শিখিয়েছি, সেগুলো একটা একটা করে অভ্যাস করো। দেখবে মাথা এবং চিত্ত দুটোই ঠান্ডা হয়ে এসেছে।

তখন তুমি আবার চিন্তা করবে। গুরুর উপদেশ হিসেবে একটা কথাই বলতে পারি, যাত্রায় বেরোনোর আগে ভালো করে প্রস্তুতি নিয়েই বেরোনো উচিত। সেটা হোক মহাপ্রস্থানের দিকে অথবা অঙ্গদকে খুঁজতে যাওয়া।'

অসিতের মন এসব কথায় একটু শান্ত হয়েছে, তবে দ্বিধা পুরোপুরি দূর হয় না। আর দ্বিধা থেকে আসে ভয়, 'কিন্তু আমি প্রস্তুত হতে হতে অঙ্গদকে নিয়ে যদি রাহু অন্য কোথাও চলে যায়? অঙ্গদ যদি আবার হারিয়ে যায়?'

'তাহলে সে যেখানে যাবে সেখানে তুমিও যাবে। মানুষের অগম্য কোনো জায়গায় তো আর সে যেতে পারবে না। প্রধান ব্যাপার হচ্ছে সামর্থ্য। একবার যদি তোমার যোগ্যতা অর্জন করা হয়ে যায় তখন পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে তুমি অঙ্গদকে উদ্ধার করে আনতে পারবে।'

অসিত আর কিছুই বলল না। রুদ্রদেবের কথামতো এখন আর যোগাভ্যাস করতে ইচ্ছে করছে না। পাশেই এক তারের বাদ্যযন্ত্রটা পড়েছিল। সেটা তুলে কোলের ওপর ফেলে বাজাতে শুরু করলো সে।

রুদ্রদেব আর কিছু বলল না। অসিত তার সিদ্ধান্ত বদলেছে। আর তার মনের এখন যে অবস্থা তাতে সংগীত যোগাভ্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম কাজ করবে না। মন উদাস থাকলে সংগীত জমে ভালো।

আজকের বিকেলের প্রশিক্ষণ বাদ পড়ে গেছে। রুদ্রদেব সিদ্ধান্ত নিলো এখন অনুশীলন করার। অসিত এখানে বসে বাজনা বাজাক।

মশাল হাতে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। অসিত সেদিকে একবারের জন্যও তাকালো না। গোপন ধনুর্বিদ্যার চর্চার জন্য আজ আর অসিতের চোখ বাঁধতে হবে না। তার মনের চোখেই আজ পট্টি বাঁধা আছে।

মশালের আলোয় জঙ্গলের ভেতরে চর্চা করতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না রুদ্রদেবের। প্রাচীন ভারতের যোদ্ধাদের অনেক রকমের ক্ষমতার একটা ছিল অন্ধকারে পরিষ্কার দেখে যুদ্ধ করার ক্ষমতা। ঠিক বেড়ালের মতো। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন রাত্রিজিত ছিলেন। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও সঠিক লক্ষ্যে তির বেঁধাতে পারতেন তিনি। অত ক্ষমতা রুদ্রদেবের নেই। তবে একটু আলো পেলেই তার চলে যায়।

আজ আর পঞ্চশরের চর্চায় কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বিদ্যাটা একেবারে হাতে চলে এসেছে তার। যে-কোনো কোণা থেকে ইচ্ছে সেখান থেকেই তির ছুঁড়ে সে ইচ্ছেমতো পাঁচ লক্ষ্যে বেঁধাতে পারছে। এখন পরের ধাপে যাবার সময়। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। আজকেই পরের ধাপে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

পঞ্চশরের পরে পঞ্চভূতের সাধনাই করার নিয়ম। মন্ত্রগুলো প্রথমে মনে পড়তে চাইলো না। তবে অনেক কষ্টে স্মৃতি থেকে সেগুলো উদ্ধার করেছে সে। চোখ বন্ধ করে মন্ত্রগুলো একটু আউড়ে নিলো। কাজটা শুরু করার আগে আরেকবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলল সে। না, কেউ উপস্থিত নেই। তারপর ধনুক হাতে নিলো সে।

দিব্যাস্ত্রের চর্চায় তিরের দরকার হয় না। মন্ত্র ঠিকমতো উচ্চারণ করে বিধি মানতে পারলে মন্ত্রশক্তি তিরের রূপ ধরে ধনুকে দেখা দেয়। সেই শক্তিকে তখন সহজেই তিরের মতো করে ছুঁড়ে দেওয়া যায়। তবে শুধু মন্ত্র আউড়ে দিলেই হয় না। একই সাথে বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার মিশেল লাগে।

একটা বেশ বড়ো শ্বাস নিয়ে ধনুকের ছিলায় আঙুল ছোঁয়াল রুদ্রদেব। মন্ত্র পড়ে টান দিলো ছিলায়। তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বহুদিন আগের সেই পরিচিত দৃশ্য ভেসে উঠলো। ধীরে ধীরে মন্ত্রের গুণে স্বয়ম্ভূ রশ্মি দেখা দিলো ছিলার ঠিক মাঝ বরাবর। রুদ্রদেব নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল যেন।

তবে সেই রশ্মি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। একটু দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। তাতেই হতাশার একটু ছায়া পড়লো রুদ্রদেবের মুখে। পরের পলেই সেই ছায়া অবশ্য দূর হয়ে

গেল। আবার মন্ত্র পড়ে রশ্নির আহবান করলো সে। কিন্তু এবারও আগের মতো অবস্থা। রশ্নি দেখা দিলো কিন্তু স্থায়ী হলো না। তবে স্থায়িত্ব একটু বেড়েছে। বার কয়েকবার চেষ্টা করে আজকের মতো ক্ষান্ত দিলো সে। ওদিকে অসিত একা একা কী করছে সেটাও দেখা দরকার।

ধনুক আর মশাল নিয়ে কুটিরে ফিরে এলো রুদ্রদেব। মশালের আলো কমে এসেছে। অসিতের চিন্তা করার দরকার ছিল না। অসিত এখনো আগের অবস্থাতেই বসে আছে। বাদ্যযন্ত্র জায়গা মতো বাজছে।

মশালটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানার এক কোণায় বসে পড়লো রুদ্রদেব। অসিত আস্তে আস্তে যন্ত্রটা বাজাচ্ছে। প্রথমে সেদিকে তেমন একটা কান দিলোনা রুদ্রদেব। তবে একটু পরেই নীরবতার মধ্যে অভ্যাসবশত কান পাতলো।

এবং তারপরেই অবাক হতে বাধ্য হলো সে। অসিতের হাত সবগুলো স্বর একেবারে নিখুঁত বাজাচ্ছে। কথাটা মনে হতেই এবার ভালো করে কান পাতলো সে। না, শোনাটা ভুল ছিল না। আসলেই নিখুঁত বাজছে। অসিত সুর আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কোণা থেকে উঠে এসে আবার মশাল জ্বালালো সে। তারপর অসিতের সামনে এসে বসলো, 'তোমার বাজনাটা একটু জোরে বাজাও তো। আমার মনে হচ্ছে আজকে তোমার বাজনা হচ্ছে। তুমি পারছো।'

অসিত এতক্ষণে আনমনে বাজাচ্ছিল। এবার রুদ্রদেবের কথায় সচেতন হলো সে। তারপর একবার দেখে নিয়ে বাজাতে শুরু করলো। এবার গুরু শিষ্য দুজনের মনোযোগই শব্দের দিকে।

এবার অসিতের অবাক হবার পালা। রুদ্রদেব বাজিয়ে যখন তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল তখন সবগুলোই মনে রেখেছিল সে। তার হাত আজকে সবগুলো টান ঠিকমতো দিচ্ছে।

কয়েকবার এভাবে বাজানোর পর থামলো অসিত। রুদ্রদেব রায় দিলো, 'এই যন্ত্রে তুমি সিদ্ধ হলে। এবার পরের ধাপে যেতে হবে।' একটু আগে সে নিজেও পরের ধাপে গিয়েছিল।

'পরের ধাপ?'

'হ্যাঁ। কাল সকালেই সমস্ত অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের শিক্ষা শুরু হবে তোমার। এখন তোমার মন ঐ বিদ্যা গ্রহণ করার জন্য তৈরি। তোমার আঙুল এখন তারের টান নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।'

'সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কোনটা?'

'যত অস্ত্রের বিদ্যা আছে তার মধ্যে অবশ্যই ধনুর্বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। আজ আর কোনো কাজই করতে হবে না। শুয়ে পড়ো। কাল সকাল থেকে ধনুকে হাতেখড়ি হবে তোমার।'

অসিত মশাল নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। তার মন জুড়ে ঘুরছে কেবল অঙ্গদ, রাহু আর শকদের বন্দর বারিগাজা।

ছদ্মবেশে থাকতে কেমন লাগে? মানুষ মাত্রই কি ছদ্মবেশে থাকে না? থাকে। তার চেহারা তাকে ঢেকে রাখতে হয় বাহির এবং ভেতর দুজায়গা থেকেই।

মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম দুজনেই এখন ছদ্মবেশে আছেন রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে। দুজনেই আছেন সতর্ক অবস্থায়। ছদ্মবেশে থাকলে তাই নিয়ম। সীমান্তে ছড়ানো হয়েছে ঘাঘু চোলা গুপ্তচরদের। কিন্তু কোনো সংবাদ নেই। গুপ্তচরেরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সীমান্তের অবস্থা যেন বিনা বাতাসের কোনো সরোবরের মতো। কোথাও কোনো কাঁপন নেই।

জঙ্গলের ভেতরে ডালপালা দিয়ে ঢাকা তাবুতে এখন বসে আছেন কারিকালা আর ইরাম। এই তাবু খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কোনোভাবেই এই তাবু একটু দূর থেকে না জানলে দেখা যাবে না। এই তাবুর ভেতরে ব্যক্তিগত পরিবেশেও নিজেদের সাজ বদলাতে পারছেন না তারা। কোনো গুপ্তচরই এখানে তাদের আসল পরিচয় জানে না। তারা কেবল জানে মহারাজ এই দুজনকে পাঠিয়েছেন। তারা এসে এই দুজনের কাছে কেবল খবর দিয়ে যায়।

দুজনের মধ্যে কারোরই ধৈর্যের অভাব নেই। তবে এখানে প্রশ্ন ধৈর্যের নয়। আরও কিছু জানা অজানা আতঙ্ক ভর করেছে তাদের মনে। এই আতঙ্ক গাঢ় হচ্ছে দিনদিন। আতঙ্ক সবসময় প্রশ্রয় পেলে বাড়ে।

'কাকা। এই মন্ত্রীমণ্ডলের নড়াচড়ার কোনো খবর পাচ্ছি না কেন? তারা যেন একেবারে অনড় বসে আছে। তাদের উদ্দেশ্য কী? দক্ষিণ সীমান্তের কয়েকটা ছোটো বড়ো ঘাঁটি দখল করে ওরা আর কতদিন বসে থাকবে? আর তাদের কিছু একটা করার অপেক্ষায় আমরাই বা আর কতদিন এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবো?'

'আমার মনে হয় আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।' ইরামের গলায় অধৈর্য হবার চিহ্ন আছে তবে তা কারিকালার মতো অত বেশি নয়, 'আমরা যেমন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে তেমনি স্পষ্টত ওরাও কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'কীসের অপেক্ষা?'

'সঠিক সময়ের অপেক্ষা যে করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অন্ধ হয়ে অথবা নিয়তির ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ওরা এই পদক্ষেপ নেয়নি। নিশ্চিত হয়েই নিয়েছে। এখন দেখা যাক, সীমান্ত আর কতদিন ঠান্ডা থাকে।'

'আমাদের এভাবে বসে থাকাই উচিত হয়নি। যে পরিমাণ সময় আমরা পেয়েছিলাম তাতে এতদিনে রাজধানী থেকে সেনা নিয়ে সীমান্তে চলে আসতে পারতাম। তারপর এই বিদ্রোহীদের একেবারে যম দুয়ারে পাঠিয়ে দিতাম। দূর করে দিতাম সব কাঁটা। যা, তোরা এবার যমের রাজ্য দখল কর।'

'সেটা করা যেতো। কিন্তু এরপরে কী করতে?'

'এরপরে আর কী। সীমান্তে বসে থেকে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করতাম। শত্রু এলে যুদ্ধ হতো। তাতে যা হোক কিছু একটা হতো।'

'হ্যাঁ, তোমার কথা অনুযায়ী আমরা তা করতেই পারতাম। কিন্তু তারপরে দুই রাজ্যের মিলিত সেনা আমাদের মুখোমুখি থাকতো। আমাদের খুব শোচনীয় পরাজয় ঘটতো। আমার চিন্তা তা নয়।'

'তাহলে কী?'

আমাদের এখন মূল চিন্তা হওয়া উচিত কোন জায়গায় যুদ্ধ হবে তা নয়, যুদ্ধটা কীভাবে হবে তা নিয়ে।'

'মানে?'

'মানে তো সোজা। ব্যাপারটা এখন সাতবাহন রাজ্যের ওপর নির্ভর করছে। তারা তাদের কথা রাখবে কি না। তাদের কথা বেদবাক্য ধরে নিয়েই আমরা এই জুয়া খেলেছি। এখন তারা সময়মতো সেনা পাঠাবে কি না তাই এখন আসল কথা।'

'হ্যাঁ। এই ভগ্নশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে গেলে আমরা হেরে যাবো।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্যা এখন মন্ত্রীমণ্ডল না। তাদের যে-কোনো সময়েই শায়েস্তা করা যাবে। কিন্তু চেরা আর পান্ড্য রাজ্যের সাথে কিছুতেই আঁটা যাবে না।'

তাবুর বাইরে হঠাৎ খসখস শব্দ শোনা গেল। কথা এবং নিঃশ্বাস দুটোই বন্ধ হয়ে গেল দুজনের। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে। এখানে যারা আসবে তাদের সবারই একটা নির্দিষ্ট সংকেত জানা আছে। একটা শব্দ বলতে হবে। নিঃশব্দে সেই শব্দের শোনার অপেক্ষা করছে দুজনে।

শব্দটা শোনা গেল। গলার স্বরও তাদের অপরিচিত নয়।

ইরাম গলা খুললেন এবার, 'কে ওখানে?'

বাইরে থেকে জবাব এলো, 'আমি দক্ষিণ সীমান্তের ওপারের দূত। একটা বিশেষ খবর এনেছি আমি।'

সীমান্ত পেরিয়ে নিয়োগ করা গুপ্তচরের একজন খবর নিয়ে এসেছে।

ইরাম আদেশ দিলেন, 'ভেতরে এসো।'

ইরামের কথা শেষ হতেই ভেতরে ঢুকলো গুপ্তচর। সামনের দুজনের আসল পরিচয় সেও জানে না। তাই মহারাজ এবং মহামন্ত্রীর তুল্য সম্ভাষণের ধার ধারল না সে, 'আমি সংবাদ নিয়ে এসেছি। যদি অনুমতি পাই তাহলে পেশ করতে পারি।'

'অনুমতি দেওয়া হলো। পেশ করো।'

'আমাদের দক্ষিণ ভারতের পুরো ভূমিই বলতে গেলে তিনটা রাজ্যের দখলে আছে।'

'হ্যাঁ' একমত হলেন ইরাম, 'চেরা, চোলা আর পান্ড্য।'

'কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন না, এই তিন রাজ্যের মিলিত সীমান্তের মাঝে মাঝে কিছু স্বাধীন ভূমি আছে। মোট এগারোটা।'

'তাও জানা আছে।' সায় দিলেন ইরাম।

'ঐ রাজ্যগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে-কোনো প্রভাব থেকে মুক্ত।'

'হ্যাঁ। তাদের ওপর কারো প্রভাব নেই। তারা কাউকে খাজনা দেন না। কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী?'

'ওনারা এমনিতে ছোটো অধিপতি। সামন্ত রাজাদের চেয়েও ছোটো। কিন্তু তাদের সবারই নিজস্ব বাহিনী আছে। সেই বাহিনী বড়ো কোনো রাজ্যের জন্য তেমন একটা হুমকির কারণ নয় ঠিক, কিন্তু সেই এগারো ভূমিপতির সেনা একত্র হলে সেই বাহিনীকে হেলাফেলা করা যাবে না।'

'সেটাও স্বাভাবিক। দশটা পাথর এক জায়গায় করতে পারলেই দেওয়াল হয়ে যায়। এগারো জনের ছোটো ছোটো দল এক হয়ে গেলে দলটা অনেক বড়ো হবে।'

'হ্যাঁ, এবং ঠিক তাই হয়েছে। সেই এগারো জনের সৈন্যরা একত্র হয়েছে। শুধু তাই নয় তারা সজ্জিত হয়েছে যুদ্ধযাত্রা করবে বলে।'

'বলো কী!' এবার কথা বললেন মহারাজ কারিকালা, 'তাদের আবার কী হয়েছে? তারা আবার কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবে? আমাদের বিরুদ্ধে?'

'তারা এরই মধ্যে যাত্রা শুরু করে দিয়েছিল। তবে আমাদের সীমান্তের দিকে নয়। চেরা রাজ্যের দিকে।'

'এটা আবার কি আজব কাহিনি। তারা হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়া চেরা রাজ্য কেন আক্রমণ করবে?'

'সেটা আমি জানতাম না। কেন তারা যাত্রা করলো চেরা রাজ্যের দিকে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ঘটনা যে করেই হোক পুরোপুরি বুঝতে হবে। নিঃশব্দে আমি প্রকৃতির সাথে মিশে এই বাহিনীকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এই সজ্জিত বাহিনীকে চেরা সীমান্তে কোনো বাঁধার মুখোমুখি হতে হলো না। তারা সুরসুর করে প্রবেশ করলো চেরা রাজ্যে। চেরা সৈন্যরা যেন সাদরে অভ্যর্থনা করলো তাদেরকে।'

কারিকালা আর ইরাম দুজনেই বেশ অবাক হয়েছেন। কেউই পেছনের কারণ ধরতে পারছেন না।

'কেন তারা এমন করছে?' বিড়বিড় করলেন মহারজা কারিকালা।

'তা আমি বুঝতে পারিনি।'

ইরাম খেই হারালেন না, 'তারপর কী হলো?'

'বাহিনী চেরা সীমান্তে প্রবেশ করলো। আমিও সাধারণ চেরা নাগরিকের বেশে প্রবেশ করলাম সেখানে। পেছন পেছন যেতে লাগলাম। সেই বাহিনী দেখতে দেখতে একেবারে রাজধানীতে প্রবেশ করলো। সেখানে আগে থেকেই চেরা সেনা সজ্জিত ছিল। তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো এই বাহিনী। তখন আমি বুঝলাম, এই মিলিত সেনা চেরা রাজ্য আক্রমণ করতে যায়নি, বরং চেরা বাহিনীর সাথে মিলিত হতে গেছে।'

কারিকালার মুখ দেখে মনে হলো যেন বাজ পড়েছে তার ওপর, 'এটা শোনাই বাকি ছিল।'

গুপ্তচর দম নিলো এবার, 'আমি এই খবর দেবার জন্যই এসেছি।'

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। দক্ষিণ সীমান্ত পেরিয়ে দেখো কী অবস্থা।'

গুপ্তচর প্রস্থান করেছে। কারিকালা হতাশ হয়ে তাকালেন ইরামের দিকে, 'এসবের মানে কী কাকা? আমি যতদূর জানি ঐ স্বাধীন ভূমি অধিপতিরা নিজেদের ভূমির বাইরে যায় না। নিজেদের মাটির বাইরের কোনো কিছুতে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা প্রকৃত স্বাধীনচেতা, যার যার ভূমি মাটি কামড়ে রক্ষা করে। তারা সবাই কেন একসাথে নিজেদের সেনা নিয়ে চেরা রাজার সাথে যোগ দিলো? এ-রকম দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর নিজেই চান না, এই যুদ্ধে আমাদের জেতার কোনো আশা থাকুক।'

'অনেক কারণই হতে পারে। তারা যে চেরাদের পক্ষে কেবল স্বাধীনতা চাপে পড়ে গেছে বলেই যুদ্ধ করছে তা নাও হতে পারে। হতে পারে চেরা রাজা ওদের বাড়তি ভূমি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনও হতে পারে, তাদের সরাসরি অনেক সম্পদ দেবার অঙ্গীকার করেছেন। কেন তারা যোগ দিয়েছে সেটা বড়ো কথা না, বড়ো কথা হচ্ছে, এইমাত্র গুপ্তচর যে খবর নিয়ে এসেছে তা আমাদের জন্য মোটেও সুবিধার নয়। আমাদের শত্রুদের শক্তি এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এখনও হয়তো যোগ দেয়নি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পান্ড্য সেনা চেরার সেনার সাথে যোগ দেবে। তাহলে তো আমি যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনই দেখছি না। নিশ্চিত পরাজয়ের মধ্যে আর শুধুশুধু নিজের সৈন্যের রক্তক্ষয় করে লাভ কী?'

'এই ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত না হয়ে পারছি না। অত বড়ো সেনার সাথে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। জোয়ারের সময় দড়ি ছাড়া ডিঙ্গি যেভাবে ভেসে যায় আমরাও ঠিক সেভাবেই ভেসে যাবো। কোনো যুদ্ধকলাই খাটবে না। তবে একটা ভরসা তো এখনও আমাদের কাছে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, সাতবাহন সেনা। অবশ্য সেনা বলে সাতবাহনের প্রতিশ্রুতি বললেও চলে।'

'হ্যাঁ।'

'ভয়টা তো আরও বেড়ে গেল। সাতবাহন যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে? কাকা, যদি এটা তাদের কোন কূটনৈতিক চাল হয়ে থাকে?'

'সেনা পাঠাক আর না পাঠাক, এটা অবশ্যই সাতবাহনের একটা কূটনৈতিক চাল। তবে আমাদের সামনে তো এখন কোনো উপায় নেই। হয় আমাদের সাতবাহনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, অথবা আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হতে হবে।'

'কোনটা বেছে নেবো আমরা?'

'দুটোর মধ্যে সময়ে যেটা এগিয়ে থাকবে। আমরা একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত সাতবাহনের সেনার জন্য অপেক্ষা করবো।'

আচমকা বিষণ্ন হয়ে উঠলো মহারাজ কারিকালার মন। কত রকমের সংগ্রাম, কত চড়াই উৎরাই, বুদ্ধির খেলা পেরিয়ে এসে এই সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন তিনি। সেই আসন এখনও তার স্পর্শে ঠিকমতো উষ্ণ হবার অবকাশ পায়নি, তার আগেই এই সিংহাসন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।

তখনই তাবুর বাইরে আবার খসখস শব্দ হলো। আবারও দুজনে নিঃশ্বাস আটকে বসে রইলেন। অন্য কোনো গুপ্তচর কি এসেছে অন্য কোনো খারাপ সংবাদ নিয়ে? নাকি একটু আগের চরই আবার ফিরে এসেছে? কিছু বলা কি বাকি ছিল?

ইরাম আবার শব্দটা শুনে দূতকে আজ্ঞা দিলেন ভেতরে আসার জন্য। এবারও দূত এসেছে। তবে এই দূত আগের দূত নয়। এই দূতকে তারা চেনেন। সে রাজধানী থেকে এসেছে।

দূতকে দেখেই মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম দুজনেই বুঝলেন এই দূত রাজধানী থেকে নিশ্চয়ই সাতবাহনের কোনো খবর নিয়ে এসেছে। রাজধানী থেকে আসার মতো তো অন্য কোনো খবর নেই। এই দূত তাদের আসল পরিচয় জানে। পুহার নগরী ত্যাগ করার সময়েই এই দূতকে বিশেষভাবে রাজধানীতে রেখে এসেছিলেন ইরাম। আর এই দূতের ওপর নির্দিষ্ট নির্দেশনা ছিল যাতে সাতবাহন থেকে কোনো খবর এলেই সে যেন কোনোরকম দেরি না করে খবর নিয়ে এখানে আসে।

এই দূত কিন্তু তাদের দুজনেরই আসল পরিচয় জানে। যথাযথ সম্ভাষণ জানালো সে। তারপর সংবাদ পেশ করলো, 'সাতবাহনের দূত গত পরশু সন্ধ্যায় পত্র নিয়ে পুহারে পৌঁছেছে। আমি পত্র পেয়ে আর দেরি করিনি। পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়েছি।'

'পথে কোনো সমস্যায় পড়োনি তো?' সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ইরাম।

'না মহামন্ত্রী। আমাকে কোনো বাঁধার মুখে পড়তে হয়নি। শুধু খাওয়া আর আনুসঙ্গিক কাজ বাদে আমি আর কোনো কিছুর জন্যই থামিনি।'

'সেটা তোমার এখানে আসার জন্য সময়ের পরিমাণ দেখেই বুঝতে পারছি। পত্রটা দাও। আর তুমি এখন আবার রাজধানীতে ফিরে যাবে। এবার পথের সরাইখানাতে বিশ্রাম নিতে নিতে যাবে। যেতে অত তাড়া নেই।'

পত্র হাতে অর্থ উদ্ধারে ব্রতী হলেন ইরাম। দূত পত্র বয়ে এনেছে বটে তবে এই পত্রের অর্থ উদ্ধার চোলা রাজ্যে একমাত্র তার দ্বারাই সম্ভব।

প্রথমবার হলে সময় বেশি লাগে। তার আগেই ইরামের কয়েকবার অনুশীলন করা হয়ে গেছে। এবার সংকেতের মানে বের করতে বেশি সময় লাগলো না।

কারিকালার দৃষ্টি উৎসুক, 'কী লিখেছে কাকা? তাড়াতাড়ি সংকেত উদ্ধার করুন। আমার আর তর সইছে না।'

'সময় আর লাগবে না। সংকেতের মানে বের করে ফেলেছি। তিনটা নির্দেশনা দেওয়া আছে চিঠিতে। সেগুলো এক এক করে আলোচনা করবো আমরা।'

'আচ্ছা' নড়েচড়ে বসেন কারিকালা।

'প্রথমেই লেখা আছে- আমি যখন এই পত্র আপনাকে লিখছি তখন আর চারদিন বাকি আছে। তার মানে আপনি যখন এই পত্র পাবেন তখন চারদিন পেরিয়ে যাবে। ততক্ষণে চেরা বাহিনী আপনাদের রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ফেলেছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এগারো ভূমি অধিপতির বাড়তি সৈন্য। তারপর তারা কী করবে তা তো আপনার জানাই। তারা দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে আপনাদের রাজ্য আক্রমণ করবে। সেখানে আছে আপনাদের বিদ্রোহী মন্ত্রীদল। তাদের সেনার সাথে যোগ দেবে তারা। আর দক্ষিণ সীমান্ত পার হবার আগে অথবা পরে পান্ড্য বাহিনী তাদের সাথে যোগ দেবে। এই ব্যাপারে আমরা ঠিক খবর পাইনি। পান্ড্য বাহিনী যে-কোনো সময় যোগ দিতে পারে। তারপর সেই মিলিত বাহিনী আপনাদের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করবে।'

কারিকালা এই অংশ বেশ মন দিয়েই শুনেছেন, 'নতুন কথা তো কিছুই লিখেননি। তবে একটা ব্যাপার আমরা জানতে পারলাম। চেরা সেনাবাহিনী এরই মধ্যে যাত্রা করে ফেলেছে। তবে খুব বেশি সময় হয়নি। তাহলে আমাদের গুপ্তচর খবর পেয়ে যেতো। আমার হিসেবে তাদের সৈন্য দক্ষিণ সীমান্তে পৌছতে এখনও কমবেশি দশ দিন সময় লাগবে। আমাদের এখনই রাজধানীতে চলে যাওয়া উচিত।'

ইরাম সম্মত হলেন, 'ঠিক বলেছ। এবার দ্বিতীয় অংশে আসি- আপনারা আপনাদের সজ্জিত সেনা নিয়ে অতি সত্ত্বর রাজধানী থেকে যাত্রা করবেন। কোনোভাবেই ঐ সেনাকে আপনাদের রাজধানীতে পৌছতে দেওয়া যাবে না। তার আগেই পথে ঐ সেনার মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে। সেখানেই প্রতিহত করতে হবে।'

'এটা আবার কেমন কথা? রাজধানীতে থাকলে আমরা দুর্গের সহায়তা পাবো। খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে কম সেনা নিয়ে লড়বো কীভাবে? এরপরে কী লিখেছে?'

'এরপরে লেখা আছে আরেকটা পরামর্শ। এখানে বলা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেবার কথা- আপনারা যে জায়গায় তাদের সেনাকে বাঁধা দেবেন তার ব্যাপারে খুবই সাবধান। সেই যুদ্ধক্ষেত্র যেন লম্বায় যথেষ্ট হয় কিন্তু পাশে যেন খুব বেশি না হয়। কোনোভাবেই যেন সেই সমতল যুদ্ধক্ষেত্রের প্রশস্ততা সহস্র ধনুর বেশি না হয়। এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আবার বলছি, কোনোভাবেই আপনাদের বেছে নেওয়া ক্ষেত্র যাতে প্রশস্তে সহস্র ধনুর ওপরে না হয়।'

'বুঝতে পেরেছি কাকা। আমাদের বোধের অগম্য কোনো পরিকল্পনা ঘুরে চলেছে সাতবাহন মন্ত্রী গিরিধারীর মাথায়। কিন্তু আসল কথাই তো নেই। তাদের সেনাবাহিনী এখন কোথায় আছে? তারা আমাদের সাথে কবে যোগ দেবে?'

'সেটা লেখা আছে তৃতীয় অংশে- আপনারা যখন অতি সতর্ক হয়ে ঐ ক্ষেত্র বাছাই করবেন তখন সাথে সাথে দূত পাঠিয়ে আমাদের জানিয়ে দেবেন তার অবস্থান। আমরা যুদ্ধের প্রাক্কালে ঠিক সময় মতো আপনার সেনা পাঠিয়ে দেবো।'

'এইবার হয়েছে।' কারিকালার চেহারা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অনেকদিন পরে হাসি বেরিয়ে এলো ঠিক তার প্রাণের ভেতর থেকে, 'তাহলে কাকা, আর দেরি করে লাভ নেই। আমরা এখনই সব সৈন্য আর চরসহ পুহারের দিকে যাত্রা করি?'

'হ্যাঁ, আর দেরি করা চলবে না। সেখানে গিয়ে আবার সেনা নিয়ে বেরোতে হবে।'

'চেরা মহারাজ নিশ্চয়ই চমকে যাবেন। যতটা সহজে এই যুদ্ধ তিনি জিতবেন ভেবেছিলেন ততটা সহজ হবে না কাজটা।'

'আমি তা ভাবছি না। আমাদের এখানে একটা কাজ দিয়েছেন মন্ত্রী গিরিধারী। একটা সহস্র ধনু অথবা তার কম প্রশস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনা সজ্জা করতে বলা হয়েছে। সেই সরু যুদ্ধক্ষেত্র কোথায় পাবো?'

'এই সমস্যার কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সমাধান আমার মাথা থেকে বেরোবে না। আমি এই রাজ্যের রাজা হতে পারি, কিন্তু আমার সম্পত্তি আমি যে খুব ভালো চিনি তা বলা যাবে না। এই রাজ্যের প্রত্যেক কোণা আপনার নখদর্পণে। জায়গাটা আপনিই খুঁজে বের করুন।'

'সেটা ঠিক বলেছ। আমাকেই সমাধান করতে হবে। আর তা করতে হবে এখনই। নইলে স্বস্তি পাচ্ছি না।'

নিজের থলের দিকে হাত বাড়ালেন ইরাম। গুপ্তচরের জাল ছড়িয়ে কাজ করতে নানা রকম নকশা লাগে। পুরো চোলা রাজ্যের নকশা আছে তার আছে। সেই নকশা চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। নকশায় চোখ বোলাতে বোলাতে নিজের নিজের মনে বিড়বিড় করছেন তিনি,

'ওরা দক্ষিণ দিক থেকে পুহারের দিকে যাত্রা করবে। আমাদের কাজ হচ্ছে পথে একটা সরু ক্ষেত্রে তাদের বাঁধা দেওয়া। এখন কথা হচ্ছে তারা কোন পথে পুহারের দিকে যাত্রা করবে?'

যদিও ইরাম কারিকালার সাথে কথা বলছেন না কিন্তু কারিকালার খাড়া করে রাখা কানে ঐ কথাগুলো ধরা পড়েছে, 'সেনা নিশ্চয়ই সহজ পথেই যাত্রা করবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক। এবং দক্ষিণ সীমান্ত থেকে রাজধানীর দিকে যাবার সহজ রাস্তাটা তাদেরকে বলে দেবে আমাদের বিদ্রোহী মন্ত্রীরা।' মানচিত্রের ওপরে আঙ্গুল বোলালেন তিনি, 'ঠিক এই জায়গা ধরেই তারা আসবে পুহারের দিকে।'

'হ্যাঁ কাকা। এই পথের ওপর এমন কোনো জায়গা কি আছে? যেমনটা গিরিধারী বলে দিয়েছেন?'

ভ্রু কুঁচকালো ইরামের, 'আমার মনে হয় আছে।'

'এই পথের মাঝে?'

'হ্যাঁ। জায়গাটার দুপাশে জঙ্গল আর বন্ধুর জমি। সেই জমি থেকে যুদ্ধ করা যাবে না। শুধু মাঝের সমতল জায়গাতেই সেনা সজ্জা করতে হবে। যুদ্ধ করার যোগ্য জমির প্রশস্ততা কোনোভাবেই ওখানে সহস্র ধনুর বেশি হবে না।'

'কোথায় আছে কাকা এই জায়গা? জায়গার নাম কী?'

আবার নিজের পরিকল্পনা পরখ করে নিচ্ছেন ইরাম, 'ওরা কোনোভাবেই সমুদ্র পার ধরে আমাদের রাজধানীতে আসবে না। তাতে একে সময় বেশি লাগবে। এবং জলের অভাব হবে। তাই ওরা কোনো রকম ঘুরপথে না এসে আসতে হবে সোজা কর্ণ বরাবর পথে। আর সেই পথে এলে আমার ঠিক করা জায়গা এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। না, আর কোনো সন্দেহ নেই। ওখানেই আমরা আটকাবো ওদের।'

'জায়গাটার নাম কী কাকা?' দ্বিতীয়বার অধৈর্য কণ্ঠে একই প্রশ্ন করলেন কারিকালা।

'ভেন্নি। পুহার থেকে জায়গাটা বেশি না, মাত্র পাঁচ যোজন দূরে। ওখানেই সেনা সজ্জা করবো আমরা।'

৫০

পাভ্য রাজ্যের জাতীয় অলসতার দিন শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। এটা ঘানির যে-কোনো একটা উপাদানের মতো। সমাজের শ্রেণি বিন্যাসে এক অংশ জোরে চলতে শুরু করলে বাকি অংশগুলোও সেই গতির সাথে নিজের গতি বাড়াতে বাধ্য হয়। নইলে যন্ত্র থেকে ছিটকে পড়তে হবে।

মহারাজ ভালুদি প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করেছেন। নিখুঁতের বিচার করলে তা কখনোই শেষ হবে না। তবে একটা সময় সব কিছুকেই শেষ করতে হয়। নিজের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার কথা অনুযায়ী কাজ করেছে সেনাপতিরা। বেশ কয়েকবার মহড়া দিয়েছে সেনার নানা অংশের। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন মহারাজ ভালুদি। এখনও তাদের নড়াচড়ায় কিছু অনভ্যস্ততার ভাব রয়ে গেছে, তবে এই বাহিনীকে একেবারে আনাড়ি বলা যাবে না। কাজ চলে যাবে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মহারাজ ভালুদি। সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছেন। এই বাহিনীর রক্ত অবশ্যই ঝরবে সামনের পথে। আর এই রক্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই এই বাহিনী বেতন নেয়। তাদের রক্ত বিক্রি করেই তিনি গড়ে তুলবেন তার ভবিষ্যত। তাতে কোনো অন্যায় দেখছেন না তিনি। রাজা এবং মাতৃভূমির জন্য রক্ত নেওয়া এবং দেওয়াই সেনাবাহিনীর কাজ। এই কাজের জন্যই তারা নিয়মিত যত্ন করে শরীরে রক্ত আর শক্তি জমায়।

ঝড়ের আবহ অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি অপেক্ষা করছেন ঝড় শুরু হবার। সেই সময়ের আর বেশি বাকি নেই।

তখনই দূত এসে তাকে ভেরাপ্পনের আসার সংবাদ দিলো। মহারাজ ভালুদি এই আশাই করছিলেন। তিনি অপ্রস্তুত হলেন না। দক্ষিণ ভারতে এবার ঝড় বয়ে যাবে। ওলটপালট হয়ে যাবে সবকিছু। এই ঝড়ের মধ্যে নিজের জায়গাটা ধরে রাখতে পারলে আখেরে ভালো লাভ হবে। পরিবর্তন আসবে। ভালো খারাপ দুই দিক থেকেই।

মন্ত্রী ভীমসেনকে সাথে নিয়ে ভেরাপ্পনের সামনে এসে বসলেন মহারাজ ভালুদি। আজ কিন্তু তার মধ্যে কোন কাঁচুমাচু ভাব নেই। চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। ভেরাপ্পন ওনাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মহারাজ ভালুদি মনে মনে হাসলেন। যে রাজা সৈন্যে শক্তিশালী হয় তার কদর আপনিই বেড়ে যায়। মহারাজ ভালুদি কিছুদিন আগেই গ্রহীতার জায়গায় ছিলেন, এখন পালন করছেন চেরা রাজ্যের সহযাত্রীর ভূমিকা। আজ মহারাজ ভালুদি আর ভীমসেন বসেই ছিলেন, দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানালেন ভেরাপ্পন।

একটা চরিত্রে মানুষ যখন অভিনয় করতে শুরু করে তখন সেই অভিনয় তাকে চালিয়ে নিতে হয়, চরিত্রের ভাবটা বজায় রাখতে হয়। মহারাজ ভালুদি নিজের গলার স্বরে যথেষ্ট ভারিক্কি ভাব নিয়ে এলেন, 'আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা মন্ত্রী ভেরাপ্পন। আপনার সাথে আগেই আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে। পরিকল্পনাও তৈরি করেছি

আমরা। সেনার প্রস্তুতিও হয়ে গেছে। সবকিছু তৈরি হয়ে যাবার পর অপেক্ষা করতে কারোই ভালো লাগে না। আপনারা কেন দেরি করছেন?'

'মহারাজ, আমরা দেরি করছি না। পরিকল্পনা করার সময়েই আমরা কোন সময় কোন কাজ করবো তা ঠিক করে ফেলেছি। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। কোনোকিছুই আটকে নেই। আপনার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে শুনে খুশি হলাম।'

'আপনাদের পরিকল্পনা ঠিক থাকলে তো ভালোই। সব প্রস্তুতি শেষ হবার পর যদি আপনারা পরিকল্পনা বাতিল করে দেন তাহলে তো বিপদ। এখন তাহলে বলুন, কেন আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে আমাদের রাজ্যে?'

'মহারাজ, আমাদের সময় চলে এসেছে। গতবার যখন এসেছিলাম আপনি বলেছিলেন আপনার সেনা এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি নেই। সময় বেশি পাননি। এর মধ্যেই বলছেন আপনার সেনা তৈরি। অস্ত্রশস্ত্রের কী অবস্থা?'

মহারাজ ভালুদি মাথাটা একটু সোজা করে শ্বাস ফেললেন, তার পরেই পাল্টে ফেললেন প্রসঙ্গ, 'সেই প্রশ্নের উত্তর আপনি একটু পরেই পাবেন। তার আগে বলুন, আমার প্রস্তাবের কী অবস্থা? সেই ব্যাপারে আপনাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী? আপনি কি আমাদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতার ব্যাপারটা নিয়ে মহারাজ উথিয়ানের সাথে কথা বলেছেন? সেই ব্যাপারে আগে একটা আলোচনা হওয়া দরকার।'

ভেরাপ্পন চট করে এই কথার কোনো উত্তর দিলেন না। মহারাজ ভালুদির প্রস্তাবের কথা তার মনে আছে। তবে সেই প্রস্তাব মহারাজ উথিয়ানের কানে তোলার প্রশ্নই ওঠে না। মহারাজ উথিয়ানকে তিনি বুঝিয়েছেন, এই যুদ্ধের ফলে চেরা রাজ্য একই সাথে দক্ষিণ ভারতের তিন রাজ্যের সেনা এবং বাণিজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী হবেন। আর এখানে পাণ্ড্য রাজ্য যুদ্ধের আগেই নিজেদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা চাইছে। সেই মূল্য কখনোই দিতে রাজি হতেন না মহারাজ উথিয়ান। উল্টো পুরো ব্যাপারটাতেই জল ঢেলে দিতেন তিনি। যুদ্ধই তখন আর হতো না। কিন্তু তিনি যে মহারাজ উথিয়ানের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেননি, সেই কথাও এখানে এখন বলা যাবে না।

কূটনীতির চরম পরীক্ষা দিতে হবে এখন। তবে সব ছক কষেই এসেছেন তিনি। মহারাজ ভালুদি যখন তার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখনই তিনি বুঝেছিলেন, এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় একটা জটিল প্যাঁচ এনে দেবে। প্যাঁচটা বেশ জটিল। তবে এতদিন চিন্তা করে করে সেই জটিল প্যাঁচ খোলার উপায় বের করে ফেলেছেন ভেরাপ্পন। সুতোয় টান দিলেই চলবে, তবে তা করতে হবে অবশ্যই খুব সাবধানে।

'মহারাজ, আপনার প্রস্তাব যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল। যে বলিদান আপনি আমাদের জন্য দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার বদলে আপনার চাওয়া কিছুই নয়। এটুকু ফল আপনি আশা করতেই পারেন। তবে'

এবার ভীমসেন কথা বলে উঠলেন, 'এখানে, আলোচনার এই পর্যায়ে আপনি যদি 'তবে', 'কিন্তু' এসব শব্দের প্রয়োগ করেন তবে কিন্তু পরিস্থিতি আরও জটিল হতে বাধ্য। এসব শব্দ আপনি এখন পরিহার করলেই ভালো হয়।'

ভেরাপ্পন মহারাজ ভালুদি আর মন্ত্রী ভীমসেনের মিলিত আক্রমণে একটু বিব্রত বোধ করেন, 'মন্ত্রী ভীমসেন, আমি যেমন চেরা রাজ্যের মন্ত্রী, তেমনি আপনিও এই পাণ্ড্য

রাজ্যের মন্ত্রী। আর রাজনীতির পাঠ সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, মন্ত্রীর কাজ হচ্ছে পরিস্থিতি সরল করা। আমি এখানে ঠিক সেই চেষ্টাই করছি। এখন আপনারা যদি একটু সহযোগিতা না করেন তাহলে কোনো পক্ষের চাওয়াই পূরণ হবে না।'

মহারাজ ভালুদি ইশারা করলেন ভীমসেনকে, মন্ত্রী আর কোনো কথা বললেন না। ভালুদি এবার সরাসরি বললেন, 'মন্ত্রী ভেরাপ্পন, বুঝতে পারছি আপনি এখানে পরিস্থিতি সরল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কীভাবে আপনি তা করবেন সেটা জানতে পারলে আমাদের একটু সুবিধা হতো।'

মন্ত্রী ভেরাপ্পন কিছু একটা বলতে চাইলেন। কিন্তু ভালুদি বাঁধা দিলেন তাকে, তার কথা এখনও শেষ হয়নি, 'দেখুন, আমরাও চাইছি, আসল কাজে নামার আগে সব ঠিক হয়ে যাক। নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতি জটিল করে ফেললে আসল কাজে কিছুতেই সাফল্য আসবে না। আর এখানে অবস্থা সরল করার একটাই উপায় আছে। বিনিময় প্রথা। আমরা এখানে বিনা শর্তে দান করার অবস্থায় নেই, সেই ইচ্ছাও আমাদের নেই। আপনি আমাকে কিছু দেবেন, আমি আপনাকে কিছু দেবো। আর এখানে আমি কী চাই, তা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। আমাদের দুটো মসলার জন্য সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা।'

আলোচনায় বারবার একই কথা ঘুরেফিরে আসছে। এখানে আসল কথাটা না বলে আর কোনো উপায় নেই। সাবধানে পরের কথাগুলো বেছে নিলেন মন্ত্রী ভেরাপ্পন, 'মহারাজ, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনার এই প্রস্তাব মহারাজ উথিয়ানের কাছে আমি দেইনি। আপনার প্রস্তাবের ব্যাপারে তাকে আমি কিছুই জানাইনি। তবে আপনি যে পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন এই কথা বলেছি। আপনার সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেছি, যুদ্ধে আপনাদের ভূমিকা নিয়েও কথা বলেছি।'

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ কিছুই বলতে পারলেন না মহারাজ ভালুদি। আশায় জল পড়েছে। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে মন্ত্রী ভেরাপ্পনের ওপর ভরসা করে আদতে তাদের ক্ষতিই হয়েছে। কিছুক্ষণ পড়ে নীরবতা ভাঙ্গলেন মহারাজ ভালুদি, 'বাহ, মন্ত্রী ভেরাপ্পন বাহ। আপনি তো ভালোই খেল দেখালেন।'

'আপনি আমার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন।'

'আমি আপনার ব্যাপার বুঝতে পারবো না। এই যুদ্ধ আপনাদের, আমার নয়। আপনি আমার সাথে যে কথা হয়েছিল তার অর্ধেক কথা জানিয়েছিলেন মহারাজ উথিয়ানকে। বাকি অর্ধেক কথা বেমালুম চেপে গেছেন। দেখুন, আমি আপনাকে সরাসরি একটা কথা বলে দিচ্ছি। আপনি আমাদেরকে মহারাজ উথিয়ানের হয়ে বচন দেবেন। রাজ বচন।'

'মহারাজ, একটু শুনুন।'

'না, আলোচনা এগোনোর জন্য আপনাকে বচন দিতে হবে। নইলে কোনো কথা বলার দরকার নেই। আপনি যদি আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমাকে বচন না দেন, তাহলে আমার সেনাবাহিনী এই রাজধানী ছেড়ে কোনোদিকে এক পাও যাবে না। এই আমার শেষ কথা। আর কোনো দর কষাকষি চলবে না।'

মহারাজ ভালুদির জোরালো স্বরে বলা কথাটার পরে বেশ বড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভেরাপ্পন। সবটা বুঝিয়ে বলতে ব্রতী হলেন তিনি, 'মহারাজ, আপনি তো জানেনই, মহারাজ উথিয়ানের স্বভাব। বাণিজ্যই ওনার ধ্যান জ্ঞান। লক্ষ্মীতেই তিনি সম্পূর্ণ ভরসা করে আছেন। অনেক কষ্ট করে, কূটনীতির অনেক প্রয়োগ করে, পরিকল্পনা করে অবশেষে দক্ষিণ ভারতের সম্পূর্ণ বাণিজ্যের অধিকারী হতে পেরেছেন তিনি। সেটা শুধু বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব না। এর জন্য প্রবল সংকল্প থাকতে হয়।'

'এই ব্যাপারে আমি একমত। মহারাজ উথিয়ানের বাণিজ্যিক সংকল্প নিয়ে কোনো সন্দেহ আমার মধ্যে নেই।'

'জি মহারাজ। আপনার রাজ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণ আপনি আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়েছেন কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই। আপনাকে এক প্রকার বাধ্য করেছেন তিনি বশ্যতা স্বীকার করতে।'

'হ্যাঁ, তখন আমার ক্ষত্রিয় রক্ত শুয়ে ছিল। আমি সংগ্রামের চেয়ে সুখকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলাম।'

'মহারাজ, তাহলে আপনিই এখন বলুন, যে বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য মহারাজ উথিয়ান এত বড়ো যুদ্ধ করছেন, এত ঝুঁকি নিচ্ছেন, সেই বাণিজ্য শক্তি খর্ব করার প্রস্তাব আমি সরাসরি মহারাজকে এখন কীভাবে দেই? মহারাজ তো এক কথায় এই প্রস্তাব বাতিল করে দিতেন। তখন তো আপনার এবং আমার কোনো লাভই হতো না। আমার লাভ তো দূরের কথা মন্ত্রীর পদ চলে যেত। হয়তো আমার প্রাণ নিয়েও এতক্ষণে টানাটানি পড়ে যেত। আর একটা ব্যাপার তো আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি চেরা রাজ্যের মন্ত্রীর পদে না থাকলে তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে পান্ড্য রাজ্যের।'

ভেরাপ্পনের কাতর আকুল স্বরে একটু নরম হয়ে এলেন মহারাজ ভালুদি, 'এটা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছেন। সেই হিসেবে আমাদের মধ্যে একটা ভালো দেনা পাওনার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মন্ত্রী ভেরাপ্পন, প্রকৃতি যেহেতু আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছে, তখন সেটা গ্রহণ করাই ভালো। আমরা আর কারো বশ্যতা স্বীকার করে চলবো না।'

'মহারাজ, আমি আপনাদের কারো বশ্যতা স্বীকার করে চলতে বলছি না। শুধু এটুকু বলছি, মহারাজ উথিয়ানের সাথে আপনাদের দাবি নিয়ে কথা বলার মতো পরিস্থিতি এখনও আসেনি। এখন বললে মহারাজ ঠিকমতো না শুনেই না করে দেবেন। তবে' একটু ঝুঁকে এলেন ভেরাপ্পন, 'এই যুদ্ধের পর আপনাদের আর কারো বশ্যতা স্বীকার করে চলতে হবে না। আমি যে করেই হোক আপনাদের দুটো পণ্য আমাদের রাজ্য থেকে তুলে নেবো। আপনারা আপনাদের স্বাধীনতা পেয়ে যাবেন।'

মহারাজ ভালুদি ভেরাপ্পনের প্রতিশ্রুতি ঠিক বুঝতে পারলেন না, 'মহারাজ উথিয়ান যদি এখন প্রস্তাব মেনে না নেন, তাহলে যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কেন মেনে নেবেন? একবার আমরা যদি সেনা যাত্রা করি, একবার আমাদের সেনা যদি আপনাদের সেনার সাথে যোগ দেয়, তাহলে তো আমাদের পিছিয়ে যাবার, প্রত্যাখ্যান করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।'

ভেরাপ্পনের কণ্ঠে এবার একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে, 'মহারাজ, আপনি কি আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমি তো বললাম, আপনার ইচ্ছে যেভাবেই হোক পূরণ করার ব্যবস্থা আমি করবো।'

'মন্ত্রী ভেরাপ্পন, আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছি না। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। তবে বুদ্ধিমানেরা বলেছেন, তার কথাতেই বিশ্বাস করবে যার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। আপনি তো আমাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। তাই এখানে আপনার মুখের কথা বিশ্বাস করা বা না করার কোনো গুরুত্ব নেই।'

ভেরাপ্পনের মুখ আবার বিষণ্ন হলো। নত মুখে মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তার সামনের পথ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। নাহ, এবার আসল তাসটা ফেলার সময় এসেছে। এই প্রস্তাব মহারাজ ভালুদি আর ফেলতে পারবেন না।

'আপনারা শেষ পর্যন্ত আমাকে একজন পরাজিত মানুষে পরিণত করবেন। আপনারা যদি এই যুদ্ধে অংশ না নেন তাহলে মহারাজ উথিয়ানের কাজে আমার কূটনৈতিক পরাজয় ঘটবে। আমি মহারাজ উথিয়ানের কাছে একজন অযোগ্য মন্ত্রী হিসেবে বিবেচ্য হবো। এতদিন আপনাদের পক্ষে ছিলাম, এত এত কাজ করলাম আপনাদের জন্য, আর শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাকে এই প্রতিদান দিলেন। বেশ।'

অনুভূতির চাল মাঝে মাঝে বেশ কাজে লাগে।

ভেরাপ্পনের দৃষ্টি নিচের দিকে হলেও আড়চোখে তিনি সবই লক্ষ্য করছেন। মহারাজ ভালুদি আর ভীমসেন দৃষ্টি বিনিময় করলেন। এখন এখানে আবেগের প্রশ্ন চলে এসেছে। আর মানুষ সবচেয়ে ভয়ংকর সিদ্ধান্তগুলো আবেগ থেকেই নেয়। মহারাজ ভালুদিকে ইশারা করলেন ভীমসেন। ইশারার মানে ধরতে পারলেন মহারাজ ভালুদি।

'মন্ত্রী ভেরাপ্পন। আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমরা একটু আসছি। খুব বেশি বিলম্ব হবে না।'

পাশের একটু দূরের একটা কক্ষে এসে বসেলেন দুজনে। মন্ত্রী ভীমসেনের এবার মন্ত্রণা দেওয়ার পালা, 'মহারাজ আপনি আলোচনায় নিজের জেদকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। আর তা করতে গিয়ে মন্ত্রী ভেরাপ্পনকে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই অপমান করে ফেলেছেন। তার ফলাফলটাও একটু ভাবুন।'

'কী ফলাফল?'

'আমাদের কাছে গুপ্তচর খবর আছে, চেরা বাহিনী অনেক শক্তিশালী। চোলাদের বাহিনী এমনিতেই তাদের চেয়ে ছোটো। তার ওপর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এগারো ভূমি অধিকারীর বাহিনী। এখন যদি আমাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই চেরা রাজ্য চোলার রাজ্যকে পরাজিত করে তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে একবার ভাবুন। ওদের উদ্দেশ্য তো তাহলে এমনিতেও পূরণ হবে, অমনিতেও পূরণ হবে। আমাদের সাহায্য ছাড়াই যদি পূরণ হয় তখন কিন্তু মন্ত্রী ভেরাপ্পন আজকের এই অপমানের কথা ভুলে যাবেন না। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন যদি?'

'কিন্তু, তাই বলে কি একেবারে ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেবো? মাথা তুলে দাঁড়াবার এমন সুযোগ তো বারবার আসবে না। আর অধিকার আদায় করার সময় প্রদানকারীকে একটু চাপ দিতেই হয়। এটাই নিয়ম।'

'মহারাজ, সেটা তো অন্যভাবেও করা যায়। আমরা একটু অন্যরকম ভাবে চাপ প্রয়োগ করতে পারি, যাতে মন্ত্রী ভেরাপ্পন অপমানিত বোধ না করেন। তাতে আমাদের দুই কূলই রক্ষা পাবে।'

'কিন্তু সেরকম কোনো মধ্য পন্থা তো আমার মাথায় আসছে না। আপনার মাথায় কি কোনো পথ আসছে?'

'না মহারাজ আসছে না। তবে সেটা কোনো সমস্যা নয়। আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ভার ভেরাপ্পনের ওপরেই ছেড়ে দেবো। তাকেই এখন মধ্য পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। যাতে তার মান সম্মান বেঁচে যায়, আর আমাদের অধিকার রক্ষা পায়। এবার ফিরে গেলে মন্ত্রী ভেরাপ্পনের সাথে একটু নরম স্বরে কথা বলবেন।'

'ঠিক আছে। তেমনই হবে।'

মহারাজ ভালুদি আর ভীমসেন আবার ফিরে এলেন মন্ত্রণাকক্ষে। ভেরাপ্পনের চেহারা এখনো বদলায়নি। সেখানে বিষণ্নতা এখনো আছে।

মহারাজ ভালুদি সময় ক্ষেপণ করলেন না, 'আমি আর আমার মন্ত্রী আলোচনা করে এলাম। বলতে গেলে আমাদের হাতে কোনো উপায় নেই। এখন এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথ আপনাকেই বলে দিতে হবে। এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে দুপক্ষেরই স্বার্থ থাকে। কেউ যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে।'

ভেরাপ্পনের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তবে ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি হয়ে উঠেছেন তিনি। এবার মাছের মুখে বড়শি ঠিকমতো গেঁথেছে।

দুপক্ষকেই একসাথে জিতিয়ে দেওয়া পৃথিবীর কঠিন কাজগুলোর একটি। চিন্তিত একটা ভঙ্গি ধরলেন ভেরাপ্পন, তার ভ্রু কুঁচকে এলো, 'আর মাত্র চারদিন পরে মহারাজ উথিয়ান তার সম্মিলিত সেনাবাহিনী নিয়ে চোলা রাজ্যের দিকে যাত্রা করবেন। চোলা রাজ্যের দক্ষিণ দিক দিয়ে চোলা রাজ্যে প্রবেশ করবে তার বাহিনী। আপনাদের এখান থেকে চোলা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে সৈন্যে পৌছতে কয়দিন লাগবে?'

'বড়োজোর সাত দিন।'

'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। আর আমাদের রাজ্য থেকে সৈন্য চোলার দক্ষিণ সীমান্তে পৌছতে লাগবে পনের দিন। এই পনের দিনের মধ্যে আপনাদের যেভাবেই হোক দক্ষিণ সীমান্তে পৌছতে হবে। নইলে মহারাজ উথিয়ান আপনাদের ওপর অনেক রুষ্ট হবেন।'

'আমি জানি মন্ত্রী ভেরাপ্পন' বললেন মাহারাজ ভালুদি, 'কিন্তু আমি তো আমার পাওনা বুঝে না ফেলে সেনা বেরই করবো না।'

'তা অবশ্য এরই মধ্যে আমাকে বলেছেন।'

'হ্যাঁ, এবং আমার দাবি ন্যায়সঙ্গত বলেই আমার বিশ্বাস। এখন সবকিছুই আপনার হাতে। আপনি এমন একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন, যাতে আমরা আমাদের পাওনা পেয়ে যাই, আর মহারাজ উথিয়ান আমাদের ওপর কিছুতেই রুষ্ট না হন।'

'চিন্তা করে দেখতে হবে' ভ্রুর কুঁচকানো আরও বাড়ালেন মন্ত্রী ভেরাপ্পন। অবশ্যই ইচ্ছে করে। তারপর মুখ তুললেন, 'মহারাজ, আমার মাথায় বোধহয় আপনার দাবি পূরণ করার একটা উপায় এসেছে।'

মহারাজ ভালুদি আর মন্ত্রী ভীমসেন দুজনেই বেশ উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'শুনুন, মহারাজ। আপনি তো চাচ্ছেন বাণিজ্যিক স্বাধীনতা। এবং এই স্বাধীনতা কোনোভাবেই স্বাভাবিক অবস্থায় মহারাজ উথিয়ান আপনাকে দেবেন না। এইজন্য আপনাকে মহারাজ উথিয়ানকে কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধতে হবে। একবার মন থেকে আপনার ওপর কৃতজ্ঞ হলে মহারাজ উথিয়ান অবশ্যই যে করেই হোক আপনাকে প্রতিদান দিতে চেষ্টা করবেন। আর তখনই আপনি আপনার দাবি সহজেই পূরণ করতে পারবেন।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি কীভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধবো?'

'কাজটা কঠিন। আপনার সাহায্য ছাড়াই আমাদের বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী। শুনতে আপনাদের অনুকূলে না শোনালেও এটাই সত্যি কথা। আমাদের পক্ষে এগারো ভূমি অধিপতির সৈন্য আছে। সেই সাথে চোলাদের সেনাদলের মন্ত্রী পক্ষের বিদ্রোহী সেনারাও আছেন আমাদের পাশে।'

'হ্যাঁ, এসব কিছুই ব্যাপারটা আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। মহারাজ উথিয়ান আমাদের ওপর কৃতজ্ঞ হবার কোনো কারণ নেই। তাকে সাহায্য করার অনেকেই আছে।'

'আছে মহারাজ। আপনাদের শক্তি কম না। আপনি কেবল একটাই কাজ করবেন। মহারাজ উথিয়ান যখন তার সেনাবাহিনী নিয়ে চোলায় প্রবেশ করবেন, তখন আপনিও তাকে অনুসরণ করবেন। তবে মনে রাখবেন, আপনার সেনাবাহিনী যেন সবসময় চেরা বাহিনীর সাথে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে। এক দিনের মতো দূরত্ব রাখলেই চলবে। সময় আসার আগ পর্যন্ত আপনি মূল যুদ্ধে অংশ নেবেন না।'

প্রস্তাবটা শুনে মহারাজ ভালুদির চোয়াল ঝুলে পড়েছে, 'এসব কী বলছেন? মহারাজ উথিয়ান যদি আমাদের দেরি হবার কারণ অনুসন্ধান করেন? যদি দূত পাঠান আমাদের খোঁজে? তখন আমরা কী জবাব দেবো?'

'দূতকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে একশো একটা কারণ থাকবে। সেখান থেকে যুতসই একটা কারণ বলে দিলেই চলবে। বিপদের অভাব কখনোই হয় না এই পৃথিবীতে। সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়ে আছে তারা।'

'কিন্তু তাহলে আমরা কি শুধু এড়িয়ে যাবো? আমরা মূল যুদ্ধে কখন অংশ নেবো?'

'মহারাজ, চেরা রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া আমার উচিত হচ্ছে না। এটা রীতিমতো রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। তবু আপনার সাথে আমার অতীত সম্পর্কের কথা ভেবে আমি বলছি।

আমাদের সৈন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। তবে আপনারা যদি যোগ না দেন তাহলে চেরা বাহিনী আর চোলা বাহিনীর সৈন্যের পার্থক্য হবে আঠারো-বিশ। তখন যুদ্ধ করবে দুপক্ষই বেশ ভালো করে। আর যুদ্ধ সম্পর্কে আমি ঠিক যেটুকু জানি তাতে চেরা বাহিনী সবসময় জিতবে না। কোনো না কোনো সময় তাদের খারাপ সময় আসতেই পারে। এবং সেই খারাপ সময়েই আপনাদের বাজিমাত করতে হবে।

মহারাজ উথিয়ানের তখন প্রায় অসহায় অবস্থা হবে। আর ঠিক তখনই আপনারা সেনা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এসে হাজির হবেন। আর আমিও সেই সুযোগে তাকে

আপনাদের প্রস্তাবের কথাটা বলবো। তখন সেই অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য মহারাজ উথিয়ান কিছুতেই আপনাদের প্রস্তাব ফেলতে পারবেন না। তাকে মেনে নিতেই হবে। এটাই আমার মতে একমাত্র এবং সবচেয়ে ভালো উপায়। এই চালটা দিতে পারলেই কাজ হবে। তবে চালটা অবশ্যই হতে হবে বেশ হিসেবি।'

এবার হাসি ফুটলো ভেরাপ্পনের সামনে বসে থাকা দুজনের ঠোঁটে। ভীমসেন মত দিলেন, 'এই বুদ্ধিটা একেবারে মোক্ষম। এবার আপনার কথায় আমরা রাজি।'

'তাহলে এই কথাই রইলো। আপনাদের সীমান্তে পনের দিনের মধ্যেই চেরা বাহিনী চলে আসবে। আর আপনারাও আপনাদের বাহিনী নিয়ে অনুসরণ করবেন। ঠিক এক দিনের দূরত্ব বজায় রেখে। দেখবেন কখনো যেন তার চেয়ে বেশি পিছিয়ে না যান।'

'ঠিক আছে মন্ত্রী ভেরাপ্পন। আপনার পরামর্শের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি এবার দুজনের উদ্দেশ্যই সফল হবে।'

এরপরে পান্ড্য রাজ্যের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে খুব একটা সময় লাগলো না ভেরাপ্পনের। সিংহ দুয়ার পেরিয়ে আসতেই তার মুখে এতক্ষণ মনে চেপে রাখা হাসিটা দেখা দিলো। সেখানে কোনো চিন্তার ছাপ নেই, কেবলই সফল হবার আনন্দ। যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তিনি পান্ড্যতে এসেছিলেন, তা পুরোপুরি সফল হয়েছে।

আজ অসিতের ধনুক হাতে নেবার দিন। সকাল সকাল প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সে উঠানে দাঁড়িয়ে পড়লো। সর্ব কলার শ্রেষ্ঠ কলা শিখতে তর সইছে না তার।

রুদ্রদেব শিষ্যের উত্তেজনা বুঝতে পারছে। উত্তেজনার দরকার আছে এসবে। তবে গুরুর কাজ হচ্ছে ছাত্রের উত্তেজনাকে কোনোভাবে ছাত্রের আগ্রহ বানিয়ে দেওয়া। উত্তেজনা হুট করে উপশম হয়, কিন্তু আগ্রহ উবে যেতে অনেক সময় লাগে।

'শোনো, একটু স্থির হও। শিক্ষার সময় ধনুক হাতে নেবার পর সবার প্রথমে কী করতে হবে জানো?'

মাথা নাড়লো অসিত। জানে না।

'প্রথমে ছিলা বাঁধতে শিখতে হবে। তুমি তো ছোটোবেলায় ধর্মশাস্ত্র পড়েছ। আমাদের ধর্ম শাস্ত্র তো শুধু শাস্ত্র নয়, এটা আমাদের ইতিহাসও বটে। আমাদের ইতিহাসে ধনুক নিয়ে সবচেয়ে বড়ো দুটো ঘটনার কথা মনে করো।'

রুদ্রদেবের কথা প্রথমে ধরতে পারেনি অসিত। কোন দুটো ঘটনার কথা বলছে রুদ্রদেব? তবে একটু চিন্তা করতেই রামায়ণ আর মহাভারতের ছোটোবেলার পাঠ মনে পড়লো তার, 'হ্যাঁ, আমি জানি। রামায়ণে আছে, রামচন্দ্রের হরধনু ভাঙ্গার কথা। সীতাকে বিয়ে করার স্বয়ংবর সভায় রামচন্দ্র হরধনু ছিলা বাঁধতে গিয়ে হরধনু ভেঙ্গেই ফেলেছিলেন।'

'আর দ্বিতীয় ঘটনা?'

'মহাভারতে অর্জুন। এখানেও স্বয়ংবর। একটা ধনুকে ছিলা লাগিয়ে তির জুড়ে ছুঁড়ে দিতে হবে। তারপরে সেই তির যদি ওপরে ছোটাছুটি করতে থাকা মাছের চোখে লাগে তাহলে ধনুকধারী জিতবে। আবার সেই তির ছুঁড়তে হবে সম্পূর্ণ নিচের জলে মাছের ছায়া দেখে।'

'বাহ, তোমার মনে আছে দেখছি। আমার তো মনে হয়েছিল আমাকে আবার পুরো ঘটনা তোমাকে ভেঙ্গে বলতে হবে।'

একটু ফুলে উঠলো অসিতের বুক।

'একটা কথা তো বুঝতে পেরেছ। দুটো ঘটনাতেই স্বয়ংবর সভা হয়েছিল। আর বীরত্ব দিয়ে সুন্দরী কন্যা জয় করার আনন্দই আলাদা। এই দুই কাহিনির ভেতর আনন্দ ছাড়া আর কিছু বুঝতে পেরেছিলে? বলো তো, কেন দুটো ক্ষেত্রে বীর নির্ণয়ের জন্য ধনুককেই বেছে নেওয়া হলো?'

'কারণ ধনুর্বিদ্যা যুদ্ধ কলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।'

'বাহ্, এইতো বুঝতে পেরেছ। এবার বলো তো, কীসের জোরে অর্জুন আর রামচন্দ্র কন্যা জয় করেছিলেন?'

'এটা তো বেশ সোজা। এখানে বোঝার কী আছে? তাদের শক্তি বেশি ছিল তাই তারা কন্যা জয় করেছিল।'

'হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু এটাই সবাই দেখে। এই দুই ঘটনার সূক্ষ্ম শিক্ষা সবাই এড়িয়ে যায়। তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দুই জায়গাতেই ধনুক খালি পড়েছিল।

প্রতিযোগিতার শর্ত ছিল, প্রথমে ধনুক তুলতে হবে। তারপর তাতে ঠিকমতো ছিলা বাঁধতে হবে। আর সবার শেষে ছুঁড়তে হবে তীর।'

'হ্যা, সেখানে অর্জুনের তির ছোঁড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু রামচন্দ্রের সে ভাগ্য হয়নি। ধনুক ভেঙ্গে কাত হয়ে গেছে।'

'ঘটনা তো বেশ ভালোই মনে আছে। এখন বলো, এই দুই মহা ক্ষত্রিয়ের থেকে ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে?'

এবার চুপ করে রইলো অসিত। গল্প শুনে মনে রাখ যায়, মাঝে মাঝে সেই শোনা গল্প আরেকজনের কাছে বলাও যায়, কিন্তু গল্পের ভেতরের শিক্ষা বুঝতে পারা অত সহজ ব্যাপার না।

'শোনো, ক্ষত্রিয়রা এসব গল্প থেকেই ছোটোবেলা থেকে যুদ্ধবিদ্যা শেখে। ক্ষত্রিয়দের প্রথমে ধনুকের ওজন হাতে সইয়ে নিতে শিখতে হয়। যা রামচন্দ্র ছাড়া আর কেউই পারেননি। তারপর বাঁধতে হয় ছিলা। যা করতে পেরেছিলেন অর্জুন। আর সবশেষে হচ্ছে তির ছোঁড়া। তাই তুমি যদি মনে করে থাকো, প্রথমেই ধনুকে তির জুড়ে যেদিক ইচ্ছা সেদিক ছুঁড়বে তাহলে তুমি সঠিক পথে হাঁটছ না।'

'ধনুকের ওজন কি আমি হাতে নিতে পারবো?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় পারবে। নয়তো তোমাকে তো ধনুক শিক্ষা দেবার চিন্তা করতাম না।'

'তারপরে ছিলা বাঁধতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। ধনুকে প্রতিদিন ছিলা বাঁধার দরকার কী? একদিন ঠিকমতো বেঁধে বাকি জীবন সেই ছিলা দিয়ে কাজ করলেই হয়। একেবারে তৈরি ধনুক। যখন তখন ব্যবহার করলেই হলো। প্রতিদিন লাগানো আর খোলার যুক্তি কী?'

'বা বেশ বলেছ। কেন ক্ষত্রিয়রা এত বোকার মতো প্রতিদিন কষ্ট করে? একবার লাগালেই তো হলো।'

'তাই তো বলছি।'

'আচ্ছা, চলো, এসব ব্যাপারে আমাদেরকে কথাবার্তা বলার চেয়ে কাজ করলেই শিখতে বেশি সুবিধা হবে। চলো, একটু মল্লযুদ্ধ চর্চা করি।'

মল্লের বেশ কিছু প্যাঁচ এর মধ্যেই শিখে ফেলেছে অসিত। খালি হাতের যুদ্ধে ওসব বেশ কাজে লাগে। সেগুলো চর্চা করতেও মন্দ লাগে না।

কিন্তু আজ রুদ্রদেবের মনের ইচ্ছে আলাদা। মল্লের ক্ষেত্রে নামতেই আচমকা এক হ্যাচকা প্যাঁচে অসিতকে মাটিতে ফেলে দিলো সে। অসিতের দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসছে। সে মল্লযুদ্ধ সম্পর্কে যেটুকু জানে, তার থেকে তার এই জ্ঞান হয়েছে, এই প্যাঁচ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না।

'অসিত, এবার কী করবে? আমার প্যাঁচ তো খুলতে পারবে না। এখন তোমার কী করণীয়? চিন্তা করে দেখো আমি কী শিখিয়েছিলাম তোমাকে।'

মনে পড়লো অসিতের। মল্লযুদ্ধে যদি কখনো প্রতিপক্ষ মরণ প্যাঁচ খেলে তবে তা খোলার চেষ্টা না করে পাল্টা তার ওপরেও ওরকম একটা শক্ত প্যাঁচ কষতে হবে। তবেই হবে সাম্যাবস্থা।

অসিত অনেক কষ্টে মনে করে একটা প্যাঁচ কষলো। রুদ্রদেবের গলা পেঁচিয়ে ধরলো সেই প্যাঁচ। তবে তেমন একটা জোর পাওয়া যায়নি। রুদ্রদেবের গলায় প্যাঁচ পড়লেও তার কথা বলতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না, 'এই অবস্থায় আমরা দুজনেই যদি বেশিক্ষণ থাকি তাহলে কী হবে?'

অসিতের গলার জোর একটু কমে এসেছে, 'আমার হাত ভেঙ্গে যাবে। আর আপনার ঘাড় মটকে যাবে।'

একটু হাসল রুদ্রদেব, 'প্রথমে কোনটা ঘটবে?'

'আমার হাত ভাঙ্গবে।' স্বীকার করতে বাধ্য হলো অসিত।

'ঠিক বলেছ। কিন্তু কথা হচ্ছে কেন ভাঙ্গবে? কারণ কী?'

'আরে, এটা আবার কেমন কথা। হাতের ওপর চাপ পড়লে হাত ভাঙ্গবে না।'

রুদ্রদেব অসিতকে ছেড়ে দিলো। নিজেকেও ছাড়িয়ে নিলো সে, 'যাক, তাহলে বুঝতে পেরেছ। যদি তোমার হাতের ওপর চাপ পড়তে তোমার হাত ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়, তাহলে ছিলা বাঁধা অবস্থায় ধনুকের ওপর যে চাপ পড়বে তাতে ধনুকের শক্তি অবশ্যই কমে যাবে। এমনকি ভেঙ্গেও যেতে পারে।'

এবার বুঝতে পারলো অসিত। তাই তো।

'ধনুক দুর্বল হয়ে গেলে তির আর নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না। তখন ঐ ধনুক আর যোদ্ধার কোনো কাজে আসবে না।'

মল্লস্থান ত্যাগ করলো রুদ্রদেব, 'উঠে এসো। তোমার প্রশ্নের উত্তর আশা করি পেয়ে গেছো। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, জড়দেহ হোক আর জীবদেহ, চাপে থাকলে তার শক্তি অবশ্যই কমে যাবে। সেই চাপ শারীরিকও হতে পারে আবার মানসিকও হতে পারে। এজন্যই প্রয়োজন ছাড়া শরীর এবং মনকে কখনো চাপে পড়তে দেবে না। চলাচলের সময় অযথা বাঁকা পথে যাবে না। সবসময় সরল পথে চলাচল করবে।'

অসিত আবার ধনুক হাতে নিলো। নির্দেশ দিলো রুদ্রদেব, 'এবার ধনুকে ছিলা বাঁধা চর্চা করো। ধনুক তোলার শক্তি তোমার বাহুতে চলে এসেছে। তুমি নিজেও সেটা অবশ্যই বুঝতে পারছো। এবার ছিলা ঠিকমতো বাঁধতে আর খুলতে পারলেই তীর ছোঁড়া শুরু করতে পারবে।'

তবে রুদ্রদেব, ফাঁকিবাজ গুরু, যাদের আমরা প্রতিনিয়ত পাঠশালায় দেখি, যারা ছাত্রকে অংক কষতে দিয়ে নিজে সুখে নিদ্রা যায়, তেমন গুরু নয়। সে শুধু আদেশ নির্দেশেই আবদ্ধ থাকলো না। কীভাবে ধনুকের নানা কাজের জন্য নানা রকম ছিলা বাঁধতে হয় তা একেবারে হাতে কলমে শিখিয়ে দিতে লাগলো অসিতকে। একেকটা কৌশল অসিত যতক্ষণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করছে ততক্ষণ সে নিবিড় মনোযোগ দিলো শিষ্যের প্রতি। এরপরে অসিত একেকটা কৌশল অনুশীলন করতে লাগলো, আর একটু দূরে বসে বসে তা নিরীক্ষণ করতে লাগলো রুদ্রদেব।

অসিত ধনুক তুলতে শিখেছে সত্য। তবে ধনুক তুলতে পারা আর ছিলা বাঁধতে পারা এক কথা না। ছিলা বাঁধতে হলে এক হাতে ধনুককে উলম্ব অবস্থানে দাঁড় করাতে হয়। তারপর ওপরের অংশ হাত দিয়ে চেপে ধরে বাঁকিয়ে আনতে হয় নিচের দিকে। একই সাথে ছিলাকে টেনে ওপরের পাশের ধনুকের খাঁজে আটকে দিতে হয়। এক প্রান্ত মাটিতে রেখে আরেক প্রান্ত বাঁকাতে অসিতের ঘাম ছুটে গেল। তবে অনেক কষ্ট হলেও সমর্থ হলো অবশেষে। ধনুকের প্রান্তে ঠিকভাবেই জড়িয়ে এলো সুতো।

রুদ্রদেব একটু মনোযোগ দিয়েই দেখছিল। শিষ্যের উন্নতিতে প্রকৃত গুরু সবসময় আনন্দিত হন। অসিতের উন্নতিতে সে সন্তুষ্ট। এবার আসল বিদ্যা দান শুরু করা যেতে পারে।

রুদ্রদেব এবার পরের উপদেশে গেল, 'ছিলার মধ্যভাগ চিহ্নিত করা হচ্ছে তার পরের কাজ। প্রতিবার বাঁধার পরেই এই কাজটা তোমাকে করতে হবে। মধ্যভাগ চিহ্নিত না করতে পারলে সঠিক লক্ষ্যে তীর বেঁধাতে পারবে না। কোন ভাগে তীর জুড়তে হবে তা লক্ষ্য, লক্ষ্যের উচ্চতা, নিক্ষেপণ কোণ আর ছিলার মধ্যভাগের ওপরেই নির্ভর করে। কাজটা করার জন্য তুমি এখন যন্ত্রের সাহায্য হয়তো নিতে পারো। তবে আসল কাজের সময় তুমি কোনো যন্ত্র পাবে না। তাই কাজটা করতে হবে তোমাকে সম্পূর্ণ চোখের আন্দাজে, অবশ্যই খুব নিখুঁতভাবে।'

ছিলার মধ্যভাগ নির্ণয়ের কাজটা অত কঠিন নয়। শুধু কৌশলটা জানতে হবে। অসিত সহজেই শিখে নিতে পারলো।

'এবার তির পরাও।'

অসিত রুদ্রদেবকে অনেকবার ধনুকের ছিলায় তির পরাতে দেখেছে। সেই দেখে শেখা বিদ্যাই এবার কাজে লাগলো। মোটামুটি নিখুঁতভাবেই সে তির পরালো ধনুকে। রুদ্রদেব দেখে নিলো, 'ঠিক আছে।'

এবার তীরের গতিবিদ্যা শিক্ষা দেবার পালা। এটাই ধনুর্বিদ্যার সবচেয়ে কঠিন অংশ। এই বিদ্যা মুখে বলে কোনোভাবেই শেখানো যায় না। অনেক অনুশীলন করার পরেই এই ক্ষমতা যোদ্ধার নিয়ন্ত্রণে আসে।

'খাড়া ওপরের দিকে অথবা ওপর থেকে নিচের দিকে কোনো লক্ষ্যভেদ করতে হলে কোনো সমস্যা নেই। তখন ধনুক লক্ষ্যের দিকে সোজা রেখে ছুঁড়ে দিলেই হলো। তখন তির থাকবে ভূমির সাথে লম্ব করে। প্যাঁচটা লাগবে যখন তুমি তোমার সোজা অথবা কৌণিক দিকে ওপরে অথবা নিচে কোন লক্ষ্য ভেদ করতে যাবে। যুদ্ধে এই কাজটাই তোমাকে সবচেয়ে বেশি করতে হবে। তখন ধনুকের বেশ কঠিন একটা নীতি প্রয়োগ করতে হয়।'

'কী?' অসিতের সাগ্রহ প্রশ্ন।

'নিক্ষেপ কোণ। লম্ব ছাড়া অন্য যে-কোনো দিকে তির ছুঁড়তে হলে তোমাকে এই নিক্ষেপ কোণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। উড়ন্ত সবকিছুরই মাটিতে পড়ে যাবার একটা প্রবণতা আছে সেটা তো জানোই। তুমি যদি নিক্ষেপ কোণ না ঠিক করে কারো বুকে তির মারো তাহলে দেখবে তীর তার পায়ের কাছের মাটিতে গিয়ে বিঁধেছে। এজন্যই তোমাকে তির ছুঁড়তে হবে একটু ওপরে। অবশ্য আমি যতই বলি, এটা তোমাকে তির ছুঁড়ে ছুঁড়েই শিখতে হবে। এখন সেসব থাক। আপাতত কাছের লক্ষ্যেই তির ছোঁড়ার অনুশীলন করো।'

এরপর আরও কিছু উপদেশ দিলো সে অসিতকে। কেন নৃত্যের সময় তাকে হাতের এবং আঙুলের মুদ্রাগুলো শিখতে হয়েছিল তাকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলো অসিত। তির আকর্ষণ করার কাজে এই মুদ্রাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

বিশ হস্ত দূরের একটা গাছে লক্ষ্য স্থির করে দিলো রুদ্রদেব। গাছের গায়ে বেশ বড়ো একটা বৃত্ত আঁকা হয়েছে। তির ছোঁড়ার আদেশ দিলো অসিতকে। অসিত প্রথম থেকে শুরু করে সব নিয়ম মেনে নিয়ে তির ছুঁড়ল। এবং পাশের গাছে গিয়ে বিঁধল সেই তির।

লজ্জায় অসিতের মুখ লাল হয়ে গেলেও রুদ্রদেব বাহবা দিলো তাকে, 'বাহ, বেশ ভালো করেছো। প্রথমবারেই বেশ কাছাকাছি গেছে। মনে হচ্ছে তুমি ধনুর্বিদ্যায় বেশ ভালো করবে।'

সব প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান হয়ে গেছে। বাকিটুকু অসিতকে নিজের থেকেই শিখতে হবে। অসিত সেগুলো এক এক করে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুশীলন করলো। শেষ পর্যন্ত অনেকবার ছোঁড়ার পর লক্ষ্যের বৃত্তে দুটো তির বিঁধলো।

'এক দিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে' রুদ্রদেব মত দিলো, 'এবার তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। কাল আরও গভীর প্রশিক্ষণ হবে।'

'আপনি ঘরে যাবেন না?' ছিলা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো অসিত। এবার আর ধনুক বাঁকাতে তার অতটা কষ্ট হলো না।

'না, তুমি আজকে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছো। তোমার এখন কিছুটা বিশ্রাম দরকার। আমি তো কেবল বসে বসে তোমাকে উপদেশ দিয়েছি। এবার আমি জংগলের ভেতরে যাই। একটু হাত পা চালিয়ে আসি।'

আপত্তি করলো না অসিত। এখন তার জঙ্গলে রুদ্রদেবের সাথে না গেলেই ভালো হয়। তার শরীর আসলেই আর চলছে না।

রুদ্রদেব জঙ্গলের দিকে রওনা দিলো। কালকের মতো আজকেও ধনুকের গোপন বিদ্যা চর্চা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। অসিতের সামনে সেটা কোনোভাবেই করা যাবে না। শুধু অসিত কেন, এই বর্তমান পৃথিবীর কারো সামনেই এই বিদ্যা প্রয়োগ করা যাবে না।

বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সে এরই মধ্যে। সে জানে, আরও অনেকবার তাকে চেষ্টা করতে হবে, অনেক বার ব্যর্থ হতে হবে। শরীরের চেয়ে মনকে বশে আনা বেশি কঠিন। শুধু মন্ত্র শুদ্ধ উচ্চারণে আওড়ালেই চলবে না। মনের সাথে ধনুকে উৎপন্ন রশ্মির সমন্বয় করতেই হবে।

আজকেও শুধু ধনুক নিয়ে এসেছে সে জঙ্গলে। দেরি করলো না। সময় হাতে বেশি নেই। মন্ত্র পড়ে ছিলায় টান দিলো সে। আজকেও কালকের মতো রশ্মি দেখা দিলো তিরের আকারে। তবে ছিলাতে টান বাড়াতে থাকার সাথে সাথে সেই রশ্মি মিলিয়ে গেল।

না, যদিও ক্রোধ এবং নিজের প্রতি অবিশ্বাস মনের গভীর থেকে উঠে আসতে চাইছে, কিন্তু তাকে পাত্তা দেওয়া চলবে না। আচমকা উপায়টা মনে পড়ে গেল তার। একটা বিশেষ যোগের আসন আছে। বীরভদ্রাসন। এই আসনে মনোযোগ বেশি দেওয়া যায়। এক লহমায় সেই আসনে চলে গেল সে। আসনে দাঁড়িয়েই এবার উচ্চারণ করলো মন্ত্র। জ্যা আকর্ষণ করলো ধীরে ধীরে। এবার আর রশ্মি শুরুতেই মিলিয়ে গেল না। এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ তিরের আকার ধারণ করবে সেই রশ্মি। চোখের সামনে দিব্যাস্ত্র হাতের ধনুকে ফুটে উঠতে দেখে আনন্দিত হলো রুদ্রদেব। ভেতর থেকে হাসি বেরিয়ে এলো।

তবে সুখ-দুঃখ দুটোই মানুষের ক্ষেত্রে একটা কাজ করে। তার স্বাভাবিক অবস্থা ভুলিয়ে দেয়। এখানেও তাই হলো। আনন্দের আতিশায্যে রুদ্রদেব অস্ত্র সংবরণ করতে ভুলে গেল। জঙ্গলের ভেতরে লক্ষ্যহীন হয়ে ছুটে গেল দিব্যাস্ত্র।

রুদ্রদেবের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে ছুটে গেল সেই রশ্মিযুক্ত দিব্যাস্ত্র। জঙ্গলের গভীরে গিয়ে অদৃশ্য হলো। তবে অদৃশ্য হবার আগে নিজের শক্তি ছড়িয়ে দিতে ভুল করলো না তা। আলোর ঝলকানির বিস্ফোরণে পুরো জঙ্গল যেন দিনের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। যদিও খুব বেশি সময়ের জন্য না, তবে মানুষের চোখে পড়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। শব্দ তেমন একটা হলো না। শুধু একটা ঝিম ধরা কম্পন ছড়িয়ে গেল চারিদিকে।

এখনও বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রদেব। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো উচিত হয়নি। এই জঙ্গল যদিও জনমানবশূন্য। তবে বলা যায় না, কেউ কোনো কাজে এখানে আসতেও পারে। কারোর চোখে পড়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। যেমন একটা ঝলকানি দেখালো অস্ত্র।

রুদ্রদেবের আশঙ্কা মিথ্যে হলো না। কেউ না দেখলেও একজনের চোখে পড়ে গেছে এই আলো। অসিত বিশ্রাম নিচ্ছিল ঘরের ভেতরে। তখনই তার মনে পড়েছে জল খাবার পাত্রটা বাইরে রয়ে গেছে। একটু তৃষ্ণা মেটানো দরকার। সেই কাজেই বাইরে এসেছিল সে। তখনই সে যে দৃশ্য দেখতে পেলো তাতে আরেকটু হলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতো সে। কিন্তু এতদিনের অনুশীলনে শরীর আর মন শক্ত হওয়াতে তা হয়নি। আচমকা জঙ্গলের ভেতর তীব্র আলো দেখতে পেলো সে। এক পলের জন্য। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল সেই আলো।

অজ্ঞান হবার মতো না হলেও ভয় ভালোই পেয়েছে অসিত। এমন রঙের আলো আগে কখনো দেখেনি সে। তখনই তার মনে পড়লো, জঙ্গলের ভেতর কিছুক্ষণ আগেই গিয়েছিল রুদ্রদেব। না, ব্যাপারটা সুবিধার না। তার কোনো বিপদ হলো না তো?

ক্রমাগত দুশ্চিন্তা জেঁকে বসতে থাকে তার মাথায়। না, ঘরে বসে থাকলে চলবে না। রুদ্রদেবকে খুঁজতে জঙ্গলে যাওয়া দরকার। একটা মশাল জ্বালিয়ে নিলো সে। ঐ আলোর ভয় এখনও তার মনে থেকে চলে যায়নি। জঙ্গলের দিকে যেতেও ভয় লাগছে।

শেষ পর্যন্ত ভয়ের সাথে লড়াইয়ে জয়ী হলো সে। জঙ্গলের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার ঠিক মুখেই দেখা হয়ে গেল রুদ্রদেবের সাথে।

তাকে দেখে অসিতের মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা, 'আপনি কি ঠিক আছেন?'

মশালের আলোয় অসিতের মুখের উদ্বিগ্ন ভাব নজর এড়ালো না রুদ্রদেবের। অসিত নিশ্চয়ই ঐ আলো দেখেছে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। কী হয়েছে?'

'জানি না। জঙ্গলের ভেতরে তীব্র আলো দেখতে পেলাম। জ্বলেই আবার নিভে গেল। আমি এমনটা আর কখনো দেখিনি।'

মুখে কোনো অনুভূতি ফুটে উঠলো না রুদ্রদেবের, 'জঙ্গলের ভেতর মাঝে মাঝে এমন অনেক কিছুই দেখা যায়। এসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। চলো, ঘরে যাই। এবার তোমার সাথে আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

৫২

মহারাজ কারিকালা সৈন্য সংখ্যায় তার প্রতিপক্ষের থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেন, তবে একটা ব্যাপারে তিনি একটু এগিয়েই আছেন। চেরা মহারাজের মতো সেনাকে প্রশিক্ষণ দিতে বাড়তি সময় লাগবে না তার। বাহ্যিক কোনো সেনাকে নিজের সেনাদলের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার কষ্টকর চেষ্টাও তাকে করতে হচ্ছে না। পান্ড্য সেনাবাহিনীর অবস্থাও জানা। তাদের মতো মহারাজ কারিকালার লেজে গোবর লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তার সেনাবাহিনী তৈরিই আছে। কয়দিন আগেই বেশ বড়োসড়ো একটা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তাদের। হোক তা গৃহযুদ্ধ, তবু তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকি তো লেগেছিল বেশ। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা কুচকাওয়াজের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই মন্ত্রী দলের সাথে যুদ্ধের পরেও সেই যুদ্ধের একটা আভাস রয়ে গেছে মহারাজ কারিকালার সেনাদের মাঝে।

কোনো সেনাদল যদি দিগ্‌বিজয়ে বের হয় তবে আরেকটা চর্চায় থাকা সেনাদলের সামনে পড়া পর্যন্ত তাদেরকে ঠেকানো বেশ কঠিন। তারা যুদ্ধের ভেতরেই থাকে, একটা যুদ্ধ শেষ করেই আরেকটা ধরে। সামনের সেনারা নিশ্চিন্ত থাকে। হঠাৎ করে যুদ্ধবাজ বাহিনীর সামনে পড়লে আর উপায় থাকে না। যুদ্ধে দক্ষতার পাশাপাশি সৈনিকদের অভ্যাস আর মনোভাব একটা বড়ো ভূমিকা রাখে।

শুরু থেকেই যে প্রশ্ন খোঁচাচ্ছিল তাকে তা এখনও খুঁচিয়েই যাচ্ছে মহারাজ কারিকালাকে। এখনও তার মন দুলছে দোটানায়। মন্ত্রী ইরাম মুখে কিছুই বলেননি, তবে তারও ভেতরে ভেতরে চিন্তাটা ভালোই চলছে।

যদিও আদপে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। তারা এখন যে অবস্থায় আছেন তাতে সাতবাহনের কথা মতো না চলে কোনো উপায় নেই। তাদেরকে সেনাবাহিনী নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগোতেই হবে। আর ঠিক তারপরেই গিরিধারীর নিজের কথা রাখার পালা। যদি গিরিধারী নিজের কথা না রাখেন তবে তাদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথই খোলা থাকবে না। সন্ধি হয়তো করা যায়, তবে দুর্বল হয়ে যদি সন্ধি করতে হয় তাহলে এমন সব শর্ত মেনে নিতে হবে যে সেগুলো মেনে নেওয়ার চাইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সহজ।

দক্ষিণ সীমান্ত থেকে সেদিনই রওনা দিয়েছেন দুজনে। এখন আর খবর সংগ্রহ করার দরকার নেই। খবর যা নেবার নেওয়া হয়ে গেছে। এবার কাজ করতে হবে। মাঠে নামতে হবে।

এখন মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম ঠিক প্রাসাদের সুউচ্চ ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। দুজনের দৃষ্টিই সামনের দিকে। কেউ কোনো কথা বলেননি অনেকক্ষণ।

এখান থেকে সেনাবাহিনীর পুরোটা দেখা যাচ্ছে। জগতের যে-কোনো চিন্তাতেই মহারাজ কারিকালা ব্যস্ত থাকুন না কেন এদিকে তাকালে তার সব চিন্তা উবে যায়। ক্ষণিকের জন্য সব সংকট ভুলে সেনাদলের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট গলায় নিজের মনে বলে উঠলেন তিনি, 'স্বয়ংসম্পূর্ণ আমার বাহিনী। সব নিয়ম মেনে চলে। যে-কোনো ব্যূহ

স্থাপনে এবং রক্ষণে দক্ষ। আমার সেনায় যেমন অস্ত্রভেদে দক্ষ সেনাও আছে তেমনি সর্ব রকমের অস্ত্রে যুদ্ধ করার মতো যোদ্ধাও কম নেই। একজন রাজা, একজন সর্বাধিনায়ক এমন সেনার অতিরিক্ত পৃথিবীতে আর কিইবা চাইতে পারে?'

ইরাম এই কথার কোনো জবাব দিলেন না। তাকে উদ্দেশ্য করে এই প্রশ্ন করা হয়নি। কারিকালার মুখে আবার সন্তুষ্ট বচন দেখা দিলো, 'প্রাসাদের মধ্যে এই জায়গাটা আমার সবচেয়ে পছন্দের। প্রাসাদের বলছি কেন, আমার তো মনে হয় এই পৃথিবীতে এই জায়গার চেয়ে আমার পছন্দের কোনো জায়গা থাকতেই পারে না।'

এবার আর চুপ থাকলেন না ইরাম, 'কেন? এই জায়গার প্রতি এত টান হবার তো তেমন কোনো কারণ দেখছি না।'

'আছে কাকা। সারা রাজ্যে একমাত্র এই জায়গাতে দাঁড়ালেই আমি আমার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ দেখতে পাই। দেখতে পাই আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি। আমার মনে হয় আমি পৃথিবীর যে-কোনো বাঁধা পেরিয়ে যেতে পারবো। আমার সম্পূর্ণ শক্তি একমাত্র এই জায়গায় দাঁড়ালেই আমি টের পাই।'

'তবে, আমি দেখে শুনে যা বুঝছি, তাতে এমন কোনো জায়গা না থাকলেই ভালো হতো।'

'কেন কাকা? এমন কেন বলছেন? আমার এই সজ্জিত বাহিনী দেখতে আপনার ভালো লাগছে না?' কারিকালা যেন একটু অবাক হন।

'মানে হচ্ছে, এমন কোন জায়গা যদি আদৌ না থাকতো তাহলে কতই না ভালো হতো। যদি এমন হতো আমাদের সেনাবাহিনীকে পৃথিবীর কোনো জায়গা থেকেই সম্পূর্ণ দেখা যায় না তাহলেই ভালো হতো। যদি আসলেই আমাদের বাহিনী এতটা বড়ো হতো।' দুঃখের সাথেই কথাটা বললেন ইরাম।

কথাটার মানে এতক্ষণে বুঝতে পারলেন কারিকালা। সাথে সাথে টের পাওয়া শক্তি উবে গেল তার। সন্তুষ্টির চিহ্ন চেহারা থেকে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

পেছনে একটা শব্দ হলো। শব্দ মৃদু কিন্তু এই শব্দের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। যুদ্ধক্ষেত্রের আইনে স্পষ্ট লেখা আছে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কখনো যেন নারীর প্রবেশ না ঘটে। যুদ্ধের ভেতরে নারী প্রবেশ অমঙ্গলজনক।

তবে নারীরা কি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনোই প্রবেশ করতে পারবেন না? হ্যাঁ, পারবেন। সূর্যাস্তের পরে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা আর নিহতদের সৎকারের কাজে সাহায্য করার জন্য নারীর প্রবেশের বিধান অবশ্য আছে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রী প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও সেই নারীর স্ত্রী-আচার সাথে নিয়েই যুদ্ধ যাত্রা করতে হয়। অন্দর থেকে নারীরা সেই দূতই পাঠিয়েছে। এখন মহারাজ কারিকালার স্ত্রী-আচারের সংস্কার পালন করতে হবে।

মহারাজ কারিকালা এবং মন্ত্রী ইরাম দুজনেই অন্দরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। ইরাম পরিবারের সদস্য বলে অন্দরে প্রবেশ করতে পারেন অনুমতি ছাড়াই। অনেক পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে অন্দরের মন্দিরে। সেই অন্দরের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন দুজনে। সপ্ত প্রদীপ বেশ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। সেই দীপের আভা গায়ে মাখলেন মহারাজ কারিকালা। তারপরে তার কপালে মঙ্গলা যজ্ঞ টিকা পরানো হলো। ইরামের কপালেও এঁকে দেওয়া হলো বিজয় টিকা। সকল অমঙ্গল দূরে যাক, আর চোলা রাজ্যের এই বিজয় যাত্রা বজায় রাখার প্রার্থনা করা হলো কুলদেবতার প্রতি।

স্ত্রী-আচারের পরে কুলগুরুর আশীর্বাদ নেবার পালা। দুজনেই পালা করে সেই কাজ শেষ করলেন। সাষ্টাঙ্গে কুলগুরুকে প্রণাম করে প্রাসাদ থেকে বাইরে পা রাখলেন মহারাজ কারিকালা। আজকেই তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

মহারাজ কারিকালা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ইরাম সহ সেনাদলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজকে যুদ্ধ সাজে দেখতে পেয়ে সৈন্যদের মধ্যে উল্লাস ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। মহারাজ কারিকালাই তাদের সেনাপতি। তারা সমস্বরে মহারাজের জয়ধ্বনি করলো। সবাই নিজ নিজ সেনাপতির ইশারায় গর্জন করে বুঝিয়ে দিলো, এই বাহিনী এখনই রওনা দিতে পারে।

সময় আগে থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। সৈন্যরাও সব আগে থেকেই জানতো। মহারাজ ইশারা দিতেই জোরালো শব্দে বেজে উঠলো রণ ভেরী। সেই ধ্বনির সাথে বেজে উঠলো অনেক মঙ্গল শঙ্খ। সেগুলোর কেউ কেউ সেনাদলের লোকেরা বাজাচ্ছে। নগরের কিছু উৎসাহী বাড়ি থেকেও ভেসে আসতে লাগলো শঙ্খধ্বনি। চারপাশ যেন সেই শব্দের নিনাদে কেঁপে উঠছে। শঙ্খধ্বনি কানে নিয়ে মঙ্গল মাখতে মাখতে সেনাবাহিনী নিয়ে নগর ত্যাগ করলেন কারিকালা।

নগর থেকে বেরিয়েই চক্রাকারে চারিদিকে দূত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রে রেখে কয়েক যোজন বিস্তৃত হয়ে চারপাশের খবর এনে দিচ্ছে একের পর এক। সেই খবরের ওপর ভিত্তি করেই মূল সেনাবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। মূল সেনাবাহিনীর সবার সামনে আছেন মহারাজ কারিকালা। এই সেনা পেছনে নিয়ে যুদ্ধ সাজে সাজলে, ঘোড়ার খুরের শব্দ, রথের শব্দের ক্যাঁচকোচ, ভেরী এসব শব্দ যেন তাকে মাতিয়ে তোলে। তিনি রাজা হতে পারেন তবে তা বংশানুক্রমে, ভেতর থেকে তিনি আসলে একজন যোদ্ধা, সর্ব কৌশলে নিপুণ, যুদ্ধে অকুতোভয় এক সেনাপতি।

ইরামের সঠিক পথ প্রদর্শনে বাহিনী ঠিক একদিন একরাত পার করে ভেন্নিতে এসে পৌছল। ভেন্নি সম্পর্কে মহারাজ কারিকালার পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। এই জায়গাতে আগে কখনো আসা হয়নি তার। পৌছেই পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটা একবার পাক দিলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

আর একবার দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ইরাম একেবারে সঠিক স্থান বেছে নিয়েছেন। মনে মনে ইরামের প্রশংসা না করে পারা গেল না। একেবারে সঠিক কথাই বলেছেন তিনি। ঘন কাঁটাঝোপ আর ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা মাঝখানে একটা লম্বাটে অপ্রশস্ত প্রান্তর। তারা যেদিকে শিবির স্থাপনের চিন্তা করছেন সেই জায়গা আছে একটু উঁচুতে। এখানেও তিনি একটু বাড়তি সুবিধা পাবেন।

ইরামের পাশে এসে ঘোড়া থামালেন কারিকালা, 'জায়গাটা আপনি ভালোই বেছেছেন কাকা।'

'হ্যাঁ, অনেক চিন্তা করেছি। গিরিধারী যেমন বলেছেন তেমনভাবে এরচেয়ে ভালো কোনো ক্ষেত্রের কথা আমার মাথায় আসেনি।'

'ঠিকভাবে সেনা সজ্জা করা গেলে এখানে আমাদের ছোটো সেনা দিয়েই ওদের বড়ো সেনাকে আটকে দেওয়া যাবে। আমরা লড়াই অন্তত করতে পারবো।'

'হ্যাঁ, লড়াই করতে পারবো। কয়েকদিন ওদেরকে হয়তো আটকেও রাখতে পারবো। কিন্তু যুদ্ধ জিততে পারা কষ্ট হয়ে যাবে। অভিজ্ঞতা, রণকৌশল সবই ঠিক আছে। জায়গার সুবিধাও আমরা পাবো। কিন্তু যুদ্ধে সেনার আধিক্যকে কখনোই অস্বীকার করা চলবে না।'

'তা ঠিক। তবে আমাদের সুবিধা হচ্ছে, এটা আমাদের দেশ। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরাই আগে এসেছি। সে হিসেবে এই ক্ষেত্রে হবে আমাদের চেনা। এখন শিবির স্থাপন করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি।'

দিনের বাকিটা সময় পেরিয়ে গেল। তারপরে রাত্রির দুই প্রহর ব্যয় হলো শিবির স্থাপন করতে। পুরো প্রান্তরের এক প্রান্তে শিবির স্থাপন করা হলো। ক্ষেপণাস্ত্র এবং নানা মুক্ত অস্ত্রধারীদের রাখা হলো সতর্ক পাহারায়। মহারাজ কারিকালার শরীরে যেন ক্লান্তি বলে কোনো শব্দের স্থান নেই। তিনি ঘোড়ায় চড়ে শিবিরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত আসা যাওয়া করছেন। ঘোড়া ক্লান্ত হলে ঘোড়া বদলে নিচ্ছেন। সব কিছুই সাজিয়ে নিচ্ছেন একেবারে নিজের মনের মতো করে।

চারিদিকে দূতেরা চলে গেছে। অগ্রসর শত্রুসেনার ওপর নজর রাখার জন্য পাঠানো হলো কয়েকজনকে। শত্রুর প্রত্যেক পদক্ষেপের ওপর নজর রাখতে হবে এখন থেকে। এবং সেই খবরও পেতে হবে নিয়মিত।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। দক্ষিণ ভারতের এই ভেন্নি প্রান্তরে রচিত হবে ইতিহাস। ইতিহাস অবশ্যই লেখা থাকবে এবং প্রবল বিক্রমের সাথে সেই ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কারিকালা। মশালের আলোয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার সেই চোখের কাঠিন্য। না, যত সহজে শত্রু জিতে যাবে বলে তার মনে হয়েছিল, কাজটা ওদের জন্য তত সহজ হবে না।

যুদ্ধে দুর্বল দিকের একটা সুবিধাও আছে। কোনোভাবে যদি এই যুদ্ধ তিনি একবার জিতে যান, তাহলে তার নাম ইতিহাস কখনোই মুছে দিতে পারবে না। এই আমলের দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে পরাক্রমশালী সম্রাট হিসেবেই তাকে মনে রাখবে সেই পাতাগুলো। আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।

ওদিকে ইতিহাস রচনায় কেবল এদিকে একজনই সচেষ্ট নন। আরেকজনও ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট আছেন। আর তিনি ভালো করেই জানেন, ইতিহাস তাকে বিবেচনা করবে পর্দার পেছনের একজন কুশীলব হিসেবে। আগত সময়ে এই যুদ্ধে তার ভূমিকার কথা কেউ জানতেও পারবে না। তবু কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ইতিহাস যদিও তার মাথা থেকেই রচিত হচ্ছে, তবু ইতিহাসের পাতায় তার নাম লেখা থাকবে না। তিনি অবশ্য এটার পরোয়া করেন না। মহাকাল সবই মুছে দেয়।

৫৩

চোলা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন মহারাজ উথিয়ান। তার পেছনে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী। এখানেই তাকে যাত্রার প্রথম বিরতিটা দিতে হলো। শত্রু রাজ্যে প্রবেশের আগে দেওয়া এই বিরতির কারণ শুধু অবস্থা বোঝা না, একটা বিশেষ কারণও আছে।

যুদ্ধসাজে মহারাজ উথিয়ানকে দারুণ মানিয়েছে। আসলে কর্মযোগী পুরুষ যে কাজই করেন তাই মন দিয়ে করেন। পছন্দের কাজ তো সবাই মন দিয়ে করতে পারে, সেখানে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু সত্যিকারের সফল লোক মাঝে মাঝে জীবনের পথে আসা প্রয়োজনীয় কিন্তু অপছন্দের কাজগুলোও বেশ মন দিয়ে করেন। মহারাজ উথিয়ানের দৃপ্ত ঘোড়ার ওপর বসে থাকার ভঙ্গি দেখে এখন কে বলবে, তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ বিশেষ একটা পছন্দ করেন না। সারা জীবন শান্তির পথেই চিন্তা করেছেন।

মহারাজ উথিয়ানের সামনে শ-হস্ত দূরে আছে মহেন্দ্রগড়ের দুর্গ। দরজা বন্ধ। তবে মহারাজ উথিয়ান জানেন এই দরজা বেশিক্ষণ বন্ধ থাকবে না।

এই বিশাল সেনাবাহিনী দেখে খুলে গেল মহেন্দ্রগড়ের বিশাল দরজা। দরজা খুলতেই দেখা গেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মাত্র লোক। তিনি মহারাজ উথিয়ানের বর্তমানের পরিস্থিতির গুণে মিত্র। বেরিয়ে এলেন তিনি। তার দিকে তাকিয়ে আছেন মহারাজ উথিয়ান। জানেন, একটু পরেই তার সৈন্য বল আরেকটু বৃদ্ধি পাবে।

মহেন্দ্রগড়ের দরজা দিয়ে যিনি বেরিয়ে এলেন তার বয়স অনেক কিন্তু শির সেই বয়সের ভাঁড়ে এখনও ঝুঁকে যায়নি। মাথা উঁচু করেই বেরিয়ে এসেছেন তিনি। মাথায় সজ্জিত মুকুট আর জমকালো পোশাক দেখে বোঝাই গেল এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই অভিজাত কেউ হবেন।

হ্যাঁ, তিনি আসলেই অভিজাত। অনেকদিনের অভ্যাস কিছুদিনের অনভ্যাসে এখনও উবে যায়নি। তিনি এই কিছুদিন আগেও চোলা রাজ্যের মহামন্ত্রীর পদ অলংকৃত করতেন। মহারাজের পরেই ছিল তার স্থান। তবে তিনি নিজের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাননি। নিজের অবস্থান আরেক ধাপ এগিয়ে ক্ষমতার একেবারে শেষ স্তরে পৌঁছতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার একটাই উপায় আছে। বিদ্রোহ। সব পারিষদ আর আমলাদের সাথে আঁতাত করে সেই পথেই হাঁটতে শুরু করেন তিনি। প্রথমে সফল হয়েছেন, পরে আবার হয়েছেন ব্যর্থ। তবে চেষ্টা করা ছেড়ে দেওয়া তো আর চলবে না। আবার অন্য উপায় অবলম্বন করে সিংহাসন দখলে সচেষ্ট হয়েছেন।

বিদ্রোহী মন্ত্রীর পোশাক অভিজাত হতে পারে, তবে পদমর্যাদার দিক থেকে তিনি এখন আর সম্মানের যোগ্য নন। মহারাজ উথিয়ান সামনে দাঁড়ানো মন্ত্রীর দিকে আনন্দিত দৃষ্টিতে তাকাতে পারলেন না। সেই দৃষ্টিতে একটু হলেও ঘৃণা আর সন্দেহ মিশে আছে। বিষধর সর্প আর বিশ্বাসঘাতককে কখনো বিশ্বাস করতে হয় না।

মহারাজ উথিয়ানের সামনে এসে এবার বৃদ্ধের মাথা একটু ঝুঁকে এলো, 'আপনাকে চোলা রাজ্যে স্বাগত জানাচ্ছি মহারাজ।' তার গলায় যেন মধু ঝরছে। অবশ্য যে তাকে

সিংহাসন পাইয়ে দেবে তার সাথে কথা বলতে এলে গলায় লালার বদলে মধু চলে আসাই স্বাভাবিক।

মহারাজ উথিয়ানের মনোভাব এই সম্ভাষণে তেমন একটা বদলালো না। তিনি মন্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'একজন প্রতিবেশী রাজার রাজাকে সম্ভাষণ জানাবার নৈতিক অধিকার এখন আর আপনার নেই। তবু আমার দুর্ভাগ্য শান্তি নয় যুদ্ধ সম্পন্ন করে এই রাজ্যে আসতে হয়েছে। আর যুদ্ধে তো আর জাতের বিচার করলে চলে না, তাই না মহামন্ত্রী? ও আচ্ছা, আমার একটু ভুল হয়েছে। সাবেক মহামন্ত্রী। তাই না?'

অপমানটা গায়ে মাখলেন না বৃদ্ধ। তিনি কূটনীতিতে কাঁচা হলে মহামন্ত্রী হতে পারতেন না। এখানেও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ দেখালেন তিনি, 'সাবেক মহামন্ত্রীর কাছ থেকে হয়তো সম্ভাষণ আপনি গ্রহণ করবেন না, তা আপনার রুচিবোধের সাথে যায় না, কিন্তু চোলা রাজ্যের ভবিষ্যৎ মহারাজের কাছ থেকে তো সম্ভাষণ গ্রহণ করাই যায়। তাতে তো আপনার রাজ সম্মানের কোনো অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না।'

'ভূমি ফেলে রেখে ফসলের আশা করাটা বোকামির লক্ষণ। তার চেয়ে কর্ষণ করে, জল দিয়ে, বীজ ফেলে তারপর আশা করাটা ভালো। তাও ঈশ্বরের ইচ্ছের ওপরেই অনেকটা নির্ভর করে।'

'আমি মহারাজ এখানে সবই করেছি। এখন কেবল ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষা।'

সাংকেতিক কথা আরও অনেকক্ষণ চালানো যেতো। তবে মহারাজ উথিয়ান আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। তিনি নিজের রুচির প্রশ্ন বদলে নিজের কাজে মন দিলেন।

ভেরাপ্পন তাকে এমনই বলেছিল। এদের সাথে এরই মধ্যে তার চুক্তি হয়ে গেছে। এই মন্ত্রীদের বিদ্রোহী সদস্যরা তাদের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে। আর প্রতিদানে তিনি তাদের হাতে তুলে দেবেন চোলা রাজ্যের শাসন ভার। এনারা সেই ক্ষমতা ভোগ করার পাশাপাশি হবেন চেরা মহারাজের ইশারার পুতুল। বলা যায়, তারা চেরা রাজের হয়ে চোলা রাজ্যে শাসন পরিচালনা করবেন।

তবে এই চুক্তি যদিও করা হয়েছে তবে এই চুক্তির বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা আছে। মহারাজ উথিয়ানের পরিকল্পনা আলাদা। প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধে মহারাজ কারিকালাকে হারাতে হবে। আগে যেমনই চিন্তা করুন না কেন, এখন তার মনে হচ্ছে না কাজটা এতটা সহজ হবে। নিজের ভূমে নিজের সেনা নিয়ে সব রাজারই শক্তি বেশি থাকে।

অবশ্য যুদ্ধ ছাড়াও সংকট উত্তরণের পথে হাঁটারও পরিকল্পনা আছে মহারাজ উথিয়ানের। সে পরিকল্পনায় সম্মুখ যুদ্ধের কোনো স্থান নেই। প্রথমেই কারিকালাকে বাক্যযুদ্ধে হারিয়ে শরণাগতি অবলম্বন করানোই প্রথম চেষ্টা হবে তার। আর সেখানেই হবে সমস্যা। ভেরাপ্পন বিদ্রোহী মন্ত্রীদের যে কথা দিয়েছেন সেই পথে কথাটা রাখা সম্ভব হবে না। এখনও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। ভেরাপ্পনের সাথে এই নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল, সেটাও করা হয়নি। যাক, সেটা পরে দেখা যাবে। দরকার হলে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবেন তিনি। বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার রুচিতে বাঁধবে না। তারা এই আচরণেরই যোগ্য।

মহারাজ উথিয়ানের আগমন উপলক্ষে সব ব্যবস্থাই আগে থেকে করে রাখা হয়েছে। দুর্গের দেওয়ালের লাগোয়া এক জায়গায় সিংহাসন তুল্য একটা আসনের সাথে

আরও কিছু আসন পেতে রাখা হয়েছে। বুড়ো সাবেক মন্ত্রী আর মহারাজ উথিয়ান সেখানেই বসলেন। ভবিষ্যতের বচন পূরণের আলোচনায় আর সময় নষ্ট করলেন না মহারাজ উথিয়ান। সরাসরি অন্য কথায় চলে এলেন, 'আপনারা তো আমাদের সেনার সাথে মিলিত হবেন এখন। তা আপনাদের সেনাবল সম্পর্কে কিছু বলুন। দেখি আপনাদের শক্তি কতটুকু।'

'মহারাজ, আপনার অজানা কিছুই নেই। আমাদের সেনাবল অপ্রতুল। যদি আমাদের যথেষ্ট সৈন্য এবং পশু থাকতো, তাহলে অনেক আগেই রাজধানী আক্রমণ করে বসতাম। আপনাকে আর কষ্ট করে আমাদের সাহায্য করতে এতদূর আসতে হতো না।'

'সেটা আমি জানি। কেউ তো আর সাধ করে বাইরের ঝামেলাকে ঘরের ভেতরে টেনে আনতে চায় না। বলুন আপনার শক্তি সম্পর্কে। অপ্রতুল হলেও কিছু তো অবশ্যই আছে।'

'হ্যাঁ। আমাদের দলে বিভিন্ন স্তরের প্রায় বারো শ সৈন্য আছে। সেই সাথে মহেন্দ্রগড় দখল করে নিয়েছি আমরা। এই মহেন্দ্রগড়ের অস্ত্রাগার নেহাত কম ঐশ্বর্যময় নয়। সেই সমস্ত অস্ত্র আপনি আপনার দখলে পাবেন।'

'আপনার কথা অবিশ্বাস করার যদিও কোনো কারণ নেই তবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। একটা সীমান্ত দুর্গে আর কতই বা অস্ত্র থাকতে পারে। আর এমনিতেও এই অস্ত্রের ভরসায় আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। আমাদের অস্ত্রের পরিমাণ যথেষ্ট। আর আপনাদের যেই বারো'শ সৈন্যের কথা বললেন, তা তো আমার সৈন্যের কাছে সমুদ্রে গোষ্পদ।'

মন্ত্রী প্রথমেই আলোচনায় হেরে যাচ্ছেন। কিন্তু তাহলে তো আর চলবে না, 'মহারাজ, আপনি যদি তুলনা করেন তাহলে সেরকমই মনে হবে। আমাদের জিনিস আপনাদের তুলনায় কিছুই না। তবে আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি, আমরা এখনও আমাদের সেরা অস্ত্রটা আপনার সামনে রাখিনি।'

'তাই না-কি?' আগ্রহী হলেন মহারাজ উথিয়ান, 'কী সেই অস্ত্র?'

মন্ত্রী বসা থেকে উঠে একটু সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'মহারাজ, একদিন আমি এই রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলের নেতা ছিলাম। এখানে আমরা এমন অনেকেই আছি। এখন যে মহারাজ আছেন তার আগের রাজা আমাদের সাথে নিয়েই মন্ত্রণায় বসতেন। বলতে গেলে তখন রাজ্যের শাসনের সব কিছুই ছিল আমাদের নখদর্পণে।'

'কিন্তু সেই সময় তো গত হয়েছে। এখন তো আর আপনাদের হাতে কিছুই নেই।' মহারাজ উথিয়ানও দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'আমাদের হাতে কিছু নেই ঠিক, কিন্তু তাদের অতীত আমাদের জানা। আর অতীতকে এতো সহজে বদলানো যায় না। চোলার সেনা কৌশল এবং যুদ্ধের গোপন সংকেতের ব্যাপার আমাদের জানা। এত সহজে সৈন্যদলের ওসব যে বদলানো যায় না, সেটা অবশ্যই আপনার জানা।'

মাথা নাড়লেন মহারাজ উথিয়ান, 'ঠিক।'

মন্ত্রী বলেই যাচ্ছেন নিজের ক্ষমতার কথা, 'তাদের আক্রমণ অথবা রক্ষণের কৌশল, ব্যূহ নির্মাণ কৌশল এসব আমরা জানি। আগে থেকেই আপনার সেনাপতিদের

সেসব যুদ্ধ পদক্ষেপের কথা আমরা জানিয়ে দিতে পারবো। এবং আমরা এই কাজ করলেই আপনারা ধারণার চেয়েও কম সময়ে, কম কষ্টে যুদ্ধ জয় করতে পারবেন। এবং এসব তথ্য সমৃদ্ধ অস্ত্রই আমাদের আসল অস্ত্র। আর আপনার মতো একজন বিচক্ষণ রাজা যে এত বড়ো মহাস্ত্র নিজের দলে নিয়ে যুদ্ধে যাবার সুযোগ পেয়ে হেলায় হারাবেন তা আমার মনে হচ্ছে না।'

মহারাজ উথিয়ান তার বিচক্ষণ হবার প্রমাণ দিলেন নিজের পরের কথাতেই, 'তাহলে আপনারা কেন হেরে গেলেন তাদের কাছে? সবই তো জানতেন। সেই কৌশল কি খাটাতে পারেননি।'

দুঃখ ঝরে পড়লো মন্ত্রীর গলায়, 'একটা যুত মতো বাহিনী পেলে ঐ রাজা কারিকালাকে যুদ্ধ একেবারে শিখিয়ে দিতাম।'

মহারাজ উথিয়ান আগের কথা ফিরলেন, 'না, মেনে নিতেই হচ্ছে, আপনাদের এবারের অস্ত্র বেশ শক্তিশালী। এবং আমার সিদ্ধান্তের কথা যদি জানতে চান, এই অস্ত্র আমি অবশ্যই যুদ্ধে সাথে নিয়ে যাবো।'

মন্ত্রী বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। তার প্রাথমিক কাজ শেষ, 'ঠিক আছে মহারাজ। তাহলে আজ আপনি আর আপনার বাহিনী এখানেই বিশ্রাম করবেন। কাল সকালে আমরা একসাথে রাজধানী অভিমুখে সেনা যাত্রা করবো।'

মহারাজ উথিয়ান একটু ভ্রূ কুচকালেন, 'কেন? কাল সকালে কেন? আমরা তো আজকেই রওনা দিতে পারি। সেনা যখন যুদ্ধ উদ্দেশ্যে বের হয় তখন সেই ক্ষেত্রে পৌছানোর আগে অন্য কোথাও থেমে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের শাস্ত্র মতে এটা অনেক বড়ো অলক্ষণ। একটা বাঁধা পরে যাবার মতো।'

'কিন্তু মহারাজ, ক্ষমা করবেন। আপনাদের সাথে যাত্রার জন্য মহেন্দ্রগড় এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। আমাদের সেনাদের গুছিয়ে নিতে হবে। এজন্য আমাদের কিছুটা সময় প্রয়োজন।'

এবার মহারাজ উথিয়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মন্ত্রীর দিকে, 'আমরা এখানে আপনাদেরকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানাতে আসিনি যে আপনি আমাকে প্রস্তুতির দোহাই দেবেন।'

মন্ত্রীর গলায় কোনো কথা জোগালো না।

মহারাজ উথিয়ানের গলায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি পুরোপুরি প্রস্তুত। আপনি এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শুধু অপেক্ষা করার মতো কাজ আপনার মতো ঘাঘু লোক করবেন না। তার মানে আপনি অবশ্যই আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। সেই চর অবশ্যই আগে থেকেই আমাদের গতি এবং পথ সম্পর্কে আপনাকে জানিয়েছিল। তার মানে আপনি অনেক আগে থেকেই জানতেন আজ সকালে আমরা এই মহেন্দ্রগড়ের সামনে এসে উপস্থিত হবো। আপনি নিশ্চয়ই সেটা জানতে পেরে আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন। তাহলে বলুন, এখন ঠিক কী কারণে আপনি আমার কাছে আরও একদিন সময় চাচ্ছেন?'

একটু থ মেরে গেলেন বৃদ্ধ মন্ত্রী। মহারাজ উথিয়ানের অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভুল। সবকিছু তৈরিই আছে। তিনি আসলে একদিন সময় নিতে চেয়েছিলেন অন্য একটা

কারণে। তাদের প্রস্তাব আর চুক্তি নিয়ে কথা হয়েছিল কেবল ভেরাপ্পনের সাথে। মন্ত্রীর বচন আর রাজার বচনে পার্থক্য আছে। আজ বিশ্রামের অবসরে ভেরাপ্পনের উপস্থিতিতে মহারাজ উথিয়ানের কাছ থেকে সেই বচন আদায় করে নেবার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। একবার যুদ্ধ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লে সেসব আলোচনা করার অবসর আর পরিস্থিতি আর পাওয়া যাবে না।

উঠে দাঁড়ালেন মহারাজ উথিয়ান। মন্ত্রীও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন আলোচনার সময় শেষ হয়েছে। মহারাজ উথিয়ান নিজের শিবিরের দিকে যাত্রা করার আগে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, 'দুপুরের খাবার শেষ করার ঠিক এক মুহূর্ত পর আমরা যাত্রা করবো।'

বৃদ্ধ আর কোন কথা বললেন না। মন্ত্রী ভেরাপ্পনের বচনই এখন শেষ ভরসা। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে তিনিও মহেন্দ্রগড়ের ভেতরে চলে গেলেন।

দুপুরের খাবারের পর এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার কথা ছিল। তবে সেই বিশ্রাম সাধারণ সেনাদের কপালে জুটল না। তারা নানা রকম ছোটোখাটো গোছগাছ করে নিচ্ছে। ঠিক এক মুহূর্ত পরেই রন ভেরী বাজিয়ে যাত্রা করলো সেনা।

চোলাদের রাজধানী পুহার। রাজধানী অভিমুখেই চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহারাজ উথিয়ান। মন্ত্রীদেরও সায় আছে এই সিদ্ধান্তে। রাজধানী অবরোধ করে রাখাই মহারাজ উথিয়ানের প্রাথমিক লক্ষ্য।

মন্ত্রীরা তাদের বারো শ সৈন্য অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের পক্ষের বেশির ভাগ সৈন্যই কারিকালার সাথে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, কেউ হয়েছিল বন্দি, আবার কেউ চলে গিয়েছিল নিরুদ্দেশ হয়ে। মহারাজ উথিয়ান সেই কথাই ভাবছেন। এই বারো'শ সৈন্যরা নিশ্চয়ই কয়েকটা দস্যুদল একত্র করে বানানো হয়েছে। কিছু সংগঠিত দস্যুদল মাঝে মাঝে যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করে। মহারাজ উথিয়ান সেসব জানেন।

বারো'শ সৈন্য কোত্থেকে এসেছে তা এখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই সৈন্য নিয়ে মন্ত্রীরা এখন সামনে আছেন। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের। এতক্ষণে কারিকালার গুপ্তচর নিশ্চয়ই তাদের যাত্রা করার খবর পেয়ে গেছে। এখন দেখা যাক কারিকালা তাদের জন্য কী আয়োজন করে রাখে।

ভেরাপ্পন ঘোড়া নিয়ে মহারাজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারিদিকে সতর্ক নজর রাখছেন তিনিও। মহারাজ উথিয়ান ঘোড়ার ওপর বেশ আরাম করেই বসেছেন, 'যাত্রা তো করলাম। কিন্তু একটা ঝামেলা যে পেকে রয়েছে, তার সমাধান কী হবে?'

ভেরাপ্পন কোন ঝামেলার কথা বলা হচ্ছে ঠিক ধরতে পারলেন না, 'বুঝলাম না মহারাজ। এখানে আবার ঝামেলা এলো কোত্থেকে?'

'যদি মহারাজ কারিকালা যুদ্ধ করার চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলেই তো ঝামেলার একশেষ। এই বিদ্রোহী মন্ত্রীদের সামলাবেন কী করে তখন? কথা তো দিয়ে বসে আছেন।'

এবার বুঝতে পারলেন ভেরাপ্পন। সাথে সাথে হাসলেন, 'মহারাজ, আমি প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর আপনি প্রতিশ্রুতি দেওয়া তো একই কথা। আর প্রতিজ্ঞা যখন করেছি সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে তো হবেই। আমি তো আপনার হয়ে কাজ করি।'

'এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমরা এই প্রতিজ্ঞা পালন করবো কীভাবে?'

'সেই চিন্তা আমি অনেক আগেই করে রেখেছি। আর উপায় খুঁজেও পেয়ে গেছি।'

'কী উপায়?'

'মহারাজ কারিকালা যদি যুদ্ধ ছাড়াই সন্ধির পথ বেছে নেন, তাহলে সেই সন্ধি কিন্তু কোনোভাবেই সমানে সমানে সন্ধি হবে না। আমরাই থাকবো সেখানে সবল অংশ। তাই শর্ত জুড়ে দেবার ক্ষমতা আমাদেরই থাকবে বেশি। সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা সেখানে একটা বিশেষ শর্ত জুড়ে দেবো। সেক্ষেত্রে চোলা রাজ্য দুই ভাগ হয়ে যাবে। একটা ছোটো টুকরো কেটে বের করে নিয়ে আসবো চোলার মানচিত্র থেকে।'

'বাহ, বেশ ভালো উপায় তো। মন্ত্রীদের স্বাধীন রাজা হবার ইচ্ছা। সে ইচ্ছা পূরণ হলো। আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হলো। আর মহারাজ কারিকালাও চোলা রাজ্যের রাজা রইলেন। এই উপায়ে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। কোনো ঝামেলা থাকবে না। আমার মনে হয় না একটা ছোটো অংশ ছেড়ে দিতে মহারাজ কারিকালা খুব বেশি আপত্তি করবেন।'

'তিনি রাজি হয়ে যাবেন মহারাজ। সম্পূর্ণ রাজ্য হারানোর চেয়ে একটা ছোটো অংশ ছেড়ে দেওয়া ভালো। হিসেব একেবারে জলের মতো পরিষ্কার।'

কথা আর আগে বাড়লো না। এরপর শুধু চলার পালা। রাতের খানিক সময়ের বিশ্রাম বাদে আর কোনো বিশ্রাম পেলো না সৈনিকেরা। কোথাও শিবির পড়লো না। কেবল অবিশ্রান্ত এগিয়ে চলা। দুই দিন ধরে প্রায় অবিশ্রান্ত এগিয়ে চলল সেনাদল। দুদিন পরের ঠিক দুপুর বেলা সামনে টহল দিতে যাওয়া এক সৈনিককে জোরসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেল।

সৈনিকের ঘোড়া ছোটানোর ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার গুরুতর। কিছু সৈনিককে সবসময় সৈন্যদলের সামনে পাঠাতে হয় পরিস্থিতি অবলোকন করার জন্য। এখানেও তাই করা হয়েছিল। সামনে একটা জঙ্গল আছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে চর।

সোজা মহারাজ উথিয়ানের সামনে এসে দাঁড়ালো চরের ঘোড়া। বৃদ্ধ মন্ত্রীও চরকে ছুটে আসতে দেখেছেন। তিনিও এসে দাঁড়িয়েছেন মহারাজ উথিয়ানের পাশে।

সওয়ার ঘোড়ার ছোটানোর ক্লান্তিতে একটু হাঁপাচ্ছে, 'মহারাজ, আমাদের মনে হয় রাজধানী পর্যন্ত যেতে হবে না।'

'কেন?' সন্দিগ্ধ প্রশ্ন মহারাজ উথিয়ানের।

'এই জঙ্গল পেরিয়ে ঠিক সামনে একটা খোলা জায়গা আছে। সেই খোলা জায়গা চওড়ায় খুব বেশি না। তার ওপাশেই দেখলাম বিশাল সেনা সমাবেশ।'

'তাই না-কি? কী দেখেছো সব বলো।'

'মহারাজ, বিশাল সেনা। একেবারে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত। আমি নিশ্চিত এটা চোলা রাজ্যের সেনা। সেনা শিবিরের চূড়ায় আমি চোলাদের নিশান দেখেছি। সেই নিশান চিনতে আমার ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

মহারাজ উথিয়ানের মুখ চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছেন মহারাজ কারিকালা। তিনি রাজধানীতে বসে নেই। সম্মুখ সমরে বাঁধা দিতে এসে এখানে দাঁড়িয়েছেন। অবরোধ করে সন্ধি করার চিন্তা আপাতত বাদ। এখন যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই।

মহারাজ উথিয়ান বৃদ্ধ মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেই তাকানোর মানে বুঝতে পারলেন মন্ত্রী, 'মহারাজ এই জঙ্গলের ঠিক ওপাশেই ভেন্নির প্রান্তর। দূতের কথা শুনে যতটুকু বুঝতে পারছি, মহারাজ কারিকালা ভেন্নির প্রান্তরের ওপাশেই তার সেনা সজ্জা করেছেন।'

মহারাজ উথিয়ান মন্তব্য করলেন, 'তার মানে ভেন্নিই হবে আমাদের রণক্ষেত্র।'

'জি মহারাজ।'

সেনাপতিদের সেনা এগিয়ে নেবার হুকুম দিলেন মহারাজ উথিয়ান। দেখতে দেখতে জঙ্গলের বাঁধা পার হয়ে চেরা রাজ্যের সেনারা প্রান্তরের ওপর প্রান্তে এসে জমা হতে লাগলো। এখনই প্রান্তর পার হবার চেষ্টা করলেন না মহারাজ উথিয়ান। তাহলে সামনের বাহিনী এই কাজকে উষ্কানি হিসেবে ধরে নিতে পারে। এখনই যুদ্ধ করার ইচ্ছে নেই তার। বাহিনী দুই দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত, এলোমেলো। এখন যুদ্ধ করলে বিপক্ষ সুযোগ পেয়ে যাবে।

বিপক্ষের বাহিনীকে কোনো সুযোগই দেওয়া যাবে না। সৈন্যদের যত তাড়াতাড়ি পারা যায় শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপর চললেন ভেরাপ্পনের দিকে।

ভেরাপ্পন তৈরিই ছিলেন। 'পান্ড্য সেনাবাহিনী এখন কোথায়?' মহারাজ উথিয়ানের এই প্রশ্নের উত্তর তার জানা।

'মহারাজ, আমার প্রেরণ করা দূতের দেওয়া খবর অনুযায়ী এখনও এক দিনের দূরত্বে আছে তারা।'

'দূরত্বে অবস্থান করার সময় এখন নয়। তাদের কাছে অতি সত্বর দূত পাঠান। বলুন গতি যাতে দ্রুত করে। সম্মুখ সমর আসন্ন। তাড়াতাড়ি যাতে ভেন্নির প্রান্তরে চলে আসে তার সেনা।'

'আমি এখনই দূত প্রেরণ করছি।' ভেরাপ্পন দূতের খোঁজে পা বাড়ালেন। বেশ দ্রুত তার ভঙ্গী। এখন প্রতিটা মুহূর্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৫৪

আর্যাবর্তের একটা ভূমি এই মুহূর্তে রক্ত শুষে নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ভূমি কি রক্ত শুষে নেয়? না-কি সেই রক্ত গিয়ে জমা হয় ভূমির বুকে? বসুন্ধরার তৃষ্ণা মেটাবে নাকি বোঝা বাড়াবে সেই চিন্তা কেউ করে না, সবাই রক্ত ঝরানোতে ব্যস্ত।

সেই ভূমি থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। এই নগরে কোনো উত্তাপ নেই। নগরবাসী নিজেদের প্রাত্যহিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু দুজন মানুষের মনে শান্তি নেই। তাদের মনের ভবিষ্যৎ বিষয়ক চিন্তা তাদেরকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না।

প্রতিষ্ঠানা নগরীতে মহারাজ সাতকর্ণীর দিন আরামে কাটছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে সুখ তার মনের শত ক্রোশের ভেতরেও নেই। তিনি তার মনের ভাব গোপন করার চেষ্টা করছেন না। তার চেহারায় চিন্তার রেখা স্পষ্ট। তবে সামনে বসা গিরিধারীর মুখ ভাবলেশহীন। তার মুখ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই, এই মুহূর্তে এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ পাশা খেলায় তিনি একজন প্রধান খেলোয়াড়।

'খবর পাবার পর তো অনেকদিন পার হয়ে গেল গিরিধারী। এতক্ষণে কতদূর এগিয়েছে চেরা বাহিনী? আমি যদি সেনা চালনা করতাম তাহলে তো এতদিনে চোলা রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়তাম।'

'আজ্ঞে মহারাজ। স্বাভাবিক হিসেব তাই বলে।'

'আমরা কি বসে বসে এখন স্বাভাবিক হিসেব কষার জন্য দোয়াত-পাতা নিয়ে বসবো?'

মহারাজের গলার ঝাঁঝ আর ব্যাঙ্গক্তি গিরিধারীর কান এড়ালো না, 'না মহারাজ। এসব ক্ষেত্রে বসে বসে হিসেব করলে আখেরে কোনো লাভই হয় না। সেজন্যই আমাদের গুপ্তচররা নিয়োজিত আছে। অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছে তারা। খুব তাড়াতাড়ি আমরা সঠিক খবর পেয়ে যাবো বলেই আমার বিশ্বাস।'

'ভালো কথা। কিন্তু আপনার কী মনে হয়? গুপ্তচর কি খবর আনবে? আপনার পরামর্শ কি চোলা মহারাজ কারিকালা মেনে নেবেন?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মুখে গিরিধারী বললেন, 'মেনে নেবেন। এছাড়া তো তার কাছে কোনো উপায় নেই। কেউ কি আর সাধ করে গর্তে ইঁদুরের মতো আটকে পড়তে চায়? চোলারা যদি রাজধানীর দুয়ার আর দেওয়াল আগলে বসে থাকে তাহলে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না। কিছুদিন আগেই রাজ্যে বিদ্রোহ হয়েছে, তারপর হয়েছে একটা বড়োসড়ো গৃহযুদ্ধ। স্বভাবতই এখন ওদের রাজধানী অগোছালো, সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর খাবারের বড়োই অভাব।'

'ঠিক বলেছেন। তার মানে বেশি না, মাত্র সাতদিন যদি চেরা বাহিনী রাজধানী পুহার অবরোধ করে রাখে তাহলে আর দেখতে হবে না। আত্মসমর্পণ না করলে ক্ষিধেয় সৈনিক আর প্রজাদের মৃত্যু শুরু হয়ে যাবে। মহারাজ কারিকালা কখনোই এই ভুল করবেন না।'

'হ্যাঁ, তার মানে তাকে রাজধানী থেকে বাইরে আসতেই হবে। আর বাইরে আসতেই যেহেতু হবে তাহলে তো আমার কথা মেনে নেওয়াই তার জন্য ভালো হবে। গুপ্তচর আসুক, দেখি পরিস্থিতি কতটুকু গড়িয়েছে।'

গিরিধারীর শান্ত স্বর মহারাজ সাতকর্ণীর মেজাজ আরও খারাপ করে দিচ্ছে। তিনি উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম, আর সেখানে গিরিধারীকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি অবকাশ যাপন করছেন। সিংহাসনের হাতলের সিংহের মস্তকে সিংহের হাতের সমতুল্য একটা থাবা বসালেন তিনি, 'এতকিছু নিশ্চিত জানার পরেও আমরা কেন সেখানে চোলাদের সাহায্যে এখনও সেনা পাঠাচ্ছি না? অবশ্য এখন আর সেসব চিন্তা করে লাভ কী? এখন তো পাঠানোর সময় নেই, সেই চিন্তা করেও লাভ নেই। এখন পাঠালে আমাদের বাহিনী চণ্ডালের কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ করার সুযোগ পাবে না।'

'হ্যাঁ মহারাজ। এটা আপনি আগেও বলেছেন।'

'হ্যাঁ, আবারও বলছি। তারা সেখানে শুধু পাবে চোলা সেনাদের মৃতদেহ। শ্মশানে মুখাগ্নি করতে পারবে বড়োজোর।'

'না মহারাজ, আপনার বিশেষ বাহিনীর এরচেয়েও ভালো কিছু করার সুযোগ আসবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

'রাখছি। এই বিশেষ বাহিনী আমরা চোলাদের সাহায্য করতে বানাইনি। প্রথমে আমি সবই ভুল জানতাম। কিন্তু যদি পরেই কাজে লাগবে তাহলে এত কষ্ট স্বীকার করে, এতো তাড়াহুড়া করে কেন আমরা এই বাহিনী তৈরি করলাম? আরেকটু দেরি করলেই বা কী ক্ষতি হতো?'

'ক্ষতি হতো মহারাজ। এখন আমাদের বাহিনী পুরো তৈরি। এখন আমরা অন্যদিকে নজর দিতে পারবো।'

'তাহলে চোলারা হেরে যাবে? আমরা কি আমাদের স্বার্থে চেরাদের সাথে সন্ধি করবো?'

'সেটা করতে পারলেও মন্দ হতো না। উদ্দেশ্য আরও ভালো করে সিদ্ধ হতো। তবে সেখানে একটা সমস্যা আছে।'

'হ্যাঁ জানি। দুর্বলকে সাহায্য করলে সে হয় অনুগত, আর সবলকে সাহায্য করলে সে হয় সন্দেহকারী।'

মহারাজের আলোচনা আর বাড়তে দিলেন না গিরিধারী, 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি মহারাজ, আমাদের অবস্থা এখন টালমাটাল। হাতে এখন অনেক কাজ। একজনের জন্য অনেক বেশি। তাই আমরা কাজ ভাগ করে নিয়েছিলাম। আপনার প্রধান মনোযোগ থাকবে ভেতরের দিকে। আপনি সেনাবল বাড়াবেন, আর বাণিজ্য কাঠামো আরও উন্নত করবেন। আর আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকবে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে। আমি কি কখনো আপনাকে আপনার সেনা বাহিনী অথবা আভ্যন্তরীণ অন্য কাজের জন্য কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।'

'আপনি কেন জিজ্ঞেস করবেন? ভুলে যাবেন না, আমি মহারাজ আর আপনি আমার মহামন্ত্রী। আমিই আপনাকে প্রশ্ন করবো। আপনি জবাব দেবেন। আমি আপনার কাছে জবাবদিহি করবো না। আপনি আপন্নার কাজ সম্পর্কে আমাকে জানাবেন।'

'আপনি কিন্তু মহারাজ রাজনীতি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে কথাগুলো বললেন না। আপনি নিজের ক্রোধের বশে আছেন। প্রাচীন কালের অনেক মন্ত্রীই কিন্তু তাদের কাজ সম্পর্কে মহারাজকে সবকিছু জানাতেন না। কারণ অনেক তথ্যের সন্নিবেশে মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাতে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়। তখন আপনি হয়তো আপনার নিজের কাজে এবং অনেক সিদ্ধান্তে ভুল করে ফেলতে পারেন।'

'হ্যাঁ, সে ঠিক আছে।' একটু সামলে নিলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'কিন্তু এই কথা তো বলবেন, এত বড়ো সুসজ্জিত বাহিনী আমরা আসলে কাদের জন্য তৈরি করেছি?'

'প্রয়োজন আছে মহারাজ। কিন্তু কোথায় এবং কীভাবে তা এখনও আমি সঠিকভাবে জানি না। তবে আমার মন বলছে এই বাহিনী আমাদের কাজে লাগবে। এই বাহিনীকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে সামনে। তবে আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম মহারাজ, এই বাহিনীর জন্য একজন সুযোগ্য সেনাপতি দরকার। আপনি কি এখনও তেমন কাউকে খুঁজে পেয়েছেন? যে আপনার সেনাপতিদের চেয়ে একটু আলাদা। যে প্রচলিত চিন্তার বাইরে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে।'

'এখন কিন্তু আপনি আমার কাজে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। বাহিনীর চিন্তা আমার মাথাতেই থাকতে দিন। আপনার এই কথাও আমার মাথায় ধরছে না। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। বেছে বেছে আমার সবচেয়ে কুশলী সেনাপতিকে আমি ঐ বাহিনীর দায়িত্ব দেবো। সেই আমার মতে এই বাহিনীর জন্য সঠিক লোক।'

'মহারাজ, আপনি আমার কথাটা ধরতে পারেননি। আমি এখানে যোগ্য অযোগ্যের প্রশ্ন করছি না। আপনার সেনাপতিরা সবাই যোগ্য, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে তা অবশ্যই প্রচলিত যুদ্ধ কৌশলের দিক থেকে চিন্তা করলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের সৈন্য শাস্ত্রের যেসব নিয়ম মেনে যুদ্ধ করে সেই শাস্ত্র কেবল আমরাই অধ্যয়ন করি না। আমাদের শত্রুরাও সেসব শাস্ত্র পাঠ করে। তাহলে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য তৈরি হবে কীভাবে?

আমাদের এমন একজন সেনাপতি দরকার যে প্রচলিত পথে হাঁটার চেয়ে অপ্রচলিত পথে হাঁটতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যার জ্ঞান হতে হবে অবশ্যই আমাদের সীমানার বাইরে। তাহলেই সেই জ্ঞান আমাদের শত্রুদেরও জ্ঞানের সীমানার বাইরে থাকবে। সে হবে আমাদের শত্রুদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়। সেই ধাঁধাঁ ওরা সমাধান করতে পারবে না। একমাত্র তেমন একজন সেনাধ্যক্ষ দ্বারাই আমাদের লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব। খুঁজে দেখুন মহারাজ, এমন কোন ক্ষত্রিয় আছে কি না, যে অজানা অপ্রচলিত কৌশলে যুদ্ধ করে। তেমন লোকই আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

এবার মহারাজ সাতকর্ণী গিরিধারীর কথা একটু একটু বুঝতে পেরেছেন। সেদিক নিয়ে আর কিছুই বললেন না। তবে উত্তেজনা মানুষকে চুপ থাকতে দেয় না, 'আচ্ছা, সেটা আমি খুঁজে দেখবো। কিন্তু এই যে আপনি বলছেন, সবকিছু সময় এলে বলবে, সময় আসুক, তেমন সময় কিন্তু এক জায়গায় এর মধ্যেই এসে পড়েছে।'

গিরিধারী এখনও সেই ব্যাপারে কোনো জবাব দিলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন মহারাজ কোন সময়ের কথা বলছেন।

'বলুন গিরিধারী, কলিঙ্গের সেনা নিঃশ্বাস ফেলছে অমরাবতীর ঠিক ঘাড়ের ওপর। ওদিকে চেরা আর চোলাদের সেনা প্রায় মুখোমুখি। আমার তো মনে হয় না, আমরা এখন কোনোভাবেই পরিস্থিতি সামলাতে পারবো।'

'মিত্রের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে মহারাজ। আমি এখানে দুজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আপনাকে আর মহারাজ কারিকালাকে। যে করেই হোক আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো। আচ্ছা, আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি আমি। আমি চোলা রাজ্যে অনেক আগেই সেনা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'কী বললেন! সেনা পাঠিয়ে দিয়েছেন? দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার যতটুকু মনে পড়ছে এখন পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সহস্র সৈন্য বাদে আপনি আর কোনো সৈন্য প্রার্থনা করেননি। তার মানে কী? ওরকম একটা মহাযুদ্ধ লড়তে সাহায্য করার জন্য আপনি মাত্র সহস্র সেনা পাঠিয়েছেন?'

'না মহারাজ, আমি অতটাও বোকা নই। সেই সহস্র সৈন্য অন্য এক কাজে লেগেছে। আমি অন্য সেনা পাঠিয়েছি।'

'দেখুন গিরিধারী, আপনার বুদ্ধির হিসেব যেমন আপনার কাছে আছে তেমনি আমার সেনার হিসেবও আমার কাছেই আছে। আপনি যদি গোপনে সেনা তৈরি করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তা রাজদ্রোহের শামিল। আপনি কি তাই করেছেন?'

'ছি ছি মহারাজ। আমি কি কোনোভাবে রাজদ্রোহ করতে পারি?'

'আমার একজন সৈন্যও কোনদিকে যায়নি। তবে আপনি সেনা পাঠালেন কোত্থেকে?'

নিজের কপালের ডানদিকে মধ্যমা দিয়ে একটা টোকা দিলেন গিরিধারী, 'এখান থেকে।'

কৃষ্ণা নদী পূবের যেই জায়গাতে সাগরে পড়েছে তা প্রতিষ্ঠানা থেকে অনেক দূরে। অমরাবতী থেকে জায়গাটা কাছে। শান্ত স্নিগ্ধ কৃষ্ণা এই জায়গাতে সমুদ্রের মিলনের আশায় আস্তে আস্তে উত্তেজিত রূপ ধারণ করছে। মিলনের আবেগে প্রচণ্ড শব্দে আলোড়িত হচ্ছে নোনা আর মিষ্টি জলের ধারা।

নৌকাটা তেমন বড়ো নয়। নদী থেকে মালামাল নিয়ে যেসব নৌযান সাগরে গিয়ে পড়ে সেগুলোকে আসলে নৌকা না বলে অনায়াসেই জাহাজ বলা যায়। এটাকে কোনোভাবেই জাহাজ বলার উপায় নেই।

অভিজ্ঞ মাঝিদের ভিড়ে এই নৌকায় একজন অনভিজ্ঞ যুবকও আছে। সে অনভিজ্ঞ হতে পারে তবে অদক্ষ নয়। নদীতে অনেক নৌকা বেয়েছে সে। ছোটোখাটো ঝড়ের সামনে যে পড়েনি তা নয়। সেসব পরিস্থিতি ভালোই সামলাতে পেরেছিল সে। তবে কৃষ্ণা আর বঙ্গোপসাগরের মিলনে সে জলের যে ধর্ম এখন দেখছে তাকে কোনোভাবেই সেসবের সাথে তুলনা করা যায় না। জিভ আপনা থেকেই শুকিয়ে আসতে চায়।

দুরুদুরু বুকে সে এগিয়ে গেল প্রধান মাঝির দিকে, 'সর্দার, এই নৌকা নিয়ে কি আসলে সমুদ্রে যাওয়া যাবে?'

সর্দার বুড়ো হয়েছেন এই জলেই। যুবকের মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন তিনি, 'কি রে, ভয় পাচ্ছিস না-কি?'

মনের ভাব লুকায় যুবক, নিজের গরিমা বিসর্জন দেয় না, 'না না, ভয় পাবো কেন?'

'তোর কোনো দোষ নেই। ভয় তো একটু লাগতেই পারে। তুই এই সমুদ্রে নতুন হতে পারিস তবে আমি তো আর নতুন না। আমার ওপর একটু ভরসা রাখ।'

'না বলছিলাম আরেকটু বড়ো নৌকা নিয়ে আসলে ভালো হতো না?'

'তা তো ভালো হতোই। তবে এরচেয়েও ছোটো নৌকায় আমি কৃষ্ণা পেরিয়ে সাগরে গেছি। এখানে বড়ো নৌকা নিয়ে আসা যেতো। তবে সেই অনুমতি মেলেনি। বড়ো নৌকার গতি কম। যেই কাজে যাচ্ছি তাতে গতি কোনোমতেই কমে গেলে চলবে না। এই নৌকা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না।'

আর কথা বলার সময় নেই। নৌকা সমুদ্রের কাছে চলে এসেছে। পাল আর হাল দুই-ই এখন সবলে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সাথে বৈঠাও চালাতে হবে সমানে। পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেই পেরিয়ে যেতে হবে এই মোহনা।

বৃদ্ধ নিজেই হাল ধরেছেন। এই বয়সেও হাল ধরার মতো শক্তি ধরে তার বাহু। সবদিকেই নজর রাখছেন তিনি।

সময় হতেই পালের দিক সঠিক দিকে খাটাতে নির্দেশ দিলেন তিনি। ঢেউয়ের আঘাতে মোচার মতো দুলতে লাগলো নৌকা। সবাইকে চিৎকার করে বৈঠা বাইতে নির্দেশ দিলেন তিনি। কিছুতেই যাতে বৈঠা না থামে। যতই অভিজ্ঞতা থাকুক, এমন সময়ে ভয় সবারই লাগে। তবে ভয়কে কেউই আমল দিলো না। সেই যুবক একমনে বৈঠা বাইছে। ডুবে যাবার কোনো শঙ্কা এখন আর তার মধ্যে নেই। আছে শুধু পেরিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা।

আস্তে আস্তে মোহনার ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে সমুদ্রের ভেতরে এসে পড়লো নৌকা, এখানে ঢেউ আছে, তবে একটু আগের সেই জায়গার মতো এলোমেলো নয়, একটা ছন্দ মিশে আছে এই ঢেউগুলোতে। নৌকার মাল্লারা একটু শান্ত হলো। পালের দিকও এবার পরিবর্তন করতে হলো। যুবকের মুখে ফুটে উঠলো হাসি। সমুদ্রে আসার অভিজ্ঞতা তাহলে হয়েই গেল।

উপকূল ডানদিকে রেখে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলো নৌকা। এমনিতে এই নৌকা অনেক বোঝা বইতে পারে। তবে সাধ্যের অর্ধেক বোঝা চাপানো হয়েছে এখানে। কারণটাও স্বাভাবিক। গতি ধরে রাখা। যেই কাজে তারা যাচ্ছে সেখানে সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এই পৃথিবীতে সব কাজে সময়ই শেষ কথা।

ভারী কোনো বোঝা না থাকায় তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকা। মাল্লাদের হাত এক মুহূর্তের জন্য থামে না। শুধু ক্ষিধে নিবারণের বিরতি পড়ে। নির্ঘুম পরিশ্রম করে যায় সবাই।

এক দিন এক রাত নৌকা চলল আরও। তারপর রাত্রি শেষ হয়ে যখন প্রভাত সূর্য সমুদ্র জলে আলোর চিঠিতে চুমো খাচ্ছিল তখনই সর্দারের চোখে পড়লো বন্দরটা। এই বন্দরের কাছেই তাদের নৌকা ভেড়ানোর কথা।

বন্দরে ভেড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে আর গোপন কাজ গোপন থাকবে না। গোপন জায়গাটার কথাও সর্দারকে আগে থেকেই বলে দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনে গোপন জায়গাতে নৌকা ভেড়াতে আদেশ দিলেন তিনি। সময়ের হিসেব করে

দেখলেন, না, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছিল তার আগেই তিনি এসে পৌঁছেছেন এখানে।

নৌকার গলুইয়ে একটা বিশেষ নকশা সম্বলিত লাল নিশান টানিয়ে দিলেন তিনি। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে একটা নির্দোষ কাপড়ের টুকরো, কিন্তু এই নকশাই খবর পাঠিয়ে দেবে সঠিক লোককে।

লোকটা নকশা টানিয়ে দিতে খুব বেশি দেরি করলো না। নির্জন সাগর তীরে চলে এলো সে। সাথে আরও অনেক লোক। তারা নৌকার মধ্যে থাকা জিনিসগুলো নামিয়ে নিতে লাগলো। তাদের কথা থেকেই বুঝতে পারলেন সর্দার, তার আগেই এমন আরও তিনটা নৌকা এসে ঠিক এই জায়গাতেই ভিড়েছিল। সময়ের আগে এসে পৌঁছলেও, তিনিই আসলে চার নৌকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেরি করেছেন।

দূত এগিয়ে চলেছে তীব্র বেগে। ঘোড়াটা বেছে নিয়েছে সে যথেষ্ট সময় নিয়ে। একেবারে নির্ভুল নির্বাচন। মনে হচ্ছে টানা তিন দিন এভাবে ছুটলেও এই ঘোড়া ক্লান্ত হবে না।

ভেরাপ্পন মহারাজ উথিয়ানকে ঠিক খবরই দিয়েছিলেন। ঠিক একদিনের দূরত্বে আছে পান্ড্যদের সেনা শিবির। দূত এসে পৌঁছল সেই শিবিরে।

শিবিরের ঠিক বাইরেই দূত দেখা পেলো মন্ত্রী ভীমসেনের। চিন্তিত মুখ তার। যুদ্ধাবস্থায় মন্ত্রীদের এমন মুখ হওয়াই স্বাভাবিক।

'মহা মন্ত্রী, চেরা মহারাজ উথিয়ানের কাছ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি। মহারাজ ভালুদির কাছে সেই সংবাদ বলতে চাই।'

'আমাকে বলত পারো দূত। মহারাজ এখন একটু অসংলগ্ন অবস্থায় আছেন।'

'ঠিক আছে। এই মুহূর্তে চেরা বাহিনী আর চোলার বাহিনী মুখোমুখি হয়েছে ভেন্নি নামক প্রান্তরে। সেই মাঠের দুই ধারে দাঁড়িয়ে দুই সেনাদল এখন অপেক্ষা করছে আসন্ন যুদ্ধের। যে-কোনো সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। মহারাজ উথিয়ান এই মুহূর্তে আপনাদের সেনার উপস্থিতি কামনা করছেন। তিনি বিশেষ বলে দিয়েছেন, আপনারা যাতে আমার কাছে সংবাদ পাওয়া মাত্র ভেন্নির প্রান্তরের দিকে সেনা যাত্রা করেন।'

মন্ত্রী ভীমসেনের মুখের অবস্থা বদলালো না। দূতের দিকে তাকালেন তিনি, 'মহারাজ ভালুদির সাথে দেখা করবে বলেছিলে না। এসো।'

একটা তাবুর ভেতরে প্রবেশ করলো তারা। সেই তাবুর ভেতরে শুয়ে আছেন মহারাজ ভালুদি। তার অবস্থা দেখে দূতের কেমন যেন সন্দেহ হলো। যেভাবে মহারাজ ভালুদি শুয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি বিশেষ অসুস্থ। তার শয্যার পাশে নানা আরক আর ওষুধি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

'মহারাজের কী হয়েছে?' প্রশ্ন করে দূত।

'বলছি।' মন্ত্রী ভীমসেন দূতের এতক্ষণ বলা কথাগুলো মহারাজকে শোনায়। কোনোকিছুই বাদ দেয় না।

চেহারার সাথে সাথে মহারজা ভালুদির গলার স্বরও দুর্বল, 'আমরা আরও আগেই চেরা বাহিনীর সাথে যোগ দিতাম। কিন্তু যে ভীষণ বিপদ আমাদের ওপর নেমে এসেছে তারপর তো আর কোনোদিকে যাত্রা করার ভাগ্য আমাদের হবে না।' চোখ বুঝে

ফেললেন তিনি। আর কোনো আশা নেই। মহারাজ উখিয়ানের সাথে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা নিয়ে দর কষাকষির আর কোনো সুযোগ রইলো না।

দূত এবার কৌতূহলের মাত্রা বাড়ালো, 'কী হয়েছে মহারাজ?'

'তা তো আর বলে বোঝানো যাবে না। তার চেয়ে তুমি নিজ চোখেই দেখে যাও। একমাত্র নিজের চোখে দেখলেই তুমি আমাদের পরিস্থিতি মহারাজ উখিয়ানকে সবিস্তারে বলতে পারবে। যান ভীমসেন, ওকে দেখিয়ে আনুন।'

মহারাজের তাবু ত্যাগ করলেন তারা। দূতকে নিয়ে মহারাজের তাবু থেকে একটু দূরে স্থাপিত তাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন মন্ত্রী ভীমসেন।

তাবুতে ঢুকতেই যেন ভীষণ এক ধাক্কা খেলো দূত। এই তাবুতে অনেক মানুষ শয্যাশায়ী। সবার শরীরেই মারাত্মক ক্ষত বিদ্যমান। আর সেই সাথে কমবেশি সবাই আর্তনাদ করছে ভীষণ কষ্টে। চাপা সেই আর্তনাদ। জোরে চিৎকার করার শক্তিও সেই দেহগুলোতে অবশিষ্ট নেই।

দূত ছিটকে বেরিয়ে এলো তাবু থেকে। বিস্ফোরিত তার দৃষ্টি, 'এসব কী মহা মন্ত্রী?'

'এসবই আমাদের ভাগ্য।' জবাব দিলেন মন্ত্রী, 'মহারাজ উখিয়ানকে গিয়ে বলবেন তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন। আমাদের সেনার ভেতরে নীহারিকা মহামারী আক্রমণ করেছে। এখন আমরা যেই স্থানে যাবো সেই জায়গা শ্মশান হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনো বৈদ্য, কোনো ওষুধ এই রোগের নিবারন করতে পারবে না। এই রোগের প্রতিকার কেবল ঈশ্বরের হাতে।'

'এখন তাহলে কী হবে?'

'আমরা আমাদের ভাগ্য মেনে নিয়ে অপেক্ষা করবো। দেখা যাক, কতজনের রক্ত শুষে নিয়ে এই রোগের ক্ষিধে মেটে। আমরা যদি এখন চেরা বাহিনীর সাথে যোগ দেই তাহলে আমাদের এই রোগ চেরা বাহিনীতেও ছড়িয়ে পড়বে। এই ঝুঁকি আমরা কেউই নিতে পারবো না। তুমি মহারাজকে জানাবে, আমরা অপারগ।'

এই খবর পাবার পর আর বিলম্ব করা চলে না। আতঙ্কে দূতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এই তীব্র ছোঁয়াচে রোগের সান্নিধ্যে একটু আগে সেও এসেছে। পান্ড্য সেনা শিবির থেকে ঘোড়া বের করে আগের থেকেও বেগে ছোটালো সে। এই জায়গা থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় দূরে চলে যেতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটতে লাগলো সে। পান্ড্যদের এই খবর অবিলম্বে ভেন্নিতে পৌছাতে হবে।

৫৫

এখন আর কোনো কিছুই লুকানো নেই। কোনো পক্ষের প্রতিপক্ষ থেকে লুকানোর কিছুই নেই। কোনো গোপন খবরের প্রতীক্ষা নেই, গুপ্তচরদের গা ঢেকে চলাচল করার প্রয়োজনীয়তাও প্রায় ফুরিয়েছে। কোনো ফিসফাস শব্দ নেই বাতাসে। নিয়তি তার অমোঘ আচল মেলে রেখেছে এই প্রান্তরে।

কাল থেকেই ভেন্নির প্রান্তরে দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে আছে। কোনো পক্ষ থেকেই এখনও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার যার শিবিরের নিয়মিত কাজ চলছে কেবল। তবে প্রকৃতি পরিস্থিতি বুঝতে পারে। ভেন্নির প্রান্তরের প্রকৃতিও সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছে।

প্রান্তরের ধুলোয়, ছোটো ছোটো ঘাসে মৃদু পরিবর্তন এসেছে। হাওয়া তার গতিপথ বদলে ফেলছে আস্তে আস্তে। প্রান্তরের মাঝে যে ধুলো বাতাসের পিঠে সওয়ার হয়ে খেলা করছে, আর মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে, সেই ধুলো এতক্ষণে জেনে গেছে এখন আর বৃষ্টির জলের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। ইন্দ্রের আশীর্বাদের আগেই তাদের হয়তো স্পর্শ পেতে হবে জীবন রসের।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হলো। তবু কোথাও কোনো হেলদোল নেই। বাতাস একেবারে থমকে আছে এখন। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।

মহারাজ কারিকালা এখন বসে আছেন ঠিক তার শিবিরের মাঝ বরাবর সামনে। ওপাশের দিকে মেলে রেখেছেন তার দৃষ্টি। ওপাশের শিবিরে আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে আলো। এক এক করে সবগুলো আলোই জ্বলে উঠেছে। এত আলো গোণা সম্ভব না। অনেকগুলো মশাল। তবে সেই মশালের সংখ্যা শত্রু শিবিরের বিস্তৃতি বেশ ভালো ভাবেই প্রকাশ করছে। নিশ্চিতভাবেই তার পাশে এত আলোর ঝলকানি নেই।

ওপাশে নিজের তাবুর সামনে বসে একই কাজ করছেন মহারাজ উথিয়ান। আলোর হিসেব তিনিও করছেন অত্যন্ত সাবধানে। এই আলোর হিসেবই তার সেনাদলের আকারের আধিক্য সবিস্তারে ঘোষণা করছে। মহারাজ উথিয়ান এখন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করে নিচ্ছেন মনে মনে।

নীতিশাস্ত্র বলে, শত্রু যখন সবল হয় তখন তার সাথে যুদ্ধ করতে হয়। কারণ তখন সন্ধি করলে অনেক অপমানজনক শর্ত মেনে নিতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তারচেয়ে মরণ কামড় দিয়েই মরা উচিত। তবে শত্রু দুর্বল হলে সন্ধিই করে বুদ্ধিমান। তখন যুদ্ধে যা প্রাপ্ত হয়, সন্ধিতেই তা পাওয়া সম্ভব। অকারণে লোকক্ষয় আর হয় না।

মহারাজ উথিয়ান এখনও সন্ধির চিন্তা মাথা থেকে বাদ দেননি। এখনও তার মনে হচ্ছে তিনি কারিকালাকে বুঝিয়ে সন্ধির রাস্তায় নিয়ে আসতে পারবেন। কেবল দেখতে হবে অপমানজনক শর্তগুলো যাতে মহারাজ কারিকালার কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে তার ক্রোধ জেগে না ওঠে।

আস্তে আস্তে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসতে লাগলো। পেরিয়ে গেল আরেকটা টান টান রাত্রি। দুই পাশের মশালগুলোই দেখতে দেখতে নিভে আসতে লাগলো। সবগুলো মশাল নিভে গেল সকালের প্রথম মুহূর্তেই। তারপর নিজের শিবিরের একেবারে ওপরে মহারাজ উথিয়ান সাদা নিশান টানিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

নিশান টানানো হতেই খবর পৌঁছে গেল মহারাজ কারিকালার তাবুতে। তিনি বেরিয়ে এসে এই নিশান দেখে অবাক হলেন। সাদা পতাকা তো সন্ধির সংকেত। এত বড়ো সেনা নিয়ে চেরা মহারাজ উথিয়ান কি তাহলে সন্ধি করতে এসেছেন? পুরোপুরি ধন্ধে যে তিনি পড়ে গেছেন তা অস্বীকার করতে পারবেন না মহারাজ কারিকালা। আজ সকাল হতেই বিপক্ষ শিবির থেকে সমর শঙ্খের ধ্বনি আর লাল নিশানের প্রাচুর্য দেখার আশা করেছিলেন তিনি।

প্রকৃতি বোধহয় বুঝতে পেরেছে আজকে তেমন কিছুই হবে না। সে সাহস পেয়ে ছড়াচ্ছে সকালের শুভ্রতা। সেই স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বাতাসের সকালে চেরা শিবির থেকে চারজনের একটা ছোটো দল বেরিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঠে তাদের বসে থাকার ভঙ্গী বেশ অনায়াস। ঘোড়াগুলো চলছেও বেশ ধীরে। মহারাজ উথিয়ানের সাথে সেখানে আছেন মন্ত্রী ভেরাপ্পন। সাথে অন্য দুই প্রধান সেনাপতি। ভেন্নির প্রান্তরে নেমে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন প্রান্তরের মাঝের দিকে। সবাই নিঃশস্ত্র। সন্ধি আলোচনায় যাবার এটাই নিয়ম।

চোলা শিবির থেকে মেলে রাখা সতর্ক চোখে তাদের এই নড়াচড়া প্রথমেই ধরা পড়ে গেছে। মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। প্রতিপক্ষের চারজনকে প্রান্তরে নামতে দেখে তারাও চারজন বেরিয়ে এলেন শিবির থেকে। তারাও দুজন সেনাপতিকে সাথে নিয়েছেন।

দুই দলই একে অপরের দিকে এগোতে লাগলো সমান গতিতে। যখন তারা মুখোমুখি হলো সেই স্থান ভেন্নির প্রান্তরের একেবারে মধ্যরেখায়।

মুখোমুখি হলেও একেবারে কাছাকাছি আসেনি দুই দল। বাইরে থেকে নিঃশস্ত্র মনে হলেও যা কারো কাছেই লুকানো গোপন অস্ত্র থাকতে পারে। দুই দলের সেনাপতিরা প্রথমে এগিয়ে এলেন একে অপরের দিকে। তারপর দুই পক্ষ থেকেই তল্লাশি চালানো হলো। না, কেউই অস্ত্র বহন করেনি। তারপর উভয় পক্ষের সেনাপতিরা বিপরীত দলের মহারাজ আর মন্ত্রীর দেহও তল্লাশি করলো। সকল পরীক্ষা শেষ হলো নির্বিঘ্নে।

এবার আলোচনা শুরু করা যায়। মহারাজ কারিকালা আর মহারাজ উথিয়ান দাঁড়িয়েছেন মুখোমুখি। ইরাম আর ভেরাপ্পনও দাঁড়িয়েছেন মুখোমুখি।

মহারাজ কারিকালাই শুরু করলেন আলোচনা, 'আপনাকে আমার রাজ্যে স্বাগত মহারাজ উথিয়ান।'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন মহারাজ উথিয়ান।

কারিকালা বলে চললেন, 'আমার পিতা স্বর্গলোকে যাবার পরেই আমি এই রাজ্যের রাজা হয়েছি। সেটাই আসলে সাধারণ পথ যুবরাজের রাজা হবার। তবে আপনি মনে হয় জানেন, সেই সাধারণ সরল পথটাই আমার জন্য হয়ে উঠেছিল বেশ কঠিন। মন্ত্রীরা আমার সাথে করেছিল বিশ্বাসঘাতকতা। অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে আমাকে।

নিজের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। বন্দি হতে হয়েছিল। তারপর কয়েক দফা যুদ্ধের পর আমি আমার এই অধিকার ফিরে পেয়েছি। নতুন রাজাকে অভিনন্দন জানানো প্রতিবেশী রাজাদের সাধারণ ভদ্রতা। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি প্রতিবেশী নতুন রাজাকে অভিনন্দন জানাতে প্রমোদ ভ্রমণে না এসে কেন যুদ্ধ সাজে আমাদের রাজ্যে এসেছেন। একজন নতুন রাজার সাথে এমন ব্যবহার কিছুতেই প্রার্থনীয় নয়।'

চেরা শিবিরের দিকে এবার তাকালেন মহারাজ কারিকালা। সেখানে নানা মাপের তাবু স্থাপন করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো তাঁবুটা নিঃসন্দেহে মহারাজ উথিয়ানের। তার অদূরেই আরও কিছু বড়ো মাপের তাবু দেখা যাচ্ছে। সেগুলোই বিদ্রোহী মন্ত্রীদের তাবু। অনেকের মতো সেই মন্ত্রীরাও তাবু থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে আছেন এই মধ্য মাঠের দিকে। কারিকালা এত দূর থেকে দেখেও তাদের চিনতে পারলেন।

'শুধু তাই নয় মহারাজ উথিয়ান। আপনি আমার রাজ্যে শুধু নিজের সেনা নিয়ে আসেননি। আমি ওদিকে দেখতে পাচ্ছি, আমার রাজ্য থেকে যাদের বিতাড়িত করা হয়েছিল, যাদের পাপের রাজধর্ম অনুসারে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তাদেরকেও আপনার সাথে করে নিয়ে এসেছেন। আমি আশা করি তাদেরকে আপনি বন্দি হিসেবেই নিয়ে এসেছেন, যদিও আমি তেমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'না, তারা আমার বন্দি নয়, তারা আমার কাছে শরনাগতি প্রার্থনা করেছিল। আমি তাদের আশ্রয় দিয়েছি।'

'মহারাজ, কোনো রাজদ্রোহীর সাথে সন্ধি স্থাপন করা রাজধর্মের ঘোর লঙ্ঘন তা তো আপনি ভালো করেই জানেন। তাই না মহান চেরা মহারাজ উথিয়ান।' এবার কারিকালা চুপ করে গেলেন। এবার মহারাজ উথিয়ানের জবাব দেবার পালা।

মহারাজ উথিয়ানের মুখে মৃদু হাসি, 'আপনাকে নতুন রাজা হিসেবে অভিনন্দন জানাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মহারাজ। আপনাকে চোলা সম্রাট হিসেবে স্বীকার করে নিতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি এই মুহূর্তে আমার দুই সেনাপতি এবং মন্ত্রীর সামনে আপনাকে চোলা সম্রাট বলে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমার শিবিরে আপনার জন্য বিশেষ শুভেচ্ছা উপঢৌকন রাখা আছে। আমাদের মধ্যকার এই শুভেচ্ছা আলোচনা শেষ হলে সেগুলো আমি আপনার শিবিরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।'

'তাহলে আপনি এত বড়ো সেনা নিয়ে এসেছেন কেন? কেউ তো মহারাজ অস্ত্র আর উপঢৌকন একসাথে নিয়ে আসে না।'

'কারণ তো অবশ্যই আছে মহারাজ। সেনা আনার পেছনেও ছোটো একটা কারণ আছে। তবে আমি যে একেবারে যুদ্ধ চিন্তা করেই সেনা এনেছি তা নয়। আসলে আমাদের তরফ থেকে আপনাদের জন্য কিছু প্রস্তাব আছে। সেই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় সেনার উপস্থিতি থাকলে ভালো হয়। সেই চিন্তা করেই সেনা নিয়ে আসা আরকি।'

'আপনার প্রস্তাব আপনি উপস্থাপন করতে পারেন মহারাজ। শুনে দেখতে তো কোনো ক্ষতি নেই।'

'আচ্ছা, বেশ ভালো। আপনার বয়সের তুলনায় আপনি বেশ পরিণত মহারাজ। আপনার মাথা বেশ ঠান্ডা। আর ঠান্ডা মাথার লোকজন আমার অনেক পছন্দের।'

'আপনার মুখে আমার প্রশংসা শুনে ভালো লাগলো মহারাজ। তবে রাজার মানসিকতা কখনোই তার বয়সের ওপর নির্ভর করে না। সম্পর্কটা সিংহাসনের সাথে। আমি এই বয়সেই এই আসনের অনেক গুণ দেখে ফেলেছি। আর যে-কোনো রাজাই রাজ্যের ওপর আঘাত এলে পরিণত হতে বাধ্য। আমরা মনে হয় সময় নষ্ট করছি মহারাজ। বৃথা বাক্য ব্যয় না করে কাজের কথা আসা যাক। আপনি আপনার প্রস্তাবগুলো একে একে বলুন।'

'আচ্ছা, আমার প্রথম প্রস্তাব বাণিজ্য সংক্রান্ত।'

'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। বৈশ্য ক্ষত্রিয় হিসেবে দক্ষিণ ভারতে ইদানীং আপনার নাম খুব শোনা যাচ্ছে।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না মহারাজ উথিয়ান, 'তাতে কিন্তু আপনার আমার দুজনেরই লাভ।'

'তার মানে বাকি প্রস্তাবগুলোতে দুই পক্ষের লাভের কোনো ব্যাপার নেই, তাই তো?'

মহারাজ উথিয়ান এই প্রশ্নটাও সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার এই প্রস্তাব অনুসারে আপনাদেরকে রাজ্যের অর্ধেক জমিতে মসলার চাষ করতে হবে। আপনার রাজ্যের মাটিতে মসলা বেশ ভালোই ফলবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনি তো অবশ্যই জানেন, আমাদের বন্দরে এই মসলার কত চাহিদা। আমরা আপনাদের কাছ থেকে উৎপাদিত মশলা ন্যায্য দামেই কিনে নেবো। আপনাদের রাজকোষ অনেক স্বর্ণমুদ্রায় ভরে উঠবে। আপনাদের রাজ্যের এখন ভঙ্গুর দশা। এই সময়ে স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে বড়ো বন্ধু আপনাদের রাজ্যের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।'

মহারাজ কারিকালা প্রস্তাব শুনে মন্ত্রী ইরামের দিকে তাকালেন। এতক্ষণ দুই মহারাজ ছাড়া কেউ কোনো কথা বলেনি। এবার কথা বললেন মন্ত্রী ইরাম, 'আমার মনে হয়, মহারাজ উথিয়ানের প্রথম শর্ত শুনেই মতামত দেওয়াটা উচিত হবে না। চিন্তা ভাবনার ব্যাপার আছে। আর সেই সাথে বাকি প্রস্তাবগুলোও আমাদের শুনে নেওয়া উচিত।'

মহারাজ কারিকালা একমত হলেন, 'তাই হোক। বলে যান মহারাজ। আপনার পরের প্রস্তাবগুলো শুনে দেখি।'

'আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব একতা নিয়ে। আমার মনে হয়, আমরা দক্ষিণের তিন রাজ্য অনেকদিন ধরেই একেবারে আলাদা হয়ে আছি। একে অপরের শত্রু হয়ে আছি। এটা কিন্তু আমাদের জন্য চরম বোকামির কাজ হচ্ছে। আমরা আমাদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হেলায় হারাচ্ছি। আপনার কী মনে হয়?'

'প্রতিবেশী রাজার সাথে শত্রুতা রাখা অবশ্যই ক্ষতিকারক। আমাদের এমন কোনো অভিপ্রায় নেই।'

'শুনে বেশ খুশি হলাম। তাহলে আমার এই প্রস্তাব আপনার ভালো লাগবে। আমরা তিন রাজ্য মিলে এক হয়ে যাবো। তখন বাইরের কেউই আমাদের দিকে চোখ তুলে

তাকাতে সাহস পাবে না। পান্ড্য রাজা এরই মধ্যে আমার এই শর্তে একমত হয়েছেন। সেই সাথে তিনি নিজের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ আমার অধিকারে অর্পণ করেছেন।' শেষ বাক্যটা বলার সময় মহারাজ উথিয়ানের গলার প্রচ্ছন্ন হুমকি কারিকালার এবং ইরামের কান এড়ালো না।

'এখন আমি চাই, আপনারাও আপনাদের সেনাবাহিনীর পূর্ণ অধিকার আমাকে দেবেন। তাহলেই আমরা তিন রাজ্য মিলে এক হয়ে শত্রুদের মূলেই ধ্বংস করে দিতে পারবো।'

মুচকি হাসলেন মহারাজ কারিকালা, 'বুঝেছি মহারাজ উথিয়ান। আপনি এখন আর আমাদের মতো এক রাজ্যের রাজা হয়ে থাকতে চাচ্ছেন না। ধনবলে বলীয়ান হয়ে আপনার মনে এখন দক্ষিণ ভারতের চক্রবর্তী হবার ইচ্ছে জেগেছে। বলতেই হচ্ছে, বেশ ভালো চিন্তা।'

এবারও পাল্টা জবাব দিলেন না মহারাজ উথিয়ান, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন। চলে গেলেন তার তৃতীয় আর শেষ প্রস্তাবে, 'আর শেষ প্রস্তাবটা আসলে আমার হিতের জন্য নয়। এটা আমাকে দিতে হচ্ছে শান্তির জন্য। অনেক যুদ্ধ হয়েছে। আর রক্তপাত আমার কাম্য নয়। আপনার বিদ্রোহী পরাজিত মন্ত্রীদল আমার শরণে এসেছে। তাদেরকে আমি অভয় বচন দিয়েছি। তাদের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সমস্যা সমাধান করার অধিকার তারা আমাকে দিয়েছে।'

'শান্তিপূর্ণ সমাধান কী হবে?'

'আপনি তাদের জন্য চোলা রাজ্যের কিছুটা ছেড়ে দেবেন। সেই অংশে রাজত্ব করবে তারা। নিজের রাজ্য স্থাপন করে সব ভুলে তারা আবার নতুন করে বাঁচবেন। এতে করে সবাই শান্তিতে থাকবে। আসলে শান্তিই আমার একান্ত কামনা।'

মহারাজ উথিয়ানের পেছনের বিশাল সেনার ওপর চোখ ঘুরিয়ে আনলেন মহারাজ কারিকালা, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'সবাই শান্তিতে থাকুক। এই দক্ষিণ ভারতের কেউই আর নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এই হচ্ছে আমার তিনটে প্রস্তাব। এখন বলুন, আপনার শিবিরে উপঢৌকন কখন পাঠাবো?'

মহারাজ কারিকালা পুরোপুরি নিশ্চুপ। তার ভেতরটা ফেটে পড়তে চাচ্ছে। ইরাম ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছেন তার দিকে। এখন প্রতিটা শব্দই খুব বাছাই করে বলতে হবে।

কারিকালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মুখ থেকে নিচু স্বরে কিছু কথা ভেসে আসছে। নিজের মনেই বিড়বিড় করছেন তিনি। পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না, কিছু কিছু কথা কেবল শোনা যাচ্ছে, 'যুদ্ধ নয়', 'শান্তি নয়', 'সবার আগে আত্মমর্যাদা', 'সবার আগে স্বাধীনতা।'

আরও কিছুক্ষণ নিজের সাথে বিড়বিড় করলেন কারিকালা। মহারাজ উথিয়ান তার মুখটা একটু এগিয়ে আনলেন, 'আপনি কি কিছু বললেন?'

মাথাটা তুলে সরাসরি মহারাজ উথিয়ানের দিকে তাকালেন কারিকালা। ততক্ষণে তার স্বাভাবিক চোখ রক্তচক্ষুতে পরিণত হয়েছে, 'আপনার তিনটা প্রস্তাবের কথা এক এক করে বলি।

আপনি আপনার রাজ্যের ভূমিকে কী হিসেবে দেখেন তা আমি জানি না। তবে এই চোলা রাজ্যের ভূমি আমাদের মাতা। আর আমাদের মাতা আমাদের পরম আদর করে খাওয়ায়, কারো রক্ষিতা হিসেবে আমাদের মাকে আমরা পাঠাতে পারবো না। তার আগে মৃত্যুই শ্রেয়। আমাদের ভূমি আমাদের সম্মান পেয়ে যাবে সারা জীবন। আমাদের ভূমিতে আর কারো ইচ্ছে চলবে না।

আপনাদের প্রথম প্রস্তাবটা মোটামুটি ভদ্রোচিত। তবে সেটাই আমাদের কাছে যথেষ্ট অপমানজনক ছিল। তবে সেটা ক্ষমা করা যায়। আর শেষ দুটো প্রস্তাব তো ভদ্রতার সামান্য সীমাও অতিক্রম করে গেছে। কোনো রাজা যদি নিজের সেনা দিয়ে নিজের রাজ্য বাঁচাতে না পারেন তবে তার উচিত রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে চলে যাওয়া। তবে আপনার ভয়ের কারণ বুঝতে পেরেছি। কখনো যদি আপনার রাজ্যে শত্রু আক্রমণ করে, তাহলে আমাকে একবার খবর পাঠাবেন। তখন আমরা চিন্তা করে দেখবো, একজন প্রতিবেশী অসহায় রাজাকে সাহায্য করা যায় কি না।

আর আপনার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে শেষের প্রস্তাবটা। একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা হিসেবে আপনার উচিত বিশ্বাসঘাতকদের আমাদের হাতে অর্পণ করা। আমি তাদের অপরাধ অনুযায়ী যথাযথ শাস্তি দেবো। সেটা না করে আপনি তাদের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। শুধু তাই না, নিজের মিত্রের জন্য আমার কাছে ভূমি প্রার্থনা করেছেন। এত বড়ো অন্যায় আবদার আর্যাবর্তের ইতিহাসে বিরলই বলতে হবে।'

এতক্ষণ মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন মহারাজ উথিয়ান। তার চোখের রঙও কিঞ্চিত লাল বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু তার স্বর উদাস, 'একটা কথা ভুল বললেন। আমি আমার মিত্রের জন্য ভূমি প্রার্থনা করিনি। আপনাকে দিতে আদেশ করেছি। সবল কখনো প্রার্থনা করে না।'

'যে পরীক্ষা না দিয়েই নিজেকে সবল বলে অহংকার করে তার প্রতি আমার করুণা হয়।'

'তাহলে এতক্ষণ যা বলেছেন সেগুলোই আমার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার শেষ কথা? না-কি আরেকটু ভেবেচিন্তে দেখবেন?'

'না, আর ভাবার প্রয়োজন নেই।'

'ভেবেছিলাম যুদ্ধের প্রয়োজন পড়বে না। প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব আপনি মেনে নেবেন। কিন্তু এখন তো দেখছি যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় নেই।'

কারিকালার স্বর দৃঢ়, ক্রোধের বেশ জোরালো আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে, 'না, যুদ্ধ এড়াবার আরেকটা উপায় এখনও আছে।'

মহারাজ উথিয়ানের স্বর স্থির, 'কী সেটা?'

'এতক্ষণ আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি। এবার আপনি আমারটা শুনবেন। প্রথমেই আমার রাজ্যে সেনা সমাবেশ করে আপনি ঘোরতর অন্যায় করেছেন। সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান আবশ্যক। তবে তারপরও আমি সব ভুলে যাবো। আপনাদেরকে চলে যেতে দেবো। এই মুহূর্তে আপনারা আপনার রাজ্যের দিকে ফিরতি পথ ধরবেন। আর সেই সাথে যাবার আগে আপনার কাছে যারা শরণাগতি প্রত্যাশা করেছিল, সেই বিদ্রোহী

কুকুরের দলকে আমার হাতে সোপর্দ করে যাবেন। তাহলেই আর কোনো সমস্যা হবে না।'

মহারাজ উথিয়ানের স্বরে এবার রাগের আভাস ফুটে উঠলো স্পষ্ট, 'আপনি বোধহয় দূর থেকে খুব ভালো দেখতে পান না। যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতেন তাহলে আমার সেনার আকার সম্পর্কে আপনি ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন। ফিরে যাবার জন্য আমরা এতদূর আসিনি। ভুল করবেন না। আপনার সেনাসহ আপনি কিন্তু ছারখার হয়ে যাবেন।'

কারিকালার কাঁধ চেপে ধরলেন ইরাম। একটু চাপ দিয়ে বোঝালেন সংযত হতে।

হুমকি এখনও শেষ হয়নি মহারাজ উথিয়ানের, 'রাজা হিসেবে নির্বিঘ্নে চোলা শাসন করার সুযোগ আপনার সামনেই ছিল। এখন তার বদলে অকাল মৃত্যু হবে আপনার। এখন আমরা শিবিরে ফিরে যাবো। আজ সারাদিন অপেক্ষা করবো। যদি আজ সারদিনে আপনার সিদ্ধান্ত বদলের কোনো খবর আমরা না পাই, তাহলে কাল সকালে আপনাকে আর নিরাশ হতে হবে না। লাল নিশান অবশ্যই দেখতে পাবেন।'

মহারাজ কারিকালাও সমাপনী পরামর্শ দিলেন, 'আপনিও আজ বিকেলের মধ্যে ওদেরকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে নিজেও উল্টো ঘুরবেন। আমিও আপনাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি। নয়তো কাল সকালে আপনাদের লাল নিশানের আগে আমাদের লাল নিশান উড়বে।'

শিবিরে ফিরে সময় নষ্ট করলেন না দুই পক্ষের কেউই। ইরাম আর কারিকালা বসেছেন মুখোমুখি।

'এখনও তো সাতবাহন সেনারা এসে পৌছল না। আমাদের হাতে আর সময় নেই। এখন কী করবো কাকা?' হাত কামড়ানোর অবস্থা কারিকালার।

ইরাম কিছুই বললেন না। অনেকদিন পর আজকেই তার মাথায় কিছুই আসছে না। একটাই ভরসা। মনে হচ্ছে সাতবাহন মন্ত্রীর বচন অবশ্যই রক্ষা হবে।

মহারাজ উথিয়ান অপেক্ষা করছেন পান্ড্য সেনার কাছে পাঠানো দূতের পথ চেয়ে। সেই সেনা এলে একেবারে চেপে ধরা যাবে।

তবে সেনা আসুক আর নাই আসুক, দুই পক্ষের দুই তাবুতে সবাই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, প্রতিপক্ষ কিছুতেই মাথা নোয়াবে না।

কাল সকালে যুদ্ধ সুনিশ্চিত।

৫৬

আর্যাবর্তের সবখানে এখন অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্রের খেলা চলছে। সবাই সবার পথে এখন কাঁটা বিছাতে ব্যস্ত। এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না, কেউ কারো কথা রাখবে বলে মনেও হচ্ছে না।

তবে আজ সকালে দুই পক্ষই নিজেদের কথা পুরোপুরি রক্ষা করেছে। লাল নিশান নানা জায়গায় সগর্বে দুই দলের শিবিরেই উড়ছে। সৈন্যরা ছোটাছুটি করছে নানা কাজে। একটু একটু করে সম্পন্ন হচ্ছে শেষ প্রস্তুতি।

ভেন্নির প্রান্তরের প্রকৃতিও আজকে অনেকটাই বদলে গেছে। ভবিষ্যৎ আঁচ করে ফেলেছে হয়তো। কালকের সাথে আজকে সকালের বাতাসের অনেক প্রভেদ। বোবা প্রকৃতি নিজের মনোভাব বোঝাচ্ছে বায়ুর মাধ্যমে। প্রান্তরের কিছু কিছু স্থানে একটু পরপরই উৎপন্ন হচ্ছে ধুলোর ঘূর্ণি।

কাল আলোচনার পরে দুই রাজার মাথায় ক্রোধ খুব গেঁড়ে বসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এখন সময় গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে সেই ক্রোধ অনেকটাই কমে এসেছে। অলস মাথায় রাগ অনেকক্ষণ বাস করতে পারলেও কর্মময় মাথার সামনের কাজের চিন্তা সেসব বাজে অনুভূতিকে পাত্তা দিতে বাঁধা দেয়। এখন দুই রাজার মাথাই একেবারে ছায়াময় সরোবরের জলের মতো ঠান্ডা।

মহারাজ কারিকালা এবং মহারাজ উথিয়ান এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাপছেন প্রতিপক্ষকে। মহারাজ কারিকালার স্মৃতিতে যুদ্ধ এখনও তাজা। সমর নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে তার তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

খুব একটা সমস্যা মহারাজ উথিয়ানেরও হয়নি। তিনি ছোটোবেলা থেকেই ঠান্ডা মাথার লোক। কখনো তেমন বড়ো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বিদ্যা জাহির করার সুযোগ না পেলেও ছোটোবেলা থেকে তার যুদ্ধের সকল শাস্ত্রের পুরোপুরি শিক্ষা হয়েছিল। যুদ্ধ যদিও কখনোই তার পছন্দের তালিকায় ছিল না, তবু এই কথা কে না জানে, ঠান্ডা মাথার লোক প্রয়োজনীয় অপছন্দের কাজও ভালোভাবে করতে পারে।

প্রথমেই বিপক্ষ দলের শক্তির দিকে নজর দিয়েছেন দুজনে। মহারাজ কারিকালার সৈন্য সংখ্যা কম হতে পারে তবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আগে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই অবস্থানগত সুবিধা নিয়ে তিনি প্রান্তরের একটু উঁচু ভাগে আছেন।

মহারাজ উথিয়ানের চোখে সেই জিনিসটাই পড়েছে সবার আগে। মহারাজ কারিকালার সেনারা নিক্ষেপ অস্ত্রের ক্ষেত্রে এখানে বিশেষ সুবিধা পাবে। তীর আর বর্শার বেগ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেড়ে যাবে। তার মানে শত্রুর দিকে ধেয়ে আক্রমণ করলে বিপদ আছে।

নিজের আক্রমণের চিন্তাও তিনি করছেন। কেবল মহারাজ কারিকালার সুবিধার কথা না ভেবে নিজের শক্তি প্রয়োগের সঠিক কৌশল ভাবতে হবে। তবে তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আক্রমণের ক্ষেত্রে তাকে বার বার ভাবাচ্ছে সেই প্রথম

ব্যাপারটাই। শত্রুর ওপরে অবস্থান। শুরুতেই ঘোড়সওয়ার পাঠানোর ইচ্ছে তার নেই। হস্তী বাহিনীর ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত। শুরুতে যদি পদাতিকেরা এগিয়ে যায় তবে ঢালে কোনোভাবেই স্বাভাবিক গতি পাবে না। সেই মন্থর গতির সৈনিকদের তির মেরে সহজেই ঘায়েল করতে পারবে কারিকালার সেনারা। নিজের সৈন্যদের সোজা ঐ বিপদের খপ্পরে পড়তে দেওয়া যাবে না।

এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যূহ রচনা। নিজের এবং সেই সাথে শত্রুরও। শত্রু সৈন্য সংখ্যায় দুর্বল। স্বভাবতই তাদের প্রধান পরিকল্পনা থাকবে যেভাবেই হোক নিজের সৈন্য বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষের বেশির ভাগ সৈন্যের প্রাণ হরণ করা।

ওদিকে কারিকালা এত কিছু চিন্তা করছেন না। তিনি নিজের ব্যূহ সাজিয়ে ফেলেছেন। উঁচু জমি থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াই স্বাভাবিক। তাই নিয়েছেন তিনি। তিনি যে ব্যূহ সাজিয়েছেন যুদ্ধকলায় সেই ব্যূহের বিশদ বর্ণনা আছে। আর সেই ব্যূহ রচনা একেবারে নিখুঁত হয়েছে। অনেক দূর থেকে দেখেই চেনা যাচ্ছে।

প্রতিপক্ষের মহারাজ উথিয়ানও ব্যূহটা দেখামাত্রই চিনতে পেরেছেন। 'গরুড়' ব্যূহ। পাখির ডানা দুদিকে সম্পূর্ণ মেলে রয়েছে। সেই ডানার সামনের অংশে ঘোড়সওয়াররা। পেছনে পদাতিক। তিরন্দাজরা আছে ব্যূহের একেবারে পেছনের দিকে। পাখির পেটে ঢাল তলোয়ার ধারী ঘোড়সওয়াররা আছে। লম্বাটে পাখির দেহের একেবারে সামনে মাথা। সেই মাথায় যেখানে ঠোঁটের অবস্থান হবার কথা সেখানে সম্পূর্ণ যুদ্ধ সাজে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন মহারাজ কারিকালা। ঢাল আর বর্শা নিয়ে তার ঠিক পেছনেই ব্যূহের প্রথম সারিতে আছেন চোলা রাজ্যের সেরা সৈন্যরা।

প্রথমে নিজের মাথায় 'সমুদ্র' ব্যূহ সাজিয়েছিলেন মহারাজ উথিয়ান। সৈন্য সংখ্যা বেশি হলে সেই ব্যূহ দিয়েই হিসেব ঠিক রেখে যুদ্ধ করা যায়। নিজের সেনাও মরবে, পরের সেনাও মরবে, আর শেষে কম সৈন্যের মালিক রাজা হেরে যাবেন।

তবে সামনে 'গরুড়' ব্যূহ দেখে পুঁথিগত সেই চিন্তা বাদ দিতে বাধ্য হলেন তিনি। তিনি যে সমুদ্র ব্যূহ গঠন করবেন তা নিশ্চয়ই মহারাজ কারিকালাও বুঝতে পেরেছিলেন। তার প্রতিকার তিনি করেছেন গরুড় ব্যূহে। আর একবার সাবধানে কারিকালার তিরন্দাজদের দিকে তাকালেন তিনি। না, তারা সমুদ্র ব্যূহ ঠেকিয়ে দেবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি আছে। এখানে পুঁথিগত বিদ্যা কাজে লাগালে ধরা খেতে হবে।

মহারাজ কারিকালা তলোয়ার উঁচু করে ধরলেন। সাথে সাথে একই সাথে অনেকগুলো যুদ্ধ বাজনা বেজে উঠলো। শিঙ্গাগুলো বেশ জোরে বাজছে।

মহারাজ উথিয়ানের পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধ মন্ত্রী বলে উঠলেন, 'ঐ যে, যুদ্ধ শুরুর সংকেত দিলো।'

এই সংকেতের মানে মহারাজ উথিয়ান বৃদ্ধ মন্ত্রী না বলে দিলেও বুঝতে পারতেন। রণ আস্ফালন করে তাকে রণে আহবান করছেন মহারাজ কারিকালা।

এই আস্ফালনের উত্তর না দেওয়া রীতিমতো কাপুরুষতা। উত্তর দিলেন মহারাজ উথিয়ান। তবে সেই উত্তর অহেতুক শব্দ দিয়ে দেওয়া হলো না। দেওয়া হলো কর্মে।

মহারাজ কারিকালা দেখতে পেলেন, হঠাৎ করে চেরা বাহিনীর প্রথম তিন সারি নড়ে উঠেছে। প্রথমে দেখতে সমুদ্র ব্যূহ মনে হলেও ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে তা

সম্পূর্ণ অন্যরকম এক ব্যূহের আকার ধারণ করছে। যুদ্ধ শিঙ্গার শব্দ সংকেতের সাথে সাথে আকার পেতে লাগলো সেই নতুন ব্যূহ। এই কৌশল দেখে ভ্রু কোঁচকাতে বাধ্য হলো মহারাজ কারিকালার। বলতে গেলে সৈন্যরা এগোতে এগোতে ব্যূহ নির্মাণ করছে। এটা খুবই শক্তিশালী এবং প্রশিক্ষিত সেনাদলের লক্ষণ।

মহারাজ কারিকালা যে একাই সেই ব্যূহের পরিবর্তন দেখছেন তা নয়, সেই সাথে তার মন্ত্রীরাও দেখছেন। তাদের চিন্তিত চোখের সামনে সেনাদল একসময় 'অর্ধচন্দ্র' ব্যূহের আকার ধারণ করলো।

গরুড় ব্যূহ রচনা করার পেছনে বেশ ভালো কারণ ছিল মহারজা কারিকালার। তিনি জানতেন, প্রথমেই সমুদ্র ব্যূহ দিয়ে আক্রমণ করে তাদের গুঁড়িয়ে দিতে চাইবেন মহারাজ উথিয়ান। কিন্তু তিনি মাথা গরম করে নয়, একেবারে ঠান্ডা মাথায় অন্যরকম চাল দিয়েছেন। এমনিতেও গরুড় ব্যূহের সামনে সমুদ্র ব্যূহ দিয়েই আক্রমণ করার নিয়ম। তবে হঠাৎ করে বানানো এই অর্ধচন্দ্র ব্যূহে তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।

প্রধান সেনাপতি কারিকালার পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'মহারাজ ওরা তো অর্ধচন্দ্রে আক্রমণ করছে আমাদের।'

'দেখতে পেয়েছি।'

'এই ব্যূহের সামনে গরুড় ব্যূহ দিয়ে সুবিধা করা যাবে না। আমাদের এখনই 'পদ্ম' ব্যূহ তৈরি করে নিজেদের সেনা রক্ষা করা উচিত। আমি কি সেনাকে সেই সংকেত দেবো?'

'আমি জানি, অর্ধচন্দ্র ব্যূহের সামনে একমাত্র পদ্ম ব্যূহই আমাকে যুদ্ধ জেতাতে পারে। তবে এখানে যুদ্ধ জয় করা এত সহজ হবে না। পদ্ম ব্যূহ তৈরি আমি করবো। তবে তার আগে আমার তিরন্দাজদের তাদের কাজ করতে দিন। তৈরি হতে বলুন তাদের।'

তিরন্দাজদের তৈরি হবার সংকেত দেওয়া হলো। সকল তিরন্দাজ একইসাথে ধনুকে তির জুড়ে তৈরি হলো। টানটান হয়ে গেল সবার ছিলা। ভূমির সাথে অর্ধ সমকোণে আছে তাদের তিরের ফলা।

যুদ্ধ এবার শুরু হবে। সামনের শত্রুর দিকে তাকিয়ে আছেন মহারাজ কারিকালা। সময় হতেই তলোয়ার দিয়ে বাতাসে কোপ দিলেন। সাথে সাথে খুলে গেল তিরন্দাজদের দুটো আঙ্গুল। সবগুলো তির আকাশ ঢেকে দিয়ে ছুটে গেল।

যদি সামনের শত্রুরা সমুদ্র ব্যূহ গঠন করে ছুটে আসতো তাহলে এই ছোঁড়া তীরের বৃষ্টিতে তার অনেক ক্ষতি সাধিত হতো। তবে অর্ধচন্দ্রে সৈন্যরা অনেক ছড়ানো অবস্থায় থাকে। সেখানে তির ছুঁড়ে তেমন সুবিধা করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে ভরসা কেবল ঐ উঁচু জায়গা। তীরের তীব্র গতি বেশ কয়েকজন সৈন্যকে মাটিতে ফেলে দিলো।

এই ঘটনায় বেশ উৎসাহ পেয়ে গেল তিরন্দাজরা। আবার তির জুড়ে লক্ষ্য ঠিক করে ছুঁড়ল তারা। এবারে সামনের সেনার কিছু ক্ষতি হলো। তবে অর্ধচন্দ্রের গতি একটুও কমলো না। পেছন থেকে মহারাজ উথিয়ানের সেনার সংকেতে দুর্বার বেগে এগিয়ে আসছে তারা।

মহারাজ কারিকালা বুঝতে পেরেছেন, তির ছুঁড়ে সামনে অর্ধচন্দ্র আটকানো যাবে না। তারা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে। এবার তাকেও এগোতে হবে। গতির বিরুদ্ধে কাজ করাতে হবে গতিকে।

সেনার প্রথম দুই সারি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন মহারাজ কারিকালা। তার মাথায় পদ্ম ব্যূহ ঘুরছে না। উঁচু জায়গার সুবিধা নিতে হবে ভালো মতো। প্রতিপক্ষকে ঘাবড়ে দিতে হবে। বেশ অভিনব সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অর্ধচন্দ্রের উত্তরে তিনিও প্রেরণ করলেন দুই সারি সৈন্য দিয়ে তৈরি অর্ধচন্দ্র।

মহারাজ উথিয়ান এবার বেশ অবাক হলেন। মহারাজ কারিকালার প্রতিপক্ষকে ঘাবড়ে দেবার কৌশল বেশ সফল হয়েছে। অর্ধচন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্ধচন্দ্র প্রেরণ করার কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। তবে ক্ষেত্রে যখন চতুরঙ্গের আন্দোলনে ধুলো উড়তে শুরু করে সেখানে কোনো শাস্ত্র থাকে না।

এখন সামনে চেয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। দুই অর্ধচন্দ্র পরস্পরের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। শিঙ্গার সংকেতে এখন আর কোনোভাবেই তার প্রেরিত সেনারা নতুন ব্যূহ গঠন করতে পারবে না। এখন শুধু এই সংঘর্ষের পরিণতি দেখার অপেক্ষা।

প্রবল উত্তেজনা মাথায় নিয়ে পরিণতি দেখার জন্য তাকিয়ে আছে সবাই। মহারাজ কারিকালা উত্তেজনায় অসি কোষমুক্ত করে ফেলেছেন। ভুলে গেছেন এখন তার লড়ার সময় আসেনি।

দুই অর্ধচন্দ্রের সংঘর্ষ হলো প্রায়। প্রথমে দুই ছুঁচালো মধ্যভাগ আর তারপরে স্ফীত মধ্যাংশ কাছাকছি হলো একে অপরের।

সেনাদের দক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। দুই পক্ষের সেনারাই প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো। মহারাজ কারিকালা নিজের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দেখতে উৎসুক হলেন।

মহারাজ কারিকালার সেনারা এখনো উঁচু জায়গার সুবিধা পাচ্ছে। এটা মহারাজ আগে থেকেই জানতেন। তিনি এই অর্ধচন্দ্রে সব লম্বা বর্শাধারী সৈনিক পাঠিয়েছিলেন। সেই সেনারা একই সাথে উঁচু স্থানের সুবিধা নিতে উদ্যোগী হলো। সবেগে নিচের দিকে বর্শা চালাতে লাগলো তারা। তীব্র বেগের আঘাতে মহারাজ উথিয়ানের সেনারা কেঁপে উঠলো। তাদের বর্ম এবং ঢাল তেমন কোন কাজেই আসছে না। তবে সংখ্যায় কম হওয়ায় কারিকালার সেনারা সুবিধার মাত্রাটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারলো না।

কারিকালার সেনাদের অর্ধচন্দ্রে বর্শা হাতে এগিয়ে আসতে দেখেই বর্তমান পরিস্থিতি আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন মহারাজ উথিয়ান। নিজের মগজ তাকে সেই সমস্যার সমাধান দিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। বর্শা হাতে একটু ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাদলের মোকাবেলা করা যে-কোনো অস্ত্র দিয়েই বেশ কঠিন। এবং এই পরিস্থিতি সামলাতে কেবল একটা উপায়ই আছে।

ক্ষেপনাস্ত্র!

নিজের হাতের ইশারায় বিশেষ শিঙ্গা ধ্বনি বাজাতে নির্দেশ দিলেন মহারাজ উথিয়ান। এই আদেশের জন্য বাদকরা সব সময় তৈরিই থাকে। অবিলম্বে শিঙ্গা ধ্বনি বেজে উঠলো।

চেরা সৈন্যরা সেই ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। মহারাজের আদেশ বুঝতে পেরে পালন করলো সাথে সাথে। চেরা রাজ্যের প্রত্যেক সৈন্যের কাছেই হস্তত্রাণে দুটো ছোটো ছুরি রাখা আছে। তাড়াতাড়ি ছুরিগুলো বের করে নিতে লাগলো তারা। তারপর সবাই একযোগে এক এক করে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

বর্শা হাতে কতৃত্ব করতে থাকা চোলা সেনারা একটু ঘাবড়ে না গিয়ে পারলো না। তাদের পরিকল্পনা এখন আর কাজ করবে না। শত্রু বর্শার আওতা থেকে একটু দূর থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রাণ হন্তারক ছুরি। চোখের পল না ফেলতে সেই ছুরি এসে আঘাত করছে। ঢাল দিয়ে ঠেকিয়ে দেবার তেমন কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। শরীরের নানা স্থানে ছুরির খোঁচা খেয়ে তারা ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে ঢাল ঠিক করতে করতে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

মহারাজ কারিকালা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন কী করতে হবে। ক্ষেপণাস্ত্রের উত্তর অমুক্ত অস্ত্র দিয়ে দেওয়া যাবে না। বর্শা একই সাথে মুক্ত, অমুক্ত দুই রূপেই কাজ করতে পারে। তিনি শিঙ্গার আওয়াজে নিজের সৈন্যদের বর্শা ছুঁড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়ে চোলা সেনারা আর দেরি করলো না। একযোগে সবাই ছুঁড়তে শুরু করলো বর্শা। চেরা সেনার ক্ষতিও নেহাত কম হলো না। দেখতে দেখতে তাদের ছোঁড়া ছুরি আর প্রতিপক্ষের ছোঁড়া বর্শা নিঃশেষ হলো।

এবার আর শিঙ্গার আওয়াজ শোনার দরকার নেই। নিজের সৈনিক মনের তাড়না মেনে নিয়ে মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়লো একে অন্যের ওপর। কেউ কোমর থেকে অসি খুলে নিয়েছে, কেউ আবার কুড়িয়ে নিয়েছে বর্শা অথবা ছুরি। কোনটা নিজের অস্ত্র আর কোনটা শত্রুর কিছুক্ষণ পরে তার আর কোনো বালাই রইলো না।

দুই দল থেকেই সেনা খুব বেশি পাঠানো হয়নি। তবে চোলাদের সেনা সংখ্যার কথা চিন্তা করলে এটাই অনেক বেশি। দুই পক্ষের অবশিষ্ট সেনারা যুদ্ধ করতে লাগলো এবার এলোপাথাড়ি। কোন ধরনের নিয়ম কানুনের বালাই নেই এখন ভেন্নির প্রান্তরের মাঝখানে। আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে সৈন্যরা। কেউ সঠিক আঘাত করতে সফল হচ্ছে, কারো শরীরের নানা কাঁটা অংশ মাটিতে ছিটকে পড়ছে। কারো কারো মধ্যে মৃত্যুভয় প্রবেশ করেছে। এমন সময়ে তা স্বাভাবিক। তাদের সবাই পিঠে আঘাত নিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ছে। আর্তনাদ আর যুদ্ধনাদ মিলেমিশে এক হয়ে গেল সেখানে। সেখানে সাহসের গর্ব আর রইলো না, আছে কেবল মৃত্যুর হাসি মুখ।

এই খণ্ড সেনার যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করা গেল না। চেরাও জেতেনি, চোলাও জেতেনি, এই যুদ্ধে জিতেছে কেবল মৃত্যু। সংখ্যায় বেশি হওয়ায় কিছু চেরা সেনা বেঁচে ছিল। তাদের কেউই অক্ষত নয়। মৃত্যুর কাছ থেকে হাত দূরত্বে থাকা চোলা সেনাদের আঘাতের যন্ত্রণা সমাপ্ত করতে সচেষ্ট হলো তারা। হাতের অস্ত্র দিয়ে মুমূর্ষু সেনাদের বীরগতি প্রদান করতে লাগলো।

মহারাজ উথিয়ান ইশারা করলেন। চেরা শিবিরে একেবারে উঁচুতে ওঠানো হলো হলুদ পতাকা। এই সংকেত যুদ্ধ বিরতির। যদিও এখনও আজকের সূর্যাস্ত হতে অনেকটা সময় বাকি।

মহারাজ কারিকালা হলুদ নিশান দেখতে পেলেন। তিনি সেই নিশানের বিরোধিতা করলেন না, ওড়ালেন হলুদ নিশান। প্রথম দিনের হিসেবে যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে।

সেনারা এবার নিরস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার সামগ্রী নিয়ে চলে গেছে প্রান্তরের মাঝে। মৃত আর আহত সৈনিকদের দেহ সংগ্রহ করে দোলায় চাপিয়ে তারা নিয়ে আসতে লাগলো যার যার শিবিরে।

মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম একা বসেছেন রাজতাবুতে। মহারাজ কারিকালার মুখ থমথম করছে। প্রথম দিনের যুদ্ধ তাকে যথেষ্ট গভীরে আঘাত করেছে। এই মুহূর্তে কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু মন্ত্রী ইরামের সাথে কালকের যুদ্ধ কৌশল নিয়ে আলোচনা না করলেও চলবে না।

'কাকা, আজকের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলুন। কী মনে হয়েছে আপনার?'

'আমি শুধু দেখতে পেয়েছি আমাদের যেসব সেনাদের আমরা ক্ষেত্রে অগ্রসর করেছি তাদের কেউ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল না।'

'হ্যাঁ কাকা। চেরা সৈনিকদের যুদ্ধ কৌশল অনেক পোক্ত। কে বলবে এই সেনা অনেক দিন যুদ্ধের ধারেকাছেও যায়নি। আমি দুটো বড়ো যুদ্ধ জিতেছি, কিন্তু এমন সমস্যার সামনে তো কখনো পড়িনি।'

'আমরা যুদ্ধ জিতেছি আসলে নিজেদের সৈন্যের এক অংশের বিরুদ্ধে। মহারাজের অনুগত সেনাপতিরা শেষে আপনার সাথে এসে যোগ দিয়েছিল। তাদের পক্ষে কেউই ছিল না। কিন্তু এখানে গৃহযুদ্ধ নয়, আমরা লড়ছি এক শক্তিশালী স্বতন্ত্র রাজ্যের সেনার বিরুদ্ধে। তুলনা করে এখানে লাভ নেই।'

'আমি আসলে ভয় পাচ্ছি কাকা। এমন গভীর ভয়ের অনুভূতি আমার জীবনে কখনো হয়নি। বন্দি অবস্থায় যখন কারাগারে আগুন লাগলো তখনো আমি এমন ঘাবড়ে যাইনি।' সত্যিটা নিজের কাকার সামনে লজ্জাজনক হলেও স্বীকার করলেন মহারাজ কারিকালা।

'এই মুহূর্তে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তবে আমরা আজ একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণ করিনি। আর আমরা তো আগে থেকেই জানতাম চেরা সৈন্যের শক্তির ব্যাপারে। ভয় পেলে সমস্যা নেই, কিন্তু সেই ভয়কে কিছুতেই মনে জাঁকিয়ে বসতে দেওয়া যাবে না। আমাদের এখন পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে কাজে। কম সৈন্য নিয়ে বেশি সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ার সবচেয়ে ভালো উপায়, সবচেয়ে ভালো ব্যূহটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। একজন রাজার জীবনে মাথা ঠান্ডা রেখে মোক্ষম সিদ্ধান্ত নেবার এমন অবসর খুব একটা আসে না। তাই এখন ভাবতে হবে আমাদের।'

'কী ভাববো কাকা? কী ব্যূহ গঠন করবো কাল? আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।'

'ভাবো কারিকালা ভাবো। তুমি জানো এই সময়ে কোন ব্যূহ প্রতিপক্ষকে মরণ কামড় দিতে পারবে। তুমি তা জানো।'

কারিকালার চোখ বিস্ফোরিত হলো, 'আপনি কি মকর ব্যূহের কথা বলছেন? হয় একেবারে মরো, নইলে শত্রুকে একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলো- এই তাহলে হবে আমাদের নীতি?'

'হ্যাঁ। আমরা কাল আমাদের অর্ধেক সেনা নিয়ে পৃথক তিনটা মকর ব্যূহ গঠন করবো।'

'প্রথমেই?'

'না, আমার পরিকল্পনা শোনো। মহারাজ উথিয়ানের সাথে সোজা পথে যুদ্ধ করে সুবিধা করা যাবে না। তার চিন্তাকে ধোঁকা দিতে হবে। আমাদের অর্ধেক সেনা কাল গরুড় ব্যূহ গঠন করে এগোবে। তারপর শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করবে।'

'গরুড় তো শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করবে। মাঝে ঢুকবে কীভাবে?'

'এখানেই তো প্রথম ধোঁকা। আমরা ওদের কাছাকাছি গিয়ে সূচি ব্যূহ গঠন করে ফেলবো। তাহলেই আর ঢুকতে অসুবিধা হবে না। আমাদের সেনাদের ওভাবেই নির্দেশনা দেওয়া থাকবে। কোনো ঝামেলা হবে না।'

কারিকালা আগ্রহী হয়ে উঠলেন, 'তারপর?'

শত্রুর মাঝে প্রবেশ করে শত্রুসেনার আড়াআড়ি তারা তিনটে মকর ব্যূহ গঠন করে ফেলবে। তারপর লেজ আর মাথা দিয়ে মকর শত্রু সংহার করবে।'

'তাহলে তো এখনই এই বিশেষ ব্যূহ গঠনের কথা সেনাপতিদের সাথে আলোচনা করা দরকার। কিন্তু আমার খটকা লাগছে অন্য জায়গায়।'

'কী?'

'যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই কি আমাদের অর্ধেক সেনা সম্মুখে পাঠানো উচিত হবে?'

'হবে। এছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। আমাদের সেনা সংখ্যা কম। আমরা যদি আজকের মতো করে যুদ্ধ করি তাহলে সেসব ছোটো ছোটো খণ্ডযুদ্ধে চেরা আর চোলা সমান সংখ্যক সেনা হারাবে। যা আজকে হয়েছে। তাতে কিন্তু আদপে চেরাদেরই লাভ। আর আমাদের সৈন্য ক্রমশ কমতে কমতে এক সময় হাতে গোণায় পরিণত হবে। আর অন্যদিকে অধিক সেনার মালিক হওয়াতে মহারাজ উথিয়ান বড়ো কোনো যুদ্ধ করা ছাড়াই জিতে যাবেন। এজন্য আমাদের হাতে জুয়া খেলা ছাড়া উপায় নেই। আর জুয়া যেহেতু খেলতেই হবে, তাতে বড়ো জুয়া খেলাই ভালো। জিততে হলে একসাথে ওদের সেনার একটা বড়ো অংশ ধ্বংস করার চেষ্টা করতে হবে।'

'কিন্তু তাতে যদি সফল হই তাহলেও কি শেষ রক্ষা হবে? যদি'

'তুমি কী বলবে জানি। তবে সাতবাহনের সাহায্যের কথা এখন আর চিন্তা না করাই ভালো। এলে এতদিনে চলে আসতো। সাতবাহন শেষ মুহূর্তে নিজেদের সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে নিশ্চয়ই। আমাদের সাথে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। আমাদের এই লড়াই এখন আমাদেরই লড়তে হবে। চলো, সেনাপতিদের সাথে এখন আলোচনায় বসা যাক।'

ওদিকে চেরা শিবিরও বসে নেই। সেখানেও চলছে আলোচনা। সেনাপতিদের নিয়ে বসে আছেন মহারাজ উথিয়ান।

প্রধান সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ, কাল আমাদের ব্যূহ রচনা কী হবে?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। ভাবতে হবে।' মহারাজ উথিয়ানের স্বর শান্ত, 'আমরা আজকের যুদ্ধে আমাদের বার্তা দিয়ে দিয়েছি। একসাথে বেশি সেনা দিয়ে আমরা যুদ্ধ করবো না। ছোটো ছোটো সেনাদল কার্যকর ব্যূহ গঠন করে যুদ্ধ করবে। সব যুদ্ধ হবে খণ্ডযুদ্ধ।'

'মহারাজ, আমরা সেনাবলে বলীয়ান। আমরা একটা আক্রমণাত্মক ব্যূহ গঠন করে মহারাজ কারিকালার সব সৈন্যই তো এক অথবা দুই দিনে শেষ করে দিতে পারি।'

মহারাজ উথিয়ান হাসলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমাদের সেনার ক্ষতিও কম হবে না। আমি জিতবো ঠিকই, কিন্তু আমার সেনাবল অনেক কমে যাবে। মহারাজ কারিকালা যদি বুদ্ধিমান হন, তাহলে বড়ো ব্যূহ গঠন করে তিনি নিজেই আক্রমণ করবেন। আর মহারাজ কারিকালা যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান তার পরিচয় আমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছি। তাই আমাদের আক্রমণের ব্যূহ গঠন করার কথা চিন্তা করলে চলবে না। আমাদেরকে রচনা করতে হবে প্রতি-আক্রমণ ব্যূহ। আর আপনি প্রধান সেনাপতি হিসেবে তো জানেনই, প্রতি আক্রমণ ব্যূহর সিদ্ধান্ত শত্রুর ব্যূহ রচনা না দেখে নেওয়া যাবে না। আমরা কাল সকালেই সেই সিদ্ধান্ত নেবো। আপনি এখন সেনার কাছে যান। আপনার সেনাপতিদের নিয়ে সেনাদের সাহস জোগান, তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখুন। দেখবেন কিছুতেই যাতে মনোবলে কোনো ঘাটতি না হয়।'

কুর্নিশ করে প্রস্থান করলেন প্রধান সেনাপতি। ভেরাপ্পন এতক্ষণ একপাশে চুপচাপ বসেছিলেন। এবার তার দিকে ফিরলেন মহারাজ উথিয়ান,

'পাণ্ড্যদের থেকে খবর নিয়ে আপনার দূত কি ফিরে এসেছে? না-কি এখনও এসে পৌঁছায়নি?'

'হ্যাঁ মহারাজ। কিছুক্ষণ আগেই সে ফিরে এসেছে।'

'আপনার গলার স্বরে মনে হচ্ছে সুখকর কিছু হয়নি। কী সমস্যা হয়েছে?'

'দূত খুব খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছে মহারাজ।'

কথাটা শুনে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন মহারাজ উথিয়ান, তারপর খুলে বললেন, 'যুদ্ধের মধ্যে খারাপ সংবাদ পাওয়াটা কোনো কাজের কথা না। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তো হাত দেওয়া যাবে না। কী সেই সংবাদ?'

'মহারাজ, পাণ্ড্য সেনা এখন কিছুতেই আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবে না।'

'কেন? তবে কি মহারাজ ভালুদি শেষ মুহূর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এতদিনের প্রতিদান কি তিনি ভুলে গেছেন? কিন্তু তা তো হবার কথা না। ভবিষ্যৎ কি তিনি চিন্তা করেননি? তিনি কি জানেন না, চেরা রাজ্য যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে তাদের রাজপ্রাসাদে আর আলো ঠিকমতো জ্বলবে না। তাদের প্রজারা তখন না খেয়ে মরবে।'

'না মহারাজ। মহারাজ ভালুদির সেই সাহস হবে না। তিনি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।'

'তাহলে?'

'ঈশ্বর আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?'

'তার মানে!'

'ভয়ংকর নীহারিকা মহামারী দেখা দিয়েছে পাণ্ড্য শিবিরে। আমাদের দূত নিজে সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এসেছে।'

এবার শঙ্কা দেখা দিলো মহারাজ উথিয়ানের গলায়, 'কী বলছেন এসব? আমাদের সেই দূত এখন কোথায়? সে কি আমাদের শিবিরে প্রবেশ করেছে?'

'চিন্তা করবেন না মহারাজ। দূত এই রোগ সম্পর্কে জানে। আমাদের শিবির থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকেই এই সংবাদ প্রেরণ করেছে সে। খবর দিয়ে সে প্রস্থান করেছে। অর্ধ মাস বনে থাকবে একাকী। তারপর যদি রোগাক্রান্ত না হয়ে বেঁচে থাকে তবেই ফিরে আসবে লোকালয়ে।'

'হ্যাঁ, ঠিক কাজ করেছে দূত। কিন্তু এখন আসল কথা হচ্ছে, পাণ্ড্য সেনার কোনো সাহায্য পাচ্ছি না আমরা।'

ভেরাপ্পন চুপ করে রইলেন। তার আর মহারাজ ভালুদির মধ্যে যে পরিকল্পনা মহারাজ উথিয়ানের অগোচরে হয়েছিল তা ভেস্তে গেছে। দূতের কথা শুনে মনে হচ্ছে আসলেই নীহারিকা মহামারী আঘাত হেনেছে সেখানে। এই যুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই পাণ্ড্যরা চেরাদের পক্ষে যোগ দিতে পারবে না।

গভীর চিন্তা চলছে মহারাজ উথিয়ানের মাথায়। হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে গেছে। শুরুতে চোলার সাথে যুদ্ধটাকে যেমন অসম হবে ভেবে নিয়েছিলেন, এখন আর অবস্থা তেমন অসম মনে হচ্ছে না।

সূর্য কখনো দেরি করে না। সময়ের চিন্তা যার সীমিত সময় আছে তার থাকে, কিন্তু যেখানে সময়ের চক্র তার ধারালো থাবা বিস্তার করতে পারেনি, তার সময়ের চিন্তা থাকে না, জীবনের চিন্তা থাকে না, সেই সাথে স্বভাবতই মৃত্যুর চিন্তাও থাকে না। তবে এই পৃথিবীর সময় নির্দিষ্ট হয় যে রশ্মিতে তা আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছে পুবাকাশে।

তাতে দুই শিবিরের দুই রাজার নির্ঘুম রাত শেষ হলো। দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হতেই দুই রাজা শিবিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাদের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরছে বিপক্ষের প্রত্যেক নড়াচড়ার ওপর। নির্ঘুম রাত তাদের দৃষ্টি ক্ষমতার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না।

মহারাজ উথিয়ান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ধারণার মিলে যাওয়া প্রতক্ষ্য করছেন। সেনার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজ কারিকালা। পুরো চোলা সেনাবাহিনীতে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সৈন্যরা ছোটাছুটি করছে, তবে তা বিশৃঙ্খল নড়াচড়া নয়। নিশ্চয়ই কারিকালা আজকের যুদ্ধ পরিকল্পনা করে ফেলেছেন, আর এরই মধ্যে সেনাদের কাছে সেই পরিকল্পনার কথা প্রচার হয়ে গেছে।

তখনই চোলা শিবিরে যুদ্ধ শিঙ্গার আওয়াজ শোনা গেল। সাথে সাথে চঞ্চলতা আরও বেড়েছে সেনাদের। মহারাজ উথিয়ানের সেনারা নিশ্চুপ। এভাবে থাকলে সেনাদের মনোবলের ওপর একটা আঘাত আসতে পারে। নিজের সেনাদের যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধ হবার আদেশ দিলেন মহারাজ উথিয়ান। এবার নিজের সেনাতেও নড়াচড়া শুরু হয়ে গেল। সাধারণ সারিতে দাঁড়ালো সৈন্যরা। প্রয়োজনে এই সেনা যে-কোনো ব্যূহ গঠন করতে পারবে।

মহারাজ কারিকালা এসে দাঁড়ালেন ইরামের সামনে, 'কাকা, আপনি কি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'সেই চিন্তা এখন পুরোপুরি নিস্ফল। আমরা এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।'

'সেনাপতিদের আদেশ দিয়ে দিয়েছেন?'

'আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। তবে এই সিদ্ধান্তের অন্তিম নির্দেশ তোমাকেই দিতে হবে। এই পরিকল্পনায় সফলতার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি আমরা এখানে ব্যর্থও হতে পারি। আর রাজা হিসেবে সেই ফলের ভার রাজা হিসেবে তোমাকেই নিতে হবে। এই যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, রাজা হিসেবে ইতিহাস তোমাকেই মনে রাখবে, আমাকে না। আমি মন্ত্রীর কাজ করেছি, মন্ত্রণা দিয়েছি। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি, তোমার সামনের প্রতিপক্ষ এখন যে পথ বেছে নিয়েছে, তাতে যুদ্ধে তোমার সামনে এর চেয়ে ভালো পথ আর খোলা নেই।'

'ঠিক আছে কাকা।' মহারাজ কারিকালা মেনে নিলেন। ঝেড়ে ফেলে দিলেন নিজের মনের সব দ্বিধা। এগিয়ে গেলেন সেনার দিকে। পরিকল্পনা মতো সাজানো হয়েছে কি না তা আরেকবার নিজের চোখে দেখে নেওয়া দরকার।

শিঙ্গার স্বর কিছুক্ষণ পর পর বাজছিল। এখন আর প্রয়োজন নেই। আচমকা শিঙ্গার শব্দ থেমে যেতে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে। প্রধান সেনাপতিদের খবর দেওয়া হয়েছে। মহারাজ কারিকালা ঘোড়ায় বসে আছেন তাদের ঠিক সামনে।

সেনাপতিরাও সবাই ঘোড়ার ওপরেই বসে আছেন। সবারই ভাব যুদ্ধংদেহী। কারিকালা কোনোরকম ভূমিকায় গেলেন না, 'আজকে আমরাই প্রথম আক্রমণ করবো। কালকের মতো বসে থাকবো না।'

ব্যাপারটা সেনাপতিরা আগে থেকেই আঁচ পেয়েছিলেন। সবার মাথা উঁচু। আক্রমণ করতে কারো কোনো আপত্তি নেই। শত্রুরা তাদের মাটিতে ঢুকে পড়েছে। তাদের সামনে সেনা নিয়ে তাদেরই জমিতে লম্ফঝম্ফ করছে। ক্ষত্রিয় রক্ত এই ব্যাপারটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় সবাই বুক টান করে প্রস্তুত আছে।

'আমরা ত্রিশূল ব্যুহ নিয়ে আক্রমণ করবো।' পরিকল্পনায় একটু বদল এনেছেন মহারাজ কারিকালা। প্রথমে গরুড় ব্যুহে আক্রমণ করার কথা ভেবেছিলেন। সেই পরিকল্পনায় গরুড় ঠোঁটে সূচি ব্যুহ তৈরি করে শত্রু মাঝে প্রবেশ করবে। তারপর দুই ডানা থেকে দুটো আর ঠোঁট, মাথা আর লেজ থেকে একটা- মোট তিনটে মকর ব্যুহ গঠন করা হবে। তবে সেখানে একটা সমস্যা আছে। সূচি ব্যুহ দিয়ে ঠোঁট তো প্রবেশ করবে, কিন্তু ডানা প্রবেশ করবে কীভাবে?

এই সমস্যার উত্তর দিতেই ত্রিশূল ব্যুহ গঠন করার কথা চিন্তা করলেন তিনি। ত্রিশূলের তিন দণ্ডের তিনটেই সহজে সূচি ব্যুহ তৈরি করে ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে আর তিনটে দণ্ড আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি করবে তিনটে মকর।

সিদ্ধান্তের বাকি কথাগুলো জানালেন কারিকালা, 'যান, ত্রিশূল ব্যুহের জন্য সেনা প্রস্তুত করুন। আজ আমরা অর্ধ সেনা দিয়ে আক্রমণ করবো। ঠিক প্রথম প্রহরের শেষ অর্ধে। যেভাবেই হোক আজকে শত্রু সেনার অর্ধেকের বেশি আমাদের নাশ করতেই হবে। প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হবে আজকে। হেরে যাবার কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। আজ আমাদের পরাজয়ের মানে হচ্ছে আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের অনির্দিষ্ট কালের পরাধীনতা।'

ক্ষত্রিয়ের কাছে স্বাধীনতার আগে কিছু নেই। তবে প্রধান সেনাপতি মহারাজের ভাষণের আবেগে ঠিক ভেসে যেতে পারলেন না। তিনি পরিকল্পনায় ফিরে এসেছেন, 'কিন্তু মহারাজ, আমরা যদি ত্রিশূল ব্যুহ সাজিয়ে আক্রমণ করি তাহলে আমাদের তিন ফলার মধ্যে দুটো ফাঁকা স্থান থাকবে। প্রতিপক্ষ যদি বুদ্ধি করে সেই ফাঁকা জায়গায় দুটো বজ্র ব্যুহ প্রেরণ করে তাহলে তো আমাদের ত্রিশূল আর কোনো কাজেই আসবে না। শত্রু হয়তো বাড়তি সুবিধা পাবে না, কিন্তু আমাদের যে শত্রু সংহারের পরিকল্পনা তা তো সফল হবে না। আর প্রতিপক্ষের কাছে যথেষ্ট সেনা আছে। সে তো বড়ো বজ্র ব্যুহ বানাবে। তখন আমাদের সেনারা ব্যুহ ছাড়া হয়ে যাবে। কিছুতেই টিকতে পারবে না। বজ্রের আঘাতে তখন ত্রিশূল ভেঙ্গে যাবে।'

কারিকালা মুচকি হাসলেন, 'আমিও চাই তারা যাতে দুটো বজ্র তৈরি করে আমাদের মোকাবেলা করে। এই হিসেব আমার আগেই করা হয়ে গেছে প্রধান

সেনাপতি। আমরা আক্রমণ করবো ত্রিশূল ব্যূহ দিয়ে। তবে সেটা হবে আমাদের ছদ্মব্যূহ।'

'ছদ্ম ব্যূহ!'

'হ্যাঁ। আমরা যথাসময়ে ব্যূহ বদল করবো। আমিও চাই তারা যাতে বড়ো দুটো বজ্র প্রেরণ করে। তাহলে সেই বজ্র ঘিরে আমরা তৈরি করবো তিন ফলা থেকে তিনটে মকর। আর মকরের সামনে বজ্র টিকতে পারবে না।'

এবার মহারাজ কারিকালার মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়লো প্রধান সেনাপতির ঠোঁটে। কারিকালা বুঝলেন সকল সন্দেহের অবসান হয়েছে, সকল প্রশ্নের উত্তর মিলেছে, 'আপনারা আমার আদেশ মতো ব্যূহ বদল করবেন। শিঙ্গার বিশেষ আওয়াজে সময় মতো আপনাদের কাছে আমার আদেশ পৌছে যাবে। এখন ওরা বজ্র পাঠাক নয়তো বস থাকুক, আমাদের পরিকল্পনা একই থাকবে।'

সেনাপতিরা যার যার বাহিনীর ভাগের কাছে চলে এলেন। তীক্ষ্ণ সুরে আবার বেজে উঠলো শিঙ্গা।

এবারও সেই আওয়াজ প্রবেশ করেছে মহারাজ উথিয়ানের কানে। আজ সকালেই তিনি বুঝতে পেরেছেন মহারাজ কারিকালা বিশেষ কিছু করবেন। তাই কাজের কাজটাই করেছেন তিনি। বিদ্রোহী বৃদ্ধ মন্ত্রী আর কবে কাজে লাগবে। তিনি সেই মন্ত্রীকে এনে বসিয়েছেন নিজের কাছে। শিঙ্গার শব্দ হতে মহারাজ উথিয়ান তাকালেন বৃদ্ধ মন্ত্রীর দিকে,

'আপনি তো তখন অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছিলেন। চোলা সেনাবাহিনীর যত যুদ্ধ কৌশল, যত ভেরী, যত শিঙ্গার সংকেত সবই না-কি আপনার জানা। তাহলে বলুন তো, এখনকার এই তীব্র শিঙ্গা ধ্বনি আসলে কী বোঝাচ্ছে?'

'তারা এখন আক্রমণ করবে মহারাজ। এই সংকেত সে কথাই বোঝাচ্ছে।'

'সেটা জানার জন্য তো গোপন সংকেত জানার দরকার পড়ে না। ওদের সেনার গতি আর অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা এই সংকেতের মাঝে তারা কী ব্যূহ গঠন করবে তার কোনো ইশারা লুকিয়ে আছে? আজকে কোন ব্যূহতে তারা আক্রমণ করতে চাচ্ছে সেটা বোঝাই এখন সবচেয়ে দরকারি।'

বৃদ্ধ মন্ত্রী সংকোচে একটু কুঁচকে আসেন, এখন আর উল্টাপাল্টা কথা বলে বোঝানোর উপায় নেই, 'মহারাজ, আমি আসলে ওদের সংকেতের পূর্ণ মানে বুঝতে পারছি না। ওরা বেশির ভাগ সংকেতই বদলে ফেলেছে। এই কাজটা ওরা কীভাবে এত তাড়াতাড়ি করলো বুঝতে পারছি না। আপনি চিন্তা করবেন না মহারাজ। আমি ওদের সেনা সজ্জা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছি। খুব শীঘ্রই ওদের ব্যূহ সম্পর্কে বুঝতে পারবো।'

মহারাজ উথিয়ানের স্বর শান্ত কিন্তু তাতে বিরক্তি এবং ক্রোধের আভাস আছে, 'তার মানে, যে বিশেষ সুবিধার দেবার কথা বলে আপনি আমাদের কাছ থেকে বচন আদায় করেছেন, সেই সুবিধা আপনি আমাদের দিতে পারছেন না। সেই সামর্থ্য এখন আর আপনার নেই। ধর্ম অনুযায়ী, এখন আমি যদি আমার বচন পালন না করি, তাহলে আমার রাজধর্ম কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।'

'মহারাজ, আমি আপনাকে সাহায্য করার সর্বোত্তম চেষ্টা করছি' বৃদ্ধ মন্ত্রীর গলায় এবার বেপরোয়া ভাব।

'তাই করুন।' মন্ত্রীর দিকে নজর দিয়ে এখন আর লাভ নেই। এই বাতিল মাল যে এখন কিছু করতে পারবে না তা বুঝতে পেরেছেন মহারাজ উথিয়ান। বিপক্ষের সেনা সজ্জার দিকে নজর দিলেন তিনি। এতক্ষণ তার প্রধান সেনাপতি ঠিক এই কাজটাই করছিল। এখন তাকে নিজের দিকে আসতে দেখলেন মহারাজ উথিয়ান।

প্রধান সেনাপতি এসে তার সামনে দাঁড়ালেন, 'মহারাজ, প্রতিপক্ষের ব্যূহ রচনা শুরু হয়ে গেছে।'

'তা তো আমিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারা কি ব্যূহ সাজাচ্ছে তা তো মনে হচ্ছে আরেকটু সময় না গেলে বোঝা যাবে না। আপনি কী বলেন?'

'আমি বোধহয় একটু বুঝতে পেরেছি মহারাজ।'

'তাই না-কি। কী ব্যূহ সাজাচ্ছে শত্রু?'

'আমার অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারে। তবে আমার চোখ আর এত বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, ওরা ত্রিশূল ব্যূহ গঠন করার জন্য সেনা সাজাচ্ছে। তাও ছোটো কোনো ত্রিশূল নয়, বেশ বড়ো ব্যূহ। বেশ অনেকটা জমি নিয়ে সাজছে এই ব্যূহ।'

'কি! ত্রিশূল ব্যূহ!' মহারাজ চমকে না উঠে পারলেন না। আবার তাকালেন সামনের দিকে। একটু ভালো করে খেয়াল করতেই বুঝলেন প্রধান সেনাপতির অনুমান একেবারে নির্ভুল। চোলা সেনারা আজকের যুদ্ধে ত্রিশূল বৃ্যহই সাজাচ্ছে।

মাথায় তড়িৎ চিন্তা চলছে মহারাজ উথিয়ানের। যখন কোনো অবলম্বন পাওয়া যায় না, যখন বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করে না, তখন ব্যাকরণ মেনে চলার উপদেশই গুণীজনেরা দিয়ে গেছেন। না, আরেকটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ত্রিশূল ব্যূহের মতো একটা কঠিন এবং বিপদজনক ব্যূহ শত্রু কেন গঠন করছে? তাদের মূল উদ্দেশ্য আসলে কী?

প্রধান সেনাপতি মহারাজের আদেশের অপেক্ষায় আছেন, 'মহারাজ, ত্রিশূল ব্যূহের জবাবে আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের শীঘ্রই গঠন করতে হবে ব্যূহ। বিনা ব্যূহতে যদি আমরা ত্রিশূলের সামনে পড়ি, তাহলে স্রেফ ধ্বংস হয়ে যাবো।'

'তা আমি জানি। কিন্তু ত্রিশূল ব্যূহের বিরুদ্ধে কী ব্যূহ তৈরি করবো আমরা? আপনার মাথায় কোনো চিন্তা এসেছে?'

'মহারাজ, ত্রিশূল ব্যূহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে একটা বৃ্যহের কথাই বলা আছে। এখানে একটা বৃ্যহই আমাদের সেনা রক্ষা করতে পারবে।'

'সেনা রক্ষার চিন্তা কেন করছি আমরা? আজকে ওদেরকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবো। সেই অনুযায়ী ব্যূহ তৈরি করুন।'

'তাহলে মহারাজ আমাদের হাতে একটা উপায়ই আছে। আমরা বজ্র ব্যূহ গঠন করবো।'

'বজ্র ব্যূহ! হ্যাঁ সেনাপতি। আমরা ঠিক তাই করবো।'

'দুটো বড়ো বড়ো বজ্র ব্যূহ গঠন করে ওদের ত্রিশূলের তিন ফলার ঠিক মাঝখানে পাঠিয়ে দেবো। আমার মনে হচ্ছে ওদের ত্রিশূলের আকার অনেক বড়ো হবে।'

আচমকা একটা চিন্তা খেলে গেল মহারাজ উথিয়ানের মাথায়, 'না প্রধান সেনাপতি। ত্রিশূল ব্যূহের গঠনের কথা চিন্তা করুন। সামনে দিতে হয় দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার। যাদের হাতে থাকবে বর্শা। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন ওদিকে।'

প্রধান সেনাপতি বিপক্ষের দিকে তাকালেন, 'মহারাজ। তাদের সামনে তো পদাতিক। ঘোড়সওয়ার আছে ফলাগুলোর মাঝের দিকে।'

'একদম ঠিক। তার মানে ত্রিশূল ব্যূহ তারা যুদ্ধ করার জন্য গঠন করেনি। এটা আমাদের জন্য একটা ফাঁদ। তারাও চায় আমরা যাতে দুটো বজ্র গঠন করে পাঠাই।'

'আমরা আরেকটু হলেই তাদের ফাঁদে পা দিতাম মহারাজ। তাহলে এখন কী করবো?'

'তাদের পরিকল্পনা মতোই আমরা কাজ করবো। শুধু একটু বদল আনবো। দুটো বড়ো বজ্র না, আপনি একই সেনা দিয়ে চারটে মাঝারি বজ্র তৈরি করুন। শুধু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন, যাতে আমাদের সেনার সংখ্যা তাদের দেড় গুণ হয়।'

'আজ্ঞে মহারাজ।' প্রধান সেনাপতি প্রস্থান করলেন। এবার এদিকের পালা। শিঙ্গার আওয়াজে এবার প্রকম্পিত হতে লাগলো চেরা শিবির।

প্রথম প্রহরের শেষাংশে চোলা ব্যূহ ভৈরবের নাম স্মরণ করে যাত্রা শুরু করলো। অবয়বে তাদের ত্রিশূল ব্যূহ একেবারে নির্ভুল। উঁচু জায়গা থেকে যাত্রা করেছে বলে শুরুতেই ভীম গতি অর্জন করেছে ব্যূহ।

ততক্ষণে চারটে বজ্র ব্যূহ তৈরি করে ফেলেছে চেরা সেনাপতিরা। চারটে বজ্র একসাথে যাত্রা শুরু করলো। তবে পাশাপাশি নয়। একটু দূরত্ব বজায় রেখে। মিলিত সংখ্যায় তাদের সেনার সংখ্যা অনেক বেশি।

মহারাজ কারিকালা ইরামের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বাহ্, আমার চিন্তা কাজ করেছে দেখি। ওরা বজ্র ব্যূহই গঠন করেছে।'

ইরামের চোখে চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, 'হ্যাঁ, কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের অনুমান মেলেনি। তারা দুটো বজ্র ব্যূহ বানায়নি, বানিয়েছে চারটা। সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি। তারা তাদের চার বজ্র দিয়ে আমাদের তিনটা ত্রিশূলের ফলা ঘিরে ফেলতে চাইছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু চাইলেই কি আর পারবে? মহাদেবের ত্রিশূলের সামনে ইন্দ্রের বজ্র কোনো কাজেই আসবে না। বজ্র ব্যূহ কীভাবে অকার্যকর করতে হয় তা আমার সেনার বেশ ভালোই জানা আছে। জয় আজকে আমাদেরই হবে।'

'দেখা যাক।'

আলাদা করে কথাটা বলার কোনো দরকার ছিল না। সামনের দিকে সবাই উদগ্র আগ্রহে দৃষ্টি মেলে আছে।

আর অল্পক্ষণ পরেই ত্রিশূল আর বজ্র মুখোমুখি হবে। কিন্তু ঠিক তখনই প্রান্তর কাঁপিয়ে তীব্র আওয়াজে শিঙ্গা বেজে উঠলো চোলা শিবিরে।

মহারাজ উথিয়ানের অবাক হবার পালা এবার। এই সময়ে শিঙ্গা বাজানোর মানে কী? চঞ্চল হয়ে উঠলো তার চোখ। ওরা কি দ্বিমুখী কোনো আক্রমণ করার কথা চিন্তা করছে? কোনো গুপ্ত সেনার ব্যূহ দিয়ে গুপ্ত হামলা করবে? কিন্তু এই প্রান্তর তো খোলা।

এখানে তো এমন কিছু করার সুযোগ নেই। তাদের অবশিষ্ট সেনাও নড়ছে না। তাহলে এই আচমকা শিঙ্গা ধ্বনির মানে কী?

মহারাজ উথিয়ানের সন্দেহের নিরসন হতে খুব বেশি সময় লাগলো না। বিদ্রোহী বৃদ্ধ মন্ত্রী নিজের বয়সের সাথে যথেষ্ট বেমামান গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে মহারাজের সামনে এলেন। হাঁপাচ্ছেন ভীষণ, কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই।

'মহারাজ, শুনলেন। চোলা শিবিরে জোর শিঙ্গা বাজানো হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এত জোরে বাজছে, না শোনার তো কোনো কারণ নেই। কিন্তু এখন এই শিঙ্গা ধ্বনির মানে কী? তারা কি দ্বিতীয় কোনো ব্যূহ বানিয়ে বাকি সৈন্য ত্রিশূল ব্যূহের পেছনে প্রেরণ করছে?'

'না মহারাজ।' হাঁপানির শিসের সাথে বৃদ্ধ মন্ত্রীর গলা থেকে কথা বেরিয়ে এলো, 'না মহারাজ, ওরা ওদের সব সংকেত ধ্বনি বদলে ফেলেছে, তবে বিশেষ কৌশল তো আর এত সহজে বদলানো যায় না। আমি এই সংকেতের মানে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। ওরা আপনার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হবার ঠিক আগে নিজেদের ব্যূহ বদলে ফেলবে।'

'কী? কিন্তু এভাবে ব্যূহ বদল করা তো অসম্ভব।'

'না মহারাজ। এই জ্ঞান চোলা বাহিনীর আছে। এটা চোলাদের বেশ চর্চিত একটা কৌশল। এই কৌশলে চোলারা বেশ পাকা।'

নষ্ট করার মতো সময় এখন আর হাতে নেই। নিয়ম মানা এখন অসম্ভব। প্রধান সেনাপতিকে ডেকে না পাঠিয়ে মহারাজ উথিয়ান নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে প্রধান সেনাপতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সবকিছু খুলে বলতেই প্রধান সেনাপতি বুঝতে পারলেন, 'মহারাজ, যুদ্ধের গুপ্ত বিদ্যায় আক্রমণের ঠিক আগ মুহূর্তে ব্যূহ বদলে দিয়ে শত্রুদের চমকে দেওয়ার কৌশল বর্ণনা করা আছে। তবে এই কৌশল সচরাচর ব্যবহার করা হয় না। তবে ওরা যদি তাই করতে চায় তবে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমাদের প্রথমে দেখতে হবে ওরা ত্রিশূল ব্যূহকে কী ব্যূহে বদলে ফেলে।'

তাদের দুজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো যুদ্ধক্ষেত্রে চোলা বাহিনীর দিকে। ত্রিশূলের ঘোড়া ততক্ষণে আলগা হতে শুরু করেছে। সেই সাথে বেশ মসৃণ ভঙ্গিমায় ফলার মধ্যেও পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

মহারাজের উথিয়ানের চোখে পরিবর্তনের ফল ধরা পড়লো সবার আগে, 'দেখেছেন?'

প্রধান সেনাপতিও খেয়াল করেছেন ব্যাপারটা, 'দেখেছি মহারাজ। এবার আর অনুমান নয়, আমার বিশ্বাস ওরা তিনটা মকর ব্যূহ নির্মাণ করতে চলেছে। ওদের ব্যূহ পরিবর্তনের কৌশল দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। ত্রিশূলের তিন ফলা তৈরি করবে তিনটে মকর ব্যূহ।'

'বাহ, মহারাজ কারিকালা বেশ ভালো পরিকল্পনা করেছেন তো। আমরা তো সবাই জানি বজ্র ব্যূহ মকর ব্যূহের সামনে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে। তার মানে আমাদের সর্বনাশ একেবারে নিকটে। কিছু একটা না করতে পারলে আজকে আমার পাঠানো সেনা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

এবার প্রধান সেনাপতি হাসলেন, 'মহারাজ চোলা সেনা ব্যূহ বদলের জ্ঞানে কুশলী হতে পারে, তবে এটা তো কোনো গোপন জ্ঞান নয়। তাদের নিজস্ব আবিষ্কারও নয়। আমাদের সেনা করার জন্য নির্দেশিত না হলেও, শিঙ্গা বাজালেই ব্যূহ তারাও বদলাতে পারবে। সেই শিক্ষা আমি সেনাকে দিয়েছি মহারাজ।'

'আপনি আমাকে বাঁচালেন। এখন আমরাও ব্যূহ বদলাবো।'

'হ্যাঁ মহারাজ, বদলাতেই হবে। মকর ব্যূহের সাথে বজ্র লড়াই করতে পারবে না। আপনি আপনার তিন ভাগের এক ভাগ সেনা হারিয়ে ফেলবেন।'

'না, সেই ক্ষতি আমি কোনোমতেই মেনে নেবো না। মকরের সাথে লড়াই করার মতো ব্যূহ আমরাও গঠন করবো।'

'কী ব্যূহ মহারাজ?'

'মকরের সাথে লড়তে পারে সর্প ব্যূহ।'

'হ্যাঁ মহারাজ', প্রধান সেনাপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমরা চারটা বজ্র মিলে একটা বৃহৎ সর্প ব্যূহ তৈরি করবো। মকর মুখ আর লেজ দিয়ে আক্রমণ করবে। আর আমাদের সর্প ঠিক মকরের সবচেয়ে দুর্বল দিক মানে পেটে জড়িয়ে ধরে আঘাত করবে। মকরের পেট ধ্বংস করে দিলেই মকর ধ্বংস হবে, আমাদের জয় সুনিশ্চিত।'

অপেক্ষা করতে লাগলো চেরা শিবির। যখন তিনটা মকর চারটে বজ্রের মাঝে মাঝে ঢুকে পড়েছে তখনই চেরা শিবিরে বেজে উঠলো ভীম নাদ। বজ্র ব্যূহের পরিচালক সেনাপতিরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন সেই সংকেত। শুনে অবাক হলেও তাদের কিছু করার নেই। আদেশ পালন করতেই হবে। তাতে প্রাণ যায় যাক।

দেখতে দেখতে সর্প ব্যূহ গঠিত হলো। কারিকালার সৈন্যরা মকর ব্যূহ থেকে বাঁধা দিলো যথেষ্ট কিন্তু বজ্র ভেঙ্গে যেতেই তারা আর সুবিধা করতে পারলো না। যে যুদ্ধ হবার কথা ছিল ত্রিশূল আর বজ্রের মাঝে, তা এখন হচ্ছে মকর আর সর্পে।

মহারাজ কারিকালা আর মন্ত্রী ইরাম আতঙ্কিত চোখে দেখলেন তাদের ব্যূহ বদলানোর কৌশল কি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনটে মকরের পেটই এখন শক্ত ভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে সর্প।

তারপরের ফলাফল তো জানাই। মকর কোনো সুযোগই পেলো না। অর্ধ প্রহরের মধ্যেই মকরের পেট একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। চোলা সেনারা এতো অসুবিধার মাঝেও লড়ে যেতে লাগলো। প্রতিপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি করে পূর্ণ দ্বিপ্রহরে তিনটে মকরই ধ্বংস হলো পুরোপুরি। মহারাজ কারিকালার পাঠানো বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে। সর্পের পেঁচানো দেহও অক্ষত নেই। সেনা সংখ্যা সমান হলে হয়তো আজ মকর জিতলেও জিততে পারতো।

এই যুদ্ধ মহারাজ কারিকালার জন্য কেবল এক খণ্ড যুদ্ধে পরাজয় নয়, তার বাহিনীর অর্ধেক সেনাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তার মানে এতদিন কাগজে কলমে একটু থাকলেও এখন আর তার জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখন শুধু পরাজয়ের ক্ষণ গণনা করা।

৫৮

বললে কেউই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এই ঘোর পরাজয়ের পরে রাতে মহারাজ কারিকালার বেশ গভীর ঘুম হলো। একেবারে নিঃসাড়। মানুষের মাথায় যখন চিন্তা থাকে, পরিকল্পনা থাকে, ভবিষ্যতের ভাবনা থাকে, কাজ শেষ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণই তার অশান্তি। এসবের যখন আর প্রয়োজন পড়ে না, তখন মানুষ একেবারে ঝাড়া হাত-পা। তখন সে কোনোরকম অসুবিধা ছাড়াই ঘুমাতে পারে।

অবিশ্বাস করার মতো ঘটনা চেরা শিবিরেও ঘটেছে। আজ ভোরে আবার সেখানে সাদা পতাকা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চিত বিজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজ উথিয়ান। আর একবার মাত্র আক্রমণ করতে হবে। তাহলেই মহারাজ কারিকালার সেনা একেবারে নিঃশেষ। তবে সেটা তো আর মহারাজ উথিয়ানের কাম্য নয়। তিনি চাচ্ছেন চোলার অবশিষ্ট সৈন্য অক্ষত রেখে যুদ্ধ জয় করতে। ভবিষ্যতে এই সেনা তার পক্ষেই কাজে লাগবে। গভীরে চিন্তা করতে গেলে চোলার পক্ষের প্রত্যেক সৈন্যের মৃত্যুতে আসলে তার ক্ষতিই হচ্ছে। এবার আর কারিকালা যুদ্ধবিরত হতে অমত করবেন বলে মনে হয় না।

মহারাজ কারিকালাকে গভীর ঘুম থেকে ডেকে তুললেন স্বয়ং ইরাম।

চোখ খুললেন কারিকালা, 'কী হয়েছে কাকা? এখন তো আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। এখন আবার এত সকালে ঘুম থেকে কেন উঠতে হবে?'

'বাইরে এসো কারিকালা। মহারাজ উথিয়ানের শিবিরে সাদা পতাকা দেখা যাচ্ছে।'

অবিশ্বাসে না-কি ঘুমের চোটে কারিকালা চোখ পিটপিট করলেন তা ঠিক বোঝা গেল না, 'কী বলছেন কাকা?'

'হ্যাঁ, একবার বাইরে এসেই দেখো।'

বাইরে বেরোতেই সাদা পতাকার দেখা মিলল। সেই পতাকার জবাব দিলেন মহারাজ কারিকালা। আবার প্রথম সকালের মতো ভেন্নির মাঝ প্রান্তরে আলোচনায় বসলো দুই দল।

মহারাজ উথিয়ানের মধ্যে বিজয় গর্ব আছে, কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করলেন না। তার গলায় সহানুভূতির লক্ষণ স্পষ্ট, 'মহারাজ কারিকালা, দেখুন, এখনও প্রান্তরের শিবিরের পেছনে চিতার ছাই ঠান্ডা হয়নি। আপনার হঠকারিতার জন্য এতগুলো মূল্যবান প্রাণ অকালেই ঝরে গেল। আপনি দুদিন আগে আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে এসবের কিছুই হতো না। তবে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। আমি আজকেও চাই আপনি আমার মিত্র হন। তাই আমাই আবার সাদা পতাকা তুলেছি। এখনও আপনার সামনে পথ খোলা আছে। আপনার অর্ধেক সেনার জীবন আপনি সহজেই বাঁচাতে পারেন। আমি এখন বলতে গেলে জয়ী অবস্থায় আছি। কিন্তু তাই বলে আপনার ওপর নতুন কোনো শর্ত আরোপ করবো না। যুদ্ধ শুরুর আগে আমার যে তিনটে প্রস্তাব ছিল, সেগুলো এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। আপনি শর্তগুলো মেনে নিন। এই অতি দুঃখের যুদ্ধ থেকে আপনার সেনাদের আর প্রজাদের মুক্তি দিন।'

মহারাজ কারিকালার তেজ এখন আর আগের মতো নেই। তবে যেটুকু বাকি আছে তাতেই তিনি জবাব দিলেন, 'আপনাদের রাজ্যের ক্ষত্রিয়দের কী শিক্ষা দেওয়া হয়, তা আমি জানি না। তবে আমাদের এখানে শিক্ষাটা একটু ভিন্ন।'

মহারাজ উথিয়ান স্পষ্ট বুঝতে পারছেন আলোচনা কোনদিকে যাচ্ছে। তিনি কঠিন মুখে চুপ করে রইলেন।

'প্রথম থেকেই আমাদের সেনাদের একটা কথাই শেখানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগতি প্রাপ্ত করাই একজন সৈনিকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সেই স্বর্গপ্রাপ্তি থেকে আমি আমার সেনাকে বঞ্চিত করবো না। তারা কারো দাসত্ব করার চেয়ে স্বর্গে যাবার উপায়ে সানন্দে রাজি হবে। আপনি এখনো জয়ী হননি। আমার সব সেনা আর স্বয়ং আমাকে বধ করেই আপনাকে চোলা রাজ্য অধিকার করতে হবে। আমাদের দেহে প্রাণের ছিটেফোঁটা থাকার মানে হচ্ছে, এখনও আপনি চোলা অধিকার করতে পারেননি, এখনও আপনার বিজয় সম্পূর্ণ হয়নি।

শিবিরে ফিরে যান মহারাজ উথিয়ান। আমাদের সংহার করে অধিকার করুন চোলা রাজ্য। আমাকে ভীত আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধা আর রাজা হিসেবে মনে রাখার সুযোগ আমি ইতিহাসকে কিছুতেই দেবো না। তারচেয়ে মৃত্যু স্বীকার করে নেবো। ইতিহাস মনে রাখবে আমি পরাজিত হয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলাম বীরের মতো। বৃথা তর্ক আর বাক্যব্যয়ে আর প্রয়োজন নেই মহারাজ। যান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।'

মহারাজ উথিয়ান আর তর্কে গেলেন না, 'মহারাজ কারিকালা, আমি প্রস্তুত আছি। আজকের যুদ্ধই হবে সর্বশেষ যুদ্ধ।'

দুই রাজাই যার যার শিবিরে ফিরে গেলেন।

চোলা শিবিরে পৌছে মহারাজ কারিকালার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস আবার বেরিয়ে এলো। সেখানে কোনো দুঃখ নেই, হতাশা নেই, কেবল আছে উদাসীনতা, 'সাতবাহন রাজ্যের মন্ত্রী গিরিধারী এমন কাজ করবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি কাকা।'

'চিন্তাটা আমরা এমনভাবে না করলেও পারি।' ইরামের হাবভাব যথারীতি শান্ত, 'মন্ত্রী গিরিধারী আমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেননি ঠিক, তবে সাহায্য তো তিনি আমাদের অবশ্যই করেছেন। উনি আমাদের রাজ্যে আলোচনা করতে না এলেও চেরা রাজ্যের সেনা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতো। উল্টো তিনি আগে থেকে আমাদের রাজ্যে এসে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা গুপ্তচর ব্যবহার করতে পেরেছি। যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে পেরেছি যুদ্ধের জন্য। নয়তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারতো।'

কারিকালা হাসলেন, 'এরচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আর কী হতে পারতো কাকা? আমরা পরাজয় থেকে কেবল এক কদম দূরে আছি। কোনোভাবেই আমরা এই যুদ্ধ জয় করতে পারবো না। ধ্বংস নিশ্চিত। আর জানেন কাকা, আমাদের এই যুদ্ধ হারার কারণ কী?'

'জানি। সৈন্য সংখ্যা।'

'হ্যাঁ কাকা, মন্ত্রী গিরিধারী যদি আমাদেরকে সেনা দিয়ে সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা পালন করতেন তাহলে এই যুদ্ধ আমি কিছুতেই হেরে যেতাম না। কিন্তু তিনি তো সেই বচন রক্ষা করলেন না।'

'এসব চিন্তা করে এখন আর শোক করে লাভ নেই। পরিণতি যখন নিশ্চিত, তখন তা বরণ করে নেওয়াই শ্রেয়। অর্ধেক সৈন্য নিয়ে কীভাবে আজকে যুদ্ধ করবে সেই চিন্তা করো। আজকে কী ব্যূহ গঠন করবো আমরা?'

'এই পরিকল্পনা আমি আগেই করে রেখেছি কাকা।'

'কী?'

'আজকের পরিকল্পনা হচ্ছে, আজ আর কোনো পরিকল্পনা নেই। এই যুদ্ধ জেতা কোনভাবেই সম্ভব না। এখন আমার একটাই লক্ষ্য। প্রতিপক্ষের যতটুকু সম্ভব সর্বনাশ করা। তাই আজ আমার সেনা বিনা ব্যূহে যুদ্ধ করবে। এবং আজ আমি স্বয়ং সেনার অগ্রভাগে থেকে সেনা চালনা করবো।'

'বিনা ব্যূহে? অরক্ষিত অবস্থায়? আত্মহত্যা করার চিন্তাটা একটু বেশি বিলাসী হয়ে গেল না?'

'হ্যাঁ, কাকা। বিপক্ষের সৈন্যের নানা রকম আক্রমণ থেকে সেনাকে বাঁচানোর জন্য ব্যূহ গঠন করা হয়। আজ আমার সেনাবাহিনী কোন ধরনের বিপদের আশঙ্কা করবে না। নিজেই শত্রুর জন্য ভয়ংকর বিপদ কালভৈরব হয়ে ক্ষেত্রে নামবে। তবে প্রথমে সমুদ্র ব্যূহ গঠন করে এগোবো আমরা। তারপর শত্রুসেনার মুখোমুখি হয়ে সেই ব্যূহ ভেঙ্গে দেবো। ব্যূহহীন হয়ে এলোমেলো পবনের মতো আমরা শত্রু সেনার ওপর আছড়ে পড়বো।'

'আমিও যাবো আজ যুদ্ধে। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছো তুমি পুত্র। নিশ্চিত মৃত্যু। তবু তোমার সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি। আসলেই ইতিহাস তোমার এই বীরত্বের কথা মনে রাখবে।'

'হ্যাঁ কাকা। আত্মহত্যা করলে নরকবাস হয়। তবে এটাই আত্মহত্যার একমাত্র মাধ্যম যাতে নরক বাস হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। স্বর্গবাস নিশ্চিত।'

অল্পক্ষণ পরেই চোলা শিবিরে উড়ল রক্ত পতাকা। রণ ভেরী বেজে উঠলো তীব্র শব্দে। আজকে যেন উৎসাহ ফেটে বেরোচ্ছে প্রত্যেক চোলা সৈন্যের দেহ থেকে।

মহারাজ উথিয়ান তাকিয়ে আছেন সেদিকে। কেউ যদি নিজেই নিজের ধ্বংস চায় তাহলে তার আর কী করার আছে। তবে মহারাজ কারিকালা তাকে চমকে দিয়েছেন ভীষণভাবে। এত দৃঢ়তা চোলা মহারাজ দেখাবেন, এই চিন্তা কিছুতেই করতে পারেননি তিনি। সত্যিই মহারজা কারিকালার সম্পূর্ণ সেনা ধ্বংস করার ইচ্ছে তার ছিল না। তবে এখন আর মহারাজ কারিকালার সম্পূর্ণ সৈন্য ধ্বংস করা ছাড়া সামনে কোন পথ খোলা নেই।

ততক্ষণে চোলা সৈন্য সমুদ্র ব্যূহ গঠন করে ফেলেছে। এই সেনার তৎপরতা দেখার মতো। সেনা সংখ্যায় কাছাকাছি হলে মহারাজ উথিয়ানের নাভিশ্বাস বের করে ফেলত এরা।

সমুদ্র তার ঢেউ নিয়ে প্রবল বেগে ছুটে আসছে। গরুড় ব্যূহ তৈরি করার নির্দেশ দিলেন মহারাজ উথিয়ান।

চোলা মহারাজ কারিকালা আজ একেবারে ব্যূহের সামনেই আছেন। স্বয়ং সম্রাটকে সেনাধ্যক্ষের পদে পেয়ে সৈন্যদের উৎসাহ যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। তারাও বুঝতে পারছে আজকের যুদ্ধের পরিণতি। তবে সেসব ভয়ের কথা এখন আর তাদের মাথায় আসছে না। যুদ্ধের উৎসাহে, রক্ত পিপাসায় তারা উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এখন কে বলবে তারা কেবল একটা বড়ো সেনার অবশিষ্টাংশ। কে বলবে এই আক্রমণের একটাই ফলাফল হতে পারে, মৃত্যু।

সমুদ্র ব্যূহ থেকে উর্মি তীব্র বেগে এগিয়ে এলো। ঝড়ের সময় সমুদ্রের ঢেউ যেভাবে বালির ওপর আছড়ে পড়ে ঠিক সেভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো চেরা বাহিনীর গরুড়ের ওপর। সেই তীব্র বেগে করা আঘাতে কেঁপে উঠলো গরুড়ের ডানা।

চোলাদের আগে থেকেই সংকেত দেওয়া ছিল। সেনারা গরুড়ের গায়ে ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়েই নিজের ইচ্ছেতে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ব্যূহ ভেঙ্গে গেল সাথে সাথে। তারপর শুরু হলো নিয়ম ছাড়া যুদ্ধ। যে যেভাবে পারছে আক্রমণ করছে তার সামনের সৈন্যকে। তিরন্দাজ, অশ্বারোহী, পদাতিক, হস্তী আরোহী, বর্শাধারী, অসিধারী যে যেভাবে পারছে নিজের নিজের অস্ত্র দিয়ে সংহার করছে শত্রুর প্রাণ।

চেরা বাহিনীর গরুড় ব্যূহের সম্মুখ সারি আচমকা আক্রমণে যেন টলে উঠলো। ভীষণ বিপদে পড়ে গেল তারা। গরুড়ের প্রথম প্রতিরক্ষা সারি ছিন্নভিন্ন হতে বেশি সময় লাগলো না।

চেরাদের একটু একটু করে পিছু হটতেই হলো। শত্রু পেছনে হটতেই চোলা সেনাদের উৎসাহ যেন একেবারে চরমে উঠলো। গত দুই দিন যুদ্ধে পরাজয়ের পর এই প্রথম যুদ্ধে বিজয়ের ক্ষীণ ঘ্রাণ তাদের নাকে আসছে। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো প্রবল বিক্রমে।

চেরা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পরিস্থিতি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন। হার নিশ্চিত জেনে শত্রু শেষ আক্রমণ করেছে। বেপরোয়া এই আক্রমণে মরণ কামড় দিতে তারা একেবারে তৈরি। এখন মাথা ঠান্ডা রাখাই মূলমন্ত্র। তবে সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি করা চলবে না।

নিজের গরুড়ের এক সারি বিনষ্ট হয়েছে। আরও দুই সারি বিলিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তারপরে নিজের সম্পূর্ণ সেনা নিয়ে গঠন করতে লাগলেন ভয়ংকর এক রক্ষা ব্যূহ।

দুর্গ ব্যূহ। তৃতীয় সারিতে সেনারা বড়ো বড়ো ঢাল দিয়ে সেনারা দুর্গের দেওয়াল বানালো। তিরন্দাজরা তৈরি হলো সেই দেওয়ালের আড়ালে লক্ষ্যভেদ করার জন্য। এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ যে-কোনো বেপরোয়া আক্রমণ ঠেকিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

ওদিকে দুই সারি চেরা সেনা যারা দুর্গ ব্যূহের বাইরে পড়ে গেছে। তারাও নিজেদের পরিণাম ঠিক বুঝতে পারছে। ব্যূহহীন হয়ে তারা চোলা সেনাদের দ্বারা কচুকাটা হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বেপরোয়াদের বিরুদ্ধে তারাও বেপরোয়া যুদ্ধ শুরু করলো।

প্রথম সারির সেনা ধ্বংস করে চোলা সেনার উৎসাহ তুঙ্গে উঠেছে। প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে চেরাদের পরের সারির ওপর। মহারাজ কারিকালা সবার আগে থেকে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছেন। তার হাতের অসি ঝিকমিক করে আঘাত করছে

চেরা সেনাদের। মাংসে গেঁথে যাচ্ছে ধারালো ধাতু, সাথে সাথে বীভৎস গতিতে বেরিয়ে আসছে রক্ত। দেখতে দেখতে চেরা বাহিনীর দ্বিতীয় আর তৃতীয় সারিও ধ্বংস হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকার কোনো সুযোগই পেলো না তারা। তাদের যুদ্ধ কৌশল কোনো কাজে এলো না। বাঁধভাঙ্গা পানিতে তৃণের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো সুযোগই থাকে না। তাকে ভেসে যেতেই হয়।

চিৎকারে চিৎকারে প্রকম্পিত হচ্ছে ভেন্নির প্রান্তর। সৈনিকদের যুদ্ধনাদের কাছে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আহতদের আর্তনাদ।

তবে এরপরেই পাশার দান উল্টে গেল। চেরা সেনাবাহিনী ইচ্ছে করেই তার দুই সারি সৈন্য বিসর্জন দিয়েছেন। এবার তাদের প্রতিরোধের পালা।

পরের সারিতেও প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করলো চোলা সৈন্যরা। বেপরোয়া সেই গতি থামানোর কোনো উপায় এমনিতেও ছিল না। তবে এবার তারা অবাক হয়ে দেখল এখন আর বিপক্ষ সেনারা তাদের সামনে খালি অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। সৈন্যদের বদলে তাদের সামনে আছে এখন বড়ো বড়ো ঢাল। সেই বড়ো ঢালের আড়ালে এখন সুরক্ষিত অবস্থায় আছে চেরা বাহিনী।

ততক্ষণে মহারাজ উথিয়ান নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। এবার দুর্গ ব্যূহে নিজের সব সেনাকে ব্যবহার করলেন তিনি। আজ চোলা সেনাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। কোনো খণ্ড যুদ্ধ আজকে হবে না। সর্বাত্মক লড়াই করে যুদ্ধ আজকেই শেষ হবে।

দুর্গ ব্যূহ গড়ে তোলার একটা সুবিধা আছে। এখানে প্রধান লক্ষ্য থাকে সেনাদের প্রতিরক্ষা। তবে সেই সাথে ঢালের ফাঁক থেকে বর্শা আক্রমণ চালানো যায় সামনের সেনাদের ওপর। এছাড়া দুর্গের ভেতরে একটু পেছন থেকে ভল্ল আর তির ছুঁড়েও শত্রু নিধন করা যায়। সেই অনুযায়ী আক্রমণ করতে এর মধ্যেই তৈরি হয়েছে চেরা বাহিনীর তিরন্দাজরা।

ঠিক সেই কাজটাই করলো চেরা বাহিনী। ঢালের সামনে মাথা কুটে মরছে চোলা বাহিনীর সদস্যরা। আর সেই ফুঁসতে থাকা বেপরোয়া বাহিনীর ওপর বৃষ্টির মতো তির ছুঁড়তে লাগলো চেরা তিরন্দাজরা। সাথে যোগ হচ্ছে ভল্ল।

ব্যূহের সামনে দাঁড়াতেই মহারাজ কারিকালা ব্যূহ চিনতে পেরেছেন। দুর্গ ব্যূহ গঠন করেছে শত্রু। আজ শিবির থেকে চেরা সৈন্য যতটুকু পারা যায় ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সেনা নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। তিন সারি সৈন্য ধ্বংস করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দুর্গ ব্যূহের সামনে তারা অরক্ষিত অবস্থায় আছে। আর কোনো উপায় নেই। মৃত্যুকে স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সামনে আক্রমণ করার মতো কেউ নেই। তার ওপর ছুটে আসছে বৃষ্টির মতো তির আর অন্যান্য ক্ষেপনাস্ত্র। তাই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ত্যাগ করে যার যার হাতে ঢাল আছে তারা ঢাল তুলে নিজেদের কিছুটা আড়াল করে নিলো। এতক্ষণের যুদ্ধে অনেকের হাতের ঢালই চ্যুত হয়েছে। তাদের সামনে আর কোনো উপায়ই রইলো না। শরীরে একাধিক অস্ত্রের আঘাত নিয়ে তারা চলে যেতে লাগলো স্বর্গে।

প্রতিপক্ষ এখন কী করবে তা নিশ্চিত জানেন কারিকালা। আরও কিছুক্ষণ উন্মুক্ত অস্ত্র ছুঁড়ে তাদেরকে ভয় পাইয়ে দেবে। তারপর সামনের ঢাল সরে গিয়ে ভেতর থেকে

বেরিয়ে আসবে অশ্বারোহী আর হস্তী বাহিনী। আক্রমণ করবে পর্যুদস্ত চোলা সেনাদের। মাঝে মাঝে অনুমান করতে পারলেও করার আর কিছুই থাকে না। মহারাজ কারিকালার এখন ঠিক সেই অবস্থা।

মহারাজ কারিকালার অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভুল। প্রতিপক্ষের দুর্গ ব্যূহের ভেতর থেকে আরও কয়েকবার অস্ত্র বৃষ্টি হলো। তারপর শিঙ্গার আওয়াজে দুর্গের সামনের দরজা খুলে দেবার সংকেত দিলেন চেরা প্রধান সেনাপতি।

চোলা সৈন্যরা এখন বলতে গেলে স্থবির। সেই থেমে যাওয়া সেনাদের ওপর এবার প্রবল বেগে আক্রমণ করলো চেরা অশ্বারোহীরা। কিছুক্ষণ আগে করা আক্রমণের একবারে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে লাগলো এবার তারা। এবার চোলা সেনারা প্রতি আক্রমণের কোনো সুযোগই পাচ্ছে না। এবার শুরু হলো নির্বিচারে চোলা সেনা নিধন। পাশার দান উল্টে গেছে।

ঠিক তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার জন্য দুই পক্ষের কেউই প্রস্তুত ছিল না। চেরা বাহিনী এখন সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করছে। চেরা বাহিনীর শিবির যেখানে স্থাপন করা হয়েছে সেই দিকের জঙ্গল থেকে একটা বিশাল বাহিনী যেন ভোজবাজির মতো উদয় হলো। পেছনের সেই সেনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মহারাজ উথিয়ান দেখলেন তাদের শরীরে চোলা সেনাদের পোশাক। তিনি কিছুই ভেবে পেলেন না। তার মানে কোনোভাবে চোলা বাহিনীর একটা অংশ তাদের পেছনে চলে গেছে। কিন্তু এ তো রীতিমতো অসম্ভব। এত পরিমাণ বাড়তি সৈন্য তারা জোগাড় করলো কোত্থেকে? আর সেই সেনারা কীভাবে তাদের চোখ এড়িয়ে তাদের পেছনে অবস্থান নিলো?

মহারাজ কারিকালারও একই অবস্থা। তিনিও কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই বাহিনী এলো কোত্থেকে? যুদ্ধক্ষেত্রে আগত নতুন সেনাদের গায়ে ঠিক তার সেনাবাহিনীর মতোই পোশাক এবং সাজ। এই বাহিনী কোত্থেকে এসেছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার।

তবে সেসব এখন চিন্তা না করলেও চলবে। এই বাহিনী তার বাহিনীর সাজ পোশাক পরে এসেছে। তার মানে অবশ্যই এই বাহিনী তার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছে। এবার সহায় পেয়ে প্রবল বিক্রমে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'চোলা সেনারা, আমাদের সেনা এসে গেছে। তোমরা সবাই প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করো।'

চেরা বাহিনী আচমকা এই ঘটনায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল কারিকালার চিৎকারে চোলা সেনাদের সাথে সাথে তাদেরও জ্ঞান ফিরেছে। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সমান তালে।

চেরা প্রধান সেনাপতি সমূহ বিপদ দেখতে পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলেন মহারাজ উথিয়ানের দিকে। পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'মহারাজ, আমাদের ওপর দুই দিক থেকেই আক্রমণ হয়েছে। সামনে আর পেছনে সেনারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। আর আমাদের পুরো বাহিনী ফিরে আছে একদিকে। এখন কী করবো?'

'হ্যাঁ, প্রধান সেনাপতি, একমুখী কোনো ব্যূহ দিয়ে এখন আর আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না। তবে আমাদের সেনা সংখ্যা কম না। একটা চারিদিক রক্ষা করার মতো ব্যূহ আমাদের এখনই তৈরি করতে হবে। তাড়াতাড়ি চক্রব্যূহ গঠন করার সংকেত দিন।'

'মহারাজ, তা আমি অনেক আগেই চিন্তা করে দেখেছি। জায়গাটা অনেক আগেই আমি জরিপ করেছি। একমুখী ব্যূহ গঠন করার জন্য জায়গাটা যথেষ্ট। কিন্তু চতুর্মুখি ব্যূহ মানে চক্রব্যূহ অথবা সর্বোতভদ্র ব্যূহ আমরা কিছুতেই গঠন করতে পারবো না।'

যুদ্ধে এসে এবার প্রথমবারের মতো সত্যিকারের ভয় পেলেন মহারাজ উথিয়ান, 'তাহলে এখন আমাদের হাতে কী উপায় আছে?'

'মহারাজ, এখন আর কোনো কৌশল খাটিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ আমাদের কাছে নেই। আমাদের হাতে একটাই উপায় আছে। কোনো ব্যূহ গঠন করা যাবে না। আপনি অর্ধ সেনার অধিপতি হয়ে সামনের দিকে যুদ্ধ করুন। আমি বাকি অর্ধ সেনা নিয়ে পেছনে ফিরছি। এছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই।

এক পলে চেরা সৈন্যের ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে এলো। শুরু হলো মহারণ। কোনো দলই এখন আর ব্যূহ নির্মাণের কথা চিন্তা করছে না। কেবল শত্রু সংহারের চিন্তা তাদের মাথায়। মাঠ জুড়ে কেবল অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সৈন্যদের আর্তনাদ। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, যুদ্ধে যেই জিতুক, এই যুদ্ধের সমাপ্তি আজকেই হবে।

দুই দিক থেকে আসা ক্রমশ আক্রমণে ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগলো চেরা বাহিনীর দাঁড়ানোর জায়গা। তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। আর ঠিকমতো জায়গা না পেয়ে সেনারা সুবিধা মতো দাঁড়াতেই পারছে না। আস্তে আস্তে হারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছেন মহারাজ উথিয়ান। ওদিকে মহারাজ কারিকালাও এগোচ্ছেন আস্তে আস্তে চেরা সেনার বুক বিদীর্ণ করে। একটু পড়েই মহারাজ উথিয়ানের মুখোমুখি হলেন মহারাজ কারিকালা। বুঝতে পারলেন এবার রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে। দুজনেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন ঘোড়া থেকে।

দুই রাজার লড়াই মানেই বিশেষ কিছু। কাছাকাছি থাকা সেনারা যুদ্ধ করা থামিয়ে দিলো। জায়গা করে দিলো দুজনকে। দুজন এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনকে মেপে নিচ্ছেন।

দুই রক্তাক্ত তলোয়ার একে অপরকে আঘাত করলো। দুজনের কাছেই তলোয়ার ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। মহারাজ উথিয়ানের উৎসাহ যতই থাকুক, তার বয়স হয়েছে। ওদিকে কারিকালার এখনও তারুণ্য ঠিক মতো যায়নি, সারা শরীরে স্ফূর্তি, রক্ত তাজা।

বেশ কিছুক্ষণ সমানে লড়লেন মহারাজ উথিয়ান। সমানে বললে ভুল হবে, কারিকালার শরীরে দুটো তলোয়ারের খোঁচা লাগলো। মহারাজ উথিয়ান এখনও অক্ষত।

সেই আঘাত আমলে নিলেন না মহারজা কারিকালা। বেড়ালের মতো তাকিয়ে আছেন তিনি প্রতিপক্ষের দিকে। মনোযোগে একটুও ঘাটতি দেবার অর্থ মৃত্যু। শুধু তার মৃত্যু নয়, রাজার মৃত্যু মানে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ জয়।

মহারাজ কারিকালা খেয়াল করেছেন মহারাজ উথিয়ানের অবস্থা। বয়স তার ওপর প্রভাব ফেলেছে। একটু ভারী হয়ে এসেছে ওনার শ্বাস। ভারী শরীরের ক্ষিপ্রতাও যেন একটু কমে এসেছে।

কারিকালা জানেন তার সুযোগ আসবে। আর তখনই করতে হবে মোক্ষম আঘাত। সেই মুহূর্ত চলে এলো সহসা। ধীর হয়ে আসা মহারাজ উথিয়ানের একটা আঘাত এড়িয়ে গেলেন কারিকালা। তারপর চোখের পলকে আঘাত করলেন মহারাজ উথিয়ানের পিঠে। জোরালো আঘাতের ধাক্কায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন মহারাজ উথিয়ান। তার পিঠে গভীর গর্ত হয়ে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো আঘাতের স্থান থেকে। মাথার রাজ মুকুট ছিটকে একদিকে পড়ে গেছে। চেরা মহারাজার মুকুট মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে চেরা বাহিনীর পরাজয়ও ঘোষণা হয়ে গেল।

মহারাজ কারিকালা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন মহারাজ উথিয়ানের দিকে। তারপর নিজের ধারালো তলোয়ারের ফলা ছোঁয়ালেন মহারাজ উথিয়ানের গলায়।

সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে চোলা সৈন্যদের হর্ষ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো। চেরা সৈন্যরা কোনোদিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তাদের হাত থেকে খসে পড়েছে অস্ত্র। দূরে থাকা সৈন্যরা তখনো একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। তখনই চোলা যুদ্ধ শিঙ্গা বেজে উঠলো বেশ জোরে।

এই ধ্বনির অর্থ সবাই জানে। এটা কোন বিশেষ সংকেত নয়। এই ধ্বনির মানে হচ্ছে দুই পক্ষের কোনো এক রাজা হয় নিহত হয়েছেন অথবা বন্দি হয়েছেন। সবাই এবার যুদ্ধ থামিয়ে জটলার দিকে নজর দিলো।

মহারাজ কারিকালা হাত তুলতেই চোলা সেনারা হর্ষ ধ্বনি থামালো। প্রান্তরে এখন অখণ্ড নীরবতা। সেই নীরবতার বুক চিরে দিয়ে মহারাজ কারিকালা বেশ জোরালো গলায় বললেন, 'শোনো চেরা সেনারা, যদি তোমাদের মহারাজকে আরও কয়েকদিন জীবিত দেখতে চাও তাহলে সবাই এই মুহূর্তে অস্ত্র ত্যাগ করো। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে।'

রাজা বন্দি হলে যুদ্ধ করার আর কোনো মানে নেই। সমগ্র চেরা বাহিনী শস্ত্র ত্যাগ করে বরণ করে নিলো বন্দিত্ব।

মহারাজ কারিকালার মনে অপার স্বস্তি। তবে তার ভেতরেও কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে একটা চিন্তা। সম্পূর্ণ হেরে যাওয়া একটা যুদ্ধ জিতে গেছেন তিনি। কিন্তু বাড়তি সেনা কোথা থেকে এসেছে সেই ব্যাপারটার এখনও কোনো সমাধান হয়নি।

সেই রহস্যের জবাব দিতেই যেন নতুন আসা সৈন্যদের দল থেকে এক সেনা এগিয়ে এলো মহারাজ কারিকালার দিকে। তার শরীরে চোলা সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট পোশাক। তবে মহারাজ কারিকালা নিশ্চিত, এই সৈনিক তার বাহিনীর কেউ নয়।

বরং এই সৈনিককে তিনি আগে অন্য জায়গায় দেখেছেন।

৫৯

মহারাজ কারিকালা এখন নিজের শিবিরের তাবুতে বসে আছেন। এখনও একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলে নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে নেই। রাজাদের জীবনে কখনোই নিজের অনুভূতির জন্য বরাদ্দ করা সময় পাওয়া যায় না।

চেরা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য এখন বন্দি অবস্থায় আছে। তাদের সাথে কি আচরণ করা হবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি। তবে মহারাজ উথিয়ানের পিঠের মারাত্মক ক্ষতের চিকিৎসা এর মধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন বৈদ্যরা।

সেই পূর্ব পরিচিত কিন্তু আপাত ছদ্মবেশী সৈনিক এখন দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ কারিকালার ঠিক সামনে। এই সৈনিককে আগে মহারাজ কারিকালা দেখেছিলেন। এই সৈন্য ছিলেন মন্ত্রী গিরিধারীর দূত। আগে সেই পরিচয়েই চোলা রাজ্যে এসেছিল সে।

সৈনিক যে এককালে দূত ছিল এবং এখনও যে তার দূতের কাজই ভালো লাগে তা তার কথার ভাব দেখেই বোঝা গেল, 'মহারাজ কারিকালা, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহামন্ত্রী গিরিধারী তার বচন পূর্ণ করেছেন। যথাসময়ে আপনার সাহায্যার্থে সেনা প্রেরণ করেছেন। আর আপনাকে অভিনন্দন, সেই পাঠানো সেনার বদৌলতে আপনি প্রায় হেরে যাওয়া যুদ্ধ জিতে গেছেন। যদিও বলতে দ্বিধা নেই, আজ আপনিও যুদ্ধক্ষেত্রে কালান্তক যমের মতো শত্রুসেনা নিধন করেছেন। আপনার বীরত্বের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।'

'হ্যাঁ, এজন্য আমি সাতবাহন রাজ্য এবং মন্ত্রী গিরিধারীর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই সেনা এলো কোত্থেকে? আর আমার সেনাদলের সাজ-পোশাক ওদের কেন পরানো হয়েছে?'

'আমার মনে হয় এই সহজ উত্তরটা আপনি জানেন মহারাজ। সেনাকে আপনার সেনার সাজপোশাক পরানো হয়েছে যাতে মনে হয় এরা আপনারই সেনা। দুটো কারণে মহামন্ত্রী গিরিধারী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'কী সেই দুটো কারণ?'

'প্রথমেই কাউকে অবশ্যই বুঝতে দেওয়া চলবে না, এখানে সাতবাহন রাজ্য আপনাদের সাহায্য করছে। আপনার সেনার পোশাক পরলে এখানে সাতবাহনের দিকে কেউ আর আঙুল তুলবে না। আর দ্বিতীয়ত মহামন্ত্রী গিরিধারী আপনাকে প্রকৃত মিত্র মনে করেন। তিনি চাননি এই যুদ্ধ জেতার গৌরব আপনি ছাড়া আর কারো ভাগে চলে যাক। তাই আপনাকে কেউ সাহায্য করেছে এমন কোনো চিহ্ন রাখতে তিনি আমাকে বিশেষভাবে বারণ করে দিয়েছিলেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু সাহায্যটা একটু দেরিতে এসেছে। আরেকদিন আগে এলে আমাকে আর অর্ধেক সেনা হারাতে হতো না। যাই হোক, নিয়তির লেখা তো আর খণ্ডানো যাবে না। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে।'

'আপনার অর্ধেক সৈন্যের মৃত্যুতে আমি সত্যিই দুঃখিত মহারাজ। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আপনার হাতে এখনও অর্ধেক সেনা আছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই যুদ্ধ জয়ের ফলে আপনি এখন এই দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। নিজেকে এখন বিনা বিবেচনায় আপনি দক্ষিণ ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করতে পারেন।'

'আচ্ছা। আমি কী পেয়েছি, কী পাবো সেসব কথা থাক। তোমাদের রাজ্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে জানো তো, এই রাজনীতিতে কেউ কাউকে যেচে সাহায্য করে না। স্বার্থ অবশ্যই থাকে। এখন বিনিময়ের কথায় আসা যাক। আমাকে এখন সাতবাহনের জন্য কী করতে হবে? যাতে কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতায় কাটাকাটি হয়ে যায়।'

'ছি ছি মহারাজ। সেরকম কোনো ব্যাপারই নেই।'

কারিকালা হাসলেন, 'তুমিও জানো, কথাটা সত্যি নয়। সংকোচ কোরো না। বলে ফেলো।'

'আমাকে এই ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি মহারাজ। তবে মন্ত্রী গিরিধারী নিশ্চিত জানতেন আপনি এই যুদ্ধে জিতবেন। তাই জয়ের পরে কিছু কাজ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন তিনি।'

'শোনা যাক সেগুলো। কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধা আমি। তবে কোনোভাবে আমার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কাজ করতে নিশ্চয়ই বলেননি তিনি।'

'না মহারাজ। প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, আপনি মহারাজ উথিয়ানের প্রাণ ভিক্ষা দেবেন। তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে তার রাজ্যে ফিরে যাবার সুযোগ দেবেন।'

'কী! তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেবো?'

'হ্যাঁ মহারাজ। শুধু ছেড়ে দেবার আগে ওনার সাথে একটা চুক্তি করে নেবেন।'

'চুক্তি!'

'আজ্ঞে মহারাজ। চেরা রাজ্যের সম্পূর্ণ বাণিজ্য আর শাসনের ভার থাকবে আপনার হাতে। আপনি চোলা থেকে নিজের প্রতিনিধি দিয়ে এই দুটো ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করবেন।'

'কিন্তু শত্রুকে এভাবে ছেড়ে দেবার কি আদৌ কোনো মানে হয়। আঘাত প্রাপ্ত শত্রু হয় বিষাক্ত সর্পের মতো। সুযোগ পেলেই সে আবার ছোবল বসাবে। চেরা রাজ্যে ফিরে যদি মহারাজ উথিয়ান আবার আমাদেরকে আক্রমণ করার পায়তারা করেন? যদি চেরার মাটিতে গিয়েই তিনি চুক্তি বাতাসে উড়িয়ে দেন?'

'সেই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। আর সেই কথা চিন্তা করেই মহামন্ত্রী গিরিধারী আপনার জন্য দ্বিতীয় পরামর্শ পাঠিয়েছেন। আপনি সম্পূর্ণ চেরা সেনাবাহিনী আপনার অধীনেই রাখবেন। সাথে থাকবে আমাদের পাঠানো সেনা। আপনার কাছে আপনার অর্ধেক সেনা তো আছেই। এই মিলিত বিশাল সেনাবাহিনীর অধিপতি এখন শুধু আপনি। আপনি মহারাজ উথিয়ানের সাথে চেরা বাহিনীর কাউকে পাঠাবেন না। পাঠাবেন আপনার বাহিনীর সেনাদের। তারা মহারাজকে চেরা রাজ্যে পৌঁছে দেবে ঠিক। কিন্তু তাকে নজর বন্দি করে রাখবে।'

'কিন্তু এই কাজটা কেন করতে হবে? মহারাজ উথিয়ানকে হত্যা করলেও তো আমার সেনারা চেরা অধিকার করতে পারবে।'

'মহারাজ, এই কাজটা করা আপনার জন্য অনেক জরুরি। এতে চেরা রাজ্যের জনগন এবং কর্মকর্তাদের কাছে আপনার মহানুভবতার একটা শক্ত পরিচয় দেওয়া হবে। বন্দি রাজাকে নিজের রাজ্যে ফেরত পাঠালে আপনি রাজ্যের ব্যবসায়ী এবং প্রজাদের শ্রদ্ধা লাভ করবেন। তারা আপনার অধীনে শাসিত হতে দ্বিধা বোধ করবে না। বন্দরের ব্যবসায়ীরা আপনার লোকেদের কথায় চলবে। আর কঠিন নজরবন্দি থাকার কারণে মহারাজ উথিয়ান আপনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না, প্রজাদের সহানুভূতিও তিনি পাবেন না। পরাজিত রাজাকে সবাই অযোগ্য হিসেবেই দেখে। তখন আপনার শত্রুর ছোবল খাবার কোনো ভয় থাকবে না।'

মুচকি হাসলেন কারিকালা, 'এবার বুঝতে পেরেছি। একেবারে নিখুঁত রাজনীতির চাল। মহামন্ত্রী গিরিধারীর কাছে আমরা এখনও শিশু। তবে আমি এখনও দক্ষিণ ভারতের সম্রাট হইনি। দক্ষিণ ভারতের তিন রাজ্যের আরেকটা রাজ্য হচ্ছে পাণ্ড্য। সেই রাজ্য তো আর আমার অধিকারে নেই।'

'হ্যাঁ। পাণ্ড্য রাজ্যের সাথে আপনার যুদ্ধ হয়নি সেকথা ঠিক। তবে আগে থেকেই চেরা রাজ্যের দয়ায় প্রতিপালিত হয়ে আসছে পাণ্ড্যরা। আপনি যখন চেরা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করবেন তখন স্বভাবতই পাণ্ড্য রাজ্য আপনার অধীনে চলে আসবে।'

মহারাজ কারিকালার এখনও মনে হচ্ছে না, সাতবাহন তার কাছে কোনো সাহায্য চায় না, 'আমি এখন এত বড়ো সেনাবাহিনী নিয়ে কী করবো? কবে নাগাদ এই সেনা ব্যবহার করে আমি আমার ঋণ শোধ করবো?'

'আমি আবারও বিনীতভাবে বলছি, তা আমি জানি না মহারাজ। তবে সেরকম কোনো পরিকল্পনা যদি মহামন্ত্রী গিরিধারীর মাথায় থেকে থাকে তাহলে সময়মতো আপনি অবশ্যই খবর পেয়ে যাবেন। একটা শেষ পরামর্শ আপনাকে দিতে বলেছেন মহামন্ত্রী।'

'সেটা কী?'

'মহারাজ, বিজিতকে ক্ষমা করা যায়, সেটা মহানুভবতার উদাহরণ, তবে যে একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, রাজদ্রোহ করেছে, তাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করা যায় না। আমি এবার তাহলে আসি মহারাজ। সাতবাহন রাজ্যে মহারাজ এবং মহামন্ত্রী আমার খবরের অপেক্ষা করছেন। আমি চাই না তাদের অপেক্ষা দীর্ঘ হোক।'

'ঠিক আছে। পথে আমার তরফ থেকে তোমার কোনো সাহায্য দরকার হবে?'

'না মহারাজ। আপনাকে আবারও অভিনন্দন।'

দূত প্রস্থান করে। শিবির থেকে বেরিয়ে আসেন মহারাজ কারিকালা। তখনই গিরিধারীর দেওয়া শেষ পরামর্শটা মাথায় এলো তার। বিশ্বাসঘাতকের কোনো ক্ষমা নেই।

বিদ্রোহী মন্ত্রী আর তার সহচরদের অবিলম্বে শিরঃচ্ছেদ করা হলো। পিতৃহন্তা বৃদ্ধ মন্ত্রীর শিরঃচ্ছেদ করলেন স্বয়ং মহারাজ কারিকালা।

৬০

গিরিধারী বসে আছেন মহারাজ সাতকর্ণীর ঠিক সামনে। প্রতিষ্ঠানার এই মন্ত্রণাকক্ষে এখন আর কারো উপস্থিতি নেই। মহারাজ সাতকর্ণীর মুখ শান্ত। এটাই এখন গিরিধারীর সবচেয়ে বড়ো ভয়ের কারণ। মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, কোনো কাজে বিচলিত থাকে, তখন সে অস্থির হয়, তার রাগ, তার চঞ্চলতা বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেই মানুষ যখন স্থির হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। এখানে মহারাজ নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেটাই এখন সবচেয়ে বড়ো ভয়ের কারণ। কী সেই সিদ্ধান্ত?

আজকে যেন দুজনের চরিত্র বদলে গেছে। আজ গিরিধারী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। সৌম্য মুখে এখন একটু হলেও দুশ্চিন্তার ছায়া প্রকাশ পাচ্ছে। আসলে প্রকৃত কর্মযোগী হওয়া এই জগতে খুবই কঠিন কাজ। এক সময় ফলের চিন্তা পেয়ে বসে। পরমেশ্বরের ওপর ভরসা একসময় একটু হলে কমে যায়। তবে কাজ শেষ করে অবসরে ফলের চিন্তা করলে ক্ষতি একটু কম।

গিরিধারী একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, মহারাজ আর বেশি অপেক্ষা করবেন না। যথেষ্ট ধৈর্য ধরেছেন তিনি। সবার জন্যই ধৈর্যের একটা সীমা আছে, আর ইতিহাস বলে রাজপুরুষদের জন্য সেই সীমা যথেষ্ট সংকীর্ণ। আর গিরিধারী বর্তমানে যে আসনে বসে আছেন সেটা তিনি বংশানুক্রমে অর্জন করেননি, তাকে দিতে হয়নি কোনো যোগ্যতার পরীক্ষাও। তিনি আপদ কালীন মন্ত্রী। তাই যে-কোনো সময় পূর্বের মন্ত্রী বলদেবের পরিণতি বরণ করে নিতে হতে পারে তাকে।

এখন হিসেব সোজা। রান্নার জোগাড় শেষ, রান্না করা হয়ে গেছে, পরিকল্পনার চর্বণও এতক্ষণে শেষ হবার কথা, এবার দেখা যাক ফল কী হয়। ব্যর্থতার কোনো ক্ষমা এখানে নেই, ফল না এলে অবশ্যই মহারাজ সাতকর্ণী নতুন মন্ত্রীর খোঁজ করবেন।

সময়ের হিসেব চলছে গিরিধারীর মনে মনে। আজকে না, দুই দিন আগে থেকেই। তার হিসেবে সময় হয়ে এসেছে। একটা না একটা খবর চলে আসবে। তবে নিরালায় বসে করা মাথার হিসেব আর পথের হিসাবে অনেক ফারাক থাকে। সেই হিসেবে খবর আসতে আরও দুই এক দিন লাগতে পারে। তবে, সেই দুই একদিন সময় এখন গিরিধারীর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মহারাজ সাতকর্ণী এতক্ষণ চুপ ছিলেন। এবার শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'গিরিধারী, আমি কি অভিজ্ঞতার দাম না দিয়ে, নতুন ধ্যানকে অভিজ্ঞতার ওপর স্থান দিয়ে কোনো ভুল করেছি?'

'এই কথা কেন বলছেন মহারাজ? এখনও তো আমার পরীক্ষার ফলের সময় আসেনি। আমি কৃতকার্য হয়েছি কি না সেটা না জেনে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কি উচিত হবে?'

'আর পরীক্ষা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শেষ পর্যন্ত কী হবে। দেখা যাবে আমার সব গুটি জীবিত আছে, তারপরও আমি হেরে বসে আছি। আপনি আমাকে দিয়ে একটা সম্পূর্ণ এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী বানালেন। সেই বাহিনীর কী কাজ সেই সম্পর্কে আপনি নিজেই নিশ্চিত না। নতুন বাহিনী বানাতে, চালাতে কত খরচ হচ্ছে জানেন? জানেন তো অবশ্যই। নেহাত কম না। আমার দুর্বল কোষাগারের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে সেই সম্পদ জোগাড় করতে গিয়ে।'

'আমি জানি মহারাজ। মন্ত্রী হিসেবে রাজ খাজাঞ্চির সাথে নিয়মিত আলোচনা করাও আমার কর্তব্যের ভেতরে পড়ে।'

'সে যাক। আপনার দক্ষিণের কূটনীতির কোনো উন্নতি তো আমার চোখে পড়ছে না। আপনার পরীক্ষার ফল আমি কীভাবে পাবো? পরীক্ষাই তো দিচ্ছেন না আপনি। আপনি অতি সত্বর আমাকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশনা দেবেন। এভাবে বসে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না। একবার যুদ্ধে নামলে তারপর আমি নিজেই সামলে নিতে পারবো। যুদ্ধ জয় করার কৌশল আমার ভালোই জানা আছে। আর যদি আপনি নিজেকে যোগ্য মনে না করেন, তাহলে আর কালক্ষেপণ করে এই রাজ্য আর আমার সর্বনাশ করবেন না। আমাকে সত্যিটা বলে দিন, আমি যোগ্য লোক খুঁজে নিতে পারবো।'

গিরিধারী এখন আর আশার বাণী শোনাতে তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। কিন্তু মহারাজের এমন সব কথার পিঠে তো একেবারে চুপ করেও থাকা যায় না। তিনি সাবধানে মুখ খুললেন, 'মহারাজ, পরীক্ষার ফলাফল অবশ্যই বিবেচ্য। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে হবে না, যদি আমি বুঝতে পারি আমার পরীক্ষা খারাপ হচ্ছে তাহলে আমি নিজেয় চলে যাবো, আপনাকে কষ্ট করে আমাকে ত্যাজ্য করতে হবে না।'

'তাহলে আপনার পরীক্ষা শুরু হবে কবে?'

ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলেন গিরিধারী, 'মহারাজ, শুরু হবে নয়, আমার পরীক্ষা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। আর একবার শুরু হয়ে সে আর থামেনি, এখনও সমানে চলছে।'

'বাহ, কথাটা শুনে ভালো লাগলো। কথাটা ঠিক। বলদেবকে সরানোর কঠিন সিদ্ধান্তটা যেদিন আমি নিয়েছিলাম, যেদিন আপনাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম সেদিনই পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। তবে সাথে সাথে আমার যুধিষ্ঠিরের কথাটাও মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'কী কথা মহারাজ?' গিরিধারী বুঝতে পারেন না ঠিক।

'শাস্ত্র কিছু আমিও পড়েছি। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যখন কঙ্ক নাম ধারণ করে বিরাটের সভায় ছিলেন, তখন তাকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। একজন রাজার কখনোই শুধু একজন মন্ত্রী অথবা সেনাপতির ওপর ভরসা করা উচিত নয়। সেই কথাটাই এখানে আমি মানিনি। একা আপনার ওপর ভরসা করেছি। একার মতের চেয়ে সম্মিলিত মতামতের ফলাফল অবশ্যই ভালো হয়।'

এবার বুঝতে পারলেন গিরিধারী, তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর কিছু দেরি হলে তাকে ত্যাজ্য করা না হলেও ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা করা হতে পারে। না, আর দেরি করা যাবে না। ভাগ্যকে নিজের সহায় হবার জন্য মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি।

তখনই দরজায় প্রহরীর ভারী পদ শব্দ শোনা গেল। ভেতর থেকে বেশ জোরালো গলায় বললেন গিরিধারী, 'ভেতরে এসো।'

প্রহরী এসে দাঁড়ালো। মহারাজ সাতকর্ণী তাকালেন তার দিকে, 'কী হয়েছে? অন্তঃপুর থেকে ডাকছে আমাকে?'

'আজ্ঞে না মহারাজ। একজন দূত এসেছে। সে মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে পথশ্রমে অনেক ক্লান্ত। এখন আজ্ঞা করুন।'

মহারাজ সাতকর্ণী গিরিধারীর দিকে তাকালেন। গিরিধারী তাকালেন প্রহরীর দিকে, 'সে কি তার নাম বলেছে?'

'আজ্ঞে মহামন্ত্রী।'

গিরিধারীর আদেশে নামটা বলল প্রহরী। আগত দূতের নাম শুনেই গিরিধারীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার মন থেকে যেন দুই মণের এক বোঝা নেমে গেছে। দূতের যে শারীরিক অবস্থার কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে অন্য সময় হলে দূতকে বাড়িতে পাঠিয়ে পরে দেখা করে নিতেন তিনি। তবে এখন সেই কাজ করার সময় নয়। গিরিধারী প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন, 'যাও, দ্রুত দূতকে এখানে নিয়ে এসো।'

আশ্চর্য হলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'দূতকে এই অবস্থায় এখানে ডাকার দরকার কী? আমার সামনেই আপনার দূতের সাথে কথা বলবেন?'

'আজ্ঞে মহারাজ, প্রয়োজন আছে' গিরিধারীর কণ্ঠে বিনয় মাখা অনুনয়, 'অনুমতি দিন মহারাজ।'

মহারাজ সাতকর্ণী আর না করতে পারলেন না, তিনি নিজেও একটু কৌতূহল বোধ করছেন দূতের ব্যাপারে। দূতের কথা শুনেই যেন গিরিধারীর হাবভাব বদলে গেছে, 'আচ্ছা, যাও, দূতকে এখানে নিয়ে এসো।'

প্রহরী প্রস্থান করলো। মহারাজ সাতকর্ণী আড় চোখে তাকালেন গিরিধারীর দিকে। গিরিধারীর প্রতি তিনি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এখন গিরিধারীর আচরণের এই পরিবর্তনের কারণ কী সেটা জানতে উৎসুক হলেন তিনি, 'এতক্ষণ আপনার সাথে যে আলোচনা হচ্ছিলো তাতে তো আপনাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল আপনার পুরো চেহারায়। সামান্য এক দূতের আগমনে আপনার চেহারায় এত ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠার তো কোনো কারণ দেখছি না। ঘটনা কী?'

গিরিধারী হাসলেন। একেবারে মনের ভেতর থেকে, 'মহারাজ, যে দূত এসেছে সে কোনো সাধারণ দূত নয়। আপনি কিছুক্ষণ আগে আমার পরীক্ষা আর তার ফলাফল নিয়ে কথা বলছিলেন। সেই ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আমার ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাও আভাসে বলেছেন। এই দূত আমার সেই পরীক্ষার ফল নিয়ে এসেছে।'

'তাহলে তো আর দেরি হবে না। এখনই জানা যাবে সব। কিন্তু দূত কী সংবাদ নিয়ে এসেছে তা না জেনেই আপনার চোখেমুখে আলো এলো কীভাবে?'

'সফল হবো কিনা ব্যর্থ হবো জানি না। অবশ্য তা একটু পরে এমনিতেই জানতে পারবো। ফলাফল তো আসলে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে। তবে জানেন তো মহারাজ, কোনোকিছু নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকার চেয়ে যা হোক কিছু একটা ফলাফল জেনে নেওয়া অনেক স্বস্তির। আমার মুখে আসলে সেই স্বস্তিরই হাসি।'

প্রহরী দেরি করলো না। জলদি দূতকে হাজির করলো কামরায়। দূতের পোশাকের নানা জায়গায় কুঞ্চিত হয়ে আছে। চেহারায় তার ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু তার চেহারায় সে ছাপ নেই। গিরিধারী বুঝতে পারলেন, দূত নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছে। প্রথমে মহারাজ এবং পরে গিরিধারীকে সম্মান প্রদর্শন করে এক কোণায় দাঁড়ালো সে।

গিরিধারীর আর তর সইছে না, 'বলো, দক্ষিণের যুদ্ধের কী খবর?'

মহারাজ সাতকর্ণী কম অবাক হলেন না, 'দক্ষিণের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে?'

ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলো দূত, 'শেষও হয়ে গেছে মহারাজ।'

'বলো কি!'

'আজ্ঞে মহারাজ। মহামন্ত্রীর পরিকল্পনা মতোই সবকিছু হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর ঠিক তিনদিনের মাথায় চেরা মহারাজ চেরাল উথিয়ান পরাজয় বরণ করেছেন। তিনি এখন বন্দি আছেন চোলাদের হাতে। যুদ্ধে অবশ্য চোলা সেনাবাহিনীর অর্ধেক অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

নিজের পরিকল্পনার পূর্ণতার কথা রসিয়ে রসিয়ে শুনতে আগ্রহী গিরিধারী, 'মহারাজ উথিয়ান বন্দি হলেন কীভাবে?'

'কাপুরুষের মতো হয়েছেন তা বলা যাবে না। তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেই বন্দি হয়েছেন। তৃতীয় দিনের যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি মুখোমুখি হন চোলা মহারাজ কারিকালার। তখন আপনার পাঠানো বাহিনী পেছন থেকে চেরা বাহিনীকে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। মহারাজ উথিয়ান সম্মুখ যুদ্ধে প্রথমে ভালোই লড়েছিলেন, পরে নিজের বয়স আর দমের কারণে হেরে যান। কারিকালার আঘাত একেবারে তার পিঠে লাগে। বেশ জোরালো সেই আঘাতের পর তিনি আর দাঁড়াতে পারেননি।'

'বুঝতে পেরেছি। রাজা লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে সেনাও পরাজিত হয়েছে।'

'আজ্ঞে মহামন্ত্রী। তবে চেরা বাহিনীর নিহত সৈন্য সংখ্যা চোলাদের চেয়ে কম। তারপরেও এত বড়ো সেনাদল বাধ্য হয়েছে অস্ত্র ত্যাগ করতে। একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে তারা।'

'যাক। তিনদিনেই ঝামেলা শেষ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম আরেকটু সময় লাগবে। দুই রাজা যে এত জলদি যুদ্ধ শেষ করে দেবেন তা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তোমার বাকি কাজ ঠিকমতো করেছো তো? যুদ্ধ জয়ের পর, উদযাপনের পর মহারাজ কারিকালা যখন শান্ত হয়েছেন, তখন তুমি তার সাথে কথা বলেছ? আমার দেওয়া শর্তগুলো তাকে ঠিকমতো বলে এসেছ তো?'

'আজ্ঞে। আমি সব শর্তই বলে এসেছি। আপনি যেভাবে বলতে বলেছেন ঠিক সেভাবে। তিনি আমাদের সবগুলো শর্তই মেনে নিয়েছেন।'

'আর?'

দূত তাড়াতাড়ি বলল, 'আর তিনি এও জানিয়েছেন যখনই আমরা সাহায্য চেয়ে সংবাদ পাঠাবো, সেই ক্ষণে বিলম্ব না করে তিনি আমাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত।'

'আচ্ছা। বিদ্রোহী মন্ত্রীরা তো চেরা বাহিনীর সাথেই ছিল। তারা কি ছিল? না পালিয়ে গেছে যুদ্ধের মধ্যে?'

'না তারা পালাতে পারেনি। বন্দি হয়েছে। আমি শিবির ত্যাগ করার আগেই আমাদের পরামর্শ মেনে নিয়েছেন মহারাজ কারিকালা। তাদের সবারই একসাথে শিরঃচ্ছেদ করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, বেশ ভালো সংবাদ নিয়ে এসেছ। তুমি আলাদা পুরস্কার পাবে। এখন যাও, অথিতিশালায় ঘর প্রস্তুত পাবে। বিশ্রাম করো।'

দূত মহারাজ সাতকর্ণীর দিকে তাকালো। মহারাজের উপস্থিতিতে মহারাজের অনুমতি ছাড়া প্রস্থান করা ঠিক হবে না। মহারাজ সাতকর্ণীর মনে অনেক প্রশ্ন জমেছে, তবে সেসবের উত্তর এই দূত দিতে পারবে না। গিরিধারীই পারবে তার কৌতূহল মেটাতে। তিনি হাতের ইশারায় দূতকে প্রস্থান করতে বললেন। দূত দ্রুত অথিতিশালার দিকে প্রস্থান করলো।

গিরিধারী তাকালেন মহারাজ সাতকর্ণীর দিকে, 'নিজের কানে সবই তো শুনলেন মহারাজ। পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। আপনার কৃপায়, পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে আমি সেই পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছি।'

মহারাজ সাতকর্ণী সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গিরিধারীও উঠে দাঁড়ালেন তড়িঘড়ি। সিংহাসনের দুই হাতলে দুটো সিংহের মাথা নকশা করা আছে। সিংহ বেশ জোরে গর্জন করছে। সেই সিংহের মাথায় আরও সিংহসম থাবা বসালেন মহারাজ সাতকর্ণী, সাথে বেরিয়ে এলো পশুরাজের চেয়েও জোরালো গর্জন, 'ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি গিরিধারী, আর যদি একটা ঘোরানো কথা বলেন, তাহলে আমি কিন্তু আমার সমস্ত ধৈর্য ত্যাগ করবো। আমি এখন আর কিছুই বুঝতে চাইছি না। আপনি আমাকে সবকিছু একেবারে প্রথম থেকে খুলে বলবেন।'

মহারাজের এই রূপ দেখে ভীত না হয়ে পারলেন না গিরিধারী। তার স্বভাব সুলভ রসিকতা আর রহস্য এখন আর চলবে না। তাড়াতাড়ি নত মুখে গিরিধারী বললেন, 'মহারাজ, আপনি শান্ত হয়ে বসুন। ক্রোধ বড়োই ভয়ানক, যে-কোনো মানুষের জন্যই। আর সেটা যদি হয় রাজক্রোধ, তাহলে আর কোনো উপায় নেই।'

মহারাজ সাতকর্ণী আত্মসংবরণ করলেন। বসে পড়লেন নিজের আসনে। তারপর তাকালেন গিরিধারীর দিকে।

গিরিধারীও ধীরে ধীরে নিজের আসনে বসলেন, 'আমি আপনাকে সব এখনই খুলে বলছি মহারাজ।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

গিরিধারী শুরু করলেন তার পরিকল্পনা। যা তিনি অনেক ভেবে সাজিয়েছিলেন। যা তিনি করেছেন এতদিন মহারাজের অগোচরে।

'প্রথমেই মহারাজ আপনাকে বলি, আমার মূল পরিকল্পনা অনেক দীর্ঘ। আর সেই দীর্ঘ পরিকল্পনার অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে। হয়তো অর্ধেকের চেয়েও কম। তবে আপনি যদি আমার পাশে থাকেন তাহলে পরমেশ্বরের কৃপায় বাকিটুকুও আমি সম্পন্ন করতে পারবো। আপনাকে আর অপেক্ষা করাবো না। আমার পরিকল্পনা এক এক করে আপনাকে বলছি। এবারে কোনো রহস্য নয়। একেবারে সরাসরি বর্ণনা।

মহারাজ, প্রথমেই আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, শক রাজা নাহাপনাকে পরাজিত করার মতো সেনা শক্তি আমাদের কাছে নেই। নিজের কাছে যখন কোনো কিছু না থাকে তখন মানুষকে বাইরে নজর দিতেই হয়। সেটাই আমি করেছি।

বড়ো কোনো সামরিক জোট ছাড়া নাহাপনার বিরুদ্ধে আমরা সুবিধা কিছুতেই করতে পারবো না। আর সেই সামরিক জোট আমাদের এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ক্ষীরও ঘন হয়, আবার আমাদের লাকড়িও বেঁচে যায়। সেজন্যই বহু পদক্ষেপে সাজাই এক পরিকল্পনা। আমার কূটনীতি আর বুদ্ধির মিলিত শক্তি এখানে কাজে লেগেছে।'

'বলে যান গিরিধারী।' মহারাজ বেশ আগ্রহ ভরে শুনছেন।

'এই পরিকল্পনা পুরো একটা লোহার শেকলের মতো। মাঝখানের একটা বলয় যদি ছিঁড়ে অথবা ভেঙ্গে যায় তাহলে পুরো শেকলই বাতিল হয়ে যাবে। তাই আমাকে কাজ করতে হয়েছিল খুবই সাবধানে।

আপনি যখন শুনেছিলেন মহারাজ নাহাপনা তার দূত হিসেবে স্বয়ং তার মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন কলিঙ্গে তখন আপনি বেশ চিন্তায় পরে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু মনে মনে তাতে খুশিই হয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনার জন্য প্রতিপক্ষের চাল দেওয়াটা বেশ জরুরি ছিল। সেই চাল আমার ইচ্ছে মতোই দিয়েছেন শকরাজ। তবে তাতে আমার কূটনীতির কোনো হাত ছিল না।

আমি বুঝতে পারলাম কী হতে যাচ্ছে। শক রাজের কাছে আছে অঢেল সোনা, যার থেকে কিছুটা কলিঙ্গের রাজ কোষাগারে গেলে তাদের কিছু যাবে আসবে না। কলিঙ্গের অর্থনীতির অবস্থা বেশ খারাপ। কলিঙ্গ রাজ যে এতে রাজি হবেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। সোনার বিনিময়ে তাহলে কলিঙ্গ রাজ কী দেবেন? কী আছে কলিঙ্গ রাজের কাছে?'

'তার মোটামুটি ব্যবহার যোগ্য সেনা।' মহারাজ সাতকর্ণী নিজের জানা তথ্য দেওয়ার সুযোগ ছাড়লেন না।

'একদম ঠিক মহারাজ। আমি নিশ্চিত ছিলাম, কলিঙ্গের বিশাল সেনাবাহিনী আমাদের রাজ্যের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবে। আমার এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর যখনই আমি বুঝতে পারলাম কলিঙ্গ ঠিক এই কাজটাই করবে তখন আমি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দেই।'

'সেই পরিকল্পনায় আপনি প্রথমে ঠিক কী করলেন?'

'প্রথমেই কূটনীতির সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র প্রয়োগ করলাম আমি। সন্দেহ। আমি চলে গেলাম চোলা রাজ্যে। তখন সদ্য ক্ষতবিক্ষত হওয়া চোলা রাজ্যের রাজা তরুণ কারিকালা। তাকে আমি বোঝালাম, তার এখন সাবধানে থাকা উচিত। তার রাজ্যের

এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার রাজ্যে আক্রমণ করতে পারে চেরা আর পাণ্ড্য রাজ্য।'

'হ্যাঁ। আপনি যে চোলা রাজ্যে গিয়ে কারিকালাকে এই কথা বলেছিলেন তা আমি জানি। আমি যা জানি না সেটা বলুন।'

'বলছি। আমি সন্দেহ ছড়িয়ে দিলাম চোলা রাজার মাথায়। আসলে এমন কোনো চিন্তা চেরা মহারাজ উথিয়ান এবং পাণ্ড্য রাজার মাথাতেই ছিল না। মহারাজ উথিয়ানের মনোযোগ পুরোপুরি ছিল তার রাজ্যের বাণিজ্যের প্রতি। পাণ্ড্য রাজ্যকে বশে এনে তার কাজ ভালোই চলছিল। তার মাথায় চোলা আক্রমণের কোনো চিন্তাই ছিল না। তখন আমি দ্বিতীয় চাল দিলাম। মহারাজ চেরাল উথিয়ান যদি শুধু বাণিজ্য নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে তো আর আমার উদ্দেশ্য সাধন হয় না।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে দুই দিকেই সেনা দাঁড়াতে হয়।'

'হ্যাঁ মহারাজ। এবার আমাকে দ্বিতীয় পক্ষ জোগাড় করতে হবে। যে কিনা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াবে মহারাজ কারিকালার বিরুদ্ধে। এবং কাজটা করতে হবে খুবই সাবধানে। কাউকেই জানালে চলবে না আমিই জলের কুমির, আবার আমিই ডাঙ্গার বাঘ। আসলে দুই পক্ষে আমিই চাল দিয়েছি।'

চোয়াল ঝুলে পড়লো মহারাজ সাতকর্ণীর, 'মানে! আপনি এসব কী বলছেন গিরিধারী? দুই পক্ষের চাল আপনি দিয়েছেন, এই কথার মানে কী?'

'আসলে মহারাজ দুই পক্ষে না, তিন পক্ষেই আমি চাল দিয়েছি।'

মহারাজ সাতকর্ণীর ঝুলে পড়া চোয়ালের বিস্তার আরেকটু বাড়লো, 'এখানে আবার তৃতীয় পক্ষ এলো কোত্থেকে?'

'আসবে মহারাজ। তৃতীয় পক্ষও আসবে। শুনুন মহারাজ, দ্বিতীয় পক্ষ মানে চেরা রাজ্যের পক্ষে চাল দিতে আমার একজন বিভীষণের দরকার ছিল। মহারাজ উথিয়ান বেশ বিবেচক লোক, তার ওপর যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করেন না। তার মনে সন্দেহের বীজ বপন করা এত সহজ হবে না। সেই বিভীষণকে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করলাম আমি।'

'কে সেই বিভীষণ?'

'ভেরাপ্পন, মহারাজ।'

'তার মানে মহারাজ উথিয়ানের মন্ত্রী!'

'আজ্ঞে মহারাজ। মহারাজ উথিয়ানের সেই মন্ত্রী তখন আমাদের রাজ্যেই ছিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশে। ঘুরে ঘুরে গুপ্তচরের কাজ করছিলেন তিনি। তাকে খুঁজে পেতেই বন্দি করলাম। তারপর তাকে দীক্ষা দিলাম বিশ্বাসঘাতকতার মন্ত্রে।'

'ভেরাপ্পন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!'

'আজ্ঞে মহারাজ। সেই মন্ত্র মন্ত্রী থেকে রাজা হবার। সাথে অনেক উপঢৌকন আর ভবিষ্যৎ সুখের প্রতিশ্রুতি। সে অবশেষে রাজি হয়। খানিকটা লোভে, আর খানিকটা ভয়ে। তাতে আমার কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। আমি দূত হয়ে গেলে মহারাজ উথিয়ান আমলে দিতেন না, কিন্তু নিজের মন্ত্রীর কথা তিনি কীভাবে ফেলবেন?'

'বুঝলাম। ভেরাপ্পনই আমাদের মদতে চেরা রাজা উথিয়ানকে ভুলভাল বুঝিয়ে যুদ্ধে রাজি করিয়েছিলেন। তাতেই চোলা আর চেরার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল আর আমাদের

সাহায্য নিয়ে মহারাজ কারিকালা জিতে যান। আর জয়ী রাজাকে সাহায্য করে তাকে আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে নিলাম। এতো রীতিমতো অনৈতিক কাজ। একটা শান্তিপূর্ণ রাজ্যকে আমরা চরম সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছি।'

'এজন্যই মহারাজ আমি আপনাকে প্রথমে এসবের কিছুই জানাইনি। কূটনীতিতে কোনো ধরনের নীতি খাটে না মহারাজ।'

'আচ্ছা, বুঝলাম ভেরাপ্পন আমাদের পক্ষে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তবে তারপরেও অনেক-প্রশ্ন বাকি থেকে যায়।'

'হ্যাঁ মহারাজ, তবে সেসবের সবই গৌণ। ভেরাপ্পনকে দলে ভিড়িয়ে আমরা আমাদের কঠিন কাজটা সেরে রেখেছিলাম। তারপর কেবল বাকি ছিল কিছু ছেঁড়া সুতোকে জোড়া দিয়ে সেলাইটা সম্পন্ন করা।

যুদ্ধ করতে হলে প্রথমেই লাগে আত্মবিশ্বাস। প্রথমেই চেরা আর চোলা রাজ্যের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হতো আমার। প্রথমেই চোলা রাজ্যকে সেনা সাহায্য দেবার কথা বলে তাদের সাহস বাড়িয়ে দিলাম আমি। এরপর হাত দিলাম চেরাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কাজে।

চেরাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য আমাকে ঠিক দুটো কাজ করতে হলো। আপনার তো মনে আছে মহারাজ, আমি আপনার কাছে এক হাজার সেনা চেয়ে নিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মহারাজ। সেই সেনাকে ছদ্মবেশে ভাড়াটে সৈনিকের আকারে রূপ দেই আমি। তারা তাদের চরিত্র উপস্থাপন করতে দক্ষিণ ভারতে কিছু দস্যুবৃত্তির ঘটনাও ঘটায়।

তখন চোলা বিদ্রোহী মন্ত্রী মণ্ডল বিতাড়িত, অসহায়। তাদের সাথের সব সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। সেনা ছাড়া কিছুই করা যাবে না। তখনই তাদের সাথে দেখা হয় আমার পাঠানো ছদ্মবেশে থাকা ভাড়াটে সেনাদের সাথে। তারা সুযোগ পেয়ে কম মূল্যে তাদের লুফে নেয়। একবারের জন্যও তারা ভাবতে পারেনি, আসলে তারা সেনাদল নয়, বরং সেনাদলই তাদের লুফে নিয়েছে।

তারপর আসে তাদের কাজের কথা। সৈন্য হাতে পেতেই তারা আক্রমণ করে দক্ষিণের সীমান্ত দুর্গগুলো। সেগুলো দখল করতেই শুরু হয়ে গেল আবার গৃহযুদ্ধ।

আমার সেনারাই তাদের বুদ্ধি দিয়ে এমনটা করিয়েছিল। ভেরাপ্পনের মাধ্যমে এই গৃহযুদ্ধের খবর পৌছে গেল চেরা রাজ উথিয়ানের কাছে। তিনি পেলেন আত্মবিশ্বাস। এরপর কেবল আরেকটা ছোটো কাজ। ভেরাপ্পনের মাধ্যমে আমিই কিছু অর্থ খরচ করে ঐ এগারো ভূমি অধিকারীকে পাঠাই চেরাদের পক্ষে। শক্তি আরও বাড়ল তাদের। পাণ্ড্য সেনা তো আগে থেকেই মহারাজ উথিয়ানের কাছেই ছিল। এই সম্মিলিত সেনাবলে বলীয়ান হয়ে মহারাজ উথিয়ানের বাণিজ্যিক মন কেমন যেন বদলে গেল। তিনি স্পষ্ট নিজের বিজয় দেখতে পেলেন। কোনোরকম যুদ্ধ না করেই চোলা রাজ্য জয় করার বাসনাও তার মনে ছিল। তাই এরপর ভেরাপ্পনকে আর কিছুই করতে হয়নি। মহারাজ নিজের উৎসাহেই পরের কাজটা করে ফেলেন। আক্রমণ করে বসেন চোলা।'

'বুঝলাম। নীতির প্রশ্ন অমূলক এখানে। কিন্তু কিছু ব্যাপার এখনও বাকি রয়ে যায়। বিশেষ করে একটা রহস্য। আপনি আমার কাছ থেকে এক হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলে। তার একটা ব্যাখ্যা পেলাম। কিন্তু আস্ত একটা সেনাদল আপনি চোলা রাজ্যের সাহায্যে কীভাবে পাঠালেন? আমি তো কোন সেনা দেইনি। সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও বাকি আছে।'

'হ্যাঁ মহারাজ, শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরই বাকি আছে। এখানেও আমাকে একটু বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

মনে আছে মহারাজ, আমি আপনাকে একটু আগে বলেছিলাম, আমি তৃতীয় পক্ষেও চাল দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ।'

'সেই তৃতীয় পক্ষ হলেন পাণ্ড্য মহারাজ ভালুদি। আর সেই চালের মাধ্যম কে ছিলেন তা তো আপনি বুঝতেই পারছেন।'

'ভেরাপ্পন! আবার কে!'

'প্রথমে পাণ্ড্য মহারাজ ভালুদির মনে এসব কোনো চিন্তা ছিল না। তিনি সেনা নিয়ে মহারাজ উথিয়ানকে সাহায্য করার জন্যই এসেছিলেন। তবে তাদের এই যুদ্ধে সাহায্য করা নিঃস্বার্থ ছিল না। তাদের একটা দাবি ছিল। বেশ জোরালো দাবি।'

'কী সেই দাবী?'

'মহারাজ ভালুদি বাণিজ্যিক স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। নিজেই বাণিজ্য করে সরাসরি স্বর্ণ রোজগার করতে চেয়েছিলেন। এখানেই ভেরাপ্পনকে দিয়ে শেষ মুহূর্তে আমি চাল দেই। তাদেরকে প্রস্তাব দেই, আপনাদের ইচ্ছে পূরণ হবে, কেবল যুদ্ধে আপনাদের পক্ষ আর প্রতিপক্ষ বদলে ফেলতে হবে।'

'মানে! পাণ্ড্য রাজাই সেনা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে?'

'আজ্ঞে মহারাজ। প্রথমেই পাণ্ড্য সেনাবাহিনীর শিবিরে একটা মহামারীর আবহ সৃষ্টি করা হয়। মহারাজ উথিয়ান তাদের দেরি দেখে দূত পাঠালেন। সেই দূত দেখে গেল তাদের মিত্রের সেনা শিবির ভয়াবহ মহামারীতে আক্রান্ত। সেই খবর পেয়েই মহারাজ উথিয়ান পাণ্ড্য সেনার সাহায্যের আশা ত্যাগ করেন। আসলে ওখানে কোনো মহামারী হয়নি। সবই কেবল ঐ দূতকে দেখানোর জন্য।

আমার কাছে এখন তৈরি সেনা আছে। অন্যদলের সেনা দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে কাজ সমাধা হলে কেন নিজের সেনাদল ব্যবহার করা? আমি একশো জন তাঁতিও ডেকে এনেছিলাম সময় মতো।'

'হ্যাঁ, আমাদের নতুন সেনার পোশাক বানানোর জন্য।'

'না মহারাজ, আপনাকে একটা ছোটো মিথ্যে বলার জন্য দুঃখিত। সেই তাঁতিদের দিয়ে আমি চোলা সেনাদের যথেষ্ট সাজপোশাক তৈরি করাই। তারপর নৌপথে সেই পোশাক পাঠিয়ে দেই পাণ্ড্যদের কাছে। সেই পোশাক পরেই তারা যোগ দিয়েছিল যুদ্ধে। সেই সেনার গায়ে চোলা রাজের পোশাক দেখে কারিকালা আর মহারাজ উথিয়ান দুজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। ওখানে কেউ ভাবতেই পারেনি পাণ্ড্য সেনা আসলে চোলা সেনার পোশাক পরে যুদ্ধ করছে। আমি জানতাম, দুই মিলিত সেনার সাথেও

চেরা বাহিনী ভালোই যুদ্ধ করতে পারে। তাই আগে থেকে চোলাদের সহস্র ধনুর চেয়ে সরু জায়গা বেছে নিতে বলেছিলাম। যাতে কোনমতেই যুদ্ধক্ষেত্রে দুই দিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে চেরা সেনা চতুর্মুখ ব্যুহ মানে চক্রব্যূহ অথবা সর্বোতভদ্র ব্যুহ তৈরি না করতে পারে। আর তাতেই চেরার পরাজয় একেবারে নিশ্চিত হয়।'

'সেখানেও কারো ভাবতে পারার কথা না গিরিধারী। আপনি তো আমার মাথাই পুরো ওলটপালট করে দিচ্ছেন। আপনার আমাকে কিছু না জানিয়ে কাজ করাটাই ঠিক আছে। আপনার কোনো পরিকল্পনাই আমাকে সিদ্ধির আগে জানাবেন না। একে তো এত প্যাঁচ আমার মাথা নিতে পারবে না। আর আমার নীতিতেও এসবের কোনো অনুমোদন আপনি পাবেন না।'

'আমি তো এজন্য আগেই বলেছিলাম মহারাজ, এমন অনেক তথ্য আছে যা সময়ের আগে প্রকাশ করা ক্ষতিকর।'

'হ্যাঁ গিরিধারী। আপনি মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক কোথায় যাবেন জানি না, তবে স্বর্গে গেলে একজনের খবর আছে।'

'কার মহারাজ? এবার রহস্যের সামনে পড়লেন গিরিধারী।

'দেবর্ষি নারদের। বিষ্ণুকে মাঝে মাঝে গান শোনানোর ফাঁকে ফাঁকে স্বর্গের কূটনীতিতে তার যথেষ্ট মনোযোগ আছে তার। দেবতারাও সেই গুণের কদর করেন বলেই তার একটা আলাদা সম্মান আছে। আপনি স্বর্গে গেলে তার সেই সম্মান লোপ পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

৬১

আজ এই তোরণে এমন ঘটনার সাক্ষী হবার কথা ছিল না প্রজাদের। এই তোরণ আজ সেজে ওঠার কথা ছিল তাজা পুষ্প আর মূল্যবান সাজে। ঝালর থাকার কথা ছিল, চারদিক সুগন্ধে মৌ মৌ করার কথা ছিল।

শুধু এই তোরণ নয়, এই নগরের সমস্ত বাড়িঘর আজ নতুন সাজে সেজে ওঠার কথা ছিল। রাজপথ পুষ্পে ঢেকে জয়ীকে বরণ করে নিতো। উৎসব দিনে দিনে শেষ হতো না। রাতেও নিশ্চিত চলতো। সেই রাতের উৎসবের জন্য ওপার আলোর মশাল রাস্তার কোণায় কোণায় শোভা পাবার কথা ছিল। প্রজাদের হর্ষোল্লাস আর মুহুর্মুহু চিৎকারে কেঁপে ওঠার কথা ছিল নগরের বাতাসের। তাদের কারো কারো হয়তো গলা ভেঙ্গে যেতো, তবু সেই ভাঙ্গা ফ্যাসফেসে গলায়ও তারা চিৎকার করে যেতো।

তবে আজ তার কিছুই হয়নি। মহারানি আর অন্যান্য রাজমহিষীরা প্রতিদিনের চেয়ে আলাদা পোশাক আর সাজ পরে আছেন। তাদের শরীরে স্বর্ণালঙ্কারের কোনো আধিক্য নেই, আধিক্য তো দূরের কথা কোথাও স্বর্ণের দ্যুতি দেখাই যাচ্ছে না। তাদের পরনে সোনালি বস্ত্রের বদলে কালো রঙের পোশাক দেখা যাচ্ছে। হাতে কোনো মঙ্গল প্রদীপ নেই, তাদের চোখের প্রদীপও নিভে গেছে। সেখানে কেবল অতল শূন্যতা।

মুঝিরিসের রাজ তোরণে পৌছল মহারাজ উথিয়ানের বহর। খবরটা তার আগেই নগরে পৌছে গেছে। নিঃশব্দে প্রজারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল মহারাজের। মহারাজের বহরে অনেকগুলো রথ। তবে তারা আশ্চর্য হয়ে দেখছে, সেই বহরের বেশির ভাগ রথেই সগর্বে উড়ছে চোলা মানে শত্রু রাজ্যের পতাকা। অল্প কিছু রথে চেরা পতাকা দেখা যাচ্ছে। তবে সেগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে খারাপ সময়ের, পরাজয়ের। মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে হতোদ্যম হয়ে।

মহারাজ চেরাল উথিয়ান তার রথে আছেন। তবে একা রথে বসে থাকার ক্ষমতা হারিয়েছেন তিনি। দুই পাশে তার দুই পারিষদ তাকে ধরে রেখেছেন। পিঠের ব্যথা এখনও আছে, বলতে গেলে ক্রমশ বাড়ছে। রক্ত হারানোর ক্রিয়ায় আর পথের ধকলে প্রায় অচেতন হয়ে আছেন মহারাজ উথিয়ান। ভেরাপ্পন বসে আছেন মহারাজের ঠিক ডান পাশে। ভাবটা এমন যেন মহারাজের শরীরের অবস্থায় তার কঠিন মনোযোগ। রথে চিকিৎসকও উপস্থিত আছেন। কিছুক্ষণ পর পর পরীক্ষা করছেন মহারাজের দেহ। তবে প্রতি বারেই চিকিৎসকের মুখ চোখ হতাশ হয়ে যাচ্ছে। অতি সত্বর ওষুধির প্রয়োগ করতে হবে। সাথে লাগবে পূর্ণ লম্বা বিশ্রাম।

মুঝিরিসের প্রজারা সত্যি বলতে কী শবযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। যে রাজা নিজের রাজ্য থেকে সেনা নিয়ে অন্য রাজ্য আক্রমণ করতে যায় সে যদি পরাজিত হয় তবে সেই রাজাকে হত্যা করা অনৈতিক কিছু নয়। তবে তাদের শবযাত্রার আর রাজ সৎকারের প্রস্তুতি বৃথা হয়েছে। মহারাজ আর তার পারিষদরা জীবিত ফিরে এসেছেন। তবে তাদের সাথে যে সৈন্যরা আছে তাদের পোশাক প্রজাদের অচেনা। তাদের বহন করা নিশানও। মহারাজ আর তার পারিষদরা ফিরে এসেছেন সত্য। তবে তারা দিয়ে

গিয়েছিলেন রাজ্যের গৌরব আর ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি, আর নিয়ে এসেছেন পরাধীনতা। ভিন রাজ্যের সেনাদের সগর্ব উপস্থিতিই বলে দিচ্ছে চেরা রাজ্য আজ পদানত। ভেন্নির প্রান্তরে সেদিন হেরে গেলেও আজই যেন চেরা রাজ্যের পরাজয়ের আসল ছবিটা দেখা যাচ্ছে।

মহারাজ উথিয়ানের রথ এসে থামল রাজমহলের সামনে। রাজ মহিষীরা তৈরি ছিলেন। তারা ধরাধরি করে নামিয়ে নিলেন মহারাজকে। তারপর ধীরে ধীরে অন্দরে নিয়ে গেলেন তাকে।

রাজসূর্য অস্তমিত হয়েছে ভেন্নির প্রান্তরে, কিন্তু মহারাজ তো এখনও বেঁচে আছেন। প্রজাদের মনে খানিক স্বস্তি ফিরে এসেছে। রাজা ছাড়া রাজ্য কল্পনা করা যায় না। মানুষ আসলে একটা যন্ত্রই। ঠিকমতো চালানোর কেউ না থাকলে সেই যন্ত্র এক হলে উল্টোপাল্টা চলে ভেঙ্গে যায় অথবা পড়ে থেকে মরচে পড়ে।

তবে একটু পরেই প্রজাদের আলোচনা মহারাজ উথিয়ানের বেঁচে থাকার দিক থেকে ফিরে গেল চোলা রাজের মহানুভবতার কাছে। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। শত্রুকে কেউ এভাবে ছেড়ে দেয়!

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেও দুই পক্ষ তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাজ চিকিৎসক অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন মহারাজ উথিয়ানের চিকিৎসায়। তার সহকারীরা ওষুধি প্রস্তুতিতে লেগে পড়েছে।

চোলা সেনারাও বসে নেই। আদেশ মতো কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রথমেই যেসব সেনাকে নগর রক্ষার জন্য রেখে যাওয়া হয়েছিল তাদের আর রাজ ভবনের প্রহরীদের নিরস্ত্র করে ফেললো তারা। দুটো জায়গার নিয়ন্ত্রণ সবার আগে নিতে হয়। সেনার সাথে এখানে দুজন সেনাপতিও পাঠিয়েছেন মহারাজ কারিকালা। তারা একে একে কোষাগার আর অস্ত্রাগারের অধিকার নিজের হাতে নিলো। রাজ প্রাসাদ ঘিরে ফেলা হয়েছে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার চাদরে। রাজ প্রাসাদে কাজ করছে অর্ধেক চোলা সেনা। বাকি অর্ধেক এর মধ্যেই চলে গেছে বন্দরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবার জন্য। রাজপ্রাসাদ আর বন্দরের নিয়ন্ত্রণ ঠিক মতো হাতে নেবার মানে হলো পুরো মুঝিরিস মানে চেরার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নেওয়া।

রাজপ্রাসাদে পারিষদ আর প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ দাসদাসীরা জড়ো হয়েছে। এত মানুষের ভিড়ের যে একটা কলরব হবার কথা তা পুরোপুরি অনুপস্থিত। পিনপতন নীরবতা সারা প্রাসাদ জুড়ে।

পথের ঝাঁকুনিতে মহারাজ উথিয়ানের ক্ষতের মুখ খুলে গেছে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে চেপে ধরেও চিকিৎসক রক্ত পড়া ঠিকমতো বন্ধ করতে পারেননি। অনেকটা রক্ত হারিয়েছেন মহারাজ। রাজ চিকিৎসক প্রথমেই সেই রক্ত বন্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। ওষুধ পুরু করে মাখানো হলো ক্ষতে। আস্তে আস্তে রক্ত পড়া বন্ধ হলো। তবে মহারাজ প্রবল ব্যথায় অচেতন হয়ে রইলেন। চিকিৎসক তারপর নজর দিলেন সেই ব্যথার দিকে। মহারাজকে একটা কড়া ব্যথানাশক খাইয়ে দিলেন তিনি। অল্পক্ষণ পরেই ওষুধ কাজ করলো। ব্যথা অনেকটা কমে এলো। সেই সাথে মহারাজের চেতনাও ফিরে এলো।

মহারাজ উথিয়ান রাজ পালঙ্কে একটু উঠে বসার চেষ্টা করলেন। চিকিৎসকের সাহায্যে মাথাটা একটু তুলতে সমর্থ হলেন তিনি। ক্ষীণ কাঁপা গলায় ডাকলেন. 'ভেরাপ্পন।'

রাজমহিষীরা এতক্ষণ সবাই মহারাজকে ঘিরে ছিলেন। সামন্তরা ছিলেন একটু দূরে। ভেরাপ্পনকে জায়গা করে দিতে মহিষীরা একটু সরে গেলেন।

ভেরাপ্পন এগিয়ে এসে মহারাজের একেবারে কাছে দাঁড়ালেন, মাথা একটু নামিয়ে এনে আলতো করে বললেন, 'মহারাজ, আমি এখানেই আছি। আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে?'

'এখন একটু ভালো লাগছে।'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মহারাজ। আমি আর্যাবর্তের সব বড়ো বড়ো চিকিৎসকদের চেরা রাজ্যে নিয়ে আসবো। এরই মধ্যে আমি চিকিৎসক আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়েছি নানা দিকে। আপনি ভাববেন না মহারাজ। অতি সত্বর আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'

একটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো মহারাজ উথিয়ানের চোখের কোণ ঘেঁষে। তার গলায় চরম হতাশা, 'আপনি আর এসব কিছু করতে যাবেন না ভেরাপ্পন। এসবের আর দরকার নেই।'

'না মহারাজ। দরকার আছে। আপনাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে।'

'আমি এখন আর রাজা নই, তাই আপনাকে বলতে পারছি না রাজাজ্ঞার ঠিক মতো পালন করতে। তবে ব্যক্তি হিসেবে আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া একমাত্র আমারই অধিকার। যেসব চিকিৎসক আপনি নিয়ে আসবেন তারা হয়তো আমার দেহের ক্ষত সেরে দিতে পারবে, কিন্তু আমার মনের যে ক্ষত, আমার অপমানের যে অসহ্য জ্বলুনি তা কোন চিকিৎসক মুছবে? আপনি আমার জন্য চিন্তা করা বাদ দিন। প্রজাদের ওপর নজর দিন। ওরা আমার কোষাগার আর অস্ত্রাগারের দখল নিয়েছে। নিক, ওরা আমার সম্পদ আর অস্ত্র লুট করুক, কিন্তু খেয়াল রাখবেন, আমার প্রজাদের ওপর কোনো অত্যাচার যেন না করা হয়।'

'আমি সেদিকে নজর রাখবো মহারাজ। চোলা মহারাজ কারিকালা কথা দিয়েছেন, তিনি প্রজাদের ওপর কোনো অত্যাচার করবে না। তার সেনাদের তেমন নির্দেশনাই দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের পরে আমাদের কোনো সৈন্যকেই নির্বিচারে হত্যা করা হবে না। আমার মনে হয় না স্বয়ং মহারাজ কারিকালার আদেশের বাইরে গিয়ে তার সেনারা অন্যরকম কিছু করবে। এখন আমাদের প্রজারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'ভুল বললেন ভেরাপ্পন। বিদেশি শাসনে প্রজারা কখনোই নিরাপদে থাকে না। থাক সেসব, আপনি এখনই নগরে যান। মন্ত্রীদেরও নিয়ে যান। আপনাদের আর এই প্রাসাদের দিকে আসতে হবে না। নগরে আপনারা অবস্থান করলে চোলা সেনারা কোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা করার আগে দুই বার ভাববে। আমার প্রজাদের একটু হলেও উপকার হবে।'

'তাহলে আমরা কি চলে যাবো মহারাজ?'

'হ্যাঁ। আমার কর্মের পালা শেষ হয়েছে, যদিও আমি দায়িত্ব ভালো ভাবে পালন করতে পারিনি। কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।'

ভেরাপ্পন মন্ত্রীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন। নিজের দায়িত্ব শেষ হবার কথা বলে মহারাজ কী বুঝিয়েছেন ঠিক বোঝা গেল না। তবে তার জন্য তাড়াতাড়ি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেই ভালো হয়। নগরে আর বন্দরে তার অনেক কাজ আছে।

মহারাজ উথিয়ান অনেক কষ্ট করে কথাগুলো বলেছেন ভেরাপ্পনকে। তারপর শক্তি হারিয়ে আবার পুরোপুরি শুয়ে পড়লেন পালঙ্কে। পিঠের আঘাতের কারণে একটু কাত হয়ে শুতে হচ্ছে। এই ভঙ্গিতে খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না।

চিকিৎসক নতমুখে রাজমহিষীর দিকে তাকালেন, 'মহারাজের ব্যথা এখন অনেকটাই কমে গেছে। এখানেই আমার ওষুধের কাজ শেষ। এখন পথ্য দিতে হবে। আপনারা মহারাজের জন্য পুষ্টিকর সহজ পাচ্য খাবারের ব্যবস্থা করুন। মহারাজের শরীর এখন বেশ দুর্বল। তার উত্তম খাবারের বিশেষ প্রয়োজন।'

মহিষীদের মধ্যে কয়েকজন উনুন ঘরের দিকে চলে গেলেন। রাজ মহলের উনুনে সব রকমের খাবার জিনিস তৈরি থাকে। দাসীরাও সাথে গেলেন সাহায্য করার জন্য। একটু কাজের অবসর পেয়ে যেন একটু প্রাণ ফিরে এলো মহলে। উনুন ঘরে নানা আওয়াজ হচ্ছে।

রান্নায় খুব বেশি সময় লাগলো না। সদ্য প্রস্তুত করা পঞ্চব্যাঞ্জন সাজিয়ে নিয়ে এলেন মহিষীরা। রানি স্বয়ং পাত্র সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাখলেন মহারাজের সামনে। এখন আর খাবারের জায়গায় পরিবেশন সম্ভব না। বিছানাতেই খেতে হবে। মহারাজকে ধরে তোলা হয়েছে। তিনি পালঙ্কের নকশা করা ঘেরে পাশ হেলিয়ে বসলেন।

খাবারের সময় মহারাজের সামনে মহিষীরা ছাড়া অন্য কেউ থাকে না। দাসীরাও থাকে একটু দূরে। মহারাজের শয়ন কক্ষে এখন অনেক মানুষের ভিড়। সবাই একে একে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তখুনি মহারাজ উথিয়ানের গলার স্বর শোনা গেল, 'আপনারা কেউ এই কক্ষ ত্যাগ করবেন না। আপনাদের সবার এখন এই কক্ষে থাকা একান্ত প্রয়োজন।'

সবাই মোটামুটি অবাক হয়ে ফিরে এলো। এক বৃদ্ধ পারিষদ মন্ত্রী ভেরাপ্পনের সাথে নগরে যাননি। তিনি মহারাজের উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করে বললেন, 'মহারাজ, আমরা বাইরেই অপেক্ষা করছি। আপনি যা বলবেন তা আহার সেরে বলবেন। আমরা প্রাসাদেই থাকি। এখন আপনার জন্য খাওয়া এবং বিশ্রাম সবার আগে প্রয়োজন।'

মহারাজ একমত হলেন না। তার মধ্যে বিকারের কোনো লক্ষণ নেই। ধীর স্থির মুখ তার। মানুষ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে তার চেহারা এমন হয়ে যায়।

'না, আমার এই কথা এখনই বলা উচিত। কথাগুলো বলে হালকা হয়ে তবেই খাবারে মন দিতে পারবো।'

সবাই আবার কক্ষে এসে চুপ করে দাঁড়ালো। মহারাজ একটা জোর দম নিয়ে নিলেন, 'আমি এখন আর এই রাজ্যের রাজা নই। রাজা হিসেবে আগে আপনাদের সবার ওপর আমি যে কতৃত্ব করতাম তা করার কোনো অধিকার এখন আর আমার নেই। আপনারা এখন থেকে অন্য শাসকের অধীনে থাকবেন। ঐ রাজার কাছে আমি শুধু যুদ্ধই হারিনি, সেই সাথে আমি এই রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, অধিকার সবই হারিয়েছি। তাই এখন আমি যা করছি তা সবই অনধিকার চর্চা। এই নরম গদির পালঙ্ক, রাজ উনুনের রাজ খাবার, রাজ পোশাক, রাজ চিকিৎসকের চিকিৎসা এসবই এখন আমার

অধিকারের সম্পূর্ণ বাইরে। কোনো কিছুতেই আমার কোনো অধিকার নেই। আর আমার আত্মসম্মান কারো দয়া নিয়ে বাঁচতে আমাকে বাঁধা দেয়। তাই আজ এই মুহূর্ত থেকে আমি এই সব অধিকার ত্যাগ করলাম। আপনাদের জানানোর জন্যই বলছি এই রাজপ্রাসাদ থেকে আমি এই মুহূর্তেই বেরিয়ে যাবো।'

সবার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন দেখা দিলো। বৃদ্ধ পারিষদ আর্ত কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে নিজের প্রাসাদে থাকার অধিকার স্বয়ং চোলা রাজা দিয়েছেন। তাই এই প্রাসাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর এখনও আপনার অধিকার আছে। আপনি শরীরের এই অবস্থায় এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

'আমি চোলা রাজের দাক্ষিণ্যে বাঁচতে পারবো না। আপনারা আমাকে আর বাঁধা দেবেন না। আমি মর্যাদা যতটুকু বাকি আছে ততটুকু নিয়ে চিতায় উঠতে চাই।'

কারো মুখেই কোনো কথা জোগালো না। সবাই জানে মহারাজ এখন কোনো ভাবেই থামবেন না।

মহারাজ উথিয়ান উঠে দাঁড়াতে সচেষ্ট হলেন। অনেক কসরত আর রানির সহায়তায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন নিজের পায়ে। তারপর মহিষীর কাঁধে ভর দিয়ে মৃদু পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন প্রস্থান দরজার দিকে। একটু আগে যে পথ ধরে তিনি রাজমহলে প্রবেশ করেছিলেন এখন ঠিক সেই পথ ধরেই আবার তিনি বেরিয়ে এলেন প্রাসাদের বাইরে। একবার পেছন ফিরে তিনি তাকালেন প্রাসাদের দিকে। যে অধিকার তার বংশ প্রজন্মান্তরে ভোগ করছিল, যাকে মনে হয়েছিল বেদের মতো চিরসত্য, সেই অধিকার এখন আর নেই।

রক্তপাত বন্ধ হওয়া আর ব্যথানাশক ওষুধে মহারাজ উথিয়ান এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন। প্রাসাদের প্রধান তোরণের বাইরে এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। এখন নিজের ক্ষমতাতেই হাঁটতে পারছেন। নিজ হাতে নিজের দেহের সকল আবরণ আর আভরণ খুলে নিতে লাগলেন তিনি। রাজ পোশাক খুলে উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করলেন। ত্যাগ করা সব সম্পদ তিনি রাখলেন তোরণের পাশে ভূমিতে।

একটা সাধারণ কাপড় কেউ একজন বাড়িয়ে দিলেন মহারাজের দিকে। সেই কাপড় গায়ে জড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি নগরের পথে। রাজ মহিষীরাও অনুসরণ করলেন তাকে। সাথে মহারাজের সন্তানও। যেখানে রাজার অধিকারই খর্ব করা হয়েছে, সেখানে রানি আর রাজপুত্রের কথা তো বলাই বাহুল্য।

মহারাজ কোনদিকে যাচ্ছেন তা কেউই জানে না। তবু সবাই তাকে অনুসরণ করছে। তবে অজানা গন্তব্যের দিকে মহারাজ যাত্রা করেননি। গন্তব্য স্থির করেছে তিনি। মুঝিরিস বন্দর নগরীর একেবারে প্রান্তে, বলতে গেলে নগরের ঠিক বাইরের একটা ফাঁকা জায়গায় রাজ জমিতে বেশ কিছু কুটির তৈরি আছে। পথিক, ভবঘুরে, সন্ন্যাসী, ভিখারি, ব্যবসায়ী যাদের কোনো ঘর নেই, সরাইখানায় মুদ্রা খরচ করে থাকার সামর্থ্য নেই, তারা নিশ্চিন্তে এখানে রাত কাটায়। সেই কুটিরগুলোর একটায় রাজমহিষীদের সাথে উঠলেন মহারাজ উথিয়ান।

এত ছোটো ঘরে সবার জায়গা হবে না। সবাই দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তাদের উদ্দেশ্যে মহারাজ বললেন, 'আগেই বলেছি, আজ থেকে আপনারা কেউ আর আমার অধীন নন। আমি আর আপনাদের পারিশ্রমিক দিতে পারবো না, তাই আপনাদের

থেকে সেবা নেওয়া চরম অন্যায় হবে। তবে এখানে থাকতে আমার কোন অসুবিধা নেই। এই ঘরগুলো ভিখারির জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আমার মতো ভিখারি এখন এই রাজ্যে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

উপস্থিত সবার মধ্যে কান্নার রোল উঠলো। মহারাজের এমন অবস্থা হবে কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

'আরেকটা কথা। এখানে দরিদ্রদের জন্য শুধু আবাসের ব্যবস্থাই নেই, খাবারের ব্যবস্থাও আছে। আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য নিত্য কিঞ্চিত খাবারের ব্যবস্থা আপনারা করবেন। আমি এখনও এই রাজ্যের প্রজা। নগরের সদস্য হিসেবে আপনাদের এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনারা পালন করবেন আশা রাখি। চেরা রাজ্যের সব নগর অনেকদিন ধরে এই প্রথার পালন করে আসছে। আশা করি আপনারাও এই রীতির সর্বোত্তম পালন করবেন।'

মহারাজের এক বহুদিনের পুরানো সেবক অশ্রুগালে এগিয়ে এলো, 'মহারাজ, আপনার ইচ্ছাই এখনও আমাদের কাছে আদেশ। সব অধিকার তো আপনি ছেড়েই দিয়েছেন। আপনার সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু বলার সাহস আমাদের নেই। মন্ত্রীদের মন্ত্রণা দেবার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন আপনি, সেবকদের সেবা নেবার ইচ্ছেও ত্যাগ করেছেন। আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। তবে মহারাজ, একটাই অনুরোধ, রাজ চিকিৎসককে আপনার সেবা করার অনুমতি দিন। আপনার পিঠের ক্ষতের অবস্থা বেশ খারাপ। একবার এই ক্ষতে পচন ধরলে তা আর সারবে না। তখন আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

মহারাজ উথিয়ানের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, 'যার দেহ ত্যাগ করাই ভবিতব্য, সেই দেহে পচন ধরাই কি, আর না ধরাই কি। দেহ পচে গেলে এখন আর কিছুই আসে যায় না।'

'মহারাজ! কী বললেন!'

'আমি আমার শেষ সিদ্ধান্ত এখনও জানাইনি। সবাই শুনুন, এই মহাশোক সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ গেলেই আমার ভালো হতো। মহারাজ কারিকালা আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে আসলে আমার ক্ষতিই করেছেন। আজ থেকে আমি উপবাস ব্রত গ্রহণ করলাম। সম্পূর্ণ উপবাস।'

এই কথায় উপস্থিত সবাই শিউরে না উঠে পারলো না। মহিষীরা এতক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করলেও চুপ ছিলেন। এবার তাদের মাঝেও সশব্দ কান্নার রোল উঠলো।

উপবাস ব্রতের ফলাফল এই রাজ্যের সকলেই জানেন। এই ব্রতে ব্রতকারী কোনোরকম খাবার অথবা পানীয় গ্রহণ করেন না। শুধু বসে থেকে ঈশ্বরের নাম জপেন। খাবারের ওভাবে আর এই দেহ ছেড়ে যাবার বাসনায় প্রাণ একসময় শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রজাদের মধ্যে রোল উঠলো। একজন শেষ এটা চেষ্টা করার জন্য এগিয়ে এলো, 'কিন্তু মহারাজ এ তো আত্মহত্যা। আর যে আত্মহত্যা করে তার মুক্তি হয় না। তাকে নরকে যেতে হয়।'

'নরকে তো আমার এমনিতেই যেতে হবে। ক্ষত্রিয় হয়েও আমার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগতি প্রাপ্ত হয়নি। পরাজিত ক্ষত্রিয়দের জন্য নরকই নির্ধারিত স্থান। আর এই জন্মে

আমি যে অনুতাপ ভোগ করছি, নরকের তাপ তার কাছে কিছুই না। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই স্থান ত্যাগ করুন। আমাকে পরিবার সহ একা থাকতে দিন। পরিস্থিতি ভালো না। যে যার পরিবারের কাছে ফিরে যান। তাদের রক্ষা করুন।'

সবাই ধীরে ধীরে ফিরে যেতে শুরু করলো। জায়গাটা ফাঁকা হতে লাগলো। মহারাজ উথিয়ান তাদের মাঝে যার যার পরিবারের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

সবাই ফিরে গেলেও কিছু পারিষদ ফিরে গেলেন না। মহারাজের ঋণ শোধ করার সামান্য সুযোগও তারা বিফলে যেতে দেবেন না।

'মহারাজ, আপনি অনুমতি দিন আর না দিন, আমরাও আপনার সাথে উপবাস ব্রত গ্রহণ করলাম। এই পরাজয়ের আমরাও সমান ফলভোগী।'

মহারাজ উথিয়ান বাঁধা দিলেন না। বাক্য ব্যয় করার শক্তি আর ইচ্ছা কোনোটাই তার মধ্যে আর বাকি নেই।

এরপর মহারাজ উথিয়ান আট দিন বেঁচে ছিলেন। ব্যর্থতা মেনে নিয়ে মারা গেলেন তিনি। তার শেষ যাত্রায় তেমন একটা আড়ম্বর হলো না। ঐ আটদিনে মুঝিরিসের প্রজারা নিজেদেরকে অন্য রাজার প্রজা হিসেবে মেনে নিয়েছে। নিজেদের স্বাভাবিক নাগরিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। সবকিছু যেন হয়ে গেছে আগের মতো। তাই মহারাজ উথিয়ান যখন মারা গেলেন তিনি একজন ভিখারি হিসেবেই মারা গেলেন। আর ভিখারির কপালে কখনো রাজ সম্মান জোটে না।

বন্দরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ভেরাপ্পন প্রথম দিন থেকেই মহারাজের উপবাস ব্রতের কথা জানতে পেরেছিলেন। বলাই বাহুল্য, এই সংবাদে তিনি মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। মহারাজ কারিকালা কেন যে মহারাজ উথিয়ানকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছিলেন তা তার মাথায় ঢুকছিল না। মহারাজ বেঁচে থাকা মানে গলায় মাছের কাঁটার মতো একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি বেঁচে থাকা। তার মৃত্যুতে সেই কাঁটা দূর হলো।

সাতবাহন মন্ত্রী গিরিধারী তার কথা রেখেছেন। বিদেশি শক্তির আড়ালে বসে বসে ভেরাপ্পন পুরো চেরা রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। তিনিই এখন রাজ্য আর বন্দরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। প্রজা বিদ্রোহ এড়ানো আর ক্ষমতা ভোগ দুটো উদ্দেশ্যই পূরণ হয়েছে একেবারে বিনা ঝামেলায়।

ওদিকে দক্ষিণ ভারতের ঝামেলা আপাতত মিটলেও মধ্য ভারতের সমস্যা রয়ে গেছে। দিনে দিনে বাড়ছে তা। গিরিধারী দক্ষিণ ভারতের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়েছেন। নিজের সাফল্য উদযাপন করার বিলাসিতা তিনি করতে পারছেন না। আসল কর্মযোগী মানুষের জীবনে সেই অবসর কখনো আসে না।

'মহারাজ, প্রথম ধাপ আমরা যথেষ্ট সময় নিয়ে পার করেছি। তবে শেষ ধাপে আমাদের হাতে এত সময় নেই। এখন আমাদের তড়িৎ পদক্ষেপ নিতে হবে। পরবর্তী বাণিজ্যিক মৌসুম এগিয়ে আসছে, জাহাজগুলো কিছুদিনের মধ্যে আসতে শুরু করবে। বন্দরে যেসব জাহাজ রয়ে গেছিল সেগুলো আবার ফিরে যেতে শুরু করবে। বাণিজ্যের মধ্যে বিদেশিদের ভয় পাইয়ে দিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ করা যাবে না।' মহারাজ সাতকর্ণীর সামনে মন্তব্য করলেন গিরিধারী।

সাতকর্ণী সে মন্তব্যে যথেষ্ট উৎসাহ পেলেন, 'তার মানে আমাদের এখন দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে হবে। এখন আর অন্য কাউকে দিয়ে নয়, নিজের যুদ্ধ নিজেকেই করতে হবে। আমার জন্য বেশ ভালো খবর।'

তবে এটুকু বলেই মহারাজ সাতকর্ণী একটু থামলেন। গলাটা একটু গম্ভীর হয়ে এসেছে তার, 'তবে সেই আলোচনায় যাবার আগে বিগত সময়ের একটা বাকি থাকা আলোচনা আমি আগে করে নিতে চাই। ব্যাপারটা আমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই খোঁচাচ্ছে।'

'বলুন মহারাজ।'

ততদিনের মহারাজ উথিয়ানের দুঃখজনক মৃত্যুর কথা পৌঁছে গেছে প্রতিষ্ঠানাতে। বলাই বাহুল্য, একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক রাজার মৃত্যুতে মহারাজ সাতকর্ণী মন ভার হয়ে গেছে, 'গিরিধারী, আপনার পরিকল্পনার কার্যকারিতার ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে আমার কোনো প্রশ্নই নেই। বুদ্ধির খেলায় আপনি জিতে গেছেন। কিন্তু আরেকটা জায়গায় আমরা কি হেরে যাইনি?'

'কোন জায়গায় মহারাজ?'

'নীতির প্রশ্নে। এখানে কি আমরা খুব নিচে নেমে যাইনি? একজন নিজের রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত, প্রজাদরদী রাজাকে ষড়যন্ত্র করে আমরা যুদ্ধে নামিয়েছি। আর শেষ পর্যন্ত সেই রাজা যুদ্ধে হেরে আত্মহত্যা করেছেন। ইতিহাস কি আমাদের কখনো ক্ষমা করবে? আমার যে এত এত বীরত্বের গাঁথা, তা কি এই একটা ঘটনার সামনে ম্লান হয়ে যাবে না? ইতিহাসে আমরা বেঁচে থাকবো শকুনির মতো ছলকারী হিসেবে।'

গিরিধারী হাসলেন, 'মহারাজ, সেই ভয় আছে, তবে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের মহাভারত লিখবে কে? এখানে তো কোনো ব্যাস নেই। তাই আপনি ইতিহাসের হুমকি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। ইতিহাস ভবিষ্যতকে ঠিক ততটুকুই জানাবে, যতটুকু

আমরা তাকে সংরক্ষণ করার অনুমতি দেবো। তার বাইরে ইতিহাস কাউকে কিছু বলবে না।'

'তা ঠিক আছে। মেনে নিলাম। কিন্তু নীতির প্রশ্ন তো কেবল ইতিহাস আর অন্য কেউ জানার ওপর নির্ভর করে না। নিজের কাছেও তো জবাব দেবার একটা ব্যাপার আছে। স্বার্থের কারণে একটা স্বাধীন সচ্ছল রাজ্যকে আমরা অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছি। নিরপরাধ এক রাজাকে বলি দিতে বাধ্য করেছি। মহারাজ উথিয়ানের তো কোনো দোষ ছিল না। বিবেক যখন নির্জনে আমাকে প্রশ্ন করছে তখন তো আমি আটকে যাচ্ছি।'

গিরিধারী বুঝতে পারলেন মহারাজ আত্মগ্লানিতে ভুগছেন। না, মহারাজের মতি ঠিক করতে হবে। গলাটা একটু চড়ালেন তিনি, 'ছিল মহারাজ ছিল। কর্মের মধ্যে দোষ না থাকলে তার ফল কাউকেই ভুগতে হয় না। তার মধ্যেও দোষ ছিল। আর সেই দোষ থেকে তিনি করেছেন অপরাধ। আর সেই অপরাধের শাস্তিই তিনি পেয়েছেন।'

'আমাকে ভুলভাল বোঝানোর চেষ্টা করবেন না। কী অপরাধ ছিল ওনার? অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি। এখন তার দোষ বেরিয়ে গেল, আর আমরা সবাই সাধু।'

গিরিধারী বুঝতে পারলেন মহারাজ সাতকর্ণী একটু রেগে উঠেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। রাজা মহারাজদের রক্ত নিজের মতের বিরুদ্ধতা খুব বেশি সহ্য করতে পারে না। বুঝতে পারলেন এবার সতর্ক হতে হবে, 'মহারাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি মহারাজ উথিয়ানের দোষগুলো যুক্তি দিয়ে দেখাতে পারি। যুক্তি ছাড়া আমি কিন্তু ওনাকে অভিযুক্ত করছি না।'

'বেশ, শোনা যাক।'

'মহারাজ, ওনার প্রথম দোষ ছিল মন্ত্রী নির্বাচন ও পোষণ। তিনি এমন একজন লোককে মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, যে কিনা আমরা একটু লোভ আর ভয় দেখাতেই এক কথায় বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হয়ে গেল। এখন মহারাজ ধরুন, আমি যদি এখন আপনার প্রধানমন্ত্রী হয়েও অন্য কোনো রাজ্যের প্রস্তাবে রাজি হয়ে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে সেখানে আমার দোষ যে থাকবে না তা নয়, তবে আপনারও তাতে দোষ থাকবে। আমার হবে নৈতিক দোষ, আর আপনার জন্য অযোগ্যতা হবে মানুষ চিনতে পারার ক্ষমতা না থাকা। যা একজন রাজার জন্য বড়োসড়ো দোষের চেয়ে কম নয়। মহারাজ উথিয়ান লোক চিনতে ভুল করেছিলেন। আর ভুল করলে তার খেসারত তো দিতেই হবে। এছাড়াও রাজ্য চালনায় তিনি অনেক ভুল করেছিলেন।'

'তাই না-কি? এতেও শেষ নয়? আরও আছে?' মহারাজ সাতকর্ণীর মুখের রাগ এবার কমে এসেছে। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

'আজ্ঞে মহারাজ। অবশ্যই ছিল। একজন রাজা তিনি যদি ঋষিও হন, তবু তাকে মনে রাখতে হবে, তিনি কখনোই শত্রুহীন নন। রাজার শত্রু থাকবেই। আর সেই শত্রুকে সামলানোর জন্য তাকে সবসময় সেনা আর গুপ্তচর ব্যবস্থা শক্তিশালী করে রাখতে হয়। মহারাজ উথিয়ানের গুপ্তচর ব্যবস্থা যথেষ্ট দুর্বল ছিল। এদিকে তার নজর একেবারেই ছিল না। ওনার মন্ত্রীকে গুপ্তচর হিসেবে আটক করতে আমাদের কোনো সমস্যাই হয়নি।

মহারাজ, আমাদের এই ভূমিতে শান্তিপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ রাজা নেহাত কম ছিল না। আপনি স্বয়ং রামচন্দ্রের কথাই মনে করুন। সেই শাসনের মধ্যেও তার শত্রু ছিল। সেই শত্রুদের সামলানোর জন্য রামচন্দ্রের বেশ শক্তিশালী গুপ্তচর দলও ছিল। রাজা যেমনই হোন না কেন এই ব্যবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

তারপর ধরুন ধর্মরাজ যুধিস্টিরের কথা। তিনি সত্য আর ন্যায়ের পথে সারা জীবন চলেছেন। তবু ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপনের পর অন্য রাজ্য থেকে ভূমি আর শক্তি আহরণ করেছিলেন তিনি নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। মগধের রাজা জরাসন্ধকে হত্যা করেছিলেন ভীম, জরাসন্ধের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমি যুধিস্টির নিজের রাজ্যের নিয়ে নেন। তখন তার উপাধি হয় রাজ চক্রবর্তী। রাজ্য চারিদিকে ছড়াতে হয়। মহারাজ উথিয়ান তার বাণিজ্যিক উপদেষ্টাদের যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার কূটনৈতিক মন্ত্রী আর সেনাপতিদের তেমন গুরুত্ব দিতেন না।'

'আপনার যুক্তি ঠিক আছে। আমি অস্বীকার করছি না। মহারাজ উথিয়ানের অনেক দোষ ছিল। কিন্তু অন্য কারো দোষ দিয়ে তো আমরা আর নিজের দোষ ঢাকতে পারি না।'

'না মহারাজ। আমাদের কোনো দোষ নেই। আমি কোনো অপরাধ করিনি, আপনি কোনো অপরাধ করেননি, এই সাতবাহন রাজ্যও কোনো অপরাধ করেনি। প্রতিবেশী রাজাদের মধ্যে রাজনীতি আর কূটনীতির প্যাঁচ তো সবসময়ই খেলা হয়। কোনো বিরতি থাকে না তাতে। সেই প্যাঁচের খেলায় মহারাজ উথিয়ান আমাদের কাছে হেরে গেছেন। কূটনীতির লড়াইটা এমনই হয় মহারাজ। মন্ত্রীদের কপালই খারাপ। আপনি যেভাবেই কূটনীতির লড়াইয়ে গুটি সাজান না কেন, বাইরে থেকে দেখলে তা ষড়যন্ত্রের মতোই দেখায়। আমরা মহারাজ এখন এই আলোচনা থেকে সরে আসি? আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ আছে। অতীতের সুতো দিয়ে জাল না বুনে আমাদের বর্তমানের মাছটা জালে তোলা উচিত।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন বলুন, আপনার দ্বিতীয় পরিকল্পনা আপনি যেন কী বলেছিলেন?'

'আজ্ঞে মহারাজ। যদিও আমি চেরা মহারাজ উথিয়ানের বিরুদ্ধে কূটনীতির বেশ শক্ত চাল চেলেছিলাম, কিন্তু তিনি কখনোই আমাদের রাজ্যের প্রধান শত্রু ছিলেন না।'

'হ্যাঁ। আমাদের রাজ্যের হুমকি বলি, আর প্রধান শত্রু বলি তা কিন্তু এখনও শক রাজ নাহাপনা।'

'হ্যাঁ। এবং এরই মধ্যে তিনি নিজের চাল দিয়ে কলিঙ্গ সেনাকে আমাদের রাজধানী অমরাবতীর সীমান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। এবং এখনও সেই সেনা আমাদের বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এখনও তার সমুচিত কোনো জবাব দিতে পারিনি।'

'হ্যাঁ মহারাজ। তবে কথাটা একটু বদলে নিন। পারিনি নয়, করিনি। তবে দ্বিতীয় পর্বে কলিঙ্গ রাজকে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। প্রথম পর্বে আমাদের সেনা শক্তি কম ছিল। এখন তো আমরা দক্ষিণ ভারতের সব সেনার অধীশ্বর চোলা রাজাকে আমাদের

কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে ফেলেছি। এবার আমরা সমুচিত জবাব দেবো। আপনি এখন খুশি হতে পারেন মহারাজ। এই পর্বে আমার মাথার সাথে আপনার তলোয়ারও খেলবে।'

'আচ্ছা, শুনে বেশ লাগলো। তো এখন ঠিক কোন কাজটা করবো আমরা?'

'এবার আমাদের উস্কানি দেবার পালা মহারাজ। মহারাজ নাহাপনা আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামানোর জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন। এবার আমরা তাকে গর্ত থেকে বের করার জন্য টোপ দেবো।'

'কীভাবে?'

'অবশ্যই আমরা কলিঙ্গের সেনাদের প্রথমে শিক্ষা দেবো। শক রাজার বিরুদ্ধে আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই। আমরা যদি আক্রমণ করি তাহলে সেটা পুরো আর্যাবর্তের চোখেই অন্যায় বলে পরিগণিত হবে। তাছাড়া সরাসরি তাদের আক্রমণ করে কোনো লাভও হবে না। তাদের মিত্ররা তাদের বাঁচিয়ে দেবে। তাই আমরা নজর দেবো কলিঙ্গের সেনার দিকে।'

'আচ্ছা। তার মানে আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন যুদ্ধ নিশ্চিত। আমাদের সেনা তৈরিই আছে।' আসন্ন যুদ্ধের উত্তেজনায় মহারাজ সাতকর্ণী সোজা হয়ে বসেছেন।

'হ্যাঁ মহারাজ। আর যুদ্ধের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্যই আজ আমরা এই মন্ত্রণায় বসেছি।'

মহারাজ সাতকর্ণী হাত নেড়ে যেন একটা মশা তাড়ালেন, 'দিনক্ষণ ঠিক করার কিছু নেই গিরিধারী। আমার সেনার যুদ্ধজয়ের জন্য গ্রহ নক্ষত্রের সাহায্যের দরকার পড়বে না। কেবল যুদ্ধ যাত্রা করলেই হলো।'

'না মহারাজ। পঞ্জিকার দিনক্ষণের কথা বলিনি। আমি এখানে বলেছি সময়ের কথা। এই যুদ্ধ নিয়েও আমার এক বিশেষ পরিকল্পনা আছে।'

'বলে ফেলুন, কি সেই বিশেষ পরিকল্পনা। আপনার তো আবার কথা পেটে আটকে রাখার অভ্যাস। এবার অন্তত তা করবেন না।'

'না মহারাজ। এবার কূটনীতি নিয়ে কোন পরিকল্পনা আমার মাথায় নেই। এবার পুরোই যুদ্ধ নিয়ে খেলা হবে। আর যুদ্ধের ময়দানের পরিকল্পনায় আপনার চেয়ে কুশলী আর কে আছে। আমি এখনই বলছি আমার পরিকল্পনা।'

কিন্তু সেই বলাতেই এলো বিপত্তি। ঠিক সেই ক্ষণেই মহলের সবচেয়ে বড়ো ঘণ্টাটা বেশ কয়েকবার পূর্ণ শব্দে বেজে উঠলো। এই ঘণ্টার সংকেতের মানে বেশ পরিষ্কার। এই রাজ্যের ওপর বেশ বড়ো কোন সংকট এসেছে। আর সেই খবর নিয়ে এসেছে কোন দূত। সেই দূত রাজভবনে মাত্র এসেছে। তার মুখ থেকে কথা শুনেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে প্রহরী।

গিরিধারী সবে মাত্র নিজের কথা বলতে আরম্ভ করবেন ভেবেছিলেন। তা আর হলো না। ঘণ্টার শব্দে মহারাজ সাতকর্ণী আর তিনি দুজনেই বেশ চমকে উঠেছেন। কোন শত্রু কি আক্রমণ করলো তাদের? কেউ কি বিশাল কোন সেনা নিয়ে এগিয়ে আসছে? কিন্তু কার বুকের ছাতি এতো চওড়া?

বিশেষ খবর পেতে বেশি দেরি হলো না। প্রহরী এসে জানালো এক প্রজা এসেছে। আশ্চর্য হলেন গিরিধারী, 'কি! আমাদের প্রজা? কোন দূত আসেনি?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে এই ঘণ্টা বাজানোর মানে কী?'

'মহামন্ত্রী, সেই প্রজা খুব ভয় পেয়েছে। কাঁদছে আর উল্টোপাল্টা কথা বলছে। তার অবস্থা দেখে আমরা ঘণ্টা না বাজিয়ে থাকতে পারিনি।'

গিরিধারী কিছুই বুঝতে পারছেন না, 'চলুন মহারাজ, আমরা একবার নিজ চোখে দেখে আসি।'

মহারাজ সাতকর্ণীর সামনে নিয়ে আসা হলো প্রজাকে। মহারাজকে দেখেও প্রজার স্বাভাবিক হুশ ফিরে এলো না। কোন সম্মান প্রদর্শন করলো না। কেবল উল্টোপাল্টা বকবক করতে লাগলো।

গিরিধারী প্রজার সামনে বসে তার ঠিক কাঁধে হাত রাখলেন, 'ভয় পেয়ো না। এখানে কোন ভয় নেই। তুমি স্বয়ং মহারাজ সাতকর্ণীর প্রাসাদে তার ঠিক সামনে আছো। শান্ত হও। এখানে পৃথিবীর কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি একটু স্থির হও। এই কেউ একটু জল নিয়ে এসো তো।'

এক সৈনিক বড়ো এক পাত্র জল নিয়ে এলো। জলটুকু একেবারে তৃষ্ণার্ত বালির মতো শুষে ফেললো প্রজা। জলের মানুষকে সুস্থির করার ক্ষমতা আছে।

প্রজার উন্মাদ ভাব একটু কমে আসতেই এবার গিরিধারী কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমার সমস্যার কথা বল। কি হয়েছে? কি দেখে তুমি এতো ভয় পেয়েছ? তোমাকে কি কোন ডাকাত অথবা দস্যুদল আক্রমন করেছে?'

'না, আমাকে কোন দস্যুদল আক্রমন করেনি। ডাকাতের দল আমাকে ধরেনি। তারচেয়েও ভয়ানক এই বিপদ।'

'কী?'

'নরখাদক। ভয়ংকর নরখাদক দেখা দিয়েছে অঞ্চলে।'

এবার মহারাজ সাতকর্ণী বলে উঠলেন, 'নরখাদক!'

'বাঘ মহারাজ। ভয়ংকর বাঘ।'

'কোথায়?'

'রাজধানী প্রতিষ্ঠানা থেকে জঙ্গলটা বেশি দূরে নয়। সেই জঙ্গল থেকেই বেরিয়েছে সেই নরখাদক। জঙ্গলের পাশের নানা গ্রামে হামলা করছে গত এক মাস ধরে। তার তাণ্ডবে আতঙ্কে দিন পার করছে প্রজারা। কাল রাতে আমার ঘরে হামলা করেছিল সেই বাঘ। আমার চোখের সামনে থাবা মেরে আমার বৌ আর দুই ছেলেকে মেরে ফেলেছে। উফ, কি বীভৎস সেই দৃশ্য।' লোকটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তাকে সুস্থির হবার সময় দেওয়া হলো।

'উফ কি ভয়ংকর। আমি কোনমতে পালিয়ে এসেছি। বাঘটা ইচ্ছে করলে আমাকেও মেরে ফেলতে পারতো। ভাগ্যই বলতে গেলে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে, এই আতংক আর কষ্ট নিয়ে বেঁচে না থাকলেই বরং ভালো হতো।'

পরিস্থিতি বোঝা শেষ। গিরিধারী প্রহরীকে ইশারা করলেন, 'একে অথিতিশালায় নিয়ে যাও। দেখবে কোন অসুবিধা যাতে না হয়। পর্যাপ্ত খাবার, চিকিৎসা আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে।'

সব ব্যবস্থা করে মহারাজ সাতকর্ণী আর গিরিধারী আবার ফিরে গেলেন নিজেদের মন্ত্রণা কক্ষে।

'মহারাজ, যা একটা বাঁধা পড়লো। এখন তাহলে আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করি?' আচমকা আসা আপদ কাটিয়ে আবার কাজে মনে দিতে চাইলেন গিরিধারী।

মহারাজ হাত তুললেন, 'এখন আর ঐ পরিকল্পনা নয় গিরিধারী। আমাদের হাতে এখন নতুন একটা সমস্যা এসেছে। প্রথমে আমাদের সেই সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হবে। সেই সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করতে হবে আগে।'

'আপনি কি এই প্রজার বলা সমস্যার কথা বলছেন? নাকি অন্য কোন সমস্যা?'

'না, অন্য কোন সমস্যা নয়। এইমাত্র যেই বিপদ আমাদের সামনে এসেছে তাই নিয়েই কথা বলছি। নরখাদক। আপনি বোধহয় আমাদের এই রাজ পরিবারের এক প্রাচীন প্রথার কথা জানেন না। জানলেও ভুলে গেছেন। আমাদের পরিবারের বেশ পুরানো ঐতিহ্য। বলদেব মন্ত্রী থাকলে অবশ্য তাকে এই কথা মনে করিয়ে দিতে হতো না।'

ভ্রু কুঁচকে গেল গিরিধারীর। মহারাজের বংশের পুরানো কি এমন ঐতিহ্য আছে যা তিনি মনে করতে পারছেন না। চিন্তা করতে লাগলেন তিনি।

আচমকা তার মনে পড়লো। আছে, একটা রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু সে তো অনেক পুরানো দিনের কথা। রীতি নিয়ে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন তিনি। না, এটা কিছুতেই এখন সম্ভব না। তার পরিকল্পনার জন্য কিছুতেই এখন ঐ রীতির পালন করতে দেওয়া যাবে না।

চিৎকার করে উঠলেন গিরিধারী প্রায়, 'না, মহারাজ। রীতির কথা আমার মনে আছে। কিন্তু এই সময়ে আপনি সেই রীতির পালন করতে পারবেন না। সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'আপনার কি মনে পড়েছে আমাদের রীতি। আপনি কি মনে করতে পারছেন? রাজবংশের নিয়ম কী?'

'নিয়ম আমি জানি মহারাজ। রাজ্যের ভেতরে কোন নরখাদক বাঘ দেখা দিলে স্বয়ং সাতবাহন রাজা ছদ্মবেশে সেই বাঘ শিকার করতে যান। তারপর সেই বাঘ মেরে ছাল নিয়ে ফিরে আসেন রাজধানীতে।'

'একেবারে ঠিক বলেছেন। এই তো মনে পড়েছে।'

'কিন্তু মহারাজ, এখন তো বাগের চেয়েও বড়ো সংকট আমাদের সামনে আছে। আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে শত্রু। এখন আপনার কোনমতেই এই রাজপ্রাসাদ আর এই রাজধানী ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। আমাদের বিশেষ বাহিনীর সঠিক সেনাপতি নিয়োগ দেওয়া এখনও বাকি, যুদ্ধের পরিকল্পনা করা বাকি। অনেক কাজ আছে হাতে। আর বাঘ মারা নিয়ে কোন চিন্তা নেই। আমি সেই ব্যবস্থা করছি। কয়েকজন চৌকস সেনা আর শিকারিকে পাঠিয়ে দেবো। ওরা বাঘ মেরে আপনার জন্য বাঘের ছাল নিয়ে আসবে।'

'গিরিধারী, আপনি ভুলে গেছেন কিছু ঐতিহ্য সময়ের সাথে সাথে দায়িত্বে পরিণত হয়। এই নরখাদক মারার দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে। নইলে প্রজারা

আমাকে আরাম লোভী কাপুরুষ ভাববে। ভাববেন না। বেশি সময় লাগবে না। কাল সকালেই আমি আগত প্রজার সাথে কথা বলে ছদ্মবেশে প্রাসাদ ত্যাগ করবো। এবং আপনাকে কথা দিচ্ছি, ফিরবো বেশ তাড়াতাড়ি। ততদিনে আপনি আপনার পরিকল্পনাগুলো আরও বেশি করে ঝালিয়ে নিন। এবারই তো প্রথম না। আগেও দুটো নরখাদক মেরেছি।'

গিরিধারী আর কিছুই বললেন না। মহারাজ সাতকর্নী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। ওনাকে এখন আর কিছুতেই আটকানো যাবে না।

৬৩

সূর্য ওঠার এখনও অনেক দেরি। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস থাকায় কোনো আলোড়ন ছাড়াই ঘুম ভেঙ্গে গেছে রুদ্রদেবের। কোনোরকম অলসতা ছাড়াই বিছানা ত্যাগ করলো সে। অসিত তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নিদ্রারত অসিতের দিকে গভীর মনোযোগে তাকাল সে। না, ঘুমে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। স্নায়ু শান্ত আছে শিষ্যের।

তখনই ছাত্রের একটা পরীক্ষা নেবার লোভ সামলাতে পারলো না সে। হঠাৎ করেই সুযোগটা চলে এসেছে। কোনোরকমের শব্দ না করে অসিতের দিকে এগিয়ে গেল সে। ছাত্রের স্নায়ু কতটুকু স্থির হয়েছে তার পরীক্ষা হবে এখন।

বেশ ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে অসিতের। ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল রুদ্রদেব। তারপর বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিলো। সাথে বেরিয়ে এসেছে তার আরোপিত ভয়ার্ত স্বর, 'ওঠো অসিত। তাড়াতাড়ি ওঠো।'

অসিতের আচরণে কোনো ধরনের চমক প্রকাশ পেলো না। ধড়মড় করে উঠে বসলো না সে, চোখ বড়ো করে লাফিয়ে চিৎকার করলো না। কোনোরকমের আশংকা, উত্তেজনা অথবা তাড়াহুড়া প্রকাশ পেলো না তার ব্যবহারে। স্বাভাবিক গতিতে চোখ খুলল সে, 'কী হয়েছে?'

রুদ্রদেব পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হলো। অসিত আস্তে আস্তে নিজের স্নায়ুর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারছে। যোদ্ধা মাত্রেরই এই গুণ থাকা জরুরি। তবে শুধু যোদ্ধা না, প্রতিটা মানুষেরই এই গুণ অর্জন করতে হয়। যে নিজের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে আসলে পরিপূর্ণভাবে কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

অসিত এখনও তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের দিকে। তাকে কেন জাগানো হয়েছে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করছে তার চোখ।

ছাত্রের সামনে গুরুর কখনো ছাত্রের প্রশংসা করা উচিত নয়, 'উঠে পড়ো। আর কত ঘুমাবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত শুরু হয়ে গেছে।'

অসিত শয্যা ছাড়লো। এরপরের কাজ নিয়মে বেঁধে দেওয়া আছে। যে যার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে প্রাতঃকর্ম সেরে এলো। তারপর অন্যান্য নিত্যকর্মের পরে শুরু হলো অভ্যাস।

নিজের যোগাভ্যাসের চর্চার পাশাপাশি অসিতের দিকেও নজর আছে রুদ্রদেবের। তার শরীর এখন অনেকটাই বশে এসে গেছে। কঠিন কঠিন যোগাসন করতে এখন আর কোনো সমস্যা হয় না। আসন সিদ্ধি লাভ করেছিল সে সেই তিন হাজার বছর আগে। শরীর এখন সেই একাগ্রতা আর শক্তি ফিরে পাচ্ছে।

তবে সেই জায়গায় পৌছতে অসিতের এখনও দেরি আছে। সে এখনও উচ্চ মার্গের যোগের পথে পা ফেলতে পারেনি। সে মৌলিক আসন আর প্রাণায়াম শেষ করে শস্ত্র হাতে নিলো। মনোযোগে একটুও ঘাটতি নেই তার। সে জানে একটু দূরেই রুদ্রদেব ময়ূরাসনের মতো কঠিন আসন চর্চা হয়তো করছে, তবে সেই অবস্থাতেও ওনার দুই

জোড়া চোখ ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে। লক্ষ্য রাখছে প্রত্যেকটা নড়াচড়ার দিকে।

অসিত তার পলকা অস্ত্রগুলো ছেড়ে কদিন হলো যুদ্ধের উপযোগী শস্ত্র শিক্ষা করার অনুমতি পেয়েছে। সঠিক উপায়ে এবং সময়ে খাদ্য গ্রহণ আর ব্যায়ামে তার পেশির জোর বেড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আস্তে আস্তে সুগঠিত হয়ে উঠেছে দুই বাহু। রুদ্রদেব নিজে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক খাবার খায়। বনের ফল আর শস্য ছাড়া সে আর কিছুই খায় না। এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হওয়া সম্ভব না। অসিতকেও তাই খেতে হয়।

ময়ূরাসন ছেড়ে উঠে এলো রুদ্রদেব। আজকে অসিতের সাথে খাদ্যাভাস নিয়ে কথা বলতে হবে।

অসিতের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, 'তোমার শক্তি আর পেশি যে হারে বাড়ছে তাতে হবে না। কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে যথেষ্ট নয়। পেশির গঠন আর শক্তির একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে। শুধু কৌশল দিয়ে একটা পর্যায় পর্যন্ত তুমি লড়তে পারবে তবে সব প্রতিপক্ষের সাথে পারবে না। এখনও তোমার অনেক কৌশল শেখা বাকি। সেগুলোর মধ্যে এমন সব কৌশল আছে সেগুলো আয়ত্ত করতে হলে দৈহিক গঠন আর শক্তি দুইই দরকার।'

'শক্তি আর দৈহিক ক্ষমতা বাড়াবো কীভাবে? ছোটোবেলা থেকেই তো আমি এই রকম।'

'হ্যাঁ। তাই তো সোজা পথে হবে না। একটু বাঁকা পথে যেতে হবে। তোমার দেহে অন্য রকমের খাবার প্রয়োজন। আমি গুরু হিসেবে তোমাকে তামসিক খাবার গ্রহণ করার অনুমতি দিচ্ছি।'

'তামসিক খাবার?'

'হ্যাঁ। কিছু বিশেষ খাবার আছে যা তোমাকে দেহে তাড়াতাড়ি শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করবে। তবে এই পথে যাবার আগে তোমাকে আমি একটু সাবধান করে দিতে চাই। তামসিক খাবার কিন্তু জিভ আর মন দুইই হরণ করে নেয়। তুমি কোনোভাবেই আসক্ত হয়ে পড়বে না কিন্তু। বিশেষ প্রয়োজনে সৈন্যরা সেগুলো খায়, তবে কখনোই সেসবে অভ্যস্ত হওয়া চলবে না।'

'এখন বুঝতে পারছি। আপনি তামসিক আহারের কথা বলছেন। তার মানে পশু পাখির মাংস খেতে হবে আমাকে এখন থেকে? নিচু ম্লেচ্ছ জাতের মতো, যারা মাছ খায়, মাংস খায়। আমি ওসব খেতে পারবো না। শেষে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। আর ওসব খেলে শরীর খারাপ করে। দেখা যাবে শক্তি বাড়ার বদলে ওসব খেয়ে পেট খারাপ হয়ে মরে গেছি। না, ওসব খেয়ে কাজ নেই।'

রুদ্রদেব অসিতের কথা শুনে না হেসে পারলো না, 'ধর্ম কি এত সহজে নষ্ট হবার জিনিস? না। এত সহজে মানুষ মরেও না। তবে, তুমি যেসব আহারের কথা বললে সেগুলোও তামসিক আহার। তবে তোমাকে জীবিত কোনো প্রাণী হত্যা করে খেতে হবে না। অন্য উপায় আছে।'

'অন্য উপায়? তামসিক আহারের আবার অন্য উপায় কী? আমি তো জানতাম তামসিক আহার মানেই হচ্ছে যে আহারের জন্য রক্তপাত ঘটাতে হয়।'

'ঠিকই জানতে, তবে পুরোপুরি ঠিক না। উপায় আছে। আর সেই উপায় হচ্ছে আয়ুর্বেদ। প্রাণীর শরীরে যেসব উপাদান আছে তাতে মানুষের শরীরে শক্তি উৎপন্ন হয় সেকথা সত্য। তবে সেই জিনিসের ক্ষতি অনেক। আর আসক্তির কথা তো বলাই বাহুল্য। তবে আয়ুর্বেদে এমন কিছু গোপন ওষুধি আছে যাতে প্রাণী দেহ থেকেও সেসব উপাদান কয়েক গুণ বেশি থাকে। তোমার জন্য কেবল সেসব অল্প পরিমাণে কদিন ব্যবহার করলেই চলবে।'

'আচ্ছা। সেগুলো খেতে কি খুব খারাপ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো অসিত।

রুদ্রদেব হাসল। কোনো জবাব দিলো না।

জঙ্গল থেকে সেদিনই সেই ওষুধির লতা খুঁজে এনেছে রুদ্রদেব। তারপর অসিতকে শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে খেতে হয়। কাণ্ড টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে রস গিলে ফেলতে হয়। বেশ ঘন আঠালো সেই তরল। অসিত প্রতিদিন এক টুকরো করে সেবন করে। ফলাফল একেবারে হাতেনাতে মিলেছে। অসিত কদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শস্ত্র হাতে শুধু তুলতেই পারলো না, খেলাতেও লাগলো সেগুলো।

তলোয়ার হাতে এখন শিবের ভঙ্গিমায় চর্চা করছে সে। প্রথমে শরীরকে নটরাজ ভঙ্গিতে নিয়ে গেল। অনায়াসে। তারপর ডান হাতে তলোয়ার মাথার ওপর তুলে ফেললো। নিখুঁত হলো সে ভঙ্গিমা। অসিতের ভারসাম্য আর হাতের তলোয়ার দুটোর একটাও এক চুল কাঁপছে না।

শিষ্যের উন্নতিতে বেশ খুশি হলো রুদ্রদেব। কয়েকটা তির ধারালো করে নিচ্ছিল সে। কাজ শেষ করে এগিয়ে এলো অসিতের দিকে, 'বাহ, তলোয়ার হাতে তোমার নটরাজ ভঙ্গি বেশ ভালোই হয়েছে।' এবার অসিতের ভঙ্গির দিকে ভালো করে তাকাল সে, ঠোঁটে আঙুল, 'হ্যাঁ। পা আর হাঁটু একটুও কাঁপছে না। শরীর পুরোপুরি স্থির। এখন সময় হয়েছে তোমার শিক্ষা পরবর্তী স্তরে নেবার। আসন ত্যাগ করো।'

নটরাজ ভঙ্গিমা ছেড়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে এলো অসিত। মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছে সে। যুদ্ধ বিদ্যা বেশ কিছুদিন ধরেই তার কাছে নেশার মতো মনে হচ্ছে। যতই নতুন নতুন জিনিস শিখছে ততই যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছে। নিজের ভেতরে উপলব্ধি করতে পারছে নতুন শক্তি। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীর যে-কোনো ঝামেলার মুখোমুখি হবার মতো যোগ্যতা সে অর্জন করে ফেলছে।

রুদ্রদেব অসিতকে তার সামনে বসালো। নিজে বসেছে পিঠ একেবারে টান করে। এখন পাঠদান আরম্ভ হবে।

'শোনো, যুদ্ধের মৌলিক কৌশল আর যেসব ভঙ্গিমা আছে সেগুলো শেখা ভালো। এতে শরীর তৈরি হয়, আর শস্ত্র আর শরীরের সংযোগের একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এতে তুমি বুঝতে পারবে কীভাবে শস্ত্র কীভাবে ধরতে হয়। তোমার শরীর এবং মন আসলে কোন শস্ত্রের প্রতি কেমন ধারণা পোষণ করে। মৌলিক কলার কাজ কেবল এটুকুই।'

'তারপর?'

'তবে সম্মুখ যুদ্ধে তুমি যখন এক বা একাধিক যোদ্ধার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তখন কিন্তু এসব মৌলিক কৌশল কাজে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। খুব সম্ভবত তোমার সামনে

থাকা যোদ্ধাও সেসব মৌলিক কৌশল ভালোভাবেই জানে। উল্টো ওদের মধ্যে এমন অভিজ্ঞ কেউ থাকতে পারে যে তোমার চেয়ে বেশি জানে, এসব কৌশল তোমার চেয়েও বেশি সময় ধরে চর্চা করেছে। তাদের কাছে নিঃসন্দেহে হেরে যাবে তুমি।'

'তাহলে জেতার কৌশল কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? সেই বিদ্যার সন্ধান আমাকে দিন। যুদ্ধের সেই কলার জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।'

রুদ্রদেব স্বভাবসুলভ বোঝানোর ভঙ্গিতে হাসল, 'শাস্ত্রে কেবল নিয়ম লেখা থাকে, জেতা বা হারার কৌশল লেখা থাকে না। শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা সবার জন্যই লেখা হয়েছে। সবাই তা জানে। জেতার জন্য তোমার সামনে একটা পথই খোলা আছে।'

'কী?' আগ্রহে কেঁপে উঠলো অসিতের গলা।

'এমন অন্তত একটা কৌশল যা সামনের যোদ্ধা জানে না।'

'কিন্তু সে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে কী করে বুঝবো? সামনে যে যোদ্ধা থাকবে সে তো আর আমার পরিচিত হবে না। যুদ্ধের আগে তার সাথে আলাপ করারও সুযোগ পাওয়া যাবে না। তাহলে আমি কীভাবে জানবো, সে কী কী কৌশল জানে?'

'হ্যাঁ। এবার সঠিক প্রশ্নটা করেছো। শস্ত্রে এই শিক্ষাই এবার হবে তোমার। তুমি সামনের যোদ্ধার সাথে আলাপ মুখে করতে পারবে না ঠিক, কিন্তু একেবারেই যে করতে পারবে না তা ঠিক নয়। তার সাথে তোমাকে আলাপ করতে হবে বাক্য দিয়ে নয়, শস্ত্র দিয়ে। এবার তোমাকে শিক্ষা দেবো কীভাবে সামনের যোদ্ধার শক্তি আর দুর্বলতা সম্পর্কে বোঝা যায়। যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে দুটোই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

অসিত আর কিছু বলে না। মনোযোগ দেয় রুদ্রদেবের দিকে।

'শোনো, মনোযোগ দাও, যুদ্ধের শুরুতে করা কিছু আঘাত বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো কিন্তু তুমি শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য করবে না, নিজেকে বাঁচানোর জন্যও করবে না। সেগুলো আসলে করা হবে প্রতিপক্ষের ওজন বোঝার জন্য। ওসব আঘাত দিয়েই সামনের জনের শক্তি আর দুর্বলতা বোঝা যাবে।

এবার শস্ত্র সম্পর্কে বলছি। একেক শস্ত্রের আঘাত করার কৌশল একেক রকম। মুক্ত আর বন্ধ অস্ত্রের ক্ষেত্রে তোমাকে এই পরীক্ষার আঘাতগুলো নানাভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সামনের জনের হাতে ধনুক থাকলে তুমি নিজে তির চালিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখবে। সে যখন তির ছুঁড়বে তখন তুমি তার ছোঁড়া ভালো করে খেয়াল করবে। এরকম তলোয়ার, গদা, বর্শার জন্য বিশেষ কৌশল আছে সেসব অস্ত্রধারীদের পরখ করার জন্য।

আমি কেবল তোমাকে সেসব আঘাতের মৌলিক ব্যাপারগুলো শেখাতে পারবো। তবে কোন রকমের যোদ্ধার ওপর তুমি কোন রকমের কৌশল প্রয়োগ করবে তা তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। সম্মুখ যুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়াই আসল কথা।'

কথার পর্ব শেষ। এবার ব্যবহারিক শিক্ষাদানের পালা। তলোয়ার, বর্শা, গদার নানারকম আঘাত দেখাতে লাগলো রুদ্রদেব। অসিত প্রত্যেকটা ভঙ্গি দেখছে অখণ্ড মনোযোগে। রুদ্রদেব থামতে অসিত শুরু করলো একটা একটা করে আঘাতের অনুশীলন। রুদ্রদেব দেখছে, মাঝে মাঝে শুধরে দিচ্ছে অসিতের নানা ভঙ্গি।

লোকটা তখনই এলো। তাদের কুটিরের কাছে আসার আগেই তার আসার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল রুদ্রদেব। অসিতের দিক থেকে মনোযোগ একটু সরালো সে।

আগন্তুকের পরনে কালো পোশাক। দুমুখো ধারালো বর্শা আর নানা শস্ত্র আছে তার সাথে। তার কাঁধে নানা জিনিসের মধ্যে বেশ কিছু পাকানো দড়িও আছে। আরও কিছু জিনিস আছে সেগুলো দেখেই চিনতে পারলো রুদ্রদেব। এগুলো ফাঁদ পাতার জিনিস। এই ধরনের লোক আগেও দেখেছে সে। এরা শিকারি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। পশু পাখি শিকার করে, মাংস খায়। আর পশুর শরীরের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস পরে বাজারে বিক্রি করে। এই ব্যাধেরা পশুর চামড়া দিয়ে নানা জিনিস তৈরি করতেও বেশ ওস্তাদ হয়। সেগুলোও বাজারে বিক্রি করা যায় ভালো দামে। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে রুদ্রদেবের। এই ব্যাধেরা এমনিতে দল বেঁধে শিকার করে। কিন্তু এই শিকারি একা। সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করলো সে।

অসিত আরও আগেই প্রস্তুত হয়ে গেছে। চর্চা থামিয়ে অস্ত্র মোটামুটি বাগিয়ে ধরেছে সে। রুদ্রদেব কিছু বললেই আগন্তুকের দিকে তেড়ে যাবে।

রুদ্রদেব তাকে আশ্বস্ত করলো, 'তুমি চর্চা চালিয়ে যাও। যদিও সশস্ত্র অপরিচিত কোন লোককে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয়, তবু আমার মনে হচ্ছে আগন্তুক আমাদের জন্য কোনো বিপদ বয়ে আনছে না। সে মূলত পথিক।'

রুদ্রদেব এগিয়ে গেল লোকটার দিকে, 'আমাদের কুটিরে আপনাকে স্বাগত। বলুন, এই জঙ্গলে কী সেবা করতে পারি আপনার?' সম্ভাষণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রশ্ন। এই জঙ্গলে কেন এসেছে ব্যাধ তাই জানতে চাইছে সে।

ইশারার প্রশ্নের উত্তর দেবার ধারেকাছেও গেল না ব্যাধ। রুদ্রদেবের দিকে তাকাল সন্দেহের দৃষ্টিতে, 'তোমরা দুজন এখানে থাকো? একা?'

'দুজনে আবার একা হয় কীভাবে?'

এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিলো না আগন্তুক, 'এখানে তোমরা দুজন কী করো?'

'আমরা দুজন মিলে পাশের জঙ্গল পাহারা দেই। জঙ্গলের মালিক আমাদেরকে নিয়োগ করেছে। যাতে এই জঙ্গল থেকে কেউ কাঠ চুরি করতে না পারে।'

'আচ্ছা। তার মানে তোমরা এখনও কিছুই জানো না। তাই এই জায়গা ছেড়ে এখনও পালাওনি। অজ্ঞানতা বিপদের অন্যতম কারণ হয় মাঝে মাঝে।'

ভ্রু কুঁচকে এলো রুদ্রদেবের, 'বিপদ? আপনি কী বিপদের কথা বলছেন?'

ব্যাধের মুখ ভাবলেশহীন, 'নরখাদক। এক ভয়ংকর বাঘ। এদিকের জঙ্গলে এক ভয়ংকর নরখাদক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পর্যন্ত অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে সেই বাঘ। পোষা পশুপাখির তো কোনো হিসেব নেই। এই বাঘের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপারটা হচ্ছে, সে শুধু নিরীহ মানুষই মারছে না, তাকে শিকার করতে আসা শিকারিদেরও ছাড়ছে না। এই পর্যন্ত বাঘের সাথে বুদ্ধির খেলায় হেরে অনেক শিকারি প্রাণ হারিয়েছে। যতটুকু জানি এই পর্যন্ত প্রায় কুড়ি শিকারির প্রাণ নিয়েছে এই বাঘ।'

অসিতের কানে বাঘ শব্দটা পৌঁছেছে। শস্ত্র চালানো বাদ দিয়ে সে এখন মনোযোগ দিয়েছে কথোপকথনে।

রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করলো, 'তা আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন? বাঘের দিকে না-কি বিপরীত দিকে?'

হাসলো ব্যাধ, 'না, এখনই পালানোর কথা ভাবছি না। শিকারি হিসেবে এমন সুযোগ তো আর জীবনে বারবার আসে না। নরখাদকের চামড়ার দাম জানো? রাজা দুহাত ভরে স্বর্ণমুদ্রা দেবেন তার বদলে। আর তার বাইরে আছে সম্মান। এক নরখাদকের শিকার করতে পারলে শিকারি হিসেবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। অর্থ আর সম্মানের জন্য জীবন বাজি তো লাগাতেই হবে। তাই আমি বাঘের দিকেই যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনার জন্য শুভ কামনা। আপনার সিদ্ধান্ত আপনার, আপনার রাস্তাও আপনার। তবে এখন আপনি অথিতি হিসেবে আমাদের কুটিরে এসেছেন। আমি আপাতত অথিতি সৎকার করতে পারলেই ধন্য হই।'

'আমার আর কী সৎকার করবে তোমরা? যে কাজে যাচ্ছি তাতে ব্যর্থ হলে আমার সৎকার এমনিতেই হয়ে যাবে। আর যদি সেবা সৎকারের কথা বলো, তাহলে সেসব প্রকৃতি আমাকে এমনিতেই দেয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। তবে তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে একটু জল দিতে পারো। আশেপাশে জল খুঁজে পেলাম না। জল খেয়েই জঙ্গলে ঢুকবো।'

রুদ্রদেব জল এনে দিলো। মাটির কলসে রাখা শীতল জল পান করে বেশ তৃপ্তি পেলো ব্যাধ। তারপর বিদায় নিয়ে রওনা দিলো জঙ্গলে।

আগন্তুকের প্রস্থানের পর অসিত এগিয়ে এলো রুদ্রদেবের দিকে, 'লোকটা কী বলে গেল?'

'যা বলে গেছে তা যথেষ্ট চিন্তার।' অসিতকে অহেতুক ভয় পাইয়ে দিতে চাইলো না রুদ্রদেব, তবে সাবধান তো হতেই হবে।

'আমি যেন বাঘ নিয়ে কথা শুনলাম।'

'হ্যাঁ। এখন থেকে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। তুমি আমার কাছে না জিজ্ঞেস করে কোথাও যাবে না। একেবারে কোথাও না। আর সন্ধ্যের আগেই আমরা খাওয়া-দাওয়া আর অন্য সব কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকে পড়বো। যাই হোক না কেন, ভোরের আলো ফোটার আগে আমরা কিছুতেই আর বাইরে বের হবো না।'

অসিত কিছু বলল না। অহেতুক তর্ক করা সে বাদ দিয়েছে। মেনে নিলো সে সিদ্ধান্ত।

কালক্ষেপণ করা যাবে না। সেদিন থেকেই তারা এই নিয়মের পালন শুরু করলো তারা। সন্ধ্যের পর সব কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকে পড়লো তারা। রুদ্রদেব বাড়তি আরেকটা কাজ করেছে। কুটিরের সামনের উঠানে বেশ বড়ো করে একটা আগুনের কুণ্ডলী জ্বেলেছে সে। অসিত কেবল দাঁড়িয়ে রুদ্রদেবের কাজ দেখছে। এত বড়ো আগুন জ্বালানোর কোনো কারণ সে খুঁজে পেলো না।

দুদিন পরের কথা। সন্ধ্যের সাথে সাথে তারা ঢুকে পড়লো ঘরে। তারপর অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লো। তবে সেদিন খুব একটা নিশ্চিন্তে ঘুম ভাঙল না তাদের।

গভীর রাতে দরজায় একটা থাবা পড়তেই দুজনের ঘুমই ভেঙ্গে গেল। তাদের দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। আওয়াজটা বেশ ভোঁতা। রুদ্রদেব আর অসিত একটুও নড়ছে না।

কিছুক্ষণ পরে থাবার আওয়াজের সাথে সাথে ভেসে এলো মৃদু আর্তনাদ। কী বলছে বোঝা গেল না। লোকটার গলায় জোরে শব্দ করার শক্তি অবশিষ্ট নেই।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারলো রুদ্রদেব। কেউ একজন আহত হয়ে সাহায্য চাইছে। তার মানে মানুষটা যদি সেই নরখাদক দ্বারা আহত হয়ে থাকে তাহলে সেই বাঘেরও কাছেপিঠে থাকার ভালো সম্ভাবনা আছে। সতর্ক হতে হবে।

পর মুহূর্তেই নিজের মাথা থেকে এই চিন্তা বাদ দিলো সে। বাঘ যদি আশেপাশে থাকতো তাহলে আহত ব্যক্তিকে এভাবে শব্দ করার সুযোগ দিতো না। এক থাবায় ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতো। খুনি প্রাণীদের এটাই স্বভাব।

মশাল জ্বেলে দরজা খুলল রুদ্রদেব। দরজার ঠিক সামনেই রক্তাক্ত একটা দেহ পরে আছে। একটু আগেও জ্ঞান ছিল দেহে। এখন আর নড়ছে না।

লোকটাকে চিনতে কষ্ট হলো না রুদ্রদেবের। সেদিন সকালে এই শিকারিই এসেছিল তাদের কুটিরে।

অসিতকে নির্দেশ দিলো রুদ্রদেব, 'যাও, তাড়াতাড়ি একটু জল নিয়ে এসো।'

অসিত নির্দেশ পালন করলো সাথে সাথে। গোল ঠোঁটে ছুয়ে গলায় যেতেই জ্ঞান যেন একটু ফিরে এলো শিকারির। নাড়ি পরীক্ষা করে দেখল রুদ্রদেব। নাহ, বাঁচার কোনো আশা নেই। মৃত্যুর পথে এর মধ্যেই যাত্রা করেছে শিকারি।

শেষ মুহূর্তে শেষ কথাটা বলে যেতে পারলো শিকারি, 'বুঝতে পারিনি। আমি একটুও বুঝতে পারিনি। আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সব শিকারি যে ধোঁকা খায় আমিও সেই ভুলই করেছি। আমাকে কোনো সুযোগই দেয়নি বাঘ। খুব বাজে ভাবে আঘাত করেছিল। কোনোমতে মশালের ছ্যাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। তবে পালাতে যে পেরেছি তা মনে হচ্ছে না।' কথাটা শেষ হতেই শিকারির প্রাণ পালিয়ে গেল তার দেহ ছেড়ে। সেদিন অথিতি সৎকারের তেমন সুযোগ পায়নি রুদ্রদেব। আজ একবারে তাকে অন্তিম সৎকারের সুযোগ দিয়ে গেল।

ভোরের অপেক্ষা করতে লাগলো রুদ্রদেব আর অসিত। সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। শিকারির ঠিকানা জানে না তারা। কাউকে খবর দেওয়ার কোনো উপায় নেই। নিজেদেরই মুখাগ্নি করতে হবে।

কুটির থেকে একটু দূরে শিকারির চিতা সাজালো তারা। তারপর রুদ্রদেব মন্ত্র পড়ে মুখাগ্নি করলো।

সামনে জ্বলন্ত চিতা দেখতে দেখতে চোখমুখ কঠিন হয়ে এলো রুদ্রদেবের, 'অসিত, এই কদিন তুমি নগরের অথিতিশালায় থাকবে। আমি একটা কাজে বেরোবো। এখানে তোমার একা থাকা চলবে না।'

'আমি জানি আপনি কী কাজ করতে যাবেন। ঐ লোকটাকে যে বাঘ মেরেছে সেই বাঘ মারতে যাবেন। আমাকে সাথে নিয়ে যান।'

'না। আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। এই কাজে নিঃশব্দে চলতে হবে। তুমি এখনও জঙ্গলে নিঃশব্দে চলার বিদ্যা অর্জন করোনি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে নগরের অথিতিশালায় রেখে আসতে হবে না। আমি নিজের ব্যবস্থা এখানেই করে নিতে পারবো। চিন্তা করবেন না, পুরো সতর্ক থাকবো।'

'আচ্ছা। আমি তোমার ওপর ভরসা রাখছি। এটাও তোমার ক্ষত্রিয় জীবনের একটা বিশাল শিক্ষা। শুধু মানুষ নয়, ক্ষত্রিয় প্রকৃতির ভারসাম্য বিধান করে। যে-কোনো কিছু যদি প্রকৃতির রীতির বিরুদ্ধে চলে যায় তবে এক হলে ক্ষত্রিয় তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে অথবা তাকে হত্যা করে তার আত্মাকে মুক্তি দেয়।

নিজের অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিতে লাগলো রুদ্রদেব। সবকিছুর ধার পরীক্ষা করছে। সে এখন তার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল। তার মনে এখন আর কোনো ভয় নেই। কোনো সন্দেহ নেই। তার মন জুড়ে কেবল আছে এখন সেই বাঘ।

এতগুলো দক্ষ শিকারি কেন ব্যর্থ হলো? কী আছে সেই বিশেষ বাঘটার মধ্যে? কী এমন কৌশল জানে সে?'

৬৪

ঠিক এই প্রশ্নগুলোই এই মুহূর্তে কিছু দূরে থাকা আরেকজনের মাথায়ও ঘুরপাক খাচ্ছে। লোকটা সোমগড়ে এসেছে একটু আগে। হাবেভাবে আর সাজে বোঝা যাচ্ছে লোকটা শিকারি। তবে এই নগরে এই লোককে আগে কখনো দেখেনি। তবে কেউই তেমন গা করলো না। এখন যেই অবস্থা তাতে এই অঞ্চলে নতুন নতুন শিকারি আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

এই অঞ্চলের অবস্থা এখন থমথমে। এর মধ্যেই এই অঞ্চলের অনেক নামকরা দক্ষ শিকারিরা ঐ নরখাদকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। এই নগর যেন এই দিনের উজ্জ্বল আলোতেও থমথম করছে। এত বড়ো নগরে যে কর্মব্যস্ততা থাকার কথা, যে শোরগোল থাকার কথা তার কিছুই নেই। সবাই নীরবে কিন্তু চটজলদি যে যার কাজ করছে। বিকেলের মধ্যেই ঘরে ফিরতে হবে। সন্ধ্যের মধ্যে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে পড়তে হবে।

শিকারি কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলো নগর। নগরের অবস্থা বুঝে নিয়ে ঢুকে পড়লো অথিতিশালায়। তার চেহারায় আশ্চর্য এক আভা আছে। সেই উজ্জ্বলতা সবাইকে আকৃষ্ট করে। যেন বুঝিয়ে দেয় তিনি সাধারণ কেউ নন। অথিতিশালার মালিক সেই আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারলো না। কয়েকজন যা খদ্দের ছিল তাদের রেখে তার কাছে এগিয়ে এলো।

শিকারি স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলো, 'কী কী খাবার আছে তোমার এখানে?'

শিকারির গলায় কতৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। একজন ভবঘুরে শিকারি গলায় এত কতৃত্ব কীভাবে পেলো সেটাও বুঝতে পারলো না অতিথিশালার মালিক।

'রুটি, ক্ষীর, মিষ্টি, পায়েস।'

'আচ্ছা। সবই তো মিষ্টি জিনিস। কোনো ঝাল তরকারি নেই? রুটির সাথে ঝাল তরকারি খেতে ইচ্ছে করছে। থাকলে নিয়ে এসো। দই, মিষ্টি তারপর খাবো।'

অথিতিশালার মালিক সত্য বলতে দুবার চিন্তা করলো না, 'ঝাল তরকারি আছে। তবে আজকের না, কালকের। একটু বাসী হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। বাসী তরকারি যদি আপনি খেতে চান তাহলে দিতে পারি।'

'তাই নিয়ে এসো।'

খাবার পরিবেশন করা হলো। আগন্তুক শিকারির খাবার গ্রহণের মধ্যেও একটা আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। সেই দৃশ্য এবার কেবল অথিতিশালার মালিককে আকৃষ্ট করলো না, ভেতরে উপস্থিত সবাইকেই আকৃষ্ট করেছে। এক উৎসাহী আলাপী লোক এগিয়ে এসে আগন্তুক শিকারির সামনে এসে বসলো, 'আপনাকে তো এখানে আগে কখনো দেখিনি। আপনি এসেছেন কোত্থেকে? বাড়ি কোথায়?'

আগন্তুক জবাব দিলো না। সেটা অনিচ্ছার কারণে না-কি মুখে খাবার থাকার কারণে তা ঠিক বোঝা গেল না। সে একমনে খেয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর না

পেয়েও ঐ আলাপী লোকের উৎসাহে তেমন ভাটা পড়লো না, 'না, বলছিলাম কি, আমাদের এখানের শিকারিরা এভাবে অথিতিশালায় খায় না। তারা বেশির ভাগ সময়ে জঙ্গলে থাকে, জঙ্গল থেকেই খাবার সংগ্রহ করে। আপনাকে দেখে তো তেমন শিকারি বলে মনে হচ্ছে না। তাই জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না।'

এবার আর শিকারি চুপ থাকলো না। মুখে থাকা খাবারটুকু গিলে নিয়ে বলল, 'না কিছু মনে করবো কেন? আমি আসলে সাধারণ ব্যাধ নই।'

'তাহলে?'

'আমি রাজধানী প্রতিষ্ঠানা থেকে এসেছি। আমি রাজার শিকারি।'

উপস্থিত সবার কান এদিকেই ছিল। এই কথা কানে যেতেই সবার মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো। রাজার কানে তাহলে খবর পৌছে গেছে। তিনি শিকারি পাঠিয়েছেন তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচাতে।

এবার শিকারি কথা বলতে লাগলো, 'জীবনে অনেক বড়ো বড়ো শিকার করেছি আমি। তাই এই নরখাদকের খবর যখন পেলেন মহারাজ সাতকর্ণী, তখন আমাকে পাঠালেন তাকে মারতে। সেই কাজেই আমি এখানে এসেছি। এই নগরের নাম কী?'

স্বয়ং সাতবাহন সম্রাট মহারাজ সাতকর্ণী এই শিকারিকে পাঠিয়েছেন শুনে সবার মধ্যে সম্ভ্রম যেন অনেকটাই বেড়ে গেল উপস্থিত লোকজনের মধ্যে। তাদের চোখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান প্রদর্শিত হচ্ছে। আলাপী লোকটা সম্ভ্রমের সাথে উত্তর দিলো,

'আজ্ঞে, সোমগড়।'

'আচ্ছা, এই নগরে কি নরখাদক হানা দিয়েছে কখনো? এখানের লোকজনের চলাফেরা আর কাজ করার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, সবাই অনেক ভয়ে আছে। এই ভয় নিশ্চয়ই সেই নরখাদকের?'

'আজ্ঞে। তবে এই নগরে এখন পর্যন্ত নরখাদক হানা দেয়নি। তবে একটু কাছের জঙ্গলেই দুজন শিকারিকে মেরেছে সে। আশেপাশের অনেক বসতিতেও হামলা করে গবাদি আর মানুষ মেরেছে। এই বাঘ বড়োই ভয়ংকর।'

'আচ্ছা।'

'আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আপনি রাজার পাঠানো শিকারি। নিশ্চয়ই অনেক বড়ো শিকারি। তবে আমাদের এই এলাকায় দক্ষ শিকারি কম নেই। সেই বাঘা বাঘা শিকারির অনেকেই এই বাঘ মারতে গিয়েছিল, কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। তাই আপনাকে বলছি, এই নরখাদককে হালকাভাবে নেবেন না। একটু সতর্ক থাকবেন।'

'আচ্ছা, শিকারিরা দল বেঁধে কখনো চেষ্টা করে দেখেনি এই বাঘ মারতে?'

'নরখাদক মারার সম্মান আর অর্থ পাবার লোভে বেশির ভাগ শিকারি একাই চেষ্টা করেছিল। তবে কিছু কিছু শিকারির দলও চেষ্টা করেছিল। তবে তারা সেই বাঘের সন্ধানই পায়নি। খালি হাতে কিন্তু জীবিত ফিরে এসেছে।'

'আচ্ছা, দেখা যাক কী করা যায়।' শিকারি আবার খাবারে মন দিলো। একটু পরে খাবারের কিছু অংশ শেষ করে সামনের উৎসাহী লোকটার দিকে তাকালো শিকারি,

'আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, এই যে এত বাঘা বাঘা শিকারিরা একের পর এক চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবু বাঘটাকে মারতে পারছে না কেন?'

এবার উৎসাহী লোকটা একটু বিপদে পড়লো। বাচাল লোক হঠাৎ করে কথা বলার কোনো কিছু খুঁজে না পেলে অথৈ জলে পড়ে। লোকটা এই প্রশ্নের উত্তর জানে না। তবু মাথা চুলকে একটু কায়দা করে জবাব দিলো, 'সেটা তো এখানকার সবার কাছেই একটা বড়ো রহস্য। নরখাদক তো আর এবারই প্রথম না। আগেও এসেছিল। তবে আমাদের শিকারিরা ওগুলোকে সহজেই মেরে ফেলেছিল। এবার কেন যে কেউ পারছে না সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।'

তবে বাচাল লোকটাকে বাঁচিয়ে দিতে তার মনের গভীর থেকে একটা যুক্তি উঠে এসেছে। এই কথা নিয়েও তাদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে। সেই মোট এবার মুখ উজ্জ্বল করে দিলো সে, 'তবে এখানের পুরানো লোকেরা একটা কথা বলাবলি করছিল। মাঝে মাঝে অপদেবতারা না-কি মানুষের কোনো কাজে কুপিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন পশুর রূপ ধরে। তখন সেসব অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পারলেই একমাত্র বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমার মনে হয় শিকারি এই বাঘের কিছুই করতে পারবে না। এখানে লাগবে বড়োসড়ো এক তান্ত্রিক। একটা বড়ো করে যজ্ঞ অথবা পূজা করলে অপদেবতা শান্ত হবে। তখন দেখা যাবে বাঘ আর দেখা যাচ্ছে না।'

'আচ্ছা, প্রথমে একবার চেষ্টা করে দেখি। যদি ব্যর্থ হই তাহলে তোমার দেখানো পথেও হাঁটা যাবে। খুঁজে নেবো এক তান্ত্রিক।'

শিকারি খাওয়া শেষ করলেন বেশ আয়েশ করে। তাকে হাত ধোবার জল এগিয়ে দিতে এলো অথিতিশালার মালিক, 'আশা করি আমার খাবার খেয়ে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন ইচ্ছে করলে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। আমার এখানে পেছনের দিকে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা আছে। খুবই স্বল্প খরচ।'

'না, এখন আর আমার বিশ্রাম নেবার সময় নেই। যেই কাজে এসেছি তা শেষ করতে হবে। নাও, মুদ্রা গুণে নাও। আমার হিসেবে বেশিই দিয়েছি।'

অথিতিশালার মালিক বেশ সাবধানে গুনল মুদ্রাগুলো। গোণার পরে মুদ্রার পরিমাণ তার মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে তুলেছে।

মূল্য পরিশোধ করে অথিতিশালা থেকে বেরিয়ে এলেন মহারাজ সাতকর্ণী। শিকারির ছদ্মবেশে তিনি এসেছেন এই নগরে। এই দোকানে খেতে বসার মতো ভীষণ ক্ষিধে তার লেগেছিল এমন না, আসল উদ্দেশ্য ছিল খবর সংগ্রহ করা। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তবে সেসব খবরে পথের আলো যে খুব একটা উজ্জ্বল হয়েছে তা বলা যাবে না।

সোমগড় থেকে জংগল খুব একটা দূরে না। ছোটোবেলাতে যুদ্ধ কলা যখন তাকে শেখানো হয়েছিল তখন গুরুদেব ভুলে গিয়েছিলেন যে সে রাজপুত্র। সব রাজগুরুরাই ভুলে যায়। একজন ছাত্র হিসেবে তাকে সব বিদ্যে শিখিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধ কলার মধ্যে চিহ্ন অনুসরণ করার বিদ্যেও পড়ে। জঙ্গলে চিহ্ন আর লক্ষণ খুঁজে চলার বিদ্যে সেখান থেকেই শিখেছিলেন তিনি। এখন সেটাই কাজে লাগছে।

জঙ্গলে ঢুকেই নিজেকে শব্দহীন করে নিলেন তিনি। তবে তিনি জানেন যতই নিজেকে শব্দহীন করুন না কেন, আড়াল করুন না কেন, বাঘের সীমানায় প্রবেশ করা মাত্র বাঘ তাকে দেখতে পাবে। লুকিয়ে থাকা যাবে না। আর এই শব্দ ব্যবহার করেই নরখাদককে নিজের দিকে আনতে হবে। কাজটা যে খুব সহজ হবে তা নয়। যে বাঘ নরখাদক হয় তার বুদ্ধিও স্বাভাবিক বাঘের চেয়ে বেশি হয়। আর এই নরখাদক তো নরখাদকদের চেয়েও বুদ্ধিমান।

প্রথমে বাঘের চলার পথ খুঁজে বের করতে হবে তাকে। বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগলো তার চোখ। একবার বাঘের পথ খুঁজে পেলে এরপর আর তেমন কাজ নেই। সেই পথের কাছে অথবা সেই পথের অন্তে কোন জলধারার কাছে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। বাঘের সাথে তখন খেলতে হবে ধৈর্যের খেলা। সে খেলায় যে জিতবে সেই বেঁচে থাকবে।

ভাগ্য সহায় হলো তার। খুব বেশি খুঁজতে হলো না। জঙ্গলের ধারেই একটা ছোটো জলাশয়ের কাছে বাঘের তাজা পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। জায়গাটা বেশ ভালো করে নিরিখ করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। এখানে মনে হচ্ছে ফাঁদ পাতা যাবে। ফাঁদের কারিগরি দিকগুলো নিয়ে পরিকল্পনা করা শুরু করে দিলো ওনার মন।

চারিদিক পরীক্ষা করে অবশেষে সঠিক স্থান খুঁজে পেলেন তিনি। এখন অপেক্ষা করতে হবে রাতের জন্য। বাঘ সাধারণত রাতে বের হয়।

ফাঁদ তৈরি করার সব উপকরণই তার সাথে আছে। তিনি সেসব প্রাসাদ থেকেই নিয়ে এসেছেন। সন্ধ্যের কাছাকাছি সময় হতেই কাজে লেগে পড়লেন তিনি। আলো কমে আসছে জঙ্গলে। ফাঁদ বানানোর সাথে সাথে বাঘের আচমকা আক্রমণের ভয়ও একটু করছে তার।

ফাঁদ মূলত প্রাণীদের ধরা অথবা মারার জন্য বানানো হয়। সেখানে ফাঁদ প্রাণীর চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। তবে এখানের ফাঁদ বাঘ মারার জন্য তৈরি হচ্ছে না। তিনি আগুনের ব্যবস্থা করছেন।

সাধারণ নিশাচর প্রাণীরা আগুন বেশ ভয় পায়। বাঘও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে নরখাদক একটা কথা জানে আগুন মানেই মানুষের উপস্থিতি। তাই সে আগুনের দিকে বেশ আকৃষ্ট হয়। সেই আগুনের ফাঁদ পেতেই নরখাদককে টেনে আনতে হবে।

একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে চক্রাকারে বেশ কয়েকটা দীর্ঘস্থায়ী মশাল জ্বেলে দিলেন মহারজা সাতকর্ণী। তারপরের কাজ সোজা। আগে থেকে ঠিক করে রাখা জায়গায় লুকিয়ে বসে পড়লেন তিনি। জঙ্গলের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ হচ্ছে না। তবে সেসব যেন নীরবতাকে আরও জোরালো করছে। এখন ক্রমাগত শব্দ বলতে মশালে আগুন জলার চিড়চিড় আওয়াজ বাদে আর কোনো আওয়াজ তার কানে আসছে না।

এক মনে অপেক্ষা করছেন মহারাজ সাতকর্ণী। আজকের পাতা ফাঁদে বাঘ ধরা পড়বে কি না জানা নেই। পিছু হটা চলবে না। আজকে ধরা না পরলে কাল আবার জায়গা বুঝে পাততে হবে। তবে এই নরখাদক মারার কাজটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভালো। ওদিকে রাজধানীতে রাজ্যের কাজ পড়ে আছে।

বাঘের মনে কী ইচ্ছে কে জানে। তবে সেই চিন্তা যে মহারাজ সাতকর্ণীর চিন্তার সাথে খুব একটা পার্থক্য রাখে না তা একটু পরেই বোঝা গেল। নিঃশব্দ জঙ্গলে রাত্রির ঠিক প্রথম আর দ্বিতীয় প্রহরের সংযোগ স্থলে মহারাজ সাতকর্ণীর কানে একটা মৃদু শব্দ ধরা পড়লো। নরম থাবা থাকার কারণে অনেক ওজনের শরীর নিয়েও বাঘ শব্দহীন চলাচল করতে পারে। বাঘের উপস্থিতি বুঝতে হলে শুধু কান নয়, আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হবে। তিনি তা সজাগই রেখেছিলেন। আর তাই শুকনো পাতার ওপর হওয়া একেবারে মৃদু শব্দ তার সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে ঠিক ধরা পড়েছে। তিনি আগে থেকেই অনড় ছিলেন, এবার শ্বাস প্রশ্বাসের গতিও ধীর করে ফেললেন।

একেবারে হঠাৎ করেই তার দৃষ্টি সীমায় চলে এলো বাঘটা। মশালের আলোয় তার চকচকে শরীর স্পষ্ট দেখতে পেলেন মহারাজ সাতকর্ণী। বেশ বিশাল শরীর। শরীরের জায়গায় জায়গায় কিছু ছোটোখাটো আঘাতের চিহ্ন আছে। বোঝাই যাচ্ছে এসবই ঐ ব্যর্থ পরলোকগত শিকারিদের চেষ্টার ফসল। তবে সেসব আঘাত বাগের চলাচলে তেমন কোনো বাঁধা সৃষ্টি করতে পারছে না। রাজকীয় ভঙ্গিতে দুলে দুলে হাঁটছে।

দেখতে দেখতে বাঘটা চক্রাকারে সাজানো মশালের একেবারে মাঝখানে এসে স্থির হলো। চারিদিকে এখন ঘুরে ঘুরে নজর বোলাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে আগুনের দিকে তাকাচ্ছে জলজল করে। আগুনকে সে আর এখন ভয় করে না।

সাতকর্ণী বুঝতে পারলেন সময় হয়েছে। লুকানোর জায়গা থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন তিনি। হাতে দুমুখো ধারালো লম্বা বর্শা। বাঘ মারার জন্য এই অস্ত্রটার কোনো বিকল্প নেই। বেরিয়ে দাঁড়ালেন বাঘের একেবারে পেছনে।

পেছনে দাঁড়ালেও বাঘের দৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে পারলেন না তিনি। এসব নিশাচর প্রাণীদের চোখের ক্ষমতা অসাধারণ হয়। তারা চোখের কোণে মৃদু নড়াচড়াও ধরতে পারে। মহারাজের এই নড়াচড়া বাঘের চোখে ঠিক ধরা পড়লো। তড়িৎ গতিতে সে ঘুরে গেল একেবারে উল্টো দিকে। এবার মহারাজ সাতকর্ণী আর বাঘ মুখোমুখি। হাতের বর্শাটা শক্ত করে ধরলেন মহারাজ সাতকর্ণী। এখন তিনি পুরোপুরি তৈরি। এক মুহূর্তের জন্যও তার চোখ বাঘের ওপর থেকে সরছে না।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভাব্য শিকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে নিলো বাঘটা। দৃশ্যটা দেখে মহারাজ সাতকর্ণী অবাক না হয়ে পারলেন না। বাঘটাকে এখন মানুষের আদলের মনে হচ্ছে তার কাছে। অঙ্গভঙ্গি পুরো মানুষের মতোই। কে জানে হয়তো সে মানুষের মতো চিন্তা করতেও শিখে গেছে।

দুজন এখন মুখোমুখি, সম্পূর্ণ স্থির। মহারাজের নিঃশ্বাস যেন আটকে আছে। একটু পরেই নিশ্চিত হয়ে যাবে এই দুজনের কে শিকার ছিল আর কে শিকারি।

নিজের ক্ষমতার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস আছে মহারাজ সাতকর্ণীর। মশালের আলোয় চারিদিক আলোকিত। দেখতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না। ধারালো বর্শার একটা মোক্ষম আঘাত একবারে বাঘের ঠিক হৃদপিণ্ডে গেঁথে দিতে পারলেই নরখাদকের খেল খতম। তবে সেই সাথে এটাও দেখতে হবে বাঘ যেন তার গায়ে কোনো স্পর্শ করতে না পারে। বাঘে ছুলেই আঠারো ঘা। তাকে তখন আর সামনের যুদ্ধ করতে হবে না।

অপেক্ষা করছেন মহারাজ সাতকর্ণী। বাঘটা তার দিকে এগিয়ে আসছে না। এখনও তাকে পরখ করছে। তিনি জানেন আক্রমণ করলে চলবে না। বাঘকেই প্রথমে আক্রমণ করতে দিতে হবে। নিজে থেকে আক্রমণে গেলে বাঘের থাবার মধ্যে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। একবার সেই আওতায় পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

তখনই বাঘটার আচরণে একটু সন্দেহ হলো তার। বাঘটা তো এতক্ষণে তাকে আক্রমণ করার কথা। তা না করে এখনও তাকে নীরবে পর্যবেক্ষণ করছে কেন? নিজের জাগিয়ে রাখা অন্তর ইন্দ্রিয় তাকে বলে দিলো, কিছু একটা গোলমাল আছে, গোলমাল আছে। বিপদের ঘ্রাণ যেন ঝুলে আছে বাতাসে। তীব্র হয়ে।

তখনই নিজের ঠিক পেছনে একটা শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। শব্দের উৎসের দিকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর ভুল করলেন না তিনি। একটু কাত হয়ে আড়চোখে তাকালেন। আর তখনই এই অঞ্চলে পা দেবার পর যে রহস্যটা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, যে প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তার সমাধান হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন কেন এতোগুলো শিকারি প্রাণ দিয়েছে এই নরখাদকের হাতে।

আসলে এই অঞ্চলে একটা নয় দুটো বাঘ একসাথে নরখাদক হয়ে গেছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, দুই নরখাদকই এখানে একটা দল হয়ে কাজ করছে। কোনো শিকারি ধারণাই করতে পারবে না জোড়া নরখাদকের কথা।

বাঘ ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিলেন তিনি। তবে এখন তিনি নিজেই ধরা পড়ে গেছেন বাঘেদের ফাঁদে। নরখাদকদের একটা এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আরেকটা ঠিক পেছনে।

সব শিকারি কেন মারা গেছে তা বোঝা গেল। শিকারিরা আশা করে আসে একটা বাঘের, আর দেখা পায় দুই বাঘের। একটা বাঘ শিকারির মনোযোগ কেড়ে নেয়, অন্যদিক থেকে অপ্রস্তুত শিকারিকে আরেকটা বাঘ মেরে ফেলে। তিনিও একটু আগে এভাবেই মারা পড়তেন, তবে কপাল ভালো তার, পেছনে বাঘটা ভুলে একটা শব্দ করে বসেছিল।

এবারেও তার ব্যতিক্রম কিছু হবে না। এতদিন এই দুই বাঘ নর রক্তের স্বাদ পেয়ে আসছিল। শিকারিদের মেরেছিল। এবার তারা রাজ রক্তের স্বাদ পাবে। তাদের নাম বদলে যাবে। লোকে তাদেরকে আর নরখাদক বলবে না, বলবে রাজখাদক।

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে মহারাজ সাতকর্ণীর মাথায়। না, মাথা গরম করলে চলবে না। বাঘ দুটো এখন তাকে মাঝে রেখে চক্রাকারে ঘুরছে। দুটো বাঘই একেবারে নিখুঁত উল্টো অবস্থান বজায় রেখে হাঁটছে। একই সাথে দুটোর ওপরই নজর রাখতে পারছেন না তিনি। তার যুদ্ধ বিদ্যার শাস্ত্র মনে মনে উল্টে চলেছেন তিনি। খুঁজছেন এমন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একই সাথে দুটো বাঘকেই মারা যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেরকম কোনো পদ্ধতি মাথায় আসছে না। চিন্তা করার আর খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না। বাঘ দুটো ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশই ছোটো করে আনছে চক্র। মহারাজ সাতকর্ণী জানেন এরা তাকে যে-কোনো সময়ে আক্রমণ করবে। এবং একটা একটা করে নয়, দুটো বাঘ এক সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

না, কোনো উপায়ের কথাই মাথায় আসছে না। এখন কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। সেটাই নিলেন তিনি। ঐ কাজটাই করতে হবে। মৃত্যু এখন নিশ্চিত, তবে প্রাণকে একেবারে বিনা কাজে হারাতে নারাজ তিনি। তার প্রাণের বিনিময়ে তিনি এই অঞ্চলের প্রজাদের এই নরখাদকের হাত থেকে মুক্তি দেবেন।

দুটো বাঘকে তিনি মারতে পারবেন না। তবে একটা বাঘকে অবশ্যই মারতে পারবেন। বেঁচে থাকা বাঘের হাতে তিনি নিজে মারা পড়বেন নিশ্চিত। তবে তারপর আর একটা বাঘই বেঁচে থাকবে, আর এই দুই নরখাদকের বেঁচে থাকা সঙ্গীহীন বাঘটা এরপর আর শিকারিদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। একা বাঘকে যে-কোনো শিকারিই কায়দা করে ফেলতে পারবে।

দুটো বাঘ থেকে একটা বেছে নিলেন তিনি। আরেকটা বাঘের ওপর থেকে সরে গেল তার দৃষ্টি। বেছে নেয়ওা বাঘের হৃদপিণ্ডে এখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আর কোনোদিকেই তিনি এখন আর তাকাচ্ছেন না। লক্ষ্যে বর্শা বেঁধাতেই হবে।

তখনই দুটো বাঘ একসাথে তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিলো। চোখের পলক পড়ার সময় পেলো না। তবে মহারাজ সাতকর্ণী ছোটোবেলা থেকে শস্ত্র চর্চা করেন। তার প্রতিক্রিয়া হলো বেশ দ্রুত। আগে থেকে বেছে রাখা বাঘের হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে বর্শা হাঁকালেন তিনি।

তবে সেই বর্শা বাঘের গায়ে লাগলো না। দুটো বাঘ লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেছে। সেই শূন্যে ভাসা অবস্থাতেই দুটো বাঘেরই হৃদপিণ্ডে গেঁথে গেল ছুটে আসা দুটো তির। তিরের আকার বেশ ভীষণ। দুটো বাঘেরই বাড়িয়ে দেওয়া থাবা মহারাজকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার পায়ের কাছে পড়লো বাঘ দুটো। একেবারে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। মাটিতে পড়তেই বাঘের প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহারাজ সাতকর্ণী। তির দুটো যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকালেন তিনি।

অন্ধকারের ভেতর থেকে ধনুক হাতে এক তিরন্দাজ বেরিয়ে এলো। লম্বা, সুগঠিত শরীর। মাথায় কাপড় দিয়ে ফেট্টি বাঁধা আছে। তবে তার চোখ শান্ত। সেখানে কোনো উত্তেজনা নেই।

আচমকা উত্তেজনার পারদ নেমে যেতে মহারাজ সাতকর্ণীর মাথা একটু ঘুরে উঠলো। মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ মাটিতে বসে রইলেন মহারাজ সাতকর্ণী। ভাগ্যকে জীবনে কখনোই অত গুরুত্বের সাথে নেননি তিনি। কিন্তু আজ সেই ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতেই হচ্ছে। একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি।

পূর্ণ বয়স্ক দুটো বাঘ এখন তার দুই পাশে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। তির যে লোকটা ছুঁড়েছিল তাকে ঠিক শিকারি বলা যাবে না। শিকারিদের সাধারণ বেশভূষা নেই তার গায়ে। সাধারণ লোকের কাপড়চোপড় পরনে তার। লোকটা তার সামনে এসে ধনুকের গোঁড়া ঠেকাল মাটিতে, 'আপনি কি ঠিক আছেন?'

মহারাজ সাতকর্ণী সাহসী ক্ষত্রিয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার যুদ্ধের কিছু কিছু কৌশল মানুষের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে গেছে। তবে শুধু কৌশল দিয়ে জীবনে এত যুদ্ধ জয় করেননি। সাহসও তার বুকে বেশ পরিমাণেই আছে। যুদ্ধের ময়দানে তিনি এখন পর্যন্ত মৃত্যুকে বেশ কাছ থেকে দেখেছেন। বেশ কয়েকবার প্রতিপক্ষ তাকে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিল। তবে সেসব ক্ষেত্রে তার সামনে বাঁচার সুযোগ ছিল। প্রত্যেক বার নিজের যুদ্ধ ক্ষমতার প্রয়োগ করে সেসব বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। তবে আজকের কথা আলাদা। বাঁচার কোনোরকম সুযোগ ছাড়া নিশ্চিত মৃত্যু তিনি আজকের আগে আর দেখেননি।

তবে, সামলে নিতে খুব বেশি সময় নিলেন না তিনি, 'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। তবে আরেকটু হলেই যে আর ঠিক থাকতাম না, সে কথা না বললেই নয়।' বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সেই সাথে হাতে তুলে নিয়েছেন তার দুই দিক ধারালো ফলার বর্শা।

আগন্তুক তার উঠে দাঁড়ানোতে একটু আশ্বস্ত হলো। না, এখন আর লোকটার সাহায্যের দরকার নেই। এবার সে মন্তব্য করলো, 'আপনার ফাঁদ পাতার বুদ্ধিটা বেশ ভালো ছিল। জায়গাটাও বেশ ভালো। একটা বাঘ হলে আপনি সহজেই মেরে ফেলতে পারতেন।'

'হ্যাঁ, পারতাম। কিন্তু তুমি তো একসাথে দুটোকেই মেরে দিলে। তোমার সাথের আর লোকজন কোথায়? তাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

আগন্তুকের ভ্রূ কুঁচকে এলো, কথাটার মানে বুঝতে পারলো না সে, 'লোকজন? লোকজন আসবে কোত্থেকে?'

'তোমার সাথিদের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'আমার তো কোনো সাথি নেই। আমি এখানে একাই এসেছি।'

মহারাজ সাতকর্ণী চারপাশের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো। কই, ডাকো তোমার দলের অন্য লোকদের। তাদের সামনে আসতে বলো। এখন তো আর কোনো সমস্যা নেই। বাঘ তো মরেই গেছে।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি। আমার সাথে আর কেউ নেই। আপনার কেন মনে হচ্ছে আমার সাথে আরও লোক আছে?'

মহারাজ সাতকর্ণীর কণ্ঠে এবার সন্দেহ প্রকট হলো, 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, একটু আগে যা ঘটে গেছে তা তুমি একাই করেছো? দুটো বাঘের দিকে দুটো তির তুমি একাই ছুঁড়েছ?'

'হ্যাঁ, দুটো বাঘের দিকে তির আমি একাই ছুঁড়েছি। আপনার প্রাণ বাঁচানোর এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তুমি দুটো বাঘ না মারলে আমি এতক্ষণে মৃত পড়ে থাকতাম। তবে সেখানে আরেকটা প্রশ্ন যে থেকে যায়।'

'কী?'

'দুটো বাঘ আমার ঠিক দুই পাশে ছিল। তার মানে সাধারণ সূত্র বলে একটা বাঘের দিকে তীর ছোঁড়ার পর ধনুকে আরেকটা তির পরিয়ে তোমাকে আরেকটা বাঘের দিকে ধনুক স্থির করে দ্বিতীয় তীর চালাতে হয়েছিল। কিন্তু দুটো তির দুটো বাঘকে প্রায় একসাথেই বিদ্ধ করেছে। এটা অসম্ভব। এত তাড়াতাড়ি কোনো মানুষ, হোক সে সৈন্য কিংবা শিকারি, কিছুতেই তির পরানো আর লক্ষ্য স্থিরের কাজটা করতে পারবে না। তাই আমার এখনও মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি একা এই দুই তির ছোড়নি। তোমার সাথে একজন হলেও সাথি আছে। এবার বলো, তোমার সাথের সেই লোক অথবা লোকেরা কোথায়?'

আগন্তুক মৃদু হাসল, 'আমি আপনাকে মিথ্যে বলিনি। মানুষ মিথ্যে বলে যখন তারা কোনো লাভের আশা থাকে অথবা সংকট থেকে উত্তরণের আর কোনো উপায় না থাকে। এখানে আমার এই দুই কারণের কোনটার সাথেই যোগ নেই। মিথ্যে বলে তাই আমার কোনো লাভ নেই। আমিও আপনার মতো একাই এই বাঘের পেছনে এসেছিলাম।'

এবার মহারাজ সাতকর্ণী একটু রেগে গেলেন, তার মনে ভুলতে শুরু করে দিয়েছে সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সে একটু আগে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, 'না, তুমি মিথ্যে বলছ। কেন লুকাচ্ছ? তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে।' এবার মহারাজ সাতকর্ণী তার হাতের বর্শা বাগিয়ে ধরলেন আগন্তুকের দিকে। তার ভেতরের কৃতজ্ঞ সত্ত্বা সরে গিয়ে রাজ সত্ত্বা জেগে উঠেছে।

রুদ্রদেব অস্ত্র বাগিয়ে ধরা দেখতে পেলো। প্রতি আক্রমণে সেও অস্ত্র বাগিয়ে ধরল না। মানুষের মনের সন্দেহ অনেক কঠিন ব্যাপার। সন্দেহের প্রকৃত নিরসন কেবল একভাবেই করা সম্ভব। প্রমাণ দিয়ে। একমাত্র প্রমাণ দিতে পারলেই সন্দেহ দূর হয়।

সে শান্ত স্বরে বলল, 'আপনি বলেছেন তির দুটো প্রায় একই সময়ে বাঘ দুটোকে বিদ্ধ করেছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বলা এই বাক্য থেকে 'প্রায়' শব্দটা আপনাকে বাদ দিতে হবে মহাশয়। প্রায় নয়, তির দুটো একই সময়ে বাঘ দুটোকে বিদ্ধ করেছে। আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত, তির দুটো আমার ধনুক থেকে একই সময়ে ছেড়েছি আমি।'

এবার হাসার পালা মহারাজ সাতকর্ণীর, 'এটা তো আরও অসম্ভব। তুমি একই সাথে সম্পূর্ণ উল্টো দুই দিকে দুটো তীর একই ধনুক থেকে কীভাবে ছুঁড়তে পারো?'

'সেটাও পারা যায় মহাশয়। একজন দক্ষ তিরন্দাজ নিজের ধনুক থেকে একই সময়ে শুধু দুটো নয়, একই সাথে তিনটে, পাঁচটে এমনকি সাতটে তীরও আলাদা লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে দিতে পারেন।'

'কীভাবে?'

'এই ভাবে।' রুদ্রদেব বুঝতে পেরেছে এখানে শুধু বাক্যে কাজ হবে না। দর্শনে প্রমাণ দিতে হবে।

নিমেষে তূণ থেকে একই সাথে দুটো তীর ডান হাতের আঙুলের খেলায় তুলে নিলো সে। ধনুকে তীর পরানো হলো কোনোরকম প্রতিক্রিয়ার সময় না নিয়ে। তারপর তীর দুটো বিন্দুমাত্র সময় না নিয়েই ছুঁড়ে দিলো সে। সম্পূর্ণ উল্টো দিকে থাকা দুটো গাছের গায়ে বিঁধল সেই তির দুটো।

মহারাজ সাতকর্ণী পুরো ঘটনাটা বিস্ফোরিত চোখে প্রত্যক্ষ করলেন। তির দুটো যে দুই গাছে বিঁধেছে তার একটা তার ডান দিকে আরেকটা বাম দিকে। একটু আগে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল বাঘ দুটোর বেলায়। এবার তার চোখ থেকে সন্দেহ সরে গিয়ে জায়গা করে নিলো হতভম্ব দৃষ্টি। ঠিক যেন কোন জাদুকরের সবচেয়ে ভালো খেলাটা দেখেছেন তিনি।

রুদ্রদেবের কণ্ঠস্বর এখনও শান্ত, এত বড়ো শারীরিক কষ্টের কোনো লক্ষণ সেখানে নেই, 'দেখলেন তো, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। ঠিক এভাবেই একটু আগে আমি দুটো তির ছুঁড়েছিলাম।'

মহারাজ সাতকর্ণীর বিস্ময় এখনও কমেনি, তিনি বিস্ময় ভরা গলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'রুদ্রদেব।'

'তোমার তির ছোঁড়ার কৌশল দেখে মনে হচ্ছে তুমি অনেক বড়ো যোদ্ধা। এমন কৌশল আমি জীবনেও দেখিনি। এত ভালো যুদ্ধবিদ্যা জানা যোদ্ধার সম্মান সবাই করবে। তুমি নিশ্চয়ই রাজার সেনাদলে বড়ো কোনো পদে আছো।'

'না মহাশয়। রাজার সেনাদলের সাথে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। পেশায় একজন বনরক্ষক। এক কাঠমিস্ত্রির খাজনার বিনিময়ে পাওয়া বনের কাঠ আমি পাহারা দেই। জঙ্গলের ধারেই থাকি। জায়গাটা এখানে থেকে খুব বেশি দূরে নয়। একটা ছোটো কিন্তু শান্তিময় কুটির।'

'বনরক্ষক! তুমি বনরক্ষক! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। অবশ্য একটু আগেও তোমার কথা অবিশ্বাস করেছিলাম। তারপর যে খেল দেখালে। এখন আর তোমার কোনো কথাই অবিশ্বাস করার সাহস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আর নাই বা করলেন। আমার সাথে গেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। এই জঙ্গলে এসে আলোর ফাঁদ পেতেছেন আপনি। তারপর কষ্ট করে বাঘের জন্য অপেক্ষা করেছেন। শারীরিক আর মানসিক দুই পরিশ্রমই হয়েছে আপনার। আমি বলি কি, আপনি আজ রাতের মতো আমার কুটিরে আশ্রয় নিন।

খাবার আর বিশ্রামের যৎসামান্য ব্যবস্থা হয়তো আমি করতে পারবো। আপনার অসুবিধা হবে না।'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে এটাই আমার জন্য সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব। তবে আমাদের এখানে একটা কাজ এখনও বাকি আছে। সেটা শেষ করতে হবে।'

'হ্যাঁ। অসম্পূর্ণ কাজ রয়ে গেছে একটা। আর কাজটা শেষ করতে বেশি সময় লাগবে না। বাঘও দুটো, আমরাও দুজন।'

'হ্যাঁ। আমি তো বাঘ মারতে পারিনি। তবে এই কাজে তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। তবে অধিকারের প্রশ্ন যদি আসে তবে বাঘ দুটোকে তো তুমিই মেরেছ। শিকারের নিয়মানুযায়ী তুমিই পাবে চামড়া দুটো। তবে সেজন্য ভেবো না আমি তোমাকে সাহায্য করবো না। আমার স্বার্থেই আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে তত আগে খাবার আর বিশ্রামের কাছে যেতে পারবো আমরা।'

'সে আপনার উদারতা।'

আর কোনো কথা হলো না। দুজনেই কাজে লেগে পড়লো তারপর। অস্ত্রগুলোর ফলা যথেষ্ট ধারালো। তবে কসাইয়ের চামড়া ছাড়ানোর ছুরি তো আর তাদের কাছে নেই। অস্ত্রের ধারালো ফলায় বিশেষ কৌশলে চামড়া ছাড়াতে লাগলেন তারা। তেমন একটা অসুবিধা অবশ্য হচ্ছে না। দুজনেরই কাজের মূল বিষয়টা জানা আছে।

চামড়া ছাড়া বাঘ দুটোকে দেখতে বেশ বীভৎস লাগছে। এভাবে তো আর রেখে দেওয়া যায় না। মহারাজ সাতকর্ণী জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো কী করবে?'

'কি আর করবো। এভাবে তো আর রেখে দেওয়া যাবে না। পচে গন্ধ ছড়াবে। প্রকৃতির ক্ষতি হয় এমন কিছু করা যাবে না। আমি চিতা সাজিয়ে দুটো দেহ জ্বালিয়ে দেবো।'

রুদ্রদেব দেখতে দেখতে কুড়ানো আর কাটা কাঠ দিয়ে একটা চিতা সাজিয়ে নিলো। তারপর হলো বাঘের সৎকার।

দুটো চামড়া গুটিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন তারা। তাদের হাতে এখন শুধু একটা করে মশাল। বাকি মশালগুলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। একটু আগের আলো ঝলমল পরিবেশ এখন আর নেই। জঙ্গলের বাতাসে স্বস্তি ফুটে উঠেছে যেন। এই জঙ্গল থেকে বিদায় নিয়েছে মূর্তিমান আতঙ্ক।

রুদ্রদেবের কুটিরে যখন পৌছল দুজনে ততক্ষণে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে। রুদ্রদেব ভেবেছিল অসিত হয়তো ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু না, প্রথমবার ডাকতেই অসিতের সাড়া পাওয়া গেল।

রুদ্রদেবের গলার স্বর শুনে আর দেরি করলো না অসিত। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তৃতীয় ব্যক্তি আর তাদের দুজনের হাতেই বাঘের রক্তমাখা চামড়া দেখে একটু চমকে উঠলো সে। পরক্ষণেই স্বস্তি দেখা দিলো তার চেহারায়, 'যাক, বাঘ মারতে পেরেছেন তাহলে। কোনদিকে গিয়েছিলেন সেটা কিন্তু আমাকে বলে গেলে পারতেন। আমি তো ভাবছিলাম আপনার কিছু হয়ে গেলে আপনার খোঁজে কীভাবে যাবো।'

'থাক, এখন আর সেই চিন্তা করে কী হবে। দেখতেই তো পাচ্ছ আমার কিছু হয়নি। কিন্তু, তুমি এখনও ঘুমাওনি কেন? তুমি তো আর বাঘ মারতে যাওনি যে সারারাত জেগে থাকবে।'

'ভয় লাগছিল' অকপটে স্বীকার করলো অসিত।

'অস্বাভাবিক কিছু না। বাঘের কথায় ভয় লাগতেই পারে। তবে এখন আর বাঘের ভয় নেই।'

মহারাজ সাতকর্ণী ততক্ষণে ঘরে ঢুকেছেন। ঘরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি। বেশ সাধারণ অবস্থা, তবে গোছানো। আরেকটু দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলেন, 'এই ছেলে কে? এও কি তোমার মতোই বনরক্ষক?'

'না' জবাব দিলো রুদ্রদেব, 'ও বনরক্ষক না। আমার শিষ্য। আমাকে কাজে সাহায্য করে, আমি ওকে অস্ত্রবিদ্যা শেখাই।'

'বাহ, বেশ ভালো। তুমি যে মানের যোদ্ধা তাতে তোমার বিদ্যা অন্যের কাছে না দিয়ে গেলে ব্যাপারটা ঠিক ভালো দেখাবে না।'

ঘরের কোথাও দুটো বিছানা ছাড়া আলাদা করে বসার জন্য আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুই পাশের দুই মলিন শয্যা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। তারপর একটার ওপর আসন পেতে বসার উপক্রম করলেন।

এবার ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা। উনি বসার আগেই রুদ্রদেব প্রায় তেড়ে এলো, 'আরে কি করছেন আপনি। এখানে বসবেন না।'

চমকে উঠলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'কেন? এখানে আবার কী হলো?' অসিতও রুদ্রদেবের এই আচমকা আচরণে আশ্চর্য হলেও। ঘটনা কী?

রুদ্রদেব রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে, 'কারণ, আপনি এই আসনে বসলে একটা অনর্থ হবে। ভূমিতে পাতা আসনে সাতবাহন রাজ্যের সম্রাট সাতকর্ণী যদি বসেন তাতে রাজদণ্ডের চরম অপমান হয়। কোনো রাজা কখনো রাজা থাকা অবস্থায় ভূমি আসনে বসতে পারেন না। আমি আপনার জন্য এখুনি একটু উঁচু আসনের ব্যবস্থা করছি। যদি আপনার পরিচয় যা আপনি কাউকে জানাতে চাননি, তা না জানতাম তাহলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন তো তা আমি জেনে গেছি। জেনেশুনে তো আর অধর্ম করা চলে না।'

মহারাজ সাতকর্ণী বুঝলেন এই দক্ষ সৈনিকের তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। এই লোক কীভাবে বুঝতে পারলো? হয়তো আন্দাজ করেছে। ঢিল ছুঁড়েছে অন্ধকারে। তবে সেই ঢিল এসে একেবারে সঠিক লক্ষ্যে আঘাত করেছে, 'কী বলছো এসব? মহারাজ সাতকর্ণী মানে?'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমি অন্ধকারে ঢিল ছুড়িনি। আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম আপনার পরিচয়। তবে নিশ্চিত হতে একটু সময় লাগছিল। তাই পথে আর আপনাকে চমকে দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে চাইনি, ঠিক করেছিলাম ঘরে গিয়েই প্রশ্নের সমাধান করবো। অসিত যাও, বাইরে থেকে আমাদের বসার গাছের গুঁড়িটা নিয়ে এসো।'

হতবুদ্ধি অসিত আদেশ পালনে ব্রতী হলো। গাছের সমান করে কাটা গুঁড়ি এনে ঘরে রাখল সে। রুদ্রদেব সাদরে আপ্যায়ন করলো, 'এখানে বসুন মহারাজ। আমি দুঃখিত, এরচেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থা এখন আমার দ্বারা করা সম্ভব হচ্ছে না।'

মহারাজ সাতকর্ণী সেই গুঁড়ির ওপর বসলেন, 'তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে যে আমিই সাতবাহন সম্রাট সাতকর্ণী? আমি একজন শিকারির চেয়ে বেশি কিছুই নই।'

'আমি জানি এই অঞ্চলে আপনি ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছেন। আর এই শিকারির পরিচয়ই আপনি এখন পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন। তবে লোকেরা বাঘের ভয়ে কাবু হয়ে না থাকলে আপনাকে সঠিক পর্যবেক্ষণ করতে পারতো। তারা আপনার ছদ্মবেশ ধরে ফেলতে পারতো।'

'কী রকম ছদ্মবেশ?'

প্রথম ভুলটা করেছেন আপনি মশালের তেলের ব্যাপারে। আপনার মশালের তেল পুড়লে এক ধরনের সুঘ্রাণ বের হয়। জঙ্গলের সেই জ্বালানো মশালে সেই সুগন্ধ আমি অনেক দূর থেকেই টের পেয়েছিলাম। তেলে সুগন্ধ এলো কোত্থেকে? কোনো সাধারণ শিকারি তো নিজের মশাল জ্বালানোর কাজে এত দামি তেল ব্যবহার করবে না। এমন সুগন্ধি তেল কে ব্যবহার করে? বড়ো বড়ো রাজা মহারাজারা, বড়ো বণিকেরা নিজেদের প্রাসাদে এসব তেল ব্যবহার করে। তার মানে এই তেল নিশ্চয়ই কোনো বড়ো বণিকের প্রাসাদ অথবা রাজ ভবন থেকে এসেছে। তার মানে বোঝা গেল আপনি সাধারণ কোনো শিকারি নন। এই তেল যে নিয়ে এসেছে সেও ঐ বড়ো শ্রেণিরই লোক।'

'তুমি এখানে সঠিক আন্দাজ করেছ। তবে একটা সিদ্ধান্ত ভুল নিয়েছ। আমি রাজ ভবন থেকে এসেছি। এজন্যই আমার সাথে দামি তেল আছে। আমি মহারাজের নিজস্ব শিকারি। শুধু তেল নয়, আমি আমার সব উপকরণই রাজ ভবন থেকে নিয়ে এসেছি।'

'তা হতে পারে। হতে পারে আপনি রাজার নিজস্ব শিকারি। কিন্তু এখানে এই কথা বলে তো আপনি ফেঁসে গেলেন। আপনার শরীরের আঘাতগুলোর কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'আমার শরীরের আঘাত?'

'হ্যাঁ। এগুলো তো কোনমতেই শিকারির দেহের আঘাত নয়। অন্যরকম আঘাত।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, শিকারির দেহেও অনেক আঘাতের চিহ্ন থাকবে। কিন্তু এই আঘাত আসবে কোনো প্রাণীর আক্রমণের দরুন। অথবা জঙ্গলের গাছ পাথর থেকে। কিন্তু আপনার দেহে এমন অনেক আঘাতের চিহ্ন আছে যেগুলো অস্ত্রাঘাত। এবং সেগুলো সব একই সময়ের নয়। কিছু আঘাত তাজা, কিছু আঘাত আবার একদম মিলিয়ে গেছে। তাই সহজেই বলা যায়, আপনি কোনো শিকারি নন, বরং বহু সময়ে বহু যুদ্ধে অংশ নেওয়া কোনো যোদ্ধা। আপনার শরীরে তির, বর্শা, বল্লম সবকিছুরই আঘাতের চিহ্ন আছে।'

'ঠিক আছে। আমি যোদ্ধা। মেনে নিলাম। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি মহারাজ সাতকর্ণী। এই রাজ্যে এমন অনেক যোদ্ধা আছে যারা অনেক দিন থেকে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তাদের সবাই তো আর মরে যায়নি। অনেকেই

বেঁচে আছে। আর আমি তো রাজার দলের এমন কোনো সেনাও হতে পারি যাকে মহারাজ নরখাদক মারতে পাঠিয়েছেন।'

'তা হতে পারতো। কিন্তু তখন মহারাজ সাতকর্ণী এমন কোনো সেনা পাঠাতেন যে এই এলাকা বেশ ভালো করে চেনে। কিন্তু আমি আপনার ওপর বিকেল থেকেই নজর রেখেছিলাম। আপনি তো আর এই এলাকা ভালো করে চেনেন না। আর এমন কাজে সেনা একা আসে না। দল বেঁধে আসে।'

এবার আর মহারাজ সাতকর্ণীর মুখে কোনো কথা জোগাল না। মনে মনে যুক্তি খুঁজে যাচ্ছেন তিনি কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছেন না।

'আর আমি একটা কাজে আজ নগরে গিয়েছিলাম। সেখানে সাতবাহন রাজ বংশের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটা কথা শুনেও এসেছিলাম। এই বংশের রাজারা নাকি নরখাদক মারতে নিজেরাই আসেন। এতেই আমি বুঝে গেলাম আপনার আসল পরিচয়। আর আপনার ছদ্মবেশ আরেকটু পাকা হওয়া দরকার ছিল। আপনার এই নামের কাহিনিও আমি জানি। ছোটোবেলায় আপনার কান কোনো দুর্ঘটনায় টুকরো হয়ে যায়। বলা হয় সাত টুকরো। এজন্যই তো আপনার নাম সাতকর্ণী। আপনার কানের ঐ ক্ষত কিন্তু এখনও একটু একটু বোঝা যায়। দুটো কানে পার্থক্য আছে। তাই বলছিলাম, সোমগড়ের লোকজন যদি একটু ভালো করে খেয়াল করতো, তখনই ধরে ফেলত আপনার আসল পরিচয়।'

মহারাজ সাতকর্ণী হাসলেন। সেই হাসিতে রুদ্রদেবের যুক্তি মেনে নেওয়ার ছাপ স্পষ্ট। রুদ্রদেব এবার ঘুমানোর উদ্যোগ নিলো, 'মহারাজ আপনি যে-কোনো একটা শয্যা গ্রহণ করুন। আমি আর আমার শিষ্য আরেকটা শয্যায় ঘুমাবো।'

ঘুমানোর আগে পেটে কিছু না দিলেই নয়। রান্নার ঝামেলা আর এত রাতে করা গেল না। কিছু আগে থেকে এনে রাখা ফল আর ভাজা শস্য। তাই দিয়ে মহারাজ সাতকর্ণী বেশ তৃপ্তি নিয়ে আহার করলেন।

শয্যায় পিঠ পাতলেন মহারাজ সাতকর্ণী। মানুষের পেট যতক্ষণ খালি থাকে ততক্ষণ কেবল একটা সমস্যা থাকে। ক্ষিধে। আর ক্ষিধে মিটে গেলে দেখা দেয় অন্য হাজারো সমস্যা। মহারাজের মাথায় এখন আবার পুরো ভারতের রাজনীতির চিন্তা ফিরে এসেছে।

৬৬

পরদিনের সকাল অন্যসব সকালের মতো ছিল না। আজ আর রুদ্রদেব আর অসিত একা নেই। সাথে আছেন স্বয়ং এই রাজ্যের রাজা। এমনিতে না জানলে হতো, তবে জেনেশুনে তো আর বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বড়ো সম্রাটের সামনে স্বাভাবিক নড়াচড়া করা যায় না। মনের ভেতরে কোথা থেকে যেন একটা ইতস্তত ভাব চলেই আসে।

এমনিতে মহারাজ সাতকর্ণীকে বিলাসী রাজা বলা যাবে না। তিনি ছোটোবেলায় বেশ ভালোই শিক্ষা লাভ করেছিলেন পূর্বজদের কাছ থেকে। তারপরে যখন তার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা এলো তখন সেই ক্ষমতার স্রোতে তিনি ভেসে যাননি। কঠিন নিয়মগুলো তিনি বেশ ভালোভাবেই মেনে চলেন। রাজনীতির সেসব নিয়ম মানা বেশ কঠিন। শাস্ত্রে রাজাদের জন্য যেভাবে দৈনিক সময় ভাগ করে কাজ করতে বলা হয়েছে তিনি সেভাবেই কাজ করেন। রাজ্যের প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, গুপ্তচর, মন্ত্রণা সবই নিয়মে বাঁধা। সেই নিয়মেই বলা হয়েছে বেশ ভোরে ঘুম থেকে ওঠার কথা। তিনিও নিয়ম করে প্রতিদিন সূর্য ওঠা দেখেন প্রাসাদের ছাদে অথবা শয়ন কক্ষের বারান্দায় বসে।

তবে আজ মনে হয় ছদ্মবেশে থাকার কারণে তার সকালের অভ্যাসের একটু গরমিল হয়েছে। ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হলো তার। অবশ্য কাল রাতে ঘুমাতে যাবার আগেও নিয়ম মানা হয়নি। চোখ মেলে উজ্জ্বল আলো দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন তিনি। তার মনে পড়লো তিনি কোথায় আছেন। এখানে তাড়াহুড়া করে লাভ নেই। একটু আরাম দেওয়া যাক শরীরকে। এখানে কোনো মন্ত্রী মন্ত্রণা করার জন্য নেই, কোনো সেনাপতিকে নতুন অস্ত্র অথবা বাহনের নির্দেশও দিতে হবে না।

একটু আড়মোড়া ভেঙে বিছানার পাশে বসলেন তিনি। শয্যা পুরোপুরি ছাড়লেন না। পাশের বিছানার দিকে নজর পড়লো তার। খালি। তার মানে গৃহকর্তারা উঠে পড়েছে।

মহারাজ সাতকর্ণী বাইরে বেরিয়ে এলেন। রুদ্রদেব আর অসিতকে পাওয়া গেল উঠানেই। দুজনেই যে যার প্রাতঃ শরীর চর্চায় ব্যস্ত। তার দিকে দুজনের কারোই নজর পড়লো না। তাদের নজর আকর্ষণ করার চেষ্টাও করলেন না তিনি। এক পাশে দাঁড়িয়ে দুজনের চর্চা দেখতে লাগলেন তিনি।

অসিত এখন বড়ো ধনুক তোলা শিখে গেছে। বাহুতে শক্তি আর কৌশল দুইই চলে এসেছে। রুদ্রদেব এখন আর কৌশল শেখাচ্ছে না অসিতকে। এখন কেবল উৎসাহ দেবার পালা।

'তুমি পারবে অসিত। তোমার মন সেই ক্ষমতা অনেক আগেই অর্জন করে ফেলেছে। সেদিন যন্ত্রে বারোটা স্বর একেবারে সঠিক বাজিয়েছিলে তুমি। এবার কেবল তোমার মনের সাথে শরীরকে ঐকতানে নিয়ে আসতে হবে। আর এখানে বিশ্বাসই একমাত্র অস্ত্র। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি পারবে। নিজের আঙুলের সাথে কথা বলো। পূর্ণ মনোযোগ দাও।'

মহারাজ সাতকর্ণী স্পষ্ট শুনতে পেলেন কথাগুলো। অসিতকে রুদ্রদেব কী কাজ করতে বলছে তা তিনি ধরতে পারলেন না। পরিস্থিতির দিকে একটু গভীর মনোযোগ দিতেই অবশ্য বুঝতে পারলেন।

অসিত যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ঠিক বিশ হস্ত দূরে একটা কৃত্রিম গাছ বানানো হয়েছে। কাঠ দিয়ে নানা রকমের শাখাপ্রশাখা বানানো হয়েছে। সেই গাছের একটা ডালের ওপর বসে আছে একটা পাখি। না, জ্যান্ত নয়। ডাল আর লতা দিয়ে বানানো হয়েছে। তেমন যত্নের শিল্পকর্ম না হলেও পাখি বলে বেশ চেনা যাচ্ছে। সেই পাখির চোখ বানানো হয়েছে বেশ যত্ন করে। মহারাজ বেশ বুঝতে পারলেন, পাখিটার চোখই এখানে তীরন্দাজের লক্ষ্য।

অসিত ধনুকে তির পরালো। মহারাজ সাতকর্ণী এবার বেশ আগ্রহ অনুভব করছেন। তিনি নিজেও একজন দক্ষ তিরন্দাজ। তবে কাল তিরন্দাজির যে নমুনা তিনি দেখেছেন তাতে তার আগ্রহ বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

অসিতের দম বন্ধ হয়ে এসেছে। মহারাজ সাতকর্ণী প্রাতঃকর্মের আবেদন অনুভব করলেন কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না। চেয়ে রইলেন এক মনে। এই দূরত্ব থেকে পাখিটা একটা সহজ লক্ষ্য, কিন্তু পাখির চোখ নয়। অসিতের বয়সি ধনুর্ধরের জন্য তো কাজটা আরও কঠিন হবার কথা। দেখা যাক কী হয়। পরিণাম দেখার আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

অসিত লক্ষ্য স্থির করেই শ্বাস আটকে তির ছুঁড়ে দিলো। একেবারে নিখুঁত নিক্ষেপ। নিখুঁত পরাবৃত্তে ভ্রমণ করে লক্ষ্যে আঘাত করলো সেই তির। বিঁধেছে একেবারে চোখে।

মহারাজ সাতকর্ণী মনে বেশ পুলক অনুভব করলেন। তিনি এই জীবনে অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধা দেখেছেন, তিরন্দাজও নেহাত কম দেখেননি। তবে অসিতের বয়সি একটা ছেলেকে এভাবে তির ছুঁড়তে তিনি কখনো দেখেননি। এত কম বয়সে এই ছেলে এই ধনুর্বিদ্যা কীভাবে অর্জন করলো? প্রশংসাবাচক একটা বাক্য তার ঠোঁটের একেবারে আগায় চলে এসেছিল কিন্তু তারা আগেই রুদ্রদেবের প্রতিক্রিয়ায় স্তব্ধ হয়ে যেতে হলো তাকে।

রুদ্রদেব তখন বেশ বিরক্তি মাখা স্বরে ভৎসনা করে চলেছে অসিতকে, 'না, এইবারও পারলে না তুমি অসিত। নিজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখনও আসেনি তোমার। কী করবো আর। নিজেকে গুরু হিসেবে অযোগ্য মনে হচ্ছে।'

অসিত কিছু বলে না। এটা বেশ পুরানো নিয়ম। গুরু যখন তিরস্কার করবেন তখন সেসব বাক্যবাণ ছোঁড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকতে হয়।

'তোমাকে আমি বারবার বলছি, তোমার শরীর এখনও তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শরীর খুব বাজে প্রভু। যেদিন তোমার আত্মা তোমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেদিন তুমি তির ছুঁড়লে সে তির ঐ পাখির চোখে ঠিক বিঁধবে কিন্তু পাখিটা পড়ে যাবে না।'

'আমার মনে হয় না তোমার শিষ্য খুব একটা খারাপ করেছে। অন্তত এভাবে তিরস্কার সহ্য করা তার কোনোমতেই উচিত হচ্ছে না।' এবার আর কথা না বলে থাকতে পারলেন না মহারাজ সাতকর্ণী।

এতক্ষণ দুজনের কেউই মহারাজকে খেয়াল করেনি। এবার নজর পড়তেই দুজনে হাঁটু গেঁড়ে মহারাজকে সম্মান প্রদর্শন করলো।

'আরে এসব আবার কী? এসব এখন করতে হবে না। এখানে আমি অথিতি।'

'মহারাজ, আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর। এই রাজ্যে আমরা সবাইই বলতে গেলে আপনার অথিতি।'

'আচ্ছা, সে ঠিক আছে। আমি এতক্ষণ তোমাদের কাজ দেখছিলাম। ওকে এভাবে তিরস্কার না করলেও হতো।'

রুদ্রদেব হাসলো, 'খারাপের একটু আর বেশি হয় না মহারাজ। মানুষকে সব সময় ভালো করা চেষ্টা করে যেতে হয়। উন্নতির চেষ্টা থামিয়ে দেওয়ার মানেই কিন্তু মৃত্যু।'

'কিন্তু তুমি তোমার শিষ্যকে যা করতে বলছ তা তো কোনোমতেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। এরকম অসম্ভব একটা কাজের ভার শিষ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত হচ্ছে কি? এত দূর থেকে ঐ হালকা পাখির গায়ে তির লাগলে পাখি ঐ ডালের ওপর কোনোভাবেই বসে থাকতে পারবে না। পড়ে যাবেই।'

'না মহারাজ, পড়বে না। ঠিকমতো ছুঁড়তে পারলে তির লক্ষ্যে বিঁধবে ঠিক কিন্তু পড়বে না।'

'তাই না-কি। তাহলে তো একটু ঘটনাটা চোখে দেখতে হচ্ছে। তুমি একবার কাজটা করে দেখাও তো। তোমার শিষ্যও কাজটা একটু চোখের সামনে দেখুক। মুখের কথায় হয়তো সে বুঝতে পারছে না।' মহারাজ সাতকর্ণীর চোখে স্পষ্ট আহবান। একটু তাচ্ছিল্যের ভাবও আছে সেখানে।

মহারাজ সাতকর্ণীর চোখমুখের কোনো অনুভূতিই এড়িয়ে গেল না রুদ্রদেবের চোখ। অসিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। অসিত ধনুকটা হাতে দিলো।

ধনুকটা নিয়ে একটুও সময় নষ্ট করলো না রুদ্রদেব। তির পরিয়ে লক্ষ্য একবারেই ঠিক করে ছুঁড়ে দিলো। মাপ একেবারে সঠিক হয়েছে। পাখির একেবারে চোখে বিঁধল সেই তির। তবে সেই পাখি পড়ে গেল না। পড়া তো দূর, ডালের ওপর পাখিটা একটু নড়লও না।

অসিত এই দৃশ্য আগেও কয়েকবার দেখেছে। সে তেমন অবাক হলো না। তবে বিস্ময়ে মহারাজ সাতকর্ণীর চোখ একেবারে ছানাবড়া।

রুদ্রদেবের কাজ তখনো শেষ হয়নি। সে আলগোছে ধরে রেখেছে ধনুক, 'এখানে তির আমি খুব আস্তে ছুঁড়েছি। আপনি হয়তো ভাবছেন খুব আস্তে অর্ধবৃত্তাকার পথে তির চালিয়ে কাজটা করে আমি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছি, আপনাকে ধোঁকা দিয়েছি। তেমন কিছুই না আসলে। এবার এই কাজটা আমি তিরের জোরালো আঘাতে করবো।'

মহারাজের সাতকর্ণীর হতভম্ব ভাব তখনো কাটেনি। তাকে সেই সময়ও দিলো না রুদ্রদেব। এবার তির পরালও আরও দ্রুত গতিতে। ধনুকের ছিলা টেনে ধরল জোরে। শরীর টানটান হয়ে আছে তার। তারপর মুক্ত হলো জ্যা।

মহারাজ সাতকর্ণী দৃশ্যটা নিজের চোখেই দেখছেন তবু তার বিশ্বাস হচ্ছে না। এবার আর তিরটা আস্তে গেল না। চোখের অলক্ষ্যে তির গিয়ে আঘাত করলো পাখিকে। তবে পাখির চোখে বিঁধল না। চোখ এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফলাফল একই। পাখিটা স্থানচ্যুত হলো না।

এবার কাজ শেষ হয়েছে রুদ্রদেবের, 'দেখলেন তো মহারাজ, ধীর আর দ্রুত দুই উপায়েই কাজটা করা যায়। শিষ্যকে এতক্ষণ সেই শিক্ষাই দিচ্ছিলাম।'

অসিতের দিকে এবার ধনুক বাড়িয়ে দিলো সে, 'নাও, আবার চর্চা শুরু করো। হাত ব্যথা হওয়া পর্যন্ত করবে।' অসিত আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তবে তার আগে এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে যাওয়া পাখির চোখটা একটু ঠিক করে নিতে হয়েছে।

মহারাজ সাতকর্ণী ততক্ষণে অবশ্য ধাক্কা সামলে ফেলেছেন। একটু আগের তাচ্ছিল্যের কোনো ভাব এখন আর তার চেহারায় নেই। সেই চোখে এখন শুধুই মুগ্ধতা। তিনি একজন যোদ্ধা হিসেবে বুঝতে পারছেন তার সামনে এমন একজন দাঁড়িয়ে আছে যাকে অতুলনীয় বললেও কম বলা হবে। নিজেকে নিজে সামলে নিতে একটু ধীর গলায় বললেন তিনি, 'রাতে তো আসলে ক্লান্তির কারণে তেমন কিছুই খেতে পারিনি। খিধেটা ঠিকমতো লেগেছে এখন। পেটে কিছু না দিলে আর চলছে না। তবে তার আগে পেটের প্রাত্যহিক মোচড়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আপনার জন্য জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে। জল আর ক্ষার পাতার ব্যবস্থাও করে রেখেছি।'

কাজ শেষ করে মহারাজ সাতকর্ণী আবার উঠানে ফিরে এলেন। রুদ্রদেব তার অপেক্ষাতেই ছিল, 'মহারাজ, এবার তাহলে আহারের ব্যবস্থা করি। আমাদেরও সকালে খাওয়া হয়নি। অসিত তাহলে চর্চা করতে থাকুক। আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। এখানে মহারাজ আপনার একটু অসুবিধাই হবে। রাজমহলের মতো সুস্বাদু খাবারের আধিক্য তো আমাদের এই গরিব কুটিরে পাবেন না, তবে আশা করি কিছু তাজা ফল আর শস্য দিয়ে ভালোই কাজ চলে যাবে।'

'তাতে আমার কোনো সমস্যা হবে না। আমি যোদ্ধা, সবসময় তো রাজমহলের সুস্বাদু খাবারে অভ্যস্ত হলে চলে না। যুদ্ধস্থলে অনেক কঠিন সময় পার করেছি আমি। তবে এখন খাবার আনতে তুমি যেও না। অসিতকে বলো আনতে।'

রুদ্রদেব মহারাজ সাতকর্ণীর ইশারা বুঝতে পেরেছে। অসিতের দিকে তাকিয়ে গলা একটু চড়ালো সে, 'অসিত চর্চা বন্ধ রেখে একটু এদিকে এসো। যাও জঙ্গল থেকে কিছু তাজা ফল নিয়ে এসো। তারপর শস্য প্রস্তুত করবে। খাবার খাওয়া হলে আবার শুরু করবো আমরা।'

অসিত চলে যেতেই রুদ্রদেব মহারাজের দিকে তাকালেন, 'বলুন মহারাজ, মনে হচ্ছে আমার সাথে আপনার একান্ত কথা আছে।'

অসিতকে কেন খাবার আনতে পাঠাতে বলেছেন মহারাজ তা বুঝে ফেলেছে রুদ্রদেব। মহারাজ সাতকর্ণী পূর্ণ দৃষ্টিতে রুদ্রদেবের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা, তোমার আসল পরিচয় কী বলো তো।'

মৃদু হাসি রুদ্রদেবের মুখে, 'মহারাজ, আমি মিথ্যে বলি না, এটা বললে একরকম অহংকার করা হবে। তবে হ্যাঁ, আমি বিনা কারণে অবশ্যই মিথ্যে বলি না। আপনার এই প্রশ্নের জবাব তো আগেই দিয়েছি। এই যে পাশে একটি জঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন, সেই জঙ্গলের বেতনভুক্ত রক্ষক আমি। আপনি যদি তাও বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে চলুন আপনাকে আমার মালিকের কাছে নিয়ে যাই।'

মহারাজ সাতকর্ণীর চাপা স্বরে এবার ধৈর্যের মৃদু অভাব দেখা দিলো, 'তোমার সে উত্তর আমি আগেই শুনেছি। কিন্তু সেটা তো সত্যি না। তুমি কোনোভাবেই শুধু একজন বনরক্ষক হতে পারো না। কে তুমি?'

এবার আর রুদ্রদেব কোনো জবাব দিলো না। ক্রোধের পারদ চড়ালেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'শোনো, একজন বনরক্ষকের শস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান কতটুকু থাকে তা আমার জানা আছে। কোনোমতেই যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তাদের এত জ্ঞান থাকতে পারে না। দক্ষতা তো থাকতে পারেই না। তুমি আমার আসল পরিচয় জেনেও চুপ করে আছো। একজন রাজার কাছে তার রাজ্যে থেকে মিথ্যে বলা অথবা তথ্য গোপন করা রাজদ্রোহের শামিল। আর রাজদ্রোহের কী শাস্তি তা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়। এবার সত্যিটা বলো।'

'আমি সত্যি বলেছি মহারাজ। একজন বনরক্ষক ব্যতীত আমার অন্য কোনো পরিচয় নেই। এখন এই কথা বিশ্বাস করবেন কি করবেন না, তা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করছে। আর রাজদ্রোহের প্রমাণ না দিতে পারলে রাজাও তো রাজদ্রোহের শাস্তি দিতে পারেন না। আপনাকে এখানে প্রমাণ করতে হবে আমি মিথ্যে বলেছি। সেটা আপনি কীভাবে করবেন মহারাজ?'

প্রমাণ করার কঠিন পথে গেলেন না মহারাজ সাতকর্ণী। তিনি নিজের কৌতূহল বজায় রেখেছেন, 'তাহলে তুমি ধনুর্বিদ্যার এত জ্ঞান আর দক্ষতা লাভ করলে কোত্থেকে? রীতিমতো ধনুক নিয়ে সাধনা না করলে এই পর্যায়ের বিদ্যা লাভ করা সম্ভব নয়।'

'মহারাজ, ছোটোবেলা থেকেই আমার যুদ্ধকলার প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। গুরুও পেয়েছিলাম ভালো। তাই শুধু ধনুর্বিদ্যা না, যুদ্ধকলার সব দিক সম্পর্কেই অল্প বিস্তর জ্ঞান আমি লাভ করেছি। কিন্তু পূর্বে অর্জিত সেসব জ্ঞানের কারণে কিন্তু আমার বর্তমান পরিচয় একটুও বদলে যায়নি।'

'আমার বিশ্বাস হলো না। রাজ পরিবারের এবং রাজ পরিবারের অমাত্যদের বংশধরদের অতি যত্নে সেসব শিক্ষা করানো হয়। রাজ্যের সেরা সেরা শস্ত্র এবং শাস্ত্র গুরুরা তাদের শিক্ষা দেন। কিন্তু তারাও যুদ্ধকলায় তোমার মতো হতে পারে না। আমার মনে হয় তুমি কোনো আশ্চর্য দৈব উপায়ে ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা লাভ করেছ। কিন্তু সঠিক গুরুর কাছ থেকে গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করতে পারোনি। আর গুরুর কাছ থেকে পাঠ লাভ না করলে যুদ্ধকলার গভীর ব্যাপারগুলো কিন্তু তোমার অজানাই থেকে যাবে।'

রুদ্রদেব হাসল, 'তাহলে পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

'আচ্ছা। তার মানে বলতে চাইছ যুদ্ধের জ্ঞান তোমার আছে। তার মানে সম্মুখ যুদ্ধে সেনাদের ব্যূহ রচনা সম্পর্কেও তোমার অনেক জ্ঞান আছে। বেশ, তাহলে এবার উত্তর দাও। সর্বতোভদ্র ব্যূহে তিরন্দাজদের স্তর কোথায় রাখতে হয়?'

'মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর তো এভাবে দেওয়া যাবে না। এই প্রশ্নের উত্তর আরও অনেক নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে।'

এবার বিজয়ীর হাসি মহারাজ সাতকর্ণীর মুখে, 'না, আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঠিক। যুদ্ধ কলা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই। যুদ্ধ শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে সর্বতোভদ্র ব্যূহে তিরন্দাজদের সারি একেবারে সামনের দিকে রাখতে হয়।'

রুদ্রদেব এবার জবাব দিলো, 'মহারাজ, যুদ্ধকলায় শাস্ত্র নিয়ে একটা বিপদ আছে। শাস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধাটা এখানেই। শাস্ত্রে যা আছে তা সকলেই জানে।'

মহারাজ সাতকর্ণী কান খাড়া করলেন। এই কথা তিনি আগেও কোথাও শুনেছেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গিরিধারীও যুদ্ধ নিয়ে সেদিন এই সুরেই কথা বলেছিল।

রুদ্রদেব ওদিকে ব্যাখ্যা দিতে ব্যস্ত, 'শাস্ত্রের সব নিয়ম সবাই জানে। তার মানে সেসবের দুর্বলতাও নিশ্চিতভাবেই জানে।

শত্রুর ব্যূহকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যই সর্বতোভদ্র ব্যূহ তৈরি করা হয়। শত্রু যদি সংখ্যায় কম হয় তাহলে সে যে ব্যূহই গঠন করুক না কেন আপনি নিজের তৈরি সর্বতোভদ্র ব্যূহ দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলতে পারবেন। সেখানে তিরন্দাজ সামনে রাখলে সুবিধা পাবেন। কিন্তু এবার অন্য কথাও একটু ভাবুন। যদি শত্রুরা সংখ্যায় আপনার সমান অথবা আপনার চেয়ে বেশি হয়। আর সেই বেশি সৈন্য দিয়ে তারা যদি শকট, সর্প অথবা চক্র ব্যূহ তৈরি করে? তখন আপনি আপনার সর্বতোভদ্র ব্যূহ কীভাবে তৈরি করবেন?'

এবার মহারাজ সাতকর্ণী একটু থ মেরে গেলেন। জবাব খুঁজে পেলেন না তিনি, 'তখন ঐ ব্যূহ তৈরি না করে অন্য কোনো ব্যূহ তৈরি করবো।'

'এটাই তো মহারাজ সমস্যা। কিন্তু এবার একটু চিন্তা করুন। কম সৈন্য নিয়েও কিন্তু তখন আপনি সর্বতোভদ্র ব্যূহ তৈরি করতে পারবেন।'

'কীভাবে?'

'তাতে তিরন্দাজদের আর সামনের দিকে রাখলে চলবে না। তখন তির ছুঁড়তে হবে ভেতরের দিক থেকে। আর আপনার বল্লমধারী আর তলোয়ারধারী সৈন্যরা তখন থাকবে সামনের সারিতে।'

'কেন?'

'তখন আপনাকে সম্মুখ যুদ্ধে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়তে হবে সেই কারণে। প্রতিপক্ষ তখন ভয় না পেয়ে নিজের ব্যূহ দিয়ে আক্রমণ করবে। তখন তিরন্দাজ সামনে রাখলে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। আর তিরন্দাজরা তখন ব্যূহের কেন্দ্রে থেকে তির ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের সেনা ধ্বংস করবে। এটাই সর্বতোভদ্র ব্যূহের সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যবহার। আর এই ব্যবহার অবশ্যই শাস্ত্রে লেখা নেই।'

মহারাজ সাতকর্ণী কিছুক্ষণ সময় নিলেন রুদ্রদেবের বলা নতুন ব্যূহের ধারণা বুঝতে। পুরোটা বুঝতে পেরেছেন তিনি সেটা মনে হলো না, তবে একটা জিনিস

বোঝা যাচ্ছে, তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আসলে সাধারণ কেউ নয়, যুদ্ধের সব ধরনের জ্ঞান আছে তার। সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি।

এরপরে যে প্রশ্নটা তার মনে উঁকি দিলো সেটাই স্বাভাবিক। প্রশ্নটা করে বসলেন তিনি, 'আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। আচ্ছা, তোমার গুরুর নাম কী? কার কাছ থেকে তুমি এমন যুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো?'

'তাকে আপনি চিনবেন না মহারাজ। তিনি গত হয়েছেন। যদিও ভারতের এই পুণ্যভূমিতে তার মতো যুদ্ধ বিশারদ খুব কমই জন্মেছে।'

'অত বড়ো একজন যুদ্ধ বিশারদকে আমি চিনবো না কেন? নাম বলো, অবশ্যই চিনতে পারবো।'

'সে কথা থাক মহারাজ। নামে কিছুই আসে যায় না। তিনি তার সমস্ত জ্ঞান নিয়ে পঞ্চভূতে মিশে গেছেন। এই পৃথিবীতে গুরুত্ব কেবল তারই আছে যে বেঁচে আছে। আমার গুরুর জ্ঞানের কিঞ্চিত ছিটেফোঁটা আমার মধ্যে রয়ে গেছে। সেটাই এই মুহূর্তে আমার এবং এই পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

মহারাজ আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তখনই অসিতকে আসতে দেখা গেল। সে অনেক কষ্ট করেছে। বেছে বেছে বেশ ভালো কিছু ফল নিয়ে এসেছে। সেগুলো দুজনের সামনে নামিয়ে রেখে এবার শস্য প্রস্তুতে মন দিলো সে।

আলোচনায় ছেদ পড়েছে, আবার খাবারও চলে এসেছে। রুদ্রদেব খাবারের টুকরি বাড়িয়ে দিলো মহারাজের দিকে, 'খাবার চলে এসেছে মহারাজ। চলুন, আগে খেয়ে নেওয়া যাক। এমনিতেই আহারের সময় আজকে পেরিয়ে গেছে।'

মহারাজ সাতকর্ণী একটা তাজা ফল তুলে নিয়ে কামড় বসালেন। রসে ভরে গেল তার মুখ। তবে সেই রসের আস্বাদনে তার তেমন মন নেই। তার মাথায় এখন ঘুরছে অন্য চিন্তা।

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের রাজনীতির বেশ বড়ো খেলা চলছে এখন। আর রাজনীতির খেলা আজ হোক বা কাল হোক যুদ্ধের রূপ নেবেই। সে অনেক বড়ো যুদ্ধ হবে। আর সেখানে তার সেনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত।

সেই বড়ো যুদ্ধে তার রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

৬৭

উজ্জয়িনির আলোগুলো আজ যেন একটু বেশিই উজ্জ্বল। রাজ্যের ঐশ্বর্য যতই বাড়তে থাকে, মা লক্ষ্মীর আসন রাজ্যের কোষাগারে যতই পাকা হতে থাকে, ততই রাজধানীর চাকচিক্য বাড়ে। আর মশালের আলোও যেন বেড়ে যায়। সেটা তেলের গুণে নাকি কাঞ্চনের ঔজ্জ্বল্যে তা ঠিকমতো বোঝা যায় না।

এমনিতে পশ্চিম শক রাজ্যের রাজধানী দুটো। সবাই তাই জানে। তবে লোকে যা জানে আর যা মানে তা সবসময় এক হয় না। বারিগাজাকে রাজধানী বলা যায়। তবে উজ্জয়িনিই যে আসল রাজধানী তা নিয়ে কারোই তেমন কোনো সন্দেহ নেই। রঙ্গশালায় বারাঙ্গনা থাকতেই পারে, কিন্তু সে কখনোই অন্দরমহলের রাজ পালঙ্কের শয্যাসঙ্গিনী রানির মর্যাদা পায় না।

বারিগাজা বন্দর ব্যাবসার মৌসুমে চাকচিক্যে চমকে ওঠে। কিন্তু আসল কথা যদি বলতে হয় সেই নগর তো আসলে উজ্জয়িনির জন্য সম্পদ সংগ্রহ আর প্রবেশের দরজা হিসেবে কাজ করে। এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই লক্ষ্মীর কৃপা এই রাজ্যের ওপর পড়ছে। বারিগাজার সেই বিশেষ দরজা ততই যেন প্রশস্ত হচ্ছে। সাক্ষী হচ্ছে নতুন নতুন অংকের।

অতীতের সকল বাৎসরিক সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ এবারে ছাড়িয়ে গেছে। প্রবাদের ভাষায় হিসেব করে নয় বরং আক্ষরিক অর্থেই উজ্জয়িনির রাজকোষ যেন উপচে পড়ছে। রাজকোষে কিছু বিস্তার কাজ করছে কারিগরেরা। নতুন অর্জিত স্বর্ণের রক্ষণে কোষাগারের আয়তন বাড়াতে হবে।

মহারাজ নাহাপনার মুখে প্রসন্ন হাসি। ভাগ্য যখন মানুষের কপালে বসে হাসে তখন মানুষের মুখেও এমন হাসি থাকে। মৌসুম শেষে শেষ আরব জাহাজও ফিরে গেছে। গ্রীকরা ফিরে গেছে আগেই। কিছু মিসরীয় জাহাজ রয়ে গেছে, সেগুলো একেবারে পরের মৌসুমে যাবে। বারিগাজার বণিকেরাও ফিরে গেছে যে যার আবাসে। অর্থনীতির খেলা এই বছরের মতো শেষ করে এবার রাজনীতির হিসেব মেলাতে বসেছেন মহারাজ নাহাপনা।

মন্ত্রী তার ঠিক সামনেই আছেন। সারথীও এতদিন বাণিজ্য আর নানা অর্থের হিসেব মেলানর কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। এতদিনে তিনিও সুযোগ পেয়েছেন অভ্যন্তরে দৃষ্টি দেবার।

'মহারাজ, কলিঙ্গ রাজ দূত পাঠিয়েছেন।'

'আচ্ছা। কেন? ওদের মোতায়েন করা সেনার ওপর কোনো আক্রমণ হয়েছে না-কি?'

'না মহারাজ। তার পত্রে অসন্তোষের কথা লেখা আছে। কোনো কাজ না করে দীর্ঘদিন ধরে বসে থাকতে থাকতে তাদের সেনা না-কি এখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সেনাদের সাথে সাথে কলিঙ্গ রাজারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'মহারাজ আসাকার কাছে তো আমরা স্বর্ণ পৌছে দিয়েছি। স্বর্ণের পরিমাণ তো আমরা ঠিক করিনি। তিনি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেই পরিমাণেই তো দেওয়া হয়েছে। তাহলে এত তাড়াতাড়ি তাদের ধৈর্য কমে গেলে কেন?' মহারাজ নাহাপনা খবরটা শুনে তেমন একটা ঘাবড়ে গেছেন বলে মনে হলো না। তেমন গুরুত্ব দিলেন না তিনি।

'মহারাজ। কাঞ্চনের বৈশিষ্ট্যই এমন। পরিমাণে কোনো মানবকে সন্তুষ্ট করা যায় না।'

'তা ঠিক। সন্তুষ্ট হওয়া উচিতও নয়। সন্তুষ্টির পরেই মানুষের ধ্বংস আসে।'

'আমরা যে ওনাকে স্বর্ণ দিয়েছিলাম এজন্যই তিনি হয়তো সরাসরি কোনো কঠিন কথা বলতে পারেননি। তবে যথেষ্ট ধৈর্য ধরেছেন ওনারা। আমরাও ধরেছি। এবার সামনে এগোনো দরকার বলেই আমি মনে করি।'

'হ্যাঁ, এবার সামনে এগোতে হবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমরা কিন্তু কলিঙ্গ সেনাকে দিয়ে অমরাবতী আক্রমণ করাতে পারি। আমাদের একটা ইশারা পেলেই কলিঙ্গ সেনা অমরাবতীকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। আমাদের গুপ্ত খবর অনুযায়ী অমরাবতীর বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা সীমান্তের কোনো দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থার চেয়েও খারাপ।'

'শুনুন সারথী, অমরাবতীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া আমার লক্ষ্য নয়। একটা মৃত প্রায় নগরী, ভূতপূর্ব রাজধানী, যাকে রাজা ত্যাগ করেছেন, মহারাজ সাতকর্ণীর সেই নগরের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সেই নগরী অধিকার অথবা ধ্বংস করে ইতিহাসে বীর হিসেবেও নাম লেখান যাবে না, তেমন কোনো সম্পদও অধিকার করা যাবে না। তার মানে আমার তাতে তেমন কোনো লাভ নেই। আমাদের মূল লক্ষ্য সাতকর্ণী।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আমাদেরকে সেই সাপের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে যার ছোবল দেবার ইচ্ছে না থাকলেও দংশন করার ক্ষমতা পুরোপুরি আছে।'

'জি মহারাজ। কিন্তু এখন কলিঙ্গের সেনার প্রতি আমাদের নির্দেশ কী হবে? ওদেরকে তাহলে কলিঙ্গে ফেরত আসতে বলে দেই? এখন আমরা উজ্জয়িনিতে ফিরে এসেছি। মহারাজ সাতকর্ণী এখন আর আমাদের আক্রমণ করার সাহস করবেন না। কলিঙ্গের সেনার পেছনে মোটা অংকের স্বর্ণ খরচ করে সাতবাহনকে ব্যস্ত রাখার এখন তো আর কোনো দরকার নেই।'

'প্রথমে আমার সেরকমই পরিকল্পনা ছিল। আপনি তো তা জানেনেই। তবে এখন সেই পরিকল্পনাতে আমি একটু পরিবর্তন করেছি। সেই পরিকল্পনা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করছি পরে। এখন বলুন দক্ষিণ ভারতের কী অবস্থা? ওখানে তো শুনেছিলাম জল আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে উঠছিল।'

'দক্ষিণ ভারতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে মহারাজ। ওরা তিন বড়ো রাজ্য মিলেমিশে যুদ্ধ করেছে। সে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের গুপ্তচর সেরকমই খবর দিয়েছে।'

'হঠাৎ করে এমন যুদ্ধ হলো কেন দক্ষিণ ভারতে?'

'আচমকা হয়েছে সেটা বলা যাবে না। অনেকদিন ধরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ছিল। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সবাই। চোলা রাজা কারিকালা তরুণ বয়সে রাজা হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল আর গৃহযুদ্ধে তাকে অংশও নিতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটু দুর্বল ছিলেন। তখনই চেরা আর পাণ্ড্য মিলে তাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে। আমাদের গুপ্তচরেরা খবর পাঠিয়েছে, এই আক্রমণ এমনিতে হয়নি। অনেকবার চেরা আর পাণ্ড্যের মধ্যে দূতের বিনিময় হয়েছিল। ঠিকমতো গুছিয়ে নিয়েই তারা নেমেছিল মাঠে।'

'দুই রাজ্য মিলে এক রাজ্যকে আক্রমনণ করেছে। তার ওপর সেই একাকী রাজা ছিলেন দুর্বল। যুদ্ধের ফলাফল তো সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ মহারাজ, এই যুদ্ধের ফল সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু মহারাজ যুদ্ধের ময়দানে যা হয়েছে তা একেবারে অবিশ্বাস্য। সেই দুই রাজ্যের মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে জিতে গেছেন মহারাজ কারিকালা। আমাদের গুপ্তচরদের প্রশংসা করতেই হয়। তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের প্রতিটা ধাপের দিকে পূর্ণ নজর রেখেছিল। তাদের কাছেই শুনলাম সেই আশ্চর্য ঘটনা।'

'আচ্ছা। মহারাজ কারিকালা অসম যুদ্ধে জিতে গেলেন কী করে?'

'একেবারে শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চিত হারার পথেই ছিলেন মহারাজ কারিকালা। তারপর হলো ভোজবাজি। হঠাৎ করে কারিকালার সেনা সংখ্যা বেড়ে গেল। সেই বাড়তি সেনা আক্রমণ করলো চেরাদের একেবারে পেছনে। দুই দিকের দুই বাহিনীর আক্রমণ চেরা বাহিনী সামলাতে পারেনি। হেরে গেছে।'

এবার কিন্তু চিন্তার রেখা দেখা দিলো মহারাজ নাহাপনার চেহারায়, 'আচমকা বাড়তি সৈন্য এসেছে! কিন্তু চোলারা এই বাড়তি সেনা পেলো কোথায়?'

'তা আমাদের গুপ্তচরেরা ধরতে পারেনি মহারাজ। তবে আমি যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হয়েছে, এই যে গোপন বাহিনীর চমক এটা মহারাজ কারিকালা যুদ্ধের বিশেষ সময়ের জন্য বাকি রেখেছিলেন। নিজের সেনার একটা অংশকে আগেই আলাদা করে রেখেছিলেন। তারপর সুযোগ বুঝে সেই বাহিনী পেছন থেকে আক্রমণ করলো শত্রুকে।'

'না সারথী' মহারাজ নাহাপনা মাথা নাড়লেন, 'ব্যাপারটা অত সহজ মনে হচ্ছে না। যুদ্ধ নিয়ে তো আর কম ঘেঁটে দেখিনি। এরকম দ্বিমুখী আক্রমণের চিন্তা করবে যে পক্ষের সেনাবল বেশি তারা। যার সেনাবল কম সে কিছুতেই সেনা দুই ভাগে ভাগ করার বিলাসিতা করবে না। এখানে অন্য কোনো কিন্তু আছে।'

'মহারাজ, হয়তো কারিকালা এই সেনাদল আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলেন।'

'না, তাও যুক্তির সাথে যায় না। গুপ্তচরদের খবর অনুযায়ী প্রতিপক্ষ বেশ খোঁজখবর নিয়েই আক্রমণ করেছিল চোলা রাজ্য। তার মানে তারা চোলা রাজ্যের সৈন্য বল সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত ছিল। সেই কারণেই জয়ের নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা করেই যুদ্ধে নামতে পেরেছিল তারা। এতো পাকা হিসাব যে করে তাকে হিসেবের খেলায় আটকে দেওয়া সম্ভব না। এখানে সেনাদল দুই ভাগ করে দিলে সাথে সাথে প্রতিপক্ষের চোখে পড়ে যাবে। এসব জায়গায় কাউকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। যদি না'

'যদি কী মহারাজ?'

'যদি না বাইরে থেকে কেউ আচমকা চোলা রাজা কারিকালাকে সাহায্য না করে থাকে।'

এবার একটু একটু বুঝতে পারলেন সারথী, 'আপনি কী বোঝাতে চাইছেন মহারাজ?'

'আমার ধারণা, আমরা এখন বেশ জটিল একটা সময় পার করছি। এই ভূখণ্ডে এখন কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনার অবশ্যই যোগ থাকবে। আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।'

'আমরা সতর্কই আছি মহারাজ।'

'তাহলে তার নমুনা দেখান। আমাদের যেসব গুপ্তচর সাতবাহনে আছে তারা দক্ষিণের যুদ্ধ সম্পর্কে কী খবর দিয়েছে? দক্ষিণের এই যুদ্ধে কি সাতবাহন সাম্রাজ্যের কোনো হাত অথবা ইন্দন ছিল?'

'মহারাজ, আমি সবসময় সাতবাহনে শক্তিশালী গুপ্তচর ব্যবস্থা বজায় রেখেছি। আমি তাদের থেকে নানা খবর পেয়েছি। তবে আপনি তো আগে থেকেই জানেন, দক্ষিণ ভারত এই আর্যাবর্তের অংশ হলেও তা কেবলই ভূমির সংযোগে। তাদের চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আলাদা। তারা এই আর্যাবর্তের অংশ হলেও স্বতন্ত্র। দক্ষিণ ভারতের তিন বড়ো রাজ্যের সম্রাট নিজেদের মধ্যে যতই ঘৃণার চাষ করুন না কেন, বাইরের কাউকে তাদের অঞ্চলে নাক গলাতে দেন না। প্রাচীন সেই স্বতন্ত্রতা বজায়ে তারা কোনো ছাড় দেন না। তাই সাতবাহন যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা ঐ বলয়ে ঢুকতে পারবে না।'

'সাতবাহন কি ঢুকতে চেষ্টা করেছিল?'

'আমাদের গুপ্তচরদের সংবাদ অনুযায়ী, হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিল। তবে সুবিধা করতে পারেননি। সাতবাহন থেকে সেনা পাঠানোর কোনো খবর আমাদের গুপ্তচরেরা পায়নি। আর আমাদের গুপ্তচরদের ফাঁকি দিয়ে বড়ো বাহিনী একটা রাজ্যের ভেতরে নড়াচড়া করানো অসম্ভব।'

'অপরিবর্তনীয় কোনো কিছুই পৃথিবীতে নেই সারথী। যুধিষ্টিরের সাথে ধর্মরাজের সেই কথোপকথনের কথাটা মনে আছে তো?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'সেখানে কিন্তু তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বদলায় মানুষের মন। বিভিন্ন কারণে হতে পারে এই বদল। কখনো ভয় পেয়ে বদলে যায়, কখনো লোভে, কখনো প্রতিশোধের বাসনায়। মানুষের মনকে ধ্রুব ধরে নিলে শেষে ভীষণ ঠকতে হয় সারথী, আর সেখানেই জীবনের সবচেয়ে বড়ো হারের অভিজ্ঞতা হয় মানুষের।'

'সে জন্যই মহারাজ আমি ধ্রুব ব্যাপারের পেছনেও গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছিলাম। আগেই তো বলেছি মহারাজ, সাতবাহন চেষ্টা করেছিল। ওদের নতুন মহামন্ত্রী গিরিধারী স্বয়ং কয়েকবার চোলা রাজ্যে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, আমি জানতাম, এই টালমাটাল সময়ের সুবিধা তারা নিতে চাইবেই।'

'সাতবাহন মন্ত্রী গিরিধারী নিশ্চয়ই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন চোলা রাজা কারিকালার দিকে। তবে তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'দেখলেন তো। শত্রু এখানেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। চিন্তায়। আমরা এদিকে দক্ষিণ ভারতের ভাতৃত্ব আর স্বতন্ত্রতাকে আমাদের ঢাল হিসেব করে বসে আছি। শত্রু কিন্তু তা করছে না। তারা ক্রমাগত পরিবর্তনের চেষ্টা অরে যাচ্ছে। আর একবার চেষ্টা করার মানে হচ্ছে আরও অনেকবার করবে। এখন বলুন, শত্রু কি তাদের চেষ্টায় একটুও সফল হয়নি? সাহায্য কি শুধু সেনা দিয়েই করতে হয়, না, অন্যভাবেও করা যায়। চোলা রাজা কারিকালার সাথে সাতবাহনের কি কোনোরকমের চুক্তি হয়েছে?'

এবার বিজয় আর আত্মতুষ্টির হাসি একসাথে হাসলেন মন্ত্রী সারথী, 'না মহারাজ, সেই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। দক্ষিণ ভারত তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সাতবাহন থেকে মহারাজ কারিকালা কোনো ধরনের সাহায্যই গ্রহণ করেননি। সাতবাহন থেকে চোলাতে সেনা তো বটেই, কোন শস্ত্র, স্বর্ণ, শস্যও যায়নি। সীমান্তে আমাদের গুপ্তচরদের কড়া নজর ছিল। তাই এই ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'আচ্ছা। এখন পর্যন্ত তাহলে আমাদের অবস্থা ভালো। তবে ঢিল দিলে চলবে না। সাতবাহন রাজ্যে আমাদের গুপ্তচরদের আরও করিৎকর্মা হতে বলুন। তাদের প্রত্যেকটা নড়াচড়ার খবর আমার চাই।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'এবার আসুন কলিঙ্গের প্রসঙ্গে। কী যেন বলছিলেন?'

'কলিঙ্গ রাজা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তিনি নিশ্চয়ই আরও স্বর্ণ চান।'

'তাকে তাই দেওয়া হবে। কলিঙ্গের রাজার কাছে দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আগে আমরা সাতবাহন রাজধানী অমরাবতী অবরোধ করার জন্য তাদেরকে স্বর্ণ দিয়েছিলাম। এবার তাদের জিজ্ঞেস করুন, অবরোধ নয়, আক্রমণের জন্য তারা কতো স্বর্ণ চায়।'

'আক্রমণ!' সারথী অবাক হলেন, 'কলিঙ্গের সেনা আবার কোথায় আক্রমণ করবে?'

'আর কোথায়? অবশ্যই সাতবাহন রাজধানী অমরাবতীতে।'

'মহারাজ, এটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয় আমাদের আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত।'

'আমি সতর্কই আছি। শুনুন সারথী, বিষধর সাপের হাত থেকে বাঁচার দুটো উপায় আছে। যে জায়গায় সেই সর্পের বাস সেখানে বেশ সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। আর যতই আমরা সাবধান হবো ততই আমাদের মধ্যে আতঙ্ক দানা বাঁধতে থাকবে। আতঙ্কের মধ্যে থেকে এই ঐশ্বর্য আমরা ভোগ করতে পারবো না। তাই এই পথ বাদ।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়টাই সবচেয়ে ভালো। সাপটাকে খুঁজে মেরে ফেলতে হবে। তাহলে নিশ্চিন্ত মনে পথে হাঁটা যাবে। মনে কাঁটা নিয়ে এই অতুল ঐশ্বর্য আমার কাছে বিষের মতো মনে হচ্ছে। আগামী বাণিজ্যিক মৌসুম আমাদের জন্য আরও সাফল্য বয়ে আনবে। আর সেই সাফল্য পাবার আগেই আমি এই কালসর্প বধ করতে চাই।'

'কিন্তু মহারাজ, দ্বিতীয় উপায় ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বিষধর সর্প বধ করতে গেলে ছোবল খাবার একটা সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়, তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আপনার সিদ্ধান্তের ওপর আমি কোনো কথা বলবো না। আপনার রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য আমরা এখন এমন জায়গায় এসে পৌছেছি, যেখানে সিদ্ধান্তটা

আপনাকেই নিতে হবে। আমি অতি সত্বর কলিঙ্গরাজ আসাকার কাছে দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

'হ্যাঁ, তাই করুন। দক্ষিণ ভারতের কথা মনে করে আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা ভুলের কথাও আমার মনে পড়ছে।'

'কী ভুল মহারাজ?'

'শকরা যুদ্ধবাজ জাতি। পশ্চিম দিকের পারস্য থেকে কম সংগ্রাম করে আমরা এই ভূখণ্ডে আসিনি। তবে এখানে এসে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানের সংস্কার গ্রহণ করেছে, ধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা এই ভূখণ্ডের রত্নরাজির অধিকার পেয়ে হয়ে গেছি ব্যবসায়ী। আমাদের যুদ্ধের রক্তের বৈশিষ্ট্য ভুলে গেছি। সেটাই উচিত হয়নি। আমরা যুদ্ধের ঐক্যে বাঁধা থাকলে ঐ দক্ষিণ ভারতের তিন রাজ্যের মতো আমরাও স্বতন্ত্র থাকতাম। কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারতো না।'

সারথী এবার কোনো কথা বললেন না। মহারাজের পূর্বপুরুষদের আলোচনার মধ্যে কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

দরজায় একটা মৃদু আওয়াজ হলো। সারথী সেদিকে চাইলেন। মহারাজের মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। তিনি আগেই জানতেন কেউ আসবে।

আলোচনা সভায় প্রবেশ করলো এক যুবক। বেশ লম্বা, শক্তসমর্থ। মুখে একটা কৌতুক মাখা মৃদু হাসি সবসময় ঝুলে থাকে তার। তবে ধারণা করারও উপায় নেই, এই হাসি মুখের পেছনে আসলে একটা হিসেবি সত্ত্বা বাস করে। এই বিচক্ষণ যুবকের নাম ঋষভদত্ত। সে মহারাজ নাহাপনার জামাতা।

'এসো।' মহারাজ বললেন, 'কাজকর্ম সব গোছানো হয়েছে?'

উজ্জয়িনিতে এই মৌসুমের ব্যাবসার উপসংহার টানার কাজ করছিল সে, 'আজ্ঞে, রাজকোষে সব হিসেব করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই মৌসুমের আয়ব্যায়ের হিসেবও করে ফেলেছি। যেসব নতুন খনি থেকে আমরা এই বছর রত্ন উত্তোলন করা শুরু করেছি সেগুলোর হিসেব আলাদা করে লিখে রেখেছি।'

'বাহ, বেশ। এবার তাহলে ব্যবসায়ী থেকে যোদ্ধা হবার পালা এসেছে।'

ঋষভদত্ত কথাটা বুঝতে পারলো না। কিছু না বলে আদেশের অপেক্ষায় নিচু মুখে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

'এখন তুমি ব্যাবসার চিন্তা মাথা থেকে পুরোপুরি দূর করে দাও। বারবারিকন আমার সাথে যে চুক্তি করেছিল তার প্রয়োগ করার এখনই সময়। তাদের কাছে প্রতিশ্রুত সেনা চাইতে যেতে হবে। তুমি কালকেই যাও, সেই সেনাদল নিয়ে এসো। আমি রাজ্যের বাইরে যুদ্ধযাত্রা করবো। আর সেই সময়ে এই সেনাদল নিয়ে তুমি উজ্জয়িনি রক্ষা করবে। বুঝতে পেরেছ?'

'আজ্ঞে। আমি কালকেই বারবারিকনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো।'

দুজনকেই কাজ বোঝানো হয়ে গেছে। ইশারা করতেই দুজনে ত্যাগ করলো আলোচনা স্থান। এখন একা বসে আছেন মহারাজ নাহাপনা। সব ব্যাপার গোছানোই আছে, কেবল একটা খচখচানি মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছেন না তিনি। চোলা রাজা কারিকালা শেষ সময়ে আক্রমণ করার জন্য দ্বিতীয় সেনাদল কোথায় পেয়েছিলেন?

বয়সে আর পদে ছোটো হলে সবসময় কায়িক পরিশ্রম ঐ ব্যক্তিকেই করতে হয়। এটাই সমাজের আদি নিয়ম। এখানে তিনজন বর্তমান আছেন। একজন তো মহারাজ, তার কথা বলাই বাহুল্য। রুদ্রদেব গুরু, সেও পদে ওপরে। বাকি রইলো অসিত। তাকেই করতে হচ্ছে প্রাত্যহিক কাজগুলো।

এখন তার ওপর ভার পড়েছে দুপুরের খাবার জোগাড় করার। রুদ্রদেবের শিক্ষায় এরই মধ্যে জঙ্গল সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছে সে। জঙ্গলের কোথায় কী পাওয়া যাবে সেটা তার মোটামুটি মুখস্ত হয়ে গেছে।

গত কিছুদিন ধরে রুদ্রদেবের বেঁধে দেওয়া নিয়মানুযায়ী চলছে সে। শস্ত্র শিক্ষা, নৃত্য, সংগীত- ঘুমের আর খাবার সময় বাদে সারাদিন একই কাজ। যতই আগ্রহের কাজ হোক না কেন, এসবে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক। তারও এসেছিল। তারপরে এলো বৈচিত্র্য। এই অঞ্চলে বেরোল বাঘ। রুদ্রদেব গেল সেই বাঘ মারতে।

তারপর একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেই চলেছে। সেসব ঘটনা বিরক্তি খুব সহজেই দূর করে দেয়। রুদ্রদেব নিজের কাজ শেষ করে রাতে ফিরে এসেছে এক আগন্তুককে নিয়ে। পড়ে জানা গেল তিনি না-কি এই রাজ্যের মহারাজ। ছোটোখাটো কোনো রাজা নন, একেবারে সম্রাট। রাজা বলতে আগে অসিত কেবল তার গ্রামের কাছের মহীস্থানের রাজাকেই বুঝতো। তবে এখন সে শুনেছে সেসব রাজারা কেউই আসলে স্বাধীন রাজা নয়। এই রাজ্যের পূর্ণ নাম হচ্ছে সাতবাহন, আর পূর্ণ মহারাজ সাতকর্ণী, তিনিই সর্বেসর্বা। আর সেই সর্ব ক্ষমতাধর রাজাই এখন তাদের কুটিরে ছদ্মবেশে আছেন।

রুদ্রদেব মোটামুটি ওনাকে নিয়েই ব্যস্ত আছে। দুপুরের খাবার জোগাড় করে এনেছে অসিত। কিছু খাবার কাঁচা ধুয়ে খাওয়া গেলেও কিছু রান্নাও করতে হবে। রান্না করতে বসে নিজের অতীতে ফিরে গেছে অসিত। এতদিনে মস্তিষ্ক ব্যস্ত ছিল অনেক চিন্তা নিয়ে। শিক্ষা নিয়ে। আজকে একটু অবসর পেয়েই তার মন ফিরে গেল তার এলে আসা সময়ে।

অঙ্গদকে মনে পড়ে তার, তবে আজ যেন একটু বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। এতদিন মনে পড়েছিল আবছা ভাবে। অস্ত্রের ঝনঝনানি অথবা কঠিন কোনো যোগাসনের মধ্যে অঙ্গদের আবছা চেহারাটা একটু দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে হওয়া গভীর ঘুমে দেখা স্বপ্নও তার তেমন মনে থাকতো না।

সে কি অঙ্গদকে ভুলে যাচ্ছে? এই চিন্তাও এসেছিল তার মনে। যে লক্ষ্যে সে ঘর, গ্রাম আর রাঁধাকে ছেড়ে বেরিয়েছিল সেই লক্ষ্য কি তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে? মনে হয় না। এই জায়গা, রুদ্রদেব, অস্ত্রবিদ্যা এসবই তার কাছে নতুন। নতুনত্বের বৈচিত্র্যের দিকে তীব্র আকর্ষণ বোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু সেসবকে তার

কিছুতেই আপন বলে মনে হয় না। তার মন এখনও পড়ে আছে সেই ছোটো গাঁয়েই, সুযোগ আসলেই সে আবার ফিরে যাবে সেখানে।

রুদ্রদেব তাকে বলেছিল মনে কোনো ধরনের সন্দেহ জাগলেই যেন সে তাকে জানায়। এই প্রশ্নও সে করেছিল। সে কি লক্ষ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে? সে কি হারিয়ে ফেলছে পথ?

এই সন্দেহের জবাবে রুদ্রদেব হেসে বহুবার দেওয়া উত্তরটাই আবার দিয়েছিল, 'না অসিত, তুমি লক্ষ্য হারিয়ে ফেলোনি, বরং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছো। পথেই আছো তুমি, সেই পথে সামনে এগোচ্ছ, তবে আগের মতো করে নয়, একটু অন্য ভাবে।'

কতদিন অঙ্গদকে দেখেনি সে। পশুদের সমর্পণ ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। সেখানে কাউকে তোষামোদের ব্যাপার থাকে না, কাউকে ভোলাতে হয় না, কোনো ভান থাকে না। স্বার্থ থাকলে তো তার ছিল। অঙ্গদকে দিয়েই রোজগার করতো সে। তার মানে সে অঙ্গদের জন্য এখন যতটুকু কষ্ট পাচ্ছে, অঙ্গদ নিশ্চয়ই তার থেকে বেশি মনে করছে তাকে। রাহুর পোষ সে কখনোই মানবে না। আর রাহুও ছাড়বে না তাকে। ক্রমাগত রাহুর অত্যাচার সহ্য করেই বেঁচে থাকতে হবে অঙ্গদকে।

মানুষের সহ্যক্ষমতা অনেক। সে সবকিছু হারিয়েও এক বুক কষ্ট নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। একটা অবোধ প্রাণী কি পারবে পুরানো বাড়ি আর মালিকের বিরহ সহ্য করে বেঁচে থাকতে?

আর রাঁধা? সেই চঞ্চল মেয়েটা তো শেষ সময়ে চোখের জল দিয়ে বুঝিয়েই দিয়েছে, তার ছটফটে বাড়ন্ত শরীরের ভেতরের অপরিপক্ব, চপল মনটা অসিতের প্রেমের স্পর্শে পরিণত হতে চায়, শান্ত হয়ে বসতে চায় ঘরের এক কোণে। অসিতের স্পর্শেই সে হয়ে উঠতে চেয়েছিল পূর্ণ নারী। অনেক দিন পর এই রান্না করার অবসরে দুজনের কথাই মনে পড়লো তার। দুদিকের দুমুখো টানে দিশেহারা বোধ করে অসিত। এতদিন ধরে শেখা যত আত্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল, সব ব্যর্থ মনে হয় তার কাছে।

তাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিলো রুদ্রদেব। অসিতের সাড়া অনেকক্ষণ ধরে না পেয়ে সে দেখতে এসেছিল। এসে দেখে এই অবস্থা। সামনে চুলা জ্বালিয়ে রেখে অসিত গভীর ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান করা খারাপ কিছু না, তবে সামনে অসমাপ্ত দায়িত্ব রেখে যে ধ্যান করা হয় তাকে ধ্যান বলে না, বলে অহেতুক কল্পনা। পরিস্থিতি দেখে সে ধীর গলায় মন্তব্য করলো, 'দিবা স্বপ্ন অথবা অলীকের কল্পনায় যে ডুবে থাকে তার বর্তমানের কাজ পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। যেমন তোমার হচ্ছে। ভাগ্যিস সময়মতো এসেছিলাম। আরেকটু দেরি করলে তো তুমি অন্ন পায়েস বানিয়ে ফেলতে।'

অসিত প্রথমে ধরা পড়ে থতমত খেলো, তারপর একটু লজ্জা পেলো। তাড়াতাড়ি অন্ন পরীক্ষা করে দেখল, হ্যাঁ, পুরোপুরি হয়ে গেছে। হাড়ি নামিয়ে নিলো সে। তারপর অভিমানে ভরে গেল তার গলা, 'অঙ্গদের কথা খুব মনে পড়ছে। আমার আসলে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে অঙ্গদ আর বেশিদিন বাঁচবে না। আমার ওকে খুঁজতে যাওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি।'

'তা তো যাওয়াই উচিত। এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও তো আমাদের সামনে কোনো সুযোগ আসেনি।'

'সুযোগ তো আর এমনি এমনি আসবে না। সুযোগের সন্ধানে যেতে হবে। পথে না নামলে পথ পার হবো কী করে? আপনি আমাকে সাহায্য না করলে কোনো সমস্যা নেই। আমি এখানে আর থাকবো না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমি বেরিয়ে পড়বো। পথে নামলে শকদের রাজ্যে যাবার একটা না একটা উপায় পেয়ে যাবোই। আর সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে অঙ্গদকে।'

'আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে। মাঝে মাঝে সব খেলা নিজে না খেলে ভাগ্যকেও কিছু খেলা খেলতে দিতে হয়। তোমার গুরু হিসেবে বলছি তোমার শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি। তবে আর কয়েকদিন পরেই তুমি পূর্ণ ক্ষত্রিয় হয়ে উঠবে। তখন তুমি যেখানে মন চায় যেও, আমি বাঁধা দেবো না। তখন তোমাকে আমার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো। তার আগে একটু ধৈর্য ধরো। এসব খেয়াল মনে আসবেই, তবে সেসবকে দমিয়ে রেখে কার্যে মন দাও।'

অসিতের মুখে আর কোনো কথা জোগাল না। তার মন অসহায়। রুদ্রদেবের কঠিন ব্যক্তিত্ব আর যুক্তির সামনে নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। সবসময় এমনই মনে হয়।

রুদ্রদেব বুঝতে পেরেছে অসিতের অবস্থা। কঠোর স্বর একটু কোমল করলো সে, 'তুমি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। অসময়ে অচিন্ত্য তোমাকে পেয়ে বসেছে। ওদিকে এই রাজ্যের মহারাজ স্বয়ং আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। কাল থেকে আমরা রাজ অথিতির সঠিক আপ্যায়ন করতে পারিনি। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ক্ষিধেয় আমাদের অথিতির অবস্থা শোচনীয়। ওনার খাবারের ব্যবস্থা করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ। রাজ্যের রাজার কোনো রূপ অনাদর হয় এমন কাজ কোনো ক্ষত্রিয়ের করা উচিত নয়।'

অসিত সবকিছু গোছাতে শুরু করলো। চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়েছে। তার বদলে জন্ম নিয়েছে এক প্রশ্ন, 'রাজাকে কখনোই অনাদর করা ক্ষত্রিয়ের উচিত নয়, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, রাজা যদি অত্যাচারী হন?'

'তাহলে সেই রাজাকে টেনে হিঁচড়ে সিংহাসন থেকে নামানোই হচ্ছে ক্ষত্রিয় ধর্ম। অত্যাচারী রাজার শাসনে থাকার চেয়ে অপমানজনক ক্ষত্রিয়ের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।'

আর কথা বাড়লো না। অসিত আর রুদ্রদেব খাবারের পাত্রগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে রান্নার জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো। ঘরের সামনে বসে আছেন মহারাজ সাতকর্ণী।

খাদ্য তেমন একটা ভালো হয়েছে তা বলা যাবে না। এটা তো আর রাজ অন্দরের কোমল হাতের সযত্নে প্রস্তুতকৃত ব্যঞ্জন নয়। তবে অনেকক্ষণ পরে অন্নের স্বাদ পেয়ে

মহারাজের বেশ ভালো অনুভূতি হলো। খেতে বসার আগ থেকেই তার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। খেতে খেতে সেই চিন্তাটা এবার পাকা করে নিলেন তিনি।

রুদ্রদেব ভালো করে ঘরে বিছানা পরিষ্কার করে দিয়েছে। খাবার পরে বিশ্রাম নিতে শয্যা গ্রহণ করেছেন মহারাজ সাতকর্ণী। অসিতের কাজ হাওয়া করা।

মহারাজের চোখ একটু বুজে এসেছে, 'তোমাদের অথিতেয়তায় আমি সত্যিই সন্তুষ্ট। তবে এখানে আর থাকা যাবে না। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। এই রাজ্যের অবস্থা এখন বেশ সঙ্গিন। আমার নরখাদক মারার কাজও মিটেছে। এবার প্রাসাদে ফিরতে হবে।'

রুদ্রদেব অথিতিকে বাঁধা দেবার চেষ্টা করলো না, 'মহারাজ, রাজাদের জীবন ত্রস্ত হরিণের মতো চঞ্চল হয়। শান্তির সময়ে রাজা নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না। এই রাজ্যের এখন যে অবস্থার কথা বললেন তাতে আপনার অবশ্যই রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়া উচিত। এই কুটিরে আপনি এসেছেন, তাতে ধন্য হয়েছি আমরা। তবে এই জায়গায় আপনার অনাদর বৈ আদর হবে না। জেনেশুনে আমিও ক্রমাগত অথিতির অনাদর করতে পারি না।'

রুদ্রদেব তুলে ধরল বাস্তবতা। কোন মেকি ভদ্রতাকে আশেপাশে ঘিরতে দিলো না।

মহারাজ সাতকর্ণীর মাথায় চিন্তা পাকা হয়েছে ঠিক, কিন্তু কথাটা কীভাবে বলবেন তা এখনও বুঝতে পারছেন না। সরাসরি বলা যাবে না, আগে পরিস্থিতি ভালো করে বোঝাতে হবে।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ রুদ্রদেব। রাজার জীবনে কোনো শান্তি নেই। অস্থির সময়ে রাজা শান্তি আনার চেষ্টা করেন, আর যখন একবার সেই শান্তি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শান্তি রক্ষার জন্য রাজাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। যুবরাজকে রাজা বানানোর আগ পর্যন্ত এই কর্তব্যের খাড়া থেকে মুক্তি নেই। প্রতিদিন রাজাকে কাটে সেই খড়্গ। তবে এই রাজ্যের অবস্থা এখন বেশ অস্থির হয়ে আছে।'

মহারাজ যদিও বলেছেন তার এখন প্রস্থান করা উচিত, তবে গাত্রোত্থানের কোনো ইচ্ছেই মহারাজ সাতকর্ণীর মাঝে দেখতে পেলো না রুদ্রদেব। মহারাজের মনে কিছু একটা চলছে। তাদের মতো দুজন সাধারণ লোকের সাথে রাজ্যের গভীর অস্থির বিষয় নিয়ে কথা বলার কোনো কারণ রাজার কাছে নেই।

মহারাজ সাতকর্ণীকে এরই মধ্যে অনেকটাই চিনতে পেরেছে রুদ্রদেব। তিনি শরীরে যেমন শক্তসমর্থ, তেমনি মনেও। রাজ্যের ভেতরের অস্থির অবস্থা বলতে গিয়ে নিজে অস্থির হয়ে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তার মানে এই অস্থির অবস্থা মহারাজের মনের আসল অবস্থা নয়, তিনি ইচ্ছে করেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই রাজার মনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে। সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো রুদ্রদেব। রাজার ছলনা অথবা দুরভিসন্ধিকে শাস্ত্রে বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'মহারাজ, আপনি বলছেন বটে রাজ্যের অবস্থা অস্থির। তবে রাজ্যের মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ তো নেই। প্রজারা নিজেদের মতো সুখে দুখে বেঁচে আছে। অভাব যে

একেবারেই নেই তা নয়, সে সব রাজ্যেই থাকে, কিন্তু অরাজকতা তো কোথাও দেখতে পাইনি।'

'কিছু অস্থির সময় আঁচ করা যায় না। গুপ্ত সেসব অবস্থা বুঝতে পারে কেবল গুপ্তচরেরা। তা হয় তুষের ভেতরে থাকা আগুনের মতো। অদৃশ্য কিন্তু ভয়ংকর।'

'মহারাজ, আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে অবশ্য এই অস্থিরতার কথা আমাদের বলতে পারেন। মাঝে মাঝে মনের কথা কাউকে বলতে পারলে ভার কিছুটা কমে যায়। আমাদের কাছ থেকে এই কথা কেউই জানতে পারবে না।'

রুদ্রদেব মহারাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। মহারাজ অস্থির অবস্থা সম্পর্কিত কিছু একটা অবশ্যই আলোচনা করতে চাচ্ছেন। সেই সুযোগটাই দিলো রুদ্রদেব। কথায় কাজ হয়েছে। মহারাজের ভেতরে এখন আর ইতস্তত ভাবটা নেই।

'তোমাকে বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। সেই ঋণে এখন তোমাকে বিশ্বাস করা আমার কর্তব্য।'

'মহারাজ, শুনে মনে হচ্ছে সমস্যা বেশ সঙ্গিন। এত বড়ো ঝামেলার সমাধান তো আর আমার মতো নগণ্য লোকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। তবু শুনি।'

'তুমি নগণ্য লোক নও। আমি কখনো বৃথা মনে হলে কোনো কাজ করি না। যদি আমার কোনো লাভ না হতো তবে তোমাকে আমি এসব বলতাম না। আচ্ছা তোমরা কখনো শকদের রাজ্যে গিয়েছিলে? আমাদের পাশের রাজ্য?'

অসিত এতক্ষণ উদাসীন হয়ে আলোচনা শুনছিল। রাজ্যের অস্থির অবস্থা নিয়ে তার তেমন একটা মাথা ব্যথা নেই। তার নিজের অবস্থাই এখন আরও অস্থির। তবে এবার শক রাজ্যের নাম আলোচনায় আসতেই তার কান একেবারে খাড়া হয়ে উঠলো। তার এই রাজ্যের নাম মনে আছে। ওখানেই অঙ্গদ আছে, সাথে রাহু। শকদের বিখ্যাত বন্দরের নামই বারিগাজা। সেদিনের শোনা প্রতিটা কথাই মনে আছে তার।

রুদ্রদেবেরও মনে আছে সেই রাজ্যের কথা। একটু আগে অসিতকে শক রাজ্যে যাবার সুযোগের কথা বলছিল সে। এখন আবার মহারাজ সাতকর্ণী সেই শক রাজ্যের নামই নিলেন।

'শক রাজ্যের কথা আমি শুনেছি মহারাজ। সে রাজ্য বর্তমান ভারতের অন্যতম ধনী রাজ্য।'

'অন্যতম ধনী না, সবচেয়ে ধনী।' এই কথা বলার সময় কার্যতই মহারাজ সাতকর্ণীর গলায় হতাশা ঝরে পড়লো।

'নাম শুনলেও সেই রাজ্যে কখনো যাইনি মহারাজ। তবে ঐ যে বললাম, খ্যাতি কানে এসেছে।'

'হ্যাঁ, বলতে গেলে পুরো ভারতের ঐশ্বর্য এখন ঐ শক রাজ্যে গিয়েই জমা হচ্ছে। বিদেশি বাণিজ্যে তার চেয়ে এগিয়ে আর কেউ নেই। আর তার সেই বাণিজ্য প্রতি বছর বেড়েই চলেছে।'

'পাশের রাজ্যের ধনাগার যদি ভরে ওঠে তাহলে রাজা হিসেবে আপনার ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। আপনিও নিশ্চয়ই এখন বাণিজ্যে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আশা করি রাজ্য লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার ধনাগারও ভরে উঠবে।'

'ব্যাবসা করা চেষ্টা আমি অনেক করেছি। বিদেশিদের সাথে বাণিজ্যে কলতে গেলে আমার মনোযোগের সবটা দিয়েছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।'

রুদ্রদেবের গলা হালকা, 'তাহলে আপনার এখন কী অভিলাষ? প্রতিযোগিতায় যা অর্জন করা যায়নি তা যুদ্ধ করে অর্জন করবেন? বিনা শত্রুতার জায়গায় জন্ম দেবেন শত্রুতা?'

রুদ্রদেব কথাটা হালকা গলায় বললেও এটা মূলত একটা অভিযোগ। আর মহারাজ সাতকর্ণী অভিযোগ শুনে অভ্যস্ত নন। তার চোখ একটু জ্বলে উঠলো, 'আপন রাজ্য আর প্রজার জন্য সম্পদ সন্ধান করাই রাজধর্ম। আর তুমি রাজাদের মধ্যের শত্রুতার কী বোঝো? বিনা শত্রুতা মানে কী? শত্রুতা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। ঐ রাজা আমাকে নিজের পথের সবচেয়ে বড়ো কাঁটা মনে করে। এখন পর্যন্ত কয়বার যে আমাকে মারতে গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছিল, তার কোনো লেখাজোঁকা নেই।'

'তাহলে তো মহারাজ চিন্তার কথা।'

'এখানেই শেষ নয়। শক রাজা নাহাপনা যদি ন্যায়পরায়ণ রাজা হতেন তাহলে একটা কথা ছিল। তিনি তা নন। তার রত্নের খনিতে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের প্রতি অনেক অত্যাচার করা হয়। অকালে মরে তারা। শুধু তাই নয় আমার আগের রাজধানী অমরাবতীর সীমান্তে সেনা মোতায়েন করে রেখেছেন তিনি। বিনা শত্রুতার কোনো লক্ষণ সেখানে আর অবশিষ্ট নেই, যা আছে তার সবই আসন্ন যুদ্ধের।'

'ঠিক বলেছেন মহারাজ। তবে আপনার রাজ্য এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড়ো। তবু বাণিজ্যে আপনি শক রাজার সাথে পেরে উঠছেন না কেন?'

'একটাই কারণ। আমার রাজ্যে ভূমি বেশি হতে পারে, কিন্তু ঐ রাজ্যে রত্নখনি আছে। আমার রাজ্যে রত্ন খনি একেবারে নেই বললেই চলে। তবে আসল কারণ অবশ্য অন্য। যদিও এসবে আমি বিশ্বাস করি না, তবু লোকে বলে সেই কথা।'

'কী মহারাজ?' রুদ্রদেব একটু উৎসাহ পায়।

'লোকে বলে বহু বছর ধরে শক রাজ্যের রত্নাগারে এক বিশেষ রত্ন আছে। সেই রত্ন বিশেষ সৌভাগ্যের প্রতীক। সবসময় বন্দরে সেই রত্ন রাখেন শক রাজা। আর সেটাই তাদের বাণিজ্য লক্ষ্মীর প্রতীক।'

'আচ্ছা। সেই রত্ন এলো কোন খনি থেকে?'

'সেখানেই তো মজা। কোনো খনি থেকে সেই রত্ন আসেনি। সমুদ্র থেকেও ডুবুরিরা সেই রত্ন খুঁজে বের করেনি। সে রত্ন দৈব। যার কাছে সেই রত্ন থাকবে সৌভাগ্য সবসময় তার সাথেই থাকবে।'

'বাহ, দৈব রত্ন! কে জানে দেখতে কেমন।'

'ঐ রত্ন দেখেছে এমন লোকের কাছেই শুনেছি। আমার এক গুপ্তচর বণিকের ছদ্মবেশে কৌশলে দেখেছিল সেই রত্ন। পঞ্চমুখী লাল রঙের অদ্ভুত জিনিস। জগতের কোনো রত্নের সাথে সেই রত্নের মিল নেই, কোনো রত্নের দ্যুতি অথবা রঙের চাকচিক্যের সাথে তাকে মেলানো চলে না।'

লাল রং! অদ্ভুত গঠন! রুদ্রদেবের চোখ ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হলো। খানিক সময়ের জন্য দিশেহারা বোধ করলো সে। এই রত্ন সে চেনে। হ্যাঁ, লোকে ঠিক কথাই

বলে। এই রত্ন দৈব। পৃথিবীর কোনো রত্নের সাথে এই রত্নের মিল নেই। প্রবাদ এখানে অবশ্যই সত্য।

তবে বাণিজ্য লক্ষ্মীর সাথে এই রত্নের কোনো সম্পর্ক নেই। দেবাদিদেবের আশীর্বাদ এই রত্নের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক অন্য জায়গায়।

একটু পরেই রুদ্রদেব বুঝতে পারলো, রত্নের কথা শুনে সে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে। দ্রুতই সামলে নিলো সে, 'আপনার কথা শুনে যা মনে হচ্ছে বেশ বড়ো একটা যুদ্ধ বাঁধবে। আপনারও তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদে ফেরা উচিত।'

হ্যাঁ, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। মহারাজ সাতকর্ণী সেটা আগে থেকেই জানেন। আর এই কথাটা এই জঙ্গলের ধারে বাস করা দুই সাধারণ প্রজার সাথে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কাজটা তিনি করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে।

মহারাজ সাতকর্ণীকে কোনোভাবেই বোকা বলা যাবে না। তিনি এর মধ্যেই রুদ্রদেবের যুদ্ধজ্ঞানের বেশ কিছু নমুনা দেখেছেন। যার ঘটে সামান্য বুদ্ধি আছে সেই সেনাধ্যক্ষই এমন যোদ্ধাকে যুদ্ধের সময় নিজের পাশে পেতে চাইবে। সাতকর্ণী জীবনে কম যোদ্ধা দেখেননি। জীবনে নিজের পক্ষে বিপক্ষে বহু যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করেছেন, অনেকের কৌশল দেখেছেন। তিনি নিজেও যুদ্ধ কৌশলে কিংবদন্তি। তবে তিনি জানেন, তিনি নিজে আর যাদেরকে তিনি দেখেছিলেন তাদের কেউই রুদ্রদেবের ধারেকাছেও নেই। এই চিন্তাটা সেই শুরু থেকেই তার মনে আসছিল।

আরও একটা কারণ কিছুক্ষণ আগে মাথায় এসেছে তার। গিরিধারী অনেক বার বলেছিল এই কথাটা। তার গঠন করা বিশেষ বাহিনীর জন্য একজন বিশেষ সেনাধ্যক্ষ দরকার। আর এই মুহূর্তে সেই পদের জন্য রুদ্রদেবের চেয়ে যোগ্য কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

আর ইতঃস্তত করলেন না মহারাজ সাতকর্ণী, 'আমি শীঘ্রই রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা দেবো। তবে এখান থেকে আমি একা যাবো না। তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবো।'

মহারাজ যে এই প্রস্তাব দেবেন তা আগে থেকেই জানতো রুদ্রদেব। আলোচনা সেদিকেই এগোচ্ছিল। তবে অসিত একেবারেই অবাক হয়েছে এই প্রস্তাবে।

মহারাজ সাতকর্ণী নিজের প্রস্তাবের সপক্ষে রুদ্রদেবের মোট আদায়ের চেষ্টা করলেন এবার, 'তোমার মতো যোদ্ধার এই সামান্য বনরক্ষকের কাজ করাটা সামর্থ্যের অপমান। তুমি আমার সাথে রাজপ্রাসাদে যাবে। সাথে যাবে তোমার শিষ্য। তোমাদের দুজনকেই সেনাবাহিনীর বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে দেবো।'

অসিতের কাছে এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। সে তড়িৎ গতিতে তাকালো রুদ্রদেবের দিকে। এইতো সুযোগ এসেছে শক রাজ্যে যাবার। অঙ্গদকে এবার উদ্ধার করা যাবে। তার জন্য যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাহলেও পেছপা হবে না সে।

রুদ্রদেবও একটু আগেই শক রাজ্যে যাবার মোক্ষম কারণ খুঁজে পেয়েছে। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে, 'মহারাজ, রাজার আদেশ পালন করা প্রত্যেক প্রজার কর্তব্য। রাজ্যের প্রয়োজনে রাজা যখন যুদ্ধের জন্য আহবান করবেন তখন প্রত্যেক

সামর্থ্যবাণ যোদ্ধার উচিত সেই আহবানে সাড়া দেওয়া। তবে এই মুহূর্তে আপনার সাথে রাজপ্রাসাদে যাবার পথে আমার জন্য একটু বাঁধা আছে।'

মহারাজ সাতকর্ণীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হলো, 'বাঁধা? কীসের বাঁধা?'

'ছোটো দায়িত্ব হলেও এই বনের মালিক বড়ো আশা করে আমার ওপর এই বন রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। আর আসল যোদ্ধা কখনো কর্তব্য পরিত্যাগ করে না, তার চেয়ে প্রাণ ত্যাগ করাকেই শ্রেয় মনে করে।'

মহারাজ সাতকর্ণী তার রাজ্যের এসব বনের বিলি বণ্টনের ব্যবস্থার কথা জানেন, 'ঠিক আছে। এই বনের আসল মালিক আমি। আর আমি এই মুহূর্তে তোমাকে এই বন রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি। তবে তাতে তোমার এখনকার মালিকের কোনো সমস্যা হবে না। এখন থেকে আমার দশ জন যোদ্ধা তোমার হয়ে এই বন পাহারা দেবে। এতে চলবে?'

এরপরে আর আপত্তি করা চলে না। রুদ্রদেব মাথা নুইয়ে সায় দিলো। বনের মালিককে খবর দিয়ে আনালেন মহারাজ সাতকর্ণী। সেই কাঠমিস্ত্রি বেশ অবাক হয়ে বিদায় দিলো রুদ্রদেবকে। তার অবাক হবার মাত্রা আরও বাড়লো যখন শুনতে পেলো তার বন এখন থেকে পাহারা দেবে রাজার দশ জন বাছাই করা সৈনিক।

মাথায় বাঁধা কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলো রুদ্রদেব। পেছনে অসিতও ঘোড়ায় চেপেছে। মহারাজ সাতকর্ণীও এখানে ঘোড়ায় চেপেই এসেছিলেন। সেই রাজ ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। লুকানো জায়গা থেকে ঘোড়া বের করে তিনিও চেপে বসলেন যুত করে।

মহারাজ সাতকর্ণী কোত্থেকে দশ জন সেনা জোগাড় করে এনেছেন তা বোঝা গেল না। অবশ্যই এসব গুপ্ত সৈনিক মহারাজের আদেশের অপেক্ষায় আশেপাশেই ছিল।

তিনটা ঘোড়া একের পর এক সারি বজায় রেখে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো রাজধানী প্রতিষ্ঠানার দিকে।

৬৯

দক্ষিণ ভারতের উত্তাল সময় এদিকে আসতে পারেনি। দয়া নদী বেশ শান্ত। সময় ক্ষুব্ধ হলে প্রকৃতিতেও তার আঁচ পাওয়া যায়। দয়া নদীর ঢেউ, ওপরে চলতে থাকা বাণিজ্য আর প্রমোদ তরীগুলো নিজের মতো করে চলছে।

মহারাজ আর মন্ত্রী কী করেছেন বা করছেন তা নিয়ে সাধারণ জনগণ কিছুই জানে না। তোশিলার প্রজারা নিজের মনেই আছে। বেশ স্বাভাবিক কলিঙ্গের রাজধানীর অবস্থা।

তবে দুজন মানুষ আছে তারা যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছেন কী কাজে তারা হাত দিয়েছেন। প্রদীপের শিখার ওপর আঙুল রাখলে সাথে সাথে উত্তাপ তেমন একটা টের না পাওয়া গেলেও আস্তে আস্তে সেই তাপ অসহ্যকর হয়ে ওঠে, আঙুল সরিয়ে নিতে হয়। মহারাজ আসাকা-সাদা আর মন্ত্রী উদিতনাথের মনের অবস্থা এখন তেমনই। কিন্তু এখন তো আর সাপের কাছে ছুঁচো উগড়ে দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

মন্ত্রী উদিতনাথের চেহারায় আগে থেকেই কিছু কুঁচকানো অংশ ছিল। এই কদিনে কপালে আরও কিছু রেখা যোগ হয়েছে, 'মহারাজ, আমরা তো এভাবে অনন্তকাল অমরাবতীর সীমান্তে সেনা ফেলে রাখতে পারি না।'

'তা তো অবশ্যই। স্বর্ণের পরিমাণের সাথে আমাদের অবস্থানের স্থায়িত্বের একটা ভারসাম্য তো আনতে হবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। স্বর্ণ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। শুধু তাই নয়, আপনার আদেশ মতো অঙ্গ আর বঙ্গের রাজ্যগুলোর সাথে বেশ কিছু লাভজনক বাণিজ্যও আমি শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু মহারাজ, এভাবে সেনাকে শিবিরে ফেলে রাখতেও তো একটা খরচ আছে। সেটাও তো নেহাত কম না।'

'এজন্যই তো ভারসাম্যের কথা বললাম।'

'ভারসাম্য শুধু সম্পদ প্রাপ্তি আর খরচের বেলায় করলে হবে না মহারাজ। সামনে কোনো লক্ষ্য না থাকলে মানুষ একসময় বিরক্ত হয়ে পড়ে। আর বিরক্তি থেকেই ঘটে ধৈর্য চ্যুতি। তখনই মানুষের মন বিদ্রোহ করে। আমাদের সেনাবাহিনী তো এমন অবস্থা হলে বেঁকে বসতে পারে। আমার কাছে এরই মধ্যে কিছু গুপ্ত খবর এসে পৌঁছেছে। আমাদের সেনাদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে, তাদের মধ্যে গা-ছাড়া ভাবও চলে এসেছে।'

এবার কথার খেই ধরলেন মহারাজ, 'হ্যাঁ। আর যেই রাজার সেনাদের মধ্যে গা-ছাড়া ভাব চলে আসে সেই রাজার প্রাণও অতি সত্বর গা ছাড়া হয়ে যায়।'

'কথা সত্য মহারাজ। নীতি শাস্ত্র তাই বলে।'

'নীতিশাস্ত্র তো আরও অনেক কথাই বলে। সেসব চিন্তা না করে শাস্ত্রের যে অংশে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ আছে তাই নিয়েই কথা বলা উচিত।'

'শাস্ত্রে সব সমস্যারই সমাধান আছে মহারাজ। একটু কেবল গভীরে ডুব দিয়ে সমাধানটা বের করে আনতে হবে। তবে আমার মনে হয় এখানে আমরা নীতিশাস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষাটা না মেনে বড়ো ভুল করেছি।'

'জানি, এখন বলবেন আমরা লোভ করেছিলাম, আর তাতে শাস্ত্রের বারণ আছে। লোভে হয় পাপ, তাতে হয় মৃত্যু। এখন এসব শুনতে ইচ্ছে করছে না, বাদ দিন।'

'নাহ মহারাজ। এখন সেই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আর লাভহীন কোনো কাজে আমার তেমন আগ্রহ নেই।'

'তাহলে?'

'নীতিশাস্ত্রের একটা গভীর বিষয় হচ্ছে একই তত্ত্ব আপনি পরিস্থিতি ভেদে নানাভাবে ব্যবহার করতে পারেন। দেখা যায় মাঝে মাঝে তত্ত্ব বদলে যায়, অথবা বদলে যায় তার মাত্রা। সন্ন্যাসীর জন্য নীতিশাস্ত্র লোভ বর্জন করতে বলেছে, রাজার জন্য নয়। রাজার জন্য সম্পদ সংগ্রহ করাই ধর্ম। আমি সেদিকে কথা বলছি না। তবে আমরা নীতিশাস্ত্রের একটা কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। চুক্তির ব্যাপারটা আমরা ভালোভাবে সামলাতে পারিনি। একটা চুক্তি করার যেসব শর্ত শাস্ত্রে আছে তার কিছু আমরা পালন করিনি।'

'কোন শর্তের কথা বলছেন?'

'মহারাজ, আমরা শকদের সাথে যা করেছি তা কেবল একটা বাণিজ্য চুক্তি। সেখানে আমরা কেবল স্বর্ণের পরিমাণের কথাই ভেবেছিলাম, কিন্তু তাদের হয়ে আমরা কতদিন কাজ করবো তার কিছু ঠিক করিনি। সময়ের কোনো মাত্রা বাধিনি আমরা। এভাবে তো আর চলতে পারে না। আর কোনো কথা না বলাতে বিপদে আমরাই পড়েছি। এখন কী করবো কিছুই মাথায় আসছে না।'

'হাঁ, হয়তো আমরা চুক্তিতে কোনো শর্তের কথা উল্লেখ করিনি। কিন্তু এভাবে তো আর বসে থাকলে চলবে না। ওদের কাছে দূত পাঠাতে হবে। ওরাও নিশ্চয়ই এটা ভেবে বসে নেই যে আমরা চিরদিন ওদের হয়ে অমরাবতীর সীমান্ত পাহারা দেবো। একটা বিহিত অবশ্যই করা দরকার।'

উদিতনাথ আর বসলেন না। মন্ত্রণা শেষ, এখন দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মহারাজ আসাকার মাথায় চিন্তা গেঁড়ে বসতে লাগলো। তিনি বাইরে স্বীকার নাই করতে পারেন, কিন্তু অন্তঃকরণে তিনি শক রাজা নাহাপনার দাসত্ব একটু একটু গ্রহণ করেছেন।

তার এই দূত পাঠানো কি শক রাজা নাহাপনা ভালো ভাবে নেবেন? বিশ মণ স্বর্ণ হাতে পেয়ে আরও পাবার লোভ তার মনে একেবারে জেঁকে বসেছে। এখন কোনোভাবেই শক রাজাকে রাগিয়ে দেওয়া চলবে না। দোয়াতে হবে আস্তে আস্তে। সাপ কিছুক্ষণ পরে মরুক সমস্যা নেই কিন্তু লাঠি রাখতে হবে আস্ত।

নাহ, উদিতনাথকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে হবে। তিনি আবার তাকে ডেকে পাঠালেন। নির্দেশ হলো, 'পত্রটা আপনি খুব মৃদু ভাষায় লিখবেন। কোনোভাবেই যেন মহারাজ নাহাপনার মনে আমাদের সম্পর্কে কোনো বিরুপ প্রতিক্রিয়া না হয়। আর দূত বাছাই করবেন বেশ সাবধানে। পত্রের ভাষার সাথে সাথে দূতের ব্যবহারও যেন নম্র হয়। কোনোভাবেই তাদের বুঝতে দিলে চলবে না তাদের কথামতো করা

অমরাবতীর অবরোধে আমাদের কোনো অরুচি আছে। কেবল বলবেন, সেই অবরোধের মহাযজ্ঞের আগুনে আরেকটু জ্বালানী প্রয়োজন কেবল, ব্যস।'

উদিতনাথ মহারাজের আজ্ঞা নিয়ে নিজের বাসস্থানে ফিরে এসেছেন। তার মাথায় এখন ঠিক দুটো কাজের ভার। সঠিক ভাষা প্রয়োগ করে পত্র লিখতে হবে, আবার সঠিক লোকের হাতে সেই পত্র পাঠাতে হবে।

নিজের লেখালেখির কাজের জন্য নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি। দরজায় দুই দূতের একজনকে দূত মহলে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যেই তার মন দূত বাছাই করে ফেলেছে।

এবার লেখার পালা। তাড়াহুড়া কোনোভাবেই করা যাবে না। মাঝে মাঝে অক্ষর তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হয়ে ওঠে। সেই ধারকে কূটনীতির মারপ্যাচে এখানে ভোঁতা করে দিতে হবে।

কালি, তুলি আর তালপত্র তৈরিই আছে। তিনি শব্দ সাজাতে শুরু করলেন। লেখা এগোতে লাগলো।

সেই পত্র পাঠানোর পর কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। কোনো খবর আসেনি শক রাজ্য থেকে। এবার মহারাজ আসাকা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। সামনে তো আর কোনো স্বর্ণ পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আবার পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। উদিতনাথের কাছে পৌঁছে গেল সে নির্দেশ, 'এবার একটু সোজা আর কড়া ভাষায় পত্র লিখুন। আর দূতকেও এবার একটু সরাসরি আর উদ্ধত আচরণে সেই পত্র উপস্থাপন করতে বলবেন। লিখে দেবেন, এবার যদি তাদের তরফ থেকে কোনো উত্তর না আসে তবে সাত দিন পর আমাদের অবরোধ করে থাকা সৈন্যরা সবাই কলিঙ্গে ফিরে আসবে।'

উদিতনাথের মনেও তেমনই ইচ্ছে। আরেকজনের কোলের পুতুল হয়ে নাচতে কার ভালো লাগে। নিজের লেখার ঘরে বসে এই পত্র শেষ করলেন তিনি। আজ আর ভাষাকে অত শালীন রাখতে হয়নি। তাই প্রথমটার তুলনায় তাড়াতাড়ি হয়েছে। লেখা শেষে যখনই মোহর লাগাতে যাবেন ঠিক তখনই দরজায় আওয়াজ হলো।

'ভেতরে এসো।'

প্রহরী ভেতরে এসে খবর দিলো, 'মহামন্ত্রী, আপনার কাছে এক দূত এসেছে।'

'হ্যাঁ, আমিই আসতে বলেছি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো আসার কথা নয়। যাই হোক, ওকে বাইরে একটু অপেক্ষা করতে বলো। আমি ডাকলে ভেতরে নিয়ে আসবে।'

'মহামন্ত্রী, এখন যে দূত এসেছে সে আমাদের দূত নয়। দূত শক রাজ্য থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। তার কাছে শক রাজা নাহাপনার নামাঙ্কিত পত্র রয়েছে।'

পত্র লেখার আর প্রয়োজন নেই। এতক্ষণের লিখতে থাকা তালপত্র তিনি মুচড়ে নষ্ট করে দিলেন। পণ্ড শ্রম হওয়াতে তিনি অবশ্য মনঃক্ষুণ্ণ হননি। বরং বোধ করছেন স্বস্তি। এমন পরিস্থিতিতে অপর পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলেই দুকূল রক্ষা পায়। এক সাথে অনেকগুলো জটিলতা এড়ানো গেছে।

'যাও, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

দূত এসে সম্ভাষণ জানালো, 'মহামন্ত্রী, আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনাদের এই সুরম্য রাজধানীর দর্শন লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।'

'অনেক দূর থেকে এসেছেন আপনি। একটু বিশ্রাম করে নিন আগে। আমাদের এই নগরীকে আরেকটু ভালো করে দেখে নিন। তারপর আলাপ করা যাবে।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের বিখ্যাত মনোমুগ্ধকর রাজধানী তোশালিতে থাকার সৌভাগ্য আমার এই যাত্রা হবে না। আজকেই আমাকে ফিরতি পথ ধরতে হবে। আমাকে এই পত্র নিয়ে মহারাজ আসাকার সাথে দেখা করতে হবে। পত্রের উত্তর স্বয়ং মহারাজের কাছ থেকেই নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন মহারাজ নাহাপনা।'

'ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থা করছি। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

দূতকে অথিতিশালায় পাঠিয়ে দিয়ে বাইরের প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন উদিতনাথ, 'আমাদের দূত ভবন থেকে যাকে আসতে বলেছিলাম তাকে মানা করে দাও। তার আর দরকার হবে না। আমি একটু রাজ অন্দরে যাচ্ছি।'

মহারাজ আসাকা এই সময়ে উদিতনাথকে দেখে একটু আশ্চর্যই হলেন, 'একটু আগেই তো আপনি গেলেন। এরই মধ্যে আপনার পত্র লেখা শেষ? না-কি কোনো ঝামেলা হয়েছে?'

'মহারাজ, পত্র লেখার আর দরকার পড়বে না। একটু দেরি করে হলেও মহারাজ নাহাপনা আমাদের প্রথম পত্রের উত্তর দিয়েছেন। সেই উত্তর নিয়ে শকের দূত একটু আগেই আমাদের রাজ্যে এসে পৌঁছেছে।'

'যাক।' এবার উদিতনাথের স্বস্তি মহারাজ আসাকার মনেও ছড়িয়ে পড়লো। তার আর তর সইলো না, 'দূতকে তাহলে আমার সামনে এনে হাজির করুন। অবশ্য সে এখন পথশ্রমে ক্লান্ত। আতিথেয়তার নিয়ম মানলে এখন তাকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া উচিত আমাদের। কিন্তু মন মানতে চাইছে না।'

'আমারও একই অবস্থা হয়েছিল মহারাজ। দূতকে আমিও বিশ্রাম নেবার কথা বলেছিলাম। কিন্তু দূতের অনেক তাড়াহুড়া। মহারাজ নাহাপনা না-কি তাকে বলে দিয়েছেন আজকেই পত্রের উত্তর নিয়ে সে যাতে ফিরে যায়।'

'যাক, ভালোই হলো। দূত এখন কোথায় আছে?'

'তাকে আপাতত অতিথিশালায় রেখে এসেছি। আপনি আদেশ করলে খবর পাঠাই।'

'তাকে হাজির করার ব্যবস্থা করুন।'

দূতকে অথিতিশালা থেকে রাজ ভবনে আনা হলো। ভালো করে তল্লাশি করে নিয়ে আসা হলো মহারাজ আসাকার সামনে।

দূত মহারাজকে সম্ভাষণ করে আর মহারাজের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আর দেরি করলো না। গোপন সেই খবর পড়তে শুরু করলো সে।

পত্র দুবার পাঠ করার নিয়ম। প্রথম বার পাঠ করে একটু বিরতি দিলো সে। তারপর আবার পাঠ করলো। এবার তাকাল দুজনের দিকে। এই তাকিয়ে থাকাটাও নিয়মের অংশ। এখন যদি পত্রের শ্রোতারা পত্রের কোনো শব্দ অথবা উচ্চারণ ভালো করে না বোঝে তাহলে দূতকে প্রশ্ন করবে। আর দূত তখন ভালো করে বুঝিয়ে দেবে।

এই পত্রের দিকে দুজন শ্রোতারই পূর্ণ মনোযোগ ছিল। কারোরই কোনো কিছু বুঝতে বাকি রইলো না। দ্বিতীয় বার পাঠের আসলে কোনো দরকার ছিল না।

মহারাজ আসাকার কণ্ঠে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট, 'আমি সম্পূর্ণ পত্রের বিষয় বুঝতে পেরেছি। একটু আলোচনা না করে তো আর এই পত্রের উত্তর দেওয়া যাবে না। তুমি অথিতিশালায় গিয়ে আহার আর বিশ্রাম গ্রহণ করো। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর লিখে তোমার প্রস্থানের ব্যবস্থা করছি।'

দূত নতমুখে প্রণাম জানালো। তারপর ত্যাগ করলো কক্ষ।

মহারাজ আসাকা আর মন্ত্রী উদিতনাথ দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এই পত্রের উত্তরে কী বলবেন তার কিছুই তাদের মাথায় আসছে না। মনে করেছিলেন একটু চাপ দিয়ে কিছুটা বাড়তি স্বর্ণ রোজগার করা যাবে। এ তো পুরো উল্টো পুরাণ শুরু করেছে।

'উদিতনাথ' মহারাজ আসাকা নীরবতা ভাঙলেন, 'আপনি কী চিন্তা করছেন? ব্যাপারটা যে এদিকে এগোবে তা তো বুঝতেই পারিনি। এবার আর মহারাজ নাহাপনা আমাদেরকে অমরাবতীর সীমান্ত অবরোধ করে রাখতে বলছেন না। তিনি চাচ্ছেন, আমরা যাতে অমরাবতী নগরে আমার সেনা অভিযান চালাই। ভয়ংকর আক্রমণ করি।'

'আমিও সেই চিন্তাই করছি মহারাজ। অবশ্য ভালো করে ভেবে দেখলে এতে আমাদের তেমন ক্ষতি বৃদ্ধি দেখছি না।'

'কেন?'

'কোনো রাজ্যের সীমান্তে আপনি যদি সেনা সমাবেশ করেন, যুদ্ধংদেহী ভাব প্রদর্শন করেন, তা এক অর্থে আক্রমণই। মহারাজ সাতকর্ণীর শত্রুতা আমরা এমনিতেই অর্জন করে ফেলেছি। আর একটু আগে বেড়ে অমরাবতী আক্রমণ করলে আমার মনে হয় না তেমন কোন সমস্যা হবে। অমরাবতীর রাজদুর্গ আক্রমণ করবো আমরা।'

'কিন্তু, মহারাজ সাতকর্ণীকে ভয় পাওয়া থেকে নিজের মনকে আমি থামিয়ে রাখতে পারছি না।'

'মহারাজ সাতকর্ণীর সাথে এমনিতেই আমরা যথেষ্ট ধৃষ্টতা করে ফেলেছি। তিনি এমনিতেই সুযোগ পেলে আমাদের ছেড়ে দেবেন না।'

'বুঝলাম। কিন্তু পত্রের পরের অংশের কিছুই তো বুঝলাম না। অমরাবতীর এখন যে অবস্থা তাতে তো আমার সেনা ইচ্ছে করলে একদিনেই অমরাবতী তছনছ করে ফেলতে পারে।'

'হ্যাঁ। এবং আমি নিশ্চিত, মহারাজ নাহাপনাও এই কথা ভালো করেই জানেন।'

'কিন্তু, তারপরও তিনি বলছেন আমরা যাতে তেমন কিছু না করি। আমরা যাতে খুব জোরালো আক্রমণ করি অমরাবতীতে, অমরাবতীর দুর্গ দখল নেয়, তাও ঠিক আছে, কিন্তু অমরাবতীর প্রজাদের যাতে কোনো ক্ষতি না করা হয়। এই আদেশের মানে কী?'

'আমি বোধহয় মহারাজ একটু বুঝতে পারছি।'

মহারাজ আসাকা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন উদিতনাথের দিকে।

'মহারাজ, নিশ্চয়ই এটা ছাগের টোপ দিয়ে বাঘকে বের করে আনার বুদ্ধি। প্রজাদেরকে জিম্মি করতে হবে, মহারাজ সাতকর্ণীর অহমে আঘাত দিয়ে তাকে তাতিয়ে তুলতেই এই কাজ করতে বলেছেন মহারাজ নাহাপনা।'

'আচ্ছা।'

'আপনি আর চিন্তা করবেন না মহারাজ। আমি এই পরিকল্পনার শেষটা দেখতে পাচ্ছি। আপনার মন্ত্রী হিসেবে বলছি, আপনি মহারাজ নাহাপনার এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।'

'আচ্ছা, তবে তাই হোক। আপনি সম্মতি সুচক পত্র লিখে দূতের হাতে প্রেরণ করে দিন। মহারাজ নাহাপনার প্রস্তাব আমরা যথযথ ভাবে পালন করবো। তিনি পত্রে যেভাবে বলেছেন সেভাবেই হবে। ওনার পছন্দ করা দিনেই আমার সেনা আমরাবতীতে প্রবেশ করে রাজ দুর্গ আক্রমণ করবে। আজই আমার সীমান্তের সেনানায়ককে বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে মহারাজ। আমি এখনই দূতকে খবর পৌছে দিচ্ছি। আর সীমান্তেও দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

উদিতনাথ বেরিয়ে যেতেই নিজের টানটান হয়ে থাকা শরীরকে আসনের অপর একেবারে এলিয়ে দিলেন মহারাজ আসাকা। আর উত্তেজনা নিতে পারছেন না। বোধহয় রক্তচাপ বেড়ে গেছে আবার।

আগুন নিয়ে খেলা অনেক আগেই শুরু করেছিলেন। এই খেলা একবার শুরু করলে শেষ করার ভার আগুনের ওপর। বেশির ভাগ সময়েই সবকিছু পুড়িয়ে যখন আর জ্বালানী মেলে না তখনই আগুন নেভে। অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ ভালো করেও টের পাচ্ছেন তিনি।

পত্র শোনার সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল তার মন। মহারাজ নাহাপনার কথা মতোই তাকে চলতে হবে। তার আদেশের ব্যাপারে যতই চিন্তা করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত নিতে হবে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। মন্ত্রী উদিতনাথের প্ররোচনা তার সিদ্ধান্তকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

পত্রের শেষে আরেকটা কথা লেখা ছিল। পত্রবাহক পত্রটা যখন দুবার পড়েছিল তখন সেই অংশও দুবার পড়েছিল। দুবারেই সেই কথাগুলো যেন তার কানে মধু ঢেলেছিল।

পত্রের সেই অংশে লেখা ছিল, 'আমার কথা মতো একবার কাজ করেছেন। তার বিনিময়ে আমি আপনার কথা মতো প্রতিদান দিয়েছি। এবারও আমার প্রস্তাব মেনে নিলে আপনারই লাভ হবে। ফল পাবেন আগেরই মতো। একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থাহীন নগরী আক্রমণ করার মতো ক্ষুদ্র কাজের প্রতিদান হিসেবে আপনি আবারও বিশ মণ স্বর্ণ পাবেন।'

৭০

প্রতিষ্ঠানার প্রধান ফটকে প্রহরী খুব সাবধানে নির্বাচন করে দেওয়া হয়। সৈনিকেরা যদিও সবাই একই প্রশিক্ষণ পায়, সবাইকেই কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই যেতে হয়, তবু মানব সমাজে সব জায়গাতেই কিছু না কিছু শ্রেণি বিভাগ হয়েই যায়। এখানেও হয়েছে। সব সৈনিকের কপালে এই দায়িত্ব জোটে না।

প্রধান ফটকের প্রহরী স্বভাবতই সাবধানী। সতর্ক দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হচ্ছে না। সেই চোখে তিনটা ঘোড়া অনেক দূর থেকেই চোখে পড়েছে। বেশ গতিতে ছুটে আসছে। খুরের ছন্দময় শব্দ হালকা কানে আসছে তার। নিশ্চিতভাবেই তিনজনের এই দলের নিজেদের গোপন করার কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ঘোড়াগুলোকে পড়তে শুরু করলো সে। মধ্যের ঘোড়াটা একটু এগিয়ে আছে। শুধু এগিয়েই নেই, একটু লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল মাঝের ঘোড়াটা অন্য দুটোর চেয়ে একটু আলাদা। একটু রাজকীয় ব্যাপার আছে। প্রহরীর আগ্রহ বেড়ে গেল। ঘোড়া সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ পেয়েছে সে। জাত সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে।

আরেকটু কাছে আসতেই প্রহরী চিহ্নটা দেখতে পেলো। একেবারে স্পষ্ট না হলেও চেনার জন্য যথেষ্ট। ঘোড়াটার রাজকীয় ব্যাপার সেই চিহ্নে বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। একটা তিলক চিহ্ন। চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল তার।

এটা রাজকীয় ঘোড়া শুধু নয়, স্বয়ং মহারাজ সাতকর্ণীর ঘোড়া। এবার ভালো করে খেয়াল করতেই ঘোড়ার আরোহীর অবয়বটাও তার আছে পরিষ্কার হয়ে ধরা দিলো। মহারাজকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হলো না তার।

স্বয়ং মহারাজ সাতকর্ণী আসছেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেল প্রহরী। মহারাজ বাইরে গেলেন কবে? তিনি কোনো কারণে বাইরে গেলে তো তার অবশ্যই জানার কথা। মাত্র দুজন লোক নিয়ে তিনি আসছেন কোত্থেকে?

মহারাজের সাথের বাকি দুজনকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। পোশাকের দিকে নজর দিলো সে। সাধারণ সাজ। তবে স্বয়ং মহারাজের পাশে যারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসে তাদেরকে সহজে সাধারণের কাতারে ফেলে দেওয়া যায় না।

আরেকটু কাছে আসতেই দুজনকে ভালো করে দেখা গেল। একজন বেশ লম্বা। কপালে মোটা করে কাপড় বাঁধা। আরেকজন নিতান্তই বালক, তবে শরীর শক্ত সমর্থ।

কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সে। এমন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি তার। এমন অবস্থায় কী করতে হবে তা অবশ্য প্রশিক্ষণের সময় ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের। সেটাই করলো সে। বড়ো করে দম নিয়ে সদর দরজার ভেরীটা বাজিয়ে দিলো সে।

সেই আওয়াজ যেন পুরো নগরের সামনের দিকটা কাঁপিয়ে দিলো। মহারাজ সাতকর্ণীর কানেও সেই আওয়াজ এসে পৌঁছেছে। প্রহরী তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে। সন্দেহজনক কিছু একটা আঁচ করেই বাজিয়ে দিয়েছে সংকেত।

সকল সদর দরজার প্রহরী ফটকের অপরের ছাউনিতে এসে জড়ো হয়েছে। এদের সন্দেহ আগে দূর করা উচিত। মহারাজ সাতকর্ণী তাই ভাবলেন। তিনি এখানে কোনো বিপদে পড়েননি।

তখনই ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি। রুদ্রদেব আর অসিত নিজেদের গতি বজায় রেখেছে। অনেকটা সামনে এগিয়ে গেল মহারাজের ঘোড়া। লাগাম ছেড়ে দিয়ে দুহাত মুক্ত করে নিলেন মহারাজ সাতকর্ণী। তারপর দুহাত ওপরে তুলে ফেললেন।

ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলেও ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করতে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এই ঘোড়া অনেকদিন থেকেই মহারাজকে চেনে। বিশেষ প্রশিক্ষণ আছে তার। মহারাজের পায়ের চাপের বিশেষ সংকেতগুলো সে বুঝতে পারছে। নিজের গতি বজায় রেখেছে সে।

দুহাত ওপরে তুলে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। হাতের দশ আঙ্গুলে মিলে একটা বিশেষ ফুলের আকার ধারণ করলো। সদর দরজার প্রত্যেক প্রহরী এই বিশেষ ভঙ্গির সাথে পরিচিত। তারা বুঝে যাবে এখানে মহারাজের সাথে কোনো বিপদ নেই। সদর দরজা খোলা যেতে পারে।

সংকেতটা দেখতেই প্রহরীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাদের হতবাক অবস্থা কেটে গেছে। বেশ দ্রুততার সাথে সদর দরজা খুলে দিলো তারা।

মহারাজ সাতকর্ণী অনেকটা এগিয়ে এসেছিলেন। দরজার একেবারে সামনে এসে ঘোড়ার গতি প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনলেন তিনি। অসিত আর রুদ্রদেব তার কাছে চলে এলো। দুজনকে নিয়ে নত মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীদের মাঝ দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন তিনি।

রাজার সুনজরে থাকার ফল অনেক ভালো হয়। যোগ্যতার অতিরিক্ত ফল লাভ হয় মাঝে মাঝে। মহারাজ সাতকর্ণীর সাথে থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানাতে প্রবেশ করার সময়েই রুদ্রদেব আর অসিতের কপালে রাজ অভ্যর্থনা জুটেছে।

অথিতিকে রাজপ্রাসাদের অথিতিশালাতেই পাঠানোর নিয়ম। তবে ওদের দুজনকে সেখানে পাঠাননি মহারাজ সাতকর্ণী। তারা তো আর অথিতি নয়। দুজনেরই স্থান হয়েছে মহারাজের অন্দর প্রাসাদে। মহারাজ ওদেরকে প্রহরীদের দিয়ে একটা কামরায় পাঠিয়েছেন। এখন আর মহারাজের ছদ্মবেশের প্রয়োজন নেই। শিকারি বেশের যেটুকু বাকি আছে সেটুকু ঝেড়ে ফেলতে অন্দরে গেছেন এখন তিনি।

রুদ্রদেব আর অসিত বসে আছে রাজপ্রাসাদের কামরায়। এখানে সাধারণ বলে কোন কামরা নেই। কেবলই চাকচিক্যের আধিক্য।

এমনটা রুদ্রদেব অনেক দেখেছে তার জীবনে। তবে জীবনের এই অংশে নয়, সে অনেক আগের কথা। তার জীবনের আগের অংশের কথা। সে নিজেও ছিল এক রাজ্যের রাজা। তার প্রাসাদেও এভাবেই নানা রকমের রত্ন, পাথর, আলোর ঝলকানি থাকতো। ভারতবর্ষের তখনকার সবগুলো বড়ো বড়ো রাজ্যের প্রাসাদেই গিয়েছিল সে। মণি-মাণিক্য-হীরের দ্যুতি, রং বেরঙ্গের নানা আলোর আধিক্য এখনও বজায় আছে প্রাসাদে। তেমন কিছুই বদলায়নি।

একটা রাজ্যের কথা অবশ্য না বললেই নয়। ইন্দ্রপ্রস্থেও যাবার সৌভাগ্য তখন হয়েছিল তার। এখনকার রাজারা সেসব দৃশ্যের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। সেই দৈব ব্যাপার কলির আগমনের সাথে সাথে উঠে গেছে পৃথিবী থেকে।

রাজারা একটু আমোদ করবেন, থাকবেন বিভবের মধ্যে, সেই ভালো। এখানে অপচয়ের কোনো ব্যাপার নেই। রাজাদের মনে এবং বাইরে কখনো রিক্ত হতে নেই। তাতে রাজ্যের অমঙ্গল। আসলে রিক্ত রাজা বলে কিছু হয় না, হওয়া উচিতও নয়।

রুদ্রদেব চিন্তা করছে অতীতের কথা। রোমন্থন করতে গিয়ে দুই কালের স্থাপত্যের তুলনা করছে সে। তবে অসিতের এই ব্যাপারে রোমন্থন করার মতো স্মৃতি নেই। সে এসব প্রথম বার দেখছে।

অসিতের চোখের মণি দ্বিগুণ বর্ধিত আকার ধারণ করেছে। সবকিছু ছুঁয়ে দেখার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে তার। ছুঁয়ে দেখলে এখানে বাঁধা দেবার কেউ নেই। তবে এক্ষেত্রে নিজেই নিজেকে বাঁধা দেয় মানুষ। নিজেকে ছোটো করে দেওয়া বিবেকের বাঁধা।

কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ রাজ পোশাকে হাজির হলেন মহারাজ সাতকর্ণী। মহারাজের দর্শনে এবার অসিতের অবাক হবার মাত্রা আরও বাড়লো। সজ্জিত রাজপোশাকের মহিমায় তাদের দুজনের শির আপনাতেই নত হয়ে এলো।

কক্ষে নিজের জন্য নির্ধারিত আসনে বসলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তোমরাও বসো।'

মহারাজের আগমনে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আদেশ পেতেই তামিল করতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না।

'তোমাদেরকে আমি এই রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছি। তোমরা এখন এই প্রাসাদের সদস্য। যে-কোনো প্রজাদের জন্য রাজপ্রাসাদের সদস্য হতে পারা বেশ সম্মানের বিষয়। তোমাদের কেমন লাগছে?'

রাজপ্রাসাদের সদস্য হবার ব্যাপারটা অসিত ঠিক বুঝতে পারেনি। প্রবেশেই কি সেই অধিকার জন্মে। উত্তর দিলো রুদ্রদেব, 'মহারাজ, আপনি যে সম্মান আজকে আমাদের দিলেন তা এই অভাজনদের জন্য বেশ ভারী।'

মাথা ঝাঁকালেন মহারাজ সাতকর্ণী। রুদ্রদেবের কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকল এক সুবেশী পরিচারিকা। অসিতের মনে হলো কোনো রাজমহিষী হবেন। সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, রুদ্রদেবের বাঁধা পেয়ে নিজেকে সংবরণ করলো। পরিচারিকার হাতে সুদৃশ্য দুটো পানপাত্র।

'বলতে পারো এটাই আমাদের ঐতিহ্য। প্রাসাদে আসা অথিতিদের রাজকীয় পানীয় দিয়েই বরণ করে নেওয়া হয়। তোমরা এই পানীয় গ্রহণ করো। সাথে স্বীকার করে নাও আমার আনুগত্য।'

এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ার ফলে ক্লান্তিতে পিপাসা ভালোই পেয়েছিল। দুজনেই গ্রহণ করলো পানীয়ের পাত্র। এতক্ষণে অসিত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রাজপ্রাসাদের কোনো জিনিস স্পর্শ করতে পারলো।

পানপাত্র তুলে নিয়েই চুমুক দিলো অসিত। অদ্ভুত তার স্বাদ। চুমুক দিতেই যেন সারা দেহে মিষ্টি একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। পানীয় যে শুধু নিয়মানুযায়ী গলনালি

বেয়ে পাকস্থলি পর্যন্ত যাচ্ছে না, বরং ছড়িয়ে পড়ছে দেহের প্রতিটা শিরায়, উপশিরায়, কোষে কোষে। পানীয় শেষ করতে দুজনের তেমন সময় লাগলো না।

'ঠিক আছে। নিয়ম পালন করা হয়ে গেল। এবার তোমাদের দুজনকে পরিচারিকা অতিথিশালায় নিয়ে যাবে। সেখানে তোমাদের জন্য খাদ্যপানীয় আর বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করা আছে। সৈনিকেরা সবাই জানে, তোমরা আমার বিশেষ অথিতি। কোনো রকম সংকোচ করবে না। যা লাগবে প্রহরীদের বললেই চলবে।'

পানীয় নিয়ে আসা পরিচারিকাই তাদেরকে নিয়ে যাবে অথিতিশালায়। অসিত এতক্ষণ পানীয়ের স্বাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবার পরিচারিকার সাজ আর রূপ তার মনোযোগ কেড়ে নিলো। সরাসরি তাকাচ্ছে না সে। তবে যেভাবেই তাকাক, রুদ্রদেবের চোখকে ফাঁকি দিতে পারছে না। মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো তারা।

মহামন্ত্রী গিরিধারী মহারাজের আসার খবর এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন। তিনি শুনে আর বিলম্ব করেননি। রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হয়েছেন। মহারাজ কোন ঘরে আছেন খবর নিয়ে সেই ঘরের সামনে আসতেই তার সাথে দেখা হয়ে গেল রুদ্রদেব আর অসিতের। তারা তখন পরিচারিকার সাথে ঐ ঘর থেকে বেরোচ্ছিল।

মানুষ চেনার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে গিরিধারীর। মানুষের শরীরের একটা ভাষা আছে যা তার ভঙ্গিতে লেখা থাকে। সেই ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে অনেক চর্চা করতে হয়। অভিজ্ঞ মানুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহজেই সেই ভাষা পড়ে ফেলতে পারে। গিরিধারী সেই ভাষা পড়তে সচেষ্ট হলেন। তিনি আগেই শুনেছেন মহারাজের সাথে দুজন লোক এসেছে। এরাই তাহলে সেই দুই লোক।

রুদ্রদেবের দিকেই আগে নজর গেল তার। এক নজরেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন গিরিধারী। তবে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন এই লম্বা লোকটার বেলায় তিনি তা পারছেন না। লক্ষণ শাস্ত্রের কোন লক্ষণের সাথেই এই লোকের দেহ ভঙ্গি মিলছে না। আশ্চর্য শান্ত চোখ কিন্তু অন্তর্ভেদী। এই লোক সাধারণ কোনো লোক হতেই পারে না।

সাথের বালককে পড়তে অবশ্য তার তেমন সমস্যা হলো না। চোখেমুখে বিহ্বল মুগ্ধতার ছাপ স্পষ্ট। রাজ মহলের ঐশ্বর্যে চোখ ধাধিয়ে গেছে। তার মানে এই বালক কখনো এমন কিছু দেখেনি। তার উৎস স্থলে সম্পদের প্রাচুর্যের চাকচিক্য ছিল না। পোশাক অবশ্য দুজনের ক্ষেত্রেই একই সংকেত দিচ্ছে।

নিজের চিন্তাকে আর বাড়তে দিলেন না গিরিধারী। মহারাজের সাথে এখন জরুরি সাক্ষাৎ করতে হবে। এমনিতেই এই বাঘের ঘটনায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। মহারাজের ফেরা নিয়েও তার মনে সংশয় ছিল। সেই ব্যাপারে স্বস্তি মিলেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তিনি।

'আসুন গিরিধারী' ভেতর থেকে মহারাজ সাতকর্ণী ডাকলেন, 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। জানি আমার আসার সংবাদে আপনি যখন তখন ছুটে আসবেন। আমাকে একটু বিশ্রামের সময়ও দেবেন না।'

'সেজন্য ক্ষমা প্রার্থী মহারাজ। তবে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কাজ করা যায় না।'

'আচ্ছা, বলুন, খেলায় এখন কোন চাল চলছে। আমাকে বুঝিয়ে দিন। এত উত্তেজনার খেলায় ময়দানের পাশের দর্শক হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। মাঠে নামতে হবে।'

গিরিধারী এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন। এবার বসলেন, 'খেলায় এখনও নতুন কিছুই হয়নি। তবে সুতো টানটান হয়ে গেছে। যে-কোনো সময় ছিঁড়ে যাবে। আপনি এখনও খেলার ভেতরেই আছেন। আচ্ছা, আপনার নরখাদক মারার ঘটনা বলুন।'

'আমি মুখে কিছু বলবো না গিরিধারী। এখনই দেখতে পাবেন।'

মহারাজ জোরে হাততালি দিয়ে উঠলেন, 'ভেতরে নিয়ে এসো।'

সংকেত পেয়ে দুজন পরিচারক দুটো পূর্ণবয়স্ক বাঘের চামড়া নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। এই চামড়া একটু প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। তারপর শোভা পাবে রাজসভার দক্ষিণ দেওয়ালে। হলুদ কালো রং ঘোষণা করবে মহারাজের বীরত্ব।

'আপনাকে সফলতার জন্য অভিনন্দন। কিন্তু এখানে তো দুটো চামড়া দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি একসাথে দুটো নরখাদক ছিল? আপনি দুটোই হত্যা করেছেন। বাহ, এই বীরত্ব অনন্য। আপনার এই নরখাদক মারার ইতিহাস লোকের মুখে মুখে ঘুরবে।'

বলাই বাহুল্য, দুটো বাঘকে রুদ্রদেব মারলেও বাঘের মৃতদেহের চামড়ার ওপর কোনো লোভ করেনি সে। বাঘের চামড়া রাজপ্রাসাদের দেওয়ালেই মানায়। কুঁড়েঘরে নয়। দুটো চামড়াই মহারাজ সাতকর্ণীকে দিয়ে দিয়েছিল সে।

মহারাজ সাতকর্ণী নিজের না করা কাজের প্রশংসা শুনে একটু বিব্রত বোধ করলেন, 'সে অনেক কথা গিরিধারী। বাঘ মারতে গিয়ে অনেক কাণ্ড ঘটেছে।'

'আপনার অনুপস্থিতিতে আমাকেও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল মহারাজ। আপনার জন্য অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যেতো। আমার মাথায় চিন্তাটা হঠাৎ করেই এসেছিল। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।'

'না শুনে কীভাবে বলি। আপনি তো ভুল সিদ্ধান্তও নিয়ে থাকতে পারেন গিরিধারী। সিদ্ধান্তটা কী ছিল?'

'আমি আমার কাজের কথাটা পরে বলি মহারাজ। সেই কাজ হয়ে গেছে। মন্ত্রীদের কূটনীতির প্যাঁচের চাল। সেটা আপনার তেমন ভালো লাগবে না।'

মহারাজ একটু ভ্রু কুঁচকে তাকালেন।

গিরিধারী একটু বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন, 'আসলে মহারাজ, আপনার এক সাথে দুই বাঘ মারার গল্প শোনার জন্য আমার আর তর সইছে না।'

এবার মৃদু হাসলেন মহারাজ সাতকর্ণী। ধীরে ধীরে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তার বাঘের সন্ধানে যাওয়া, ফাঁদ পাতা, দ্বিতীয় বাঘের আকস্মিক আক্রমণ, রুদ্রদেবের অসাধারণ ধনুর্বিদ্যা, তার প্রাণ রক্ষা।

'বুঝলেন গিরিধারী, আপনি আসার আগেই ওরা দুজন এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

'এদের মধ্যে লম্বা যুবক অসাধারণ যোদ্ধা। ঠিক এই কারণেই ওকে আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি। বলতে গেলে এই বাঘের হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে ওর মাধ্যমেই

বাঁচিয়েছে। আপনি আমার কথা শুনে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না, আপনাকে ওর যুদ্ধ কৌশলের প্রদর্শনী দেখতে হবে। তখন বুঝবে আমি তার সম্পর্কে যথেষ্ট কমিয়েই বলছি। আমার এই দীর্ঘ যোদ্ধা জীবনে আমি ভারতে ওর মতো কোন যোদ্ধা দেখিনি।'

গিরিধারী মহারাজের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন। সেই সাথে প্রায় মুগ্ধ হলেন। মহারাজের চোখ মুখ থেকে যেন প্রশংসা ছিটকে বেরোচ্ছে। মহারাজ পোড় খাওয়া যোদ্ধা। সমর নায়ক হিসেবে তিনি শত্রুদের গলা শুকাবার কারণ হয়েই এসেছেন সব সময়। তিনি যদি কারো সম্পর্কে এমন করে প্রশংসা করেন তবে সেটা অকারণ নয়, নিশ্চয়ই তীব্র সত্য।

মহারাজ সাতকর্ণী এখনও শেষ করেননি। রুদ্রদেবকে এখানে নিয়ে আসার একটা বিশেষ কারণ আছে, 'বুঝলেন গিরিধারী, আপনি তো বারবার বলছিলেন, আমাদের বিশেষ বাহিনীর জন্য আমাদের একজন ভালো সেনাপতি দরকার। বলতে বলতে আমার কানের পোকা প্রায় বের করে দিচ্ছিলেন। আমার মনে হয়, এই কাজের জন্য রুদ্রদেবের চাইতে যোগ্য কাউকে পাওয়া যাবে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। কালকেই ওকে বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

এই কথা শুনে গিরিধারী যেন একটু ধাক্কা খেলেন। মুখে যেন একটু বিব্রত ছাপ। মহারাজ সাতকর্ণীর দৃষ্টি এড়ালো না সেই ছায়া, 'কী হলো গিরিধারী। আপনার মনে হয় আমার এই সিদ্ধান্তটা ঠিক পছন্দ হয়নি।'

'না মহারাজ, সেরকম কিছু নয়। তবে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে।'

'কী হলো আবার?'

'বলেছিলাম না, আপনার অবর্তমানে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন সেখানেই আপনার সাথে আমার সংঘর্ষ বাঁধার উপক্রম হয়েছে।'

'কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?'

'আমি এরই মধ্যে আমাদের বিশেষ বাহিনীর জন্য গত পরশু সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে দিয়েছি। আসলে আপনি আসার আগে কাজ এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।'

'কী বলছেন! কাকে নিযুক্ত করেছেন?'

'রিপুজিতকে মহারাজ।'

এবার মহারাজ সাতকর্ণী চিন্তায় গম্ভীর হলেন। রিপুজিত তার খুব যোগ্য সেনাপতি। তেজী ক্ষত্রিয়। সমর বিদ্যায় খুবই ভালো। কিন্তু তার ক্ষেত্রে কেবল একটাই ঝামেলা আছে।

ক্ষত্রিয় তেজের আধিক্যের কারণে রিপুজিতের দেহে জেদের অংশ অনেক বেশি। তার একগুঁয়েমির পরিচয় মহারাজ সাতকর্ণী এর মধ্যেই কয়েকবার পেয়েছেন। তবে সে কেবল একজন অতুলনীয় যোদ্ধা বলে সেসব আচরণ অগ্রাহ্য করেছিলেন তিনি।

কিন্তু, এই সংকটে কী করবেন?

গিরিধারী বুঝতে পারলেন ঝামেলা ভালোই পেকেছে। তাকেই সমাধান বের করতে হবে। তবে তিনি মহারাজের অনুপস্থিতিতে কাজ একটা করেননি, করেছেন দুটো।

দ্বিতীয় কাজের কথা মহারাজের কানে ভুলেও তোলা যাবে না।

৭১

মানুষের মনে কোনো অনুভূতিই বেশিদিন তীব্র অবস্থায় থাকে না। ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক যে-কোনো অনুভূতির ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। কারো প্রতি তীব্র ঘৃণা, রাগ, হিংসা পুষে রাখা অনেক কঠিন আবার কারো প্রতি তীব্র ভালোবাসা, আকর্ষণ বজায় রাখাও অনেক শক্ত কাজ।

রাজবীরের এখন আর ভয় লাগে না। প্রথম প্রথম ভয়ের চোটে রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারতো না। চোখ লেগে এলেও সেখানে থাকতো দুঃস্বপ্নের আনাগোনা। তবে এখন সে ভাবলেশহীন। বৈদ্য যেমন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে দেখতে মৃত্যুর প্রতি অনুভূতি হারিয়ে ফেলে তার এখন ঠিক সেই অবস্থা।

সীমান্তে এখনও কলিঙ্গের বিশাল সেনা অবরোধ করে রেখেছে। সে বিশাল বাহিনী দেখে এখন ভাবলেশহীন চেহারা তার। তাদেরকে দেখা এখন তার দৈনন্দিন কাজ। মাঝে মাঝে মনে হয় এরা এসে যেন ভালোই হয়েছে। দিনের পর দিন প্রান্তর, পাহাড়, রুক্ষতা, জড়তা দেখতে দেখতে প্রাণের দফারফা অবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

ওদের এদিকে কোনো খেয়াল নেই। একবারও সীমানা পার হবার চেষ্টা করেনি তারা। নিজেদের নিয়ে আছে। নিয়মমাফিক পাহারা দিচ্ছে, সকাল বেলা সৈনিকদের নিয়মিত সমাবেশ হচ্ছে, অস্ত্রের মহড়া হচ্ছে, ক্ষত্রিয় সমুচিত হালকা বিনোদন যুক্ত খেলাধুলা হচ্ছে, মাঝে মাঝে কিছু সৈন্যের মাঝে মারামারিও লেগে যাচ্ছে। সেসব দেখতে দেখতে রাজবীরের দিন এখন বেশ ভালোই কাটে।

তবে, আজ সকালে সেই অনিশ্চয়তা মেশানো ভয়টা আবার ফিরে এলো তার মাঝে। আজ অন্যদিনের মতো কাজ করছে না তারা। সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। সেই লক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে ওদের সারা শিবির জুড়ে। ধুলো উড়ছে জায়গায় জায়গায়। শিবিরের কাপড় খুলে গুটিয়ে নিচ্ছে। প্রয়োজনীয় সবকিছু জড়ো করে ঘোড়া, গরু আর হাতে টানা রথে চাপিয়ে দিচ্ছে। ওদের কাজের মধ্যে কোনো শিথিলতা নেই। বেশ তাড়াহুড়া ভাব।

কিছুই ঠিকমতো বুঝতে পারছে না রাজবীর। তবে কি ওরা চলে যাবে এখান থেকে? এতদিন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এত বিশাল এক বাহিনী এখানে সমাবেশ করে ছিল।

নিজে নিজে চিন্তা করে আর পারলো না সে। দৌড় দিলো দুর্গ প্রধানকে খবর দিতে। তার দায়িত্বই এটা। যাই ঘটুক, প্রধানকে জানাতে হবে।

প্রধানের সামনে এসে খবরটা দিলো সে, 'ওরা সবকিছু গুছিয়ে ফেলছে। মনে হচ্ছে আমাদের সীমান্ত আর অবরোধ করে রাখবে না। চলে যাবে।'

'কীভাবে বুঝলে তুমি? ওরা কি তোমার কানে কানে কথা বলে বিদায় নিয়ে গেছে? নিজে নিজে কখনো সিদ্ধান্ত নিতে যেও না।'

'আজ্ঞে। কিন্তু চলে যেতে না চাইলে ওরা আজ সকালে হঠাৎ করে সবকিছু গোছানো শুরু করলো কেন?'

'শিবির পেছানোর জন্যই যে ওরা সবকিছু গোছাচ্ছে এটা তোমাকে কে বলেছে? সবকিছু গুছিয়ে আমাদের দিকে এগিয়েও তো আসতে পারে।'

এবার হাঁ হয়ে গেল রাজবীরের মুখ।

'একটা কথা ঠান্ডা মাথায় ভাবো, এতদিন ধরে ওরা চলে যাবার জন্য আমাদের সীমান্ত অবরোধ করে রাখেনি। ওরা চলে যাবার জন্য সবকিছু গুটিয়ে নিচ্ছে না।'

'তাহলে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে রাজবীর।

'আমি আগেই জানতাম ওরা ছেড়ে দেবে না। সঠিক সময়ের অপেক্ষা করবে। এবার সঠিক সময় এসেছে। ওরা এখন আমাদের আক্রমণ করবে। যাও, দেখো ওরা কী করে। আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি।'

রাজবীরের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ আর বন্ধ হলো না। আর কোনো কথা বলল না সে। ফিরে গেল তার নিজের পাহারা দেবার জায়গায়। পর্বত সমান ভীতি নিয়ে তাকিয়ে রইলো সামনের সেনাদলের কর্মকাণ্ডের দিকে।

দেখতে দেখতে সেনাদলের গোছগাছ শেষ হলো। সম্পূর্ণ সেনাদল খাদ ধরে এগোচ্ছে। একটু দূরে গিয়েই শেষ হয়েছে এই খাদ। সেখান দিয়েই সেনাদল তাদের সীমান্তে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা ঐ খাদের পার ধরে এই পারে এসে কী করবে?

ঐ খাদ পেরোলেই তাদের সামনে খোলা প্রান্তর। সেই প্রান্তর ধরে তারা চলে যেতে পারে অমরাবতীর দিকে। এই সেনাদলের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তাদের এই ছোটো দুর্গ না। তারা নিশ্চয়ই অমরাবতী আক্রমণ করতেই এসেছে।

তবে যে সেনাদল যুদ্ধযাত্রা করেছে তাদের থেকে এমন সরল আচরণ আশা করা যায় না। চলার পথের পাশের এই শত্রু দুর্গকে তারা নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা বলবে না। একটু মাড়িয়ে দিয়ে গেলেই হলো।

এই দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন ভালো না। বানানো হয়েছিল সীমান্তের ডাকাত মোকাবেলা করার জন্য, সেনার সাথে যুদ্ধ করার জন্য নয়। মাঝে মাঝে বড়ো কোনো দস্যুদলের আক্রমণই ঠেকানো দায় হয়ে পড়ে, এই সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা তো আলোচনাতেই আসে না।

খাদের ধার পার হয়ে পুরো সেনাদল নিয়ে এপাশে এসে দাঁড়ালো কলিঙ্গ সেনাপতি আদিত্য। কৌতুক মাখা চোখে একবার তাকালো ছোটো দুর্গটার দিকে। তার এই দুর্গ এখানে অক্ষত ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছেই নেই। পেছনে শত্রু অক্ষত ছেড়ে যাওয়া প্রবল নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে।

আদিত্য কলিঙ্গের প্রধান সেনাপতি। কম বয়সেই এই পদে এসেছে তবে তোষণ করে নয়, রীতিমতো কর্ষণ করে। তার গুণই তাকে এই পদে নিয়ে এসেছে। বিশাল ছাতি, শ্মশ্রুহীন পুরুষালী চেহারা তার বয়সের কমতি অতটা বুঝতে দেয় না।

সীমান্তে এভাবে বসে থাকতে থাকতে হাতে পায়ে যেন খিল ধরে গিয়েছিল। তবু রাজার আদেশ, ক্ষত্রিয় কখনো তা লঙ্ঘন করতে পারে না। আজ সকালে মহারাজ আসাকার দূত এসেছিল আদেশ নিয়ে। তার সেনাকে আড়মোড়া ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে গেছে। সেনাপতি হিসেবে আসলে সে এটাই চেয়েছিল। যত যুদ্ধ তত উন্নতি।

পথের ধারে থেমে হাতের ইশারায় কয়েকজন তিরন্দাজ আর ঘোড়সওয়ারের একটা দল সে সীমান্ত দুর্গের দিকে পাঠিয়ে দিলো। এই ছোটো দুর্গ জয় করতে এরচেয়ে বড়ো কোনো দলের দরকার নেই।

ওদিকে দুর্গের সেনা প্রধান সবাইকে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। রাজবীর এখন তারা পাহারা দেবার স্থান ত্যাগ করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আর পাহারা দিয়ে লাভ নেই। সেনা প্রধান এখন আর কোনো আশা দেবার অবস্থাতে নেই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনের সেনার গতির দিকে। কয়েকজন তিরন্দাজ আর ঘোড়সওয়ারের ছোটো দলটার এদিকে এগিয়ে আসা তাদের চোখ এড়ালো না।

রাজবীর ভয়ার্ত কাঁপা গলায় অস্ফুটে বলে উঠলো, 'এখন আমরা কী করবো?'

দুর্গ প্রধান ততক্ষণে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, 'এখানে থেকে যুদ্ধ করার চেষ্টা করা আত্মহত্যা হবে। আমাদের এখন একটা কাজই করার আছে। দুর্গ ত্যাগ করে রাজধানীতে চলে যাওয়া। সবার ঘোড়া তৈরি আছে না?'

সবাই সায় দিলো। আছে।

'তাহলে সবাই যে যার ঘোড়া নিয়ে দুর্গের পেছন দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে যাবো। কেউ পেছনের দিকে ভুলেও তাকাবে না। তারপর আমরা পূর্ণ বেগে ছুটবো রাজধানী অমরাবতীর দিকে।'

'কিন্তু, ওরা যদি আমাদের পেছনে ধাওয়া করে?' এক সৈনিক ভয়ে ভয়ে সম্ভাবনার কথা জানায়।

'আমাদের হাতে এখন আর কোনো উপায় নেই। এখানে থাকলে ইঁদুরের মতো মরতে হবে। ঘোড়ার গতিতে ওদেরকে হারিয়ে দিতে হবে। দুর্গের পেছনের পথ দিয়ে গেলে গাছের আড়াল পাবো। পথে ঘাস আছে, ধুলো উড়বে না। ওদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তারপর রাজমার্গে উঠবো আমরা। তখন আমাদের দেখে ফেললেও ওরা আর ধরতে পারবে না। আর কোনো কথা নয়। এখুনি সবাই বেরিয়ে পড়ো।'

'আচ্ছা।'

সবাই নির্দেশ বুঝতে পেরেছে। একটা দুটো অস্ত্র ছাড়া কেউ আর কিছু সাথে নেওয়ার কথা চিন্তাও করলো না। জরুরি মুহূর্তে পলায়নের এটাই নিয়ম।

সবার আগে দুর্গের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন দুর্গ প্রধান। তাকে অনুসরণ করলো সবাই। ঘেসো পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তারপরে রাজমার্গে উঠে পড়লো তারা। এবার আর লুকানোর কিছু নেই। টগবগিয়ে ছুটল ঘোড়া। নিশ্চয়ই এতক্ষণে শত্রুর চোখে পড়ে গেছেন তারা।

আদিত্য ঠায় ঘোড়ার ওপর বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ সোজা রাজমার্গে উঠে আসা দলটাকে দেখতে পেলো। তাদের থেকে প্রায় সহস্র ধনু দূরে আছে দলটা। নিশ্চয়ই দুর্গের পেছন কিংবা পাশ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দলটা ছোটো। প্রাণপণে নিশ্চয়ই এখন রাজধানীর দিকে ছুটবে তারা। পৌছানোর আগে থামবে না।

দলটাকে তাড়া না করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। ছোটাছুটি করে লাভ নেই। অমরাবতীতে পৌছতে তেমন সময় লাগবে না। সেখানে নিশ্চয়ই সবাইকে পাওয়া যাবে।

এই সীমান্ত দুর্গ এখন পরিত্যক্ত। দুর্গের দিকে পাঠানো সেনাদের ফিরে আসার সংকেত ধ্বনি বাজাতে বলল সে। তাড়াতাড়ি পুরো বাহিনী নিয়ে অমরাবতীর দিকে এগোতে হবে।

দুর্গের পলায়নপর সৈন্যরা ঘোড়ার দমের সর্বোচ্চ পরীক্ষা নিলো। ঘোড়া গুলো বেশ তাগড়া, তবে ছোটার তেমন অভ্যাস নেই। তাদের যথেষ্ট কষ্ট হতে লাগলো। কোন প্রকার বিশ্রামের সুযোগ পেলো না বোবা জানোয়ারগুলো। অবশ্য এমন মুহূর্তে কষ্ট করার জন্যই তাদের নিয়মিত দলাই মলাই করা হয়। যখন রাস্তা থেকে অমরাবতীর প্রধান দুর্গের পতাকাটা দেখা গেল তখনই দুর্গ প্রধান ঘোড়ার গতি একটু কমালেন। তার হাতের ইশারায় বাকি সেনারাও তাই করেছে।

মন্ত্রী বলদেব সময়ের ক্ষুব্ধতা অনেক আগে থেকেই টের পাচ্ছেন। তাকে দূত এসে সীমান্তের সেনাদের পালিয়ে আসার খবর দিলো। তিনি জানতেন একদিন না একদিন এই সময় আসবে। সীমান্ত দুর্গ পুরো ফাঁকা করে দুর্গ প্রধান সব সেনা নিয়ে চলে এসেছে নগরে। এর একটাই মানে হতে পারে। এতদিন অবরোধ করে রাখা কলিঙ্গের সেনারা এখন তাদের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে।

দুর্গ প্রধান ঘোড়া থেকে নেমে সরাসরি চলে এসেছে বলদেবের কাছে। পুরো শরীর ভেঙ্গে আসতে চাইছে ক্লান্তিতে। কিন্তু সেসবে এখন নজর দেবার সময় নেই।

বলদেব তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। দুর্গ প্রধান বলতে শুরু করলো, 'মহামন্ত্রী, কলিঙ্গের পুরো সেনাদল আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। আমাদের দুর্গ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আমরা পালিয়ে বেঁচেছি। জানি, কাপুরুষের মতো কাজ করেছি। কিন্তু উপায় ছিল না।'

'না, তোমাকে আমি কাপুরুষ বলছি না। তুমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ। সেখানে বোকার মতো লড়াই করতে গিয়ে মরলে তোমরাও মরতে আমরাও খবর পেতাম না। ওরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে বসতো। কলিঙ্গের সেনা এখন নিশ্চয়ই রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে?'

'আজ্ঞে মহামন্ত্রী। এছাড়া আর কী করবে?'

'আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়? ওরা কখন নাগাদ এই নগরে এসে পৌছতে পারে?'

দুর্গ প্রধান হিসাব কষতে শুরু করলো, 'ও দের কাছে হস্তী আছে, রথ আছে, শিবির আছে, দুর্গের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলার আর চড়ে বসার যন্ত্রও আছে। সেসব নিয়ে তো আর আমাদের মতো গতিতে আসতে পারবে না। তাই যত তাড়াতাড়িই আসুক, ওদের আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে।'

বলদেবও হিসেব কষছেন, 'তার মানে কাল সকালে ওদের মুখোমুখি হতে হবে। তাই তো?'

একটা ঢোক গিলে বলদেবের দিকে তাকালো দুর্গ প্রধান, 'মহামন্ত্রী, আপনি মনে হয় আমার কথা বুঝতে পারেননি। ওদের সেনাদলের আকার অনেক বড়ো। অমরাবতীকে তারা একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। সাতবাহনের মূল বাহিনী এখন প্রতিষ্ঠানায় আছে। তারা খবর পেয়ে এখানে আসার আগেই নগর ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি সবাইকে এই মুহূর্তে পালানোর নির্দেশ দিন।'

'আমি এখন এই নগরের দায়িত্বে আছি। কী নির্দেশ দেবো, আর কী দেবো না সেটা নিয়ে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। তবে ঠিকই বলেছ, আমাদের এই নগরে এখন সেনার চেয়ে দাস-দাসীর সংখ্যা বেশি। এই বিশাল সেনার মোকাবেলা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

দুর্গ প্রধান আর কোনো কথা বলে না। বলদেব আলোচনা শেষ করলেন, 'তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এখন আর কোনো কথা নয়। তুমি আর তোমার লোকেরা এখন আহার আর বিশ্রাম করবে। প্রাণ যথেচ্ছ ত্যাগ না করে রাজধানীতে এসেছ। এখন তোমাদের সাহায্য রাজধানীর প্রয়োজন হবে। বাকি সিদ্ধান্ত আমি নেবো। সেসব নিয়ে তোমাকে মাথা খাটাতে হবে না। কোনোরকম দুশ্চিন্তা না করে কেবল শক্তি সঞ্চয় করো। হতে পারে কাল সকালে এই নগরের প্রত্যেক যোদ্ধাকে তাদের সামর্থ্যের পূর্ণ অংশের ব্যবহার করতে হবে।'

দুর্গ প্রধান অভিবাদন জানিয়ে চলে যায়। একা বসে থাকেন বলদেব। কালের প্রভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। নিজের অশক্ত বৃদ্ধ শরীরকে আরও অবসন্ন মনে হয় তার। সাতবাহনের সেরা সমর কুশলী সেনানায়কদের কেউই এখন অমরাবতীতে নেই। কাজ চালানোর মতো একজন এখানে সেনাদের দায়িত্বে আছে। তবে সে ক্ষমতায় কম হলেও সাহসে বেশ বলীয়ান।

মহারাজ সাতকর্ণীর মনোভাবও তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি হয়তো আসলেই বাতিল হয়ে গেছেন। দেহ পুরানো হবার সাথে সাথে রাজনীতির মারপ্যাচেও তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মহারাজ হয়তো ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তাকে সরিয়ে দিয়ে।

কলিঙ্গের অবরোধের খবর সেই কবে পাঠানো হয়েছিল প্রতিষ্ঠানায়। তবু মহারাজ সাতকর্ণী কোনো পদক্ষেপ নেননি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে মহারাজ সত্যি সত্যিই যেন অমরাবতীকে ত্যাগ করেছেন। তবে তিনি জানেন, তা অসম্ভব, এটা মহারাজের জন্মস্থান।

সারাদিন আর আর কিছুই করার থাকলো না। সীমান্তের সেনাদের চলে আসার খবর রাজধানীতে এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। নগরের বাইরে থেকে সব প্রজারা ভেতরে চলে এসেছে। থমথমে অবস্থা।

সমর্থ যোদ্ধারা সবাই তৈরি। বলদেব সেনাপতিকে ডেকে কেবল একটা কথাই বলত পারলেন, 'শোনো, যে সেনা আসছে তার মোকাবেলা করার সামর্থ্য আমাদের নেই। সেনার দায়িত্ব তোমার ওপর। তোমাকে আমি অসম যুদ্ধ করতে আদেশ দিতে পারি না। ইচ্ছে করলে তুমি তোমাদের সেনা নিয়ে এই নগর ত্যাগ করতে পারো। তবে প্রজারা এত তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। আমি প্রজাদের বাঁচিয়ে সন্ধি করার চেষ্টা করতে পারি।'

সেনাপতি এই কথা শুনেও মাথা উঁচু রেখেছে, 'মহামন্ত্রী, আমি এবং আমার সেনারা এখনও বিশ্বাস করি, সাতবাহনের রাজধানী হলো অমরাবতী। প্রতিষ্ঠানা নয়। এই নগরী কোনো ছোটোখাটো দুর্গ নয়, যা বিনা কথায় আমরা ত্যাগ করতে পারি। স্বয়ং মহারাজ সাতকর্ণী তার এই নগরের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন। প্রাণ থাকতে আমি এই নগরের অধিকার শত্রুর ওপর ছাড়বো না। মৃত্যু যখন এই দেহ অধিকার করবে তখন কি হবে বলতে পারছি না।'

বলদেব এর পরে আর কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু হাত রাখলেন সেনাপতির কাঁধে, 'ঠিক আছে, তৈরি হয়ে নাও।'

দুর্গ প্রধানের করা হিসেবকে একেবারে নির্ভুল প্রমাণ করে সূর্য বিগত হবার একটু বাদেই অমরাবতীর দেওয়ালের গোঁড়ায় এসে উপস্থিত হলো আদিত্য আর তার বাহিনী। বলদেব আর সেনাপতি প্রাসাদের ওপর থেকে দেহতে পেলেন সেই বাহিনী। মাত্র এক বেলা আগে যে সেনাপতি নগরের রক্ষা, ক্ষত্রিয় ধর্ম, প্রাণ ত্যাগ এসব নিয়ে দৃঢ় সংকল্প দেখিয়েছিল, সে পর্যন্ত প্রতিপক্ষ সেনার বিশালতার দিকে নজর দিয়ে একবারের জন্য ঢোক গিলতে বাধ্য হলো। অন্ধকারের ভেতরের মশালের আলো সেনার সীমানা প্রদর্শন করছে।

দেখতে দেখতে শিবির স্থাপনের কাজ শুরু করে দিলো কলিঙ্গের সেনারা। প্রতিটা শিবিরের সামনে মশাল জ্বলতে লাগলো। বলদেব জানেন এই রাতের বেলা নগরের দিকে কেউ এগোবে না। সব প্রস্তুত করে সকালে শুরু হবে খেলা।

আদিত্য ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। একজন সেনা তার ঘোড়াটা নিয়ে গেল খাবার আর যত্নের দায়িত্ব নিয়ে। ঘোড়া থেকে নেমে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো কলিঙ্গের সেনাপতি। তার শিবির স্থাপন এর মধ্যেই প্রায় হয়ে এসেছে। তবে আজ রাতে আর তাবুতে গিয়ে লাভ নেই। ঘুম আসবে না।

বয়সের কারণে বলদেবেরও ইদানীং রাতে ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। আজ তো ঘুম আরও আসবে না। তিনি প্রাসাদের একেবারে ওপরের ছাদে আছেন। প্রায় অপলক দৃষ্টি মেলা আছে সামনের সেনাদলের দিকে।

সূর্য মানুষের এতো চিন্তার ধার ধারে না। সে চলে নিজের নিয়মে। যথাসময়ে সে আবার দেখা দিলো। বলদেব আর আদিত্য কারোই নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করা হয়নি।

পুরো অমরাবতী দুর্ভেদ্য পাঁচিলে ঘেরা। আদিত্য এবার সকালের প্রথম আলোয় সেই দৃশ্য বেশ ভালোভাবেই খেয়াল করলো। সবকিছু মনে গেঁথে নিতে লাগলো সে। সব দুর্ভেদ্য পাঁচিলেরই কিছু দুর্বল জায়গা থাকে। দুর্গ দেওয়াল ধসাতে হলে সেগুলো খুঁজে বের করা বেশ জরুরি।

চোখের সামনে সব দেখতে পেলো আদিত্য। অমরাবতীর সেনারা সজ্জিত হচ্ছে। তিরন্দাজরা জড়ো হচ্ছে পাঁচিলের ওপরে। পাশাপাশি সার বেঁধে। নগরের এক পাশে কৃষ্ণা নদী বয়ে গেছে। তারা আছে কৃষ্ণা নদীর ঠিক বিপরীত দিকে।

এবারে অমরাবতীর সদর দরজা খুলে গেল। আদিত্য এবার তাকাল সেদিকে। যাক, তাকে আর কষ্ট করে দূত পাঠাতে হয়নি।

তিনজন লোক বেরিয়ে এসেছে সেই খোলা দরজা দিয়ে। পরনে যুদ্ধসাজ তবে সাথে কোনো অস্ত্র নেই। সেটাই স্বাভাবিক। অমরাবতী থেকে দূত এসেছে। এবার নিজের জায়গা থেকে নড়ে উঠলো আদিত্যচন্দ্র। তার আর অস্ত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।

আদিত্য দূতের মুখোমুখি হলো।

তিন দূতের মধ্যে মাঝের জন তাকে সরাসরি বলল, 'আপনি আমাদের ভূখণ্ডে সেনা নিয়ে প্রবেশ করেছেন। স্বয়ং মহারাজ সাতকর্ণীর রাজ্যে। এর পরিণাম সম্পর্কে তো আপনি অবশ্যই জানেন।'

'প্রথমে তো নাম পরিচয় জানা দরকার। শুরুতেই কাজের কথা বললে চলবে কেন। আমি কলিঙ্গের সেনাপতি।'

'আমি এই অমরাবতীর সেনা চালনার দায়িত্বে আছি।'

এবার আদিত্য নিজের জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, আমি এর পরিণাম জানি। পরিণাম সম্পর্কে না জেনে আমার সম্পূর্ণ সেনা নিয়ে আমি এতদূর আসবো কেন? এমনিতেও আমাদের ঐতিহ্যের সাথে এই রাজ্যের নাম মিশে আছে। সাতবাহন রাজ্য জয় করা কলিঙ্গের পুরানো অভ্যাস। আরেকবার সেই অভ্যাস ঝালিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন আপনার ওপর সব নির্ভর করছে।'

'আমার ওপর কী নির্ভর করছে?'

'অমরাবতীর পতন কীভাবে হবে সেই ব্যাপারটা। আমি দ্বিতীয় প্রহরে অমরাবতীর সেনাকে যুদ্ধে আহবান করবো। যুদ্ধ তখনই শুরু হবে।'

অমরাবতীর সেনাপতি শেষ বার হুমকি দিয়ে কাজ সারতে চাইলেন, 'আপনি আরেকবার চিন্তা করে দেখুন। মহারাজ সাতকর্ণী আপনাকে নরক পর্যন্ত তাড়া করবেন। সম্পূর্ণ কলিঙ্গ মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। আমার উপদেশ মানুন, সেনা নিয়ে এখনই ফিরে যান।'

'সে তো ভবিষ্যতের কথা। আপনি আপাতত বর্তমান নিয়ে চিন্তা করুন। এখন আপনাদের সামনে কেবল দুটো পথ খোলা আছে।

হয় দ্বিতীয় প্রহরে যুদ্ধের ময়দানে আসুন। অথবা সব সেনা নিয়ে দুর্গের ভেতরে থেকে দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করুন। তখন আমরা নগরের দিকে এগোবো। আপনারা এই সেনা নিয়ে আমাদের বাঁধা দিতে পারবেন না। এই নগরীর দেওয়াল আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। দশ স্তরের কচ্ছপ ব্যূহ তৈরি করলেই আমরা এই দেওয়াল লঙ্ঘন করে ফেলতে পারবো। আমি আপনার ভালোই জন্যই বলছি, দ্বিতীয় পথে বেশ কিছু বিপদ আছে। সেনাপতি হিসেবে আপনি তো জানেনই, যুদ্ধের ময়দানে সেনাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেনারা সেনাপতির কথা ভালো করেই শোনে। কিন্তু একবার যুদ্ধ করে নগরে ঢুকতে পারলে সেই সেনাদের আর কোনোমতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তখন সৈনিকদের মাথায় লুটপাটের ভূত চাপে। আর সেই ভূত শেষ পর্যন্ত কেবল যে লুটপাটে আটকে থাকে তা নয়। তাড়া তখন নির্বিচারে প্রজাদের হত্যা করবে, মহিলাদের সম্ভ্রম হানি হবে। আমার তখন আর কিছুই করার থাকবে না। তাই আমার বিশ্বাস অমরাবতীর এই অবস্থা হতে দিতে না চাইলে আপনি প্রথম পথটাই বেছে নেবেন।'

অমরাবতীর সেনাপতির মাথায় কোনো কথাই আসছে না। নিশ্চুপ থেকে কর্তব্য স্থির করার চেষ্টা করছে সে।

আদিত্য আরেকটু হুমকি দিলো, 'আরেকটা কথা, আপনি যদি মনে করে থাকেন, কোনোভাবে আমাদের তৈরি কচ্ছপ ব্যূহ তির ছুঁড়ে আটকাতে পারবেন তাহলে জেনে রাখুন, সেখানে আপনাদের বড়ো ভুল হবে। আমাদের তিরন্দাজ সংখ্যা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি। তারা দেওয়ালের ওপরে আপনাদের তিরন্দাজদের বিঁধে ফেলতে

খুব একটা সময় নেবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের সেনাপতিকে সদুপদেশ দেওয়া নেহাত বোকামি, একটু না হয় বোকামিই করলাম।'

অমরাবতীর সেনাপতি আর কিছুই বলতে পারলো না। তিন জনে নত মুখে নগরে ফিরে এলো। ভেতরে বলদেব অপেক্ষা করছেন। সেনাপতি এসে দাঁড়ালো তার সামনে। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। সেনাপতি আলোচনার সবকিছু খুলে বলে বলদেবকে।

বলদেব মত দিলেন, 'ওদের সামনে সেনা নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া আত্মহত্যা। তুমি কি তাই করতে চাচ্ছো?'

'এই একটাই আত্মহত্যার উপায় আছে যাতে নরক দর্শন না হয়ে সরাসরি স্বর্গে যাওয়া যাবে।'

'তুমি কি স্বর্গে যাবার জন্য এই কাজটা করতে চাচ্ছো?'

'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। না হলে ওরা পুরো নগর ধ্বংস করে দেবে। সাধারণ প্রজাদেরও মেরে ফেলবে। আমরা তখন এমনিতেও মরবো।'

'কিন্তু তোমরা মারা যাবার পর আমাদের কী হবে?'

'তখন তো আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই। প্রাণ শরীর ত্যাগ করলে কী আর করা যাবে। আপনি সেই ভাবনা ভাবুন। কাপুরুষের মতো মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা ভালো।'

এরপরে আর কিছুই বললেন না বলদেব। মাথা নেড়ে শুধু সম্মতি জানালেন।

নগরের দেওয়ালের ওপর তিরন্দাজরা আগে থেকেই অবস্থান করছে। সেই অবস্থানে এখন তারা আরও পোক্ত হয়েছে। ঘোড়সওয়ার আর পদাতিকদের নিয়ে সেনাপতি বাইরে বেরিয়ে এলো। তার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। এখানে কৌশলের খেলা খেলে কোনো লাভ নেই। পরিকল্পনা সরল। যতটা সময় পারা যায় কলিঙ্গ সেনার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে হবে। বলদেব এর মধ্যেই গোপন পথে নিকটবর্তী দুর্গে দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে সাহায্য আসার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। তাহলে এই অসম যুদ্ধ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

আদিত্যের মনে অমরাবতীকে সেই প্রয়োজনীয় সময় দেবার কোন ইচ্ছেই নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নগরের অধিকার নিতে হবে। মাঠে থাকতে থাকতে আর ভালো লাগছে না। এখন রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে তার। তার ইশারায় রণ শঙ্খ বেশ জোরে বেজে উঠলো। নীরবতাকে চিরে দিলো সেই আওয়াজ। নগরবাসীর অন্তরও কেঁপে উঠলো সেই ভীষণ আওয়াজে।

প্রায় পাঁচশো অশ্বারোহী সৈন্য ছুটে গেল দুর্গের প্রধান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় দুশো সৈন্যের দিকে। অমরাবতীর সেনাপতি সেই দৃশ্য দেখে দাঁতে দাঁত চাপলেন। তিরন্দাজদের ইশারা করতেই এক পশলা তীর ছুটে গেল এগোতে থাকা অশ্বারোহী শত্রুদের দিকে। তবে তিনটে শরীর ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কোন ক্ষতি হলো না।

অমরাবতীর সেনাপতি বুঝলো, এভাবে হবে না। ভালো ভাবে হিসেব করে সত্তর জন অশ্বারোহী সামনে বাড়ালো সে। নিজে আছে সত্তর জনের একেবারে সামনে। তীব্র গতিতে শত্রুদের মুখোমুখি হবার জন্য ছুটল ঘোড়া।

আদিত্যের মুখে এখন কৌতুকের হাসি। ঘোড়ার পিঠে শরীর ছেড়ে দিয়ে আরাম করে বসলো সে। আয়েশি ভঙ্গিতে কোন উত্তেজনা নেই। যেন সামনে কোন ভাঁড় যথেষ্ট মজা করে তার ভাঁড়ামি প্রদর্শন করছে আর সে দর্শক হিসেবে সেই দৃশ্য দেখছে।

পাঁচশো অশ্বারোহীর সাথে সত্তর অশ্বারোহীর সংগ্রামের বর্ণনা দেওয়া বৃথা। কি হচ্ছে বা হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে অমরাবতীর সৈন্যরা জানে, তারা জীবনের শেষ যুদ্ধ করতে নেমেছে। আজ তাদের রক্তের শেষ বিন্দুও বয়ে গিয়ে এই মাটিতে মিশবে। প্রাণপণে চলতে লাগলো তাদের তলোয়ার আর বর্শা। সেগুলোর চমকে চোখ ধাধিয়ে যাবার জোগাড়।

সবচেয়ে জোরালো চমক দিতে লাগলো অমরাবতীর সেনাপতির তরোয়াল। দুহাতে দুটো তলোয়ার নিয়েছে সে। সব্যসাচী তলোয়ারধারীর যে উপাধি সে পেয়েছিল তার একেবারে যথার্থ প্রমাণ রাখতে লাগলো সে। কেউ নিজের অস্ত্র তার শরীরের ধারেকাছেও ভেড়াতে পারছে না। যেই একটু কাছে যাচ্ছে সেই লাভ করছে তলোয়ারের খোঁচা। তার ঠিক পরেই খালি হয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ।

এই দৃশ্য দেখতে লাগলো আদিত্য। তার মুখের হাসিটা ভয়ানক যুদ্ধ দেখে মিলিয়ে যায়নি। তবে আচমকা দূর হয়ে গেল তার দেহের শিথিল ভাব। মৃদু ইশারাতেই তার ঘোড়া বুঝতে পারলো কী করতে হবে। তীব্র বেগে ছুটে গেল সে সামনের সমর স্থান লক্ষ্য করে।

অমরাবতীর সেনাপতি একেবারে জ্ঞান শূন্য হয়ে লড়ছে, তার পূর্ণ মনোযোগ কেবল শত্রু সংহারের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে তার, নিঃশ্বাস ক্রমেই হচ্ছে আরও ঘন। দুপাশ থেকে দুজন কলিঙ্গ সেনাকে তার দিকে আক্রমণ করতে দেখল সে। এক ঝটকায় তার দুহাতের তলোয়ার দুপাশে আক্রমণে গেল। ঐ দুই সাধারণ সেনার তুলনায় তার গতি অনেক বেশি। দুপাশ থেকে সৈনিকদ্বয় আঘাত করার আগেই লক্ষ্যে আঘাত হানলো তার দুই তলোয়ার। এক তলোয়ার বসে গেল ডান দিকের সৈনিকের ঠিক গলনালিতে, আর দ্বিতীয় তলোয়ার অর্ধেক দেবে গেল বাম দিকের সৈনিকের কানের একটু নিচে। দুটোই মরণ আঘাত।

তবে তাতে একটু অসুবিধাও হয়ে গেল তার। দুটো হাতই দুটো আঘাতে একই সাথে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্শাটাকে বুক বরাবর আসতে দেখল সে। কিন্তু বাঁধা দেবার কোনো উপায় নেই। বড়ো বড়ো চোখে দেখতে পেলো বর্শাটা তার বুকে বেশ জোরে এসে বিঁধেছে। হৃদপিণ্ড একেবারে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে।

বর্শার আরেক প্রান্ত ধরা আছে আদিত্যের হাতে। এই যুদ্ধে এটাই তার প্রথম আঘাত। আর রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে শেষও। আর কোনো আঘাত করার দরকার পড়বে না।

ঘোড়ার ওপরে নিথর হয়ে গেছে অমরাবতীর সেনাপতির দেহ। আদিত্য যদি বর্শার গোঁড়া ধরে না রাখতো তাহলে নিশ্চিত এতক্ষণে ভূপাতিত হতো সে।

তারপর আর যুদ্ধ চলল না। সেনাপতির মৃত্যুতে অমরাবতীর সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তিরন্দাজরা তির ফেলে দিলো, পদাতিক আর অশ্বারোহীরাও অস্ত্র ত্যাগ করে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। আদিত্য ইশারায় অমরাবতীর

সেনাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বন্দি করার নির্দেশ দিলো। কলিঙ্গের সেনারা সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হলো সাথে সাথে। বেড়ি বদ্ধ হতে লাগলো সেনাদের হাত-পা।

মন্ত্রী বলদেব জানতেন এটাই হবে। আর তারপরে আসল দায়িত্ব এসে পড়বে তার ওপর। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন তার কাজ। নগরের প্রধান ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। দুর্বল পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ঠিক আদিত্যের মুখোমুখি।

আদিত্য ওনাকে চিনতে পেরেছে, 'আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই আর্যাবর্তে আপনার মতো মন্ত্রণা দাতা আর কেউ নেই। আপনার সম্মানে আমি কী করতে পারি বলুন।'

'শুনুন, আপনি অমরাবতী নগর অধিকার করেছেন। এই নগরের ওপর এখন শুধুই আপনার অধিকার। দয়া করে ক্ষমা ধর্মের প্রদর্শন করুন। এই নগরের রাজপ্রাসাদের সাধারণ লোকজন আর নগরের সাধারণ প্রজাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। আমি সবাইকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব এই নগর ছেড়ে চলে যাবো। আমরা আপনার কাছে শরণাগতি ভিক্ষে করছি। অহেতুক রক্তপাত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। আর ক্ষত্রিয় কখনো শরণাগতের ওপর অত্যাচার করে না।'

আদিত্য হাসলো, 'এবার আপনার কূট ক্ষমতার প্রমাণও পেলাম। আপনি কি সুন্দর কথার জালে আমাকে বেঁধে ফেলছেন। আমি যে প্রতিজ্ঞা এখন পর্যন্ত করিনি, সেই প্রতিজ্ঞা পাশেও আমাকে এর মধ্যেই বেঁধে ফেলেছেন।'

'না, তেমন কিছুই না। আমার প্রার্থনা নীতিসম্মত।'

'আজ্ঞে মহামন্ত্রী। ঠিক আছে। আমি আপনাকে আর সেনাদের বাদে আর সবাইকেই চলে যেতে দেবো। আপনাকেও যেতে দেবো। তার আগে একটা কাজ আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, সবাই বেরোবে এক বস্ত্রে, খালি হাতে। নগরের রমণীরা বেরিয়ে যাবার সময় তাদের শরীরে যেন কোনো অলংকার না থাকে। অমরাবতীর অধিকর্তা হিসেবে সেসবে এখন শুধুই আমার অধিকার। এতে নিশ্চয়ই আপনি দ্বিমত করবেন না।'

'না। আপনি যথার্থ বলেছেন। নগরবাসী সেসবে হাত দেবে না। আপনি দয়া করে আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন এই যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ, তবে আপনার প্রাণের বিনিময় মূল্য হিসেবে কিছু তো দিতে হবে। এমনি এমনি তো বাণিজ্য হয় না।'

'কী দিতে হবে?'

'তা আমি পরে বলছি। আপনি তাড়াতাড়ি নগর খালি করার ব্যবস্থা করুন।'

ফিরতি পথ ধরতে যাবেন বলদেব এমন সময় পেছন থেকে ডাকলো আদিত্য, 'তবে আপনাকে একটা কথা একটু মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি চাই না কোনো বোকামির কারণে আপনার প্রাণ যাক। নদীপথে কোনো ধরনের মূল্যবান সামগ্রী সরানোর চেষ্টা কোনোমতেই করবেন না। আমি সেদিকে এরই মধ্যে আমার সেনা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'সেরকম কোনো চেষ্টা আমরা করবো না।'

এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে নগর খালি করার কাজ শুরু হলো। নগরের রমণীরা চোখের জলে এতদিনের জমিয়ে রাখা মায়া ত্যাগ করলো। তিন প্রহরের একেবারে শেষ দিকে নগরের বাইরে এসে জড়ো হলো সবাই।

আদিত্য এসে দাঁড়ালো বলদেবের সামনে, 'আপনার প্রাণ আমি ভিক্ষা দিয়েছি। এবার আপনার প্রতিদান দেবার পালা।'

'নিঃস্ব আমি কী দিতে পারি?'

'আপনি এখনও নিঃস্ব নন। তবে একটু পরেই হবেন। আপনার প্রাণের বদলে এখন আমি আপনার মান কেড়ে নেবো। এখন যা হবে তাতে টু শব্দও করবেন না। আপনার প্রজাদের ক্ষতি হবে তাতে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন।'

বলদেব বুঝতে পারলেন না কী হতে চলেছে। আদিত্যের ইশারায় এক কলিঙ্গ সেনা এগিয়ে এলো। এক ঝটকায় খুলে নিলো বলদেবের মাথার পাগড়ি। বলদেব স্তম্ভিত। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছেন না। প্রজারা সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাদের কারোই চোখের পলক পড়ছে না।

একটা ধারালো দাঁড়ি কামানোর ফলা তুলে নিলো সৈনিক। চকচকে ফলার স্পর্শে বলদেবের মাথা ন্যাড়া হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কাজটা শেষ হতেই আদিত্য আরেকজন সৈন্যকে ইশারা করলো। সে এসে আদিত্যের হাতে একটা মাঝারি কলস তুলে দিলো।

আদিত্য কলস তুলে নিলো দু হাতে, 'আমি সাম্যে বিশ্বাসী। জয়ীর যেমন অভিষেক করতে হয়, তেমনি পরাজিতেরও করতে হয়। পার্থক্য হচ্ছে বিজেতার অভিষেক হয় দুগ্ধে আর পরাজিতের হয় ঘোলে' এটুকু বলেই হাতের কলসের সম্পূর্ণ তরল বলদেবের মাথায় ঢেলে দিলো সে।

বলদেব আহত চোখে তাকালেন আদিত্যের দিকে। এতোটা অপমান তিনি আশা করেননি। আজীবন সবার কাছ থেকে কর্মের জোরে সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি। আজ তার সব ধূলিসাৎ হলো। তার চোখ থেকে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে।

প্রজাদের প্রায় সবার চোখেই পানি। এবার আদিত্য তাদেরকে যেতে আদেশ করেছে। যাত্রা শুরু করলো তারা। বলদেব ধীর পায়ে তাদের সাথে হাঁটছেন। ঘোলে তার দেহ আর পোশাকের অনেকটাই ভিজে গেছে। রোদে একটু একটু করে শুকাচ্ছে এখন।

অনেকটা দূরে চলে এসে অমরাবতী আর তার সামনে থাকা কলিঙ্গের সেনার দিকে ফিরে তাকালেন বলদেব। সবার অলক্ষ্যে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেছে তার চেহারায়। অভিনয়ের অশ্রু জল অনেক আগেই তার চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে।

তাদের পরিকল্পনা নিখুঁত কাজ করেছে। গিরিধারী ঠিক এমনটাই বলেছিল। বলিদানও পরিমাণে খুব একটা বেশি হয়নি।

৭২

পরিস্থিতি মাঝে মাঝে সামলানোর মতো অবস্থায় থাকে না। ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকে সেসব মুহূর্ত আর কাউকেই তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

এখানেও এখন সেই অবস্থা। মহারাজ সাতকর্ণী একজনকে সেনাপতি নিয়োগ করার জন্য নিয়ে এসেছেন, আর এদিকে গিরিধারী আরেকজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে বসে আছেন।

মহারাজ মন্তব্য করলেন, 'আপনাকে দোষ দিতে পারছি না গিরিধারী। আমাকে আপনি বার বার বলেছিলেন একজন সেনাপতি নিয়োগ দিতে কিন্তু আমি সেদিকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি। যোগ্য অযোগ্যের প্রশ্নে বারবার সেই কাজে দেরি হয়ে গেছে। আর এখন এমন অবস্থায় কাজটা হলো যাতে সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও জট পাকিয়ে গেছে।'

গিরিধারী নিজের দোষ লঘু করতে চেষ্টা করলেন, 'আপনার অনুমতি না নিয়ে কাজটা করার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিই বা আর বুঝি।'

'খারাপ বোঝেন না, সেটা আমি জানি।' মহারাজের এখনও দক্ষিণ ভারতের সেই যুদ্ধে মহারাজ কারিকালার জেতার কথা আর সেখানে গিরিধারীর পরিকল্পনার কথা মনে আছে।

'মহারাজ, বাড়িয়ে বলছেন। ওখানে টোটকা কাজে লেগে গেছে। আর এখানে আমাদের হাতে কিন্তু সময় নেই। আর আপনিও বেরিয়ে গেছেন নরখাদকের সন্ধানে। আর সেনাবাহিনীর জন্য সেনাপতি নিয়োগ দিতে দেরি করা চলে না। আপনার যুদ্ধ বিশারদদের সাথে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করে অন্তে নিয়োগ দিয়েছি রিপুজিতকে।'

'সেটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারতো, যদি না আমি রুদ্রদেবকে খুঁজে না পেতাম।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমি নিজ হাতে রিপুজিতের অভিষেক করেছি। যে দেবতা বর দেয় সেই দেবতা তো আর সেই বর কাটতে পারে না। এখন আমার পক্ষে রিপুজিতকে সরিয়ে দেবার উপায় খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য।'

'না, এখানে সরিয়ে দেবার কথা আসছে কেন? যে দুজনকে আমি নিয়ে এসেছি ওদেরকে আমি বললেই ওরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবে, কিন্তু'

মহারাজ সাতকর্ণী কথাটা শেষ করতে পারলেন না। গিরিধারী বুঝতে পারলেন ভেতরে ঘটনা আছে, 'মহারাজ, আপনি কি ঐ দুজনের কাছে কোনো প্রতিজ্ঞা করেছেন না-কি?'

'হ্যাঁ গিরিধারী, দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ঐ যোদ্ধার সামর্থ্যের তুলনায় কমেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তবে আমি এখন সেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভাবছি না। আমি যদি তাকে ছেড়ে দেই তাহলে ক্ষতি হবে আমার, সাতবাহন রাজ্যের।'

'আজ্ঞে মহারাজ।' গিরিধারী আর কিছু বলেন না। তার কাছে সমাধান আছে। কিন্তু দেখা যাক, মহারাজ কী বলেন।

'শুধু আমার বিশেষ বাহিনী নয়, সমগ্র সাতবাহন সেনার সেনাপতি হবার যোগ্যতা আছে ঐ যোদ্ধার। সেখানে আমি তাকে শুধু আমার বাহিনীর একটা অংশের সেনাপতি করবো বলে এনেছি। একটা উপায় অবশ্য এসেছে। আমার বাহিনীর নানা অংশ থেকে সেনা নিয়ে একটা উপ সেনাদল গঠন করবো। আর তার সেনাপতি করে দেবো রুদ্রদেবকে।'

গিরিধারী এবার নিজের সমাধানের দিকে গেলেন। মহারাজের মথায় অনেক জটিল ব্যাপার ঘুরছে। সমস্যার এরচেয়েও সরল সমাধান আছে, 'মহারাজ, তা আপনি করতেই পারেন। তবে আপনি তো জানেন, আমি আসলে বিশেষ একজনকে আমাদের বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি পদের জন্য চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ। আপনি আমায় বলেছিলেন সেনাবল বাড়াতে। আমিও পরে হিসেব করে দেখলাম, তা দরকার। তাই একটুও দেরি না করে এই বাহিনী অনেক কষ্টে তৈরি করেছি। সে বাহিনীতে আপনার পরামর্শে ক্ষত্রিয়ের পাশাপাশি অনেক অক্ষত্রিয় যোদ্ধা আছে। অনেক প্রথা বিরুদ্ধ কাজ করতে হয়েছে আমাদের।'

'হ্যাঁ, অত বাছতে গেলে আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা কিন্তু শত্রুর গুপ্তচর জেনে ফেলতে পারতো।'

'ঠিক। আর সেজন্যই আমি প্রথার বিরুদ্ধে যেতে তেমন কোনো আপত্তি করিনি।'

'আরেকটা কথাও তো আপনার মনে থাকার কথা। আমি আপনাকে সবসময় বলতাম, আমাদের এই বাহিনী সাধারণ হবে না। আর যে বাহিনী শিক্ষা পেয়েছে অসাধারণ কলার তার সেনাপতিও হতে হবে অসাধারণ।'

'এজন্যই তো রুদ্রদেব।'

'আজ্ঞে মহারাজ। সেই বাহিনীর সেনাপতি গৎবাঁধা উপায়ে যুদ্ধ করবে না। তার কাছে সব মূল বিষয়ের জ্ঞান থাকবে কিন্তু সে যুদ্ধ করার সময় সৃষ্টিশীল হবে। নিজের কৌশলে আর সমস্যা সমাধানে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই কাজের জন্য রুদ্রদেবের তুলনা নেই।'

'সেটা নিশ্চিত। আপনার মাথায় কি নতুন কোনো উপায় এসেছে? না-কি আমি আবার নতুন কোনো বাহিনী গঠন করবো?'

'না মহারাজ। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।'

'আচ্ছা, আপনি বারবার সৃষ্টিশীল সৃষ্টিশীল বলে কী বোঝাতে চাইছেন? যুদ্ধক্ষেত্রে মুখস্ত জ্ঞান কখনোই কোনো কাজে লাগে না। সব সেনাপতিকেই সম্মুখ সমরে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে হয়। নানা রকম কৌশলের প্রয়োগে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রের নানা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।'

'আজ্ঞে মহারাজ। সেসব আমি একটু আধটু জানি। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে অন্য রকম জ্ঞান নিয়ে। এমন একজন যে ভারতীয় যুদ্ধ কৌশল বাদেও অন্যরকম কৌশল জানে।'

'এসব কী বলছেন গিরিধারী? অবাস্তব কথা। যে যোদ্ধা ভারত ভূমিতে জন্মেছে, যে অধ্যয়ন করেছে ভারতীয় যুদ্ধবেদ, সে কীভাবে অন্য কোনো জ্ঞান প্রাপ্ত হবে? আর যুদ্ধ

বেদের বাইরে কোনো জ্ঞান কি আদৌ এই পৃথিবীতে আছে? কিছু কিছু দিব্যাস্ত্রের কথা অবশ্য সেই বেদে আমরা পাই, তবে সেসব তো দেবতাদের কাছ থেকে কঠিন সাধনা করে পেতেন যোদ্ধারা। এই কলিকালে তেমন মন্ত্রসিদ্ধ যোদ্ধা আমরা পাবো কোথায়?'

'তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন মহারাজ।'

'আপনার মাথায় যদি তেমন চিন্তাই থেকে থাকে, তাহলে আপনি কেন রিপুজিতকে বেছে নিলেন? সে তো সাধারণ কৌশলের বাইরে অন্য কোনো বিশেষ কৌশল জানে না। আমার জানা মতে সে আমাদের শাস্ত্র মতেই গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করেছে। সেখানে রহস্যময় কিছুই নেই। শাস্ত্রের জ্ঞানের বাইরে কোনো যুদ্ধ জ্ঞান অবশ্য এই জীবনে দরকার পড়েনি আমার।'

'কখনোই পড়েনি মহারাজ?' প্রশ্ন করেন গিরিধারী।

'একবার শুধু এমন হয়েছিল। এক উপজাতি রাজার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছিল আমাকে। নেহাত ঐ রাজার সেনা সংখ্যা কম ছিল তাই হেরে গেছে। তবে সেই অশাস্ত্রীয় যুদ্ধ কৌশল আমাকে সেদিন ভালোই ঘোল খাইয়েছিল। সাতবাহনের অভেদ্য চক্রব্যূহে তার সেনারা কি এক অদ্ভুত কৌশলে ঢুকে পড়েছিল। একেবারে চক্রের মাঝখানে। যেন প্রাসাদের ভোজের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অথিতিরা দরজা ঠেলে বিনা বাঁধায় ঢুকে পড়ছে।'

'তেমন পরিস্থিতির সামনে আমরা আবারও পড়তে পারি। রিপুজিতকে আমি বেছে নিয়েছি মন্দের ভালো হিসেবে। কাজ তো চালাতে হবে। এখন তো এমন ঝামেলায় পরে গেছি। আপনার কথা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহী করে তুলেছে। কোনো যোদ্ধা সম্পর্কে আপনার মতামত গুরুত্ব সহকারে না নিয়ে উপায় নেই।'

'তাহলে এখন আপনি কী করতে চাচ্ছেন?'

'মহারাজ, এখানে একটা কথা পরিষ্কার, আমাদেরকে যেভাবেই হোক এই বিশেষ যোদ্ধাকে আমাদের বিশেষ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাধারণ কোনো উপায়ে নয়। এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে রুদ্রদেব রিপুজিতের সাথে সমান্তরালে দাঁড়িয়ে ঐ বাহিনী চালনা করতে পারে।'

এক বনে দুই বাঘ দেখেছেন বেশিদিন হয়নি। তবু মহারাজ সাতকর্ণীর মনের সংকোচ ঘুচল না, 'তেমন কোনো উপায় আদৌ আছে কি না জানা নেই। আপনি কেবল রিপুজিতের যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু আমি তো জানি তার মেজাজ কেমন। রুদ্রদেবকে সে কোনোমতেই নিজের অধিকারে ভাগ বসাতে দেবে না।'

'মহারাজ, এই সমস্যার সমাধান করতে হবে সমর নীতি দিয়ে নয়, রাজনীতি দিয়ে।'

'হ্যাঁ, আর এই রাজনীতিতে আপনার মাথা বেশ ভালো চলে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। রাজনীতিতে কখনো পথের কোনো অভাব হয় না। এই সত্যি যে মেনে নিতে পারে সেই সঠিক রাজনীতিজ্ঞ। এখানে অন্ধ গলি বলে আসলে কিছু নেই।'

'তাহলে বলুন, দুই কূল রক্ষা করার মতো কী পরিকল্পনা এখন আপনার মাথায় চলছে?'

'মহারাজ, এখানে একটা কথা সত্যি। এক সেনাবাহিনী দুজন সেনাধক্ষ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না। আপনার নিয়ে আসা বিশেষ যোদ্ধা ঐ বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি হবে না। সেই দায়িত্ব থাকবে রিপুজিতের কাছে। রুদ্রদেব হবে সেই বাহিনীর বিশেষ

উপদেষ্টা। সে শুধু সেনাবাহিনীর নানা ব্যাপারে পরামর্শ দেবে। যুদ্ধের সময়ে সে বাহিনীর কৌশল সম্পর্কে সেনাপতিকে আপনার পক্ষ থেকে বুদ্ধিও দেবে। আপনি শুধু নিজের একটা আদেশ পত্র দেবেন সেনাপতি রিপুজিতের উদ্দেশ্যে।'

'এটা সহজেই করা যায়। রুদ্রদেব স্বাধীন ভাবে সেনা পরিচালনা করতে পারবে। কেউ কারো অধিকারে হাত দেবে না।'

'এই বিষয় নিয়ে আপনি আর চিন্তা করবেন না। ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন, আমি ঠিক সামলে নেবো।'

তবে রাজনীতির আরও একটা ব্যাপার আছে। এখানে সমাধানের যেমন কোনো অভাব হয় না, তেমনি সমস্যারও কোনো অভাব হয় না। একটা সমস্যার সমাধান না হতেই আরও সমস্যা এসে হাজির হয়। মন্ত্রী রাজারা কখনো নির্বিঘ্নে দম ফেলবার অবসর পান না। নিয়তি যেন একের পর এক চাল সাজিয়েই রাখে।

রুদ্রদেবের সমস্যার একটা সিদ্ধান্ত নিতে না নিতেই প্রহরী এসে হাজির হলো দরজায়।

'এখন আবার কী হলো?' একটু বিরক্তি মহারাজের গলায়। তিনি এখন বিশ্রামে যেতে চেয়েছিলেন। বাঘ আর রুদ্রদেব দুই উত্তেজনাই প্রশমিত হয়েছে।

প্রহরী নতমুখে জানালো, 'একজন দূত মন্ত্রী বলদেবের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে। মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

মহারাজ তাকালেন গিরিধারীর দিকে, 'এখন আবার কী হলো? বলদেব এখন আবার কি খবর পাঠিয়েছেন?'

গিরিধারীর মুখ চিন্তিত, 'আমার মনে হচ্ছে মহারাজ, যা ঘটার ভয় আমরা পাচ্ছিলাম তাই হয়েছে। দূতই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে।'

প্রহরীর দিকে নির্দেশ দিলেন তিনি, 'যাও, তাড়াতাড়ি দূতকে নিয়ে এসো।'

দূতের কাছে একটা পত্র আছে। সে একবার পড়ে শোনালো। শুনতে শুনতে ক্রোধে মহারাজ সাতকর্ণীর চোখমুখ কঠিন হয়ে এলো। চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন, 'কী লেখা আছে তা আরেকবার পড়ে শোনাও।'

'মহারাজ, মন্ত্রী বলদেব দ্রুতগামী পায়রার মাধ্যমে এই পত্র পাঠিয়েছেন। তাদেরকে অমরাবতী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তিনি এখন অমরাবতী থেকে ত্রিশ যোজন দূরের বীরপুর দুর্গে আছেন। তার সাথে আছে অমরাবতীর সব প্রজা।'

'আর সেনারা?'

'সেনাদের কেউ সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কেউ বা যুদ্ধের পর বন্দি হয়েছে শত্রুসেনার কাছে। সেনাপতি নিজে সম্মুখ যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন।'

'তার মানে কলিঙ্গ সেনা অধিকার করে নিয়েছে অমরাবতী?'

'আজ্ঞে মহারাজ। কলিঙ্গ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আদিত্য এই যুদ্ধে কলিঙ্গ সেনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহামন্ত্রী বলদেব আত্মসমর্পণ করেছেন। তার প্রার্থনায় সেনাপতি আদিত্য অমরাবতীর প্রজাদের প্রাণ দান করেছেন। নিঃস্ব প্রজারা রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তবে খুব খারাপ আচরণ করা হয়েছে বলদেবের সাথে?'

দূত প্রবেশের পর এই প্রথম কথা বলে উঠলেন গিরিধারী, 'খারাপ ব্যবহার মানে? তিনি তো আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তার সাথে আবার কী খারাপ আচরণ করা হয়েছে?'

'মহামন্ত্রী, বিজয়ী নিজের অহংকার ফলানোর জন্য যুদ্ধের শেষে প্রতিপক্ষের সাথে এমন আচরণ করে থাকে।'

মহারাজ সাতকর্ণী ধমকে উঠলেন, 'তোমাকে এখানে জ্ঞান দিতে বলা হয়নি। তুমি শুধু বলো, ঐ সেনাপতি আদিত্য বলদেবের সাথে কী আচরণ করেছে? ভুলে যেও না, তুমি দূত, তোমার কাজ কেবল সংবাদ দেওয়া। ফলাফল নিয়ে চিন্তা করা নয়।'

দূত তবু ইতস্তত করতে লাগলো। ধৈর্য ধরতে অপারগ হলেন মহারাজ সাতকর্ণী। কালো মেঘের গম্ভীর স্বর বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে, 'তোমার যদি নিজের মস্তকের প্রতি একটুও মমতা থাকে তাহলে আর চুপ করে থেকো না। বলো।'

দূতের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো, 'মহারাজ, জানি সংবাদ দেওয়াই আমার কাজ। তবু সেই ঘটনার কথা বলতে আমার শরীর কেঁপে উঠছে। ঈশ্বর এই খবর আপনাকে অন্য কাউকে দিয়ে বলালেই আমি নিস্তার পেতাম।'

গিরিধারী নরম গলায় বললেন, 'বলো দূত। মাঝে মাঝে আমাদের বুকে পাথর চাপা দিতে হয়।'

দূত কেঁপে উঠলো, 'মহারাজ। অমরাবতীর সমস্ত প্রজার সামনে মহামন্ত্রী বলদেবকে চরম অপমান করেছে সেনাপতি আদিত্য। প্রথমে তার পাগড়ি খুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর তার পুরো মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাকে যাবার অনুমতি দিয়েছে ঐ সেনাপতি আদিত্য।'

মহারাজ সাতকর্ণীর সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। এক ঝটকায় নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মহারাজ উঠে দাঁড়ালে তো আর বসে থাকা যায় না। গিরিধারীও একই সাথে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মহারাজের চেহারায় রাজ রোষ বিকট আকার ধারণ করেছে। দূত আগেই নত মুখে মাটিতে বসে পড়েছে।

গিরিধারী আলতো করে বললেন, 'তুমি এখন যাও দূত।'

দূত ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। সাতকর্ণী তাকালেন গিরিধারীর দিকে, 'এই কাজটা করা সেনাপতি আদিত্যের কিছুতেই উচিত হয়নি।'

'মহারাজ কলিঙ্গ সেনাপতি বোকা নয়। তার প্রতি যে নির্দেশ ছিল সে নিশ্চয়ই সে অনুযায়ীই কাজ করেছে। ওরা জানে এই খবর জানতে পেরে আপনি রেগে যাবেন। দেখেছেন তো, ওদের উদ্দেশ্য সফল। মহারাজ, মাথা ঠান্ডা রাখার সময় এখন।'

'থামো গিরিধারী।' মহারাজের শীতল স্বর গিরিধারীকে যেন একেবারে জমিয়ে দিলো। 'সংযম, পরিকল্পনা, সময়, ক্রোধ এসব নিয়ে চিন্তা করার আর সময় নেই। অমরাবতী সাতবাহনের আদি এবং আসল রাজধানী। সেই নগর এখন শত্রুর অধিকারে। আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও আমার মন্ত্রীকে সেখানে চরম অপমান করা হয়েছে। মাথা ঠান্ডা রাখার এখন আর কোনো উপায় নেই। ওরা যদি মনে করে থাকে এই ঘটনা ঘটিয়ে আমার মাথা ওরা গরম করে দেবে, তাহলে ওদের ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক। আমি ঐ আদিত্য আর কলিঙ্গকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'অনতিবিলম্বে আমার সেনা যুদ্ধ যাত্রা করবে। রাজবেশ ত্যাগ করে যোদ্ধা বেশ ধারণ করার সময় চলে এসেছে।'

'অবশ্যই আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো মহারাজ। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

'হ্যাঁ, সাতদিনের মধ্যেই সব সেনা একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠানা ত্যাগ করবে। আপনি সব সেনাদলকে একত্র করার ব্যবস্থা করুন।'

কক্ষ ত্যাগ করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। গিরিধারী ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন একই জায়গায়। অস্ফুটে বলে উঠলেন,

'চিন্তা করবেন না মহারাজ। সব আমাদের পরিকল্পনা মতোই হচ্ছে। আপনি যত তাড়াতাড়ি ধারণা করছেন তার চেয়েও তাড়াতাড়ি সাতবাহনের সেনা অমরাবতীর কলিঙ্গ সেনাকে আক্রমণ করবে।'

কিছুদিন আগের কথা। অত বেশি সময় পেরিয়ে যায়নি। বললেই বোঝা যাবে। গিরিধারী আসলে সুযোগ খুঁজছিলেন। মহারাজ সাতকর্ণী যেদিন নিজের পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য নরখাদক মারার জন্য ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, তখন আর সময় নষ্ট করলেন না গিরিধারী। তার ঠিক পরদিনই তিনি যাত্রা করলেন অমরাবতীর উদ্দেশ্যে। কেউ তাকে বেরোতে দেখেনি, দেখলেও চিনতে পারেনি, তিনি বেরিয়েছিলেন ছদ্মবেশে।

অমরাবতী যাত্রার সময় সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাতে গোপনীয়তা আর বজায় থাকবে না। আরামদায়ক যাত্রা করলে রথে অনেকটা সময় চলে যাবে। সময় একদমই নেই হাতে।

দূরের পথ তাড়াতাড়ি যেতে গিরিধারীর নিজস্ব উদ্ভাবিত একটা পন্থা আছে। সেই ক্ষেত্রে দ্রুতগামী ঘোড়া আর নৌকা দুটোই কাজে লাগে। নিজে ব্রাহ্মণ হওয়াতে ছোটোবেলাতেই গ্রহের হিসেব নিকেশ করা তার আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। নদীর স্রোত জোয়ার ভাটার টানে পড়ে কখন কোনদিকে যাবে তা তিনি বেশ ভালোই জানেন। সেই অনুযায়ী ব্যবহার করেন নৌকা। আর যখনই স্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু করে তখন যান ঘোড়ায়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে অমরাবতীতে পৌঁছতে দুই দিনের বেশি সময় লাগলো না তার।

অমরাবতী তখন ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ঘাড়ে কলিঙ্গের বিশাল সৈন্যের নিঃশ্বাস অনুভব করছে প্রতি মুহূর্তে।

পৌঁছেই আর দেরি করেননি গিরিধারী। বলদেবের সাথে বসেছেন মন্ত্রণায়। রাজনীতির মন্ত্রে সিদ্ধ দুই অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

বলদেব দায়সারা গোছের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। জাঁকজমক তেমন একটা আর এই নগরে বাকি নেই।

কথার শুরুটা গিরিধারীই করলেন, 'আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন মহামন্ত্রী।'

বিদ্রুপের হাসি হাসলেন বলদেব, 'একটু ভুল হয়ে গেল মনে হচ্ছে। 'ভূতপূর্ব' শব্দটা মনে হচ্ছে বাদ পড়ে গেছে।'

'আমি জানি' গিরিধারী স্বীকার করলেন, 'আপনি আমার ওপর বেশ বিরক্ত। সেটা স্বাভাবিক। তবে সংসারে পরিবর্তন আসবে এই কথাও তো স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক কাজ যখন অস্বাভাবিক উপায়ে করা হয় তখন কি আর তার মধ্যে স্বাভাবিকতার ভাব থাকে? অবসর আর অব্যাহতি তো এক কথা নয়।'

'পরিবর্তন যেভাবেই হোক, তা হবেই। আর ইতিহাস সাক্ষী নতুন প্রজন্মের এগিয়ে আসা কখনোই পুরানোরা ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আপনার থেকে কী আচরণ পাবো, তা আমি এখানে আসার আগেই জানতাম।'

'হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক গিরিধারী। আমার এমন আচরণই এখানে স্বাভাবিক। এই দেহ অনিত্য জেনেও আমরা স্বজনের মৃত্যু মেনে নিতে পারি না, নিয়ম জানা সত্ত্বেও স্থান চ্যুত হওয়া বেশ বেদানাদায়ক।'

'আমি আমার প্রতি আপনার আচরণ বদলাতে এখানে আসিনি মহাশয়। আমার ওপর আপনি বিরক্ত থাকতেই পারেন। সেই বিরক্তি ভাব কাটানো এখন দরকারি নয়। আর অপ্রয়োজনীয় কাজে প্রয়াস করা শ্রমের অপচয়। আমি আপনার কাছে একটা প্রয়োজনীয় কাজে এসেছি। এই রাজ্যের এখনও আপনাকে প্রয়োজন।'

'বৃদ্ধের কাছে আবার কী প্রয়োজন? এখন এই পরিত্যক্ত নগরে বসে অতীতের হিসেব করা ছাড়া আমি আর কোন কাজে লাগবো?'

'অমরাবতী পরিত্যক্ত নগর নয় মহাশয়। আর বৃদ্ধ যে অনেক সময় যুবকের চেয়েও বেশি কাজে আসে তা তো আপনার অজানা নয়। সুরা বৃদ্ধ হলেই তার স্বাদ বাড়ে, তখন তার জায়গা হয় সরাইখানার সবচেয়ে উঁচু তাকে।'

'ভারী ভারী কথা বলে বাস্তব বদলানো যায় না। যাই হোক, তোমার সাথে এখন আমি বাকযুদ্ধে যেতে চাচ্ছি না। প্রয়োজনীয় কথাটা বলে ফেলো। দেখি আমি কী করতে পারি।'

'মহামন্ত্রী, আপনি তো জানেন, কলিঙ্গের বিশাল সেনা আমাদের অমরাবতীর সীমান্তে শিবির ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানি। তোমরা আর্যাবর্তের ঐ পাশে থেকে জেনে যাবে, আর আমরা এই পাশে থেকে এই পাশের ঘটনা জানতে পারবো না তা তো আর হতে পারে না।'

'আজ্ঞে। আমার হিসেবে ওরা খুব তাড়াতাড়ি অমরাবতী নগর আক্রমণ করবে।'

'সেটা বোঝার জন্য আপনার মতো নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা আক্রমণ করবে। এখনও কীসের অপেক্ষা করছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মহারাজ সাতকর্ণীর মনে অমরাবতী রক্ষার কোনো চিন্তা আছে কি না সেটাও জানি না। মনে হচ্ছে নেই। এখনও কোনো বড়ো সেনাদল তিনি অমরাবতীতে পাঠাননি। তার মানে মহারাজের এখন অমরাবতী নিয়ে আর কোনো চিন্তাই নেই।'

'কথাটা সত্যি নয় মহাশয়। মহারাজ এখনও নিজের আসল রাজধানী হিসেবে অমরাবতীকেই মানেন।'

'মনে হয় না। তার মনে এখন সম্পদের লোভ জায়গা নিয়েছে। সেই সম্পদ সংগ্রহেই এখন তার মন। আর ভারতের এই দিকের ভূমিতে এখন আর সেসব সম্পদের জৌলুশ নেই। আমি বেশ বুঝতে পারছি, অমরাবতী কয়দিনের মধ্যেই পরিত্যক্ত নগরে পরিণত হবে। তাই কলিঙ্গের সেনার আক্রমণ হওয়া আর না হওয়া নিয়ে আমি তেমন চিন্তা করছি না।'

'মহাশয়, মহারাজের চিন্তায় অমরাবতী ঠিক প্রথম স্থানেই আছে। তবে উনি পুরো সাতবাহন রাজ্যের সম্রাট। আর এখন ভারতের যা অবস্থা ওনাকে শুধু নিজের রাজ্য নিয়ে ভাবলেই চলছে না, পুরো আর্যাবর্ত নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। তাই শত্রুর অঙ্গুলি হেলনে তিনি চলতে পারেন না। হঠাৎ করেই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

আপনাকে আজ সেই কথা বলতেই এসেছি। আমাদের এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। সেই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে আমাকে আসন থেকে সরিয়ে তোমাকে বসালেন মহারাজ। এখন তুমি কী বলবে সেটাও আমি জানি। এই সাতবাহনে মহারাজ যে সেনা সাহায্য পাঠাচ্ছেন না, সেটাও তোমার মস্তিষ্ক প্রসূত এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ফসল।'

'আপনার অনুমান একেবারে নির্ভুল।'

'বাহ' এবার জোরে হেসে উঠলেন বলদেব, 'এমনও পরিকল্পনা হয়। রাজ্যের রাজধানী বিসর্জন দেওয়াও কোনো রাজা জেনে বুঝে মেনে নিতে পারেন। এমন আজব কথা তুমি আজকে না আসলে শুনতে পারতাম না।'

'রাজনীতি বদলাচ্ছে মহামন্ত্রী। নিজের গুটি বিসর্জন দেওয়াও লাগতে পারে এখানে মাঝে মাঝে। হতে পারে সেটা আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী গুটি। একটা নতুন সময়ে প্রবেশ করছি আমরা। আরও তীব্র হচ্ছে মানুষের চিন্তা, ছলনার দেবী আরও ক্ষমতাশালী হচ্ছেন। এই পৃথিবীতে ফিকে হয়ে এসেছে ন্যায়-অন্যায়।'

আর কথা বাড়ালেন না গিরিধারী। নিজের কাপড়ের ভেতরে লুকিয়ে রাখা একটা গাছের ছালের গোটানো নকশা বের করে আনলেন।

বলদেবের দৃষ্টি একটু কুঞ্চিত হলো, 'এটা কী?'

নকশাটা মেলে ধরলেন গিরিধারী, 'একটু নজর দিয়ে দেখুন তো। এই নকশা এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ চেনে না।'

নকশাটা একবার দেখেই চিনতে পারলেন বলদেব। গিরিধারী এখানে একটুও বাড়িয়ে বলেননি। তার মতো ভালো এই নকশা এই পৃথিবীতে আর কেউ চেনে না। এটা অমরাবতী নগরের নকশা।

নকশায় অপরিচিত কিছু চিহ্ন আছে। কয়েক রকমের কালি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব চিহ্ন আঁকতে। গিরিধারীর দিকে তাকিয়ে সেই চিহ্নগুলোর দিকে আঙ্গুল তুললেন বলদেব, 'এই চিহ্নগুলোর মানে কী?'

গিরিধারী এবার সবকিছু খুলে বলার প্রস্তুতি নিলেন, 'বলছি। আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনার সাহায্য আবশ্যক। বলতে পারেন এই রাজ্যের সংকটে আপনিও বেশ বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারবেন।'

বলদেব পরিকল্পনা শুনতে সচেষ্ট হলেন। কর্তব্যের ডাকে তার চিত্ত অবিচল হয়ে উঠেছে। পুরো পরিকল্পনা শুনতে শুনতে মুখের ভাব বদলে গেল তার। পুরো ঘটনা, পুরো পরিকল্পনা এবার বুঝতে পেরেছেন তিনি। এটাই তাহলে সেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

বলদেবের চেহারায় এবার সন্তুষ্টির ছাপ, একটু আগের বিরক্তির অভিব্যক্তি এখন আর তার চেহারায় নেই, 'না বলে পারছি না, এই পরিকল্পনা অমোঘ। আমি আমার তরফ থেকে সবকিছু ঠিক মতোই করবো। এই কাজে আমার তেমন সময় লাগবে না। দুদিন হলেই চলবে। এই নগরের প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটা কোণা আমার চেনা। আর এই কাজের জন্য যোগ্য লোকেরও কোনো অভাব নেই আমার হাতে।'

'আমি জানতাম এই কাজ একমাত্র আপনিই করতে পারবেন। এজন্যই বড়ো মুখ করে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি আমি।'

'কাজ হয়ে যাবে।'

'আপনি পরিকল্পনা মতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করবেন। কলিঙ্গ সেনা যখন আক্রমণ করবে, তখন আপনি প্রতিরোধের কোনো চেষ্টাই করবেন না। পারলে বিনা যুদ্ধে অথবা স্বল্প যুদ্ধে কলিঙ্গকে অমরাবতীর অধিকার দিয়ে দেবেন। কোনোমতে কেবল প্রাণ নিয়ে আর প্রজাদের নিয়ে নগর ত্যাগ করবেন। তারপর আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো। তার আগে নয়।'

'আমি সব ঠিকমতোই করবো। প্রাণের ভয় আমার নেই। এখন কেবল প্রজাদের জীবন নিয়েই চিন্তা।'

'আমার ধারণা, আপনি সবকিছু ভালোভাবেই সামলে নিতে পারবেন মহামন্ত্রী। এখন আমাকে আজ্ঞা দিতে হবে। ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সেগুলো সামলাতে হবে।'

'তুমি বেশ ক্লান্ত। একদিন বিশ্রাম না নিয়ে রওনা দিলে এত লম্বা রাস্তায় বিপদে পড়বে।' বলদেবের বিরক্তি এখন স্নেহে বদলে গেছে। পরিস্থিতি এভাবেই বদলায়।

'সামনে আমাদের আরও অনেক ক্লান্ত হতে হবে মহাশয়। এটুকু ক্লান্তিতে কাবু হয়ে শরীরের অবস্থা খারাপ হতে দিলে সামনে তো আর সামলাতে পারবো না। শরীরকে একটু হুমকি দিয়ে রাখতে হবে।'

'আচ্ছা' বলদেবের মুখে হাসি।

গিরিধারীকে বজরা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন বলদেব, 'একটা কথা না বলে পারছি না।'

গিরিধারী বজরায় উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন, 'বলুন।'

'আমি তোমার ওপর বিরক্ত ছিলাম। সত্যিই। নিজের ওপরেও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম দিন দিন। তবে এই পরিকল্পনার কথা শোনার পর আমার মনে এখন আর কোনো বিরক্তি নেই। আমার আসনে এখন যোগ্য লোকই বসেছে। সঠিক করে বলতে গেলে যোগ্যতর।'

প্রশংসার উত্তরে চুপ করে থাকাই নিয়ম। গিরিধারী তাই করলেন।

বলদেব আবার বললেন, 'আমার নিজের ওপরেও এখন আর বিরক্তি নেই। এজন্য তোমার একটা আলাদা ধন্যবাদ প্রাপ্য।'

'কেন?' এবার বজরায় উঠে পড়েছেন গিরিধারী।

'আমি ভেবেছিলাম এই জীবনে আমার কর্মের কোটা পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আমাকে অচল হওয়া থেকে বাঁচালে। এই জীবনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছ। ধন্যবাদ।'

এবারও চুপ রইলেন গিরিধারী। নিজের হাতে বজরার রশি খুলে দিলেন বলদেব।

৭৪

রুদ্রদেব বেশ আরামেই আছে। কুটিরের তুলনায় রাজপ্রাসাদের আরাম আয়েশ যে বেশি হবে স্বাভাবিক। আর সেই আরাম একেবারে বিনা দ্বিধায় উপভোগ করছে সে। অসিতের অবস্থা তেমন একটা ভালো না। কোনো কিছু দেখার জন্য আলো অবশ্যই দরকার তবে সেই আলোর আধিক্যে কিছুই দেখা যায় না, চোখ ধাধিয়ে যায়।

রুদ্রদেব শিষ্যের ইতস্তত অবস্থা ভালমতোই খেয়াল করেছে। অসিতকে একটু স্বাভাবিক করার প্রয়াস করলো সে, 'বুঝলে অসিত, সাধারণ মানুষ আর যোগীর মধ্যে এটাই পার্থক্য। যোগী সব জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। যোদ্ধা তো আসলে যোগী বই আর কিছু নয়। মনে রেখো, যার কোনো কিছুতেই আসক্তি থাকে না, তার কোনো কিছুতেই আড়ষ্টতাও জন্মায় না। এজন্যই আসক্তি ত্যাগ করার জন্য এত সাধনা করতে হয়। তুমি এখনও এই অথিতিশালার দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় শোবার মানসিকতা অর্জন করতে পারোনি, কিন্তু ঈশ্বর আমার কপালে এই বর্তমানে যে সুখ লিখে রেখেছেন সে কৃপা দুই হাত ভরে গ্রহণ করতে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।'

বাক্য যথেষ্ট জ্ঞান পূর্ণ হলেও তাতে অসিতের তেমন একটা বোধোদয় হলো না। সে এখনও আগের মতো শয্যার এক প্রান্তে বসে আছে। একটু আগের খাবারের আয়োজনেও ছিল বাড় বাড়ন্ত। সেখানেও তার তেমন একটা রুচি হয়নি। রুদ্রদেব অবশ্য সেই সুস্বাদু খাবারগুলো যথেষ্ট পরিমাণ উদরে চালান করে এখন শয্যার যথোপযুক্ত ব্যবহার করছে।

অসিত প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলো, 'আমাদেরকে তো এখানে সৈন্য হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। আপনাকে সেনার দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেনাপতি হবেন আপনি। কিন্তু সেসবের তো লক্ষণ এখনও দেখতে পাচ্ছি না।'

রুদ্রদেব চোখ বন্ধ রেখেই জবাব দিলো, 'বুঝতে পারছি, যে-কোনো একটা অজুহাতে এখন শক রাজ্যে যাবার জন্য তোমার আর তর সইছে না। সময়ের নিয়ন্ত্রণ এই পৃথিবীর কারো হাতেও থাকে না। মানুষের কেবল একটা জিনিসের ওপরেই নিয়ন্ত্রণ থাকে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।'

অসিত অপেক্ষা করতে লাগলো। অপেক্ষা করতে গেলেই ধৈর্য জিনিসটা আর টিকতে চায় না। তারচেয়ে অন্য কিছু চিন্তা করা ভালো। কিন্তু চিন্তা করার মতো কোনো বিষয়ই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

তবে আর বেশিক্ষণ অসিতকে চিন্তা করার বিষয় খুঁজতে হলো না। তাদের দুজনের অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। অথিতিশালার প্রহরী তাদের কামরার দরজার ঠিক বাইরে থেকে উঁচু গলায় ঘোষণা করলো, 'আপনারা সাবধান। তৈরি হয়ে নিন। প্রতিষ্ঠানার মহামন্ত্রী গিরিধারী শীঘ্রই আপনাদের সাথে দেখা করতে আসছেন।'

দুগ্ধ শয্যা থেকে এক ঝটকায় নিজের দেহ তুলে ফেললো রুদ্রদেব, 'অসিত, উঠে দাঁড়াও। পোশাক ঠিক করো। সময় চলে এসেছে।'

দুজনেই দ্রুত হাতে পোশাক যতটুকু পারা যায় ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করলো। রাজ পোশাকের মতো তাদের পোশাক অত জটিল নয়। সহজেই সামলে নেওয়া গেল।

গিরিধারী একটু পরেই কামরায় প্রবেশ করলেন। দুজনেই মাথা নত করে সম্মান জানালো। রাজার থেকে মন্ত্রীর সম্মান খুব একটা কম নয়। কিছু কিছু জায়গায় মন্ত্রীর গুরুত্ব রাজ্যে রাজার চেয়েও বেশি।

গিরিধারী আগেই ওদের দুজনকে দেখেছেন। এবার সামনে বসে আরেকটু ভালো করে দেখলেন। মুখে তার স্মিত হাসি, 'খাবার আর বিশ্রামের কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না' সবিনয় জবাব দিলো রুদ্রদেব, 'এমন ব্যবস্থা আমাদের জন্য চাক্ষুস করাই সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর আমরা তো রীতিমতো এই সৌভাগ্য ভোগ করছি।'

'তাহলে আমাকে বলতেই হচ্ছে, এরকম সৌভাগ্য ভোগ করার অভ্যাস করে নিন। এমন সৌভাগ্যের সাথে সাক্ষাৎ এখন থেকে নিয়মিত হবে তোমাদের। মহারাজের তো ধারণা আপনি অতুলনীয় যোদ্ধা। আর সাতবাহন রাজ্য তার যোদ্ধাদের যথা যোগ্য সম্মান করতে জানে।'

'মহারাজ নিজের বিবেচনার কথা আপনাকে জানিয়েছেন। আমি মহারাজকে ধন্যবাদ জানানোর সাহস করতে পারি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এমন কথার মান রাখার জন্য আমি আমার রক্তের শেষ বিন্দুও দিয়ে দেবো।'

'বাহ্, এইতো যোদ্ধার মতো কথা। তাহলে চলুন, এবার তাহলে আসল জায়গায় যাওয়া যাক।'

'আজ্ঞে কোথায় যাবো?'

'যোদ্ধার আসল জায়গা শিবিরে। অচিরেই আমাদেরকে অনেক বড়ো একটা যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে। তার আগে আপনার সেনাদলের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোঝাপড়া করে নিলেই মনে হয় ভালো হবে।'

'যথার্থ বলেছেন।'

ওদের দুজনকে সাথে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন গিরিধারী। গিরিধারী এই কাজের জন্য অন্য কাউকে পাঠাবেন ভেবেছিলেন। পড়ে রিপুজিতের সুনামের কথা মহারাজের কাছ থেকে জানতে পেরে সেই সাহস করলেন না। নিজেই ওদের দুজনকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই বিশেষ বাহিনীর শিবিরে।

জায়গাটা প্রতিষ্ঠানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। মাঝারি চালে চলতে লাগলো তাদের ঘোড়া। প্রায় বিকেল হয়ে গেল শিবিরে পৌছতে পৌছতে।

গিরিধারী পৌছতেই শিবিরের সদর দরজায় একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তিনি কোনো খবর না দিয়েই চলে এসেছেন। সেনাদের মধ্যে চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। গিরিধারীকে এখানে সবাই চেনে, তিনি এই শিবিরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। তার জন্য বিশেষ তাবু সব সময় খাটানোই থাকে। তার সাথে থাকার দরুন রুদ্রদেব আর অসিতেরও খাতির কম হলো না। তাদেরকেও নিয়ে যাওয়া হলো বিশেষ তাবুতে।

তাদের তিনজনের জন্যই খাদ্য আর সুশীতল পানীয় আনা হয়েছে। পথশ্রমের দরুন তিনজনেই প্রথমে পানীয়ের পাত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

নিজের পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলেন গিরিধারী। পরিচারক আরেকটা পাত্র বাড়িয়ে দিতেই তিনি হাত নাড়লেন, 'লাগবে না। তোমাদের সেনাপতি কোথায়?'

'তিনি তো শিবিরে নেই মহামন্ত্রী।'

'কোথায় গেছে?'

'আমাদের নিজস্ব অস্ত্রশালার জন্য উপযুক্ত কামার জোগাড় করতে গেছেন। তিনি কোনো কাজেই কাউকে বিশ্বাস করেন না। সবকিছু নিজে পরখ করে নেন।'

'ভালো। এমন লোকই আমার পছন্দ। যেখানে নিজে পরখ করে নেবার সুযোগ আছে সেখানে আরেকজনের ওপর নির্ভর করার দরকার কী? এখন তুমি যাও, যথেষ্ট সেবা হয়েছে। প্রয়োজন হলে আবার ডাকবো।'

গিরিধারীর অনুমান বলছে, আজ আর রিপুজিত শিবিরে ফিরবে না। তবে সে বেশিদূর যায়নি। কাল সকালের মধ্যেই ফিরে আসবে। তার মানে নতুন সৈনিককে রিপুজিতের কাঁধে চাপিয়ে দেবার কঠিন কাজটা সকালে করলেও চলবে। এখন একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।

রুদ্রদেব আর অসিত গিরিধারীর আদেশ পেতেই নিজেদের তাবুতে ফিরে এসেছে। তারাও আর দেরি করেনি। শুয়ে পড়েছে নিজেদের বিছানায়। তাবুতে অসিত আবার সাধারণ শয্যা খুঁজে পেয়েছে। নিঃসংকোচে এবার পিঠকে আরাম দেওয়া গেল।

রাত বাড়তেই শিবিরের কোলাহল আর আলো দুটোই কমে এসেছে। শুধু জেগে আছে পেঁচা আর রাতের প্রহরীরা।

গিরিধারীর ঘুম খুব সজাগ। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার সেই ছোটোবেলার গুরুকুলের অভ্যাসটা এখনও আছে তার। শাস্ত্রের উপকারী জিনিসগুলো তিনি বেশ ভালো করেই পালন করেন। তিনি জেগে ওঠার বেশ খানিক ক্ষণ পরে জেগে উঠলো পাখিরা। তাবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা নয়। পাতলা ঝোপ আর গাছের সারির মাঝে শিবির স্থাপিত হয়েছে।

দূর থেকে একজনকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন তিনি। দূর থেকে আলোর স্বল্পতার কারণে চিনতে পারলেন না। তবে আগন্তুকের পুষ্ট শরীর, তৈরি পেশি আর দৃঢ় পদক্ষেপ এই অল্প আলোতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। আরেকটু কাছে আসতেই আগন্তুককে এবার চিনতে পারলেন তিনি। নাকের নিচে অভিজাত গোঁফ, সেনাপতি রিপুজিতের চেহারায় কোনো অনুভূতির খেলা নেই। মুখ দেখে তার মেজাজ বোঝার কোনো উপায় নেই।

গলাতেও চেহারার ভাব মিশে আছে, 'মহামন্ত্রী, আমার সেনা শিবিরে আপনাকে স্বাগত।'

মাথা সামান্য নাড়লেন গিরিধারী, 'তোমার কামার জোগাড় হয়েছে? যথেষ্ট উপযুক্ত সংখ্যক কামার জোগাড় করো। যুদ্ধে গেলে অনেক কামারের দরকার হবে।'

'কামার জোগাড় হয়েছে। যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত যে-কোনো কাজেই আমার লোকের অভাব নেই। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যুদ্ধ বেশ কাছে এসে গেছে।'

এবার রিপুজিতের কণ্ঠে আনন্দের ছোঁয়া। পাকা যোদ্ধা যুদ্ধের গন্ধের মধ্যে সবচেয়ে সুবাসিত আতরের গন্ধ খুঁজে পায়।

'হ্যাঁ, যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। এড়িয়ে যাবার আর কোনো উপায় নেই।'

'আচ্ছা। আমি আমার বাহিনী নিয়ে কবে মূল বাহিনীতে যোগ দেবো? আপনি তো সেই খবর দেবার জন্যই এসেছেন? আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনি নিজে কেন এলেন? কোনো দূতকে দিয়ে সংবাদ আর নকশা পাঠিয়ে দিলেই তো আমি যথা সময়ে বাহিনীর সাথে নির্ধারিত জায়গায় চলে যেতাম। আপনি নিজে আসার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে।'

রিপুজিতকে নির্বোধ যোদ্ধা মনে করার কোনো কারণ নেই। সে ঠিকই অন্য কিছুর গন্ধ পেয়ে গেছে, 'ঠিক ধরেছ। সেই খবর দিতে হলে তো আমি এক দূতকে পাঠালেই পারতাম। আমার এখানে আসার আলাদা উদ্দেশ্য আছে।'

'বলুন, সেই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই খুব জরুরি।'

'তুমি নিশ্চয়ই কাল বেশ রাত করে শিবিরে ফিরেছ। না হলে এই ভোরে। একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলে হতো না?'

'মহামন্ত্রী। সাতবাহন সেনাপতিরা টানা সাত দিন কোনো বিশ্রাম আর ঘুম ছাড়া কাটিয়ে দিতে পারে। এটাই এই রাজ্যের সেনাপতি হবার একটা বিশেষ শর্ত। তাই বিশ্রাম নিয়ে এখন কোনো চিন্তা না করলেও চলবে।'

প্রসঙ্গ এক নিমেষে বদলে ফেললেন গিরিধারী, 'তোমাকে এই সেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেশিদিন হয়নি। সেনার কী অবস্থা? ঠিকমতো গুছিয়ে আনতে পেরেছ তো?'

'আমি সেই কাজে একটুও বিলম্ব করিনি। আমার এই বাহিনী শুরু থেকেই উত্তম প্রশিক্ষণ পেয়েছে। আমি বেশ ভালো করেই বাহিনী গুছিয়ে নিয়েছি। এই সেনারা এখন যে-কোনো বাহিনীর সাথেই সমানে সমানে যুদ্ধ করতে পারবে।'

'যাক, ভালো কথা। কিন্তু মহারাজ সাতকর্ণী কিন্তু এই ব্যাপারে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।'

এবার আঘাত লেগেছে রিপুজিতের অহংকারে। জ্বলে উঠলো তার চোখ, 'মহারাজ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মানে! কী বলেছেন তিনি?'

এবার সাবধানী হলেন গিরিধারী, 'এই সেনাবাহিনী আকারে অনেক বড়ো। কোনো যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও এদের নেই। তাই মহারাজ ভেবেছেন তুমি একা হয়তো সবদিক সামলে নিতে পারবে না। তাই তোমার হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এক সুদক্ষ সমরবিদকে তোমার সাহায্যকারী করে এখানে পাঠিয়েছেন তিনি। আমি তাকেই সাথে করে নিয়ে এসেছি। সে হবে এই বাহিনীর সেনা উপদেষ্টা।'

কোনোমতেই এই কথাটা রিপুজিতের সহ্য হবার কথা না, তেলেবেগুনে না হলেও মোটামুটি জ্বলে উঠলো সে, 'কথাটা সোজা করে বললেই পারেন। এখন আর সম্রাটের রিপুজিতের বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা নেই। তাই একজন গুপ্তচর পাঠানো হয়েছে আমার পেছনে।'

'তুমি ভুল করছো রিপুজিত। তুমি এখন আর সাধারণ সৈনিক নও। তলোয়ারের সাথে সাথে জিভেরও সঠিক ব্যবহার করতে শেখা উচিত। কোনো গুপ্তচর নয়, একজন সমর বিশেষজ্ঞকেই এখানে পাঠানো হয়েছে উপদেষ্টা করে।'

মুখটা এমন ভঙ্গিতে বিকৃত করলো রিপুজিত যেন সে না দেখেও ঐ অচেনা সমর বিশারদের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা করতে পারছে। আর সে ধারণা তেমন উচ্চ কিছু নয়।

তারা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তার খুব কাছেই অসিত আর রুদ্রদেবের তাবু। তাদেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে ততক্ষণে। আলোচনার এই পর্যায়ে রুদ্রদেব আর অসিত বেরিয়ে এলো তাবু থেকে।

গিরিধারী তাকালেন ওদের দিকে, 'আরে তোমরা দেখি উঠে পড়েছ। এদিকে এসো।'

হংস মধ্যে বক আর রঙ্গিন পক্ষী মাঝে বায়স খুব সহজেই চেনা যায়। রিপুজিত সহজেই এই দুজনের পরিচয় সম্পর্কে বুঝতে পারলো। এরা তার সেনার অধিভুক্ত নয়। তার মানে গিরিধারীর সাথে এসেছে। একজন আছে বালক। তাকে সমর বিশেষজ্ঞ মনে করার কোনো কারণ নেই।

বালক ছেড়ে রুদ্রদেবের দিকে নজর গেল রিপুজিতের। লম্বা, একহারা গড়ন যুবকের। চোখেমুখে কোনো ভাবনা নেই, এক রকমের কৌতুক খেলা করছে। কপালে একটা কাপড় মোটা করে বাঁধা। এই নিশ্চয়ই তার উপদেষ্টা।

ওদের দুজনের দিকে কোনোরকমের সম্ভাষণ ছুঁড়ে দিলো না রিপুজিত। স্পষ্টতই অবহেলা করলো, তাকাল গিরিধারীর দিকে, 'আপনার সেনা উপদেষ্টা নিশ্চয়ই এই লোক। আপনার কথা মতো বেশ বড়ো সমরবিদ। কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে, এই সাতবাহন রাজ্যের যে-কোনো সমরবিদকেই আমি চিনি। আর আপনাদের এই সমর বিশেষজ্ঞকে আমি চিনি না। ইনি বোধহয় কোনো দেবতার অবতার হয়ে ধরাধামে নেমেছেন। আমার পরিচিত একজনকে দিতেন। তাও একটু বিশ্বাসযোগ্য হতো ব্যাপারটা।'

রিপুজিতের কথায় বিদ্রূপ স্পষ্ট। রুদ্রদেবের মুখে কোনো রকমের পরিবর্তন না হলেও অসিতের চেহারায় ক্রোধ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। গুরুর নিন্দা সে সহ্য করতে পারছে না। মুখে কিছুই বলতে পারলো না সে তবে ক্রোধে ফুটতে লাগলো ভেতরটা।

রিপুজিতের কথা তখনো শেষ হয়নি, তখনো তাকিয়ে আছে সে গিরিধারীর দিকে, 'তার মানে আমার প্রথম কথাই সত্য। মিথ্যার চাদরে ঢেকে আমার বাহিনীতে আসলে একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছেন মহারাজ।'

গিরিধারী এর মধ্যেই নিজের কূটনীতির জ্ঞানের হরেক পরীক্ষা বেশ সফল ভাবেই দিয়েছেন। তিনি বোঝেন কখন কাকে কোন ওষুধ দিতে হয়। রিপুজিতকে ভালো করে বুঝিয়ে লাভ নেই। এবার রাজদণ্ডের প্রয়োগ করলেন তিনি, 'দেখো রিপুজিত, সংযত হও।'

গিরিধারীর গলার শীতলতা রিপুজিতকে একটু থমকে দিলো। গিরিধারী পরের কথাটুকু বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, 'তোমার মন কী বলছে, তুমি কী চিন্তা করছো, সেটা কোনো মানেই রাখে না। মহারাজ তোমাকে কী আদেশ দিয়েছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। না-কি তুমি অন্য ধারণা পোষণ করো?'

এই কূটনীতিক আক্রমণের কোনো জবাব রিপুজিতের কাছে নেই। সে এবার আমতা আমতা করতে লাগলো।

'মহারাজের আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে অথবা সেই আদেশে দ্বিমত পোষণ করলে তোমাকে এই মুহূর্তেই আমি সেনাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেবো। তুমি মনে হয় আসলে সেটাই চাচ্ছো।'

এবার জোঁকের মুখে বেশ ভালো পরিমাণে লবণ পড়েছে, 'না, মন্ত্রী গিরিধারী। আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি মহারাজের আদেশ সর্বতোভাবে পালন করবো।'

'বেশ। তাহলে ভালো করে শোনো। এই দুজন এখন থেকে তোমার বাহিনীর সদস্য। তুমি সেনাপতি হিসেবে সেনা উপদেষ্টাকে যথাযথ সাহায্য করবে। কোনো ধরনের ব্যক্তিগত ঝামেলা হবে না আশা করছি।'

রিপুজিত নিশ্চুপ। নীরবতা দিয়েই সে ক্রোধ চেপে রেখেছে। এই উপদেষ্টাকে সে মেপে নেবে।

গিরিধারী এবার বিদায় নিলেন, 'আমি এখনই রাজধানীর দিকে রওনা দেবো। বাহিনী সবসময় যাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখবে। যে-কোনো সময় যুদ্ধযাত্রার জন্য রাজধানী থেকে সংবাদ আসবে।'

রিপুজিত মাথা নোয়াল, 'যথা আজ্ঞা মহামন্ত্রী।'

গিরিধারী আর কিছু না বলে ঘোড়ার পিঠে উঠলেন। এরপর থেকে রুদ্রদেবকেই সামলাতে হবে। জগতে নিজের ঝামেলা নিজেকেই সামলাতে হয়। মোড়ক একটা সময় পর্যন্ত সুরক্ষা দেয়, তারপর খসে পড়ে।

রিপুজিত এগিয়ে এলো রুদ্রদেব আর অসিতের সামনে, 'তোমরা এখন থেকে আমার বাহিনীর সদস্য। রাজবাড়ি থেকে তোমাদের তোষামোদ করে এনে দিয়েছে বলে ভেবো না, এখানে সবকিছু তোমাদের মনের মতো চলবে। আমার সেনা কঠিন নিয়মে বাঁধা। কারো জন্যই তার নড়চড় হয় না। আর সেই নিয়মানুযায়ী সকালের খাবার সময় শেষ হতে খুব একটা বাকি নেই। আরেকটু দেরি করলে তোমাদের কপালে আর সকালের খাবার জুটবে না।'

রুদ্রদেব উত্তর দিলো, 'আপনার নিয়ম সর্বদা পালন করবো আমরা। এখনই খাবার জায়গায় যাচ্ছি।'

রিপুজিত এবার তাকালো রুদ্রদেবের দিকে, সম্বোধনে এলো একটু সম্মান, 'আপনি মহারাজের আদেশে আমার সেনা উপদেষ্টা। তবে কখনো ভুলে যাবেন না, এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি আমি।'

মৃদু হাসলো রুদ্রদেব, 'বিলক্ষণ।'

অ্যালেকের হাতে বারিগাজার ভার দিয়ে মহারাজ নাহাপনা কদিন আগেই ফিরে গেছেন। এমনিতে দায়িত্ব পালনে অ্যালেকের কখনো কোনো অনীহা নেই, তবু ফাঁকিবাজি জিনিসটা মানুষের রন্ধ্রে সেই সৃষ্টির প্রথম থেকেই মিশে গেছে। মহারাজ নগরে না থাকলে গ্রীক সেনাদের মাঝে একটু গাছাড়া ভাব চলে আসে। অ্যালেক তখন নিজের বাহিনীর ওপর তেমন একটা খবরদারি করে না। অনেক পরিশ্রমের পর একটু আরাম সবারই প্রাপ্য।

এমনিতে অ্যালেককে বিশ্বাস করে মহারাজ নাহাপনা একটুও ভুল করেননি। সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছিলেন তিনি আর তার পূর্বপুরুষরা। ভারতের উত্তর দিকে তখন ইন্দো-গ্রীকদের ত্রাহি অবস্থা। পারস্য থেকে আগত রাজাদের মুহুর্মুহু আক্রমণে তাদের অবস্থান ক্রমশ টলে উঠছে। একসময় দেখা গেল শুধু টলে ওঠা না, যদি এমন আক্রমণ চলতে থাকে তাহলে ইন্দো-গ্রীকদের অস্তিত্ব মিটে যেতে বেশি সময় লাগবে না। সেই আলেকজান্ডারের সময়ের গৌরব কেবল খাতাপত্রেই অবশিষ্ট থাকবে।

এই অ্যালেকের পিতা ছিলেন সেই ভঙ্গুর ইন্দো-গ্রীকদের একজন সেনাপতি। শেষ যুদ্ধে শকদের প্রবল বিক্রমের সামনে তাদের পুরো বাহিনীই ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রীকরা তাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব দিয়ে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শকদের সংখ্যা আর উদ্যমের সাথে পেরে উঠলো না।

পরাজিত হয়ে অ্যালেকের পিতা কয়েকজন সেনা নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে আসেন। সব সহায় হারিয়ে সেই দিক হীন গুটিকয়েক সেনা তখন প্রাণপণে খুঁজছে একটা আশ্রয়। তাদের আশার কথা ছিল একমাত্র পশ্চিম দিকে বাস করা কিছু শক। তারা তখন পশ্চিম দিকে নতুন রাজ্য গড়েছে।

পশ্চিম দিকের শকদের কাছে আশ্রয় চাইবার আগে কয়েকবার ভাবতে হয়েছিল তাদের। যদিও পশ্চিম শকেরা এই ভারতীয় গ্রীকদের প্রতি কখনোই কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেনি তবু ঠিক ভরসা পাওয়া যাচ্ছিলো না। স্বজাতির শত্রু স্বভাবতই শত্রু হয়।

তবে নাহাপনার মনে ঐ শত্রুতার ভাব ছিল না। তিনি রাজা হিসেবে কুশলী, সুযোগের সদ্ব্যবহার ভালোভাবেই করতে জানেন। তখন তিনি নতুন সম্রাট। তখনই একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তিনি।

রীতিমতো সিদ্ধান্তের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসেছিলেন তিনি। তখনো তার সাথে ছিলেন সারথী। এক পাল্লায় রাখলের উত্তর শক রাজ্যের সাথে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক, আরেক পাল্লায় ছিল শরনাগতির অপেক্ষায় থাকা একদল সৈনিক।

সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। কোনোমতেই উত্তর শক রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ঐ মুহূর্তে খারাপ করা যাবে না। আবার গ্রীকদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে নাহাপনা আগে থেকেই জানতেন। পলাতক গ্রীকদের আশ্রয় দেওয়ার মানে হচ্ছে নিজের সেনাদলে বেশ কুশলী কিছু যোদ্ধা আর প্রায় অজেয় এক কৌশলের অন্তর্ভুক্তি করা। শেষ পর্যন্ত দুই পাল্লাতেই

নিজের ভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। উত্তর শকদের কাছে শান্তির বার্তা পাঠালেন আর আশ্রয় দিলেন এই গ্রীকদের।

উত্তর শক রাজ্যে স্বয়ং নিজে গিয়েছিলেন তিনি। রাজ ধর্মের পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে এমনটাই বোঝালেন। একজন রাজা হয়ে তিনি কীভাবে শরণাগতের প্রার্থনা না শুনে থাকতে পারেন। রীতিমতো আকুতি ঝরে পড়েছিল তার গলা থেকে। উত্তর শক রাজা উত্তরে বলেছিলেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এই গ্রীকদের কাছ থেকে তিনি আগামীতে কোনো প্রতিশোধের আঘাত সহ্য করবেন না। মহারাজ নাহাপনা স্বয়ং সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন এই গ্রীকেরা কখনো উত্তর শক রাজ্যে পা রাখবে না। যদি দেয়, তাহলে তিনি নিজে তার পশ্চিম শক রাজ্য তাদের পায়ে ফেলে দেবেন।

উত্তর শক রাজা তারপর আর আপত্তি করতে পারলেন না। আসলে বলতে গেলে আপত্তি করার কোনো সুযোগই পাননি। তার ঠিক পরেই নানা বাণিজ্যিক আলাপ শুরু করে দিলেন মহারাজ নাহাপনা। তিনি ব্যবসা বেশ ভালো বোঝেন। তিনি উত্তর শককে বোঝাতে লাগলেন এখন এসব যুদ্ধ বিগ্রহ করে সময় নষ্ট করার সময় নেই। সামনে বিদেশিরা স্বর্ণের তাল নিয়ে এখানে আসবে ব্যবসা করতে। উত্তর শক সম্রাট সেই কথা শুনে আগ্রহী না হয়ে পারলেন না। হাজার হাজার ভবিষ্যৎ স্বর্ণমুদ্রা অর্জনের আশার নিচে কয়েকজন সহায়হীন শত্রুর আশঙ্কা চাপা পড়ে যেতে তেমন সময় লাগলো না।

নাহাপনার এই কৌশল বেশ কাজে লাগলো। পলাতক গ্রীক বাহিনী নাহাপনার ছত্রছায়ায় বাড়তে লাগলো। তবে এই কয়েকজন গ্রীক নিজের রাজ্যে পালন করা তার আসল উদ্দেশ্য ছিল না। এরপরের কাজটা তিনি করতে লাগলেন বেশ গোপনে।

উত্তর শক রাজ্যে তখনো নানা অচেনা জায়গায় অনেক গ্রীক আত্মগোপন করে ছিল। তাদের কেউ ছিল যোদ্ধা আবার কেউ সাধারণ। নানা গুপ্ত উপায়ে নাহাপনা সব গ্রীকদের নিয়ে আসেন নিজের রাজ্যে। ততদিনে গ্রীকদের আস্থা তিনি অর্জন করে নিয়েছেন। আস্তে আস্তে সাধারণ গ্রীকদের সংখ্যা কমতে লাগলো আর গ্রীক সেনার সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

ততদিনে কালের বিবর্তনে অ্যালেকের পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পিতার একমাত্র সন্তান হিসেবে পশ্চিম শক রাজ্যে অবস্থিত সব গ্রীকদের নেতা হলো সে। ক্ষমতার স্বাদ মুখে লাগতেই সে বুঝতে পারলো স্বাদটা নেহাত খারাপ না। সে ছোটোবেলা থেকেই পিতার কাছ থেকে যুদ্ধের সব কলাকৌশল শিখে নিয়েছিল। মহারাজ নাহাপনার তত্ত্বাবধানে অ্যালেক গড়ে তুলতে লাগলো এক সুশিক্ষিত গ্রীক সেনাবাহিনী। সেই সাথে মনে মনে আশ্রয় আর ক্ষমতা দাতা মহারাজ নাহাপনার প্রতি তার মনের সমর্থন বাড়তে লাগলো চক্রবৃদ্ধি হারে।

গ্রীকরা অকুতোভয় যোদ্ধা। এইদিকের মানুষের চেয়ে শারীরিক ক্ষমতায় অনেক এগিয়ে। অনেক চেষ্টা করে নিজেদের রক্তের শুদ্ধতা তারা ধরে রেখেছে। কিছু গ্রীক মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রভাবশালী কেউ হয়তো তাদের বিয়ে করেছে তবে সেটা এখনও বর্ণশঙ্কর তৈরি করার মতো উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছায়নি। পর্যাপ্ত শক্তিশালী সৈনিক আছে অ্যালেকের সেনায়। আর এই সেনার ক্ষমতা সম্পর্কে মহারাজ নাহাপনা বেশ

ভালোই জানেন। তাই কখনোই এই বাহিনীর প্রধান অ্যালেকের হাতে তার বাণিজ্যিক রাজধানী বারিগাজার ভার দিয়ে যেতে কখনোই ভাবতে হয় না তাকে। সামর্থ্য আর বিশ্বাস কিছুরই অভাব নেই।

অ্যালেক আজ সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। মহারাজের অনুপস্থিতিতে যে ছুটি পাওয়া গিয়েছিল তা খুব বেশিদিন লম্বা হয়নি। বাণিজ্যের মৌসুম শেষ হতেই মহারাজ নাহাপনা ফিরে গিয়েছিলেন রাজধানী উজ্জয়িনিতে। তবে এবার বাণিজ্যের মৌসুম পুরোপুরি শুরু হবার আগেই আবার ফিরে আসছেন। এমনটা তো আগে কখনো হয়নি।

বন্দরে কিছুক্ষণ নজর বুলিয়েছিল অ্যালেক। কিছু আরব, মিশরীয় আর গ্রীক জাহাজ এখনও সেখানে আছে। তবে বিশাল বন্দরের তুলনায় তা কিছুই না। বন্দর এখনও খালিই। এই জাহাজগুলো শেষ সময়ের কেনাকাটা করছে। সময়ের বেশ হিসেব রাখতে হচ্ছে তাদের। শীত বাতাস আর এক মাসের মতো থাকবে। ততদিনে যদি এই জাহাজগুলো বাণিজ্যের একটা হিল্লে না করতে পারে তাহলে বড়ো বিপদে পড়তে হবে তাদের। শীত বাতাস পড়ে গেলে আড়াআড়ি আরব সাগর পেরোনো যাবে না। তখন দাঁড় আর গুণ টেনে তিন গুণ রাস্তা পাড়ি দিতে হবে। এক মাসের মধ্যেই নিশ্চিত জাহাজগুলো চলে যাবে। তিন গুণ রাস্তা পাড়ি দেবার নির্বুদ্ধিতা কেউই করতে চাইবে না।

এরকম খুচরো পাঁচ দশটা জাহাজের দায়িত্ব অ্যালেক নিজেই ভালো ভাবে সামলাতে পারে, আগে এমন করেছেও। তার জন্য মহারাজ নাহাপনার তো এদিকে আসার কোনো দরকারই নেই। ভাবনা চলছে তার মাথায়। মনে হচ্ছে বাণিজ্য নয়, মহারাজ নাহাপনা এখানে আসছেন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। সেটা নিয়ে সে চিন্তা করছে তবে দুশ্চিন্তা নয়। যা হয় হোক, তার কিছুই আসে যায় না। পূর্ণ সমর্পণের শক্তিই এখানে। সমর্পিত ব্যক্তি কোনো কিছুতেই বিচলিত হয় না, কেবল কাজ করে যায়, তা সেই সমর্পণ মানুষের প্রতি হোক অথবা ঈশ্বরের প্রতি।

এই মুহূর্তে উজ্জয়িনি থেকে বারিগাজায় আসার রাস্তায় চোখ মেলে রেখেছে সে। সামনে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে তাতে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। বিচলিত না বলে উত্তেজিত বলাই বোধহয় ঠিক হবে।

উজ্জয়িনির দিক থেকে এক বিশাল সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে বারিগাজার দিকে। নিশানেই বোঝা যাচ্ছে এটা মহারাজ নাহাপনার বাহিনী। যাক, এতদিনে খুচরো বীরত্ব দেখানোর দিন শেষ হতে চলেছে। এত বড়ো বাহিনী নিয়ে কেউ শোভা যাত্রার জন্য বেরোয় না, নিশ্চিত যুদ্ধ হবে। আর সেটা বেশ বড়সড় যুদ্ধ।

অ্যালেকের রক্তে যেন বাণ ডেকেছে। কিছুক্ষণের জন্য অন্য সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতে ভুলে গেল সে। তার গ্রীক যুদ্ধ প্রিয় রক্ত কথা বলতে শুরু করেছে। তার পূর্বপুরুষরা অনেক আগে যেখান থেকে এসেছে সেখানে যুদ্ধকে ধর্ম জ্ঞান করে পূজা করা হতো। তার বাবাও অনেক বড়ো বড়ো যুদ্ধ করেছেন। সেদিক থেকে তার কপালে এখনও তেমন কোনো সমর জোটেনি। গ্রীক সেনাদের যুদ্ধকলা এবার এই ভারতকে দেখানোর সময় চলে এসেছে।

গ্রীস সম্পর্কে সে কেবল শুনেছেই, কখনো চোখে দেখেনি। কিন্তু ঐ ভূখণ্ডের সাথে যোগ কোথায় আছে সেটা যেন আজকে পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারলো সে। তাকে যেন ডাকছে সামনের ঐ বাহিনী, বলছে, 'এসো, হে একিলিসের বংশধর, তোমার সামনেও অমর হবার সুযোগ এসেছে।' এই ডাক অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কোনো গ্রীকের নেই। বাইরের ডাক হয়তো কান চাপা দিয়ে এড়ানো যায়, কিন্তু শরীরের ভেতরের আওয়াজ কোন কানে চাপা দিয়ে এড়াবে সে?

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে চিন্তা ফিরিয়ে আনতে রীতিমতো কসরত করতে হলো তাকে। মহারাজ নাহাপনাকে এখন বরণ করে নিতে হবে। দিতে হবে তার যোগ্য সম্মান।

বারিগাজায় কেউ ইচ্ছে করলেই প্রবেশ করতে পারবে না। এই নগরের সুরক্ষার সব ব্যবস্থাই নেওয়া আছে। নগরের একদিকে আছে নদী, বাকি তিনদিকে বেশ গভীর করে পরিখা খনন করা আছে। তেমন চওড়া না হলেও অনুপ্রবেশকারী ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট। পরিখা পার হবার জন্য এপাশ থেকে নিয়ন্ত্রিত একটাই সেতু আছে। সেই সেতু যথেষ্ট শক্তিশালী। নিরাপত্তার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে এই সেতু কেবল এই নগরের ভেতর দিক থেকেই নামানো যায়।

সেতু রক্ষার দায়িত্বে যে সেনারা আছে তারা বেশ কঠিন মনোভাবের। আদেশের বাইরে এ চুলও নড়বে না। তাদের ওপর কড়া নির্দেশ এই সেতু যেন অ্যালেকের সরাসরি নির্দেশ ছাড়া না নামানো হয়। তারা স্বয়ং মহারাজ নাহাপনার নির্দেশও শুনবে না। তাই তাকে এখনই সেতুর কাছে যেতে হবে। সশরীরে নির্দেশ দিতে হবে সেতুরক্ষকদের।

প্রাচীরের উঁচু জায়গা থেকে তাড়াতাড়ি অবরোহণ করলো সে। নিচেই তার ঘোড়া প্রস্তুত আছে। চড়েই আর দেরি করলো না। শুরু থেকেই ছোটাল প্রচণ্ড বেগে।

ওদিকে মহারাজ নাহাপনা পরিখার ঠিক সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পেছনে তার সেই বিশাল সেনা। সেতু রক্ষকরা তার দিকে তাকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলো। বেশ আয়োজন করে। কিন্তু সেতু নামানোর যান্ত্রিক কাঠামোর দিকে কেউ এগিয়ে গেল না। আদেশ না পেলে সেতু নামাবে না তারা। মহারাজ নাহাপনা এই অপমানে মনে মনে খুশিই হলেন। এমন সেনাই তো তার চাই। অ্যালেকের সেনারা এমনই। তারা পৃথিবীর কারো জন্যই, কোনো হুমকিতেই নিয়মের পরিবর্তন করে না।

ঘোড়া ছুটিয়ে পরিখার সামনে আসতে বেশি সময় লাগলো না অ্যালেকের। সে এসেই প্রথমে মহারাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো, তারপর পরিখার সেতু নামাতে আদেশ দিলো নিজের সেনাদের।

এরপরে মহারাজ নাহাপনার বারিগাজায় প্রবেশ করতে কোনো সমস্যা হলো না। পুরো বাহিনী অবশ্য প্রবেশ করলো না নগরে। মহারাজ নাহাপনা সারথী আর সেনাপতিদের নিয়ে প্রবেশ করলেন। একটু পরেই রাজভবনে সবাইকে নিয়ে বসলেন তিনি। সাথে অ্যালেকও আছে।

সেনাপতিরা সবাই জানেন এই সেনাযাত্রার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তবে নির্দিষ্ট করে কাউকেই কিছু বলেননি নাহাপনা। এবার সেই কথায় এলেন,

'আমরা খুব বড়ো একটা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। রাজা হিসেবে আমি যুদ্ধ এড়াবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনারা তো জানেনই একটা সময়ে সমরে দাঁড়াতেই হয়। আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই ভারত ভূমিতে আমাদের এই যুদ্ধ করতেই হবে।'

সব সেনাপতিরা নড়েচড়ে বসে।

'আপনারা আপনাদের যার যার সেনার জন্য রসদ প্রস্তুত করে নগরের বাইরে প্রস্তুত হোন। যা দরকার এই বারিগাজা নগর থেকে নিয়ে নেবেন। নগরে সবার জন্য পর্যাপ্ত রসদ আছে। ভালো করে পরিমাপ করে নেবেন সব কিছু। যদিও এরই মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তবে চূড়ান্ত যাত্রা শুরু এখনও বাকি। যে-কোনো সময় আমরা সেই যাত্রা শুরু করবো।' নাহাপনা বেশ পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন।

সেনাপতিরা সবাই নড়ে উঠলো। কাজে এখন থেকেই লেগে পড়তে হবে। এই নগরে সবকিছু পর্যাপ্ত থাকলেও জায়গাটা তাদের অচেনা। সবকিছু গুছিয়ে নিতে ভালো রকমের ঝক্কি সামলাতে হবে।

অ্যালেকও সবার সাথে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন মহারাজ নাহাপনা, 'ওরা সবাই বেরিয়ে যাক অ্যালেক। তুমি এখানে থাকো। তোমার সাথে আমার একান্তে কিছু কথা আছে।'

নিজের জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে পড়লো অ্যালেক।

প্রহরীর দিকে ইশারা করলেন সারথী। প্রহরীরাও বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সবাই বেরিয়ে যেতেই সারথী নিজেও বেরিয়ে গেলেন। এখন ঘরে মহারাজ নাহাপনা আর অ্যালেক বাদে কেউ নেই।

নাহাপনা উঠে দাঁড়িয়ে অ্যালেকের কাঁধে হাত রাখলেন, 'তোমার ওপর আমার অনেক আশা। সেই কোন কালে তোমাদের ভালোবেসে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। তখন আমার মনে এই আশা ছিল না যে তোমরা আমার হয়ে যুদ্ধ করবে। তবে আস্তে আস্তে তোমাদের যুদ্ধ দেখে আমি বুঝেছি, এই রাজ্যের প্রয়োজনে তোমরাই হবে আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি। এই যুদ্ধে তোমরা হবে আমার তুরুপের তাস। শক্তি আর অতুলনীয় কৌশল দিয়ে শত্রুদের একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে তোমরা।'

'আপনি আমাকে যে সম্মান আজ দিলেন তা আমি কখনো ভুলবো না মহারাজ। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। গ্রীক জাতি যুদ্ধ থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সর্বদা বুক বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধে আমাদের হিসেব একেবারে সোজা। হয় শত্রুর রক্তের শেষ ফোঁটা আমরা ভূমিকে অর্পণ করবো, অথবা ভূমি আমাদের রক্তের শেষ ফোঁটার স্বাদ নেবে।'

'একটাই অসুবিধা, তোমার বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন। বেশির ভাগ যোদ্ধাই কখনো সামনাসামনি যুদ্ধ করেনি। তবে সেনাপতি হিসেবে তুমি ভারতীয় যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। সাথে আছে গ্রীক কৌশল। তোমার বাহিনী দুই ভূখণ্ডের যুদ্ধেই পটু, এটাই তোমাদের বিজয়ী করবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ, ওদেরকে দুটোর সমন্বয় করিয়েই অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছি আমি।'

'খুব ভালো কথা। সেনাদের জড়ো করো। সব বিদ্যায় আরেকবার ঝালিয়ে নাও। ওদেরকে বোঝাও এবার রক্তের সন্ধানে বেরোতে হবে। সবকিছুর চর্চা অনেকবার করে করতে হবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আরেকটা কথা, শুধু নিজেরা নিজেরা চর্চা করলে হবে না। আমার মূল সেনাদলের সাথেও চর্চা করো। হতে পারে যুদ্ধের মধ্যে তাদের সাথে মিলে তোমাদের যুদ্ধ করতে হতে পারে। ওরা যাতে তোমাদের ইশারা আর কৌশল সম্পর্কে জানতে পারে। তোমাদের ব্যূহ রচনা তো আর আমাদের মতো নয়। সেই ব্যূহগুলো সম্পর্কেও যাতে আমাদের সেনাপতিরা ভালো করে জানতে পারে।'

'অবশ্যই মহারাজ। আমি এখুনি শুরু করছি।'

'আরেকটা কথা বলি। রাজা কখনো কোনো শর্তে অথবা কোনোরকমের প্রতিদানের আশায় শরণাগতকে আশ্রয় দেয় না। তবু আমার এই সংকটে আমি বলি, তোমাদের জাতির চরম বিপদের সময় একদিন আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম। তার প্রতিদান চাইতে হবে এমন কোনো দিন আসবে তা কখনো চাইনি, তবে মিথ্যে বলবো না, তোমাদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা ছিল।'

অ্যালেকের মাথা নিচু।

'তোমাদের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করেছি আমি। সম্মান দিয়েছি। এবার আমি তোমাদের কাছে একটু সাহায্য চাইছি শুধু। যে কাজটা তোমরা সবচেয়ে ভালো করতে পারো তাই আমার জন্য করো। জন্মভূমির জন্য করো। তোমার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য করো। তোমাদের এই বাহিনীই এই যুদ্ধ জিতবে। শত্রুকে হতবুদ্ধি করে দেবে। তোমাদের সম্মান বাড়িয়ে নেবার সময় এসে গেছে অ্যালেক।'

'আশ্রয়ের ঋণ আমরা কখনো পুরোপুরি শোধ করতে পারবো না, তবে জীবন দিয়ে হলেও তার কিছুটা পূরণ করতে চেষ্টা করবো।'

মাথা নাড়লেন মহারজা নাহাপনা, 'আচ্ছা, আরেকটা দিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'বারিগাজা আমার বাণিজ্যিক রাজধানী। এই নগরে এখন কিছু জাহাজ ব্যবসা উপলক্ষে আছে। তারা যেন আমাদের এই যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে। আমরা এদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবো। ওরা যেন তার কিছুই না বোঝে। তার জন্য একটা কাজ করতে পারো। নগরের এই পাশে যেন বন্দরের ঐ পাশ থেকে কেউ না আসতে পারে। তুমি একটা ঘোষণা দিয়ে দাও, নগরের ঐ পাশ থেকে দেশি-বিদেশি কোনো লোকই যেন এইদিকে না আসতে পারে। এই মুহূর্তে কেউই নগর ত্যাগ করতে পারবে না। কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করো এই আদেশ। আমি চাই না কোনো ব্যবসায়ী এই বন্দর সম্পর্কে কোনোরকমের ভয় মনে পুষে রাখে। আশা করি বুঝেছ।'

'জি মহারাজ।'

অ্যালেক বেরিয়ে যেতেই সারথী প্রবেশ করলেন, তিনি ঘরের বাইরেই ছিলেন।

'কি খবর সারথী? আপনাকে একটু চনমনে দেখাচ্ছে।'

'মহারাজ, আমার দূত খবর নিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা। কি করেছে কলিঙ্গের সেনারা?'

'কলিঙ্গের সেনাপতি আদিত্য তার সেনা নিয়ে অমরাবতীর দখল নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের নির্দেশ মতো মহারাজ সাতকর্ণীকে উস্কানোর সর্বোচ্চ কাজটা করেছে সে। প্রথমেই হাতে গোণা কিছু সৈন্যকে হত্যা করেছে। তারপর অমরাবতীর দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী বলদেবের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাকে স্বপ্রজা নগর থেকে বের করে দিয়েছে।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো মহারাজ নাহাপনার মাথায়। তিনি ঠিক এমনটাই চেয়েছিলেন। এক দূতের খবর চলে এসেছে। এবার শুধু অপেক্ষা আরেক দূতের খবরের। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ দূতের খবর আসতেও খুব একটা দেরি হবে না।

৭৬

গিরিধারী ফিরে যাবার পর সেদিন রুদ্রদেব আর অসিতের খাওয়া বাদে তেমন কিছুই আর করতে হলো না। রিপুজিতের দাঁড়ানোর সময় নেই। ওরা দুজন সারাদিন তাঁবুতে কাটায়নি, এদিক সেদিক ঘুরে বেরিয়েছিল। মাঝে কয়েকবার রিপুজিতের সামনেও পড়েছিল, কিন্তু কোনো কথা হয়নি। রিপুজিত ওদেরকে নাকের নিচেই রেখেছে।

রুদ্রদেব সবই বুঝতে পারছে। তার এখানে আসাতে রিপুজিতের সরাসরি কোনো ক্ষতি না হলেও পরোক্ষ ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। কারো যোগ্যতার ওপর প্রশ্ন এলে ভালো লাগার কথা নয়। বিশেষ করে সেই কাজে যা একটা মানুষ সারা জীবন বেশ মন দিয়ে করে আসছে। সাধারণ মানুষ এই পরিস্থিতিতে সামলাতে পারে না। উচ্চ স্তরের যোগীর কথা আলাদা, তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, রিপুজিত আর যাই হোক কোনোভাবেই সেই স্তরের যোগী নয়।

রুদ্রদেব ভালো করেই জানে, এমন সময়ে জোরাজুরি করা কোনো কাজের কথা না। অপেক্ষা করতে হবে। এখন বাইরে থেকে তাঁবুর ভেতরে এসে তাই করছে সে। বিছানায় শুয়ে পড়েছে সটান।

অসিত নিজেও এখনো যোগের উচ্চ স্তরে পৌছাতে পারেনি। তার মেজাজ সেই সকাল থেকেই চড়ে আছে, 'আপনাকে ঐ সেনাপতি কোনো পাত্তাই দেয়নি। বলতে গেলে চরম অপমান করেছে। আপনাকে এখানে সেনার একটা বড়ো পদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকাল থেকে সে একবারও আপনার সাথে কোনো কথা বলেনি, কোনো সেনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আপনি কীভাবে এখানে কাজ করবেন? আমার মনে হয় আপনার নিজের যুদ্ধ প্রতিভার কথা এই ব্যাটাকে বলা উচিত ছিল। তাকে দুই একটা নমুনা দেখিয়ে দিলেই পারতেন। অস্ত্র হাতে আপনার দুই একটা কৌশল দেখলে ব্যাটার আর কথা বলার মুখ থাকতো না।'

রুদ্রদেব শুয়ে শুয়ে অসিতের ক্রোধ উপভোগ করছে, 'সূর্যের আলো যেমন মেঘ কোনোভাবেই বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারে না, তেমনি প্রতিভা খুব বেশি সময় চেপে থাকে না। সব সময় ধৈর্য ধরা উচিত আমাদের। এখনও তুমি পরম সত্য বুঝতে পারছ না। একসময় পারবে। তখন বুঝবে, নিয়তিকে বদলানোর চেষ্টা না করে, নিয়তিকে ব্যবহার করার কৌশল অর্জন করাই হচ্ছে সফল মানুষের লক্ষণ। নিজেকে কখনো জাহির করতে যাবে না। বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় জায়গায়। বুঝেছ?'

'না, বুঝিনি। এটা অপ্রয়োজনীয় জায়গা নয়। এখানে আপনার নিজের প্রতিভা দেখানো উচিত ছিল।'

'শোনো, এখানে আমরা এসেছি স্বয়ং মহারাজের আদেশে। বাহিনীতে যুক্ত হয়েছি। রিপুজিত একসময় কথাটা বুঝতে পারবে। তখন সে আর আমাদের অবজ্ঞা করতে পারবে না। রাজ রোষ অনেক ভয়ানক ব্যাপার। আর এই রিপুজিত আমাকে পাত্তা দিলো কি দিলো না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে তো আর আমাদের কোনোভাবেই এই সেনা থেকে বের করে দিতে পারবে না। তাহলেই হবে।'

'কী হবে?'

'শোনো, কখনো আসল রাস্তা ছেড়ে মানুষ পাশের রাস্তায় নামে না। নামলেও নামে সহজ পথে কিছুটা এগিয়ে আবার সেই রাস্তায় ওঠার জন্য। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শক রাজ্যে যাওয়া, সেখানে যেহেতু যুদ্ধ হবে, আমরাও যেতে পারবো। তোমার অঙ্গদের কাছে যাবার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। নিয়তির চক্র এখনো আমাদের পক্ষেই আছে। শুধু শুধু হাঙ্গামা করে এখন লাভ নেই, তুমিও শুয়ে পড়ো।'

'তার মানে কেউ যদি অপমান করে তবে মুখ বুজে সহ্য করব?'

'না, কখনোই না। তবে অজ্ঞানতাবশত কেউ যদি অপমান করে তবে কাটিয়ে দেওয়া যায়। ঝামেলা হয় কেউ যদি তোমার প্রতিভা জানা সত্ত্বেও তোমাকে ছোটো করার চেষ্টা করে। কথা সেটা না, আসল কথা হচ্ছে কয়েকদিন ধরে আমরা অন্যরকম এক চক্রে পড়ে গেছি। গুরু হিসেবে তোমার দিকে আমি পূর্ণ নজর দিতে পারছি না। তোমার যুদ্ধকলার এখন যে অবস্থা তাতে এখন তোমার অবশ্যই প্রতিদিন চর্চা করা উচিত। জেনে রেখো, হাতে কলমের বিদ্যায় যতক্ষণ সিদ্ধি লাভ না করবে ততদিন চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তার আগে একদিন চর্চা না করলে সাতদিনের আয়ত্ত হওয়া বিদ্যা হারিয়ে যায়।'

মুখে মুখে কথা বলা অসিতের স্বভাব নয়, তবু তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'আপনিও তো চর্চা করছেন না, আপনারও তো একদিনে সাতদিনের বিদ্যা হারিয়ে যাচ্ছে।'

হেসে বিছানা থেকে উঠে বসলো রুদ্রদেব, 'না, আমার হারাচ্ছে না। তুমি মনে হয় আমার কথাটা ভালো করে শোনোনি, এই কথা সত্য সিদ্ধি লাভ করার আগে। আমি এই জ্ঞান আত্মস্থ করেছি। সিদ্ধি লাভ করেছি। মৃত্যু পর্যন্ত এই শক্তি আমার সাথেই থাকবে।'

চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে অসিতের, 'আমার সিদ্ধি লাভ করতে আর কত বাকি?'

'অনেক বাকি। যেভাবে চলছে তাতে বিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করবে না-কি ভোলানাথের সিদ্ধি তোমার কপালে আছে তা বুঝতে পারছি না। এখন উঠে দাঁড়াও, আলস্য ত্যাগ করো। অস্ত্রশস্ত্রের বাঁধন খুলে সেগুলো অবমুক্ত করো। বাইরে চলো। আমিও একটু শরীরটা খেলিয়ে নেবো।'

অসিতের এখন কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সে রুদ্রদেবের আদেশ শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। সেই ভালো। অনেকদিন না নড়াচড়া করায় শরীরে কেমন যেন খিল ধরে গেছে। আর সে আগেও দেখেছে চর্চা করলে শরীর আর মনের অস্থিরতা বেশ কমে আসে। ওদের নিয়ে আসা অস্ত্রশস্ত্রের বাঁধন খুলে ফেললো সে।

তাঁবুর পেছন দিকে বেরিয়ে এলো ওরা। রুদ্রদেব তার তলোয়ার হাতে বসলো একটা গাছের গুঁড়ির ওপর। চারপাশে তাকালো।

জায়গাটা এখানে বেশ নিরিবিলি। অনেক দূরে কয়েকজন সৈন্যকে দেখা যাচ্ছে। তারা কসরত করছে। ওদের ওপর এখন কারো দৃষ্টি নেই। সেই ভালো। নিরিবিলি অনুশীলন সেরে নেওয়া যাবে। অসিতের দিকে তাকালো সে, 'দেখি, ধনুক হাতে নাও। এতদিনের অনভ্যাসে তোমার লক্ষ্যভেদের কী অবস্থা দেখি।'

অসিত তার ধনুক হাতে নিলো। তার আগেই নির্দিষ্ট দূরত্বে লতার তৈরি সেই পুতুলটা রেখে এসেছে। ধনুকে তীর জুড়ে লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়ে দিলো সে। না, লক্ষ্যভেদের অবস্থা ঠিক আছে। পুতুলের একেবারে বুকেই বিঁধেছে।

কিন্তু পুতুলটা স্থির থাকলো না। চিত হয়ে মাটিতে পড়লো।

মন্তব্য করলো রুদ্রদেব, 'নাহ অসিত, এখনও তোমার হাতের শক্তি খরচের ওপর তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আসেনি। বারবার চেষ্টা করতে থাকো। দুই আঙুলের সাথে মনের সম্পর্ক স্থাপন করো। মনকে বোঝাও, পুতুলের গায়ে তীর লাগবে ঠিক, কিন্তু পুতুল মাটিতে পড়বে না। চর্চার কোনো বিকল্প নেই।'

কোনো কথা না বলে আবার চর্চায় ব্রতী হলো অসিত। তার জন্য এটা একটা বাধা। এই বাধা তাকে পেরোতেই হবে। তাহলেই পরের ধাপে যেতে পারবে। মিলবে ধনুর্বিদ্যার পরের শিক্ষা।

রুদ্রদেব অসিতের চর্চা দেখতে লাগলো। আর সেই সাথে আনমনে তলোয়ারের চকচকে ধাতবের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলো হাতের চামড়ায়।

ওদিকে রিপুজিত সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সারাদিন সে ইচ্ছে করেই অসিত আর রুদ্রদেবকে অগ্রাহ্য করেছে। কিছুটা রাগ ছিল, কিছুটা ছিল ব্যস্ততা। সব মিলিয়ে ওদের দুজনের গুরুত্বের কথা তার মাথায় একেবারেই আসেনি। দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে তার একটু দেরি হয়ে গেছিল। বিশ্রাম তার তেমন পছন্দের কাজ না হলেও খাবারের পরে একটু করতে হলো। সেই অবসরেই আবার ঐ দুজনের কথা মনে পড়লো তার। ঐ লম্বা লোকটা না-কি অনেক বড়ো যোদ্ধা। সেই খচখচানি কিছুতেই বুক থেকে যাচ্ছে না। সামনে যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। এখন কিছুতেই সেনাপতির বুকের ভেতরে খচখচানি থাকা কোনো কাজের কথা নয়।

এই ভাবটা বুক থেকে যেভাবেই হোক দূর করতে হবে। আর সেটার একটাই উপায় আছে। নিজের হাতে পরখ করে দেখা। না, বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের দুজনকে একটু মেপে নেওয়া যাক।

মহারাজ সাতকর্ণী রিপুজিতকে বেশ ভালোভাবেই চেনেন। সেটা রিপুজিতের অজানা নয়। তারপরও এমন একটা বিশেষ বাহিনীতে তিনি এমন একটা উটকো ঝামেলা কেন পাঠালেন? আগন্তুককে এক নজরে যা দেখেছে তাতে তেমন বড়ো কোনো যোদ্ধা বলে তার মনে হয়নি। থাকার মধ্যে একটাই গুণ আছে, সাধারণ মানুষের চেয়ে সে একটু লম্বা, এছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব নেই।

বিচার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে রিপুজিত। দেখাই যাক না, ব্যাটা কেমন যোদ্ধা।

নিজের তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। শিবিরের ভেতরে তাকে কখনো ঘরোয়া পোশাকে দেখা যায় না। ঘরোয়া পোশাক ঘরেরই জন্য। এই মুহূর্তে শিরস্ত্রাণ ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধসাজই তার পরনে আছে। বাইরে থাকা সৈন্যরা তাকে দেখে মাথা নোয়াল। সেও মাথাটা একটু নাড়িয়ে জবাব দিলো।

রুদ্রদেবের তাঁবুটা এখান থেকে খুব একটা কাছে না। মোটামুটি অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। সেদিকে হাঁটতে লাগলো সে। জোর কদমে দূরত্বটুকু পার করতে অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় সময় কমই লাগলো।

রুদ্রদেবের তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে নিজেকে একটু আড়াল করে নিলো সে। ব্যাটারা নিশ্চয়ই তাঁবুর ভেতরে এখন ঘুমাচ্ছে। বড়ো যোদ্ধারই লক্ষণ। সাবধানে তাঁবুর ভেতরে মাথা গলালো সে।

না, ভেতরে কেউ নেই। কোথায় গেল? তাঁবুর পেছন দিক থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে হয় ওদিকেই আছে।

একটু গোপনে তাঁবুর পাশ দিয়ে এগিয়ে পেছনের দিকে নজর দিলো সে। যে দৃশ্য দেখল তাতে চমৎকৃত হবার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না। নাক আপনাতেই ছিটকে এলো। লম্বা লোকটা গাছের গুঁড়িতে অলস বসে আছে। কাউকে অলস বসে থাকতে দেখলেই মেজাজ গরম হয়ে যায় তার। সামনে অবশ্য পুঁচকে ছেলেটা ধনুর্বিদ্যার চর্চা করছে।

অলস রুদ্রদেবের দিক থেকে নজর সরিয়ে এবার চর্চারত ছেলেটার দিকে তাকালো সে। ছেলেটা বেশ ঋজু ভঙ্গিতে ধনুক তুলেছে। সামনের একটা পুতুলে লক্ষ্য স্থির করেছে সে। নিখুঁত নিশানা। মনের ভেতর থেকে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও প্রশংসা অনুভূতি বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

ওদিকে লম্বা লোকটার ভঙ্গি দেখে গা জ্বলে গেল রিপুজিতের। সে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে কী যেন বলল। খালি বসে বসে মাতবরি করা। ছেলেটা পুতুল সোজা করে আবার তীর ছোঁড়া শুরু করলো।

না, এবার সামনে আসা উচিত। রিপুজিত আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওদের সামনে। তাকে আসতে দেখে একটুও অবাক হলো না রুদ্রদেব। সে জানতো রিপুজিত অবশ্যই আসবে। এই স্তরের কৌতূহলের টান তার মতো মাথা গরম লোক কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো সে। অসিতও রিপুজিতকে দেখে হাতের ধনুক নামিয়ে গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে।

'আপনাকে মহারাজ এখানে সেনা উপদেষ্টা করে পাঠিয়েছেন। আপনার আজকের কাজকর্ম দেখে যদিও আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি সেনা উপদেষ্টার কাজ কী তা একদমই বোঝেন না। কিন্তু মহারাজ আপনাকে তো একটা বেতন দেবেন তাই না? তাই আপনার কি উচিত না, সেই বেতনের বদলে একটু কাজ করা।' প্রথমেই শব্দশর ছুটে গেল রুদ্রদেবের দিকে।

মনে মনে ভাবছে রুদ্রদেব, কই বেতনের কথা তো কিছুই বলেননি মহারাজ। কিন্তু বেগার নিশ্চয়ই খাটতে হবে না। মুখে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। সেনা উপদেষ্টা পদের কথা আগে কখনো শুনিনি। যে পদের কথাই শুনিনি সে পদের কাজ কী সেটা আর কীভাবে জানবো? কোনো ধারণাই নেই আমার। নেহাত মহারাজ বললেন, তাই আর না করতে পারিনি।'

এহ, বিনয়ের অবতার! রুদ্রদেবকে সেনা উপদেষ্টার কাজ সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে শুরু করলো রিপুজিত, 'সেনা উপদেষ্টার প্রধান কাজ হচ্ছে সেনার শক্তি আর দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা। তাহলেই সে যুদ্ধের মধ্যে সঠিক সময়ে সেনাপতিকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে। এটাই হচ্ছে আপনার কাজ। তা, সেনার শক্তি আর দুর্বলতা জানার উপায়গুলো আশা করি আপনার জানা আছে। সেটা জানা থাকার জন্য অবশ্য যুদ্ধের কলা কৌশলের ওপর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হয়।'

শেষের দিকে পূর্ণ শ্লেষ ছিল রিপুজিতের স্বরে। রুদ্রদেব নিজের স্বর এখনও বিনীত রেখেছে, 'তা যুদ্ধের কলা কৌশল একটু আধটু জানা আছে।'

'তাই না-কি। তাহলে চলুন দুজনে। এখনই আমি সেনার মহড়া করাচ্ছি। তারপর সেনারা হালকা চালে একটু কসরত করবে। সেখানে গেলেই আপনি আমার সেনাদের শক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, আর আপনিও আমার শক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।' অস্ফুটে কথাটা বলল রুদ্রদেব, স্পষ্ট করে বলল, 'চলুন।'

যাবার আগে ওদের অস্ত্রগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি বোলাল রিপুজিত। তাতে তার সিটকানো নাকের অবস্থা তেমন একটা উন্নত হলো তা বলা যাবে না।

অসিত আর রুদ্রদেব রিপুজিতের সাথে এসে দাঁড়ালো মহড়ার জায়গায়। সেখানে অসি খেলা চলছে। সৈন্যরা সবাই অসির অপূর্ব ব্যবহারে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার কৌশল চর্চা করছে। সমন্বিত সেসব নড়াচড়া। একই ছন্দে সবাই নড়াচড়া করছে। সেনারা যখন একটা দল হিসেবে কাজ করে তখন এই ছন্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে দৃশ্য হিসেবে খুবই অপূর্ব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অসিধারীদের মহড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলো রিপুজিত। মহড়া শেষ হতেই জিভ চালালো সে, উদ্দেশ্য অবশ্যই সেনাদের সামনে রুদ্রদেবের সম্মান এক ধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে দেওয়া, প্রশ্নটা এলো বেশ জোরালো স্বরে, 'এমন অসির প্রদর্শন আগে কখনো দেখেছেন? এরা খুবই যত্নের সাথে শিক্ষিত। এই রাজ্যের সেরা অসি চালনার শিক্ষা এদের দেওয়া হয়েছে। বলতে গেলে এই দলটাই এখন সাতবাহন রাজ্যের সেরা অসিধারী। কেমন লেগেছে এদের মহড়া?'

এবার আর চুপ থাকলে চলবে না, বেশ বুঝতে পারলো রুদ্রদেব। শান্ত কিন্তু স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলো সে, 'না, মহড়া ভালোই হয়েছে। তেমন একটা খারাপ হয়নি। তবে এরা যদি সাতবাহনের সর্বসেরা অসিধারীর দল হয় তবে কিন্তু বেশ চিন্তার কথা।'

কথাটা রিপুজিতের মগজে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিলো। তার স্বভাবগত ক্রোধ ফিরে আসতে এক মুহূর্তও সময় লাগলো না, 'কী বললেন! তেমন খারাপ না। এই কথার মানে কী? এটা তো সরাসরি আমার সেনাদলের অপমান।'

'আমি সত্যিই বলেছি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ভূ-ভারতে এরচেয়েও ভালো অসি কৌশলের চর্চা হয়। তাই তো?' এবার রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো রিপুজিত।

'হ্যাঁ, ভূ-ভারতে তো অবশ্যই আছে।'

'বেশ। তাহলে সেই শ্রেয়তর কৌশল নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। আপনি তাহলে এখন সেই কৌশল আমাদের সামনে প্রদর্শন করুন। আমি চাই, আমার সেনাদলের প্রত্যেক সেনার মনে তাদের উপদেষ্টার জন্য শ্রদ্ধা থাকুক। কী বলো সবাই?'

উপস্থিত যোদ্ধারা সায় জানালো রিপুজিতের কথায়। তারা বুঝতে পারছে এখানে এখন একটা মজা জমে উঠবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সেই রগড় দেখতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো সেনারা।

'অবশ্যই। আপনার সাথে আমি একমত সেনাপতি। আমরা এখানে অবশ্যই অসি বিদ্যার একটা প্রদর্শনী দেখতে পারি।'

'কীভাবে তা হবে সেটাও আপনিই বলে দিন।' রিপুজিত রুদ্রদেবের হাতে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলো।

'এখানে তলোয়ারের কৌশলে সবচেয়ে সিদ্ধ যোদ্ধার সাথে আমার শিষ্য অসিত লড়বে। তবে আমি বলে দিচ্ছি, লড়াইটা অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। শুধুই একটা প্রদর্শনী। এখানে আমরা শুধু অসিবিদ্যার কিছু কলা কৌশলই দেখবো, কোনো রক্তের দেখা পাবো না।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রিপুজিত। এই লোক বলে কী। এই সকল সেনাদের মধ্যে সেরা সেনার সাথে লড়াই করবে এই বালক। বিস্ময় নিয়ে সে তাকাল রুদ্রদেবের মুখের দিকে। না, সেখানে উপহাসের কোনো চিহ্ন নেই।

এবার মনে মনে একটু হলেও ঘাবড়ে গেল রিপুজিত। এত আত্মবিশ্বাস তো কারো মনে এমনি এমনি আসে না। ঠিক আছে। আত্মবিশ্বাসের বারোটা বাজাচ্ছি। নিজের সেনাদলের ওপর চোখ বুলিয়ে সবেচেয়ে ভালো যোদ্ধাদের থেকে একজনকে বেছে নিলো সে। আঙুল তুলল, 'ঠিক আছে। এই, তুমি এগিয়ে এসো।'

শুধু রিপুজিতই হতভম্ব হয়নি, আরেকজনও রুদ্রদেবের কর্মকাণ্ডে থ খেয়ে গেছে। রুদ্রদেব তাকাল অসিতের দিকে, 'তোমার এই হতভম্ব ভাবটা কাটাও।'

অসিতের দৃষ্টিতে ভয়ের ছাপও আছে।

'শোনো অসিত, আমি না বুঝে আমার শিষ্যকে বিপদ আর লজ্জার দিকে ঠেলে দেইনি। এতক্ষণ ওরা যখন মহড়া দিচ্ছিল আমি ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেছি, ভালোই বুঝতে পেরেছি ওদের ক্ষমতা। বুঝেশুনেই এই রাস্তা বেছে নিয়েছি। তুমি এই পর্যন্ত যে বিদ্যা শিখেছ তাতে সহজেই এদের একজন যোদ্ধাকে হারিয়ে দিতে পারবে। আর যদি তুমি হেরে যাও, তাহলে জেনে রেখো, সেজন্য তোমার যুদ্ধ কৌশল অথবা দক্ষতার দোষ হবে না, হবে একমাত্র তোমার এই হতভম্ব ভাব। কোনো কথা ভেবো না অসিত, শুধু যুদ্ধ করো।'

নিজেকে একটু হলেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ মনে হচ্ছে রুদ্রদেবের। অসিত যেন অর্জুন। যদিও সেই সময় অনেক গম্ভীর ছিল। আরেকটা উপদেশ দেওয়ার ছিল অসিতকে, এবার সেটাও দিয়ে দিলো, 'আরেকটা কথা, তুমি এই যুদ্ধে কিন্তু কিছুতেই শিবের সেই বারো ভঙ্গির একটাও ব্যবহার করবে না। এটা মেনে চলবে।'

'কেন?' অসিত প্রশ্ন না করে পারে না। শিবের বারো ভঙ্গি সে অনেক চর্চা করেছে। যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারলে মন্দ হতো না।

'আমি চাই না, এই যুদ্ধে তোমার প্রতিপক্ষ মারা পড়ুক। শিবের সেই ভঙ্গিগুলোতে অনেক শক্তি। সাধারণ কোনো সৈনিকের পক্ষে সেই আঘাতের তেজ সহ্য করা সম্ভব হবে না।'

এতক্ষণ রঙ্গভূমির ওপরে অনেক যোদ্ধা একসাথে চর্চা করছিল। এবার তারা রঙ্গভূমি ছেড়ে পাশে সারি দিয়ে দাঁড়ালো। সবার দৃষ্টি সামনের জায়গার ওপর নিবদ্ধ।

পাশেই এক জায়গায় সারি সারি অস্ত্র রাখা আছে। প্রতিপক্ষ আগে থেকেই রঙ্গভূমিতে অস্ত্রসহ দাঁড়িয়ে পড়েছে। অসিত সেখান থেকে একটা তলোয়ার তুলে নিলো। তারপর এগিয়ে গেল রঙ্গভূমির দিকে।

ফোঁড়ন কাটলো রিপুজিত, 'আমাদের এই বালক বীর কি বর্ম টর্ম পরবে না না-কি? মনে হয় না, এমনিতেই মরবে।'

স্মিত হাসি রুদ্রদেবের মুখে, 'না অসিত, সেসবের এখনও কাজে লাগার সময় আসেনি। এগিয়ে যাও।'

অসিত এবার দাঁড়ালো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। এই প্রথম সত্যিকারের যুদ্ধ। এতদিন যতই চর্চা করুক না কেন, এমন সময়ে সব সৈনিকের বুকেই একটু খচখচানির ভাব হয়। জোরে একটা দম নিলো সে।

প্রশিক্ষণ ভালোই কাজে দিয়েছে। একটু পরেই তার মনোযোগ ফিরে এলো। সামনের এই সৈনিক ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

অসিতের সামনের সৈনিকের চোখেমুখে অবজ্ঞার ছায়া। সবাই তার নামে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে নানা বাক্য। কিছু ব্যঙ্গ, কিছু প্রশংসা।

অসিতের প্রতিপক্ষই প্রথম আঘাত করলো। মাথা নিচু করে হালকা লাফে এক পাশে সরে গিয়ে সেই আঘাত এড়িয়ে গেল অসিত। প্রতিপক্ষকে সময় দিতে নারাজ সে। তলোয়ার দিয়ে একটা হালকা আঘাত করলো প্রতিপক্ষের বাম দিকে। তলোয়ার দিয়ে সেই আঘাত ঠেকাল সামনের সৈনিক। পরের পলেই আবার ডানদিকে আঘাত করলো অসিত। এবারও ফিরিয়ে দিলো সামনের সৈনিক। কিন্তু দ্বিতীয় বারে একটু দুর্বল ভাবে।

অসিত বুঝতে পারলো, ডানদিকের প্রতিরক্ষায় প্রতিপক্ষ একটু দুর্বল। এরপরের কাজ তেমন একটা কঠিন হবে না।

এবার আর আঘাত করলো না সে। সামনে একটু ঝুঁকে অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটা নড়াচড়ার ওপর তীক্ষ্ণ নজর তার।

ততক্ষণে প্রতিপক্ষ কাজ শেষ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই বালকের সাথে আর সময় দিলে মান সম্মানের ক্ষতি হয়ে যাবে। পরের কয়েকটা আঘাতে প্রতিপক্ষ তার সর্বস্ব ঢেলে দিলো। তার মধ্যে অর্ধচন্দ্র অসি ভঙ্গিও ব্যবহার করলো সে। কিন্তু ততক্ষণে অসিত তার শক্তি, গতি, প্রকৃতি সব বুঝে নিয়েছে। প্রতিপক্ষের সব আঘাত সে ফিরিয়ে দিচ্ছে বেশ সহজেই।

রুদ্রদেব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছে শিষ্যের কলা। এবার বলে উঠলো সে, 'যথেষ্ট হয়েছে অসিত। এবার যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে।'

এবার আক্রমণে গেল অসিত। ওর গতি দেখে আশেপাশের সব চিৎকার থেমে গেছে। সামনের যোদ্ধার কথা তো না বললেও চলে।

প্রথমেই সর্প ভঙ্গিতে শরীর তীব্র বেগে এগিয়ে নিলো সে। একই সাথে চালাচ্ছে তলোয়ার। সামনের যোদ্ধা এই ভঙ্গি কখনো দেখেনি। কোনোমতে লাফিয়ে সরে গেল। তবে অসিতের পরের আঘাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় তার সামনে ছিল না।

অসিত পরের আঘাতে চক্র চালনা করলো। না, সুদর্শন নয়, এই চক্র শরীরের ভঙ্গি। লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল সে, শরীর চক্রের মতো ঘুরে উঠলো, সেই সাথে তলোয়ারও। তার মধ্যেই শূন্যে থেকে আঘাত করলো সে।

সামনের সৈনিক এবারেই ভুলটা করে ফেললো। তলোয়ার দিয়ে অসিতের তলোয়ারের আঘাত ফেরাতে সচেষ্ট হলো। সে তো আর জানে না, চক্র গতির আঘাতে অনেক শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই শক্তি সামলানোর মতো শক্তি তার হাতে ছিল না।

অসিত শূন্য থেকে মাটিতে অবতরণ করেছে। চক্রের শক্তির প্রভাবে প্রতিপক্ষের তলোয়ার আর প্রতিপক্ষ নিজেও ভূপাতিত হয়েছে। অসিত খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিপক্ষের পাশে। তেমন কিছু না, এখন কেবল অসিতের হাতের তলোয়ারের অগ্রভাগ প্রতিপক্ষের গলা আলতো করে ছুঁয়ে আছে। তার মুখে বিজয়ের কোনো গর্ব নেই, একেবারে ভাবলেশহীন।

রিপুজিতের সম্পূর্ণ উল্টো ভাব। নিজের সেনার এত বড়ো অপমান সে কীভাবে মেনে নেবে। এখানে তো আসলে তার নিজেরও অপমান হয়েছে। আর নিজের মানের ভার অন্যের হাতে দিলে এমনই হয়। এবার নিজের মান উদ্ধারে নিজেই মাঠে নেমে পড়লো সে। নেমেই রণ হুংকার দিয়েছে, 'ওকে ছাড়ো। আমার সাথে লড়ো।'

অসিতের মাথায় তখন যুদ্ধ চেপে বসেছে। মাটিতে পড়ে থাকা সেনার গলা থেকে তলোয়ার তুলে এগিয়ে গেল সে। প্রথমেই ডান দিকের আর বাম দিকের সেই পুরানো কৌশল প্রয়োগ করলো সে।

দুটো আঘাতই একান্ত হেলায় ফিরিয়ে দিলো রিপুজিত, 'এসব কৌশলে আমার সাথে পারবে না। আমাকে অত দুর্বল ভেবো না। আমি সব্যসাচী। ডানে বামে আমি সমান।'

অসিত এবার একটু ভড়কে গেল। দুর্বলতা কোন দিকে সেটা না বুঝতে পারলে যুদ্ধ করা একটু কঠিন। ওদিকে একের পর এক আঘাত করে চলেছে রিপুজিত।

অসিত এবার হিমশিম খেতে লাগলো। রিপুজিতের আঘাত তার শরীর যেন একেবারে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আঘাত কোনোমতে সামলাতে পারলেও রিপুজিতের শক্তির সামনে কোনোমতেই ভারসাম্য রাখতে পারছে না। আরেকটা জোরালো আঘাত আসতেই অসিত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো সে।

রিপুজিত ততক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠেছে। রক্ত খুঁজছে তার তলোয়ার। সে ভুলে গেল এটা শুধুই একটা প্রদর্শনী। তার তলোয়ার নেমে আসতে লাগলো অসিতের গর্দান লক্ষ্য করে। উপস্থিত সব সৈন্যের দম যেন বন্ধ হয়ে এসেছে। যাই হোক, এই বালকের মৃত্যু হোক এটা কেউই চায় না।

কিন্তু ঠিক তারপরেই উপস্থিত সৈন্যরা যা দেখল তা তারা কখনো দেখেনি, কখনো দেখবে বলে কল্পনাও করেনি। এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা, অলস লোকটার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

দুই পা এগিয়ে গিয়েই লাফ দিলো রুদ্রদেব। দ্রুত পেরিয়ে এলো অবিশ্বাস্য পরিমাণ দূরত্ব। লাফিয়ে থাকা অবস্থাতেই তার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে।

ওদিকে অসিতের গলায় তলোয়ার চালিয়ে দিয়েছে রিপুজিত। তলোয়ার অসিতের গলা স্পর্শ করার ঠিক আগের ক্ষণে রুদ্রদেবের ভাজ করা হাঁটু আঘাত করলো রিপুজিতের পিঠে। ছিটকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়লো রিপুজিত। অসিত বেঁচে গেল।

ওদিকে ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রিপুজিত। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের দিকে।

রুদ্রদেব অসিতকে ধরে তুলল। তারপর তাকাল রিপুজিতের দিকে, 'আরেকটু হলেই চক্রব্যূহের কলঙ্ক আপনার হাতেও লেগে যেত। আপনাকে বাঁচিয়ে দিলাম। এমন ক্রোধে অন্ধ হলে উলটোপালটা কাজ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।'

'ভালো করেছেন। আমি কলঙ্ক অর্জন করতে চাই না। গৌরব চাই। যুদ্ধ করুন আমার সাথে। অস্ত্র তুলুন।' রিপুজিতের গর্জন শুনতে পেলো প্রতিটা সেনা।

'বিশ্বাস করুন, আপনাকে হারানোর জন্য আমার কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, যুদ্ধ হোক। এগিয়ে আসুন।'

ততক্ষণে অসিত বেরিয়ে গেছে রঙ্গভূমি থেকে।

মোক্ষম ভঙ্গিতে আঘাত করলো রিপুজিত। সামনের যোদ্ধার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। সে কীভাবে আটকাবে তাকে?

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সরে এলো রুদ্রদেব, সেই সাথে রিপুজিতের তলোয়ার ধরা হাতের কবজির গোঁড়ায় আলতো করে আঘাত করলো আঙুল দিয়ে।

রিপুজিত অবাক হয়ে দেখল তার তলোয়ার ধরে থাকা হাতের আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। সেই সাথে তলোয়ার খসে পড়েছে হাত থেকে। সেই তলোয়ার মাটিতে পড়ার আগেই রিপুজিতের পাজরের ঠিক নিচে মাপা আঘাত করলো রুদ্রদেব। সেই আঘাত তার বুক থেকে বের করে দিলো সব বাতাস। রিপুজিত এবার খাবি খেতে লাগলো। বহুক্ষণ লাগলো তার স্থির হতে।

সৈন্যরা সবাই উল্লাস ধ্বনি করে উঠলো। ভুলে গেল তাদের সেনাপতি পরাজিত হয়েছে। এমন যুদ্ধকলা কেউ কখনো দেখেনি।

রিপুজিত উঠে এসে দাঁড়ালো রুদ্রদেবের সামনে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। মহারাজ ঠিক লোককেই পাঠিয়েছেন। আজ থেকে আপনিই এই সেনার সেনাপতি। সেনা উপদেষ্টা বলে কোনো পদের দরকার নেই। আমিও এখন থেকে আপনার অধীনের একজন সাধারণ সৈনিক। এমন যুদ্ধকলা আমি কখনো দেখা তো দূরে থাক, শুনিইনি। আমার চোখ থেকে গর্ব আর অহংকারের পর্দা সরে গেছে।'

রুদ্রদেব হাসলো, 'আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আপন করে নেওয়ার জন্য। এখন থেকে এই বাহিনীর দুজন সেনাপতি। আমরা দুজনে মিলে এই বাহিনী পরিচালনা করবো। চলুন, এবার সত্যিকারের মহড়া শুরু করা যাক।'

প্রতিষ্ঠানায় এখন সাজ সাজ রব। প্রজারা কিছুই জানে না, তবে বুঝতে পারছে একটা মহাযজ্ঞের আয়োজন চলছে। সেনার সংখ্যা নগরে অনেক বেড়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা রাজার জিনিস জোগান দিতে দিতে অস্থির হয়ে উঠেছে। সাধারণ লোকে প্রয়োজনীয় জিনিস পাচ্ছে অনেক কষ্টের পরে। অসুবিধা তাদের কম হচ্ছে না, তবে রাজার বিরুদ্ধে তো আর কিছু বলা যায় না।

রাজপ্রাসাদে গিরিধারী বসে আছেন মহারাজ সাতকর্ণীর সামনে। সাতকর্ণী তার সিদ্ধান্তে অবিচল, 'সাতদিন পার হয়ে গেছে গিরিধারী। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি আপনাকে ঠিক সাতদিন সময় দিয়েছিলাম। সাতদিনের বেশি আর একদিনও আমি এখানে থাকবো না।'

সাতকর্ণীর কণ্ঠের উত্তেজনা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। গিরিধারী তাড়াতাড়ি বললেন, 'মহারাজ, আপনার আদেশ অনুযায়ী কাজ চলছে। আমি নিজে এক সপ্তাহ ধরে সবগুলো সেনা শিবিরে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। কিছু কিছু শিবিরে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। সকল সেনাপতি আপনার আদেশ পেয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিয়েছে। তাদের সবার শিবির এখন স্থাপিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানা ঘিরে। কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষা। আদেশ করলেই আমরা এক যোগে যাত্রা করবো অমরাবতীর দিকে।'

'আদেশের আবার কিছু বাকি আছে না-কি। আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে। যুদ্ধ নিশান উড়িয়ে দাও। রণ শঙ্খ বাজাও। কাল সকালে সূর্য নমস্কার করেই আমি বেরিয়ে পড়বো।'

'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

গিরিধারী আর অপেক্ষা করলেন না। হাতে এখন অনেক কাজ। কাল সকালে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে রওনা দিতে হবে। হাতে থাকা সময়ের তুলনায় কাজের বোঝা অনেক বেশি।

রণ শঙ্খ বেজে উঠলো। প্রজারা এবার বুঝতে পারলো মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা করবেন। এবং কালই।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সরোবরে স্নান করে নিলেন মহারাজ সাতকর্ণী। তারপর সূর্যের প্রথম শিখাকে প্রণাম করলেন। সূর্য তেজ যেন ছড়িয়ে পড়েছে তার মনে। প্রতিবার যুদ্ধ যাত্রার সময়ই তার এমন মনে হয়।

মহিষীদের কাছ থেকে কাল রাতেই তিনি বিদায় নিয়ে নিয়েছেন। এখন কেবল কিছু মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা। অভিষেক করা হলো মহারাজের। তারপর সব সাজ পরে নিয়ে নিজের প্রিয় ঘোড়ার ওপরে অধিষ্ঠান হয়ে তিনি যখন প্রাসাদের প্রধান দরজার সামনে দাঁড়ালেন তখন সামনে প্রজারা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে একই সাথে

মহারাজের জয়ধ্বনি উঠলো। মহারাজ তাদের দিকে তাকিয়ে সেই ধ্বনির উত্তর দিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া।

গিরিধারীর চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে। সেনাদের অবশ্য তেমন কোনো সমস্যা নেই। কাল রাতে প্রস্তুতি নিতে নিতে কেউই ঘুমাবার অবকাশ পায়নি। তবে কাজ শেষ হয়েছে। সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী এখন সুসজ্জিত হয়ে প্রতিষ্ঠানার সামনের প্রান্তরে মহারাজের অপেক্ষা করছে।

প্রভাত সূর্য উঠেছে বেশিক্ষণ হয়নি। সেই আলোর আভায় ঠিক পূর্ণ সূর্যের তেজ নিয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বীর কেশরী মহারাজ সাতকর্ণী প্রতিষ্ঠানার প্রধান ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সামনের সেনার কাছে চলে এলেন ধীরে ঘোড়া ছুটিয়ে।

সেনাবাহিনী বিশেষ জ্যামিতিক ভঙ্গিমায় সজ্জিত আছে। প্রত্যেক সেনাপতি মহারাজের আগমনে নিজের সেনার দিকে নজর দিলেন। তাদের বিশেষ বিশেষ ইশারা অনুযায়ী প্রত্যেক সেনা নিজ নিজ অস্ত্র আর বাহন অনুযায়ী মহারাজের প্রতি সম্মান আর স্তুতি বাক্য প্রদর্শন করলো।

মহারাজ সাতকর্ণী বেশ সন্তুষ্ট হলেন। সেনাবাহিনীর সজ্জা একেবারে তার মনের মতো হয়েছে। তিনি একবার ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাবাহিনীর সামনে এপাশ থেকে অপাশ ঘুরে এলেন। পুরো বাহিনীর ওপর ঘুরলো তার দৃষ্টি। রুদ্রদেব বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে প্রথম সারিতেই জায়গা পেয়েছে। রুদ্রদেবের একমাত্র শিষ্য হিসেবে অসিতের সামনের সারিতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। মহারাজের সামনে মাথা নত করে রইল সবাই।

সামনের সারিতে থাকার সৌভাগ্য রুদ্রদেবের হলেও একটা জায়গায় একটু অসুবিধা হয়ে গেছে। শেষ সময়ে তার গাঁয়ের মাপে বর্ম পাওয়া যায়নি। কারিগরও নেই। শেষ পর্যন্ত একটা বর্ম পরেছে সে, একটু খাটো হয়েছে। অসিতের অবশ্য তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। তার মাপের সব সাজসজ্জা পাওয়া গেছে। বেশ মানিয়েছে তাকে যুদ্ধ সাজে।

দ্বিতীয়বারের মতো সেনাবাহিনীর সামনে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাবার সময় রুদ্রদেবের ওপর নজর পড়লো মহারাজ সাতকর্ণীর। ঘোড়াটা রুদ্রদেবের সামনে এনে থামালেন তিনি। হাসলেন, 'তোমাকে তো একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। এই সাজে একেবারে অন্য রকম লাগছে।'

মাথাটা মৃদু নোয়াল রুদ্রদেব, 'আপনাকেও কিন্তু চেনা যাচ্ছে না মহারাজ। প্রথম দেখার রূপ আর এই রূপে অনেক পার্থক্য।'

'কোনটা বেশি ভালো।'

'সন্ন্যাসী বেশ অবশ্যই ভালো, তবে সেটা আধ্যাত্মিক স্তরে। রাজার হিসেব আলাদা। কেশরীর যেমন কেশর না থাকলে তাকে বেড়ালের মতো লাগে তেমনি দীন বেশে আপনি বেমানান। আপনাকে আসলে এখানেই মানায় মহারাজ। সব সেনার সামনে, সবচেয়ে উঁচু শুভ্র ঘোড়ার পিঠে।'

মৃদু হেসে ঘোড়া আগে বাড়ালেন মহারাজ সাতকর্ণী। এবার এসে দাঁড়ালেন সেনাবাহিনীর সামনে একেবারে মাঝ বরাবর।

এত বড়ো সেনার সামনে বক্তৃতা দিয়ে তেমন একটা লাভ হয় না। তবু মহারাজ হিসেবে সৈন্যদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কিছু একটা বলতেই হয়। মহারাজ সাতকর্ণী একেবারে সোজা হয়ে বসেছেন ঘোড়ার পিঠে। কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার হাতে চলে এসেছে তার।

তলোয়ারটাকে উঁচুতে তুলে ধরে বেশ জোরালো স্বরে উদীপ্ত করা কিছু বাক্য বললেন মহারাজ। তার সেই দৃঢ় স্বরের আওয়াজ অল্প কিছু সৈন্যের কানে পৌছালো, কিন্তু সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা সবাই দেখতে পেয়েছে। মহারাজের কথা শেষ হতেই সামনের সেনাদের সাথে সাথে সবাই বেশ জোরে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

সেই আওয়াজ শুনতে পেলো প্রতিষ্ঠানার প্রতিটি প্রাণী। সেই আওয়াজের সাথে সাথেই যেন এই ভিড়ের মধ্যে জোয়ার এলো। পদাতিকের পা, ঘোড়ার খুর, রথের চাকা আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করলো। প্রান্তরের মাটিতে মৃদু কাঁপুনি উঠলো। সেনার সামনে চলতে চলতে বেশ গর্ব অনুভব করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। এত বড়ো সেনা নিয়ে কখনো তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেননি আগে। মনে হচ্ছে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আর সম্রাট অশোকের পর এত বড়ো সেনা নিয়ে কখনো কেউ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেননি। আস্তে আস্তে গতি বাড়তে লাগলো সেনার।

প্রথম পদক্ষেপ সবসময় কঠিন নয়। প্রথম পদক্ষেপে মানুষকে বদলাতে হয় অনেক কিছু, ভাঙতে হয় অনেক অভ্যাস। সৈন্যদের যাত্রা সবসময় দীর্ঘই হয়। আর এই যাত্রার শুরুর দুই তিন দিনে ক্লান্তি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চায় সেনাদের। সেনাপতিরাও তখন ক্রমাগত সৈনিকদের উৎসাহ দিত থাকেন যাতে কিছুতেই সেই ক্লান্তি সৈন্যদের মনোবল কমিয়ে দিতে না পারে।

জগতের সকল ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়ার একটাই উপায় আছে, ক্লান্তিকে কিছুতেই পাত্তা দেওয়া চলবে না। প্রথম দুই দিন একটু গায়ে লাগবে। তারপর আর কোনো সমস্যা হবে না।

প্রথম দিন শেষে কম বেশি সবার মধ্যেই ক্লান্তির আভাস পাওয়া গেল। কেবল দুজন বাদে। মহারাজ সাতকর্ণী আর রুদ্রদেব। মহারাজ সাতকর্ণী এখনও তার ঘোড়ার পিঠে ঠায় বসে আছেন। সকালের তেজ একটুও ম্লান হয়নি। ওদিকে রুদ্রদেব নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজের সেনা তদারক করছে। তার সাথে আছে রিপুজিত। এখনও সবার সাথে পরিচয় হয়নি রুদ্রদেবের। সেখানেই সাহায্য করছে রিপুজিত।

আগে থেকেই জায়গা ঠিক করে রাখা ছিল। প্রথম দিনের শেষে এই জায়গাতে শিবির ফেলার কথা রাত্রি যাপনের জন্য। তবে সেনা ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়েছে। সূর্যাস্তের দুই মুহূর্ত আগেই পৌছে গেছে সেনা। এই প্রান্তরে সবাইকে থামতে বলা হলো।

সেনারা তাদের কর্তব্য জানে। অস্থায়ী শিবির স্থাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এই শিবির স্থাপনে তেমন একটা ঝামেলা নেই। কেবল রান্নার আয়োজন করতে হবে। আর পিঠ ফেলার জায়গা। নিরাপত্তার জন্য কিছু মশাল জ্বালিয়ে চারিদিকে নজর রাখতে হবে। মশাল আর চুলা প্রস্তুত হতেই আগুন জ্বলে উঠলো।

তাবু যে একেবারেই খাটানো হলো না তা নয়। মহারাজ, সেনাপতি আর অভিজাতদের জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটু পরেই খাবারের গন্ধে সবার ক্লান্তি মাখা দেহে খিদে একেবারে চনমন করে উঠলো।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে এই সেনাদল নিজের মনের মতো বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এলোমেলো সেই ভাব। তবে ব্যাপারটা তা নয়। সেনাদল শুধু যুদ্ধের সময়ই ব্যূহের ব্যবহার করে না। সব সময় করে। সাধারণে বুঝবে না, এখানে এই বিশাল সেনাবাহিনী বিশ্রামও নিচ্ছে একটা বিশেষ ব্যূহ গঠন করে।

মহারাজ সাতকর্ণী সেনাপতিদের নক্ষত্র ব্যূহ স্থাপন করতে আদেশ করেছিলেন। সেনাপতিরাও সেই অনুযায়ীই সেনা সাজিয়েছেন। জায়গা মতো পাহারায় আছে সেনারা। বড়ো সেনাবাহিনীর বিশ্রামের জন্য বিশেষ করে রাতের বেলা এই ব্যূহই শাস্ত্র সম্মত। বিশ্রামরত আর যথাযোগ্য উপভোগরত সৈন্যদের মাঝে মাঝে ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে কিছু সেনা আছে সশস্ত্র অবস্থায়, সতর্ক অবস্থানে। চারিদিকে নজর রেখে চলেছে তারা। তাদের দুপাশে জ্বলছে মশাল। ঠিক যেন রাতের কালো আকাশে নক্ষত্রগুলো জ্বলে আছে নির্দিষ্ট দূরত্বে।

গিরিধারীর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তবে এখন তিনি তাঁবুর ভেতরে নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশ দেখছেন। গত কিছুদিন ধরেই ক্রমাগত ভ্রমন করছেন তিনি। প্রথমে যেতে হয়েছিল অমরাবতীতে, তারপর নানা সেনা শিবিরে। তবে একলা ভ্রমন করা আর সেনার সাথে পথ চলা এক কথা না। খাবার আর বিশ্রাম দুটোই চাইছে এখন তার দেহ।

তবে সেসবকে পাত্তা না দিয়ে তিনি আপাতত সেনাদের মাঝ দিয়ে হাঁটছেন। হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়ে গেল রুদ্রদেবের সাথে। রুদ্রদেব তাকে দেখেই সম্ভাষণ জানালো,

'শুভ সন্ধ্যা মহামন্ত্রী।'

মাথাটা একটু নাড়লেন গিরিধারী, 'কী খবর তোমার সেনার।'

'ভালোই চলছে। আপনি কিন্তু একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলে পারতেন। কাল আবার ক্লান্তিকর পথচলা। এসব পথে শক্তির দরকার হয়।'

'শরীর ক্লান্ত হয়েছে তা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। তবে আমার মন অনেকদিন পরে ভার মুক্ত হয়েছে। মনে কোনো ক্লান্তি নেই।'

'আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে মানে? কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

'আমার এখন অবসর আর অবসর। আর কোনো নতুন ভাবনা ভাবতে হবে না, চিন্তার ঘোরপ্যাঁচে জড়িয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে না। তাই আমি এখন আর কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করছি না। বিদুরের কথা শুনেছ তো? মহাভারতের বিদুর? ইতিহাস শুধু বীরদের মনে রাখে। তাই মহাভারতের আকর্ষণীয় চরিত্রদের নিয়েই আমরা কথা বলি। বাইরের কাউকে নিয়ে বলি না।'

রুদ্রদেব একটু মুচকি হাসল, 'আমার কিন্তু বিদুরের কথা ভালোই মনে আছে।'

'মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের সেই যুদ্ধে বিদুরের কিন্তু কোনো ভূমিকা ছিল না। আমার হয়েছে এখন সেই অবস্থা। মন্ত্রীর কাজ হচ্ছে রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছে দেওয়া।

এই বিষয়ের ওপরেই একজন মন্ত্রীর সফলতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করে। সফল মন্ত্রী সেই, যে নিজের রাজাকে সঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়। অহেতুক কোনো যুদ্ধে জড়াতে দেয় না। আর একবার সেই ক্ষেত্রে পৌঁছানোর পরে মন্ত্রীর আর তেমন কোনো কাজ থাকে না।'

গিরিধারী এখন রুদ্রদবের পাশে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। রুদ্রদেব গিরিধারীর আগের কথাটার খেই ধরল, 'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না মহামন্ত্রী। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সেনাকে যাত্রায় পাঠিয়ে আপনার কাজ এখনও শেষ হয়নি, আরও কিছু পরিকল্পনা আপনার মাথায় এখনও বসে আছে বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।'

'কী জানি। হতেও পারে। কথা বলতে বলতে আমার তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। ফিরে যাই।'

'বিদায় মহামন্ত্রী। শুভ রাত্রি।'

পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করলো বাহিনী। সারাদিন চলার পর আবার অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা হলো। স্থাপিত হলো বিশ্রাম ব্যূহ। সবকিছু চলছিল গতকালের মতোই। কোনো বৈচিত্র্য নেই।

কিন্তু পরদিন সকালে নতুন একটা ঘটনা ঘটলো। এক অপরিচিত লোক এসে দাঁড়ালো সেনা শিবিরের ঠিক বাইরে। সেনা তখনো যাত্রা শুরু করেনি, সকালের খাবার এখনও শেষ হয়নি।

সেই লোকের সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। তার কাছে আছে এক বিশেষ মোহর। সেই মোহরের চিহ্ন দেখতেই শিবিরের রক্ষীরা ঢুকতে দিলো তাকে। সোজা সে চলে এলো গিরিধারীর তাঁবুতে।

গিরিধারীর তাঁবুতে গিরিধারী আর কালো পোশাকধারী ছাড়া আর কেউ নেই। আর কেউ নেই নিশ্চিত হতেই কথা বলতে শুরু করলো কালো কাপড় পরা দূত, 'আজ ভোরেই খবর এসেছে মহামন্ত্রী। আমাদের গুপ্তচর খবর পাঠিয়েছে পায়রা দিয়ে। ওরা কাল সকালেই যাত্রা শুরু করেছে। সবাই প্রস্তুত। আমরা যখনই প্রতিষ্ঠানা থেকে যাত্রা করেছিলাম তখনই ওদের দূত পায়রা দিয়ে খবর পৌঁছে দিয়েছিল বারিগাজায়।'

'আচ্ছা, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। এই শিবিরে তুমি আর এক মুহূর্তও থাকবে না। কারো সাথে কোনো কথা বলবে না। নিজের জায়গায় ফিরে যাও।'

দূত প্রস্থান করলো। গিরিধারী চলে গেলেন সোজা মহারাজ সাতকর্ণীর তাঁবুতে। গিরিধারীর ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন মহারাজ। তাকালেন গিরিধারীর দিকে।

'মহারাজ, ভেতরে গেলে ভালো হয়।'

'আচ্ছা।' দুজনেই ভেতরে চলে এলেন। মহারাজ সাতকর্ণী বসলেন, 'বলুন কী হয়েছে। কোনো কারণ ছাড়া এত সকালে আমার তাঁবুতে নিশ্চয়ই আপনি আসেননি।'

'ঠিক ধরেছেন মহারাজ। আমাদের জন্য একটা খারাপ খবর আছে।'

'খারাপ খবর?'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমাদের এখনই ফিরতি পথ ধরতে হবে। সব সেনা নিয়ে উলটোদিকে চলতে হবে আমাদের।'

'মানে?' মহারাজ সাতকর্ণীর গলার স্বর শীতল, 'এসব কী বলছেন? আমাদের তো অমরাবতীতে যাবার কথা। সাতবাহনের এই সেনা কলিঙ্গের সেনাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। এটাই তো আমাদের কাজ, তাই না? আমি এই কাজ ছাড়া অন্য কোনোকিছুই এখন আর ভাবছি না।'

'মহারাজ, আমরা সেই লক্ষ্য থেকে একটুও বিচ্যুত হইনি। সাতবাহন সেনা কলিঙ্গের সেনাকে আসলেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। সেনা পাঠানোর ব্যবস্থা আমি এর মধ্যেই করেছি। তবে শত্রুদের ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়া আমাদের উচিত হবে না।'

'এসব কী বলছেন আপনি? সেনা কোত্থেকে পাঠিয়েছেন? আমার পূর্ণ সেনা তো এখানেই আছে।'

রহস্যময় হাসি দেখা গেল এবার গিরিধারীর মুখে, 'মহারাজ, আমাদেরকে ফিরতি পথ ধরতে হবে। আপনি কেবল অনুমতি দিন। আপনাকে সব খুলে বলবো আমি। আমার করা চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না আমি। এখন হয়েছি। শত্রু আমার দেওয়া চাল অনুযায়ীই খেলছে। আমাদেরকে এখন সেনা নিয়ে পিছিয়ে নাসিকে যেতে হবে।'

'নাসিক! মানে আমাদের রাজ্যের একেবারে পশ্চিমের সীমান্ত! ঠিক আছে। আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তাহলে পুরো বাহিনী নিয়ে দুই দিন এত পরিশ্রম কেন করলাম? শুধু শুধু এটুকু পথ এলাম।'

'এটা শত্রুদের জন্য একটা আমন্ত্রণ ছিল মহারাজ। শত্রুকে আমরা বুঝিয়েছি, আমরা তাদের পরিকল্পনা মতোই কাজ করছি। এটা করা আবশ্যক ছিল। আমার ওপর ভরসা রাখুন মহারাজ। আমরা এবার দুটো যুদ্ধ একসাথে জিতবো।'

'আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন আপনি সেনা যাত্রার জন্য এই পথটা বেছে নিয়েছিলেন। কেন বারবার নানা অজুহাতে সেনার গতি রোধ করছিলেন? কেন সেনাপতিদের নিয়ে অহেতুক যাত্রা আটকে সভা করেছিলেন। আপনি চেয়েছিলেন আমরা যাতে খুব বেশি এগোতে না পারি, তাই না? আপনার মনে প্রথম থেকেই ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল। আমি ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ মহারাজ। আমার উলটো দিকেই যাবার পরিকল্পনা ছিল। এই জন্যই কম দূরত্ব অতিক্রম করতে চেয়েছি। আমার মাথায় ছিল, যতটা এগোবো ঠিক ততটুকুই আবার পিছিয়ে যেতে হবে। কষ্ট আমাদেরই হবে।'

'আচ্ছা।'

'মহারাজ, এবার কিন্তু আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। শত্রু আমাদের অমরাবতীতে যাবার খবর জানে। কিন্তু শত্রুকে কোনোভাবেই আমাদের এই উল্টো পথে চলার কথা জানানো যাবে না। ফিরতি পথে চলাচলে আমাদেরকে অবশ্যই গুপ্তপন্থা অবলম্বন করতে হবে। যদিও আমার গুপ্তচরের খবর অনুযায়ী শত্রু এর মধ্যেই তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, তবু সাবধান থাকতে হবে। এত বড়ো সেনাবাহিনী একত্র চললে কোনোভাবেই প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদেরকে সেনাবাহিনী কিছু অংশে ভাগ করে দিতে হবে। পশ্চিম সীমান্তের নাসিক নগরের প্রান্তরে গিয়ে আমরা একত্র হবো।'

মহারাজ সাতকর্ণী সিদ্ধান্ত নিলেন, 'এবার তাহলে আমাকে বুদ্ধি খাটাতে দিন গিরিধারী। সেনা চালনায় আমার দক্ষতা আপনার চেয়ে কিঞ্চিত বেশি।'

'অবশ্যই মহারাজ।'

'শুনুন, আমার সব সেনাই গুপ্ত চলনে অভ্যস্ত। তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের বাহনকে লুকিয়ে চলতে পারে। আর গুপ্ত চলনের জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে রাত।'

'তার মানে?' এবার অবাক হবার পালা গিরিধারীর।

'তার মানে হচ্ছে, আমরা রাতে চলাচল করবো। সামনের পথ শত্রুর গুপ্তচর মুক্ত রাখতে কিছু বিশেষ সেনাকে আমরা আগেই পাঠিয়ে দেবো। ওরা শত্রুর গুপ্তচর খুঁজে পেলে মেরে ফেলবে। তার পেছনে যাবে আমাদের সেনারা। সামনের নিষ্কণ্টক রাস্তায় নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাবে বাহিনী। এতে আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

মনে মনে হিসেব কষলেন গিরিধারী, 'না, আমার মতে এতে কোনো সমস্যা হবে না।'

৭৮

মহারাজ নাহাপনা বারিগাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্পন্ন করেছেন। সেনাপতিরা যার যার বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেছেন। মিত্রদের থেকে সেনা সাহায্যও চলে এসেছে। বারিগাজা নগর থেকে একটু দূরে এক প্রান্তরে জড়ো হয়েছে সেই বাহিনী।

সবকিছুই কিন্তু করতে হচ্ছে গোপনে। কোনোমতেই যুদ্ধের অস্থিরতার সাথে বাণিজ্য আর ব্যবসায়ীদের মেলানো যাবে না। কোনোভাবেই তাদের বোঝানো যাবে না, এখানে একটা অস্থির সময় চলছে। সে জায়গায় তিনি এখন পর্যন্ত বেশ সফল। রাজ আজ্ঞা মেনে সবাই কাজ করছে। কেউই এপাশের সংবাদ ওপাশে পাচার করছে না।

সারথী প্রবেশ করলেন মহারাজ নাহাপনার কক্ষে। তাকে দেখে আরামে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে রাখা মহারাজ নাহাপনার আধবোজা চোখ পুরোপুরি খুলে খেলো, 'কী খবর সারথী? আবার কী হলো? এই সময়ে তো আপনার আমার কাছে থাকার কথা না। সেনাদলের কাছে অথবা বন্দরে থাকার কথা।'

'আমি বন্দরেই ছিলাম মহারাজ। সেখানের সবকিছু তদারক করছিলাম। সেখানেই খবর পেলাম গুপ্ত সংবাদ নিয়ে গুপ্তচর একটু আগেই এসে পৌঁছেছে।'

'কী খবর এনেছে দূত?' এবার এলানো শরীর সোজা করে ফেলেছেন মহারাজ নাহাপনা।

'আমরা যে খবরের জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি সেই খবরই নিয়ে এসেছে দূত। সাতবাহন সেনা প্রতিষ্ঠানা ত্যাগ করেছে। যাত্রা করেছে অমরাবতীর উদ্দেশ্যে।'

'কদিন আগে যাত্রা করেছে?'

মনে মনে একটু হিসেব করে নিলেন সারথী, 'কাল ভোরে যাত্রা করেছে মহারাজ। আমাদের গুপ্ত দূত সাতবাহন রাজ্যের গুপ্তচরের কাছ থেকে পায়রার মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছে। কাল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছে সেই বাহিনী।'

'শুধু কি যাত্রার খবরই পাঠিয়েছে দূত? না-কি সাতবাহন বাহিনীর আকার সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছে। সেই খবর কি পাঠিয়েছে?'

'আজ্ঞে মহারাজ। আপনি কী জানতে চাইছেন তা বুঝতে পারছি। এই নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'সেনার আকার কেমন?'

'যতটুকু বুঝতে পেরেছি, আমাদের ধারণার চেয়ে কিঞ্চিত বেশি। তবে তাতে তেমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমাদের পরিকল্পনায় ঐ কয়েকটা বাড়তি সৈন্য কোনো পার্থক্য গড়ে তুলতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি সারথী। ওরা যত বড়ো বাহিনীই গড়ে তুলুক না কেন, আমাদের ছকের সামনে ওরা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। আমাদের যৌথ বাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণের কাছে পাত্তা পাবে না। আপনার এই বুদ্ধি বেশ কাজে দিয়েছে। আপনার এই

চাল শকদের ইতিহাস বদলে দেবে। আর ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম যাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকে সেই ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো।'

সারথী নতমুখ হলেন মহারাজের প্রশংসায়, 'এটা আসলেই এক অব্যর্থ চাল ছিল মহারাজ। আমাদের ইশারায় নাচা ছাড়া শত্রুর আর কিছুই করার ছিল না। মহারাজ সাতকর্ণী আর কিবা করতেন। তাকে তো নিজের সেনা নিয়ে যাত্রা করতেই হতো অমরাবতীর দিকে। নইলে তো তার সম্মান বলে কিছুই থাকতো না। তাই তিনি করেছেন।'

'হ্যাঁ। সম্মানী লোকের সম্মান পাল্লায় তুলে দিলেই তার সামনে আর কোনো উপায় থাকে না। সম্মান মানুষের সবচেয়ে বড়ো অহংকারের জায়গা। আর সেই লোকের পতন সম্মান নামক অহংকার দিয়েই করতে হয়। এখানে আমরা অথবা কলিঙ্গ সেনা যদি একা সাতবাহনের সাথে লড়তাম তাহলে স্রেফ উড়ে যেতাম। এখন সাতবাহনের ওড়ার পালা।'

'তাহলে আমরা কখন যাত্রা করবো?'

'আমাদের তো আর দেরি করার সুযোগ নেই। ওদের তিনদিন হয়ে গেছে। তার মানে ওরা আমাদের থেকে প্রায় দুই সপ্তাহ সামনে আছে। আমরা ওদের থেকে বড়ো জোর দুদিন পিছিয়ে থাকবো যখন ওরা অমরাবতীতে পৌঁছাবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'সেই অনুযায়ীই আমরা চলবো। গতি বাড়াতে হবে। তাহলেই ওরা যখন অমরাবতীর দুর্গে কলিঙ্গ সেনাকে আক্রমণ করবে ঠিক তখনই আমরা পেছন থেকে গিয়ে ওদের আক্রমণ করবো। পৃথিবীর কোনো সেনাবাহিনীই দুই দিক থেকে জোরালো সেনার আক্রমণ সামলাতে পারবে না। আমাদের যেভাবেই হোক এই দুই সপ্তাহের দূরত্ব দুই দিনে নামিয়ে আনতে হবে।'

'জি মহারাজ। আমরা শুরু থেকেই সেজন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। আমাদের সেনা রাতেও চলবে, বিশ্রাম খুব কম নেবে। আশা করি আমরা ওদের ধরে ফেলতে পারবো। আর যদি নাও পারি তাহলে কলিঙ্গ সেনাপতির কাছে সংবাদ দেওয়ার জন্য লোক গেছে। আমাদের কাছ থেকে সংবাদ না পেলে যাতে যুদ্ধ শুরু না করে। যাতে একটু দেরি করায়।'

'তাই না-কি? অমরাবতীতে লোক পাঠিয়েছেন? কখন?'

'আজ সকালে মহারাজ।'

'আচ্ছা। এখন তাহলে আপনি পুরো সেনাকে শেষ প্রস্তুতি সেরে নিতে বলুন। কাল সকালে রোদ ওঠার আগেই আমরা রওনা দেবো। আবারও বলছি, বন্দরের কেউ যাতে কিছুই টের না পায়। কোনো মঙ্গল শঙ্খ, রনভেরী বাজানোর দরকার নেই।'

সারথী মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন।

পরদিন খুব সকালে শকদের মিলিত বাহিনী যথা সম্ভব নিঃশব্দে বারিগাজা ত্যাগ করলো। নগরের অপর প্রান্তের নদীর ওপরে জাহাজগুলোর ছোটো ছোটো ঘরে ঘুমন্ত শরীরগুলো এই যাত্রার বিষয়ে কিছুই টের পেলো না।

মহারাজ নাহাপনা আছেন সেনাদের একেবারে সামনে। প্রথম থেকেই গতি বাড়িয়ে চলেছে শক বাহিনী।

মহারাজ নাহাপনা যেখান থেকে ঘোড়ার গতি বাড়িয়েছেন ঠিক সেই জায়গা থেকে সহস্র ধনু দূরে জঙ্গলের ভেতরে আছে একজন। ছদ্মবেশে পাকা এই লোক। কালো পোশাকে জংগলের আঁধারের সাথে একেবারে মিলে আছে। তার ঘুম খুব কম হচ্ছে। তবে ক্রমাগত নির্ঘুম থাকার কোনো প্রভাব তার শরীরে পড়ছে না। এসব চরম শারীরিক অবস্থা সহ্য করার জন্য তাকে অনেক কড়া প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বারিগাজা থেকে সম্পূর্ণ শক সেনার নির্গমন বেশ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলো সে। হাতের কাজ চলছে। কালিতে কলম ডুবিয়ে পাতায় ছোটো ছোটো করে লিখে চলেছে সে। তারপর ঝোলা থেকে বের করলো স্বাস্থ্যবান পায়রাটাকে। এই পায়রাই ছিল গত কিছুদিন তার বন্ধু। বিরক্তি যে মাঝে মাঝে লাগেনি তা নয়। এই পায়রার সাথে তখন বন্ধুর মতো গল্প করেছে সে।

এবার সাথীর সাথে বিচ্ছেদের সময় চলে এসেছে।

৭৯

আদিত্যের এখন তেমন কোনো কাজ নেই। কলিঙ্গ সেনা অমরাবতী বেশ ভালোভাবেই দখল করে নিয়েছে। নগরের প্রজারা কেউই নেই। সব জায়গাতেই সেনারা যা যা বিনোদনের সামগ্রী সামনে পাচ্ছে তার সদ্ব্যবহার করছে।

অপেক্ষা করতে আদিত্যের মন্দ লাগছে এই কথা বলা যাবে না। অপেক্ষার জায়গা আর বস্তুর ওপর অপেক্ষাকারীর ধৈর্য অনেক অংশে নির্ভর করে। তার আগেও তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অমরাবতীর সীমান্তে শিবির ফেলে। সেই সেনা শিবিরে সেনাপতির জন্য যতই আরামের ব্যবস্থা থাকুক না কেন, সেই ধুলোময় রুক্ষ জায়গা কখনোই রাজপ্রাসাদের সমান হতে পারে না। স্বয়ং সাতবাহন সম্রাট বাস করতেন এই প্রাসাদে। তিনি এখন নেই, কিন্তু আরামের অনুসঙ্গ তো আর সাথে করে নিয়ে যাননি। সম্রাট সাতকর্ণী যে শয্যায় মহিষীদের নিয়ে বিলাস করতেন গত দশদিন সেই বিছানাতেই নিদ্রা যাচ্ছে সে।

সাতবাহনের প্রজারা চলে গিয়েছিল খালি হাতে। তাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আর রসদ আছে। সেগুলো ভোগ করে সময় কাটাতে সেনাদেরও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। লুটপাটের এখানে কোনো ব্যাপার নেই। শুধু ভোগ করা।

ঘর শ্রী ছাড়া কখনো ঘর হয়ে উঠতে পারে না। কোনো সুখই নারীসঙ্গ ছাড়া পুরুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এই চিন্তা অবশ্য আদিত্য আগেই করে রেখেছিল।

প্রজাদের নিয়ে যখন বেরিয়ে যাবার জোগাড় করছিলেন বলদেব তখন সেই প্রজাদের তালিকায় রাজভবনের নর্তকী আর দেবদাসীরাও ছিল। তাদেরকে অবশ্য শেষ মুহূর্তে আটকে দিয়েছিল আদিত্য, তার যুক্তিও কিন্তু ফেলে দেবার মতো ছিল না। জড়ো হওয়া সুন্দরীদের দিকে তাকিয়ে সে বলদেবকে বলেছিল, 'মহামন্ত্রী, আপনি গৃহস্থ বাড়ির মহিলাদের নিয়ে যেতে পারেন, ঠিক আছে, কিন্তু কোনো রত্ন তো নিয়ে যেতে পারেন না।'

বলদেব সত্বর উত্তর দিয়েছিলেন, 'কই, আমি তো কোনো রত্ন বের করছি না।'

আদিত্য মহলের এক সুগঠিত দেহের নর্তকীর চিবুক স্পর্শ করে বলেছিল, 'আপনি তো রাজমহলের সবচেয়ে দামি রত্নগুলোই নিয়ে যেতে চাইছেন। আগেই তো বলেছি, আপনি কোনো রত্ন নিয়ে যেতে পারবেন না।'

বলদেব বুঝতে পেরেছিলেন, এই নারীদের সামনে কঠিন সময়। তবে পরাজিত পক্ষের নারীদের এমন ভাগ্যই বরণ করতে হয়। বিধির নিয়মের বাইরে কেইবা যেতে পারে। বলদেব কেবল আহত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন আদিত্যের দিকে। না, এখানে অনুরোধে কোনো কাজ হবে না। আদিত্য আর সেনাদলের উচ্চ পদের কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করতেই হবে অমরাবতীর মেয়েদের।

নর্তকী আর দেবদাসীদের আবার প্রাসাদে ফেরত পাঠানো হলো। তাদেরকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না, কেউ তাদের মতামত নিলো না। সেই প্রয়োজন নেই।

তাদেরকে যখন দল বেঁধে একত্রে প্রাসাদ থেকে বের করে আনা হয়েছিল তখনো কেউ তাদের মতামত নেয়নি, আবার এখন সবার থেকে আলাদা করে যখন প্রাসাদে প্রবেশ করানো হলো, তখনো তারা নিশ্চুপ। তারা জানে, তাদের নিয়তি নির্দিষ্ট। তা কখনো বদলাবে না। আগে তারা সাতবাহন রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করতো, কখনো সহ্য করতো তাদের প্রেমের অত্যাচার, কখনো খেয়ালের। এখন শুধু সেই পানীয় বদলে গেছে, পাত্র একই আছে। বাইরে উজ্জ্বল, হাস্যমুখ, ভেতরটা পরিত্যক্ত কুটিরের মতো জীর্ণ।

এই মুহূর্তে আদিত্য শুয়ে আছে মহারাজ সাতকর্ণীর শয্যায়। একা নয়, তার পাশে শুয়ে আছে একটা শরীর। তন্বী, সুগঠিত। সুন্দরী নর্তকীদের মাঝ থেকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল তাকে।

সুঠাম দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আদিত্য। শরীরের আড়মোড়া ভেঙে নিলো। মিলনের আলস্য ছড়িয়ে পড়েছে তার পুরো শরীর জুড়ে। শয্যায় অচেতন রমণীর দিকে একবার ভালো করে তাকাল সে। রাতের কাঁপা আলো, সজ্জা আর উত্তেজনার আতিশয্যে ঠিকমতো খেয়াল করতে পারেনি সে, কিন্তু এই সুবেশ রমণীর সজ্জা আর বেশ মুছে গেছে এখন। তার অন্তরের ক্লান্তি আর যন্ত্রণা এখন যেন সেই মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই ঘুমের মধ্যেও। রাতের মনোহারিণী রূপ এখন হয়ে উঠেছে কুৎসিত।

শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো আদিত্য। একটা ব্যাপার বেশ ভাবাচ্ছে তাকে। সৈন্যরা নগরের ভেতরে যথেচ্ছ আচরণ করতে শুরু করেছে। এতদিন কিছুই বলেনি সে। করুক একটু আনন্দ। কিন্তু এখন যুদ্ধের সময় এগিয়ে এসেছে। এবার লাগাম টানতে হবে।

প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। এখান থেকে পুরো নগর দেখা যাচ্ছে। পুরো নগরের ওপর একবার চোখ বোলাল সে। সব জায়গাতেই নিজের সেনাদের দেখতে পাচ্ছে।

সৈনিকদের সবচেয়ে বড়ো ভূষণ মানে অস্ত্র তেমন কারো কাছেই দেখা গেল না। কারো কারো কাছে থাকলেও অবহেলায় পাশে পড়ে আছে। গনিকাদের সাথে কারো কারো উল্লাস রাত্রি এখনও পার হয়নি, কেউ হয়তো পার করে এখন আদিত্যের মতো একটু সুস্থির হতে চেষ্টা করছে। যারা আজকে নিজের ভাগে নারী রত্ন পায়নি, তারা আহার আর পানে মত্ত থেকে সেই অভাব পূরণ করে নিচ্ছে। অটল দাঁড়িয়ে সেনাদের দুর্গতি আর অধোগতি দুই-ই দেখতে লাগলো সে।

উল্লাসে মত্ত সেনাদলের ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগলো। তবে একটু সময় পরেই সবার চোখে পড়লো আদিত্যের অবস্থান। সেনাপতির চোখের সামনে এমন আচরণ আর করা চলে না। সবাই স্বাভাবিক হয়ে এলো। অমরাবতীর বাতাস যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গণিকারা অত্যাচারের থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়েছে। আলুথালু বেশ সামলে তারা ছুটল একটা আশ্রয়ের খোঁজে। ঝনঝন, ছনছন, ছমছম আওয়াজগুলো থেমে এলো আস্তে আস্তে।

নিজের দীর্ঘ শরীর নিয়ে প্রাসাদ থেকে নিচে নেমে এলো আদিত্য। এর মধ্যেই তার সেনাধ্যক্ষরা নিচে জড়ো হয়ে তার অপেক্ষা করছে।

তাদের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো আদিত্য, 'তোমরা সবাই সকালের খাবার খেয়ে মন্ত্রণাকক্ষে এসো। এবার একটু কাজ করা যাক। আমরা যথেষ্ট সুখভোগ করে ফেলেছি। জানো তো, সুখ ভোগে পুণ্য ক্ষয় হয় আর যন্ত্রণা ভোগে পাপ। আমরা এই অমরাবতী বিজয় করে যে পুণ্য অর্জন করেছি সেই পরিমাণের সুখ ভোগ করে ফেলেছি। এবার আবার সংসারের কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।'

আপাতত সাতবাহনের রাজধানী অমরাবতীর রাজপ্রাসাদ কলিঙ্গের প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই হিসেবে এই প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষ এখন কলিঙ্গ সেনার মন্ত্রণাকক্ষ। সেখানেই নিজের সেনাধক্ষ্যদের নিয়ে বসেছেন আদিত্য।

'অনেক আরাম হয়েছে। অমরাবতী দুর্গ আমরা অনন্তকালের জন্য দখল করিনি। যে কোনো সময় শত্রু তাদের এই দুর্গ উদ্ধার করার জন্য আক্রমণ করবে। আর তাদের অভ্যর্থনার যথেষ্ট ব্যবস্থা আমাদের করে রাখতে হবে।'

'আজ্ঞে সেনাপতি।' সব সেনাধ্যক্ষ সায় দিলো।

'প্রথমেই এই নগরের প্রাচীর, দেওয়ালের ওপর পাহারা দেওয়ার স্থান, দুর্বল স্থান এসবের একটা নকশা করে ফেলতে হবে। সেই অনুযায়ী আমাদের সেনাকে সজ্জিত করতে হবে। যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে আছে। এছাড়া এই প্রাসাদের অস্ত্রাগারেও অনেক অস্ত্র পেয়েছি আমরা। কোনো সমস্যা হবে না।'

'আমাদের অস্ত্র নির্মাণের কারিগররা অস্ত্র বানাতে পারে। এখানে অনেক ধাতু আছে অস্ত্র বানাবার উপযোগী।' এক সেনাধ্যক্ষ মন্তব্য করলো।

'হ্যাঁ। নগরের দেয়ালের বাইরে পাঁচ সারি অশ্ব, দুই সারি গজ আর পাঁচ সারি পদাতিক সবসময় প্রস্তুত থাকবে। দেয়ালের ওপর সারি বেঁধে দাঁড়াবে তীরন্দাজরা। আমার হিসেব অনুযায়ী এর মধ্যেই সাতবাহন বাহিনী যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য সেসব নিয়ে এত ভাবতে হবে না। জায়গা মতো আমার দূতেরা আছে। তারা সময় মতো খবর পৌঁছে দেবে।'

এবারও সবাই সায় জানালো।

এবার কঠোর হবার সময়। আদিত্যের দৃষ্টি সব সেনাধক্ষ্যের ওপর এক পাক ঘুরে এলো, 'এবার যা বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি এই আদেশ দ্বিতীয় বার দেবো না। এখন থেকে সবরকমের অভিসার, স্বেচ্ছাচার, ভোগ-বিলাস পুরোপুরি বন্ধ। এখন থেকে প্রত্যেক সেনা আমাদের বাহিনীর সাধারণ নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। সুরা আর অধর রস দুই পানই এখন থেকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। বোঝা গেছে?'

এবারও সবাই সায় জানালো, 'আজ্ঞে সেনাপতি।'

ঠিক তখনই মন্ত্রণাকক্ষের দরজায় আওয়াজ হলো। সবাই চুপ হয়ে গেছে। আদিত্য দরজার দিকে তাকালো। এখন তো কারো আসার কথা নয়।

দরজার বাইরের প্রহরী গুপ্তচরের আগমনের কথা জানালো। এই সময়ে গুপ্তচর! কোত্থেকে এলো? ধন্দে পড়ে গেল আদিত্য। আনমনে বলে উঠলো, 'যাও, দূতকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

সেনাধক্ষ্যরা সবাই উঠে যাবার আয়োজন করতেই আদিত্য হাত তুলে থামালো। ঘটনাটা সবাইকে নিয়ে সামাল দিতে হবে।

যে গুপ্তচর ঘরে প্রবেশ করেছে তাকে দেখে আদিত্য একটু অবাক হলো। নিজের গুপ্তচর দলের প্রত্যেক সদস্যকে সে খুব ভালো করেই চেনে। তাদের কে কোথায় কাজ করে আর কার ওপর কী দায়িত্ব অর্পণ করা আছে তাও তার খুব ভালো করেই জানা। এই দূতের তো সাতবাহন সেনার খবর পাবার জন্য জায়গায় অপেক্ষা করার কথা। আর সেই খবর তো এত তাড়াতাড়ি পাবার কথা না।

'খবর বলো দূত।'

চরের মুখে উত্তেজনা ঠিক ছিটকে বেরোচ্ছে, সে এতক্ষণ কথা না বলতে পেরে হাঁসফাঁস করছিল। এমন খবর না জানিয়ে পারা যায়, 'সেনাপতি, সাতবাহনের সেনা চলে এসেছে। সে এক বিশাল বাহিনী। এত বড়ো সেনা কখনো দেখিনি আমি। আজ সকালেই সেই বাহিনী আমার চোখে পড়েছে। ওদের যা গতি তাতে দুপুরের মধ্যে অমরাবতীর সীমানায় পৌঁছে যাবে।'

দূতের দিকে ভালো করে তাকাল আদিত্য। দূত তখনো কথা শেষ করতে পারেনি, আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেনাপতির ঠাণ্ডা স্বর তাকে থামিয়ে দিলো, 'তুমি কাল সারারাত কী করেছ?'

এই প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল চর। আমতা আমতা করতে লাগলো সে।

সেনাপতির ঠাণ্ডা স্বর আবার ভেসে এলো তার কানে, 'নিশ্চয়ই কাল রাতে তুমি গলা পর্যন্ত গিলেছ। সাতবাহন সেনাবাহিনীর অমরাবতীতে পৌঁছাতে কমপক্ষে এক মাস লাগবে। আর তুমি বলছ, সেই বাহিনীকে আজ সকালে নিজ চোখে দেখেছ। মশকরা করার আর জায়গা পাওনি?'

'বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি বলছি সেনাপতি। যেই দৃশ্য আমি দেখেছি পৃথিবীর কোনো সোমরস সেই দৃশ্যকে মরীচিকা বলে প্রমাণ করাতে পারবে না। আমার কথা বিশ্বাস করুন সেনাপতি।'

এবার ধন্ধের পরিমাণ আরও বাড়লো আদিত্যের চেহারায়। দূতের চেহারায় নেশার কোনো রকমের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর তার তো মিথ্যে বলার কোনো কারণ নেই। তার মানে গুপ্তচর সত্য কথা বলছে। তার মানে,

এক লাফে উঠে দাঁড়ালো আদিত্য। তার দেখাদেখি বাকি সবাইও দাঁড়িয়ে পড়লো। কিছু একটা ঘটেছে, যা তারা চিন্তাও করেনি। বজ্রপাতের মতো।

আদিত্য বুঝতে পারছে সময় একেবারেই হাতে নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। সে রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো,

'সব সৈন্য সশস্ত্র করে আমার সামনে নিয়ে এসো। সবাইকে। কে ঘুমাচ্ছে, খাচ্ছে, স্নান করছে আমি শুনতে চাই না। যে যেই অবস্থায় থাকবে সেখান থেকেই চলে আসবে। অর্ধেক মুহূর্তের মধ্যে আমি সবাইকে আমার সামনে দেখতে চাই। এতক্ষণ যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবে অমরাবতীর বাইরে আর দেয়ালের ওপরে সেনা সজ্জা করতে হবে। মন্ত্রণা করার সময় নেই। বিলম্ব করা যাবে না।'

সেনাধক্ষ্যরা দ্রুত প্রস্থান করলো। আদিত্য বসে রইল না। এই সময়ে বসে থাকা সম্ভব না। সে নিজেও ত্যাগ করলো মন্ত্রণাকক্ষ।

সৈন্যদের ওপর দিয়ে রীতিমতো ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। এতদিন কারো কোনোদিকে খেয়াল করার অবসর মেলেনি। এখন যে যার অস্ত্র আর সজ্জা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সেসব যে খুব একটা সহজে মিলবে তা মনে হচ্ছে না।

দুদিকেই নজর রাখতে হচ্ছে আদিত্যকে। সেনাদের তৈরি হবার দিকে তার এক চোখ আর আরেক চোখ মেলে রেখেছে অমরাবতীর সামনের সুবিশাল প্রান্তরের ওপর। সেখানে এখন পর্যন্ত একটা পাতার নড়াচড়াও চোখে পড়ছে না।

তবে নড়ল। একটু পরেই সেই প্রান্তরে পাতা নড়লো, ধুলো উড়ল। গুপ্তচরের দেওয়া সময়ের হিসেবকে একেবারে নির্ভুল প্রমাণ করে সূর্যকে ঠিক মাথার ওপরে রেখে সাতবাহনের বাহিনীর অগ্রভাগ ধরা পড়লো আদিত্যের চোখে। প্রথমেই হস্তীগুলো আর অনেক ওপরে উড়তে থাকা নিশানগুলোই নজরে পড়লো তার।

চোখের পলক পড়ছে না আদিত্যের। দুই চোখই এখন তার সামনের প্রান্তরে নিবদ্ধ। সাতবাহনের নিশানগুলো বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে উড়ছে। এত দূর থেকেও চিনতে একটুও কষ্ট হলো না কলিঙ্গ সেনাপতি আদিত্যের।

সব হিসেব পাল্টে গেছে। আদিত্য নজর দিলো নিজের সেনাদের দিকে। না, তারা তৈরি হয়ে গেছে। হস্তী রওনা দিয়েছে প্রাচীরের বাইরের দিকে, তীরন্দাজেরা উঠে যাচ্ছে দেওয়ালের ওপরের নির্দিষ্ট জায়গায়।

আদিত্য জানে, এতদিনের করা পরিকল্পনার এখন আর কোনো মূল্য নেই। তার সামনে যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। প্রতিপক্ষ তাকে যথেষ্ট চমকে দিয়েছে। এখন আর কূট চালে জেতা যাবে না। সম্মুখ যুদ্ধ করেই জিততে হবে।

রণ কৌশলে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করলো সে। সামনের সেনার ওজন পুরোপুরি বুঝে নিতে হবে। পরিকল্পনা যেহেতু পুরো বদলে গেছে তাই শত্রুর পেছনে বন্ধু নিজের সেনা দিয়ে আক্রমণ করবে আর শত্রুকে তারা দুজনে মিলে দুপাশ থেকে পিষে মারবে, সেই কল্পনা করা যাবে না। এখন যা করার তাকেই করতে হবে।

শত্রু সেনা যথেষ্ট কাছাকাছি আসার আগেই কলিঙ্গ সেনা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। বারো সারি সেনা অমরাবতীর দেয়ালের বাইরে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। দেয়ালের ওপর তীরের বহর নিয়ে তৈরি আছে তীরন্দাজরা। দেখে সন্তুষ্ট হলো আদিত্য। শত্রুসেনার আকার সম্পর্কে এর মধ্যেই পুরো ধারণা পেয়ে গেছে সে। সেটা যথেষ্ট বড়ো হলেও কলিঙ্গ সেনাও কম যায় না। আর এই যুদ্ধে তার সেনার একটা সুবিধা এখনও অবশিষ্ট আছে। অমরাবতীর মতো অভেদ্য দুর্গের আশ্রয় আছে তাদের। ভরসাটা ফিরে পেতেই মুখটা আবার শক্ত হয়ে গেল আদিত্যের।

যাদের দুর্গ দখল করে সে বসে আছে তারা এখন আসছে নিজেদের দুর্গ পুনঃঅধিকার করতে। এখানে সন্ধি অথবা আত্মসমর্পণের কোনো আলোচনা হবে না। শুরু থেকেই ঐ পক্ষ আক্রমণ শানাবে।

সবচেয়ে উঁচু হস্তীতে বসে আছেন একজন। ইনি নিশ্চয়ই মহারাজ সাতকর্ণী। সে তাকে আগে না দেখলেও ধারণা করে নিতে অসুবিধা হলো না। হাত তুলে ইশারা দিলেন তিনি। এই পাশ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলো আদিত্য। তার ইশারা পেতেই

বাহিনীর গতি একটু কমে এলো। পুরোপুরি থেমে আসার আগেই বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রান্তরের উড়তে থাকা ধুলোর অত্যাচার একটু কমে এলো।

আদিত্য তাকিয়ে আছে সেই বাহিনীর দিকে। ঠিকই ভেবেছিল সে। কোনো দূত অথবা কেউ এগিয়ে এলো না আলোচনার জন্য। তার বদলে বেজে উঠলো রণবাদ্য আর রণশঙ্খ। এই প্রাচীন রীতি এখনও মানা হয়। প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা আর কোনোরকম দেরি করবে না। সরাসরি আক্রমণ করবে এখনই।

আদিত্যের উত্তর দিতে বেশি দেরি হলো না। নিজের বাদকদের দিকে ইশারা করলো সে। এই পক্ষ থেকেও বেজে উঠলো রণযন্ত্রগুলো। কিছুক্ষণ দুই পক্ষেই এসব বেজে চলল। যেন কে কার থেকে জোরে আওয়াজ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলল।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আদিত্য চোখের পলক না ফেলে অপেক্ষা করছে। তার সেনা আক্রমণ করবে না। দুর্গ যার অধিকারে থাকবে সে অপেক্ষা করবে, প্রথম পদক্ষেপ দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনীই নেবে এটাই নিয়ম।

দেখাই যাক, কী করে। সামনের সেনা প্রথমে অশ্বারোহীদের পাঠাবে মনে হয়। এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। নিজের তীরন্দাজদের তৈরি থাকতে বলল আদিত্য। কলিঙ্গের তীরন্দাজদের সুখ্যাতি বিখ্যাত।

তবে কোনো ধরনের সেনা সামনে এগিয়ে দিলো না প্রতিপক্ষ। তার বদলে যা করলো তাতে আদিত্যের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে না উঠে পারলো না।

শত্রু পক্ষ তার চাল দিয়েছে। দুর্গের দেওয়াল এবং গঠন ভেঙে দেবার জন্য পাথর ছোঁড়ার যন্ত্রগুলোকে তারা এগিয়ে আনছে সামনে। হাতির সাহায্যে করতে হচ্ছে কাজটা।

বিধির কী বিধান। আদিত্য না ভেবে পারে না। এই দুর্গ তৈরি করেছিল ওরা। তৈরি করার সময় নিশ্চয়ই হিসেব করেছিল দেওয়ালের দুর্বলতা নিয়ে। অনেক যত্নে সেই দেওয়ালের দুর্বলতাগুলো ঢেকে দিয়েছিল তারা। আর আজকে পাশার দান উল্টে যেতেই নিজেরাই সেই দেওয়ালের দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করতে উদ্যত হয়েছে। আদিত্য জানে সেটা অসম্ভব। এই দেওয়াল সে অনেক আগেই পরীক্ষা করেছে। ওসব দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে এই দেওয়ালের কিছু করা যাবে না। তবে নিজের সেনাকে অবশ্যই ওসব ছোঁড়া পাথর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নিজের বাইরের সেনার সারিগুলো একটু ছড়িয়ে যেতে নির্দেশ দিলো সে।

ততক্ষণে বেশ কয়েকটা যন্ত্র এগিয়ে এসে অবস্থান নিয়েছে। গুণে দেখল বারোটা যন্ত্র। শত্রু ভালোই আয়োজন করেছে।

সবগুলো থেকে গোলাকার বড়ো পাথর এক যোগে ছোঁড়া হলো। যন্ত্রগুলোর ক্ষমতা বেশ ভালোই। সবগুলো গোলাকার পাথর উড়ে এসে পড়লো দেওয়ালের ওপর। কোনো পাথরই নিচের সেনাদের মাঝের প্রান্তরে পড়লো না। তবে আদিত্যের অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল। সেই পাথরগুলো অমরাবতীর শক্তপোক্ত দেয়ালের গায়ে একটু আঁচড়ও কাটতে পারলো না।

আদিত্যের মুখের হাসি এবার চওড়া হলো। প্রথম আক্রমণে তার কোনো সেনা হত হয়নি। তীরন্দাজরা তৈরিই আছে। তবে শত্রুসেনা এখনও তীরন্দাজদের নাগালের মধ্যে এসে পৌঁছায়নি।

আদিত্য চাইলে নিজের সেনাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে সেও চায় না তার সেনা প্রতিপক্ষের তীরের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ধৈর্যের খেলায় সে হারতে চাইলো না। সে আর তার সৈনিক অনড় দাঁড়িয়ে আছে।

আদিত্যের চিন্তা বিফল হলো না। এবার প্রতিপক্ষ আর পাথর ছুঁড়ল না। প্রথম অংশের সেনা থেকে এক অংশ সামনে বাড়ল। সেই অংশ একটা বিশেষ ব্যূহ গঠন করেছে। ব্যূহ চিনতে এক নজরের বেশি সময় লাগলো না আদিত্যের। সমুদ্র ব্যূহ। বেশ, আসুক। তার দেওয়ালের সামনের সেনার নিরেট দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পরবে সমুদ্রের ঢেউ। কোনো লাভ হবে না, একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে।

তবে প্রতিপক্ষের সেনা আরেকটু এগিয়ে আসতেই নিজের তীরন্দাজদের তৈরি হতে বলল আদিত্য। তীব্র শব্দে ভেরী বেজে উঠে সেই নির্দেশ ছড়িয়ে দিলো। তীরন্দাজদের চেহারা আর হাত টানটান হয়ে উঠলো। আদিত্যের চেহারা একটুও কাঁপছে না। আরেকটু পরেই শত্রুসেনা তীরের আওতায় চলে আসবে।

তীরন্দাজদের সেনাধ্যক্ষও পুরোপুরি প্রস্তুত। অন্তিম নির্দেশ দেবার জন্য নিজের হাতের তলোয়ার ওপরে তোলা। তলোয়ার নামিয়ে আনা আর সেই সাথে রণহুংকার দেবার জন্য সে সম্পূর্ণ তৈরি।

তবে নির্দেশ তার মুখ থেকে এলো না। এলো বিপক্ষ দলের পাথর ছোঁড়ার নির্দেশকের কাছ থেকে। যন্ত্রগুলো থেকে আবার পাথর ছোঁড়া হলো। বারোটা যন্ত্র থেকে আবার ছুটে এলো বারোটা গোলাকার ভীম আকৃতির পাথর। নিজের দলের এবং বিপক্ষের সেনাদের মাথার ওপর দিয়ে সেই পাথরগুলো আঘাত করলো দেয়ালের গায়ে।

এবার আদিত্য চিন্তিত না হয়ে পারলো না। নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষের একটা পরিকল্পনা আছে। কিন্তু কোনোভাবেই সে প্রতিপক্ষের এই দ্বিতীয়বার পাথর ছোঁড়ার কারণ খুঁজে বের করতে পারলো না। এই পর্বতসম দেয়ালের গায়ে পাথর ছুঁড়ে কী লাভ? কোনোভাবে কি তার তীরন্দাজদের বাধা দিতে চাইছে? না, সেটা অসম্ভব কল্পনা।

তবে আদিত্যের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল একটু পরেই। দ্বিতীয় বার পাথর ছোঁড়ার মানেটাও পরিষ্কার হয়ে গেল একই সাথে। বারোটা পাথর একযোগে আঘাত এনেছে দেয়ালের গায়ে। আর তাতেই ঘটলো আশ্চর্য ঘটনা। একটু আগেই যে দেয়ালকে নিরেট হিমালয় বলে মনে হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো সেই দেয়াল দেবতাদেরও অলঙ্ঘনীয়, সেই দেয়াল একটু যেন নড়ে উঠলো। দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তীরন্দাজরা একটু কেঁপে উঠলো। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে সবাই।

আদিত্যের বড়ো বড়ো চোখের সামনে সম্পূর্ণ দেওয়ালটা যেন বালির বাঁধের মতো এক সাথে ভেঙে পড়লো। দেয়ালের খুব কম অংশই আছে যা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কলিঙ্গের তীরন্দাজ বাহিনী পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। কেউ দেওয়াল থেকে পড়ে মরেছে। কেউ চাপা পড়েছে দেওয়ালের নিচে। সৈন্যদের আর্তনাদে চারিদিক কেঁপে কেঁপে

উঠতে লাগলো। ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল দুর্গেরও মনে হয় এত তাড়াতাড়ি পতন হয়নি।

আদিত্যের ঘোর অনেকক্ষণ কাটলো না। কী হচ্ছে এসব। তার সেনা পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। একটু সম্বিত ফিরে পেতেই তার আতঙ্কিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সামনে এগিয়ে আসতে থাকা শত্রুর সমুদ্র ব্যূহর দিকে। একটু আগে তার চিন্তা অনুযায়ী এই সমুদ্র দেওয়ালে আছড়ে পড়তো। এখন তো দেওয়াল বলেই কিছু নেই। কোনো রকমের আশ্রয় আর ব্যূহহীন অবস্থায় সমুদ্র ব্যূহের সামনে পড়ার মানে আদিত্য ভালো করে বোঝে। দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের কোনো আশা নেই। দেওয়ালের ওপরের সেনারা বেশিরভাগই মরেছে। এবার নগরের ভেতরে থাকা সেনাদের দিকে নজর দিতে হবে। আদিত্যের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। সে দেয়ালের যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল দেওয়ালের ঐ অংশটা ধসে পড়েনি।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নেমে এলো সে দেয়াল থেকে। অত উপর থেকে পড়ে একটু আহত হলেও আমলে নিলো না। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো, 'সবাই নগরের সবগুলো ঘর অধিকার করো। কোনো ঘরই বাদ দিয়ো না। প্রত্যেকটা ঘরের, ভবনের ছাদের দেওয়ালের ওপরে উঠে যাও। ছোটো ছোটো দুর্গে পরিণত করো ওগুলোকে।

আদিত্য জানে এতে শেষ রক্ষা হবে না। তবে এই ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। সেনাপতির নির্দেশ নিমেষে পালন করলো বাহিনী। যার যার সেনাধক্ষ্যের নির্দেশে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে তারা ঢুকে পড়তে লাগলো ঘরগুলোতে।

আদিত্য ভাবছে অন্য কথা। রাজ ভবনে আশ্রয় নিতে হবে। একদল সৈন্য নিয়ে সে ছুটল সেদিকে। বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে। জীবনে কখনো এমন ভয়ের মুখোমুখি হয়নি সে।

আদিত্যের বিভীষিকা তখনো শেষ হয়নি। রাজ ভবনের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেলো, যেই ঘর আর ভবনগুলোতে কলিঙ্গ সেনারা প্রবেশ করেছিল সেগুলোর ভেতর থেকে তারা আবার বেরিয়ে আসছে রক্তাক্ত হয়ে। কারো দেহ বাড়ির ভেতরেই পড়ে আছে, কারো দেহ পড়ছে বাড়ির বাইরের রাস্তায় এসে।

মাথায় কিছুই আসছে না আদিত্যের। ভবনের ভেতরে ওদেরকে এখন কে আক্রমণ করছে? সাতবাহন সেনা তো এখনও নগরের বাইরের সেনাদেরই পার করার কথা না। তার হতভম্ব ভাব আরও বৃদ্ধি পেলো যখন দেখলো সেই ঘরগুলো থেকে সাতবাহন সেনারা খোলা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসছে পিলপিল করে। নগরের ভেতরের বাড়িতে সাতবাহন সেনারা এলো কীভাবে?

কিছুই মাথায় ঢুকছে না আদিত্যের। প্রাণের ভয় তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের সামনে যেন ভোজবাজি ঘটছে। সাতবাহন সেনারা কচু কাটা করছে কলিঙ্গের সেনাদের। তাদের আর্তনাদে আর মৃত্যুনাদে নগরের বাতাস ভারী হয়ে আসতে লাগলো, রক্তে ভেসে যেতে লাগলো রাজমার্গ।

ততক্ষণে বাইরের কলিঙ্গের সেনাদেরও পতন হয়েছে। সাতবাহনের বাহিনী বিনা বাধায় প্রবেশ করেছে নগরে।

রাজ ভবনে প্রবেশ করতে গিয়ে সেনা সহ বাধা পেলো আদিত্য। কে বা কারা যেন রাজ ভবনের মূল ফটক ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। আর পালানোর কোনো উপায় নেই। রাজভবনের সামনের প্রাঙ্গনে একদল সেনা সহ আটকা পড়লো সে।

একটু ভালো করে তাকাতেই সে দেখতে পেলো রাজভবনের সব দেওয়াল আর ছাদের ওপর সাতবাহন সেনারা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে উদ্যত ধনুক। কিছু সৈন্যের হাতে আছে বর্শা। আদিত্য চিন্তা করার ক্ষান্ত দিলো। আর উপায় নেই।

ওদের ফাঁদে আটকে পড়তে দেখে সাতবাহন সেনা আর দেরি করলো না। চারিদিক থেকে তীর আর বর্শা আদিত্য আর তার সেনার দিকে ছুটে এলো একযোগে।

নিজেকে বাঁচাতে যথেষ্ট চেষ্টা করলো আদিত্য। তবে চারিদিক থেকে ক্রমাগত ছুটে আসা অস্ত্র ঠেকানো কোনো সৈন্যের দ্বারাই সম্ভব নয়। একটা বর্শা তার কাঁধ একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো।

এবার ঘোড়া থেমে পড়লো আদিত্যের। বর্শার জোরালো আঘাতে তার শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। হাতের বর্মটা খুব ভারি মনে হচ্ছে। তবু কোনোমতে সে তুলে ধরল সেটা। তাতে অর্ধেক দেহ ঢাকলো। সে নিজেও জানে এটা যথেষ্ট নয়। ঠিক তার এক পল পরেই আবার বর্শা আর তীরের বৃষ্টি হলো। একটা বর্শা আদিত্যের গলা ঠিক দুই ভাগ করে দিলো। কলিঙ্গের বিশাল সেনা অর্ধেক প্রহরও যুদ্ধ করতে পারলো না। সমূলে বিনষ্ট হলো।

আদিত্য ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়লো। শরীরে অসংখ্য তীর বিঁধে আছে তার। তার দেহের সামনে এসে সাতবাহনের সবচেয়ে বড়ো হাতিটা থামলো। হাতি থেকে নেমে এলেন সাতবাহন সেনার পোশাক পরা চোলা মহারাজ কারিকালা।

তার বেশ কিছুদিন আগের কথা।

মহারাজ কারিকালার যুদ্ধের ঝামেলা আপাতত মিটে গেছে। যুদ্ধের জঞ্জাল সাফ করে এখন রাজ্য সজ্জায় মনোনিবেশ করেছেন তিনি। তার সামনের কাজটা সহজ নয়। সহজে এমন দায়িত্ব আর অধিকার কারো ওপরে নিকট ভবিষ্যতে চাপেনি। পুরো দক্ষিণ ভারত এখন নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে তাকে।

সেদিনের ভেন্নির প্রান্তরে বাড়তি সৈন্য কোত্থেকে এলো সেই রহস্য অবশ্য পরে সমাধান হয়ে গেছে। সেটা না হলে পরিণতি কী হতো সেই চিন্তা এখনও মহারাজ কারিকালার মনে আসে মাঝে মাঝে। তখন মনের অজান্তেই শিউরে উঠতে হয়। সব ব্যবস্থা যে সাতবাহন মন্ত্রী গিরিধারীর মাথা থেকেই এসেছে তা তিনি বেশ ভালো করেই জানেন। বাবা, মাথাই একটা।

চেরা রাজ্যের খবর সবসময় আসছে তার কাছে। মহারাজ উথিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছেন তিনি। যদিও খবরটা খুবই হৃদয় বিদারক তবু কেন যেন মহারাজ উথিয়ানের প্রতি কোনো সহানুভূতি অনুভব করেননি তিনি। এই জগতের এই নিয়ম। ছলনায় হোক আর যেভাবেই হোক, লোভের ফাঁদে পড়ে অশান্তির রাজনীতিতে তিনি নিজের ইচ্ছেতেই প্রবেশ করেছিলেন। এসব পথে প্রবেশ করলে দুটোর একটা পরিণতি তো মেনে নিতেই হবে। হয় সফলতা নয়তো ব্যর্থতার শাস্তি পাওয়া। সেই শাস্তি সময় তার নিয়ম মেনে দিয়ে দেয়, কেউ কেউ নিজেকেই শাস্তি দেয়।

মহারাজ কারিকালা প্রায় গুছিয়ে এনেছেন সবকিছু। এখন আর কোনো দিক থেকে কোনো বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। তবে মহারাজ কারিকালা একটা সত্য ভুলে গিয়েছিলেন, এই পর্যন্ত কোনো রাজাই এই পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারেননি। রাজ সিংহাসনের মহিমাই এমন। কোনো ধরনের তাপের উৎস ছাড়াই এই আসন সবসময় গরম থাকে।

তাই গিরিধারী যখন বিকেলের শেষ বেলায় রাজধানী পুহারে এসে পৌঁছালেন তখন সে খবর পৌঁছে গেল মহারাজ কারিকালার কাছে। আর তখনই তিনি বুঝতে পারলেন পৃথিবীর আসল মহিমা। কেন ভগবান পৃথিবীকে স্বর্গ আর পাতালের মাঝখানে রেখেছেন।

গিরিধারী হাবভাবেই বুঝিয়ে দিলেন তার হাতে তেমন সময় নেই। অথিতি-সৎকার পাবার সৌভাগ্য তিনি নিয়ে আসেননি।

ভেন্নির যুদ্ধে বিজয়ের পর এই প্রথম গিরিধারী চোলা রাজ্যে এসেছেন। প্রথম কাজটা প্রথম কথাতেই সেরে নিলেন তিনি, 'আপনাকে বিজয়ের অভিনন্দন। আপনার রাজ্যের পরিধি তো অনেক বেড়ে গেছে। এখন তো আর আপনাকে মহারাজ বলে ডাকলে চলবে না, আপনি তো এখন সম্রাট। আশা করি কদিনের মধ্যেই সমস্ত ভারতের লোকেরা আপনার এই উপাধি মেনে নেবে।'

কারিকালা যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছে গিরিধারীকে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার একটা ভাব তো আগে থেকেই আছে, 'অভিনন্দনের বিনিময়ে ধন্যবাদ অবশ্যই আপনার প্রাপ্য। আপনাদের সাহায্য ছাড়া এসব কিছুই হতো না। সংকট এখন কেটে গেছে। তবে আমার সম্রাট হবার কোনো বাসনাই নেই। চোলা, চেরা আর পাণ্ড্য রাজ্য আলাদাই থাকুক। আমি ওসব রাজ্য শাসন করবো না। স্বাধীন থাকবে প্রজারা। তবে অবশ্যই আমার একটা প্রভাব থাকবে।'

'ঐ হলো, এভাবে নইলে ওভাবে।'

'ঠিক ধরেছেন,' কারিকালা হেসে উঠলেন, 'তারপর বলুন, কী কারণে আপনাকে চোলা রাজ্যে নিয়ে এসেছে এই সময়?'

'কারণটা মনে হয় আপনি জানেন।'

'না জানলেও অনুমান করতে পারছি। নিশ্চয়ই এবার মিত্র হিসেবে আমাদের প্রতিদান দেবার সময় চলে এসেছে।'

'ঠিক ধরেছেন। বুদ্ধিমান লোকের সাথে কাজ করে এজন্যই সুখ। তবে একটু ঘুরিয়ে বলতে হতো। প্রতিদান নয়, সাহায্য। মিত্র কখনো মিত্রকে প্রতিদান দেয় না, সাহায্য করে।'

'মহামন্ত্রী, আপনিও জানেন আমিও জানি রাজনীতিতে মিত্র বলে কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে আছে ঋণের সম্পর্ক। আমরা আপনাদের কাছে ঋণী। সেই ঋণ আমি যে করেই হোক শোধ করবো। রাজা ঋণী থাকার মানে হচ্ছে পুরো রাজ্য ঋণী থাকা। আমি কিছুতেই চাই না আমার চোলা রাজ্য সাতবাহন রাজ্যের কাছে ঋণী থাকুক।'

গিরিধার মৃদু হাসলেন, 'আপনার কথার সাথে একমত না হয়ে পারছি না। তবে মিত্রের সহায়তা হোক অথবা ঋণ শোধ, শেষ কথা হচ্ছে এবার আপনাকে আমাদের অনুরোধে একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কথা দিতে পারছি না। আগে আপনাদের অনুরোধটা শুনি। কোনো অন্যায় কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব হবে না।'

গিরিধারী সোজা ভাষায় বললেন, 'আপনাকে অমরাবতী আক্রমণ করতে হবে। পুরো সেনা সহ।'

এটা কোনো অন্যায় কাজ নয়, তবে যথেষ্ট হতবুদ্ধিকর। কারিকালার চোয়াল আসলেই অনেকটা ঝুলে পড়েছে। কী বলছেন উনি!

'মানে! আপনি এখানে এসেছেন আমার সাহায্য চাইতে। আর সেই সাহায্য হিসেবে চাইছেন আমি যাতে আমার পুরো সেনা নিয়ে আপনাদের রাজধানী আক্রমণ করি? এসবের মানে কী? আপনি কি মহারাজ সাতকর্ণীর হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজা হতে চাইছেন না-কি?'

'অবশ্যই নয়। আমার অনুরোধ এখনও শেষ হয়নি। আপনারা শুধু অমরাবতী আক্রমণই করবেন না, সেই সাথে ধ্বংস করতে হবে অমরাবতীর দুর্ভেদ্য দেওয়াল। সেই প্রাচীর পুরোপুরি ধূলিসাৎ করে দিয়ে ভেতরে অবস্থিত সেনাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে। সোজা কথায়, অমরাবতী বিজয় করতে হবে আপনাকে। নৃশংস পন্থায়।'

'উঁহুঁ, ব্যাপারটা আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে না। এই অন্যায় আমি করতে পারবো না। মহারাজ সাতকর্ণীর সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। তার রাজধানীতে

আমি আক্রমণ করতে পারবো না। আপনি মহারাজকে সরিয়ে রাজা হবার যে স্বপ্ন দেখছেন। আমাদের সাহায্য করার পেছনে তাহলে এই ছিল আপনার আসল উদ্দেশ্য।'

গিরিধারী কৌতুকের হাসি হাসলেন, 'রাজা হবার ইচ্ছে যে মাঝে মাঝে করে না সেই কথা বলবো না। করে, ইচ্ছে করে। তবে একটু পরেই মনে হয় কী হবে এত ঝক্কি মাথায় নিয়ে। ইচ্ছেটা কখনো ডানা মেলার সুযোগই পেলো না। আপনাকে আমি যে কাজ করার অনুরোধ করেছি তা কিন্তু সাতবাহন রাজ্য আর মহারাজ সাতকর্ণী দুই পক্ষের জন্যই বেশ মঙ্গলজনক।'

'আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু বোঝান, নিজের রাজধানী ধ্বংস হলে কোনো রাজার কী ধরনের মঙ্গল হবে? এই জবাব আশা করি অবশ্যই আপনি দিতে পারবেন।'

'বলছি। বেশ লম্বা সেই গল্প। আর এই গল্পের কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না। বেশ সময় নিয়ে বলতে হবে। দাঁড়ান, তার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই।'

শুরু করলেন গিরিধারী, 'কলিঙ্গ সেনা এখন আমাদের অমরাবতীর সীমান্তে এসে ঘাঁটি গেড়েছে।'

সায় দিলেন মহারাজ কারিকালা, 'সেই খবর আমার চরের মারফত আমিও পেয়েছি। সেই থেকেই এটা নিয়ে চিন্তা করছি আমি। ওদের এতো সাহস হয় কি করে। এই ভারতে মহারাজ সাতকর্ণীর রাজ্যে সেনা দিয়ে অবরোধ করা তো রীতিমতো পাগলামি।'

'পাগলকে একটু উৎসাহ দিলে তার পাগলামি যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য কী। ওদেরকে উৎসাহ দেবার লোক আছে। আপনি হয়তো জানেন কলিঙ্গ রাজ্যের সাথে আমাদের পুরানো শত্রুতা আছে। পুরানো সেই ক্ষত খুঁচিয়ে বের করার কোনো ইচ্ছেই এখন মহারাজ সাতকর্ণীর ছিল না। কিন্তু তাহলে চলবে কেন। আমাদের প্রধান শত্রু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। সেই শত্রুতা চাগিয়ে দিয়েছে। কলিঙ্গ সেনাকে তারাই ব্যবহার করছে।'

'কে আপনাদের প্রধান প্রতিপক্ষ?'

'শক রাজ্য। শক রাজ্যের মহারাজ নাহাপনা। তিনি আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন অনেক আগ থেকেই। আর সেই যুদ্ধ তিনি বাণিজ্য দিয়ে লড়তে চাচ্ছেন না। সমরেই লড়বেন।

তিনি খুব ভালো করেই জানেন, যদি সরাসরি তার বাহিনী নিয়ে সাতবাহন সেনার মুখোমুখি হন, তাহলে তার জয়ের কোনো আশা নেই বললেই চলে। তাই মিত্রের সাহায্য না নিয়ে তার কাছে অন্য কোনো উপায় নেই।'

'সাতবাহন রাজ্যের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে কোনো রাজ্যই বর্তমানে পারবে না।' নিজের মত অকপটে বললেন মহারাজ কারিকালা।

'হ্যাঁ। সেনা শক্তির হিসেব সেই কথাই বলে। আর তখনই মহারাজ নাহাপনা এক ভয়ংকর পরিকল্পনা করেন। প্রথমেই শত্রুর শত্রুকে বানিয়ে ফেললেন মিত্র। কলিঙ্গ রাজকে এমনি এমনি অবশ্য মিত্র বানাতে পারেননি। প্রচুর স্বর্ণ দিতে হয়েছে। আর সেই স্বর্ণের বিনিময়েই কলিঙ্গ সেনাকে মোতায়েন করেছেন আমাদের সীমানায়।'

'এখন একটু একটু যেন বুঝতে পারছি ওদের পরিকল্পনা।'

'হ্যাঁ, এখন আর পরিকল্পনা বুঝতে আপনার সমস্যা হবার কথা না। ওরা ভেবেছিল আমাদের সীমানায় কলিঙ্গ সেনার উপস্থিতির কথা জানতে পারলেই আমরা আমাদের সেনা নিয়ে কলিঙ্গ সেনাকে শায়েস্তা করতে যাবো। আর তখনই ওরা পরিকল্পনার পরের ভাগ নিয়ে কাজ করবে। তাদের সেনা নিয়ে যাত্রা করবে আমাদের পেছনে। আমরা তখন যুদ্ধে দুই সেনার মাঝে পড়ে যাবো। একা আমাদের সাথে নাহাপনা পারবেন না, সে ঠিক আছে কিন্তু কলিঙ্গ সেনা আর তাদের সেনা মিলিত হলে দুই দিক থেকে চেপে আমাদের বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলার একটা সম্ভাবনা আছে। তাই বিশেষ উপায়ে তারা কলিঙ্গ আর শক বাহিনীকে এক করতে চেয়েছিল।'

মহারাজ কারিকালার মাথায় এবার অন্য একটা ভাবনা এলো। প্রশ্নটা না করে পারলেন না তিনি, 'এখানে একটা ব্যাপার মাথায় আসছে না। যেহেতু কলিঙ্গ আর শকের মধ্যে মিত্রতা হয়েই গেছে তাই দুই বাহিনী একত্র হয়ে সাতবাহন বাহিনীকে সরাসরি আক্রমণ করলেই পারে। তাহলেই তো তারা সাতবাহনকে হারিয়ে দিতে পারে।'

'হ্যাঁ, সেটাও করা যেত। কিন্তু সাতবাহন সেনা তখন তাজা থাকতো। তখন দুই দল মিলেও হারাতে কষ্ট হয়ে যাবে। আর এভাবে ওদের দুটো উদ্দেশ্যই সফল হবে। এই পথে সাতবাহন বাহিনী দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যাবে, আর সেই ক্লান্ত বাহিনী গিয়ে পড়বে দুই বাহিনীর ঠিক মাঝে।'

'কিন্তু আপনারা তাদের এই পরিকল্পনা সফল হতে দেননি, তাই না?'

'ঠিক। আমরা এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

'তা তো পারবেনই। আপনার পাকা মাথা কি আর শত্রুর এই সামান্য চাল ধরতে পারবে না।'

বিনয়ের হাসি হাসলেন গিরিধারী, 'এবার কিন্তু আপনি একটু বেশিই প্রশংসা করে ফেলছেন।'

'না বেশি নয়। আপনার মাথার চালের ক্ষমতার কথা তো কয়দিন আগেই ভেন্নির প্রান্তরে আমি জানতে পেরেছি। সে যাক। শেষ পর্যন্ত কলিঙ্গ সেনা এসে বসে আছে সীমান্তে আর আপনারা সেনা নিয়ে যাত্রা করেননি। তাহলে তো বলতে হয় ওদের পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরা ওদের ফাঁদে পা দেইনি। কিন্তু ওরা তো চুপ করে থাকবে না। চাল পরিবর্তন করবে অথবা চালটা একটু বাড়িয়ে দেবে।'

'আপনার কী মনে হয়। এরপর কী করতে পারে কলিঙ্গ বাহিনী?'

গিরিধারী এবার কলিঙ্গের পরবর্তী কাজ সম্পর্কে নিজের ধারনার কথা বললেন, 'আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, শকরা পিছিয়ে যাবে না। তারা আমাদের বাহিনীকে প্রতিষ্ঠানা থেকে বের করার আরও চেষ্টা করবে। এবার আরও স্বর্ণের বিনিময়ে সাহসের মাত্রা বাড়বে কলিঙ্গ সেনার। ওরা আরেকটু আগে বাড়বে। তবে এবার আমার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে। আমরা ওদের ফাঁদে পা দেবো। কিন্তু শিকার হয়ে নয়, শিকারি হয়ে।'

'কলিঙ্গ সেনা সাহস বাড়াবে মানে?'

'মানে হচ্ছে এতদিন তো ওরা অমরাবতীর সীমান্ত অধিকার করে রেখেছিল। ভেবেছিল এতেই আমাদেরকে টেনে আনবে। কিন্তু তা তো কাজে লাগেনি। আমরা তো

বেরোইনি। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য তো আমাদেরকে বের করে আনতেই হবে। তাহলে এখন তারা কী করবে?'

'কী করবে?' মহারাজ কারিকালা গিরিধারীর প্রশ্নটাই আবার ফিরিয়ে দিলেন।

'ওরা আমাদের রাজধানী আক্রমণ করবে। ওরা জানে তাহলে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠানা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। এজন্যই ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে অমরাবতী অধিকার করা। আর তাতে তাদের কোনো কষ্ট হবে না। আমাদের তেমন কোনো সেনাই ওদিকে নেই।'

'তাহলে আপনারা এখনই কেন সেনা পাঠিয়ে অমরাবতী রক্ষা করছেন না। তাহলেই তো ওরা আর দখল করতে পারবে না।'

'এতক্ষণ তাহলে কী বোঝালাম। আমাদের সেনা এদিকে নিয়ে আসার মানে হচ্ছে সাতবাহন রাজ্যের পতন। এখানেই তো আমি আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'বুঝতে পেরেছি। তার মানে ওরা যখন আপনাদের রাজধানী অমরাবতী দখল করবে তখন আপনাদের সেনা হিসেবে কাজ করতে হবে চোলা বাহিনীকে। ওদেরকে আপনাদের হয়ে শিক্ষা দেবে চোলা বাহিনী।'

'একদম ঠিক বুঝেছেন। বলেছিলাম না, বুদ্ধিমান লোকের সাথে কথা বলেও শান্তি।'

কারিকালা নিজের বুদ্ধির প্রশংসার ধারে কাছেও গেলেন না, তিনি প্রসঙ্গের ঠিক মাঝে আছেন, 'না, ঠিক না। আপনি যা বলছেন সেই কাজ তো আর এত সোজা নয়। কলিঙ্গ বাহিনী সম্পর্কে পূর্ণ খবর আমার কাছেও আছে। তাদের বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী। ওরকম একটা বাহিনী যদি অমরাবতীর মতো একটা দুর্গনগরী দখল করে রাখে, তাহলে তো সর্বনাশ। ওরকম একটা বাহিনী যদি যুদ্ধের সময় দুর্গের আশ্রয় পায় তাহলে চোলা বাহিনী কোনো সুযোগই পাবে না। আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।'

এবার গিরিধারী কারিকালার দিকে একটু ঝুঁকে এলেন, 'আমার মাথাকে এত কাঁচা মনে করাও আপনার উচিত হয়নি।'

'আপনার মাথা যে কাঁচা নয় তা আমি জানি। তাহলে বলুন, অমরাবতীর দুর্গ অধিকার করে রাখা কলিঙ্গ সেনার সাথে যুদ্ধে জিততে আপনি কী বুদ্ধি বের করেছেন?'

'এতক্ষণ তো আমি ওদের পরিকল্পনার কথা বলেছি। আরে আমাদেরও তো কিছু পরিকল্পনা করতে হয়েছে মাথা খাঁটিয়ে। এমনি এমনি তো আর মাসিক পারিশ্রমিক নেই না। আপনি আমাকে মিত্র বলে মনে না করলেও আমি তো করি। আপনাকে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তার দিকে আমি তো আর ঠেলে দিতে পারি না। আপনাকে আসলে কেবল সেনা নিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধ তেমন একটা হবে না। এমনিতেই কলিঙ্গ সেনা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'কী বলছেন! যুদ্ধ ছাড়াই কলিঙ্গ সেনা ধ্বংস হয়ে যাবে! কী আপনার পরিকল্পনা?'

'এটা দেখুন।' এবার কাপড়ে মোড়ানো একটা তালপত্র বের করলেন তিনি। তালপত্রের ওপর স্পষ্ট একটা নকশা আঁকা। নকশাটা কারিকালার সামনে খুলে ধরলেন তিনি, 'এটা অমরাবতীর নকশা।'

নকশার ওপর ভালো করে দৃষ্টি বোলালেন মহারাজ কারিকালা। এখানে অমরাবতীর দেওয়াল ঘেরা জায়গাটা পুরো নির্দেশ করা হয়েছে।

'দেখুন মহারাজ। এই নকশায় দেয়ালের গায়ের আর স্তম্ভের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করা আছে। এই দুর্বল জায়গাগুলোতে আপনার সেনাবাহিনীর গোলক নিক্ষেপকরা যদি একযোগে গোলকের আঘাত করতে পারে, তাহলে সম্পূর্ণ দেওয়াল এক সাথে ধসে পড়বে। একবার চিন্তা করে দেখুন, তখন কী হবে। নিজেদের সবচেয়ে বড়ো সহায়তাই তখন কলিঙ্গ বাহিনী হারিয়ে ফেলবে। তাদের না থাকবে কোনো আশ্রয়, না থাকবে কোনো ব্যূহ। এরপরে আপনাদের সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারবে না। তা সে যত বড়ো বাহিনীই হোক।'

'তা ঠিক। পুরো দেওয়াল এক সাথে ধ্বংস করে দিতে পারলে কলিঙ্গ বাহিনী কোনো সুযোগই পাবে না। কিন্তু, আপনারা তো আর এই দেওয়াল শোলা দিয়ে বানাননি। আপনারা অবশ্যই জানেন এইসব জায়গা দুর্বল। তাহলে নিশ্চয়ই বানানোর সময় এগুলো শক্তিশালী করেই বানিয়েছেন। আমাদের লোহার গোলকের আঘাতে সেসব ভাঙবে কেন?'

'ভাঙবে, ভাঙবে। ঠিকমতো আঘাত করতে পারলে পৃথিবীতে সবই ভাঙে। শুনুন মহারাজ। আমাদের সাতবাহনের আগের মহামন্ত্রী এখন অমরাবতীর দায়িত্বে আছেন। তার কাছে এই নকশার আরেকটা প্রতিলিপি চলে গেছে। তিনি এই দেওয়াল খুব ভালো করেই চেনেন। আর আমাদের অমরাবতীতে বেশ দক্ষ কিছু কারিগর আছে। তারা নকশার এই জায়গাগুলো ঠিক মতো দুর্বল করে রাখবে। দেখে কিছুই বোঝা যাবে না, ওপরে প্রলেপ দেওয়া, ভেতরে ফোঁপরা। যে কারিগরেরা এই কাজ করবে তাদের পূর্বপুরুষরাই একদিন এই দেওয়াল বানিয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে কলিঙ্গের সেনাকে হারানোর সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এখন বাকিটা আপনাদের ওপর নির্ভর করবে।'

'আমাদের ওপর?'

'হ্যাঁ। আপনার গোলক নিক্ষেপকরা যথেষ্ট কুশলী না হলে তো কাজ হবে না। তারা সঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারবে তো?'

নিজের সেনার দক্ষতার প্রশ্ন আসায় কারিকালা একটু অসন্তুষ্ট হলেন। সেই অসন্তুষ্টি এড়িয়ে গেলেন অট্টহাস্যে, 'সেই চিন্তা করবেন না। আমাদের গোলক নিক্ষেপকরা ভূ-ভারতে অদ্বিতীয়। দেওয়ালের গায়ে যদি একটা মাছি বসে থাকে আর যদি সেই মাছি চোখে দেখা যায় তাহলে গোলক দিয়ে মাছিকে চাপা দিতে পারবে তারা। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি। তবে, এই একবার। আশা করি আপনাদের এমন কোনো সাহায্যের অনুরোধ ভবিষ্যতে আর আসবে না।'

'না, না। আর বিরক্ত করবো না। আপনি নকশাটা আরেকটু দেখুন। এখানে আরও কিছু জায়গা দেখানো আছে। এগুলোতে গোপন সুরঙ্গ খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা হবে। যখন আপনারা দুর্গের সামনে দিয়ে আক্রমণ করবেন, তখন এই পথগুলো দিয়ে আপনার বাহিনী পেছন দিয়ে নগরে ঢুকবে। দুই দিকের আক্রমণে ওদেরকে ধ্বংস করতে আপনার অর্ধ প্রহরের বেশি সময় লাগবে না।'

'তার মানে আপনি যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমাকে যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়েছেন। এখন কেবল কাজটুকু করতে হবে।'

'হ্যাঁ। আর আরেকটা কথা। আপনারা নিজেদের সাজ পরবেন না। সাতবাহন সেনাদের সাজ আর পোশাক পরে যুদ্ধ করবেন।'

'কেন? মহারাজ কারিকালা একটু অবাক হলেন।

'দুটো কারণে। প্রথমটা হচ্ছে, প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। ওরা ভাবতেও পারবে না এত তাড়াতাড়ি সাতবাহন সেনা ওদের আক্রমণ করেছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ইতিহাস এবং এই বর্তমান যাতে চোলা রাজ্য এবং আপনার মাথায় কোনো কলঙ্কের বোঝা না চাপায়। সবাই ভাববে সাতবাহন রাজ্য তাদের রাজধানী পুনুরুদ্ধার করেছে। আপনাদেরকে সাজ, পোশাক, নিশান, বাজনা সময় মতো সরবরাহ করা হবে।'

'আচ্ছা। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'আরেকটা ছোটো অনুরোধ করছি। আশা করি রাখবেন। দোষ তো শুধু কলিঙ্গ সেনার নয়। আসল অপরাধ কলিঙ্গ রাজের। তাকেও একটা শিক্ষা দিতে হবে। সেখানেও আপনারা সাতবাহনের পোশাক পরে থাকবেন। সেনা বিহীন কলিঙ্গ রাজ্যকে শায়েস্তা করে আসতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। মহারাজ আসাকা সাদার শির সহজেই আপনার তলোয়ারের ফলার স্পর্শ পাবে।'

'কাজ তো তাহলে দুটো হয়ে গেল। একটা বাড়তি।'

'আমরা সেই চিন্তাও করেছি। বাড়তি কাজের পুরস্কারও আছে। আপনারা কলিঙ্গ রাজ্য জয় করে ফিরে আসার পর অমরাবতীর সীমান্ত তীর ঘেঁষা সাতবাহনের পূর্ব সমুদ্র তট আপনার রাজ্যের অধীনে আমাদের উপহার হিসেবে চলে যাবে। জমির পরিমাণ নেহাত কম নয়। আর অন্য সুবিধাও পাবেন। বঙ্গ রাজ্যের সাথে ভবিষ্যতে আপনার বাণিজ্য বেশ ভালো হবে।'

'আমি রাজি, কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে।'

'কী?'

মহারাজ কারিকালা উঠে দাঁড়ালেন, 'শক সেনার কী হবে?'

'সেই চিন্তা আপনার নয়, আমাদের। আমরা ফাঁদে পড়ে যাবার ভান করে ওদের বের করে আনবো। তারপর ওরা নকল নয়, আসল সাতবাহন সেনার মুখোমুখি হবে।'

মনে মনে আরেক বার গিরিধারীর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন মহারাজ কারিকালা। তার কাকা ইরাম আজকে চেরায় আছেন। এখানে থাকলে দুই বুদ্ধিমানের আলাপ জমতো ভালো। তিনি যদিও তেমন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।

রাজ্য গুছানোর কাজ রেখে আরেকবার যুদ্ধের ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিতে হবে।

৮১

নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যাচ্ছে নাহাপনার সেনা। তিনি চলছেন একেবারে সামনে। পরিকল্পনা মতো সেনারা বিশ্রাম কম নিচ্ছে, গতি বাড়িয়ে রেখেছে। গুপ্তচর সামনে চলে যাবে সাতবাহন রাজ্যে ঢোকার পর, নিয়মিত শত্রুর সাথে তাদের দূরত্ব জানা থাকবে তাহলে। শত্রুকে একেবারে চেপে ধরতে হবে।

দুই দিন চলার পর বাহিনী পৌছালো পশ্চিম শক রাজ্যের একেবারে প্রান্তে। এখানেই পশ্চিম শক রাজ্যের সীমানা শেষ। নাসিক নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত জায়গাটা। এবার ভিন রাজ্যের মাটিতে সেনা যাত্রা করতে হবে। আর ভিন রাজ্যের মাটিতে সেনা যাত্রা করা শান্তির নিয়ম বিরুদ্ধ।

সেখানে পৌছেই সেদিনের দিনের আলো ফুরিয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনা মতো তারা একদিন পরপর বিশ্রাম নেবে। তাই আজ বিশ্রাম নেবার দিন। পুরো রাতটা সীমান্তেই বিশ্রাম নিয়েছে মহারাজ নাহাপনার সেনা।

ভোরের আভা যখন ফুটেছে তখনই মন্ত্রী সারথী চলে এলেন মহারাজ নাহাপনার শিবির কক্ষে। মহারাজ নিশ্চয়ই উঠে পড়েছেন। যুদ্ধ মাথায় নিয়ে কোনো রাজা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন না।

মহারাজ জেগেই ছিলেন। সারথী তার প্রশ্নটা সামনে রাখলেন, 'মহারাজ, এবার আমরা কোন পথে এগোবো? সাতবাহন রাজ্যের মাঝ দিয়ে নাসিক নগরীর পাশের পথ দিয়ে যাওয়া যায়, আবার ঘুরপথেও যাওয়া যায়।'

'ঘুরপথে কেন যাবো?' মহারাজ নাহাপনা আশ্চর্য হন। 'ঘুরপথে যাবার কোনো দরকার নেই। আমরা সোজা পথেই যাবো। সাতবাহন সেনা এখন অমরাবতীর দিকে যাচ্ছে। আমরা ওদের পেছনে যাবো। যুদ্ধ তো এমনিতেও হবে। আপনি কী ভাবছেন? ওদের সীমান্তে অনধিকার অনুপ্রবেশের জন্য আমাদেরকে তো আলাদা করে কোনো যুদ্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমি তাহলে সেনাপতিকে আপনার আদেশ পৌছে দিয়ে যাত্রা করার জন্য তৈরি হতে বলি?'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওদের সাথে আমাদের দূরত্ব খুব বেশি হয়ে গেলে কিন্তু সব পরিকল্পনা কেঁচে যাবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

নাসিকবাসী সকাল সকাল এই চলন্ত বিভীষিকার সামনে পড়ার কথা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। সাত সকালে লোকেরা নানা কাজে নগর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। নগর রক্ষকেরা চোখ ডলতে ডলতে নির্দিষ্ট জায়গায় পাহারা দিতে এসেছে, মন্দিরে বাজছে সকালের পূজার শঙ্খ। সেই সকালে নগর রক্ষকেরা আর প্রজারা দেখতে পেলো এক বিশাল সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে তাদের নগরের দিকে। এত বড়ো সেনা

দেখে ভয় পাওয়া বিচিত্র না। কয়েকজন নগর রক্ষক এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। দেখে দেখে ঢোঁক গেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না তারা।

সেনাদল একটু পরেই নগর আক্রমণ করবে। ওরা যতই কাছে আসছে ততই তাদের নিশানের নিশানা স্পষ্ট হচ্ছে। এরা শক সেনা। নগরের প্রত্যেক প্রাণী যেন শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে।

তবে তাদের শ্বাস পড়লো। সেটা একেবারে স্বস্তির শ্বাস। বাহিনী যেন তাদের নগরটা চোখেও দেখেনি। যেন কোনো এক মন্ত্র বলে তাদের নগর ওদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঈশ্বরের কৃপায় সেনাবাহিনী নগরকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। নগরের দিকে ফিরেও তাকাল না।

নগরীর পাশের প্রান্তর পার হয়ে একটা ছোটো জঙ্গল মতো আছে। সেই জঙ্গল পার হলে একটা অনেক বড়ো তৃণভূমি। মহারাজ নাহাপনা এখনও সেনার অগ্রে রয়েছেন। তার সামনের সৈন্যরা খবর এনে দিচ্ছে তাকে।

নাসিকের পাশ দিয়ে আসার সময় নগরীর ভয় পাওয়া চেহারা বেশ উপভোগ করেছেন তিনি। ঠিকই তো, প্রজার একটাই কাজ, রাজপুরুষদের ভয় পাওয়া। পুরো নগরী কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছিল। সেই ঘটনার রেশ হিসেবে একটা হাসি এখনও ঝুলে আছে তার ঠোঁটে।

তবে জঙ্গলের বাঁক পেরিয়ে তৃণভূমিতে বেরিয়ে আসতেই তার ঠোঁট থেকে সেই হাসি মুছে গেল। অনেকটা সামনে একটা বিশাল সেনাদল দাঁড়িয়ে আছে। না, রোদ এখনও অত চড়া হয়নি যে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মরীচিকা দেখতে হবে। এটা সেনাদলই। শক সেনার প্রায় দ্বিগুণ আকারের।

মহারাজ নাহাপনা স্তম্ভিত হলেন। ঘোড়া সহ দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রান্তরের ওপর। সামনের বাহিনীর উড়তে থাকা নিশানগুলো স্পষ্ট জানান দিয়ে দিচ্ছে এই বাহিনীর পরিচয়। সাতবাহন বাহিনী। কিন্তু, যে বাহিনীর পশ্চাৎ তাদের সামনে থাকার কথা, সেই বাহিনীর অগ্রভাগ কীভাবে তাদের দিকে ফিরে গেল, তা কিছুতেই মাথায় আসলো না মহারাজ নাহাপনার।

৮২

প্রান্তরের বাতাস যেন জানে পরিণতি। অমোঘ, যা থেকে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। নিয়তি ব্যাপারটাই এমন। সাতবাহন আর শকরা যে মুখোমুখি হবে তা তো প্রকৃতি অনেক আগ থেকেই জানে। তাই শক রাজা নাহাপনার মতো সে চমকে যায়নি।

প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে দুটো আরামদায়ক আসন পাতা হয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কাদের জন্য এই আসন। দুই পক্ষের মহারাজ মুখোমুখি বসবেন সেখানে। কোনো সেনা নেই আশেপাশে। দুই রাজাই নিজ নিজ মন্ত্রীর সাথে আসনের দিকে এগিয়ে আসছেন।

মুখোমুখি বসেছেন মহারাজ নাহাপনা আর সাতকর্ণী। দুই মন্ত্রীই নিজ নিজ রাজার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছেন। তাদের আসনের ব্যবস্থা করা হয়নি।

শুরুটা মহারাজ সাতকর্ণীই করলেন, 'মহারাজ নাহাপনা। শক রাজ্য থেকে কখনো আপনি আমার রাজ্যে এর আগে আসেননি। এবারই প্রথম এলেন। আপনাকে রাজকীয় সম্ভাষণ জানানো আমার জন্য রাজ কর্তব্য। তবে দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, সেই কাজটা আমি করতে পারছি না।'

শকরাজ নাহাপনা ভেতরে ভেতরে যে ভয় পেয়েছেন তা থেকে এখনও উঠতে পারেননি। ভয়ের চেয়েও বেশি চমকেছেন তিনি, 'আমি কিন্তু আপনাকে সম্ভাষণ জানিয়ে রাখছি।'

'বেশ। তবু আমি জানাতে পারছি না। আপনি সম্পূর্ণ শক বাহিনী নিয়ে আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এই বাহিনী শোভা যাত্রা করতে আসেনি, যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে আছে। কোনো পর-রাজ্যের সীমানায় সম্পূর্ণ সজ্জিত সেনা নিয়ে প্রবেশের মানে নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন করে বোঝাতে হবে না। আপনি সাতবাহন রাজ্য আক্রমণ করেছেন।'

'আপনারও কিন্তু পুরো সেনা সজ্জিত অবস্থায় আছে।' স্বর আর মাথা পুরোটাই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মহারাজ নাহাপনার।

'হ্যাঁ মহারাজ নাহাপনা। আমার সেনা পুরো সজ্জিত অবস্থায় আছে। সাতবাহন সেনা অবশ্য সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। আপনি কী ভেবেছিলেন, আমরা গা এলিয়ে শুয়ে থাকবো, আর আপনি কেবল সেনা নিয়ে এসে বিজয় নিশান উড়িয়ে চলে যাবেন?'

'আমি কী ভেবেছিলাম সেটা আপনার জানার কথা নয়। এটা সত্যি, আপনার সীমান্তে আমি সেনা নিয়ে প্রবেশ করেছি। কিন্তু, একটা কথা অস্বীকার করতে পারবেন না, আমি এখনও আক্রমণ করিনি।'

'তা করেননি।' একমত হলেন মহারাজ সাতকর্ণী।

নিজের মতের পক্ষে আরেকটা কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না মহারাজ নাহাপনা, 'ভেবে দেখুন, এখানে আসার সময় নাসিক নগরী আমার সামনেই পড়েছিল।

আমার যদি আক্রমণ করার ইচ্ছে থাকতো তাহলে তো আমি নাসিক নগরীই আক্রমণ করতে পারতাম। তা কিন্তু আমি করিনি। ওদিকে চোখ তুলেই তাকায়নি আমার সেনারা।'

মহারাজ সাতকর্ণী এবার আর কথা খুঁজে পেলেন না। মহারাজ নাহাপনা মোটামুটি শক্ত যুক্তি দিয়েছেন। যুক্তির প্রশ্ন যখন এসেই পড়লো তখন গিরিধারী আর চুপ থাকতে পারলেন না। মহারাজের পেছন থেকে বলে উঠলেন,

'ক্ষমা করবেন মহারাজ নাহাপনা। আপনার অনুমতি ছাড়াই এখানে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। পুরোপুরি সজ্জিত কোনো সেনা নিয়ে অনুমতি ছাড়া কোনো রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করাই আক্রমণ করার শামিল। নীতি শাস্ত্র তাই বলে। আলাদা করে এখানে আর সহিংসতা চালাবার দরকার পড়ে না।'

গিরিধারীর যুক্তি অব্যর্থ। মহারাজ নাহাপনা তবু বেঁচে যাবার শেষ চেষ্টা করলেন, 'না, আমার সেনার সাতবাহনে অভিযান চালানোর কোনো ইচ্ছে নেই। আমরা শুধু সাতবাহনের পথ ব্যবহার করছি।'

'পথ হিসেবে ব্যবহার করছেন?' এবার মহারাজ সাতকর্ণী প্রশ্ন করলেন, 'কোনদিকে যাচ্ছেন আমাদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে?'

জবাবটা মহারাজ নাহাপনা আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলেন, 'কলিঙ্গ রাজ্যের দিকে। কলিঙ্গ আক্রমণ করার জন্যই যাচ্ছি আমরা।' মহারাজ নাহাপনার গলার স্বর শান্ত। চোখের পলক পড়ছে না। একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে আছেন মহারাজ সাতকর্ণীর চোখের দিকে।

'বাহ।' হেসে উঠলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'ভালো রাস্তাই আপনি ব্যবহার করছেন কলিঙ্গ রাজ্যে যাবার।'

হাসিটা একটু গিরিধারীর মুখেও এসেছে, 'বলতেই হচ্ছে আপনি সোজা রাস্তা রেখে একটু ঘুরপথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এই সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করে তো আপনার কোনো লাভ হবে না।'

'কেন?' মহারাজ নাহাপনা একটু অবাক হলেন।

'কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করে আপনার কোনো লাভ নেই। ক্ষয়িষ্ণু একটা রাজ্য। কোনো সম্পদ নেই। কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য নেই। পূর্বের জমি দখল করে আপনার শক রাজ্যের কোনো লাভ হবে না। তাই বলছিলাম।'

গিরিধারীর কথার সাথে মহারাজ সাতকর্ণী যোগ করলেন, 'আর আমার জানা মতে কলিঙ্গ সেনা তো এখন কলিঙ্গে নেই। তারা আমার আরেক রাজধানী অমরাবতী দখল করেছে। আর যতটুকু জানি, এই কাজটা তারা করেছে আপনারই নির্দেশে।'

কথাটা বলার সময় চোখের দৃষ্টি প্রচণ্ড তীব্র হয়ে উঠলো মহারাজ সাতকর্ণীর, 'মহারাজ নাহাপনা, বুঝতেই পারছেন, আপনার সকল চালের কথা আমরা আগে থেকেই জানি। আপনি কখন কী করছেন, কখন কী করবেন, সেসব হিসেব আমাদের আগে থেকেই করে রাখা আছে। মিছে লুকোচুরি খেলে এখন আর লাভ নেই। অদৃষ্টকে এখন আর আপনি কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

নাহাপনা বুঝতে পারলেন আর কিছু বলে লাভ হবে না। তিনি যাদের বোকা বানাতে চাচ্ছিলেন, তারা অনেক আগেই তাকে বোকা বানিয়ে রেখেছে। গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠলো তার, 'যা হবার হয়ে গেছে। আপনি আমাকে চলে যেতে দিন। আমি আমার সেনা নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবো। অহেতুক রক্তপাত হোক এটা আমি চাই না, নিশ্চয়ই আপনিও চান না। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে ত্য আমরা দুই পক্ষই ভুলে যাবো। ভবিষ্যতে আমরা দুজনের কেউই আর কখনো কারো পথ মাড়াবো না।'

মহারাজ সাতকর্ণী হাসলেন, 'না মহারাজ। এভাবে আপনাদের ছেড়ে দেই কী করে। এভাবে তো আর এত সজ্জা ব্যর্থ করে দিতে পারি না। একবার কুরুক্ষেত্রে এসে যখন পড়েছেন যুদ্ধ তো আপনাকে করতেই হবে। কলিঙ্গ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হলো না তো কী হয়েছে, আমরা তো আছিই। আপনার যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেবে সাতবাহন বাহিনী।'

মহারাজ নাহাপনা কিছুই বললেন না। এখানে সন্ধি, সমর্পণ কোনো উপায়ই কাজ করবে না।

মহারাজ সাতকর্ণী বললেন, 'কী হলো মহারজা নাহাপনা। শেষ সময়ে এসে ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাওয়ার কী আছে? এতদিন যে কর্ম করেছেন তার ফল তো এখন আপনাকে ভোগ করতেই হবে। পরিণতির সামনে একদিন সবাইকেই দাঁড়াতে হয়, তা সে যে রাজাধিরাজই হন না কেন।'

এবার শক্ত হলেন মহারাজ নাহাপনা। এভাবে দুর্বলতার অভিনয় করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শক বাহিনীও ফেলে দেবার মতো নয়। তিনিও এবার হাসি ফিরিয়ে দিলেন, 'আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, শকরা ভয় কী জিনিস সেই বিদ্যা কখনোই শিখতে পারেনি। অহেতুক রক্তপাত এড়ানোর জন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। আপনি তো অন্য মানে ধরে নিয়েছেন। ভুলে যাবেন না, সেই সুদূর পাহাড়ি পাথুরে রাজ্য থেকে এসে যুদ্ধ করেই আমরা এই ভারতে নিজেদের আসন পাকা করেছি। কেউ আমাদেরকে দয়া করেনি। আপনাদের মতো পূর্বপুরুষদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি আমরা অনায়াস অধিকারে নিয়ে ভোগ করছি না।'

'তাও ঠিক। আপনাকে ভয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাই আমার ভুল হয়েছে।' মহারাজ সাতকর্ণী আলোচনার ইতি টানলেন, 'এই রোদের মধ্যে সবাইকে অস্ত্র রেখে শুধু শুধু আলোচনা চালিয়ে যাবার কোনো মানে নেই। শুনুন মহারাজ, এখন আপনার সামনে দুটো উপায় খোলা আছে। সেনা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারেন। তখন আমি আমার সেনা নিয়ে আপনাদের তাড়া করবো। পিঠে আঘাত পেয়ে মরতে হবে আপনাদের। আমাদের সাথে সামনা সামনি যুদ্ধও করতে পারেন। তাহলে বুকে আঘাত পেয়ে মরবেন। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, বুকে আঘাত পেয়ে মরবেন, না-কি পিঠে।'

আলোচনা শেষ। মহারাজ নাহাপনাও নিজের শেষ কথাটা বললেন, 'একটু ভুল হলো আপনার মহারাজ। এখানে তৃতীয় আরেকটা উপায়ও আছে। আর সেটা হচ্ছে, প্রতিপক্ষের বুকে আঘাত করা। আমরা সবসময় সেটাই করে এসেছি, এবারও তাই করবো।'

দুই মহারাজের কেউই আর কোনো কথা বললেন না। আলোচনা শেষ। কোনো সন্ধি হবে না, শর্ত হবে না, জরিমানা হবে না। কেবল যুদ্ধ হবে। এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হলো আসলে।

দুই মহারাজ নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে যার যার শিবিরের দিকে চলে গেলেন। রয়ে গেলেন দুই মন্ত্রী। তাদের এখন কিছু কাজ আছে। না, তাদের মধ্যে আর বাক্যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ শুরু করার আগে মন্ত্রীদের কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিছু নিয়ম ঠিক করে নিতে হয়। যুদ্ধের শুরুর সময়, শেষের সময়, বিরতির নিয়ম, বিশেষ নিয়ম সবকিছু নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে লাগলেন তারা। এই নিয়মের কথা কেবল মুখেই আটকে থাকবে না, রীতিমতো লেখা হচ্ছে। যুদ্ধ আজই শুরু হবে। যদিও দিনের আলোর স্থায়িত্ব তেমন বাকি নেই।

আবশ্যিক কাজে দেরি করলো না কোনো পক্ষই। নিয়মনীতি ঠিক হয়ে গেছে। শক শিবিরে মহারজা নাহাপনা সকল সেনাপতিদের নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য মন্ত্রণায় বসেছেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার সেনার তিন ভাগের এক ভাগ আজকে যুদ্ধের ময়দানে নামবে। আপনারা কী মত দেন?'

সকল সেনাপতিই সায় দিলো। প্রথমে তিন ভাগের এক ভাগ পাঠালেই চলবে। যদি শত্রু অতিরিক্ত সেনা পাঠায় তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে।

সেনার আকারের ব্যাপারটা মিটে যেতেই এবার অ্যালেক পরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো সবার মাঝে, 'আমাদের ব্যূহ কী হবে?'

মহারাজ নাহাপনা তার দিকে তাকালেন, তিনি জানতেন এই প্রশ্নটা অ্যালেকের কাছ থেকেই আসবে। সেনাদলের মধ্যে ভারতীয় এবং গ্রীক দুই রকমেরই ব্যূহ রচনার জ্ঞানে সে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিজের মত দিলেন মহারাজ নাহাপনা,

'সাধারণ কোনো ব্যূহ রচনা করে এই সাতবাহন সেনার কিছুই করা যাবে না। সাতবাহন সেনার ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের সেনা বিসর্জন দিতে পারি না। আমাদের সেনা সংখ্যা অনেক কম। তাই এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যাতে আমরা কচুকাটা হয়ে যাই।'

'তাহলে আমরা কী করবো?' এক সেনাপতি প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের হাতের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র প্রথমেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।' মহারাজ নাহাপনা মত দিলেন।

অ্যালেক বুঝতে পেরেছে, 'সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ব্যবহার করাই ভালো। এই অস্ত্র আমাদের হাতে অনেক আছে।'

নাহাপনা মাথা নাড়লেন। তার সেনার সবচেয়ে বড়ো গুণ ব্যবহার করে শুরুতেই সাতবাহনের মনে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। তার সেনা গ্রীক আর ভারতীয় দুই বিষয়েই অভিজ্ঞ। সাতবাহন সেনা নিশ্চয়ই গ্রীক যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে কিছুই জানে না, আজকে টের পাবে সাতবাহন।

চিন্তারত অবস্থায় সাতবাহন শিবিরে বেজে ওঠা রণশঙ্খের আওয়াজ ঠিকই মহারাজ নাহাপনার কানে এসে পৌছাল। সেই ভয়ানক মিলিত ধ্বনি তার পুরো ভেতরটা যেন

নাড়িয়ে দিয়েছে। শিবিরের তাঁবুর ভেতরে তিনি আর থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

সাতবাহন সেনা পুরোপুরি প্রস্তুত। তাদের ব্যূহের দিকে এবার নজর দিলেন মহারাজ নাহাপনা। ব্যূহটা প্রথমবারের দেখাতেই চিনতে পারলেন তিনি।

প্রতিপক্ষ বজ্র ব্যূহ রচনা করে তাদের আক্রমণ করবে। বিশাল আকারের সেনাকে বজ্রের আকারে সাজানো হয়েছে। নাহাপনা জানেন, বজ্র ব্যূহ যুদ্ধের ময়দানে খুবই বিপজ্জনক ব্যূহ যদি না ঠিকমতো সামলানো যায়। তিনি ঘাবড়ে গেলেন না। এই ভারতীয় যুদ্ধ কলায় ব্যবহৃত সকল অস্ত্রেরই প্রতিকার তার জানা আছে।

অ্যালেকের দিকে তাকালেন তিনি। গ্রীক সেনাপতির নির্দেশে তাদের ব্যূহ তৈরি হয়ে এসেছে প্রায়। তারা বজ্র ব্যূহের প্রতিকারই রচনা করেছেন। সর্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করে বজ্রের জবাব দেবে শক বাহিনী।

শক পক্ষেও এবার রণ বাজনা বেজে উঠলো। সাতবাহন সেনা আগেই ব্যূহ যাত্রা করেছে। এবার নড়ে উঠলো শক সেনা। দুই সেনা একে অপরের দিকে এগোচ্ছে। দুদলের মধ্যে প্রায় এক গব্যুতি দূরত্ব। দুই দলেরই বিপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে সহস্র ধনু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

এবার দুই পক্ষের অলস সেনা, রাজা, সেনাপতি আর মন্ত্রীদের নজর ক্ষেত্রের ঠিক মাঝ বরাবর। মহারাজ সাতকর্ণী ঘোড়ার ওপরে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি সামনের দিকে অগ্রসরমান নিজের সেনার ওপর নিবদ্ধ।

রুদ্রদেব তার একটু পেছনে বসে আছে নিজের ঘোড়ায়। সে নিরুদ্বিগ্ন নজরে দেখছে সবকিছু। একটু পরেই বোঝা যাবে কার ওজন কেমন।

রুদ্রদেবের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মহারাজ সাতকর্ণী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বুঝছ তুমি?'

'আমাদের বজ্র ব্যূহের বিপরীতে প্রতিপক্ষ তৈরি করেছে সর্বতোভদ্র ব্যূহ। আমাদের গতি তীব্র হবে, তাদের হবে ধীর। এই সুবিধা আমরা পাবো। তবে আক্রমণে আমাদের সেনা তেমন সুবিধা করতে পারবে না। সর্বতোভদ্র ব্যূহের সেনা নিধন করা অনেক শক্ত।'

'আজকের এই দুই ব্যূহের লড়াইয়ে কার জয় হবে বলে মনে হয়?'

'মহারাজ, কার্য শুরু হবার আগেই ফল নিয়ে চিন্তা করতে চাচ্ছি না। আমাদের এখন নজর রাখতে হবে সামনের দিকে। বিপক্ষের একটা লক্ষণ আমার সুবিধার মনে হচ্ছে না। যতই ওরা সামনের দিকে এগোচ্ছে ততই আমার মনে খটকা বাড়ছে।'

বিপক্ষদলের দিকে এবার নজর দিলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'কী খটকা লাগছে তোমার?'

'মহারাজ, একবার মনে করুন সর্বতোভদ্র ব্যূহের শাস্ত্রসম্মত গঠনের কথা। এই ব্যূহে প্রথমে বর্শাধারী থাকার নিয়ম, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর থাকবে পদাতিক তলোয়ারের সাথে। কিন্তু এখানে তারা সেই নিয়ম মানেনি। তাদের ব্যূহের গঠনই কেবল সর্বতোভদ্রের মতো। অস্ত্রের সজ্জা সম্পূর্ণ আলাদা। এটাই আমার মনে সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে।'

এবার মহারাজ সাতকর্ণীও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ঠিকই তো। অস্ত্রসজ্জা এভাবে কেন করেছেন।

ওদিকে রুদ্রদেবের নজরে আরও কিছু ব্যাপার ধরা পড়েছে, 'মহারাজ, তাদের বাইরের দিকের সৈন্যদের হাতে এক অদ্ভুত রকমের বর্শা দেখতে পাচ্ছি। সেই সেনাদের হাতে থাকা ঢালের আকারও অনেক বড়ো। অগ্নি পুরাণে সব ধরনের সমরাস্ত্র বানানোর কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্শা, এই ঢাল সেই নিয়ম অনুযায়ী বানানো হয়নি, আমি নিশ্চিত।'

'তার মানে কী হতে পারে? শত্রু কি আমাদের অজানা কোনো কৌশলে আক্রমণ করতে যাচ্ছে?'

'ওরা সর্বতোভদ্রের মূল নিয়ম মানেনি। ওরা অগ্নি পুরাণের নিয়মও মানেনি। এবং অবশ্যই শত্রু উন্মাদ অথবা বোকা নয়। এর একটাই মানে হতে পারে। শত্রুর মনে অন্য পরিকল্পনা আছে।'

'কী হতে পারে সেই পরিকল্পনা?'

'তা আমি বুঝতে পারছি না। আর এই সময়ে তা বোঝা সম্ভবও না। তবে আমার মনে বলছে একটু পরেই সেই ব্যাপারটা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাবো।'

'শত্রুর অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে। এটা তো আমাদের বজ্রের সেনাপতিকে জানিয়ে দিতে হবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আপনি এখনই চার মাত্রার ভেরী বাজানোর নির্দেশ দিন। বজ্রের সেনাপতিকে অবশ্যই সর্বোচ্চ মাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে।'

মহারাজ সাতকর্ণীর হাত ওপরে উঠে ইশারা করলো। বাদকেরা সেই নির্দেশ বুঝতে পারলো সাথে সাথে। তীব্র শব্দে বেজে উঠলো সেই ভেরী।

অগ্রসরমান সাতবাহন সেনাপতি বুঝতে পেরেছে তাকে সতর্ক হতে বলা হয়েছে। ঘোড়ার ওপর থেকে প্রতিপক্ষের সেনার ওপর ভালো করে দৃষ্টি বোলাল সে। কই না, অধিক সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে তেমন কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না।

দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে দুই দলের। সামনে শত্রু পেয়ে দুই দিকেরই গতি বেড়ে গেছে। সাতবাহনের বজ্র এগোচ্ছে নিখুঁত গতিতে, আকৃতি একটুও না টালিয়ে।

ঠিক তখনই ঘটলো সেই আশ্চর্য ঘটনা। সাতবাহন শিবিরের প্রত্যেক সদস্যকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ করেই প্রতিপক্ষের ব্যূহ সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। সেটা আকার নিতে লাগলো সম্পূর্ণ নতুন এক আকৃতির।

বজ্রের সেনাপতি এবার ধন্দে পড়লো। এতদিনে ছোটো বড়ো কম যুদ্ধ করেনি সে। কিন্তু প্রতিপক্ষের সামনে পড়ার ঠিক আগে কাউকে ব্যূহ ভাঙতে দেখেনি সে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ের চেয়েও হতবুদ্ধিতা খারাপ ফল বয়ে আনে। সাতবাহন সেনাপতি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

সাতবাহন শিবিরের প্রত্যেক মানুষের চোখ এখনও পলকহীন। বজ্র ব্যূহ যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে সেই গতি রোধ করা এখন একেবারেই অসম্ভব।

ব্যূহকে থামাতে চেষ্টা কম করলেন না সেনাপতি। তার চিৎকার আর আস্ফালনে বজ্রের গতি বেশ একটু কমে এলো। তবে পরমুহূর্তেই সেনাপতির মাথায় নতুন এক বুদ্ধি খেলে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহবিহীন সেনার মতো সহজ শিকার আর কোথায় পাওয়া যাবে? আজ এই খণ্ড যুদ্ধ জিতে সম্পূর্ণ গৌরব নিজের কাঁধে নিতে হবে। আবার বেড়ে গেল বজ্রের গতি।

এখানেই একটা ভুল করে ফেলেছে সাতবাহন সেনাপতি। শক সেনা ব্যূহহীন হয়নি। অস্বাভাবিক দ্রুততায় শক সেনা এমন এক ব্যূহ রচনা করলো সেটা এর আগে সাতবাহন সেনাপতি দেখা তো দূরে থাক এই ভারতের কেউই দেখেনি। এই সেই গোপন অস্ত্র যার ভরসায় মহারাজ নাহাপনা এই অসম যুদ্ধে জয়ের অভিলাষ করছেন।

শক সেনার সবগুলো ঢাল আর বর্শা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে কেন্দ্রের দিকে চতুর্মুখি অনেকগুলো সারি। চতুর্ভুজ আকারে বর্শা বাড়িয়ে রাখা হয়েছে ঢালের মাঝ দিয়ে। প্রথম দুই সারির বর্শা ঢালের ওপর দিয়ে ভূমির সাথে সমান্তরালে আর তৃতীয় আর চতুর্থ সারির সেনারা নিজদের বর্শা ভূমির সাথে অর্ধ লম্ব কোণে বাগিয়ে ধরে রেখেছে।

রুদ্রদেব ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে এই অদ্ভুত ব্যূহের দিকে। এমন ব্যূহ যুদ্ধ শাস্ত্রে নেই নিশ্চিত। তবে শাস্ত্র কেবল মানুষকে নিজের নিয়মই শেখায় না, যে শাস্ত্র ঠিকমতো অধ্যয়ন করে তার মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতাও তৈরি করে। রুদ্রদেবের মাথায় তড়িৎ গতিতে চিন্তার সুতো ঘোরা শুরু হয়ে গেছে। এই ব্যূহ কীভাবে যুদ্ধ করবে? কী হবে তার শক্তি? আর কিবা হবে দুর্বলতা?'

গ্রীকদের বিখ্যাত ব্যূহ তৈরি করেছে শক সেনা। মন্থর কিন্তু শক্তিশালী পদক্ষেপে সেই ব্যূহ চলতে লাগলো শত্রুর দিকে। অ্যালেক সব দেখে সন্তুষ্ট হলো। বেশ ভালো ব্যূহ তৈরি হয়েছে। এই ব্যূহ যেনতেন কোনো সজ্জা নয়। গ্রীসের মধ্যেও যে যোদ্ধাদের লোকে সম্মানের চোখে দেখে সেই স্পার্টানদের গৌরবের প্রতীক এই ব্যূহ। অজেয় ও অদম্য।

সেই ব্যূহ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সাতবাহনের বজ্র ব্যূহের দিকে। সংঘাতের প্রথম ধাপেই বজ্র ব্যূহ একেবারে ভেঙে পড়লো। কোনোভাবেই শত্রুর এগিয়ে আসা থামাতে পারলো না সাতবাহন বাহিনী।

কোনো রকমেই কিছু হচ্ছে না। এবার আক্রমণ বাদ দিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষায় মন দিলো সাতবাহন সেনাপতি। তাতেও খুব একটা সফলতা এলো না। প্রতিপক্ষের লম্বা বর্শা যেন একেবারে চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে। আর সেই বড়ো ঢাল এড়িয়ে প্রতিপক্ষের সেনার গায়ে কোনো আঘাতই করা যাচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যূহ সম্পর্কে আস্তে আস্তে ভয় বাড়তে লাগলো সাতবাহন সেনাপতির মনে। কোনো প্রতিকারই তার মাথায় নেই।

গ্রীক ব্যূহ এগোচ্ছে অবিচল। সাতবাহনের সেনাদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ব্যূহ। বর্শা হাঁকাচ্ছে সামনের চার সারি সেনারা। একেবারে এক গতিতে, একই ছন্দে। এই আক্রমণের কোনো জবাব হয় না।

সাতবাহন সেনার সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া যখন শুধু সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল ঠিক তখনই সূর্যের দিকে খেয়াল হলো সবার। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে এখন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আলো নেই। সাতবাহন শিবির থেকে জলদি যুদ্ধ সমাপ্তির বাজনা বেজে উঠলো। সেই বাজনা কানে গেল মহারাজ নাহাপনার। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে, 'সূর্যও কি ওদের পক্ষে যুদ্ধ করছে না-কি। কী সুন্দর আজকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাতবাহনের অর্ধেক সেনা রক্ষা করলো সে।'

সাতবাহন সেনার অবস্থা আর না বললেও চলে। ব্যূহ একটুও না ভেঙে শক বাহিনী পিছিয়ে গেছে নিজেদের শিবিরের দিকে। সাতবাহনের ব্যূহ অনেক আগেই ভেঙে গেছে। আজকে বজ্র ব্যূহে যত সেনা এসেছিল তার অর্ধেকই নিহত হয়েছে। আহতদের আর্তনাদ ভেসে আসছে আর সেই সাথে প্রতিপক্ষের উল্লাস। দুটোই সাতবাহন পক্ষের সবার বুকে শর হয়ে বিঁধছে। ক্লান্ত আর অবসন্ন সেনারা ফিরে আসতে লাগলো শিবিরে।

সন্ধ্যের পরেও কাজ আছে। মৃতদেহ সরিয়ে ক্ষেত্রকে কালকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আহতদের সরিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সব শেষে গভীর রাতে হবে মৃতদেহের সৎকার। সবগুলো কাজেই আজকে শকদের তুলনায় সাতবাহনের লোকদের কয়েক গুণ বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

মহারাজ সাতকর্ণী নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন ক্ষেত্রের দিকে। তার কাছে নতুন এই অভিজ্ঞতা। এই জীবনে শত্রুর কাছে এমন ভাবে কখনো পরাস্ত হননি তিনি। এই মারাত্মক ব্যূহ কখনো দেখেননি। কী প্রতিকার আছে এই ব্যূহের? শাস্ত্র বহির্ভূত এই ব্যূহের জ্ঞান ওরা পেলো কোথায়?

একটু দূরে ঘোড়ার ওপর অনড় বসে থাকা রুদ্রদেবের মাথায়ও ঠিক একই ভাবনা চলছে।

৮৩

সভা বসেছে সাতবাহন শিবিরে। সেনাপতিরা আছে, মন্ত্রীরা আছেন, অমাত্য যারা যুদ্ধ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে ওস্তাদ তারাও আছেন। তবে কারো মুখ থেকেই কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না। যে দৃশ্য তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একটু আগে আলো থাকতে দেখেছে সেই দৃশ্য যেন এই অন্ধকারেও তাদের তাড়া করছে। মহারাজ সাতকর্ণী সবার দিকেই তাকাচ্ছেন এক এক করে। না, কারো মধ্যেই কথা বলার কোনো লক্ষণ নেই।

'এভাবে চললে তো সাত দিনে আমার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা যেই ব্যূহ আর অস্ত্র নিয়েই এগোই, ওদের ব্যূহের সামনে তো কিছুই খাটবে না।' কেউ কথা বলছে না দেখে মহারাজ সাতকর্ণীই শুরু করলেন।

এই উক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করার লক্ষণ কোনো সেনাপতির মাঝেই দেখা গেল না। আজকে যে পরিমাণ সেনা মারা গেছে, তা শুধু অর্ধ দিনে। পুরো সাতদিন যুদ্ধ হলে পুরো সেনাই ধ্বংস হবে। গণিতের সহজ হিসেব করলে তাই দাঁড়ায়।

তবে মহারাজের এমন উক্তির পর সেনাপতিদের কেউ কিছু না বললে ভালো দেখায় না। সাতবাহন সেনাপতিদের মধ্যে বয়স্ক একজন মন্তব্য করলেন, 'এমন যুদ্ধ কে কবে দেখেছে? সেই আদিকাল থেকে মানুষ মানুষের সাথে যুদ্ধ করেছে, দেবতাদের সাথে করেছে, রাক্ষসের সাথে করেছে, অসুরের সাথেও করেছে। দেবতা আর অসুরদের যুদ্ধও আমরা কম দেখিনি। কিন্তু এমন ব্যূহ কে কবে দেখেছে?'

কারো মুখে কোনো জবাব নেই। কেউ এমন ব্যূহ দেখেনি।

'রাম-রাবনের যুদ্ধে, মহাভারতের সেই মহাযুদ্ধে কত রকমের ব্যূহ আর অস্ত্রের কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু কই, এমন কোনো ব্যূহের কথা তো শুনিনি। কোন শাস্ত্র থেকে ভারতের বুকে এমন ব্যূহ রচনা শিখলো শক বাহিনী?' বয়স্ক সেনাপতি নিজের কথা শেষ করলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বলে মনে হলো।

মহারাজ সাতকর্ণী ক্রমাগত সমস্যার কথা শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, এবার কিছু হলেও সমাধান দরকার, 'এই ব্যূহের প্রতিকার আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি। এখানে যেসব শাস্ত্র বিশারদরা আছেন, তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, কোন শাস্ত্রে এমন ব্যূহের কথা বলা আছে। এই জ্ঞানের প্রতিকার আমাদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

রুদ্রদেব এতক্ষণ কিছুই বলেনি। এবার সে নিশ্চিত হয়েছে, না, যাদের কথা বলার কথা তাড়া তাদের মত দিয়ে দিয়েছে। এবার সে কথা বলতে পারে, 'মহারাজ, অনুমতি পেলে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

মহারাজ সাতকর্ণী তাকালেন তার দিকে। তার চোখে একটু হলেও ভরসা ফিরে এসেছে। রুদ্রদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে সবাই কথা বলার জন্যই জড়ো হয়েছে। যা বলার নিঃসংকোচে বলো।'

রুদ্রদেব এবার উঠে দাঁড়িয়ে সভার মাঝখানে দাঁড়ালো, 'সবাইকে উদ্দেশ্য করে সম্মান জানাচ্ছি। তারপর বলছি, আমাদের চোখ এখনও ধাঁধিয়ে আছে। আমরা একটু আগে দেখা শত্রুর যুদ্ধ কৌশল নিয়ে এতটাই মগ্ন আছি, তার জন্য নিজেদের চিন্তা করতে পারছি না। আমাদের প্রথমে মস্তিষ্কের উত্তেজনা কমিয়ে আনতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে এখনও হতে পারেনি, যার কোনো সমাধান নেই।'

রুদ্রদেবের দৃষ্টি সবার ওপর থেকে এক পাক ঘুরে এলো, 'প্রথমেই বলে নিচ্ছি, এই ব্যূহের জ্ঞান আমাদের শাস্ত্রে নেই। এতে আমি শতভাগ নিশ্চিত। তাই শাস্ত্র বিশারদদের দিয়ে শাস্ত্র ঘাঁটানোর কাজটা না করাই ভালো হবে। এটা এই ভূ-ভারতের বাইরের বিদ্যা।'

এই কথার পর শোরগোল উঠলো সেনাপতিদের মাঝে। কে এই মূর্খ। এলো কোত্থেকে? সনাতন যুদ্ধ কৌশল কত সুপ্রাচীন। স্বয়ং দেবতারা এসব কৌশল শাস্ত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এর বাইরে কোনো জ্ঞান কীভাবে থাকতে পারে?

সবাই বলাবলি করছে এসব। মহারাজ সাতকর্ণী সবাইকে চুপ করতে বললেন। ঘরে নীরবতা নেমে এলো। মহারাজ সাতকর্ণী রুদ্রদেবের উক্তি সহজভাবে নিতে পারেননি। তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি রুদ্রদেবের দিকে, 'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ, স্পষ্ট করে বলো। সনাতন, অনিত্য শাস্ত্রের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করছ তুমি। শাস্ত্রের অপমান হচ্ছে।'

'না, মহারাজ। আমি শাস্ত্রের অপমান করছি না। পরমেশ্বরের অস্তিত্বে কোনো সন্দেহও প্রকাশ করছি না। সনাতন শাস্ত্র নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ কথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না, সনাতন ধর্ম শুধু এই ভূখণ্ডে সনাতন। এখন তো আমরা জানি, পৃথিবীতে কেবল এই ভূখণ্ডই একমাত্র নয়।'

এই কথার উত্তরে কেউই কিছু বলতে পারলো না। একজন কেবল বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, এর বাইরের সবাই তো ম্লেচ্ছ জাতি।'

'ঠিক।' রুদ্রদেব সায় দিলো, 'আমাদের কাছে তারা ম্লেচ্ছ। নিচু জাত। কিন্তু সেই নিচু জাতেরও তো একটা ধর্ম আছে, তাই না? নিয়ম আছে তাদেরও। পৃথিবীর সব জায়গায় তো ধর্ম আর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। চিন্তা করুন সবাই, এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি। এই আর্যাবর্তের বাইরে এই পৃথিবীর আরও অনেক অংশ আছে। যখন আদিকালে আর্যরা এই সনাতন ধর্মের জ্ঞান একত্র করে সংরক্ষণ করতে শুরু করেছিল, তখনো কিন্তু তারাই পৃথিবীতে একমাত্র জাতি নয়। তার বাইরে আরও জাতি ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা তখন কী করেছিল? তারা নিশ্চয়ই তাদের শাস্ত্র তৈরি করেছিল। এখন সেই শাস্ত্রে এমন যুদ্ধের কৌশল তো থাকতেও পারে, যা আমাদের শাস্ত্রে নেই।'

এক অমাত্য বলে উঠলেন, 'তুমি ঈশ্বরে সন্দেহ প্রকাশ করছ মূর্খ।'

'না, মহাশয়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি একেশ্বরে সন্দেহ প্রকাশ করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি, আমাদের ধর্মই এই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম নয়, আমাদের

নিয়মই এই জগতের একমাত্র নিয়ম নয়। সেই নিয়মগুলোর মধ্যে কিছু নিয়ম তো আমাদেরকে টেক্কা দিতেই পারে। এতে এত আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।'

'আচ্ছা। তাহলে অনেক নিয়ম আছে?'

'অবশ্যই আছে। এই পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরপুর। আর পরিবর্তনই এই বৈচিত্র্যের প্রধান উপাদান। সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অর্জুনের রথের সারথী কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, তার প্রধান কথাই ছিল এই পরিবর্তন, এই বৈচিত্র্যে। পরিবর্তনই এই সংসারের একমাত্র সার নিয়ম।'

ঘরে পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে। সবাই এখন তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের দিকে।

জ্যেষ্ঠ সেনাপতি প্রথমে বাস্তবে ফিরে এলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আমরা আমাদের প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। শাস্ত্রসম্মত কি না, সেটা ভাবার সময় এখন নয়, শাস্ত্রের তর্ক করার জন্যও এখন আমরা এখানে সমবেত হইনি। আমাদের সামনে এখন একটা সমস্যা আছে, আমাদের এখন দরকার সেই সমস্যার সমাধান। শকদের ব্যূহ ভাঙার কৌশল খুঁজে বের করাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'

মহারাজ সাতকর্ণীও এতক্ষণ শাস্ত্রের নানা জটিল কথা শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, তিনিও সায় দিলেন এই কথার সাথে, 'হ্যাঁ, এবার আমরা ওদের ব্যূহ নিয়ে আলোচনা করি।' রুদ্রদেবের দিকে তাকালেন তিনি, 'এতক্ষণ তো তুমি শাস্ত্র আর ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা করলে, এবার বলো, কীভাবে আমরা এই ব্যূহ ভাঙবো? ওদের এই অদ্ভুত ব্যূহ নিয়ে তোমার মতটা শুনি।'

'আজ্ঞে মহারাজ। সেই চিন্তা আমি এখন শুরু করিনি। যেই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ওদের ব্যূহ দেখেছি, তখন থেকেই শুধু ঐ কথাই আমার মাথায় ঘুরছে। স্বীকার করতে বাধা নেই, আমিও জীবনে প্রথম দেখছি এই ব্যূহ। এই পৃথিবীতে যেই পরিস্থিতিই আসুক না কেন, সেই পরিস্থিতি বুঝতে হয় নিজের ভেতরে সঞ্চিত জ্ঞান দিয়ে। আমার ভেতরের কিঞ্চিত জ্ঞান দিয়েই আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি এই ব্যূহ।'

'তা কী বুঝতে পারলে এতক্ষণে?'

'প্রথমেই আমি বিচার করেছি, এই ব্যূহের সাথে আমাদের ব্যূহের এবং অস্ত্রের পার্থক্য। আজকে আমাদের হারের পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে এই পার্থক্য।

আমাদের সেনা সংখ্যায় বেশি। তাই স্বভাবতই আমরা প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেলে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি প্রতিপক্ষকে ঘিরে ফেলে স্তব্ধ করে দেবো। তারপর চেপে মেরে ফেললেই হলো। তেমনি প্রতিপক্ষ নিজেও জানে তাকে ফাঁদে ফেলা হবে। প্রত্যেক ব্যূহতে কিছু সহজ দরজা থাকে। মনে হয় সেখান দিয়ে ব্যূহে প্রবেশ করা যাবে, কিন্তু তা আসলে ফাঁদ। যদি একবার প্রতিপক্ষের সেনা যুদ্ধের গতিতে সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে তাহলেই একেবারে ফেঁসে যাবে। আর এখানেই আমি ওদের ব্যূহের মূল একটা পার্থক্য বুঝতে পারলাম।'

'কী সেই পার্থক্য?' মহারাজ সাতকর্ণী আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

'মহারাজ, একটু ভেবে দেখুন। ওদের ব্যূহতে কোনো ছদ্ম দরজা নেই। কোনো ফাঁদ নেই। নিরেট সেই ব্যূহ। এখানে ঢোকার কোনো উপায় নেই। তাই আমাদের সেনারা ব্যূহে বারবার ফাটল ধরাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়েছে।'

এবার সবাই রুদ্রদেবের কথার সাথে একমত হতে বাধ্য হলো। মহারাজ সাতকর্ণী সমবেত গুঞ্জনে কান দিলেন না। তিনি এখনও সমাধান পাননি, 'তাহলে তোমার চিন্তা কি এভাবেই শেষ হয়েছিল? তুমি কি এই ব্যূহের প্রতিকারের কোনো উপায় বের করতে পেরেছ?'

'যুদ্ধনীতিতে একটা কথা আছে মহারাজ। সেনাদলের সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গাতেই তার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে। এখানেও তাই আছে।'

'কোথায় দুর্বলতা? এই নিরেট ব্যূহের দেওয়ালে কোনো ধরনের দুর্বলতা থাকতে পারে বলে তো কারোই মনে হচ্ছে না।'

'কোথায় ওদের দুর্বলতা? ঐ নিরেট পাহাড়ের মতো দেওয়ালে?' মহারাজ সাতকর্নীর কণ্ঠস্বরে একটু বিস্ময়।

'বলছি মহারাজ। এখানে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে ব্যূহ রচনা আসলে কী?'

'কী আবার? সেনাদের বিভিন্ন নিয়মে সাজানো।'

'আজ্ঞে মহারাজ। তবে একটু ভালো করে দেখলেই খেয়াল করবেন আমরা সেখানে প্রাকৃতিক নানা উপাদান আকৃতি ব্যবহার করি, বিশেষ করে নানা ধরনের প্রাণীর আকৃতি।'

'ঠিক।'

'তাহলে এখন আমাদের দেখতে হবে ওরা যে ব্যূহ গঠন করছে তা আসলে এই প্রকৃতিতে কোন প্রাণীর সাথে মেলে। তাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি আমি।'

'না, আমার মাথায় এমন কোনো প্রাণীর কথা আসছে না। আপনাদের মাথায় কি কিছু আসছে?' সব সেনাপতির ওপর দৃষ্টি ঘুরে এলো মহারাজ সাতকর্ণীর। অবশ্য তাদের চোখের অবস্থা দেখেই উত্তর বোঝা গেল। কেউ কিছু ধরতে পারেনি।

উত্তরটা সভায় একজনকেই দিতে হবে। রুদ্রদেব উত্তর দিলো, 'অনেক ভেবে কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রাণীর সাথে এই ব্যূহের মিল খুঁজে পেলাম না মহারাজ। তবে একটা বিশেষ প্রাণীর পালের সাথে এই ব্যূহের আকৃতি একেবারে মিলে যায়।'

'প্রাণীর দলের সাথে মেলে? কোন প্রাণী?' মহারাজ সাতকর্ণী জানতে চাইলেন।

'মহিষের পাল?'

'মহিষের পাল!' এবার সমবেত স্বর বলে উঠলো।

'হ্যাঁ। একমাত্র এই জিনিসের সাথেই বিপক্ষ ব্যূহের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

'মহিষের পাল, মহিষের পাল,' বিড়বিড় করছেন মহারাজ সাতকর্ণী। 'তাহলে কালকের ব্যূহ রচনায় এটা মাথায় রাখতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে মহিষের পালের সাথে লড়াইয়ে কোনো ব্যূহ গঠন করলে সফলতা পাওয়া যাবে?'

'মহারাজ ব্যূহ চিন্তা করার আগে আমাদের মহিষের পালকে আঘাত করার উপায় ভাবতে হবে। মহিষের পালে হামলা করে মহিষ শিকার সব প্রাণী করতে পারে না।

বড়ো বাঘ অথবা সিংহ পারে। বিপদ আছে। ক্ষুর আর শিংয়ের কারণে সিংহ মহিষের কাছে যেতে পারে না। একবার শিংয়ের গুঁতো গেলে প্রাণ ত্যাগ করতে হতে পারে। সিংহ যে সব সময় সফল হয় তাও নয়। তবে মহিষকে কাবু করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গলায় আঘাত করা। গলায় এক শক্ত থাবা পড়লেই মহিষ কাত।'

'কিন্তু,' মহারাজ সাতকর্ণী সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'এখানে প্রতিপক্ষের গলায় আঘাত করা তো অসম্ভব। ওদের বর্শার আকার অনেক বড়ো। আমাদের এত বড়ো বর্শা নেই। সাধারণ বর্শা ওদের সেনাদের গলা পর্যন্ত পৌঁছাবে না।'

'ওদের ঢাল আর বর্শা থেকে দূরে থেকে তীর ছুঁড়লেও হবে না। ওরা সহজেই ঢালের আড়ালে মাথা নামিয়ে ফেলবে। এত বিশাল বর্শা এত তাড়াতাড়ি বানানোও সম্ভব নয়। আর বানালেও এই বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য আর প্রশিক্ষণ তো আমাদের বাহিনী পায়নি,' মন্তব্য করলেন এক বিজ্ঞ সেনাপতি।

রুদ্রদেব ধীর গলায় বলল, 'যথার্থ বলেছেন। মহিষের গলা ধরতে হলে আমাদের সিংহের মতো লম্বা থাবা আর ক্ষিপ্র কোনো অস্ত্র চাই। আমাদের ভারতীয় যুদ্ধ শাস্ত্রে অমন লম্বা বর্শার প্রয়োগ না থাকলেও অমন একটা লম্বা অস্ত্র কিন্তু আছে। আর সেই অস্ত্র চালনায় দক্ষ সেনাও আমাদের হাতে আছে।'

'কোথায় সেই অস্ত্র? কোথায় সেই সেনা?' প্রশ্নটা মহারাজ সাতকর্ণী করলেও ঘরের প্রতিটা মানুষ সেই উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এবার রুদ্রদেব হাসল, 'মহারাজ, আপনার বিশেষ বাহিনীর কথা কি ভুলে যাচ্ছেন? তারা সব রকমের ভারতীয় অস্ত্র চালনায় অভিজ্ঞ। তারাই পারবে সেই অস্ত্র চালাতে। কেবল কোথায় আর কীভাবে চালাতে হবে সেটা একটু বুঝিয়ে দিলেই হবে। আমি নিজে তাদের সামর্থ্যের প্রমাণ।'

'কিন্তু কী সেই অস্ত্র?'

'যে অস্ত্র আমাদের কাছে প্রচুর আছে। গুপ্ত ঘাতক আর দস্যুদের অস্ত্র বলে অবজ্ঞা করে যা আমরা এমনিতে যুদ্ধে ব্যবহার করি না। যে অস্ত্র তৈরি করেছিলেন স্বয়ং অবতার যোদ্ধা পরশুরাম, সেই অস্ত্রের নাম উরুমি।'

সভায় কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপরই সবার মুখেই ফুটে উঠলো হাসি। রুদ্রদেবের ঐ কথার পরে ঘরের সবাই এখন প্রতিপক্ষের ব্যূহের সমাধান যেন নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

৮৪

শস্ত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। কারো মনেই এখন আর সাফল্য নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সবার নিঃস্পৃহ অনুৎসাহী চেহারায় আলো ফিরে এসেছে। মহারাজ সাতকর্ণী পথের দিশা পেতেই আর দেরি করলেন না। আগামী দিনের পূর্ণ সমর পরিকল্পনা করতে সচেষ্ট হলেন,

'আমাদের ব্যূহ রচনা কী হবে?'

শস্ত্র ঠিক হবার পর এবার তাই ঠিক করতে হবে। শস্ত্র যে ঠিক করে দিয়েছে তার দিকেই নজর চলে গেল সবার। কেউ এখন আর মাথা গলাতে চাইলো না।

রুদ্রদেব সেই পরিকল্পনাও করে রেখেছিল। ব্যূহের গঠনের আগে সে ব্যূহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো, 'মহারাজ, ব্যূহের কাজ দুটো।'

'হ্যাঁ, সেটা আমাদের শাস্ত্রে বেশ ভালোভাবেই উল্লেখ আছে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। ব্যূহ প্রথমে সেনা রক্ষা করবে। এই কাজ সামলে নিজের ক্ষমতা দিয়ে আক্রমণ করে বিপক্ষের সেনা নাশ করবে। এখন আমরা একটু চিন্তা করি, কাল আমরা কী করবো? সেনা রক্ষা না-কি আক্রমণ?'

'অবশ্যই আক্রমণ। আমাদের অনেক সৈন্য আজকে নিহত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা আনার জন্য আমাদের অবশ্যই কাল তীব্র আক্রমণ করে বিপক্ষের সেনা নাশ করতে হবে।' এক সেনাপতি মন্তব্য করে।

'অবশ্যই।' রুদ্রদেব একমত হয়, 'কাল আমরা আক্রমণই করবো। আর আক্রমণের জন্য এখানে ব্যবহার করতে হবে আক্রমণে সুনিপুণ, শত্রুর জন্য প্রবল ভয়ানক সর্প ব্যূহ।'

এক সেনাপতি প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু সর্প ব্যূহ কি মহিষ ব্যূহের বিপক্ষে কাজ করবে?'

সবাই এই কথার উত্তরে হেসে ওঠে। শত্রুর ব্যূহর বেশ ভালো একটা নাম দেওয়া গেছে। মহিষ ব্যূহ।

রুদ্রদেবও হাসিতে যোগ দিয়েছে, 'হ্যাঁ, সর্প ব্যূহ মহিষ ব্যূহের বিরুদ্ধে কাজ করবে। তবে এখানে আমাদের সর্প ব্যূহের চলমান রূপকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করতে হবে। কাল আমাদের ব্যূহের সর্প আগে শত্রুকে কুণ্ডলী পাকাবে, তারপর সুযোগ বুঝে ছোবল মারবে মোক্ষম জায়গায়।'

আলোচনা আর হলো না। সর্প ব্যূহের জন্য সেনাকে তৈরি করতে হবে। আর সেই সাথে শস্ত্র তৈরি করে রাখতে হবে। সেনাপতিরা প্রস্থান করলেন। রুদ্রদেবও রিপুজিতকে নিয়ে গেল নিজেদের বিশেষ বাহিনীর দিকে। কাল এই উরুমির ব্যবহারে তাদের বাহিনীকেই এগোতে হবে প্রথম সারিতে।

রিপুজিত চলতে চলতে মন্তব্য করলো, 'উরুমির ব্যবহারের কথা কারো মাথাতেই আসেনি। আপনার এলো কী করে?'

রুদ্রদেব মুচকি হাসলো, 'সবাই তো সেখানে বলছিল, আমি শাস্ত্র পড়িনি, আমি শাস্ত্রের অপমান করছি। আসলে আমি শাস্ত্র এবং শস্ত্র দুটোই মেনে চলি। কোনো শস্ত্রই কোনো শাস্ত্রের বিকল্প নয়। প্রত্যেক শস্ত্রের আলাদা কাজ আছে। আমি কেবল এখানে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত শস্ত্র খুঁজে বের করেছি।'

পরদিন সকালে দুই দল সেনা আবার মুখোমুখি হলো। শক সেনাদের মেজাজ অনেক ফুরফুরে হয়ে আছে। এক রাতের মধ্যে তাদের ধাঁধা সমাধান করতে নিশ্চয়ই পারেনি সাতবাহন বাহিনী। আজকের যুদ্ধেও সাতবাহনের পরাজয় নিশ্চিত। তবে আজ যে সাতবাহন কঠোর চেষ্টা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো আরও সামর্থ্যবান সেনাদের পাঠাবেন সাতবাহন রাজা সাতকর্ণী।

মহারাজ নাহাপনার মন থেকে এখন সন্ধি ভাবনা পুরোপুরি উধাও হয়েছে। কেন তার আগে সাতবাহন রাজার সাথে সন্ধির নরম সুরে কথা বলেছিল তা ভেবে এখন একটু আফসোস হচ্ছে। আসলে তিনিই এই যুদ্ধের শক্তিশালী পক্ষ।

এটাই নয়, তিনি আরও অনেক কিছুই নতুন করে বুঝতে পারছেন। কলিঙ্গের সাহায্য নেবার এত সব চেষ্টা না করলেও চলতো। কলিঙ্গের সেনার সাহায্য, অমরাবতী আক্রমণ এত সব কৌশল না করে সাতবাহনকে সরাসরি আক্রমণ করলেই হতো। তার বাহিনীর বিশেষ কৌশলই সাতবাহনের জন্য যথেষ্ট। কাল যুদ্ধের সময় অর্ধ দিন সময় পাওয়া গিয়েছিল। তাতেই বিপক্ষ সেনার দফারফা হয়ে গেছে। আজকে পাওয়া যাবে পুরো দিন। আজ সাতবাহনের সেনা আর বিশ্বাস দুটোই ধ্বংস করে দিতে হবে। আজ সন্ধ্যায় যেন মহারাজ সাতকর্ণী নিজে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে আসেন। সেই চিন্তায় আপাতত বিভোর হয়ে আছেন মহারাজ নাহাপনা।

দুপক্ষে রণ বাজনা বেজে উঠলো। আজ রণ শঙ্খ বাজাবার পর কালকের মতো শক বাহিনী আর ছদ্ম ব্যূহ বানাল না। সেই বিশেষ মহিষ সম ব্যূহে সেজে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোলো তারা। আজকের ব্যূহের আকার কালকের চেয়ে অনেক বড়ো। আজকে শকের অর্ধ সেনা ক্ষেত্রে ব্যূহবদ্ধ হয়ে নেমেছে।

নিজের ব্যূহ যাত্রা করতেই বিপক্ষের ব্যূহের দিকে নজর দিলেন মহারাজ নাহাপনা। দেখা যাক, প্রতিপক্ষ আজকে কী চেষ্টা করে। ভারতীয় যুদ্ধ কলা সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান তার। তার এই বিদেশি ব্যূহের জবাব দেবার শক্তি সাতবাহনের সেনাপতিদের মাথায় কোনোমতেই আসা সম্ভব নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ব্যূহ ব্যবহার করে নিজেদের ভূখণ্ডে যুদ্ধ করে আসছে গ্রীকরা। শুধু মানুষে নয়, গ্রীস দেশে না-কি অলিম্পাস নামে একটা পর্বত আছে। সেখানে থাকে গ্রীস দেশের দেবতারা। সেটাই ওদের স্বর্গ। সেই পাহাড় থেকে দেবতারাও নেমে আসতেন মাঝে মাঝে ভূমিতে। গ্রীসের সেই অকুতোভয় মানুষগুলো দেবতাদের বিরুদ্ধেও লড়তো। ধ্বংস হয়নি তারা, এখনও পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। আর সেই সাথে টিকে আছে তাদের এই বিশেষ ব্যূহ।

মহারাজ সাতকর্ণী কাল সন্ধ্যার পরের সভায় রুদ্রদেবের পরামর্শে উত্তেজিত হয়েছিলেন ঠিকই, তবে সময়ের সাথে সাথে তার মনে সন্দেহ জেগে উঠেছে। সারারাত অনিদ্রায় কেটেছে। তার মধ্যেই খেয়াল করেছেন রুদ্রদেবের কর্মকাণ্ড। সে তার বিশেষ

বাহিনী নিয়ে কাল সারারাত মশাল জ্বেলে প্রস্তুতি নিয়েছে। বেশ অনুশীলন করেছে তারা। তবে সেসব দেখেও মহারাজ সাতকর্ণীর মনের সন্দেহ কাটেনি। উরুমির ব্যবহার তিনি যে একেবারে করেননি তা নয়, তবে ঐ অস্ত্রে এই ব্যূহের বিরুদ্ধে কীভাবে কী করা হবে তা ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি।

তবে এখন আর বোঝার সময় নেই। সামনে পরিণতি এগিয়ে আসছে। জানতে আর বেশি সময় লাগবে না। দুই ব্যূহ একে অপরের দিকে এগোচ্ছে। মাঝের দূরত্ব যতই কমে আসছে দুই পাশে অপেক্ষমাণ সবার চোখের পলক ফেলার মাঝের সময়ের পরিমাণ ততই বাড়ছে। দুই প্রান্তের সবাই এখন অনড়।

সাতবাহনের বিশেষ বাহিনীর সর্প ব্যূহ এগিয়ে চলেছে সর্পের স্বাভাবিক গতিতে। মহিষ ব্যূহের একেবারে সামনে আসতেই সেই ব্যূহ একটু নড়ে উঠলো। একটু পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল।

হঠাৎ গতি বাড়িয়ে সেই সর্প শকদের ব্যূহের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে গেল। বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। দেখতে দেখতে পুরো সর্প ঘিরে ফেললো শকদের মহিষ ব্যূহকে।

মহারাজ সাতকর্ণী ঘোড়া দুই কদম সামনে এগিয়ে নিলেন উত্তেজনার বশে। এবার কী করবে শক বাহিনী? তাদের ব্যূহ কেবল সামনের দিকে সুরক্ষিত। কিন্তু এখন তার সর্প ওদের মহিষকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে।

মহারাজ নাহাপনার চোখে এই দৃশ্য কৌতুকের জন্ম দিলো। এই তাহলে সাতবাহনের পরিকল্পনা। একটু না হেসে পারলেন না তিনি। ভালো করেই জানেন, এসব করে আসলে কোনো লাভ হবে না।

প্রতিপক্ষকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে দেখে শকদের ব্যূহ একেবারে থেমে গেল। দুই পলের মতো সময় অনড় রইল তারা। নিজেদের মধ্যে সংকেত আদান-প্রদান করলো ঢালের শব্দের ইশারায়।

তারপর চোখের পলকে শকদের ব্যূহের ডান, বাম আর পেছন দিকের সৈন্যরা দুই সারিতে জায়গা বদলে ফেললো। বাম দিকের দুই সারি বামে, ডান দিকের সেনারা ডানে, আর পেছনের সেনাদের দুই সারি করে পেছনে নিজেদের ঢাল ফেরালো। সেই সাথে ঠিক করে নিলো নিজেদের বর্মের অবস্থান। এবার মহিষের পাল যেন চারদিকেই মুখ করে আছে। এখন তারা চারদিক থেকে আসা যে কোনো আক্রমণ সামলানোর জন্যই প্রস্তুত।

শক ব্যূহের এত দ্রুত দিক পরিবর্তনে মহারাজ সাতকর্ণী যথেষ্ট অবাক হয়েছেন। এমন কিছু ঘটতে পারে তা ভেবেছিলেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা ভাবা যায়নি। সর্প দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে অরক্ষিত অবস্থায় শক সেনাকে নিধন করবে এই চিন্তা যদি রুদ্রদেবের মাথায় থেকে থাকে তাহলে বলতেই হয়, সে পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে। শত্রু এখন চারিদিক থেকেই সুরক্ষিত।

তবে রুদ্রদেব শত্রুর এই খেলায় চমকালো না। সে আছে সর্পের একেবারে সামনের কুণ্ডলীতে। এবার শুরু হবে আসল খেলা। শত্রুপক্ষের হাতে আর চাল বাকি নেই। এবার তাদের পালা।

সাতবাহন সেনার সংখ্যা শকদের থেকে আজকেও বেশি। সর্পের সপ্ত কুণ্ডলীতে অনেক সেনা আছে। তবে প্রথম কুণ্ডলীতে সেনা অত নেই, সাত ভাগের এক ভাগ কেবল আছে।

সেই সপ্তাংশের এক অংশই যথেষ্ট। রুদ্রদেবের নির্দেশে বিশেষ নির্দেশনায় ভেরী বেজে উঠলো। এখন আবার ভেরী কেন? মহারাজ নাহাপনা একটু যেন ধন্ধে পড়লেন।

ভেরী বাজার সাথে সাথে সর্পের প্রথম কুণ্ডলীর সব সেনা হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিলো। তাদের হাতে এখন আর কোনো শস্ত্র নেই। আরে, এটা কী, তারা সবাই শস্ত্র ফেলে দিচ্ছে কেন? মল্লযুদ্ধ করবে না-কি? নাহাপনার এই চিন্তার সাথে একাত্মতা পোষণ করতে পরের পলে প্রথম কুণ্ডলীর সব সেনা হাত থেকে ঢালও ফেলে দিলো। পুরো শক সেনা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এমনকি মহিষ ব্যূহের ভেতরে বর্শা হাতে প্রস্তুত যে সেনারা আছে তারাও কোনো কিছু বুঝতে পারছে না।

শক সেনারা বুঝল এটাই সুযোগ। শস্ত্র ছাড়া সেনাদের বর্শার খোঁচাতে পরপারে পাঠানো বড়োই সহজ কাজ। হঠাৎ কেন সকল সাতবাহন সেনার একসাথে মতিভ্রম হয়েছে সেই চিন্তা অবশ্য তাদের কারোই মাথায় এলো না। তারা চারপাশে একটু ছড়িয়ে বর্শা বাগিয়ে ধরতে শুরু করেছে।

সেটাই তাদের কাল হলো। ব্যূহ একটু ছড়াতেই পাশাপাশি দুজন সেনার মধ্যে দূরত্ব একটু বেড়ে গেল।

শক সেনাদের বর্শা সামনে বাড়ানো আছে। ঢালের ওপর দিয়ে আনুভূমিক ভাবে। কিছু আছে অর্ধ লম্ব কোণে। সেই অবস্থান থেকেই সেগুলোকে চালনা করা হচ্ছে। কেউ সামনে এগোবার চেষ্টা করলেই নিশ্চিত মৃত্যু। বর্শার খোঁচা অব্যর্থ।

তবে সাতবাহনের ঢাল তলোয়ার ফেলে দেওয়াতে আপাত অস্ত্র বিহীন সেনারা থমকে গেল না। তারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। রুদ্রদেব এবার চিৎকার করে আদেশ দিলো। সাথে সাথে সবার হাত একসাথে চলে গেল কোমরে। বর্মের নিচে কোমরে রমণীর বিছার মতো জড়ানো আছে সেই অস্ত্র। কয়েক প্যাঁচে কোমরে প্যাঁচানো সেই উরুমি এক টানে চলে এলো তাদের হাতে। আর একবার প্যাঁচ খুলে যেতেই সাতবাহনের সেনারা সেই উরুমিগুলোকে আর বিশ্রাম দিলো না। সবাই এক সাথে চালিয়ে দিলো শত্রু লক্ষ্য করে। লক্ষ্য ঢালের ওপর দিয়ে বর্ম আর শিরস্ত্রাণের মাঝ দিয়ে দৃশ্যমান কণ্ঠদেশ।

শকদের প্রথম প্রাচীর কোনো কিছু না বুঝে এক সাথে ধরাশায়ী হলো। এই ব্যূহ দিয়ে গ্রীকরা সেই আদিকাল থেকে যুদ্ধ করে এসেছে। কোনো কোনো সময় হয়তো কোনো কোনো শত্রু এই ব্যূহ ভেঙেও ফেলেছে, কিন্তু আজকের মতো এমন তাসের ঘরের মতো এই গ্রীক গৌরব ব্যূহ নিশ্চয়ই কখনো ভেঙে পড়েনি।

মহারাজ নাহাপনার চোখ বিস্ফোরিত। যে অস্ত্রে সাতবাহন সেনা আক্রমণ করেছে সেই অস্ত্র তিনি চেনেন। এটার নাম উরুমি। উরুমির ব্যবহারের কথা কারো মাথাতেই আসেনি। যে লম্বা বর্শার জন্য শত্রু পক্ষের সেনা তাদের কাছে আসতে পারতো না, সেই বর্শার মেপে দেওয়া দূরত্ব এখন আর কোনো কাজেই আসছে না। দূর থেকেই শত্রু তাদের কণ্ঠ বিদ্ধ করছে।

শক সেনাদের আত্মবিশ্বাস আর ক্ষমতায় সাথে সাথে চিড় ধরলো। তারা দাঁড়িয়ে ছিল শুধু একটা পরিকল্পনার ওপর। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে এমন কোনো চিন্তা কখনোই তাদের মাথায় আসেনি। তাই দ্বিতীয় কোনো পরিকল্পনা তারা করেনি।

শকদের এই ধন্ধে পড়া সাতবাহন সেনাদের বেশ সুবিধা করে দিলো। পরের সারিও মোটামুটি বিনা নড়াচড়ায় গলায় উরুমির খোঁচা খেয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। রুদ্রদেবের হাতের উরুমি নিমেষে চমেক চমকে উঠছে।

দুই সারি সেনা হারিয়ে যেন চেতনা ফিরলো শক বাহিনীর। বুঝতে পারলো এখন যুদ্ধ করতে হবে সমানে সমানে। শত্রু এখন আর দুর্বল নয়। এবার উরুমির বিপরীতে বর্শা চালাতে শুরু করলো তারা। তবে সর্পের কুণ্ডলীতে সাতবাহন সেনারা দ্রুতগতিতে নড়তে পারছে, কিন্তু পোক্ত ব্যূহতে থাকায় শক সেনা তা করতে পারছে না। এদিকে সাতবাহন সেনা যে বর্শার খোঁচা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারছে তা নয়, এবার তাদের পক্ষেও কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটতে লাগলো। তবে তা শক সেনার নিধন সংখ্যার তুলনায় খুবই কম।

এভাবেই চলতে লাগলো যুদ্ধ। শক সেনার বাড়ানো বর্শা হয়তো আঘাত করছে কোনো সাতবাহন সেনার বুকে, পরের মুহূর্তেই হয়তো কারো উরুমির আঘাতে সেই শক সেনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। শক সেনার সারি ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। যুদ্ধ তার পরিণতির দিকে এগোতে লাগলো।

শকদের পুরো অর্ধ সেনা শেষ হতে তারপর খুব বেশি সময় লাগলো না। সাতবাহনের ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়নি। তবে সাতবাহনের কেবল ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু শকদের পুরো অর্ধ সেনা ধ্বংস হয়ে গেছে আজকের যুদ্ধে। তাই কোনো রকম হিসেব না করেই বলা যায়, আজকের যুদ্ধে জিতেছে সাতবাহন।

না, এখনই পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির হিসেব অথবা জয় পরাজয়ের হিসেব করা যাবে না। সূর্য এখনও মাথার ওপরেই আছে। যুদ্ধ বিরতির সময়ের এখনও অনেক বাকি আছে। সেনা ধ্বংস হতেই রুদ্রদেবের নির্দেশে সাতবাহন সেনা আবার সর্প কুণ্ডলী ছেড়ে একক সর্প ব্যূহ গঠন করেছে। তবে সর্প এখন চলছে না। থমকে আছে সর্প। শকদের অর্ধেক সেনা এখনও বাকি আছে। দেখা যাক এখন সেই অর্ধ সেনা কী ব্যূহ গঠন করে যুদ্ধ করতে আসে।

শকদের সেনাপতিরা তাকিয়ে আছে মহারজা নাহাপনার দিকে। তার মুখে কথা ফুটছে না। সেনাপতিরা তার দিকে শুধু তাকিয়ে আছে। কোনো রকমের কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। তবে তারা বুঝতে পেরেছে, কোনো রকমের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন মহারাজ।

তবে মন্ত্রী সারথী উপস্থিত বুদ্ধি হারাননি। মন্ত্রীকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। সারথী যুদ্ধ ভালো বোঝেন না, তবে এটুকু জানেন, তাদের হাতে আর কোনো পরিকল্পনা নেই, এখন সামনে বাকি সৈন্য পাঠানো মানে নিশ্চিত ধ্বংস। শকদের পুরো বাহিনী একদিনেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি কাজটা করলেন তিনি। নিজ হাতেই। নিজেদের শিবিরে যুদ্ধ বিরতির হলুদ নিশান টানিয়ে দিলেন তিনি। তার দেখাদেখি

অন্যরাও নানা জায়গায় হলুদ নিশান উড়িয়ে দিলো। শক সেনা আজকের দিনের জন্য আর যুদ্ধ চাচ্ছে না।

রুদ্রদেব হলুদ নিশানের দিকে তাকিয়ে আছে। পেছনে ফিরে একবার নিজের শিবিরের দিকেও তাকালো।

মহারাজ সাতকর্ণী দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জ্যেষ্ঠ সেনাপতির সাথে, 'হলুদ পতাকা ওড়াচ্ছে ওরা।'

সেনাপতির চোখে নিষ্ঠুরতা, 'ওদের শেষ ইচ্ছে পূরণ করে দিন মহারাজ। ওদের হাতে তো আয়ু আর একদিন। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সেই ভিক্ষে দিয়ে দিন।'

মহারাজ সাতকর্ণী সম্মত হলেন। তার হাতের ইশারায় সাতবাহন শিবিরেও উড়ল হলুদ পতাকা। রুদ্রদেব সেই দৃশ্য দেখল। ফেরার পথ ধরলো সাতবাহনের সর্প ব্যূহ।

রুদ্রদেব শিবিরে ফেরার পথে মহারাজ সাতকর্ণীর মুখোমুখি হলো। মহারাজের মুখ প্রসন্ন, 'তোমাকে আর তোমার বিশেষ বাহিনীকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে পাকাপাকি ভাবে সেনাপতি বানানোর চিন্তা করছি আমি।'

'আপনার মহানুভবতা।'

অসিত দাঁড়িয়ে আছে শিবিরে। তার মুখে হাসি। রুদ্রদেব তার সামনে ঘোড়া দাঁড় করালো, 'কেমন দেখলে যুদ্ধ?'

অসিত কৃত্রিম অভিমান দেখালো, 'আর কত দেখবো? আজ তো আপনি আমাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু তুমি তো উরুমিতে প্রশিক্ষণ পাওনি এখনো। ভেবো না, যা বুঝতে পারছি, অচিরেই তুমি যুদ্ধের ময়দানে শস্ত্র হাতে নামতে পারবে।'

রুদ্রদেব নিজের তাঁবুর দিকে গেল। অসিত এদিকে কল্পনা করতে লাগলো যুদ্ধক্ষেত্রের কথা, রাহুর সাথে মুখোমুখি হলে কীভাবে লড়াই করবে সেসব ভবিষ্যৎ।

৮৫

দুটো সন্ধ্যায় কত পার্থক্য। আবার নিরপেক্ষ চোখে দেখলে আসলে কোনো পার্থক্যই নেই। কালও সন্ধ্যেটা এমনই ছিল। এই প্রান্তরের দুই প্রান্তের গাছগুলোতে কালকের মতো আজও পাখিরা ঘরে ফিরে আসছে, সারাদিনের ঝাপটায় ক্লান্ত ডানাটা শেষ বারের মতো একটু নেড়ে নিচ্ছে, ঘরের দরজায় বসে ঘুমাবার আগে শেষ বারের মতো গলাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে তারা। প্রকৃতির কাছে এবং কাজে কোনো বদল নেই। তা কখনো বদলায় না। বদলায় মানুষের ভাগ্য আর মন।

দুই শিবিরের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ উলটে গেছে। ঠিক যেন সূর্যের আলোয় পড়া ছায়ার মতো। সকালে যেদিকে পড়ে, বিকেলে পড়ে একেবারে উলটো দিকে।

মহারাজ নাহাপনা বসে আছেন তার তাঁবুর সামনে। সন্ধ্যের অন্ধকারের চেয়েও তার মুখের আঁধার বেশি গাঢ়। সাধারণ সেনারা অনুভূতি দেখানোর সময় পাচ্ছে না। তাদের বেশিরভাগই ব্যস্ত আগুনের ব্যবস্থা করতে। তবে কোনো রকমের আলোর ব্যবস্থাই যে নাহাপনার মুখের অন্ধকার দূর করতে পারবে না, তা নিশ্চিত।

সারথী বসে আছেন মহারাজ নাহাপনার পাশেই। যোগ্য মন্ত্রীর মতো সাহচর্য দিচ্ছেন মহারাজের সবচেয়ে খারাপ সময়টাতে।

সারথী যে একটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন মহারাজ নাহাপনা, 'যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের কথাটা তড়িৎ চিন্তা করে বেশ ভালো করেছেন। নইলে ওরা যদি ব্যূহ নিয়ে আমাদের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসতো তবে আজকেই আমার সম্পূর্ণ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যেত। এতক্ষণে আমরা বন্দি হিসেবে বসে থাকতাম সাতবাহনের শিবিরে।'

'এতে আমার বুদ্ধির কোনো কৃতিত্ব নেই মহারাজ। আসলে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া একজন মানুষ যা করতো আমি ঠিক তাই করেছি।'

'সেটাই তো আমরা কেউ করতে পারছিলাম না। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সবাই।'

'আজ্ঞে মহারাজ। কিন্তু সেই কাজ করেও তো তেমন একটা লাভ হয়নি। আমরা এক রাতের আয়ু পেয়েছি। কাল সকালে যুদ্ধ যাত্রা করা ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। আমাদের সেনাকে কাল আগে বাড়াতেই হবে।'

মহারাজ নাহাপনা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আর যুদ্ধ। ঐ বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে এই কজন সেনাকে পাঠানো আর আগুনে আত্মাহুতি দিতে পাঠানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

'কিন্তু তা তো আমাদের করতেই হবে। পালিয়ে তো আমরা যেতে পারবো না।'

'কিছু একটা তো করতেই হবে। পালানো যাবে না। এই ভগ্নসেনা নিয়ে যুদ্ধ করার কোনো মানেই নেই। আমাদের অন্য উপায় ভাবতে হবে। যে এক রাতের আয়ু আমরা পেয়েছি সেই এক রাতেই ভেবে কিছু একটা বের করতে হবে।'

সারথী কথাটা শুনেই চিন্তা করতে শুরু করলেন না। তিনি নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছেন, 'তাহলে আমরা যুদ্ধ করবো না?'

'না।'

'আর কোনো উপায় কিংবা কৌশল যদি কোনো সেনাপতি বলে দিতে পারেন। সেনাপতিদের নিয়ে একটা সভা করি?'

'কোনো লাভ নেই। আমাদের সেনাপতিদের ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা পরিষ্কার। এই যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্রই মার খেয়ে গেছে। যে ব্যূহ নিয়ে আমার এত ভরসা ছিল, ভারতের যুদ্ধ শাস্ত্রে যে ব্যূহের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেই ব্যূহ ভেদ করে ফেললো সাতবাহন সেনা।' নিজের ভরসার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

সারথী চুপ করে আছেন, মহারাজ সাতকর্ণী মনের কথা উগড়ে দিচ্ছেন, 'উরুমির এমন ব্যবহারের কথা আমি কখনো চিন্তাও করিনি। ওরা মাত্র এক রাতের মধ্যেই এই ব্যূহের সমাধান বের করে ফেললো। কীভাবে?।'

'আমার জানা নেই মহারাজ।'

মহারাজ নাহাপনার গলায় হতাশা, 'কাল যদি আমরা যুদ্ধ করতে নামি তাহলে কোনো ব্যূহই আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমার সামনে এখন একটাই উপায় আছে।'

সারথী এবার তাকালেন মহারাজের দিকে। মুখে কিছু বললেন না, চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা।

সবচেয়ে সাধারণ উপায়টাই মাথায় এসেছে মহারাজ নাহাপনার, 'আমাদেরকে এখন মহারাজ সাতকর্ণীর সাথে সন্ধি করতে হবে। কাল সকালেই আমরা সন্ধির সাদা পতাকা উড়িয়ে দেবো। মহারাজ সাতকর্ণীর কাছে শরনাগতি প্রার্থনা করবো। মহারাজ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় নিয়ম ভেঙে আমাদের শরণাগতির প্রার্থনা ফেলে দেবেন না।'

সারথী এবার মৃদু মলিন হাসলেন। নাহাপনার ভ্রু কুঞ্চিত হলো, 'আপনার এই হাসি আমি চিনি সারথী। তার মানে আমার এই পরিকল্পনা আপনার পছন্দ হচ্ছে না।'

'ঠিক ধরেছেন মহারাজ। এই পরিকল্পনা আমার পছন্দ হয়নি। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।'

'পরিকল্পনা পছন্দ হয়নি কেন?'

'মহারাজ, আপনার এই পরিকল্পনায় রাজনীতির প্রধান নীতিই অনুপস্থিত। সন্ধি করতে হয় দুর্বলের সাথে। সবলের সাথে করা সন্ধি পরাজয়ের থেকেও খারাপ ফল বয়ে আনতে পারে।'

এবার অধৈর্য হয়ে উঠলেন নাহাপনা, 'তাহলে আমি এখন কী করবো সারথী? কাল সকালে আমি না যুদ্ধ করতে পারি, না সন্ধি করতে পারি। আমি আমার সেনা নিয়ে পিছু হটতেও পারবো না। চির জীবনের মতো কলঙ্ক স্বীকার করে যদি সেই চেষ্টা করি তাহলেও প্রাণ রক্ষা হবে না। পেছন থেকে ওরা আমাদের তাড়া করে কচুকাটা করবে।'

'মহারাজ, আমার মনে হয় আমাদের চিন্তা করার জন্য আরেকটা দিন সময় পেলে ভালো হয়। কাল সকালেও আমরা কালকের দিনের মতো যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব রেখে দেখতে পারি।'

'অবুঝের মতো কথা বলবেন না সারথী। এই মুহূর্তে আমরা ওদের জায়গায় থাকলে কী করতাম? আমরা এই অবস্থায় কালকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব মেনে নিতাম?'

সারথী এবার চুপ করে গেলেন। তিনি মন্ত্রী। যখন মন্ত্রণা সেবার আর কিছু বাকি থাকে না তখন চুপ থাকাই শ্রেয়।

তখনই এক সৈনিক মহারাজ নাহাপনার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কী হয়েছে?'

'মহারাজ, সেনাপতি অ্যালেক আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো।'

অ্যালেক এসে দাঁড়ালো মহারাজের সামনে। তার চেহারায় এখন হতাশার সাথে সাথে অপরাধ বোধের ছাপ স্পষ্ট। গ্রীকদের গর্ব মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে সাতবাহন সেনা। কোনো সুযোগই পায়নি তারা। হতাশা এখানে স্বাভাবিক। মহারাজের সামনে আসতে লজ্জা করছিল তার। তার জন্যই তো এই যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে শক বাহিনী।

অ্যালেকের মুখ দেখেই মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন মহারাজ নাহাপনা, 'এখন আর এমন মুখ করে রেখে লাভ কী? তোমার তো এতে কোনো দোষ নেই। তুমি তো নিজের কাজে কোনো গাফিলতি করোনি, সাতবাহনের কৃতিত্বের কাছে মার খেয়ে গেছে। তোমাকে শুধু শুধু দোষী করে তাদের সেনার কৃতিত্ব খাটো করে দেখতে আমি রাজি না।'

অ্যালেক ক্ষমা চাইতেই এসেছিল। মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই মহারাজ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বুক যেন একটু হালকা হলো তার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে এক পাশে।

নাহাপনা আবার বলতে শুরু করলেন নিজের পরিণতির কথা, হতশার কথা, 'আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। যুদ্ধ হবে না, সন্ধি হবে না, পালাতে পারবো না। কী করবো আমি? হে ঈশ্বর, কী করবো আমি?' ঈশ্বরের কাছে কখনো এমন ভাবে আকুতি জানাননি নাহাপনা। কিন্তু আজ আর কোনো উপায় নেই।

সারথীর দিকে তাকালেন তিনি, 'ঈশ্বরের নামে আমাকে কিছু একটা বলো সারথী। কারো থেকে কোনো উপায় আমাকে খুঁজে এনে দাও। ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আর চুপ করে থেকো না, তোমরা আর চুপ করে থেকো না।' নাহাপনার চেহারায় উন্মাদ ছাপ দেখা যাচ্ছে। নিজের খাঁচা ছেড়ে বাইরে এসে তিনি ফেঁসে গেছেন।

সারথী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজের দিকে তাকানোর কোনো শক্তি তার ভেতরে বেঁচে নেই। মন্ত্রণা দেবার কিছু নেই। মহারাজকে এখন পরিণতি মেনে নিতে হবে। মন্ত্রী হিসেবে আজ তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

তবে উপায় একটা না একটা বেরিয়েই যায়। গ্রীক দের ব্যূহ ব্যর্থ হয়েছে। তবে অ্যালেকের হাতে এখনও বলার মতো একটা উপায় আছে। গ্রীক রাজাদের একটা রীতি তার মাথায় খেলে গেল, 'আমি কি একটা উপায়ের কথা বলতে পারি মহারাজ?'

নিমজ্জমান ব্যক্তি খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, 'শীঘ্রই বলো।'

'এই উপায় গ্রীসে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আমার সেনা ব্যর্থ হয়েছে, উপায় ব্যর্থ হয়েছে, আপনি আমার কথা শুনবেন কি না জানি না, তবু আপনার এই অবস্থা দেখে আমি কথাটা না বলে আর পারছি না।'

'ভণিতা কোরো না, জলদি বলো।'

'মহারাজ, আপনি আজ যে সমস্যার সামনে পড়েছেন, তাতে হয়তো আপনি কখনো পড়েননি বলে আপনার কাছে নতুন লাগছে। কিন্তু সেই প্রাচীন কাল থেকে যখন দুই দলে যুদ্ধ হওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই অসম যুদ্ধও চলছে। প্রায় কখনোই দুই পক্ষের শক্তি সমান হয় না।

আমাদের গ্রীসে যখন কোনো সেনাপতি বা রাজা নিজের কম সেনাবল নিয়ে অন্য কোনো বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকারী সেনাপতি অথবা রাজার মুখোমুখি হয়, তখন সমানে সমানে যুদ্ধ করার একটাই উপায় বাকি থাকে।'

নাহাপনা আর সারথী দুজনেই আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন।

'মহারাজ, তখন কম সেনাবলের অধিকারী রাজা বা সেনাপতি অন্য পক্ষের রাজা বা সেনাপতিকে সম্মুখ দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন। সেখানে শর্ত থাকে যে লড়াইয়ে জিতবে সেই জিতে যাবে যুদ্ধ। তবে এই দ্বন্দ্বে জয় পরাজয় ঠিক করার একটাই উপায় থাকে। যখন দুই দ্বন্দ্বকারীর একজন মারা যাবেন তখনই শেষ হবে এই লড়াই। আপনাদের এখানে এই রীতি কাজ করবে কি না জানা নেই, তবে আমাদের গ্রীসে হলে এতক্ষণে আপনার স্থানে থাকা রাজা ঠিক এই কাজটাই করতেন।'

মহারাজ নাহাপনার চোখ যেন জ্বলে উঠলো, কিছুদিন আগের সেই গ্রীক গুপ্ত সেনার প্রধানের কথা মনে পড়লো, 'ঠিক। ভালো উপায়ের কথা বলেছ। আপনি কী বলেন সারথী? এই প্রস্তাব কেমন মনে হচ্ছে?'

'প্রস্তব তো ভালোই। তবে মহারাজ সাতকর্ণী এই প্রস্তাবে রাজি হবেন কি না তা বুঝতে পারছি না। গ্রীসের রাজারা গর্বের ফাঁদে পড়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলতেন অথবা ফেলেন মনে হয়। মোটা বুদ্ধির মানুষ না হলে কম শক্তির শত্রুকে কেউ সমানে সমান সুযোগ দেয়?'

নিজের জাতিকে মোটা বুদ্ধি বলাতে অ্যালেক একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলো, কিন্তু এখন তর্ক-বিবাদ করার সময় নয়।

মহারাজ নাহাপনার মুখে স্বভাবসুলভ ধূর্ত মুচকি হাসিটা ফিরে এসেছে, 'হবেন সারথী হবেন। মহারাজ সাতকর্ণীও রাজি হবেন। ঐ যে বললেন না, গর্ব মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও মোটা বুদ্ধিতে পরিণত করে। আমি সাতকর্ণীর ঠিক সেই গর্বে আঘাত করবো। ক্ষত্রিয় গর্বে আঘাত পেলে মহারাজ সাতকর্ণী আর শিবিরে নিরাপদে বসে থাকতে পারবেন না।'

হাততালি দিয়ে উঠলেন মহারাজ নাহাপনা। তার তাঁবুর বাইরের ব্যক্তিগত দূত প্রবেশ করলো ভেতরে। এই দূত যেনতেন দূত নয়, শ্রুতিধর। যা শোনে তা আর ভোলে না। পাই পাই করে বলে আসে খবর প্রাপককে। মহারাজ সাতকর্ণীর শিবিরে তাকেই পাঠাতে হবে। কোনো লিখিত পত্রের প্রয়োজন হবে না।

দূতের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলো নির্দেশ, 'শোনো দূত, আমি এখন যা বলবো তা মনে গেঁথে নাও। যেভাবে বলেছি সংবাদ ঠিক এভাবেই তুমি সাতবাহন শিবিরে গিয়ে বলবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'শুনুন মহারাজ সাতকর্ণী, মহারাজ নাহাপনা আপনাকে কাল সকালের প্রথম প্রহরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। দুই পক্ষের সেনার উপস্থিতিতে প্রান্তরের ঠিক মাঝে হবে এই যুদ্ধ। কোনো এক পক্ষের অথবা দুই পক্ষের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত চলবে এই যুদ্ধ। যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ধারণ হবে এই যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে।'

এরপরের অংশটা মহারাজ সাতকর্ণীর প্রতি আঘাত, 'মহারাজ নাহাপনার এটাই ক্ষত্রিয়োচিত প্রস্তাব। যদি মহারাজ সাতকর্ণী ভয় পান অথবা নিজেকে সমর্থ মনে না করেন তবে এই প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারেন। তাহলে যেন মহারাজ সাতকর্ণী নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেন আর কালকের পর থেকে যেন নিজেকে আর ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় না দেন।'

দূত ভালো করেই শুনে নিয়েছে তাকে কী বলতে হবে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা কাঁপছে। যদিও দূত অবধ্য তবু এই কথা শোনার পর মহারাজ সাতকর্ণী রেগে গিয়ে তার সাথে কী আচরণ করবেন তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

মহারাজ নাহাপনা জিজ্ঞেস করলেন, 'সবটা বুঝতে পেরেছ তো দূত?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'তাহলে এখনই রওনা করো। আরেকটা কথা তুমি কিন্তু শিবিরের কারো কাছেই খবরটা বলবে না। একমাত্র মহারাজ সাতকর্ণীর সামনেই পুরো খবরটা পাঠ করবে। একটু তাড়াতাড়িই যাও। মহারাজ সাতকর্ণীকেও তো একটু চিন্তা করার সময় দিতে হবে।'

দূত বেরিয়ে গেল। সারথী এবার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, 'প্রথমে একটু অযৌক্তিক মনে হলেও এখন মনে হচ্ছে চালটা কাজ করবে। মোক্ষম উপায়। মহারাজ সাতকর্ণী কিছুতেই নিজের ক্ষত্রিয় ক্ষমতার ওপর প্রশ্ন আসতে দেবেন না। আমি যতটুকু শুনেছি, তিনি অনেক বড়ো যোদ্ধা। এত বড়ো বীর হয়ে নিশ্চয়ই ইতিহাসকে তিনি নিজের গায়ে কলঙ্কের ছাপ বসাতে দেবেন না।'

অ্যালেকের মুখের অপরাধ বোধ এখন অনেকটাই কমে এসেছে। একটা মোক্ষম উপায়ের সন্ধান দেওয়া গেছে। মহারাজ নাহাপনার যুদ্ধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা আছে তার। তিনি নিশ্চয়ই সম্মুখ দ্বন্দ্বে সফল হবেন।

তবে মন্ত্রী সারথী আসলেই কূটনীতিক। তিনি মুদ্রার অপর পিঠটাও দেখে নিয়েছেন তখন, 'তবে মহারাজ, এখানে আরেকটা কথা আছে। আপনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামছেন।

যদিও আপনি অনেক বড়ো বীর, তবু আপনার পরাজয়ের একটা আশঙ্কা তো থেকেই যায়।'

এবার কঠিন হয়ে গেল মহারাজ নাহাপনার চেহারা, 'আপনি এই চিন্তা মনে স্থান দিলেন কী করে? আমি মহারাজ সাতকর্ণীর কাছে হেরে যাবো? আপনি কি ভুলে গেছেন, কে আমার অস্ত্রগুরু ছিলেন?'

'আমি কিছুই ভুলে যাইনি মহারাজ। শুধু বলতে চাইছি, যখন দুজন যুদ্ধের দুজনের মুখোমুখি হয় তখন দুজনেরই হতাহত হবার আশঙ্কা থাকে।'

'থামুন। এখানে সেসব আশঙ্কা করে লাভ নেই। শুধু ভারত না, পারস্য আর মিশরের সব রকমের যুদ্ধ কলা আর অস্ত্রে আমি পারদর্শী। এই ভারতের এক আরামপ্রিয় রাজা কিছুতেই আমাকে হারাতে পারবে না। এসব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিন। আর চিন্তা করুন, মহারাজ সাতকর্ণীকে বধ করার পরে আমরা কী করবো।'

'মহারাজ, আপনার সামর্থ্যে আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আপনাকে আমি শস্ত্র হাতে দেখেছি। তবে সেই সাথে আমি আরেকটা কথাও ভুলে যাইনি।'

'কী কথা?'

'মহারাজ সাতকর্ণী কখনো কোনো যুদ্ধে এখন পর্যন্ত পরাজিত হননি। তার সমর কৌশলের সামনে মাথা নত করে নিয়েছে সব রাজারা। অনেক কিংবদন্তি তার সামনে মাঠ কুটে মরেছে। আমি তার প্রতিপক্ষ হলে তাকে কিছুতেই অবহেলা করতাম না। একটু সতর্ক হতে কী ক্ষতি? সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য সর্বদা তৈরি থাকতে হয়। এজন্য পূর্ণ শান্তির সময়েও রাজারা নিজেদের সেনাবাহিনী তৈরি রাখেন।'

কিছুক্ষণ কথা বললেন না মহারাজ নাহাপনা। তারপর মেনে নিলেন সারথীর কথা, 'আমাদেরকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কী?'

'আপনার মৃত্যু মহারাজ। তারচেয়ে খারাপ আমাদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।'

'তার জন্য আমাদের কী প্রস্তুতি নিতে হবে?'

'মহারাজ, আমার প্রস্তাব হচ্ছে, এখনই অ্যালেক তার সেনাবাহিনী নিয়ে বারিগাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিক। পূর্ণ গতিতে সেখানে পৌছে রক্ষা করবে বারিগাজা। সেই বন্দরের জন্যই সাতবাহন হন্যে হয়ে আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মৃত্যু হলে সাতবাহন সেনা এখান থেকে প্রথমে বারিগাজাতে আক্রমণ করবে। তারপর উজ্জয়িনিতে।'

'সেটা আমিও জানি। ঐ বন্দর দখল করার জন্যই এত চাল, মন্ত্রণা, কূটকৌশল।'

'জি মহারাজ। কিন্তু ওদেরকে সেই কাজটা আমরা এত সহজে করতে দেবো না। আপনার রাজ্য এবং সম্পদ সামলানোর জন্য এখনও আপনার জামাতা ঋষভদত্ত আছেন। অ্যালেক নিজের সেনা নিয়ে বারিগাজাকে অভেদ্য দুর্গে পরিণত করলে কিছুতেই সাতবাহন বাহিনী ঐ বন্দর দখল করতে পারবে না। ততদিনে উজ্জয়িনি থেকে উত্তর শকদের সেনা নিয়ে আপনার জামাতা চলে আসতে পারবেন। আপনার মৃত্যু হলেও সাতবাহন মহারাজ সাতকর্ণীর অভিলাষ পূর্ণ হবে না। আপনার মৃত্যু হলে

অ্যালেক বারিগাজা রক্ষা করবে, আর যদি দ্বন্দ্বে মহারাজ সাতকর্ণীর মৃত্যু হয়, তাহলে সে আপনাকে বারিগাজায় সংবর্ধনা দেবে।'

সম্মত হলেন মহারাজ নাহাপনা, 'অ্যালেক, তুমি তোমার সম্পূর্ণ গ্রীক বাহিনী নিয়ে বারিগাজার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে যাত্রা করবে। মনে রাখবে, পেছন থেকে হামলা হতে পারে, কোনোমতেই গতি কমানো চলবে না। অবশ্যই আমাদের শিবিরের ওপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রেখে চলেছে ওরা।'

'মহারাজ, আমি আপনার আদেশ মেনে নিয়ে এখনই রওনা দিচ্ছি। কিন্তু মহারাজ, আমরা সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়েই তো বারিগাজায় পালিয়ে যেতে পারি। সেটা করলেই তো ভালো হয়।'

'হ্যাঁ, পারি। কিন্তু তখন সম্পূর্ণ সাতবাহন বাহিনী আমাদের পিছু নেবে, আর তুমি এক অংশ নিয়ে রওনা দিলে হয়তো সাতবাহন বাহিনী পিছু নেবে না, নিলেও তাদের ভগ্ন অংশ পিছু নেবে। তুমি সেই ভগ্ন অংশের বিরুদ্ধে বারিগাজায় শক্ত যুদ্ধ করতে পারবে। আর তুমি আর তোমার গ্রীক বাহিনী যেভাবে দ্রুত পথ চলে বারিগাজা পৌঁছাতে পারবে, আমার সম্পূর্ণ বাহিনী তা পারবে না। তুমি তোমার বিশেষ বাহিনী নিয়ে খুব গোপনে শক শিবির ত্যাগ করো। বারিগাজাকে অভেদ্য করে তোলো। এটাই এখন তোমার একমাত্র কাজ।'

৮৬

সাতবাহন শিবিরেও আজ বিপরীত অবস্থা। কালকের নিস্তব্ধতা নেই। কোলাহল করছে সৈনিকেরা। কোলাহলের পরিমাণ একটু বেশিই। গতকালের পরাজয় যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত, আজকের বিজয়ও তেমনি চিন্তার অতীত। মহারাজ সাতকর্ণী আজ শিবিরে যথেচ্ছা আচরণের ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য সেটা সরাসরি দেননি। সেনাপতিদের বলে দিয়েছেন, সৈনিকদের যাতে আজকে অত কড়াকড়ির মধ্যে না রাখা হয়। আনন্দ তো আর শুকনো গলায় হয় না, সুরা তাঁবুর দরজা আজকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। গলাটা একটু ভিজতেই সৈন্যদের মন তরল হয়ে গেছে। শৃঙ্খলার শিকল ছিঁড়ে গেলে শোরগোল তো একটু হবেই।

রুদ্রদেব আর অসিত কিন্তু সেই পানে মত্ত না হলেও আহারে আপত্তি করেনি। অসিত বড়ো একটা মিষ্টির টুকরো পেয়েছে ভাগে। সেটাকে কায়দা করছে সে। রুদ্রদেবের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। তাকে পরিবেশন করা হয়েছে অভিজাতদের জন্য তৈরি করা খাবারের থালা।

শোরগোলের মধ্যে কেউ কারো কথা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না। কেউ অবশ্য নির্দিষ্ট করে কিছু শুনতে চাচ্ছেও না। তবে আওয়াজ যতই বেশি হোক না কেন, একটু পরেই তার মধ্যে একটা ছন্দ চলেই আসে। আর বাইরের অন্য কোনো শব্দে যদি সেই ছন্দ ভঙ্গ হয়, তাহলে সেটা এই কোলাহলের মধ্যেও কানে আসে। এই গভীর রাতে প্রান্তরের ওপর পাশ থেকে ক্রমশ জোরালো হতে থাকা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ওদের কানে ঠিকই এসেছে। কিছু সৈনিক সতর্ক হয়ে উঠলো। অত চিন্তার কিছু নেই। মাত্র একটা ঘোড়াই আসছে। একটু আগে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো সৈনিকেরা।

আরেকটু সামনে এগিয়ে আসতেই এক সৈনিক জোরালো গলায় বলল, 'কে আসছে এদিকে? সাবধান।'

ঘোড়া ততক্ষণে আরও একটু এগিয়ে এসেছে। এবার সওয়ারের কানে নিশ্চয়ই সৈনিকের চিৎকার পৌছেছে। ঘোড়ার গতি কমে এলো অনেকটা। আরেকটু সামনে আসতেই সেই ঘোড়া আর সওয়ারিকে দেখতে পেলো সৈনিকেরা। এক দেখাতেই বোঝা গেল এই সৈনিক এসেছে শক শিবির থেকে।

'থামো, আর এক পাও এগিয়ো না।' সেই সৈনিক এবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করলো।

আগন্তুক নির্দেশ পালন করলো। লাগামের হ্যাঁচকা টানে ঘোড়া জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

'এবার ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নেমে এসো। কোনো রকমের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছ কি আর বাঁচার আশা থাকবে না। নিজের পরিচয় দাও।'

আগন্তুক ঘোড়া থেকে নেমে এসে আলোর সামনে দাঁড়ালো, তার কাছে কোনো অস্ত্র নেই, অস্ত্র বাগিয়ে ধরার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, 'আমি শক দূত। মহারাজ নাহাপনার

কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। মহারাজ নাহাপনা মহারাজ সাতকর্ণীর উদ্দেশ্যে একটা বার্তা পাঠিয়েছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

সৈনিকেরা বুঝতে পেরেছে এটা সাধারণ দূত, তার থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তাদের মধ্যকার তরল ভাবটা আবার ফিরে এলো। এক সৈনিক এগিয়ে এসেছে দূতের দিকে, 'তোমাদের সব দূতেদের একই সমস্যা। সব খবরই তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে একসাথে নিজেকে নারদ মনে করো তোমরা।'

এবার সমর্থনের আশায় সেই সৈনিক বাকিদের দিকে তাকালো, 'আমি এই পর্যন্ত কোনো রাজদূতকে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর আনতে দেখিনি। তোমরা কেউ দেখেছ না-কি?'

সবাই না না স্বরে সায় দিলো। সেই সৈনিক এবার দূতের দিকে তাকালো, 'কই দেখি, পত্র দেখাও। কোথায় শক রাজার চিহ্ন সহ পত্র? দেখাও।'

'মহারাজ নাহাপনা কোনো পত্র দেননি। আমি শ্রুতিধর দূত। সব সংবাদ আমার স্মৃতিতে নিয়ে এসেছি।'

'বাহ, সেও ভালো। কিন্তু তুমি যে শকদের দূত তার কোনো প্রমাণ আছে। যে কেউ আসলেই তো তাকে আমরা মহারাজ সাতকর্ণীর সাথে দেখা করতে দিতে পারি না।'

সেই প্রমাণ অবশ্য আছে। দূত শকদের দূতিয়ালির চিহ্ন স্বরূপ একটা আংটি বের করে দেখাল। ভালো করে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো সৈনিকেরা। না, আর কোনো সন্দেহ নেই।

মহারাজ সাতকর্ণীর অনুমতি পাওয়া গেছে। দূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছেন তিনি।

ভালোভাবে তল্লাশির পর্ব সেরে দূতকে পাঠানো হলো মহারাজ সাতকর্ণীর তাবুর ভেতরে। কিছুক্ষণ পরেই দূত নিজেকে আবিষ্কার করলো মহারাজ সাতকর্ণীর সামনে। সপারিষদ বসে আছেন।

যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে দূত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। অনুমতি না পেলে কথা বলা যাবে না।

'বলো দূত, মহারাজ নাহাপনা কী খবর পাঠিয়েছেন? এখনও কী কথা থাকতে পারে ওনার? প্রস্তাব দেবার মতো কোনো কিছু তো এখনও তার কাছে বাকি থাকার কথা নয়।'

এক পারিষদ বলে উঠলেন, 'প্রস্তাব তো এখন একটাই আসতে পারে। শরণাগতির প্রস্তাব। সেটাই এখন ভালো বুদ্ধি। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, মহারাজ সাতকর্ণী শরণাগতের কোনো ক্ষতি করেন না। তাই আগেই দূত পাঠিয়ে নিজের আর নিজের অবশিষ্ট সেনার প্রাণ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।'

গিরিধারী বললেন, 'আচ্ছা, আমরা নিজেরা এত মত না দেই। দূতের কী বলার আছে সেটা শুনি।'

দূত প্রথা মেনে আবার মাথা নোয়ালো, তারপর দূত শাস্ত্রের খবর দেবার সাজানো কথাগুলো বলে গেল, 'মহারাজ, আমি এখন আপনার সামনে যে কথাগুলো বলবো সেগুলো আমার কথা নয়। আমি কেবল আরেকজনের কথা আপনার কাছে পৌছে

দিচ্ছি। এই কথাগুলোর সাথে আমার মতামত, সিদ্ধান্ত অথবা চিন্তার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি শুধুই একজন বার্তাবাহক। আপনি অনুমতি দিন মহারাজ।'

মহারাজ সাতকর্ণী অনুমতি দিলেন। নিশ্চয়ই শরনাগতির কথাই বলবে দূত। কিন্তু না, দূত যখন সংবাদ পাঠ আরম্ভ করলো তখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। মহারাজ নাহাপনা যেভাবে বলতে বলেছেন ঠিক সেভাবেই বলল সে। একটা শব্দও এদিক সেদিক হলো না। দূতের মুখে কোনো ভাবলেশ নেই।

কথাগুলো শুনতে শুনতে মহারাজ সাতকর্ণীর মুখ আপনা থেকেই শক্ত হয়ে গেল। মহারাজ নাহাপনা শরণাগতির প্রস্তাব পাঠাননি। তিনি যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তাতে যে কোনো ক্ষত্রিয়েরই শরীরের রক্ত ঝলকে উঠবে। তার রক্তেও ঢেউ এসেছে।

মহারাজের মনোভাব বুঝতে পারলেন গিরিধারী। সাবধান হলেন তিনি। প্রথমেই দূতকে তাঁবুর বাইরে পাঠাতে সচেষ্ট হলেন, 'ঠিক আছে। তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো দূত। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি তোমার ইচ্ছে মতো খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করো। আমাদের সিদ্ধান্ত তোমাকে অচিরেই জানিয়ে দেওয়া হবে।'

গিরিধারীর আদেশ শুনে আর দেরি করলো না দূত। উঠে দাঁড়িয়ে দুই সেনাকে মাঝে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দুই সেনার দিকে আগেই চোখের ইশারা করেছে গিরিধারী। এই দুজনই দূতের খাদ্য আর পানীয়ের ব্যবস্থা করবে।

মহারাজ সাতকর্ণীর পারিষদেরা সবাই চুপ। একটু আগের তরল ভাবটা এখন আর সভার মধ্যে নেই। কেউ কোনো কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না।

চুপ করে থেকে লাভ নেই। মূলেই বিনাশ করতে হবে এই সর্বনাশা সম্ভাবনার। গিরিধারী মুখ খুললেন, 'মহারাজ, নাহাপনার এই প্রস্তাবে কান দেবার কোনো মানেই হয় না। একটু চিন্তা করলেই তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'কী সেই উদ্দেশ্য?' মহারাজ সাতকর্ণীর গলায় কালো মেঘের শীতলতা।

'মহারাজ, তিনি যুদ্ধের এই অবস্থায় একটা অসম যুদ্ধে সমতা আনতে চেষ্টা করছেন। আমাদের সেনাবল বেশি, কাল যুদ্ধে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। মহারাজ নাহাপনা আর আর সেনাপতিরা কালকেই বন্দি হবেন। এখন আপনার ময়দানে নেমে তার সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ের কোনো মানে হয় না।'

'সেসব ঠিক আছে। আমি নিজেও নাহাপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। তবে যোদ্ধা হিসেবে তিনি তো কোনো অন্যায় প্রস্তাব পাঠাননি। তিনি নিজের যোদ্ধা অধিকারেরই প্রয়োগ করেছেন।'

ভয়টা প্রথম থেকেই পাচ্ছিলেন গিরিধারী। না, পরিস্থিতি বেঁকে যাচ্ছে। গিরিধারী তাড়াতাড়ি কিছু একটা বলতে গেলেন, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'থামুন। যুদ্ধ শাস্ত্র অনুযায়ী এক যোদ্ধা আরেক যোদ্ধাকে দ্বন্দ্ব করার আহ্বান করতেই পারে। সেখানে শর্ত হচ্ছে, যে সৈন্য আহ্বান করবে তাকে যাকে আহ্বান করছে তার সমান অথবা এক ধাপ নিচের অবশ্যই হতে হবে। মানে রাজাকে আহ্বান করতে পারবেন কেবল বিপক্ষের রাজা বা কোনো মহারথী। এখানে কোনো সাধারণ সৈনিক আমাকে আহ্বান করেনি। করেছেন বিপক্ষের মহারাজ। এই আহ্বান তিনি করতেই পারেন। তিনি রাজ্যধারী মহারাজ। পাণ্ডবেরা যখন কর্ণকে অর্জুনের সাথে দ্বন্দ্ব

করতে দিতে চাচ্ছিলো না, তখন দুর্যোধন তাকে রাজা বানিয়েছিল অর্জুনের সমান বানাবার জন্য। এই গল্প তো আপনার অজানা থাকার কথা নয়।'

গিরিধারী মহারাজের কথা মন দিয়েই শুনেছেন। শুনতে শুনতে তার মন খুঁজে বেরোচ্ছে পালটা যুক্তি। মহারাজ সাতকর্ণীর অহংকারে আঘাত লেগেছে। সেই ভাবটা কুৎসিত ভাবে জেগে উঠেছে। একটা বড়োসড়ো পরিকল্পনা অহংকারের এক ছিটে আঘাতেই ভেঙে খান খান হয়ে যেতে পারে। অহংকার যেমন সময়ে সময়ে মহারাজ সাতকর্ণীর প্রধান শক্তি, তেমনি এখন সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতাও বটে।

সাবধানে শব্দ বাছলেন গিরিধারী, 'মহারাজ, আমি জানি, আমাদের শাস্ত্রে সেই নিয়ম আছে। হয়তো সেই নিয়ম মহাভারতের সাথে সাথে যুদ্ধের নিয়মেও আছে। তবে সেটা তিন হাজার বছর আগের কথা। সেই সময়ের নিয়ম কি এখন খাটবে মহারাজ? অহংকার ত্যাগ করুন মহারাজ। শত্রুকে বাগে পাওয়া গেছে। নিঃশেষ করতে হবে। পরিকল্পনার শেষ ধাপ।'

এবার হেসে উঠলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'আচ্ছা, আপনি আমাকে শুরু থেকেই এভাবে বারণ করছেন কেন? আপনি কী ভাবছেন? আমি মহারাজ নাহাপনার সামনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াতেই পারবো না?'

প্রমাদ গুনলেন গিরিধারী মনে মনে। এবার আর কিছুই করার নেই। অহংকার তার সীমা ত্যাগ করেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি, মহারাজ সাতকর্ণী এখন আর তার কোনো বারণই শুনবেন না। নেশা জেগে উঠেছে। শস্ত্র হাতে নেবার নেশা, নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করার নেশা, নিজেকে আরও বড়ো ক্ষত্রিয় কিংবদন্তি হিসেবে তৈরি করার নেশা। এই দ্বন্দ্বের খবর নিশ্চয়ই ইতিহাস অনেকদিন নিজের পাতায় ধরে রাখবে।

মহারাজ সাতকর্ণী নিজের মত বলতে যাবেন এমন সময় দূত প্রবেশ করলো শিবিরে। এই দূত শকদের আসা দূত নয়, সাতবাহনের।

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলার এমন সুযোগ হারাতে চাইলেন না গিরিধারী, 'এমন সময় তুমি আবার এখানে এসেছ কেন?'

'মহামন্ত্রী, শক শিবিরে আমাদের গুপ্তচর অদ্ভুত নড়াচড়ার আভাস পেয়েছে।'

একের পর এক ঝামেলা। সবকিছু নিশ্চয়ই একই সুতোয় গাঁথা। গিরিধারী জানতে চাইলেন, 'অদ্ভুত নড়াচড়া মানে?'

'শক শিবির থেকে দুই সহস্রের মতো সৈন্য শিবির থেকে বেরিয়ে উলটো পথ ধরেছে। মনে হচ্ছে শক রাজ্যের দিকে রওনা দিয়েছে তারা। ওদের সাথে আছে লাল মুখো সেই পরদেশি সেনাপতি। সেই নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের।'

'কতক্ষণ আগে এই খবর এসেছে?'

'বেশিক্ষণ হয়নি। এক মুহূর্তের বেশি হবে না। ওরা যাত্রা করতেই আমাদের গুপ্তচর এসে খবর দিয়েছে। আমিও একটুও দেরি না করে এখানে চলে এসেছি।'

'আচ্ছা, যাও তুমি।'

দূত চলে যেতেই মহারাজ সাতকর্ণী গিরিধারীর দিকে ফিরলেন, 'এসব হচ্ছে কী? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। প্রথমে আমাকে এমন একটা প্রস্তাব পাঠালেন মহারাজ

নাহাপনা। এখন আবার নিজের শ্রেষ্ঠ বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছে শক রাজ্যে। ঘটনাটা হচ্ছে কী? আনন্দে মেতে থেকে আমরা শত্রুর চাল ফাঁকতালে সফল হতে দিচ্ছি না তো?'

গিরিধারী কিছু বললেন না। ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে তার মাথায়, 'মহারাজ আমাকে একটু ভাবতে দিন।' বসে পড়লেন তিনি।

রুদ্রদেব পারিষদের মাঝেই জায়গা পেয়েছে। যদিও সে মন্ত্রীদলের সদস্য নয়, সেনাপতিও নয়, তাই এই জায়গায় তার থাকার কথা ছিল না। তবে সবাই জানে সে কাগজে কলমে না হলেও সেনাপতি। আর সেই সম্মানই তাকে মহারাজ দিয়েছেন এই সভায় স্থান দিয়ে। মন্তব্য করে উঠলো সে, 'মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে এই যে সৈন্য ফেরত পাঠানো, এটা ওদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা। যদি প্রথম পরিকল্পনা কাজ না করে তাহলে এই ফেরত পাঠানো সেনারা দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পন্ন করবে।'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। গিরিধারীও রুদ্রদেবের কথাগুলো শুনেছেন। সাথে সাথে তার মাথায় এতক্ষণ চলতে থাকা চিন্তার সুতো জোড়া লাগে, 'ঠিক। এই দুটো কাজের মধ্যে এটাই সম্পর্ক। মহারাজ নাহাপনা দ্বিতীয় পথ ঠিক করে রেখেছেন। এই কারণেই কিছু সেনা পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের রাজ্যে।'

মহারাজ সাতকর্ণী কিছুই বুঝতে পারলেন না, 'মহারাজ নাহাপনা দ্বিতীয় উপায় ভাবলেন কেন? তিনি আমার সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করবেন কাল। এক হলে তিনি মরবেন অথবা আমি মরবো। এতে দ্বিতীয় পথের মানে কী?'

গিরিধারী এতক্ষণে সবটা বুঝে গেছেন, 'মহারাজ, কালকে মহারাজ নাহাপনা নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই দ্বিতীয় উপায় ভেবে রেখেছেন। তিনি যদি আপনার সাথে জেতেন তাহলে তো সন্ধি করতে বাধ্য হবো আমরা। এটাই তার চিন্তা।'

'আর যদি তিনি হেরে যান? মানে মারা যান?'

'তাহলে দ্বিতীয় উপায়। দেখুন তিনি এখনও জানেন না আপনি তার সম্মুখ দ্বন্দ্বের প্রস্তাব মেনে নেবেন কি নেবেন না। তবে কাল সম্মুখ সমর হোক অথবা তার সামান্য সেনা নিয়ে যুদ্ধ হোক মহারাজ নাহাপনার মৃত্যু অথবা বন্দি হওয়া তো প্রায় সুনিশ্চিত। কিন্তু তাকে হত্যা করে, তার পুরো বাহিনী ধ্বংস করেও যাতে সাতবাহন বাহিনীর কোনো লাভ না হয়, সেজন্যই তিনি তার শ্রেষ্ঠ সেনাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন শক রাজ্যে। আমার অনুমান ঠিক হলে তারা গেছে বারিগাজায়। শক রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে ঐ দিক দিয়েই করতে হবে।'

'সাতবাহন রাজ্যের লাভ নেই কেন? শক রাজা মারা গেলেই তো আমরা যুদ্ধ জিতে গেলাম।'

'না মহারাজ। আমাদের রাজ্যে এই বাহিনী ধ্বংস করে আমাদের কোনো লাভ নেই। গ্রীক সেনারা বারিগাজাকে অভেদ্য বানিয়ে যুদ্ধ করবে। সেই সাথে খবর চলে যাবে উজ্জয়িনিতে। সেই সাথে এদিকে সাহায্য আসবে উজ্জয়িনি, বারবারিকন, উত্তর শক আর পহলবদের কাছ থেকে। ভুলে যাবেন না, ঋষভদত্ত মানে নাহাপনার জামাতা এখনও উজ্জয়িনিতে আছে। এজন্যই মহারাজ নাহাপনার মৃত্যু হলেও আমাদের কোনো লাভ হবে না। সেই দিকে বিশাল শক বাহিনী আবার আমাদের অপেক্ষায় থাকবে। এই নতুন শক বাহিনীকে কোনোভাবেই একত্র হতে দেওয়া যাবে না।'

সবার কাছেই পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সময়ের বিবেচনায় একেবারে মোক্ষম চাল দিয়েছেন নাহাপনা।

গিরিধারী বললেন, 'এক এক করে এগোনো যাক। আমাদেরকেও দ্বিতীয় পরিকল্পনা করে রাখতে হবে। আগে ঠিক করি, কাল সকালে আমরা আমাদের সেনা পাঠাবো না-কি মহারাজ নিজে একা ঐ মহারাজ নাহাপনার সাথে দ্বন্দ্বে নামবেন।'

এই সিদ্ধান্ত দিতে মহারাজ সাতকর্ণী একটুও সময় নষ্ট করলেন না, 'সেটা তো আগেই ঠিক করে রেখেছি। আমি মহারাজ নাহাপনার সাথে দ্বন্দ্বে নামবো।'

'ঠিক আছে মহারাজ। তাহলে আপনার মৃত্যু কিংবা জয়ে আমাদের পরিকল্পনা একই থাকবে। আমরা শক সেনাকে পরাজিত করে তার অধিকার নিয়ে নেবো। তারপর কোনো রকম দেরি না করে শক রাজ্যের দিকে সেনা যাত্রা করবো। প্রথমে আমাদের লক্ষ্য হবে বারিগাজা, সেটা দখল করার পরে ওদের আসল রাজধানী উজ্জয়িনি দখল করে নেবো।'

রুদ্রদেব সাবধানে যোগ করলো, 'কিন্তু ততক্ষণে শত্রু সেনা বারিগাজা বন্দরে গুছিয়ে বসবে। বারিগাজা তো যেনতেন বন্দর নয়, বেশ সুরক্ষিত একটা বন্দর নগরী। শত্রু যদি সেখানে গুছিয়ে বসে তবে চট করে তাকে হারানো যাবে না।'

গিরিধারী এতে সায় দিলেন, 'হ্যাঁ। ঐ এলাকায় দুর্গ অথবা দেওয়াল ভাঙার যন্ত্র দিয়ে বেশি সুবিধা করা যাবে না। ঐ দুর্গ তো আর অমরাবতীর মতো দুর্বল করে রাখা নেই।'

মহারাজ সাতকর্ণী জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন তুমি কী করতে বলো?' প্রশ্নটা রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে।

রুদ্রদেব জানে, নিজের উদ্দেশ্য পূরণে তাকে এখন সাবধান হতে হবে। দুপক্ষের স্বার্থই রক্ষা করতে হবে এক সাথে, 'মহারাজ' রুদ্রদেব তার সিদ্ধান্ত দিলো, 'আমার মতে আমাদের এখনই ঐ লাল মুখের ফর্সা সেনাপতি এবং তার দলের পিছু নেওয়া উচিত। সম্ভব হলে তাদেরকে রাস্তাতেই আক্রমণ করতে হবে। আর যদি তা না পারা যায় তবে তাদেরকে বারিগাজা পৌঁছে যাবার পর বেশি সময় দেওয়া যাবে না। ঠিক মতো তৈরি হবার আগেই আমাদেরকে অবরোধ করতে হবে বারিগাজা।'

মহারাজ সাতকর্ণী সায় দিলেন, 'পরিকল্পনা তো যথেষ্ট মজবুত মনে হচ্ছে। কী বলেন গিরিধারী?'

'অবশ্যই। অতি সত্বর আমাদের সেনার এক অংশ পাঠানো দরকার ওদের পেছনে।'

'কোন দলটাকে পাঠানো যায়?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন মহারাজ সাতকর্ণী।

গিরিধারী সমাধান দিলেন, 'মহারাজ, ওদের ম্লেচ্ছ সেনা বারিগাজায় যাচ্ছে। তারাই সব সময় বারিগাজা রক্ষা করে। আর সেই ম্লেচ্ছ সেনার জন্যই তো আমরা আমাদের বিশেষ বাহিনী তৈরি করেছি। আমি বলি কী, রুদ্রদেব আর রিপুজিতের নেতৃত্বে সেই সেনাই পিছু নিক ওদের। রিপুজিত থাকবে সেই পিছু নেওয়ার দায়িত্বে। তার মতো ঐ অঞ্চল আর কোনো সেনাপতি চেনে না।'

হ্যাঁ, মহারাজ সাতকর্ণী সেটা জানেন। রিপুজিত যৌবনের প্রথম অংশে ঐ অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর গুপ্তচরের কাজ করেছিল।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। সময় হাতে নেই। রুদ্রদেব সভাকক্ষ থেকে বেরোতে উদ্যত হলো। বের হবার আগে মহারাজ সাতকর্ণীর সাথে শেষ আলোচনাটা সেরে নিলে সে,

'মহারাজ, যুদ্ধে যতক্ষণ শস্ত্র খাপে থাকে ততক্ষণই নীতি। শস্ত্র যখনই খাপ মুক্ত হবে তারপর আর কোনো নীতি নেই। তখন কেবলই পরিণতি। আর তা হলো নিজের অথবা শত্রুর মৃত্যু।'

মাথা নাড়লেন মহারাজ সাতকর্ণী। রুদ্রদেবের শেষ কথা তখনো বাকি, 'মহারাজ, আপনি বিজ্ঞ, কী আর বলবো। তবে যুদ্ধ নিয়ে আমার একটা মতামত আছে। যুদ্ধে ত্যাগ আর অর্জনের একটা সূক্ষ্ম হিসেব কষতে হয়। যে প্রকৃত যোদ্ধা সে ত্যাগ আর অর্জনের সেই হিসেব কষতে পারে, তারই জয় হয়। আশা করি আমাদের আবার দেখা হবে মহারাজ।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' মহারাজ সাতকর্ণীর কথাটা শেষ হতেই সভা কক্ষ ত্যাগ করলো রুদ্রদেব।

দুই পক্ষের সেনাদের মাঝে কানাকানি চলছে। কাল রাত থেকেই শুরু হয়েছে। সাতবাহন শিবিরে কাল যে উৎসব চলছিল তা শক দূতের প্রস্থানের সাথে সাথেই থেমে গেছে। কাল রাতে দুই শিবিরের মধ্যে দূতের চলাফের হয়েছিল। দূত কেন গিয়েছিল তা জানতে এখন আর কারো বাকি নেই। সবাই জানে আজ সকালে কী হতে যাচ্ছে।

সৈনিকেরা সবাই জানে আজ সকালে কাউকে যুদ্ধে যেতে হবে না। তবু সবাই সকাল সকাল উঠে প্রাত্যহিক কাজ সেরে যুদ্ধ সাজ পরে নিয়েছে। দুই পক্ষই বুঝতে পারছে, লড়াই দুই মহারাজের মধ্যেই হোক না কেন, যখন কোনো রাজার মৃত্যু হবে তখন সেই পক্ষের সৈন্যদের চুপ থাকার যে নিয়মের কথা বলা হয়েছিল তা রক্ষিত নাও হতে পারে। দুই পক্ষেই সেনারা তৈরি হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

মহারাজ নাহাপনা এমনিতেও এই যুদ্ধ যাত্রায় খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। আজ উঠেছেন আরও আগে। সূর্য উঠতে তখনো প্রায় দুই মুহূর্ত বাকি। শঙ্কায় বিছানায় থাকতে ইচ্ছে করছিল না, সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ নিজেকে তৈরি করে নেওয়া। শরীর অনেকদিন ধরে কোনো যুদ্ধ করেনি। জমে আছে। জমাটটা ছাড়াতে হবে। নিয়ম মেনে বেশ কিছু শরীর চর্চার কৌশল সেরে নিলেন তিনি। প্রথমে সরল চর্চাগুলো করলেও আস্তে আস্তে চর্চার তীব্রতা বাড়তে লাগলো, সারা শরীর ঘামে এমন ভাবে ভিজে গেল যেন এই মাত্র তিনি সরোবর থেকে ডুব দিয়ে উঠেছেন। অনেক ঘাম ঝরিয়ে মহারাজ নাহাপনা বিশ্রামে বসলেন। পরিচারকদের আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া হলো। তারা ওনার পেশীগুলোকে শিথিল করার জন্য মালিশ করতে শুরু করেছে।

মহারাজ নাহাপনা এখন জানেন, তার প্রতিটা পেশি এখন তৈরি। পরিচারকদের যুদ্ধ সাজ পরাতে নির্দেশ দিলেন তিনি।

ওদিকে মহারাজ সাতকর্ণীও সেরে নিচ্ছেন চর্চা। উত্তেজনা পুরো শরীর ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন তার। গিরিধারী সকাল থেকেই আছেন মহারাজ সাতকর্ণীর পাশে। কাল রাতে এক পলের জন্য চোখের পাতা এক করতে পারেননি তিনি। সকাল হতেই মহারাজের তাঁবুতে ছুটে এসেছেন। একটু আগেই মহারাজের চর্চা শেষ হয়েছে। এখন তার যুদ্ধ সাজ পরানো চলছে।

গিরিধারী জানেন, মহারাজকে এখন এই পথ থেকে ফেরানো কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই লড়াইয়ের আলোচনা শুরু করলেন তিনি, 'মহারাজ এই লড়াইয়ের পরিণতি কী হবে তা তো নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু আরও অনেক ব্যাপার তো বাকি আছে।'

'কী ব্যাপার?' মহারাজ সাতকর্ণী নিজের শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করছেন প্রাণায়াম করে।

'প্রথমেই আসে শস্ত্রের কথা। এই লড়াইয়ের জন্য কে কী শস্ত্র ব্যবহার করবে তা কে ঠিক করবে? ঘোড়ায় যুদ্ধ হবে না-কি রথে? না-কি শুধুই পদের ওপর? সেসবের কিছুই তো ঠিক হয়নি।'

মহারাজ সাতকর্ণীর উত্তেজনা প্রাণায়ামের গুণে বেশ একটু কমে এসেছে, 'হবে গিরিধারী। সে সবই ঠিক হবে। ওসব নিয়ে আলোচনা হবে। যখন হবে তখন আপনি আমার সাথেই থাকবেন। এখন উঠতে হবে। বিশ্রামের সময় শেষ।'

একটু পরেই প্রান্তরের দুই দিক থেকে ধুলো উড়িয়ে দুটো রথ পরস্পরের দিকে আসতে দেখা গেল। সমস্ত সৈন্য পলকহীন তাকিয়ে আছে দুই রথের স্পর্শ স্থানের দিকে। ঠিক প্রান্তরের মাঝ বরাবর।

শক রথে মহারাজ নাহাপনার সাথে সারথী আছেন। তবে রথ এখানে মহারাজই চালাচ্ছেন। সারথী যুদ্ধ এবং রথ চালনায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মহারাজ সাতকর্ণীর রথে অবশ্য সেকাজ করছেন গিরিধারী। মাঠ পর্যায়ের যুদ্ধ ক্রিয়ায় তিনি অপারগ হলেও সেই ছোটোবেলা থেকেই তিনি অশ্ব আর অশ্ব চালিত শকট চালনায় হাত পাকিয়েছেন। এটা তার একটা শখ বলা যায়।

দুই মহারাজই এক সাথে রথ থেকে নামলেন। দুই মন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন যার যার পক্ষের রথের পাশে। দুই মহারাজ দাঁড়িয়েছেন মুখোমুখি।

মহারাজ নাহাপনাই কথা শুরু করলেন, 'সাতবাহনের সীমানায় এটা আপনার সাথে আমার দ্বিতীয় দেখা। অবশ্য প্রথম দেখাটার তেমন তাৎপর্য ছিল না। ইতিহাস কথা বলবে আজকের দেখাটা নিয়ে। আজকেই বলতে গেলে প্রথম দেখা। আমি ধন্য বোধ করছি। হাজার হোক আপনি এই আর্যাবর্তের সবচেয়ে বড়ো রাজ্যের অধিকারী। সবচেয়ে শক্তিশালী সেনার সেনানায়েক।'

'আমিও কম ধন্য বোধ করছি বলে মনে করবেন না। আপনিও আর্যাবর্তের সবচেয়ে ধনী রাজা। আর শুনেছি শকরা যুদ্ধ কৌশলে অনেক পটু।'

'আচ্ছা, শুধু শুনেছেন। চিন্তা করবেন না মহারাজ। আজ সেটা নিজের চোখে দেখতে পাবেন। তা সে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও।'

হুমকিটা বুঝতে পেরেছেন মহারাজ সাতকর্ণী। তিনি কিছুই বললেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে বেশি মুখ চালানোর পক্ষপাতী তিনি না।

মহারাজ নাহাপনাই কথা বলছেন, 'অবশ্য এই দেখাটা আপনার প্রাসাদে সুরা পাত্র হাতে হলেই সবচেয়ে ভালো হতো।'

এবার কথা বলে উঠলেন মহারাজ সাতকর্ণী, 'আমার কাছে এই জায়গাটাও খারাপ মনে হচ্ছে না। আমার রাজ্যের প্রতিটা অংশই আমার কাছে সুন্দর। অবশ্য এক দল মানুষ এসে এই সৌন্দর্য নষ্ট না করলেই প্রকৃতি আরেকটু মনোরম থাকতো।'

'ঠিকই বলেছেন। দুই যুদ্ধ পটু রাজার জন্য এই ক্ষেত্রে দেখা হওয়াটাও কম কথা নয়।'

'ঠিক আছে। এ কথায় সে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করি।' মহারাজ সাতকর্ণী আর সময় দিতে ইচ্ছুক নন।

'ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি অবশ্য ভাবতে পারিনি আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন। তবে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে প্রমাণ করেছেন যে আপনি সাহসী, তেজবান ক্ষত্রিয়। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আপনি আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধা। তবে আপনার বিপক্ষের যোদ্ধা কিন্তু আগেই তার সাহসের প্রমাণ দিয়েছে।'

নিজের মাথা একটু উঁচু করলেন মহারাজ সাতকর্ণী, মুখের হাসিতে আত্মবিশ্বাস, 'কে কেমন যোদ্ধা, কে কতটুকু শিখেছে, কার যুদ্ধ গুরু কত কুশলী ছিলেন তা একটু পরেই বোঝা যাবে। আপনার প্রস্তাব আমি কালকেই মেনে নিয়েছি। আমাদের মধ্যে যে কোনো একজনের মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ শেষ হবে। আত্মসমর্পণের কোনো ব্যাপার এখানে থাকবে না। আর আমাদের মধ্যের যে কোনো একজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই যুদ্ধেরও ইতি ঘটবে। কোনো পক্ষই অন্য পক্ষের সেনার কোনো ক্ষতি করবে না।'

যিনি বললেন আর যিনি শুনলেন দুজনেই জানেন, এটা শুধু বলার জন্য বলা। এই নিয়ম আসলে কেউই মানবে না। তবু, দুজনেই এই কথায় সায় দিলেন।

আর কথা বাড়ানোর কিছু নেই। মহারাজ সাতকর্ণী নিয়ম আর নীতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, 'এবার তাহলে নীতি ঠিক করে নেই। প্রথমেই তো আমরা সময় সীমা ঠিক করে নিয়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত। এবার অন্যান্য নীতি ঠিক করে নেই।'

'আচ্ছা।'

'শস্ত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কী শস্ত্র ব্যবহার করবো আমরা? মুক্ত না-কি অমুক্ত?'

'এখানে আমার একটা প্রস্তাব আছে। একজন যোদ্ধা কত শস্ত্র বহন করতে পারে সেটাও তার একটা ক্ষমতা। তাই এখানে আমরা যে যা পারি শস্ত্র বহন করবো নিজেদের সাথে। তবে সেই সব শস্ত্রই হবে অমুক্ত। কেউ কোনো মুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। আশা করি এতে আপনার কোনো আপত্তি নেই।' নাহাপনার মুখে মুচকি হাসি।

'না, নেই। যে যত ইচ্ছে অমুক্ত অস্ত্র বহন এবং ব্যবহার করতে পারবে। কোনো অস্ত্রই কেউ মুক্ত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। যুদ্ধের বাহন কী হবে? রথ না-কি ঘোড়া?'

'যুদ্ধ হবে পায়ের ওপর। প্রান্তরে আমরা একে অপরের পরীক্ষা নেবো দাঁড়িয়ে। অন্য কোনো বাহনের সাহায্য নেবো না। ঠিক আছে?'

'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

নিয়ম সব ঠিক হয়ে গেছে। এবার লড়াইয়ের পালা। যে যার রথের দিকে এগিয়ে গেলেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে দুই পক্ষই। একই সাথে অনেক মঙ্গল শঙ্খ আর বাজনা বেজে উঠলো দুই পক্ষের শিবিরেই। এই বাজনাই তাল দেবে। তাল ছাড়া কি যুদ্ধ জমে? সেনারাও নানা উৎসাহ বাণী চেঁচিয়ে বলতে লাগলো।

মহারাজ নাহাপনা তার রথে সব শস্ত্রই নিয়ে এসেছিলেন। সেখান থেকেই শস্ত্র বেছে নিতে শুরু করলেন তিনি। এক সাথে অনেক শস্ত্র বহন করার সুবিধা আছে। অনেক রকম ভাবে আক্রমণ করা যায়। তিনি এই ব্যাপারে পটু। নিয়ম ঠিক করার সময় এই ব্যাপারটা তার পক্ষেই গেছে।

প্রথমেই নিজের সবচেয়ে পছন্দের শস্ত্রে হাত দিলেন মহারাজ নাহাপনা। একটা ভয়াল দর্শন বর্শা। সাধারণ বর্শার মতো একদিকে ফলা নয়। এই বর্শার দুই প্রান্তেই ধারালো ফলা। এই দণ্ড কোনো আঘাতেই নমনীয় নয়, অভঙ্গুর। বিশেষ উপায়ে তৈরি বলে এই বর্শা ওজনেও বেশ হালকা। নাড়াচাড়া করতে বেশ সুবিধা।

এবার আরেকটা অস্ত্র হাতে নিলেন তিনি। এই শস্ত্র ভারতের পরিচিত না। এটা তার পারিবারিক শস্ত্র। এই শস্ত্র পারস্যের এবং তার পরিবারের গৌরব বাঁকানো ভয়ংকর শমসের। এক হাতে দুমুখো বর্শা, আরেক হাতে বাঁকানো শমসের। এই দুই শস্ত্রের বাইরে আর কোনো শস্ত্রের প্রয়োজন পড়বে না।

তবু আরও কিছু ছোটোখাটো ছোরা নিজের যুদ্ধ সাজ আর বর্মের নানা খাঁজে গুঁজে নিলেন তিনি। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে দুই হাতে দুই শস্ত্র নিয়ে মহারাজ নাহাপনা যখন রথ থেকে নেমে এলেন তখন শক বাহিনীর হর্ষ ধ্বনি চরমে উঠলো। মহারাজ নাহাপনার ঋজু দেহ সগর্বে দাঁড়ালো প্রান্তরের মাঝে। তার সেই অটল দেহের ভেতরে যে হৃদয় আছে, সেখানে পর্বত সম আত্মবিশ্বাস।

ওদিকে মহারাজ সাতকর্ণী নিজের রথে শস্ত্র সন্ধান করছেন। তিনিও আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন কী করবেন। আগেই জানতেন দুজনের মধ্যেকার যুদ্ধে মুক্ত অস্ত্রের ব্যবহার না হবারই কথা। তার ধারণা সত্যি হয়েছে। তিনি বেছে নিতে লাগলেন অমুক্ত অস্ত্রগুলো। সারি সারি বর্ম সাজানো রয়েছে রথের পেছন দিকে। সেগুলো এড়িয়ে গেলেন তিনি। বিশেষ বর্ম লাগবে না। গায়ে যা আছে তাই যথেষ্ট। বর্ম দিয়ে আত্মরক্ষা হয়, আজ আত্মরক্ষার দরকার নেই, সেই বিদ্যে ভুলে থাকাই শ্রেয়।

অগ্নি পুরাণের নিয়ম অনুযায়ী বানানো বত্রিশ রকমের তলোয়ার সাজানো আছে তার রথে। এই বত্রিশ রকমের তলোয়ারেই সিদ্ধ হস্ত মহারাজ সাতকর্ণী। সেখান থেকে সবচেয়ে ভয়ংকরগুলো একটাই আজকের যুদ্ধের জন্য বেছে নিলেন তিনি। এই তলোয়ারের আঘাত কখনোই একাধিকের দরকার হয় না। এই ভয়াল দর্শন, প্রশস্ত তলোয়ারের নাম বিভীষণ।

দ্বিতীয় অস্ত্র হিসেবে কিছুতেই তিনি বর্শাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। শত্রুকে দূরে রাখতে মুখোমুখি যুদ্ধে এই অস্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। সাতবাহন কারিগরেরা মহারাজের জন্য বেশ যত্ন করে বর্শাগুলো বানিয়েছে। সেগুলো থেকে দশাসই একটা বেছে নিলেন তিনি। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এখনও কিছু জায়গা খালি আছে। সেখানে বেশ কিছু ছোরা নিয়ে নিলেন তিনি। প্রতিপক্ষ মুক্ত অস্ত্রের নিয়ম ভেঙে ফেললে তিনিও ছেড়ে কথা বলবেন না।

সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে যেতেই মহারাজ সাতকর্ণীও লাফিয়ে নেমে এলেন রথ থেকে। তার অতুল বাহুবল সমৃদ্ধ শরীর থেকে শক্তি তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন। তার সুগঠিত পায়ের দলনে ভূপৃষ্ঠ থেকে বেশ খানিকটা ধুলো উড়ল। তার হাতের দুটো অস্ত্র যেন ঝিকমিক করছে। নিজের সেনাদের উদ্দেশ্যে অস্ত্র তুলে ধরলেন তিনি। এবার উল্লাস করে উঠলো সাতবাহন সেনারা।

দুজনেই এবার এগোলেন দুজনের দিকে। ঠিক দশ হস্ত তফাতে দুজনে থমকে দাঁড়ালেন। এখন আর তাদের কারো কানেই কোনো শব্দ আসছে না। সৈন্যদের উল্লাস

ধ্বনি, বাজনার আওয়াজ সব যেন মিলিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। দুজনেই দুজনের হাত আর পায়ের দিকে নজর রাখছে। যদিও মুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করা নিষেধ তবু যে কেউই বর্শা ছুঁড়ে একটা সুবিধা নিতে পারে। আর যুদ্ধের সময় পায়ের দিকে নজর তো রাখতেই হবে। শরীরের এই একটা অঙ্গ দিয়েই তো মানুষ স্থান পরিবর্তন করে।

দুজনেই দুজনের শত্রু মাপছেন। বিভীষণ তলোয়ারের কথা আগে শুনলেও কখনো মুখোমুখি হওয়া হয়নি মহারাজ নাহাপনার। আর পারস্যের ভয়ংকর তলোয়ার শমসেরের মুখোমুখিও কখনো হননি সাতকর্ণী। তবে এবার মুখোমুখি হবার জন্য তিনি তৈরি।

প্রথম আক্রমণ করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। দুই লাফে পেরিয়ে এলেন মাঝের দূরত্ব। তারপর হাতের বিভীষণ দিয়ে ভীষণ আঘাত করলেন নাহাপনার উদ্দেশ্যে।

তড়িৎ গতির সেই আঘাত অবশ্য নাহাপনাকে তেমন একটা ঘাবড়ে দিতে পারলো না। সহজেই নিজের বাঁকানো ফলার শমসেরে সেই আঘাত এড়িয়ে গেলেন। বিভীষণের সাথে দেখা হলো শমসেরের। আগুনের ফুলকি দেখা গেল। বাঁকানো ফলায় পিছলে গেল বিভীষণের ফলা।

লক্ষ্য চ্যুত হওয়াতে আচমকা ভারসাম্য হারিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে এলেন মহারাজ সাতকর্ণী। তার মুখটা বিপজ্জনকভাবে নাহাপনার দেহের কাছে চলে এসেছে। নিজের বাঁ কাঁধ দিয়ে মহারাজ সাতকর্ণীর মুখে প্রবল আঘাত করলেন তিনি। প্রচণ্ড সেই আঘাতের তোড়ে বাতাসে উড়ে প্রায় তিন হস্ত দূরে গিয়ে পড়লেন মহারাজ সাতকর্ণী। তলোয়ার হাতে থাকলেও তার হাত থেকে ছিটকে গেল বর্শা। আঘাতের চোটে যেন এক পলকের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

তবে এখন তো জ্ঞান হারালে চলবে না। এখানে জ্ঞান হারালে প্রাণ হারিয়ে যেতে পারে।

মহারাজ নাহাপনার নিজের আঘাতের ওপর বিশ্বাস আছে। জানেন, এই আঘাত সহজে সামলে নিতে পারবেন না তার প্রতিপক্ষ। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন তিনি। মহারাজ সাতকর্ণীর বুকে কোনো শক্ত বর্ম নেই। সেই বর্মবিহীন বুকের ওপরে শমসেরের এক আঘাতেই এই লড়াইয়ের অন্ত হয়ে যাবে। স্থির দেহতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। শমসের তিনি তুলে ফেলেছেন সাতকর্ণীর বুক লক্ষ্য করে। তারপর করলেন মরণ আঘাত।

শমসেরের চকচকে ফলার দিকে তাকিয়ে আছেন মহারাজ সাতকর্ণী। ভীম বেগে সেটা ধেয়ে আসছে তার দিকে। না, কোনোমতেই জ্ঞান হারানো চলবে না এখন। একটা গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেলেন তিনি। নাহাপনার হাতের শমসের মাটিতে গাঁথলো।

ওদিকে মহারাজ সাতকর্ণী শুধু গড়িয়ে সরে যাননি। সেই সাথেই ছিটকে পড়ে যাওয়া বর্শাটা তিনি তুলে নিয়েছেন। মহারাজ নাহাপনা তলোয়ার চালাতে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়েছিলেন। মহারাজ সাতকর্ণীর হাতের বর্শাটায় একটা ঘূর্ণন উঠলো। তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারলো না, কেবল নাহাপনার কাঁধের একটু চামড়া ছিলে দিলো। মহারাজ নাহাপনার তাতে মনোযোগে একটুও ঘাটতি হলো না। তিনি নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ালেন।

দুই পক্ষের উত্তেজনাই এখন চরমে। সৈন্যরা সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দুই মহারাজের মধ্যকার এই ভীষণ লড়াই। তারাও শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল না। নিজ নিজ ভাষায় আর শব্দে নিজ নিজ রাজাকে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগলো তারা।

সাতকর্ণী আর নাহাপনা দুজনেই আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। একটু আগের খণ্ড লড়াইয়ে কোনো ফল হয়তো আসেনি, কিন্তু দুজনেই বুঝতে পেরেছেন বিপক্ষের শক্তি আর সামর্থ্য সম্পর্কে। বুঝতে পেরেছেন সহজে এই লড়াইয়ের অন্ত হবে না। দুজনের মধ্যেই পরাজয়ের ভয় জেগে উঠতে চাইছে, প্রাণপণে বাঁধা দিয়ে রাখতে হচ্ছে সেটা। ভয় পেয়ে মনসংযোগ হারিয়ে ফেললেই বিপদ। এখন একে অন্যকে ভালো করে মাপছেন তারা। এখন তাদের মধ্যে অকারণ আত্মবিশ্বাস নেই, প্রতি শ্বাসে সেখানে আছে সতর্কতা।

এরপরে দুই যোদ্ধাই সতর্ক হয়ে এগোলেন। যুদ্ধ শাস্ত্রের প্রাথমিক নিয়ম মেনে বেশ কয়েকটা আঘাত করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। সেগুলো হেলায় ফেরালেন নাহাপনা। নাহাপনার করা পাল্টা আঘাতগুলোও সাতকর্ণীকে খুব একটা বিচলিত করতে পারলো না। দুজনেই আরও একটা ব্যাপার বুঝতে পারলেন, শুধু শাস্ত্রের মুখস্থ আঘাত দিয়ে প্রতিপক্ষের কিছুই করা যাবে না।

দুই প্রবল প্রতিপক্ষ যখন সমানে সমান লড়ে তখন সবচেয়ে মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ধৈর্য। আরও একটা বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। শক্তি ক্রমশ কমে আসতে থাকে যুদ্ধ করতে করতে। দুই রাজারই শক্তি ক্রমশ কমে আসছে। ঘামের ধারা শরীর থেকে বেরিয়ে আসার হার বেড়ে গেছে। শ্বাসকার্য এখন আর অতি সহজে চালানো যাচ্ছে না। বাতাস যেন একটু ভারী হয়ে এসেছে। দুজনেই বুঝতে পারছেন কিছু একটা এখনই করতে হবে। শক্তি হারিয়ে গেলে তখন সাধারণ আঘাতেই মৃত্যু বরণ করে নিতে হবে।

তলোয়ার বাগিয়ে ধরে মহা শিবের নাগেন্দ্র ভঙ্গিমা ধারণ করে বেশ জোরালো আঘাত করলেন মহারাজ সাতকর্ণী। মারাত্মক সে আঘাত। কোনোমতে সেই আঘাত ঠেকিয়ে দিলেন মহারাজ নাহাপনা কিন্তু পুরোপুরি রক্ষা হলো না। তিনি তলোয়ারের সামনে পেতে দিয়েছিলেন বর্শা। কিন্তু সেই মজবুত বর্শাও সেই নাগেন্দ্র ভঙ্গিমার আঘাত সহ্য করতে পারলো না। প্রায় মাঝ বরাবর দুই টুকরো হয়ে গেল। এক ফলা নিয়ে এক টুকরো রয়ে গেল নাহাপনার হাতে।

মহারাজ নাহাপনা এবার নিজের বিপদ বুঝতে পারলেন। তার হাতের বর্শা অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন এর সাথে তলোয়ারের দৈর্ঘ্যের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ওদিকে প্রতিপক্ষের হাতের বর্শা এখনও অক্ষত।

বিপদে পড়লে কিছু মানুষের বুদ্ধি খোলে, আর কিছু মানুষ বিপদে বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে। এখানেই সফল আর ব্যর্থ মানুষের পার্থক্য। নাহাপনা বুঝতে পারলেন এবার তার বিশেষ কৌশলগুলোর একটা প্রয়োগ করতে হবে।

স্থির হয়ে দাঁড়ালেন মহারাজ নাহাপনা। আগে এমন বিপদের সময় বড়ো বড়ো যোদ্ধাদের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, বায়বাস্ত্র ছিল, ছিল আরও নানা রকম দিব্যাস্ত্র। সেসবের যুগ এখন নেই। তবে এখনও বিশেষ অস্ত্র তার কাছে আছে। তার আবিষ্কৃত কিছু কৌশল। সেগুলো তিনি আর তার অস্ত্রগুরু ছাড়া এই পৃথিবীর আর কেউ

জানে না। সেই গোপন কৌশলগুলোর মধ্য থেকেই তিনি একটা বেছে নিলেন প্রয়োগ করার জন্য।

এদিকে সাতকর্ণীও খেয়াল করেছেন, মহারাজ নাহাপনার হাতের বর্শার দৈর্ঘ্য অর্ধেক হয়ে গেছে। মনে মনে এবার নিজের হাতের বর্শা দিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন তিনি।

তবে সামনের পক্ষের অঙ্গভঙ্গি দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে আক্রমণ করতে হবে না, প্রতিপক্ষই আক্রমণ শানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে সেই ভঙ্গি কোনো শাস্ত্রীয় ভঙ্গি। অচেনা কৌশলে দাঁড়িয়ে আছেন নাহাপনা।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন নাহাপনা। দুই পাক শূন্যে ঘুরেই শমসের হাঁকালেন মহারাজ সাতকর্ণীর গলা লক্ষ্য করে। নিজের তলোয়ার বাড়িয়ে দিলেন মহারাজ সাতকর্ণী আঘাত এড়ানোর জন্য।

তবে, সেখানেই ঘটলো বিপত্তি। মহারাজ নাহাপনা আসলে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে চাননি। এটাই তার বিশেষ কৌশল। সাতকর্ণীর পূর্ণ মনোযোগ তলোয়ারের আঘাতের দিকে। তবে শূন্যে থাকতেই তলোয়ার সামলে ফেললেন মহারাজ নাহাপনা। সেই সাথেই ডান পায়ের জোরালো লাঠি বসালেন মহারাজ সাতকর্ণীর হাতে থাকা বর্শায়। সেই আঘাত এড়ানোর কোনো সময়ই পেলেন না মহারাজ সাতকর্ণী। মহারাজ নাহাপনার লাথি খেয়ে মহারাজ সাতকর্ণীর হাতের বর্শা বিশ হস্ত দূরে ছিটকে পড়লো। সাথে সাথে শক সেনারা তীব্র উল্লাসে যেন ফেটে পড়লো।

নাহাপনা কাজ শেষ করে দাঁড়ালেন। প্রতিপক্ষের হাতে এখন মাত্র একটা অস্ত্র। নিজের বিশেষ কৌশলের একটাই দেখিয়েছেন তিনি। আরও অনেক বাকি আছে। এবার খেলাটা শেষ করতে হবে। কিছুদিন আগে এক গ্রীক বণিক রুপী সেনাকে যেভাবে হত্যা করেছিলেন এখানেও সেই কৌশলই প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। আচমকা তলোয়ার চালালেন আবার মহারাজ সাতকর্ণীর গলা লক্ষ্য করে।

মহারাজ সাতকর্ণী একটু আগে শত্রুর কৌশল দেখেছেন। মহারাজ নাহাপনা ছদ্ম আঘাতে সিদ্ধ হস্ত। সতর্ক হতে হবে। তাই এই আঘাত আসতেই তিনি বুঝে গেলেন এটা আসল আঘাত না। কিন্তু গলা লক্ষ্য করে আসছে শমসের। না ঠেকালেও চলবে না। তলোয়ারে তার হাতের একমাত্র অস্ত্র বিভীষণ ব্যস্ত হয়ে যাবে, আর সেই সাথে আরেক হাতের অর্ধ বর্শা দিয়েই তিনি হানবেন মরণ আঘাত। কিন্তু কী করবেন তিনি এখন এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে?

ঠিক তখনই কাল রাতে বলা রুদ্রদেবের শেষ কথাটা যেন তার কানে ক্ষণিকের জন্য বেজে উঠলো। মনে পড়ে গেল রুদ্রদেবের উপদেশ। যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ আর অর্জনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হয়। যে সঠিক ভারসাম্য করতে পারে সেই জয়ী হয়। দাঁতে দাঁত চেপে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন তিনি।

মহারাজ নাহাপনা অবাক হয়ে দেখলেন, তার হাতের শমসেরের আঘাত মহারাজ সাতকর্ণী নিজের তলোয়ার দিয়ে ঠেকালেন না। তার বদলে বাড়িয়ে দিলেন নিজের বাম হাত। কনুইয়ের একটু ওপরের বর্মে আঘাত হানলো শমসের। বর্মের চামড়া আঘাত

সম্পূর্ণ এড়াতে পারলো না। চামড়া কেটে গিয়ে বাহুর মাংস কেটে বসলো শমসের, ফিনকি দিয়ে রক্ত ফোয়ারা ছুটলো।

ততক্ষণে নিজের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মহারাজ সাতকর্ণীর গলা লক্ষ্য করে বর্শাও চালিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজ নাহাপনা। তবে এই আঘাত যে আসবে তা আগে থেকেই জানতেন মহারাজ সাতকর্ণী। গলা একটু ডানপাশে সরাতেই কান ঘেঁষে পেরিয়ে গেল বর্শা। কানের লতির একটু চামড়াও ছিলেছে।

এবার নিজের বর্শার দৈর্ঘ্যের কথা চিন্তা করে আফসোস করা ছাড়া মহারাজ নাহাপনার আর কিছুই করার ছিল না। তার শমসের বিঁধেছে মহারাজ সাতকর্ণীর বাহুতে। বর্শা লক্ষ্য চ্যুত হয়েছে। বর্শার দৈর্ঘ্য কম বলে মহারাজ নাহাপনা বিপজ্জনকভাবে শত্রুর খুব কাছে চলে এসেছেন।

আর অপেক্ষা করলেন না মহারাজ সাতকর্ণী, তার ডান হাতের বিভীষণ চালিয়ে দিলেন তিনি। সেই ভীষণ তলোয়ারের ফলা মহারাজ নাহাপনার গলা দিয়ে প্রবেশ করে ঘাড় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাহুতে গভীর একটা ক্ষতের ত্যাগের বিনিময়ে প্রাণটা এই যুদ্ধক্ষেত্রে বাঁচিয়ে নিলেন মহারাজ সাতকর্ণী। মহারাজ নাহাপনা পড়ে আছেন ভূমিতে। কোনো পক্ষ উল্লাস করছে, আর কোনো পক্ষে শ্মশান তা তো আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

৮৮

অ্যালেক তার বাহিনী নিয়ে এখনও চলছে। সে কাল রাতে শক শিবির থেকে নিজের সেনাদের নিয়ে সে বেরিয়েছিল। তারপরে দুবার খাবারের জন্য স্বল্প বিরতি ছাড়া আর কোনো বিরতি নেই। সৈনিকদের যার প্রাকৃতিক কাজ সারার দরকার পড়ছে, তারা সেই কাজ সেরে আবার দৌড়ে বাহিনীর সাথে এসে মিলছে। কোনো রকমের বিরতি নেই। বেরোনোর সময় তারা যথাসম্ভব কম জিনিসপত্র নিয়েছিল, কোনো ধরনের রথ কিংবা বোঝা নেই। তাই দ্রুতগতিতে চলতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না।

আজ সকালে দুই রাজার মাঝে দ্বন্দ্ব হবার কথা ছিল। সেই দ্বন্দ্বের ফলাফল কী হলো তা জানারও কোনো উপায় নেই। মহারাজ নাহাপনা এতক্ষণে বেঁচে আছেন না-কি মারা গেছেন বলা যাচ্ছে না। তবে যাই হোক, তার কাজ বারিগাজা রক্ষা করা, তা সে ভালো ভাবেই করবে। এই রাতের বেলা অরণ্য সংকুল পথ হলে চলা যেত না। তবে বারিগাজার যাবার জন্য প্রশস্ত রাজমার্গ আছে। চলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

মানুষ যখন ভবঘুরে ছিল তখনের কথা বলা যাচ্ছে না, তবে যখন থেকে তারা ঘর বানাতে শিখেছে, তখন থেকেই বিপদের সময় তাদের সেই ঘরের কথাই মনে পড়ে। সেই বিপদ জাগতিকও হতে পারে, অলৌকিকও হতে পারে। সাতবাহনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে যখন অ্যালেকের বিশেষ ব্যূহ ব্যর্থ হয়েছিল, তখনই সে বুঝেছে সামনে ঘোর বিপদ উপস্থিত। এখানে থাকলে মরতে হবে। তখনই তার মনে পড়েছিলো বারিগাজার কথা। এটাই তার ঘর। দেশি-বিদেশি সবার জন্যই ঘরের টানের ব্যাপারটা সত্য।

তাই কাল সন্ধ্যার দিকে যখন মহারাজ নাহাপনা তাকে তার বাহিনী নিয়ে বারিগাজায় চলে আসতে বলল তখন সে মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছিল। তার সেনাদের কাছেও এই বারিগাজাই ঘর। সেই ঘরের টানে তারাও চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি সেই ইচ্ছের কাছে তেমন জোর পাচ্ছে না।

দুই দিনের রাস্তা তারা একদিনেই পার হয়ে এসেছে। বারিগাজা নগর আর খুব বেশি দূরে নেই। পথ চলতে চলতে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। এতক্ষণ রাতের পাখিরা অনাহুত আগন্তুকদের দিকে চেয়ে ডাকছিল, এখন পাখিরা বুঝতে পেরেছে, ঘর ছেড়ে খাবার খোঁজার সময় চলে এসেছে।

সৈনিকদের হাতে জ্বলছে মশাল। নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সেনারা মশাল বহন করছে। সেই মশালের কাঁপা মৃদু আলোতেই বাকি সেনারা পথ চলছে। রাজমার্গ হলেও জায়গায় জায়গায় খানাখন্দের অভাব নেই। মশাল ছাড়া পথ চলা যেত না।

এই পথের পথ প্রদর্শক এক মনে পথ চলছে। তার ঠিক পেছনেই আছে অ্যালেক। কিছুক্ষণ পর পর বাকি রাস্তার দৈর্ঘ্য জিজ্ঞেস করে দেরি করছে না সে, তবে নিজেই দূরত্বটা বোঝার চেষ্টা করছে। এটা একটা বিশেষ রাস্তা, যাবার সময় তারা এখান দিয়ে যায়নি। এই নতুন রাস্তায় বারিগাজার দূরত্ব অনুমান করতে চেষ্টা করছে সে। অনুমান

কতটুকু সত্যি হচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই। তবে তার মনে বলছে বারিগাজা আর তেমন একটা দূরে নেই।

এই পথ চলার মাঝেও পেছনের আতঙ্কের কথা ভুলতে পারেনি সে। তারা যে শিবির ত্যাগ করেছে সেই খবর অবশ্যই চলে গেছে সাতবাহন শিবিরে। নিশ্চয়ই তাদের পেছনে সেনা পাঠিয়েছে তারা। অবশ্য নাও পাঠাতে পারে। হয়তো চিন্তা করেছে, গেলে যাক, শক সেনাকে যুদ্ধে হারিয়ে তারপরে শক রাজ্যে এসে বাকি সৈনিকদের ব্যবস্থা করা যাবে। তবু পেছনের আক্রমণের কথা ভুলে যায়নি সে। একটুও না থামার জন্য সেটাও একটা কারণ। পেছনের সারির সেনাদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে। তারা পেছন দিকে লক্ষ্য রেখে রেখে চলেছে।

বারিগাজা কাছে চলে এসেছে- অ্যালেকের এই অনুমান মিথ্যে নয়। একটু পরেই বিশেষ রাস্তা থেকে সেনা উঠে এলো বারিগাজার প্রধান রাজমার্গে। সে জানে আরেকটু গেলেই বারিগাজার রাজপ্রাসাদের চূড়া দেখা যাবে। তারপর আরেকটু গেলে বারিগাজার দেওয়াল আর পরিখার পরের বিশাল দরজাও দেখা যাবে। ঘরের দেখা পেয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে।

ভোরের পাখিরা তখন পূর্ণ বেগে ডাকতে শুরু করেছে। মশালগুলোর এখন আর দরকার নেই। সেগুলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। পাখিদের কিচিরমিচির ক্ষণিকের জন্য থামিয়ে দিলো অ্যালেক নিজের বাজখাই গলা দিয়ে। সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিলো, 'সবাই চলতে থাকো। কেউ থেমো না। পারলে গতি বাড়াও। আমি জানি সবাই এখন অনেক ক্লান্ত। কারোই পা চলতে চাইছে না। তবু পা চালাও। আমরা আমাদের লক্ষ্যের খুব কাছে চলে এসেছি। খুব বেশি দেরি নেই, আমরা সবাই বিশ্রাম করতে পারবো।'

সেনাধ্যক্ষরা চেঁচিয়ে অ্যালেকের কথাটা পুরো সেনাদলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলো। সৈন্যরা নিজেদের ঘর দেখতে পেয়ে পায়ের বাকি শক্তিটুকু উজাড় করে দেয়ার জন্য তৈরি হলো। পা চলতে লাগলো আরও জোর শব্দ করে।

কিছু সৈনিক ঘোড়ার ওপরেও আছে। তাদের হয়ে কষ্ট করছে ঘোড়ারা। বেশ কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণীগুলোও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সওয়াররা কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলে তাদেরকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে। তাতে যেন একটু শক্তি ফিরে পেলো অবলা প্রাণীগুলো। সবগুলোর ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরের নিচে ঘামের দাগ পড়ে গেছে। নেহাত যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়া এগুলো। সাধারণ কোনো ঘোড়া হলে এতক্ষণে পেট মাটিতে লাগিয়ে বসে পড়তো নিশ্চিত।

ওরাই এতক্ষণ দেখছিল নগরের দেওয়াল আর পরিখা। এবার পরিখার দরজা আর দেয়াল পাহারা দিতে থাকা সেনারা ওদেরকে দেখতে পেলো। এত ভোরে যদিও চোখের পাতা বুজে আসাই স্বাভাবিক, তবু সময় স্বাভাবিক না হলে স্বাভাবিক কাজগুলোও বদলে যায়। নগরীর বেশির ভাগ সেনাই যুদ্ধে চলে গেছে। বাকি সেনাদের ওপরেই এখন বারিগাজার পাহারার দায়িত্ব। তাই সাধারণ সময়ের চেয়েও বেশি সতর্ক তারা। এই সময় চোখে ঘুম আসে না।

নিজেদের সেনাদের পোশাক আর সাজ দেখেই চিনতে পেরেছে তারা। এরা যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধে জিতে ফিরে আসার সময় সৈনিকদের মাঝে যে স্বাভাবিক উল্লাস দেখা যায় তা এদের আচরণে অনুপস্থিত। তার মানে পরাজিত হয়ে ফিরছে? সতর্ক হয়ে উঠলো পাহারার সৈনিকেরা।

সবার আগে থাকা অ্যালেককে দেখতে পেলো ওরা এতক্ষণে। অ্যালেকের নির্দেশই মানে ওরা। সেনাপতিকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো তাদের নড়াচড়া।

অ্যালেক আদেশ দিলো হাত তুলে। এই ইশারার মানে বোঝে তারা। এখনই পরিখার ওপরের পুল নামিয়ে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি। তার মানে পরিষ্কার। পেছনে নিশ্চয়ই কেউ তাড়া করেছে অথবা তাড়া করার সম্ভাবনা আছে। নির্দেশ পালনে লেগে পড়লো তারা। তাড়াতাড়ি নামাতে লাগলো পরিখার পুল। এখনও তারা ফলাফল নিয়ে নিশ্চিত নয়। যে সেনা দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ সফরে বেরিয়েছিল, তারা একটা চাঁদের আবর্তন পূর্ণ না হতেই ফিরে এসেছে। এখানে অবশ্যই গণ্ডগোল আছে।

পরিখার পুল নামানো হয়ে গেছে। অ্যালেক ঘোড়ার পিঠে বসে পুলের পাশে দাঁড়ালো। প্রত্যেক সেনাকে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়তে বলছে নগরে। সব সেনা আর বাহন প্রবেশের পর সেও ঢুকে পড়লো নগরে। না, আর বিপদ নেই।

এতক্ষণের যাত্রায় অনেক বার পেছনে ফেরার ইচ্ছে হলেও সেটা দমন করে রেখেছিল অ্যালেক। এবার নিজের নগরে প্রবেশ করেছে সে। আর ভয় নেই। এবার দেয়ালের ওপরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যে রাস্তা দিয়ে সেনা নিয়ে এসেছে সেই রাস্তার ওপর চোখ মেলল। তখনই দৃষ্টিসীমার একেবারে প্রান্তে পথের ওপর যে দৃশ্য সে দেখল, তাতে তার ক্লান্ত দেহ আর মন আবার চনমনে হয়ে উঠলো।

রাজমার্গের প্রান্তে প্রায় ক্রোশ খানেক দূরে বেশ পরিমাণ ধুলো উড়ছে। একটা বিশাল সজ্জিত সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে সেই রাস্তা ধরে। সে জানে এই সেনা কার। সজ্জাতেই সব বোঝা যাচ্ছে। জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'তাড়াতাড়ি পরিখার সেতু তুলে ফেলো। তাড়াতাড়ি। সব তীরন্দাজদের খবর দাও। যারা আমার সাথে এসেছে তাদেরকেও। বলবে দেবতারা এখনও বিশ্রাম আমাদের কপালে লেখেননি।'

এক সেনা ছুটল সব ব্যবস্থা করতে। অ্যালেক এদিকে উঠে গেল পরিখার পাশের দেয়ালের সবচেয়ে উঁচু স্থানে। এখান থেকে কেবল বাহিনীর সামনেটা দেখা যাচ্ছে। ওপর থেকে বাহিনীর সম্পূর্ণ রূপ দেখা যাবে। সেখান থেকেই বোঝা যাবে বাহিনীর আসল আকার আর শক্তি।

রুদ্রদেব তার সেনা নিয়ে এগিয়ে আসছে। পথের চিহ্ন দেখতে দেখতে মন্তব্য করলো সে, 'ওরা এই পথ দিয়েই গেছে। বেশিক্ষণ হয়নি।'

রিপুজিত আছে সবার সামনে। সেই পথ দেখাচ্ছে সেনাকে, 'হ্যাঁ, তাই হয়েছে। বারিগাজা আর বেশি দূরে না। ক্রোশ খানেক হবে।'

'তার মানে এতক্ষণে নিজেদের নগরে পৌঁছে গেছে ওরা। কাজটা কঠিন হয়ে গেল।'

রুদ্রদেবের পাশে ঘোড়ায় চলছে অসিত। সে মনে মনে খুব উত্তেজিত। তবে মনের উত্তেজনা লুকিয়ে রাখার কৌশল এতদিনে শিখে ফেলেছে সে। সে জানে তারা কোথায়

যাচ্ছে। এতদিনের অপেক্ষার অবসান হবে আজকে। একটু পরেই তারা পৌছে যাবে বারিগাজা বন্দরে। সেখানেই আছে অঙ্গদ। সাথে রাহু, তার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। কতদিন আগে নিজের গ্রাম থেকে সবকিছুকে বিদায় দিয়ে বেরিয়েছে। আজ সেই পথচলার অবসান হবে। এখান থেকে সফল হয়ে ধরতে হবে ফিরতি পথ।

তবে সে এটাও জানে এখানে তারা এসেছে শত্রু হিসেবে। যুদ্ধ করতে হবে। সহজে অঙ্গদের কাছে পৌছাতে পারবে না। যুদ্ধ জয় করতে হবে প্রথমে। দাঁতে দাঁত চাপল সে। এত কাছে এসে আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে না সে।

সাতবাহন রাজা সাতকর্ণীর পাঠানো সেনা যখন বারিগাজা বন্দরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সূর্যের সোনালি আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেওয়াল থেকে জায়গাটার দূরত্ব চোখের আন্দাজে মেপে নিলো রুদ্রদেব। সেনাদের আর এগোতে বারণ করলো। দেয়ালের ওপর শত্রুর তীরন্দাজদের তৈরি অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এতক্ষণে দেয়ালের বাইরের পরিখাও নজরে পড়েছে তাদের। পরিখার ওপর দিকে সেতু আর বারিগাজার প্রধান দরজার দিকে নজর পড়লো রুদ্রদেবের। সেই দরজার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালেক।

রুদ্রদেবের সাথে সরাসরি চোখাচোখি হলো তার। রুদ্রদেবের পেছনের বিশাল সেনাবাহিনীর দিকে তাকালো সে। যত বড়ো বাহিনীই হোক এখন আর তার কোনো ভয় নেই। এই গভীর আর চওড়া পরিখা এড়িয়ে কোনো সেনাই বারিগাজায় প্রবেশ করতে পারবে না।

তবে তাকে অবাক করেছে সামনের লোকটার পট্টি বাঁধা কপালের নিচের ভাবলেশহীন দুটো চোখ। সেখানে নির্লিপ্ততা। একযোগে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এই লোককে চেনে সে। যখন সাতবাহন বাহিনী তার ব্যূহ ব্যর্থ করে দিয়েছিল তখন এই লোকই ছিল সাতবাহন বাহিনীর নেতৃত্বে। এই লোকই এখানে আসা বাহিনীর সেনাপতি মনে হচ্ছে।

না, এখন আর আচমকা কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। ক্লান্ত দেহ আর কথা শুনতে চাইছে না। যারা নগরে ছিল সেই চনমনে সেনাদের দিকে আদেশ দিলো সে, 'তোমরা সবাই তীর আর বর্শা নিয়ে দেওয়ালের ওপরে দাঁড়াও। চোখের পলক ফেলবে না। যখনই পরিখার বিশ হস্তের মধ্যে শত্রুর কাউকে আসতে দেখবে ঠিক তখনই বর্শা আর তীর ছুঁড়বে।'

এবার যারা তার সাথে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক কষ্ট করে ফিরেছে তাদের দিকে গেল তার আদেশ, 'তোমাদেরকে বিশ্রামের সময় দিচ্ছি। তবে ঘুমে একেবারে ঢলে পড়ো না। তাহলে একেবারেই ঘুমিয়ে যেতে হবে। তোমরা ঠিক দুই প্রহর সময় পাবে। তার মধ্যেই স্নান করবে, আহার করবে, স্ত্রী সঙ্গ সম্পন্ন করবে, সন্তানদের আদর করবে, পিতামাতাদের আশীর্বাদ নেবে, যা ইচ্ছে তাই করবে, কিন্তু সবাই মনে রেখো, সময় মাত্র দুই প্রহর। তারপরেই তোমাদের সবাইকে রাজ প্রাসাদের সামনের প্রান্তরে যুদ্ধ সাজে দেখতে চাই আমি।'

আদেশ দিয়েই আর অপেক্ষা করলো না অ্যালেক। নিজের প্রাসাদের দিকে রওনা দিলো। তার জন্যও এই দুই প্রহরই বরাদ্দ। সৈনিকদের মধ্যেও তাড়াহুড়া দেখা গেল। যাদের পরিবার আছে তারা ছুটল প্রতিবারের দিকে।

অ্যালেক জানে এখন তার কী দরকার। কড়া মদে একটা লম্বা চুমুক, রং মহলের একজনকে বেছে নিয়ে বাহুলগ্না করা, আর শয্যা। সেই সব একত্র করে মাথায় ভালো করে চিন্তার জাল বিছিয়ে দিতে হবে।

এদিকে রুদ্রদেব সামনে থেকে নিজের সেনাবাহিনীর কাছে ফিরে এসেছে। রিপুজিত ততক্ষণে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছে। যুদ্ধ করতে হলে প্রথমেই শিবির স্থাপন করতে হবে। সেই কাজই করছে তারা। রিপুজিতের কাজে মাথা গলালো না সে। জানে, এই কাজ রিপুজিত কোনো রকম খুঁত ছাড়াই সম্পন্ন করবে।

দেওয়ালের ওপর থেকে সৈনিকেরা তীর আর বর্শা হাতে প্রস্তুত আছে। সেগুলোর ধারালো ফলা তাদেরকেই দেখছে। তবে সেগুলো এখনই ছোঁড়া হবে না, এটা রুদ্রদেব জানে।

পরিখার ধার ধরে বেশ কয়েকবার এদিক ওদিক যাতায়াত করলো সে। দূরত্ব বজায় রেখেছে যাতে তার দিকে তীর আর বর্শা না ছোঁড়া হয়। পরিখার এদিক থেকে দেওয়ালের উচ্চতা ভালো করে মেপে নিচ্ছে সে। না, বাস্তুশাস্ত্রের সব নিয়ম মেনেই দেওয়াল, নগর আর পরিখা তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ নিয়মে ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না। কিন্তু, এই যুদ্ধ জয় করতে হলে ভেতরে প্রবেশ করার উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। এবং তা সাতবাহন থেকে সসৈন্য মহারাজ সাতকর্ণী এসে পড়ার আগেই। তিনি চলে আসলে তার পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে যাবে।

শিবির মোটামুটি পাতা হয়ে গেছে। সদ্য পাতা শিবিরের সামনে একটা আসনে এসে বসলো রুদ্রদেব। এবার ভালো করে চিন্তা করার পালা। শ্বাস টেনে চিত্ত একটু স্থির করে নিলো সে।

ওদিকে অ্যালেক অন্দরে পৌঁছে গেছে। প্রথমেই স্নান করে নিলো সে। তারপর শয্যায় আশ্রয় দিলো শরীরকে। তার বাহুলগ্না সুন্দরী গ্রীক নয়, ভারতীয়। গ্রীক মেয়েরা তার কাছে অপূর্ব তাতে সন্দেহ নেই, তবে বৈচিত্র্যে ভরা পৃথিবীতে অন্য বৈচিত্র্যের স্বাদ নিতে তার কোনো আপত্তি নেই। নগর ত্যাগ করার আগে যখন যুদ্ধের বাজনা তখনো বাজেনি, তখনই এই মেয়েটার শরীর তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। নগরে ফিরে সুযোগ পেয়েই সেই নেশা কাছে ফিরে এসেছে সে।

রতিঋণ মিটিয়ে ভাবতে বসলো অ্যালেক। আক্রমণ করার একমাত্র উপায় পরিখার ওপরের দরজা দিয়ে। শত্রুপক্ষ অন্য কোথাও আক্রমণ করতে পারবে না। একমাত্র নদী পথ বাদে বাকি সব পথই উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। নদী পথ দিয়ে হয়তো আক্রমণ করতে পারে, তবে ভারতীয় রাজারা নৌ যুদ্ধে অতটা পটু নয়। আর নৌসেনা আসলেও তারা প্রবেশ করবে বন্দরের পাশ দিয়ে। বন্দর আর মূল নগরের মধ্যে আবার দেওয়ালের বাঁধা আছে। না, সে মোটামুটি দুর্ভেদ্য অবস্থাতেই আছে।

ওদিকে রুদ্রদেবও বসে বসে চিন্তা করছে। একটু আগেই রিপুজিতের কাছ থেকে জানা গেছে, এখানে একটা নদী আছে। নদীটা এখান থেকে দেখা যায় না, অপর

পাশে। মূল নগর আর বন্দর আলাদা করা আছে। নদীর দিক থেকে নৌ বাহিনী যোগাড় করে আক্রমণ করেও তেমন একটা লাভ হবে না। যা করার এদিক থেকেই করতে হবে। এই পরিখা যেভাবেই হোক পেরোতে হবে।

সুন্দরীর বাহুটা আরও শক্ত করে গলায় জড়িয়ে নিলো অ্যালেক। চিন্তার অন্তে পৌঁছে গেছে সে। তার মানে ওরা আক্রমণ করবে সামনে দিয়ে, অন্তত আক্রমণ করার চেষ্টা তো করবেই পরিখা পার হবার জন্য। কিন্তু অ্যালেক জানে তা অনেক কঠিন, রীতিমতো অসম্ভব। সে নিজে বিপক্ষের দলে থাকলে কী করতো? দেওয়াল ভাঙার যন্ত্রও নেই ওদের কাছে। এই সময়ে বাহিনী নিয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু করার নেই।

তখনই আরেকটা কথা মাথায় এলো তার। তাকে ভেতর থেকে খোঁচাচ্ছে কেবল ওদের সেই পট্টি বাঁধা লোকটা। ঐ লোকটাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তার কেন যেন মনে হচ্ছে সেই লোকটাই গ্রীকদের অজেয় ব্যূহ ভাঙার কৌশল আবিষ্কার করেছে। এক বেলার মধ্যেই কৌশল আবিষ্কার করে, এক প্রহরের মধ্যেই তার বাহিনীকে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলেছিল সাতবাহন সেনা। তাদেরকে এত হালকাভাবে নেওয়া চলবে না। ওদের তূনে আরও অনেক তীর থাকতে পারে, যেগুলোর সাথে সে পরিচিত নয়।

কোনোভাবে এই পরিখা আর অভেদ্য দেয়াল পার হবার বুদ্ধিও চলে আসতে পারে। সর্বক্ষণ শত্রুর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, ওরা যেসব কাজ করে, সেগুলোও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আর শত্রুকে ভয়ের ওপর রাখতে হবে। সুযোগ পেলেই ওদের দিকে আক্রমণ করতে হবে মুক্ত অস্ত্র দিয়ে।

অন্য সব পাশের চিন্তা বাদ দিয়ে রুদ্রদেব ভাবতে বসলো কীভাবে এই পরিখা অতিক্রম করা যায় সেই বুদ্ধি নিয়ে। এই নগরের গঠন পুরোপুরি নিখুঁত। তার মানে এমন কোনো গোপন উপায় নেই যা দ্বারা নগরে প্রবেশ করা যায়। কোনো সিঁদ কাটা যাবে না, কোনো গুপ্ত রাস্তার সন্ধানও সহজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। পথ তৈরি করে নিতে হবে। তার বাহিনী অসাধারণ, সবাই সব ধরনের শস্ত্র চালনায় পটু, কিন্তু এই দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা কোঁটা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এদিকে রসদেরও জোগাড় করতে হবে। এত সৈনিকের খাবার আর জলের জোগাড় করাও কম ঝামেলার কাজ না।

অ্যালেক বিছানায় পাশ ফিরল। ভুলেই গেল তার পাশে অপূর্ব এক যুবতী শুয়ে আছে। এতক্ষণে একটা চিন্তা মাথায় এসেছে তার। উজ্জয়িনিতে যে কেউই নেই তা তো না। মহারাজ নাহাপনার জামাতা সেখানে আছেন। তার কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে। এখন যে বাহিনী এসেছে তাদের হয়তো আটকে দেওয়া যাবে, কিন্তু মহারাজ নাহাপনাকে দ্বন্দ্বে হত্যা করে যদি মহারাজ সাতকর্ণী তার সম্পূর্ণ সেনা নিয়ে নগরে আক্রমণ করেন, তবে আর কিছুই করার থাকবে না। তার আগেই সাহায্য চলে আসলেই ভালো।

খবর পাঠানোর উপায় নিয়ে ভাবতে বসলো সে। দূত পাঠানো যাবে না, নদীপথও ব্যবহার করা যাবে না। নিশ্চয়ই শত্রু নজর রেখেছে এসব রাস্তায়। মৃদু হাসল সে, এরচেয়েও ভালো উপায় আছে খবর পাঠানোর।

রুদ্রদেব রিপুজিতের কথা ভাবছে। সে নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতিতে মহারাজ সাতকর্ণী আর মূল বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে বলবে। সেটাই স্বাভাবিক কাজ, কিন্তু তা তো রুদ্রদেব হতে দিতে পারে না।

মহারাজ সাতকর্ণী যদি চলে আসেন তবে বারিগাজা জয়ের পর বারিগাজার রত্নভাণ্ডারের অধিকার রাজার কাছে চলে যাবে স্বাভাবিকভাবেই। তা সে কোনোভাবেই হতে দেবে না। রত্ন ভাণ্ডারে সবার আগে এবং সবার অলক্ষ্যে তাকেই পৌঁছাতে হবে।

গিরিধারী বলেছিলেন, বারিগাজা থেকে অবশ্যই সেনা সাহায্য চেয়ে উজ্জয়িনিতে দূত যাবে। সেটা হতে দেওয়া চলবে না। সেই খবর আটকানোর ব্যবস্থাও করতে হবে। রিপুজিতকে বোঝাতে হবে। কাজ অনেক।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রুদ্রদেব, এগিয়ে গেল রিপুজিতের দিকে, 'শুনুন, সৈন্যদের মাঝে একটা আদেশ ছড়িয়ে দিন। যাতে সন্ধ্যের ঘনাবার পর কেউ কোনো শব্দ না করে, একটুও না।'

রিপুজিত নিজের কাজে লেগে পড়লো। রুদ্রদেব জানে, শত্রুর দুর্বলতা কাজে লাগিয়েই যুদ্ধ জয় করতে হয়। তবে এখানে শত্রুর কোনো দুর্বল দিক নেই। জীবনে এমন শত্রুরও মুখোমুখি হতে হয়, যেখানে শত্রুর কোনো দুর্বলতা চোখে পড়ে না। আর বিনা দুর্বলতার শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধ জয়ের একটাই উপায়।

নিজের সবলতা।

৮৯

দিনটা কোনোমতে কেটেছে। নিয়ম মেনে সময় কেটেছে, তবে সে যেন বড়ো ধীর হয়েছিল অ্যালেকের জন্য। সন্ধ্যের আভাস পাওয়ার সাথে সাথে তার চঞ্চলতা বাড়তে লাগলো। কাজটায় সফল হবার মধ্যে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

ওদিকে সন্ধ্যে নামার সাথে সাথে আগেকার পরিকল্পনা মতো সাতবাহনের বিশেষ বাহিনীর শিবিরে একেবারে নিশি নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। বারিগাজার সেনারা কোনো রকম নড়াচড়া লক্ষ্য করছে না। মশালগুলো শুধু চিড়বিড় আওয়াজে জ্বলছে। প্রকৃতি অবশ্য কারো সাথে কম মন্ত্রণা করে না। সে তার শব্দগুলো করেই যাচ্ছে।

রুদ্রদেব দাঁড়িয়ে আছে নিজের শিবিরের একধারে একটা খোলা জায়গায়। মশালের আলো থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়েছে সে। তাকে দেয়ালের ওপরের বারিগাজার সেনারা অন্ধকারের মধ্যে আলাদা করতে পারবে না। কিছু কিছু জায়গায় ধূপ মেশানো ধুনো থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই বস্তু থাকাতে রক্ষা। নয়তো মশা আর নানা পোকামাকড়ের জ্বালায় এখানে নিঃশব্দে বসে থাকার জন্য মহাযুদ্ধ করতে হতো। মশার বিরুদ্ধে শস্ত্র খাটে না।

রুদ্রদেব নিরস্ত্র নয়। বাম হাতে ধনুক ধরে রেখেছে সে। ভারী সেই বস্তুকে সে এমনভাবে ধরে রেখছে যেন সেটা কোনো শোলা জাতীয় দ্রব্যের তৈরি। অসিতও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রদেবের পাশে। এখানে এই সময়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না সে। তবে রুদ্রদেবের আদেশ, গুরুর আদেশ তো আর ফেলে দেওয়া যাবে না।

একটু পরেই অবশ্য সে উশখুশ করে উঠলো। এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া ভালো ছিল। যদিও তাঁবুর বিছানা তেমন আরামদায়ক নয়, তবু এই শ্রান্ত দেহে কোনো কিছুর ওপর শুলেই হলো। অধৈর্য হয়ে উঠলো তার কণ্ঠ, 'এখানে কী করছি আমরা?'

প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি রুদ্রদেব, 'আজ বিকেলের অনুশীলন করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'মনে এবং দেহে প্রস্তুত হয়ে নাও। অনুশীলন যতই করো না কেন, যতক্ষণ মাঠে না নামবে ততক্ষণ সূর্যের উত্তাপ টের পাবে না। খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে জীবনের প্রথম যুদ্ধে নামতে হবে।'

'যুদ্ধ করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

অসিতের দিকে তাকালো না রুদ্রদেব, সে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে, 'শোনো, আমি জানি, বারিগাজাতে তোমার স্বার্থ আছে। তোমার লক্ষ্য লুকিয়ে আছে এই নগরেই। আমি জানি তোমার অভীষ্ট তুমি স্বীয় বাহুবলেই অর্জন করে নেবে। তবে উত্তেজনা দমন করো। কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করবে না, তাড়াহুড়া করে চিন্তাও করবে না।'

'আমি উত্তেজনা দমন করেই শত্রুর মুখোমুখি হবো। যুদ্ধ শুরু হবে কখন?'

'যখন আমরা সাপকে গর্ত থেকে বের করার কৌশল জানতে পারবো।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো অসিত, 'তা সাপের কি আজকে গর্ত থেকে বের হবার কোনো সম্ভাবনা আছে? আজকে রাতে কি যুদ্ধ হবে?'

'একটা কথা ভুলে যেয়ো না অসিত, যুদ্ধ শুধু মাঠেই হয় না। দুই শত্রু যখন মুখোমুখি হয় তখন অস্ত্রের যুদ্ধের আগেই মাথার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এখানে এখন তাই চলছে। এই যে আমি এখানে আলো থেকে লুকিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি সেটাও তো এক প্রকার যুদ্ধ।'

'এটাও যুদ্ধ?' অবাক হয় অসিত।

'হ্যাঁ। হতে পারে আমাকে এভাবেই সারা রাত এখানে এভাবে শস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এখন আমি আর তুমি কোনো কথা বলবো না। কথা বন্ধ। সব সৈন্যের কথা বলা আর শব্দ করা বন্ধ করেছি আমি আর নিজেই সমানে বকে যাচ্ছি।'

অসিত চুপ হয়ে গেল। দুজনের মাঝে অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। রুদ্রদেব জানে তাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে। অসিতকে একটা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই সে এখানে এনে রেখেছে। সেও অপেক্ষা করুক।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সব ধরনের পাখির আওয়াজ মিলিয়ে যেত লাগলো। রাত্রির নিজস্ব একটা শব্দ হচ্ছে। একে থামানোর সাধ্য কারো নেই। সেই শব্দই কেবল শোনা যাচ্ছে এখন।

রাত্রির প্রথম প্রহর এভাবেই কেটে গেল। অপেক্ষার পালা শেষ হলো দ্বিতীয় প্রহরের মাঝামাঝি সময়ে। বারিগাজার দেয়ালের ওপর থেকে একটা বিশেষ ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে এলো। শব্দটাকে কোনোভাবেই জোরালো বলা যাবে না। তবে রুদ্রদেব এমনিতে সতর্ক, সে এই শব্দের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, তার কান মৃদু শব্দে ধোঁকা খেলো না।

বায়ু বেগে রুদ্রদেবের হাতে উঠে এলো ধনুক, একই সাথে তূণ থেকে একটা মোক্ষম তীর চলে এসেছে আরেক হাতে। ধনুকে তীর জুড়তে তার পলকেরও কম সময় লাগলো। এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে একবারের জন্যও আলোর দিকে তাকায়নি সে। নিজের চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে চায়নি। তার অন্ধকার সয়ে যাওয়া চোখে আকশে সদ্য উঠে আসা পাখিটার দেহ স্পষ্ট দেখতে পেলো সে।

শিকারের গতি বুঝে নিয়ে তীর ছেড়ে দিলো রুদ্রদেব। অব্যর্থ এই শব্দভেদের জ্ঞান। পাখিটা তীর ছোঁড়া মাত্র সারা জীবনের মতো ডানা ঝাপটানোর ক্ষমতা হারালো সে। পায়রার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে তীর।

ওদিকে অ্যালেক নিজে অন্ধকারে পায়রার গতিপথ ঠিক দেখতে পায় না। সে বুঝতেও পারলো না এতক্ষণ ধরে প্রস্তুতি নিয়ে যে পায়রাকে সে উজ্জয়িনিতে পাঠাতে চেয়েছে, সে পায়রা উজ্জিয়িনির পথে ঠিকমতো যাত্রাই করতে পারেনি। তার আগেই রুদ্রদেবের অমোঘ বিদ্যের কল্যাণে সে প্রাণ হারিয়ে পড়ে আছে দেওয়াল থেকে একটু দূরে। তার পায়ে এখনও ছোটো করে লেখা পত্রটা রয়ে গেছে।

কাজ শেষ করে অসিতের দিকে তাকাল রুদ্রদেব। অসিত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এই অন্ধকারে রুদ্রদেব কীসের দিকে তীর ছুঁড়েছে আর কেন সাফল্যের হাসি হাসছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তাকে নিয়ে রিপুজিতের ডেরাতে প্রবেশ করলো রুদ্রদেব। রিপুজিত অহংকারী হলেও তা কেবলই যুদ্ধক্ষেত্রে, এমনিতে তার চলাচল বেশ সাধারণ। রুদ্রদেবকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো রিপুজিত, 'আরে, এখন এসেছেন আপনি। এদিকে কথা না বলে বলে সেই বিকেল থেকে আমার অবস্থা খারাপ। আর কতক্ষণ চুপ করে থাকতে হবে? সৈনিকেরা এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলে তো তাদের বুক ফেটে যাবে। কথা এভাবে আটকে রাখা তীব্র মূত্র আটকে রাখার চেয়েও কঠিন।'

না হেসে পারলো না রুদ্রদেব, 'না সে কাজ হয়েছে। আপনি আর আপনার সেনারা এবার কথা শুরু করতে পারেন। ইচ্ছে হলে একটু চিৎকার চেঁচামেচিও করে নিতে পারেন। তবে, আজ রাতে আমার কাজ শেষ হয়েছে, আর দ্বিতীয় কাজটা আমাদের সবাইকে মিলেই করতে হবে।'

'আপনি যা বলবেন সেটাই সবাই করবে, কোনো সমস্যা নেই। শুধু একটাই অনুরোধ, এভাবে আর কখনো কথা বলা, শব্দ করাতে বারণ করবেন না। এখন বলুন, কী কাজ করতে হবে?'

'শুনুন, আমাদেরকে সৈনিকদের মধ্য থেকে কিছু সেনা বাছতে হবে। যাদের শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে আর নির্মাণ জ্ঞান ভালো।'

চেহারা থেকে এবার কৌতুক মুছে গেল রিপুজিতের, মনোযোগী হলো সে, 'নির্মাণ কাজ জানা সেনা দিয়ে এখন কী হবে? আপনি আসলে কী পরিকল্পনা করেছেন?'

'শুনুন, আমি খুলেই বলছি। আপনিও নিজের মত দিতে পারেন। আমরা এই পরিখা কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারবো না। লাফ দিয়ে অথবা অন্য কিছু করে সম্ভব নয়। এই পরিখা একটা উপায়েই অতিক্রম করা যাবে। সেটা হচ্ছে সেতু। আর আপাতত যে সেতু আছে সেটা ওদের নিয়ন্ত্রণে। তাহলে সহজ হিসেবে এখন আমাদের সামনে একটাই উপায় আছে, তা হচ্ছে একটা সেতু নিজেদের জন্য বানানো। আমাদের বাছাই করা কারিগররা সেই সেতু তৈরি করবে। তারপর সেই সেতু আমরা পরিখার ওপর ফেলে আমরা পরিখা পেরিয়ে যাবো। পরিকল্পনা অত জটিল না। তবে দক্ষ কারিগর লাগবে।'

'পরিকল্পনা অত্যন্ত কার্যকরী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এত কষ্ট করার দরকার কী? মহারাজ সাতকর্ণী সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে শীঘ্রই এখানে এসে উপস্থিত হবেন। তখন যা করার করা যাবে।'

'আচ্ছা আপনি কি জানেন, মহারাজ সাতকর্ণী আর মহারাজ নাহাপনার মধ্যের যুদ্ধের কী পরিণাম হয়েছে?'

'না, তার কোনো খবর পাইনি।'

'হতেও তো পারে, এতক্ষণে তিনি সেই দ্বন্দ্বে মারা গেছেন। সে হিসেবে মহারাজ সাতকর্ণী আসবেন না, মহারাজ নাহাপনা আসবেন এখানে। তার আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।'

রিপুজিতের মুখে চিন্তা, 'তাই তো। তাহলে সেতুই বানাতে হবে।'

'হ্যাঁ। আমি সেতু বানাবার সব পরিকল্পনা করে ফেলেছি। আমি দৈর্ঘ্য প্রস্থ সবই ঠিক করে ফেলেছি। আপনি কেবল যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ লোকবল জোগাড় করুন।'

'ঠিক আছে, আমি এখুনি যাচ্ছি। যত পারি লোক জড়ো করছি।'

'ঠিক আছে, জলদি, এই রাতটুকুই কেবল আমাদের কাছে আছে।'

রিপুজিত যে অনেকগুলো দক্ষ কারিগর জোগাড় করতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার কর্মতৎপরতা দেখার মতো। যেদিন থেকে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সেদিন থেকেই এই বাহিনীর সব ধরনের খবরাখবর তার নেওয়া। এই সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের নাড়িনক্ষত্র তার জানা। কে আগে ব্যক্তি জীবনে কী করতো সেসব বেশ ভালো করেই জানে সে। সেনাদলের মাঝ থেকে কামার আর সূত্রধরদের এক জায়গায় জড়ো করতে তার বেশি সময় লাগলো না।

জড়ো করার পর রিপুজিত খবর পাঠাল রুদ্রদেবকে। জড়ো হওয়া সৈন্যদের সামনে এসে দাঁড়ালো রুদ্রদেব। এতদিনে সব সৈন্যই রুদ্রদেবের ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে গেছে। তাদের চোখে স্পষ্ট শ্রদ্ধা।

সেনাদের উদ্দেশ্যে বলল রুদ্রদেব, 'আমরা একটা সেতু তৈরি করবো। আজ রাতের মধ্যেই। তারপর মজবুত সেই সেতু ফেলে দেবো পরিখার ওপর। ঐ সেতু দিয়েই পার হয়ে যাবো পরিখা। এছাড়া বারিগাজা নগরে ঢোকার আর কোনো উপায় নেই। তোমরা এখনই কাজে লেগে পড়ো।'

প্রথমে উপকরণ জোগাড় করতে হবে। সেসবের অভাব নেই আশেপাশে। সেগুলো যোগাড় করতে শুরু করলো তারা। দড়ি হিসেবে কাজ করবে মজবুত লতা, সেগুলো ছিঁড়বে না। আর সেতুর কাঠের পাটাতনের জোগান দেবে দুটো বড়ো গাছ। সেই গাছ কেটে ফেলতে তেমন সময় লাগলো না। ছুতোররা সবাই দক্ষ কাঠুরে। আর যেসব হস্ত যন্ত্র লাগবে সেসব এমনিতেই শিবির স্থাপন আর ঘর বানাতে ওদের কাছেই আছে।

কাঠ কেটে বেঁধে বেশ মজবুত করে একটা বড়ো সেতু বানানো শেষ হতে রাত্রির শেষ প্রহর চলে এলো। পাটাতন এতক্ষণ রুদ্রদেবের পরিকল্পনায় ছিল, এবার সামনে চলে এসেছে। একবার দেখেই বুঝতে পেরেছে, না এতে কাজ হবে।

পরিকল্পনাটা আরেকবার ঝালিয়ে নিলো সে। পরিখার পাশের একটা গাছ কালকেই বেছে নিয়েছে সে। সেই গাছের এটা শক্ত ডালে দড়ির সাহায্যে বাঁধতে হবে এই পাটাতন। তারপর আস্তে আস্তে লতার দড়ি ছাড়লেই নিচের প্রান্ত থাকবে এই পাশের মাটিতে আর ওপরের প্রান্ত পরিখার ওপর দিয়ে গিয়ে পড়বে ঐ পাশের মাটিতে। চোখের আন্দাজে পরিখার পাশটা মাপলেও সেতুর দৈর্ঘ্য দেখে রুদ্রদেব নিশ্চিত, অপর প্রান্ত অবশ্যই ওদিকের মাটি স্পর্শ করবে।

যারা সেতু বানানোয় সারারাত পরিশ্রম করেছে তাদের বিশ্রামে পাঠিয়ে দিলো রুদ্রদেব। যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছে তারা। এবার আসল ঘটনার পরিকল্পনা করতে হবে।

সেতু বানানো একটা কঠিন কাজ হলেও সবচেয়ে ঝামেলা হবে সেতু পরিখার ওপর দিয়ে বিছানোর সময়। ওপাশের সেনাদের সামনে প্রথমে এই পাটাতন সেই পরিখার পাশের গাছের কাছে নিতে হবে। তারপর গাছের ডালের সাহায্যে দড়ি টেনে পাটাতন

খাড়া করে দড়ি ছেড়ে দিলেই সেতু পরিখার ওপর দিয়ে বিছিয়ে পড়বে। এই কাজগুলো করতে হবে বিপক্ষ সৈনিকদের চোখের সামনে। তারা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। অবশ্যই বাঁধা দেবে। তীর আর বর্শা ছুঁড়বে একযোগে। সেনারা ঢালের আড়ালেও যেতে পারবে না। বেঘোরে মরবে। নিজের পরিকল্পনার এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তা এখনও ভেবে উঠতে পারেনি সে।

এবার ভাবতে হবে। নিজের ঘোড়ায় চড়ে এই ভোরবেলা সে রেকি করতে শুরু করলো। গাছ আগেই বেছে নিয়েছে। এবার বেশ কিছু জায়গা খুঁজতে লাগলো যেগুলোর আড়ালে লুকিয়ে তার সেনারা বিপক্ষের তীর আর বর্শার জবাব দিতে পারবে।

সকালের আলো একটু একটু করে ফোটা শুরু করেছে। সেই সাথেই শেষ হলো রুদ্রদেবের রেকির কাজ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার সেনার সম্ভাব্য অবস্থানগুলো ঝালিয়ে নিতে লাগলো। না, সব ঠিক আছে। পরিকল্পনাতে কোনো খাদ নেই।

অ্যালেক খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠে নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো। যদিও তার সেনারা অনেক বিশ্বাসী তবু এই সময়ে কারো ওপরেই বিশ্বাস রাখতে পারছে না সে। নিজের চোখে এবার শত্রুসেনার গতি বুঝতে হবে। কে জানে, কী পরিকল্পনা আবার আঁটতে বসেছে তারা।

তবে তাকে শত্রুসেনার কাছে যেতে হলো না। প্রাসাদ থেকে বেরোতেই দেখতে পেলো এক সৈন্য দৌড়ে তার দিকেই আসছে। একটু থমকে দাঁড়ালো অ্যালেক। কী হলো আবার? কোনো শব্দ তো সে পায়নি।

ছুটে আসা সৈনিক অ্যালেকের সামনে এসে দাঁড়ালো। অর্ধেক উত্তেজনা আর অর্ধেক পরিশ্রমে সে ভালোই হাঁপাচ্ছে, কথা ঠিকমতো বলতে পারছে না, 'মহামান্য সেনাপতি, আপনি এখুনি একবার দেওয়ালের দিকে আসুন।'

নিশ্চয়ই শত্রু কোনো একটা চাল দিয়েছে, অ্যালেকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু ঘটছে। সৈনিকের কাছ থেকে কী হয়েছে সেটা শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না সে। ঝেড়ে দৌড় দিলো দেওয়ালের দিকে। আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করার সময় নেই।

দেওয়ালের ওপর ওঠা পর্যন্ত দৌড় থামালও না সে। যা দেখল তাতে তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো। বিপক্ষের সেনারা এক রাতের ভেতরেই তাদের পরিখার ওষুধ খুঁজে বের করে ফেলেছে। একটা বিশাল সেতু বানিয়ে ফেলেছে তারা। আর এখন সেই সেতু দড়ি বেঁধে বেশ কয়েকটা ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে আসছে পরিখার দিকে। এই পাটাতন একবার পরিখার ওপর ফেলতে পারলে তাদের পরিখা আর কোনো কাজেই আসবে না। সর্বনাশ হবে।

না, মনোযোগ হারালে চলবে না। ভালো ভাবে নজর দিলো এবার অ্যালেক। ঠিকমতো তাকাতেই বুঝতে পারলো শত্রুর পরিকল্পনা। পরিখার ওপাশে কাছেই একটা বিশাল কাণ্ডের গাছ আছে। সেই গাছ সহজেই এই পাটাতনের ভার নিতে পারবে। শত্রুও সেই পরিকল্পনাই করেছে। ঘোড়া দিয়ে দড়িতে টান দিলেই সেই কাণ্ডের লাগোয়া ডালের ওপর দিয়ে চলে যাবে দড়ি। পাটাতন খাড়া হয়ে যাবে। তারপর দড়ি কেটে দিলেই খেলা শেষ। পাটাতন এসে পড়বে পরিখার ওপর।

অ্যালেকের মাথার মধ্যে চমক চলছে। না, শত্রুকে কিছুতেই সফল হতে দেওয়া যাবে না। বুদ্ধির খেলায় হেরে যাবে না সে। একবার পাটাতন ফেলে দিলে আর কিছুই করার থাকবে না। যা করার এখনই করতে হবে।

চিৎকার করলো অ্যালেক, 'তীরন্দাজরা, সবাই এই মুহূর্তে শত্রুর উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়তে শুরু করো। কোনো রকমের বিরতি দেবে না। শত্রু এবার বুঝতে পারবে, মেঘের বৃষ্টির থেকেও তীব্র হতে পারে তীরের বৃষ্টি।'

যে ঘোড়াগুলো এখন পাটাতন টেনে আনছে তারা আর তাদের নিয়ন্ত্রকরা এখন তীরের আওতার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সেনাপতির নির্দেশ পেতেই তীরন্দাজরা দেয়ালের ওপর থেকে একাধারে তীর ছুঁড়তে শুরু করলো। তীরের প্রথম পশলাতেই প্রায় পনেরো জন সাতবাহন সেনা নিহত হয়েছে। এতে তীরন্দাজদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তীর ছুঁড়তে শুরু করলো নির্বিচারে।

আচমকা আক্রমণে হতভম্ব হয়ে পড়লো সাতবাহন সেনারা। পিছিয়ে দৌড় দেওয়ার সময় এখন, কারো কারো মধ্যে সেই ইচ্ছে জেগেও উঠেছে। কিন্তু ক্ষেত্র থেকে পিছু হটা সেনাপতির আদেশ ছাড়া সম্ভব নয়। সেই আদেশের জন্যই সকলে তাকালও রিপুজিতের দিকে।

অসিত আজকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। রুদ্রদেব তাকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। দুটো তীর ছুটে এসেছিল তার দিকে, কিন্তু নিজের ধনুকের সাহায্যে সহজেই এড়িয়ে গেল সে তীরগুলো। তারপর সবার সাথে সাথে সেও তাকাল রুদ্রদেবের দিকে।

রুদ্রদেব এসব আগেই জানতো। শত্রু আক্রমণ করবেই। এসবের জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে সে। শত্রু অবশ্য তার অনুমানের চেয়েও তীব্র তীরের আক্রমণ চালিয়েছে। পরিখায় সেতু স্থাপন সহজ হবে না।

ভোরে রেকি করে জায়গায় জায়গায় সেও দক্ষ দক্ষ তীরন্দাজদের বসিয়ে রেখেছে। তাদের উদ্দেশ্যে এবার চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'তীর ছোঁড়ো।'

রুদ্রদেবের বসিয়ে রাখা তীরন্দাজেরা জানে কাকে কোথায় তীর ছুঁড়তে হবে। বিভিন্ন লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে তারা বারিগাজার দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলো তীর। বারিগাজার দেয়ালের ওপরের বেশ অনেকজন তীরন্দাজ তীর বিদ্ধ হলো। কেউ প্রাণ হারিয়েছে, কেউ সংজ্ঞা হারিয়েছে, আবার কেউ আর্তনাদ করছে দেওয়ালের ওপর বসে বসে। কেউ দেওয়ালের ওপর থেকে মাটিতে পড়ে গেছে।

অ্যালেক বুঝতে পারলো শত্রু আগে থেকেই তাদের তীরন্দাজদের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করে রেখেছে। জায়গা মতো নিজের তীরন্দাজ বসিয়ে রেখেছে। না, তীরন্দাজদের সেতু স্থাপনের কাজে বাঁধা দেবার আর কোনো উপায় তার চোখে পড়ছে না।

ওদিকে নিজের দলের তীরন্দাজরা আক্রমণ শুরু করতেই সাতবাহন সেনারা সাহস ফিরে পেয়েছে। নতুন ঘোড়া নিয়ে এসেছে তারা। সেটা দিয়ে আবার টানা শুরু করেছে পাটাতন। একবার খাড়া করে ফেলতে পারলেই আর দেখতে হবে না।

অ্যালেক বুঝতে পারলো কিছু একটা এখুনি করতে হবে। লুকিয়ে থাকা সেনাদের দিকে তীর ছুঁড়তে পারছে না তার সেনারা। উলটো দেওয়ালের ওপর দাঁড়ালে তাদের দিকেই ছুটে আসছে তীর। আর সেসব তীরের লক্ষ্যভেদ অবাক করা।

অসিত নিজেও একটা জায়গায় তীর ধনুকে পরিয়ে অপেক্ষা করছে। এর মধ্যে তিন বার তার ধনুক থেকে তীর বেরিয়েছে। তিনটেই লক্ষ্যভেদ করেছে। দুটোতে শত্রুর মৃত্যু হয়েছে, আরেকটাতে আহত। রুদ্রদেব এর মধ্যে একবার তাকিয়েছে তার দিকে। তার চোখে প্রশংসার ভাব।

অ্যালেক তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমরা তীর ছুঁড়তে থাকো। আর দেওয়ালের নিচ থেকে সেনারা আমার সাথে এসো। খাঁচাগুলো সব একসাথে খুলে দিতে হবে।'

এই কথা শুনতেই যেন নতুন করে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়লো বারিগাজার সেনাদের ভেতরে। তীরন্দাজরা ছাড়া বাকি সবাই ছুটল অ্যালেকের পেছন পেছন।

রাজ প্রাসাদের বাইরেই একটা প্রকাণ্ড ঘর আছে। সেখানে সারি সারি খাঁচা গুছিয়ে রাখা। একেকজন দুটো করে খাঁচা বের করে আনলো। একসাথে সবাই মিলে খুলে দিলো সবগুলো দরজা।

নিমেষে কয়েকশো বাজ বেরিয়ে এলো খাঁচাগুলো থেকে। এগুলো সাধারণ বাজ নয়। সবগুলোকে অনেক দিন ধরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শত্রুদের জন্য এই বাজের দল বেশ মারাত্মক। কেন? তা একটু পরেই টের পাবে সাতবাহন সেনারা।

পাথরের নানা দিক ধারালো করে স্তূপ করে রাখা হয়েছে রাজপ্রাসাদের সামনের ক্ষেত্রের এক কোণে। বশ বড়ো সেই স্তূপ। সেখান থেকেই দুপায়ে দুটো আর মুখে একটা মোট তিনটে পাথর তুলে নিলো একেকটা বাজ।

রুদ্রদেব আর পুরো সাতবাহন সেনাকে পুরো স্তম্ভিত হয়ে গেল বাজের দল দেখে। বাজের দল কোনো রকম সময় নষ্ট না করে সাতবাহন সেনার ওপর আক্রমণ করলো। তাদের নিশানা নিখুঁত। তাদের জন্য কোনো জায়গাই গোপন না। সাতবাহন বাহিনীর ওপর পাথর বৃষ্টি শুরু করলো বাজ বাহিনী।

ধারালো পাথরের সেই আঘাতে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল সাতবাহন বাহিনী। একেক তীরন্দাজ এক সাথে ছুঁড়তে পারে একটা তীর, এখানে একটা বাজই পাথর ছুঁড়ছে তিনটা করে। তারা এঁকেবেঁকে উড়ছে। কোনোভাবেই তীরের লক্ষ্য স্থির করা যাচ্ছে না। আড়ালে লুকিয়ে থাকা দূরপাল্লার বিশেষ তীরন্দাজরাও বাজের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারলো না। হত-আহত হয়ে মাটিতে পড়তে লাগলো তারা। যুদ্ধের পাল্লা আবার হেলে পড়লো বারিগাজার সেনাদের দিকে।

বাজগুলোর ক্ষিপ্রতা দেখার মতো। ছুঁড়ে দেওয়া পাথরগুলো ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে তারা। আবার ছুঁড়ে দিচ্ছে শত্রুদের দিকে। কেউ সেটা না পারলে নগরের ভেতর থেকে আবার নিয়েছে ধারালো পাথর। তারপর আবার সংঘবদ্ধ হয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওপর থেকে।

অসিত অনেক কষ্টে একটা বাজকে বিদ্ধ করলো তীরে। তাও পাঁচবার তীর ছোঁড়ার পর। ওদিকে বারিগাজার সেনারা দেয়ালের ওপর থেকে আবার তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে।

রুদ্রদেব বুঝতে পেরেছে, এখন আর কিছুই করার নেই। শত্রুর বাজ আক্রমণ ঠেকানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাদের। চিৎকার করে উঠলো এবার সে, 'সবাই তাড়াতাড়ি শিবিরের ভেতরে তাঁবুতে ফিরে যাও।'

সবাই এই নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল। সেতুর পাটাতন ফেলে রেখে সবাই ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। সবাই শিবিরে পৌছানো পর্যন্ত পাথর বৃষ্টি করলো বাজের দল। সাথে তীরও চলল সমানে।

অ্যালেক একটা বিশেষ বাঁশি বাজিয়ে দিলো। বাজেরা এই বাঁশি শুনে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলো নগরে। তারপর পাথরগুলো স্তূপের মধ্যে রেখে যে যার খাঁচায় ঢুকে পড়লো। ওরা নিজেদের খাঁচা চেনে।

অ্যালেক সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকালো বাজগুলোর দিকে। আদেশ দিলো গলা চড়িয়ে, 'আজ যেন ওদের খাবারে তাজা মাংসের কোনো অভাব না হয়।'

প্রায় এক রাত কষ্ট করে বানানো পাটাতন আর প্রায় নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা পেছনে ফেলে রেখে সাতবাহন বাহিনী এখন আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের শিবিরে। এমন যুদ্ধের পর যখন যুদ্ধ বিরতি হয় অথবা অন্ত হয় তখন প্রধান কাজ হচ্ছে আহত এবং নিহতদের খোঁজখবর নেওয়া। এখানে সেনাদের মনে সেই কাজ করার সাহস অবশিষ্ট নেই। পাখিগুলোর আক্রমণ এমন ভয়ংকর আতঙ্ক তাদের মনে জন্ম দিয়েছে কেউ এখন ছাদের নিচ থেকে খোলা আকাশে যেতেই ভয় পাচ্ছে। কম আহত সেনারা যারা কোনমতে শিবিরে এসে নিজেদের তাঁবুতে ঢোকাতে পেরেছে তারা এখন একই সাথে আর্তনাদ আর নিজেদের পরিচর্যা দুই-ই করছে।

রুদ্রদেবের তাঁবুতে এসে জড়ো হয়েছে রিপুজিত আর অসিত। রুদ্রদেবও সেখানেই আছে। রিপুজিত একটু আহত হয়েছিল, একটা ধারালো বেশ ওজনের পাথর তার গালে ছোঁয়া দিয়েছিল। তাতেই তার গাল কেটে গেছে, এখনও রক্ত বেরোচ্ছে সেই ক্ষত থেকে। পাথর সরাসরি আঘাত করলে আর ভাবতে হতো না, গালটাই পুরো থেঁতলে যেত। তখন হয়তো বাইরের মাটিতেই পড়ে থাকতে হতো রিপুজিতকে।

বেঁটে নেওয়া ওষুধি পাতার রস গালে লাগাতে লাগাতে রিপুজিত গোঙাচ্ছে, তার মতো সাহসী লোকেরও সাহসে একটু দোল লেগেছে, 'বাবারে, এমন যুদ্ধ তো জীবনেও দেখিনি। এত এত বাজপাখি ওরা জড়ো করলো কী করে? আবার ওগুলোকে পোষ মানাল। নিশ্চয়ই তারা জাদু করেছে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা হতেই পারে না।'

রুদ্রদেব সেই কথাতে তেমন একটা মন দিয়েছে বলে মনে হলো না। তার পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, শুধু অস্ফুটে বলল, 'না, কোনো জাদু করেনি। তবে আমাদের মোহগ্রস্ত করতে অবশ্যই পেরেছে।'

শত্রুর শক্তি পুরোপুরি না জেনে লড়াই করতে গেলে এমনই হয়। ভীষ্মের মতো যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রে ছিলেন। তার বধের উপায় না জানলে পাণ্ডবরা কখনো কৌরবদের প্রথম সেনাপতির বাঁধাই পেরোতে পারতো না। তবে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, এখানে তাদের জন্য কেউই নেই। শত্রু নিজের আস্তিনে আর কত তাস লুকিয়ে রেখেছে কে জানে।

রিপুজিতের রস লাগানো শেষ হয়েছে। গালের জ্বলুনি এখন দাঁত চেপে সহ্য করছে সে। আর কিছুই করার ইচ্ছে নেই তার, 'এবার আর তাহলে আমাদের আর শিবির থেকে বেরিয়ে কাজ নেই।'

অসিত মত দিলো, 'সেই ভালো। এই পাখিগুলোকে তীর দিয়েও মারা যায় না।'

'হ্যাঁ। মহারাজ সাতকর্ণীর খবর নিতে হবে। তিনি আসলে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমাদের আর সেনা ক্ষয় করে লাভ নেই।' রিপুজিত কাল রাতে দেওয়া নিজের মতটা আবার দিলো।

বলাই বাহুল্য সেই মত রুদ্রদেবের ভালো লাগলো না। তবে, এবার সরাসরি অমত করার মতো অবস্থা নেই তার। যদি কোনো উপায় থাকতো তাহলে সে কিছু বলতে

পারতো। কিন্তু শত্রুর মতুন শক্তির বিরুদ্ধে আপাতত কোনো উপায় নেই। রিপুজিতকে আবার যুদ্ধে রাজি করাতে যে যুক্তি দরকার সেটা রুদ্রদেব খুঁজে বের করতে পারলো না।

অসিতের দেহে কোনো আঘাত লাগেনি সত্য তবে মাথা থেকে আতঙ্ক এখনও কাটেনি। শ্বাস যদিও এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, তবু বুকের ভেতরে একটা খাবি খাওয়ার মতো অনুভূতি এখনও হচ্ছে। প্রথমে শকদের তীর আসছিল এক দিক থেকে, সেটা সামলানো যাচ্ছিল। কিন্তু যখনই পাখিগুলো আকাশে উড়ছিল তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল বিভীষিকা। মনে হচ্ছিল চারদিক থেকেই যেন ছুটে আসছে পাথর। ঘাড় আর মাথা যে এখন পর্যন্ত আস্ত আছে সেটাই মহা স্বস্তির কথা।

এতক্ষণ একটা কথাই ভাবছিল রুদ্রদেব, এবার সেই ভাবনাটা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'তাহলে শত্রুপক্ষ যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেই ফেললো।'

রিপুজিত আর অসিত এই কথার কিছুই বুঝতে পারলো না। অসিত যুদ্ধ বিদ্যার সাথে সাথে যুদ্ধের কিছু নিয়মও জানে। আর রিপুজিতেরও সেসব সম্পর্কে জ্ঞান কিছু কম নেই। তার তো অনেক যুদ্ধের সরাসরি অস্ত্র চালনার অভিজ্ঞতাও আছে। তবু তারা রুদ্রদেবের কথার মানে ধরতে পারলো না।

রুদ্রদেব একটু পরেই মুখ তুলে দুজনের দিকে তাকালও। আর সাথে সাথে বুঝতে পারলো তার একটু আগে বলা কথাটা এদের কেউই বুঝতে পারেনি। আবার কথাটা বলল সে, 'ওরা স্পষ্টতই যুদ্ধের নিয়ম ভেঙেছে।'

এবার আর চুপ থাকতে পারলো না রিপুজিত, 'ওরা এখানে কী নিয়ম ভঙ্গ করেছে? আমার তো মনে হয় ওরা তেমন কিছু করেনি। ওদের এখানে যুদ্ধ করার একটাই লক্ষ্য। যেভাবেই হোক আমাদের নগরের ভেতরে যেতে বাঁধা দেওয়া। ওরা ঠিক তাই করেছে। এখানে আবার নিয়ম ভাঙ্গার কী হলো। আর এসব নিয়ম নীতির অপ্রয়োজনীয় আলাপ এখন করার দরকার কী?'

'একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে রিপুজিত। নইলে তো এই কথা বুঝতে পারবে না।'

রুদ্রদেবের কথায় চোখ বুজে ফেললো রিপুজিত। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল, 'না, গভীরভাবে একটু চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু বাইরেটা দেখে আসা দরকার। ওরা যদি পাখিদের থামায় তাহলে আমাদের সেনাদের উদ্ধার করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি কিছু সেনাকে বলেছিলাম বাজের দলের দিকে নজর রাখতে। বাজের দল এতক্ষণে ভেতরে ফিরে গেছে।'

'তাহলে ঠিক আছে,' রিপুজিত রুদ্রদেবের কথায় সন্তুষ্ট হলো, 'গভীর চিন্তার ব্যাপারে যেন কী কথা হচ্ছিলো?'

'হ্যাঁ,' রুদ্রদেব শুরু করলো, 'মহাভারতের সেই সময়ের কথা মনে করো। যেখানে নীতি আর দুর্নীতি একসাথে দেখানো হয়েছিল। ইন্দ্র কেন কর্ণের কবচ আর কুণ্ডল নিয়ে গিয়েছিলেন? দ্রোণাচার্য কেন একলব্যকে আঙুল কেটে দিতে কৌশলে বাধ্য করেছিলেন? ঘটোৎকোচ যুদ্ধে এসে কী করেছিল? কর্ণের বধ কেন অশাস্ত্রীয় হলেও অবশ্য কর্তব্য ছিল? এত এত অন্যায় কেন ধর্মের পক্ষের লোকে করেছিল? কেউ জানো সেই উত্তর?'

রিপুজিতের তত্ত্বজ্ঞান তেমন জোরালো নয়, কখনোই ছিল না। রুদ্রদেবের একের পর এক প্রশ্নের ধাক্কা সে সামলে উঠতে পারলো না, 'না তো জানি না। এসব নিয়ে কখনো ভাবিনি।'

'শোনো, যুদ্ধ এই পৃথিবীতে অনেক আগ থেকেই শুরু হয়েছে। যখন সৃষ্টি শুরুও হয়নি, যখন ব্রহ্মা বসে ছিলেন বিষ্ণুর নাভির কমলাসনে, তখনই মধু আর কৈটভ যুদ্ধ করেছিলো শ্রীবিষ্ণুর সাথে। সেই আদি যুদ্ধতেও যুদ্ধের নিয়ম মানা হয়েছিল।'

'কী সেই নিয়ম?' প্রশ্ন করে অসিত।

'যুদ্ধ হবে সমানে সমানে। মানে বাইরে থেকে কেউ যোদ্ধাকে কোনো অযাচিত সাহায্য করতে পারবে না। কর্ণের কবচ আর কুণ্ডল ছিল সূর্যদেবের দান। ঐ যুদ্ধে যদি কর্ণের কাছে সেগুলো থাকতো তবে তো সমানে সমান হলো না, সেখানে কর্ণ পেয়ে যেত অযাচিত সাহায্য। তাই তো সেই কবচ আর কুণ্ডল কৌশলে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার থেকে। এটাই নিয়তির বিধান।'

'হ্যাঁ। কিন্তু স্বয়ং ভগবান বসেছিলেন অর্জুনের রথে।' একটা মন্তব্য জুড়ে দেয় রিপুজিত।

'হ্যাঁ। কিন্তু তিনিও কৌশলে অস্ত্র ত্যাগ করেই বসেছিলেন। শুধু সারথী হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করে গেছেন। সেটাও কিন্তু সেই সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই। গুরু দ্রোণের বিদ্যা শিখে একলভ্য অনেক বড়ো ধনুর্ধর হয়ে উঠছিল, সেটাও নির্মূল করে দিয়েছিলেন গুরু। এমনিতে দেখলে ব্যাপারটা নির্মম, কিন্তু একলব্য নিজেও তো অপরাধ করেছিলো, লুকিয়ে শিখেছিল সেই বিদ্যা। তার মধ্যেও ছল ছিল। তার ওপরে সে ছিল হস্তিনাপুরের শত্রু রাজ্যের বাসিন্দা। ছলের উত্তরেই ছল করেছিলেন অস্ত্রগুরু।'

ব্যাখ্যার জবাব দিতে পারে না রিপুজিত, কিন্তু তার কাছে এখনও কিছু যুক্তি বাকি রয়ে গেছে, 'মানুষের যুদ্ধে রাক্ষসের আহবান কেন করেছিলেন কৃষ্ণ? তার বুদ্ধিতেই তো ঘটোৎকচ এসেছিল যুদ্ধ করতে।'

'কৌরবদের পক্ষেও তো যুদ্ধ করেছিল অলম্বুষ। হয়ে গেল সমানে সমান।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কর্ণকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করেছিলো অর্জুন। স্বয়ং তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। সেটাকে কী বলবেন আপনি? সেটা কি অন্যায় নয়? সাত্যকি নিরস্ত্র হস্তহীন ভুরিশ্রবাকে মস্তক ছেদ করে হত্যা করেছিলেন। সেটাও স্পষ্ট অন্যায়।'

'অবশ্যই অন্যায়।'

'তার মানে ঈশ্বর নিজেও ছল করেন, অন্যায় করেন।'

'করেন। করতে হয়। ছলের বাণ দিয়েই ছল কাটতে হয়। একটু বুঝিয়ে বলি। আপনি তো দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি। আপনি তো চতুরঙ্গ সেনার কথা জানেন।'

'অবশ্যই জানি। এই নিয়ম তো আদিকাল থেকেই চলে আসছে। চণ্ডী অনুযায়ী মা দুর্গাকে মহিষাসুর নিজের চতুরঙ্গ সেনা দিয়েই আক্রমণ করেছিলেন। পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, হস্তী আর রথী মিলে এই চতুরঙ্গ হয়।'

'ঠিক। আর সেই নিয়মে পদাতিক লড়বে পদাতিকের সাথে, রথীর সাথে রথী, হস্তীতে হস্তীতে, ঘোড়ায় ঘোড়ায় লড়াই হবে। আরেকটা নিয়ম ছিল, কোনো যোদ্ধাকে তার সমান অথবা বেশি ক্ষমতার একের অধিক যোদ্ধা আক্রমণ করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, এই নিয়ম যুদ্ধক্ষেত্রে মানতে হয়।' রিপুজিত স্বীকার করে নিলো।

'আর এই নিয়মই ভেঙে ফেলেছে বারিগাজার শক বাহিনী। তারা এসব নিয়মের ধার ধারে না, কিন্তু আমাদের ধারতে হয়। ওরা ব্যবহার করেছে বাজপাখি। চতুরঙ্গের বদলে এখানে ব্যবহার হয়েছে পঞ্চরঙ্গের। আমাদের কাছে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য কোনো পাখি কিংবা পঞ্চম কোনো প্রাণী নেই, কিন্তু তারা তবু আমাদের ওপর ঐ পাখি দিয়ে আক্রমণ করেছে। তার মানে বাজের ব্যবহার করে ওরা এই ভারতের যুদ্ধের আদি নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।'

'হ্যাঁ, সেই নিয়মের লঙ্ঘন তো অবশ্যই করেছে। কিন্তু তাতে কী? এমন নিয়মের লঙ্ঘন তো যুদ্ধে হরহামেশাই করা হয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো অন্যায়। ভালো করে একটু ভেবে দেখুন, কৃষ্ণ কিন্তু ইচ্ছে করলে কুরুক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকেই ছলের আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু নেননি। যুদ্ধের সব নিয়ম পাণ্ডবরা ভেঙেছিল অভিমন্যুর মৃত্যুর পর। ভীষ্ম তো স্বেচ্ছায় অস্ত্র ত্যাগ করে নিজের প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। দ্রোণের মৃত্যু দিয়েই শুরু হয়েছিল ছল। কর্ণ আর বাকি সব সেই ছলেই মরেছে। অভিমন্যুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ভুল করেছিল কুরুরা। একবার শত্রু ছল করলে সেই শত্রুকে বধ করতে ছল করাতে কোনো অন্যায় নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে ছল করা যাবে, অবশ্যই যাবে, যদি শত্রু পক্ষ অন্যায় করে যুদ্ধের কোনো নিয়ম ভেঙে ফেলে। এখানে আমাদের প্রতিপক্ষ এর মধ্যেই পঞ্চরঙ্গের ব্যবহার করে অন্যায় করেছে। এখন আমাদের অন্যায় করতে আর কোনো বাঁধা নেই। আমরাও ছল করবো।'

অবাক হলো রিপুজিত, 'আমরা আবার কী ছল করবো? আমাদের কাছে ছল করার কী আছে?'

'এখনও কিছু নেই। কিন্তু জোগাড় করতে হবে। আমি এখুনি শিবির ছেড়ে একটু বেরোবো। আপনি আর অসিত আমার অনুপস্থিতিতে শিবিরের দায়িত্ব পালন করবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো। অসিত আপনার সাথেই থাকবে। যদিও মনে হয় না তার সাহায্য আমি আসার আগে আপনার দরকার হবে, তবু রেখে গেলাম।'

অসিত রুদ্রদেবের সাথেই যেতে চাচ্ছিলো, কিন্তু চোখের ইশারায় তাকে বারণ করলো রুদ্রদেব।

শিবিরের পেছন দিক দিয়ে কোনোরকম শব্দ না করে বেরিয়ে এলো রুদ্রদেব। বহুদূরে এক জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সেখান দিয়েই বারিগাজার দিকে এসেছিল তারা। তখনই এই জঙ্গলটা ভালো করে দেখেছিল রুদ্রদেব। সে যা খুঁজছে তা ঐ জঙ্গলে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেভাবেই হোক সবকিছু ব্যবস্থা করে আজ সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। মহারাজ সাতকর্ণী যে কোনো সময় এদিকে চলে আসতে পারেন। তার আগেই যা করার করতে হবে।

জঙ্গলে পৌঁছাতে দিনের প্রায় দুই প্রহর পেরিয়ে গেল। সুবিধাজনক আড়াল দেখে ঘোড়া বাঁধল সে। বাইরে থেকে ঘোড়াটা আচমকা দেখা যাবে না। জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করলো সে।

শুরুতেই একটা গুল্ম খুঁজতে শুরু করলো সে। আয়ুর্বেদের বেশ গোপন বিদ্যায় লুকিয়ে আছে সেই বিশেষ গুল্মে। এগুলো বেশ সহজলভ্য কিন্তু খুব কম মানুষেই সেই

গুল্মের ব্যবহার জানে। তাও অনেক আগের কথা এখন এই বিদ্যা খুব সম্ভব হারিয়ে গেছে।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। একটু পরেই সেই গুল্ম খুঁজে পেলো সে। বেশ ভালো পরিমাণেই আছে। কাজ চলে যাবে। গুল্মের ঝোপের মাঝ থেকে সাবধানে পাতা ছিঁড়ে নিতে শুরু করলো সে। সাথে করে দুটো বড়ো বড়ো থলে নিয়ে এসেছে। পাতাগুলো সেই থলেতে ভরতে লাগলো। কাজের অর্ধেক শেষ হয়েছে। আরেকটা কাজও সারতে হবে। আগে গুল্ম গুলো নেওয়া যাক।

ওদিকে জঙ্গলের ভেতর আঁধার নেমে আসছে। আলো থাকতে থাকতে কাজটা শেষ করতে হবে। কোনোভাবেই অন্ধকার করতে দেওয়া চলবে না। এই ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছুই করা যাবে না।

তীক্ষ্ণ চোখে জঙ্গলের মাটিতে চিহ্নটা খুঁজতে শুরু করলো সে। এই বিশেষ চিহ্ন খুঁজে বের করা সহজ নয়। সাধারণ কেউ সেটা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। কিন্তু দীর্ঘকাল জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে সেই লক্ষণ সে দেখলেই চিনতে পারবে।

খোঁজার দ্রুততা বাড়িয়ে দিলো সে। আলো যেন ঝপ করে আরেকটু নেমে এলো। সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাবার আগেই যেভাবে হোক কাজটা করতে হবে। অনেক কালের মধ্যে এই প্রথম একটু অস্থির হলো রুদ্রদেব। দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তার। সময় আর বেশি নেই।

একটু পরেই যেন চিহ্নটা দেখতে পেলো সে। আরে ঐ তো, না, কোনো ভুল নেই। এটাই সেই চিহ্ন। আরেকবার ভালো করে চিহ্নটা দেখল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

তখুনি পেছন থেকে ভেসে আসা একটা শব্দে তার সেই স্বস্তি যেন উড়ে গেল। হিস হিস শব্দ। ঠিক জায়গায় জমে গেল রুদ্রদেব। নিশ্চিত পেছনে কোনো বিষধর সাপ আছে। প্রায় সব সাপই এভাবে আওয়াজ করে, কিন্তু এত ভয়ংকর শব্দ শুধু একটা সাপই করতে পারে। এই শব্দটা সাপেদের মধ্যেও বিশেষ। পেছনে না দেখেও সে বুঝতে পারছে কী এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। এই এলাকা রাজার এলাকা, আর রাজাই ক্রুদ্ধ হয়ে শব্দ করছে।

রাজ গোখরো!

৯১

জায়গায় জমে গেছে রুদ্রদেব। জঙ্গল সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে দেখেই সে উন্মাদের মতো লাফালাফি করে নিজের বিপদ ডেকে আনলো না। অভিজ্ঞতার কারণেই সে জানে, সাপের দুনিয়ায় এনাকে সাধ করে কেউ রাজার খেতাব দেয়নি। সে এই খেতাবের উপযুক্ত। সে মর্ত্যের সবচেয়ে প্রখর অনুভূতি সম্পন্ন আর বুদ্ধিসম্পন্ন সাপ। তার সামনে যে থাকে তার প্রত্যেক নড়াচড়া বোঝার সামর্থ্য আছে তার। শক্তি তার অনেক, তবে একটাই আশার কথা। কোনো সাপই, হোক সে রাজা অথবা প্রজা, মানুষের সাথে লাগতে আসে না। বিনা কারণে তারা ঝামেলা পছন্দ করে না।

অনেকটা সময় পরে আস্তে আস্তে পেছনে ঘুরলো রুদ্রদেব। একটুও তাড়াহুড়া করলো না। তখনই প্রথম সাপটার ওপর নজর পড়লো তার। প্রায় দুই মানুষ সমান লম্বা। এখন সম্পূর্ণ ফনা তুলে তৈরি হয় আছে। এত ওপরে ফনা তুলেছে প্রায় তার বুকের সমান্তরালে চলে এসেছে তার মাথা। এই সাপের বিষের প্রতিষেধক যে নেই তা নয়, তবে এখানে যদি তাকে দংশন করে তবে সেই প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করার কেউ নেই। এখানেই মরে পড়ে থাকতে হবে।

ঝামেলা পছন্দ না করলেও একটা জায়গাতেই রাজ গোখরো কাউকে ছাড় দেয় না। যদি কেউ তার সীমানায় প্রবেশ করে তবে আর রক্ষা নেই। রুদ্রদেব ভুল করে সেই কাজটাই করে ফেলেছে। এখন সহজে ছাড় পাওয়া যাবে না।

বাতাসে অল্প অল্প করে দুলছে রাজ গোখরোর ফনা। পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, জানে রুদ্রদেব। এটা করলেই সামনের রাজা বুঝবে সে ভয় পেয়েছে। আক্রমণ করবে। সামনে এগোনোর চেষ্টা করলেও বিপদ। রাজা মনে করবে তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। ছোবল বসাবে।

ফণাটা একটু যেন সামনে এগোল। ভুল হয়নি রুদ্রদেবের। রাজা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। রুদ্রদেব আস্তে করে একটা লম্বা শ্বাস নিলো। রাজার সাথে রাজার নিয়মেই খেলতে হবে।

শিকারকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেবার পর ছোবল মারার আগে রাজ গোখরো তার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র প্রয়োগ করে। সম্মোহন অস্ত্র। নিজের চোখ সে রাখে শিকারের চোখে। শিকার একবার সেই চোখের দিকে ঠিকমতো তাকালেই হয়েছে। সেই দৃষ্টির আকর্ষণ থেকে সে আর বেরোতে পারে না। সম্মোহিত হয়ে যায়। পলক ফেলতে ভুলে যায়। প্রথমে থমকে যায় তার চোখ, তারপর সারা দেহ। তখন শিকারকে নিজের মতো করে পরিচালিত করে রাজ গোখরো। নিজের মুখের কাছে এনে নিশ্চিত হয়ে ছোবল বসায়।

এখানেও রাজ গোখরো ঠিক একই উপায় বেছে নিয়েছে। রুদ্রদেবের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। মাথাটা একটুও নাড়ছে না।

রুদ্রদেব সতর্ক হলো। সে জানে, এখন তাকে রাজার নিয়মেই চলতে হবে। সম্মোহনের খেলা শুরু হয়ে গেছে। কিছুতেই সাপের বশে চলে যাওয়া যাবে না।

সর্পের চোখের সমান্তরালে নিজের চোখ আনার জন্য হাঁটু গেঁড়ে বসলো সে। এবার দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। সাপের চোখের পাতা থাকে না, সেটা ফেলার প্রশ্নও ওঠে না।

চোখ টানটান করে তাকিয়ে আছে রুদ্রদেব। খোলা চোখে তাকে সম্মোহন করার চেষ্টা করছে রাজ গোখরো। রুদ্রদেব নিজেও এই সম্মোহনের কায়দা জানে। সে নিজেও তাকিয়ে আছে রাজ গোখরোর চোখের দিকে। দেখা যাক, একই কাজে কে আগে সফল হয়।

অনেক চেষ্টার পর চার মণির মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হলো। সম্মোহনকারী আর সম্মোহিতের মধ্যে এখন অভেদ্য সম্পর্ক। সফল হয়েছে রুদ্রদেব। সে মাথাটা একটু ডানে হেলাল, সাপের মাথা বেঁকে গেল একটু বাঁ দিকে। আবার বাম দিকে মাথা হেলাতেই সাপ নিজের ডান দিকে মাথা হেলাল। রুদ্রদেব সামনে মাথা বাড়াতেই সাপও একটু সামনে বাড়ালো মাথা।

রুদ্রদেব বুঝতে পারলো সে সফল হয়েছে। সে সম্মোহন করে ফেলেছে এই সাপটাকে। সম্মোহনের রাজা রাজ গোখরো নিজেই এখন সম্মোহনের শিকার।

এবার চোখে চোখ রেখে রাজ গোখরোর একেবারে সামনে এসে বসলো রুদ্রদেব। তারপর আস্তে করে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো। সাপের ঠিক দুই চোখের মাঝে স্পর্শ করলো তার তর্জনী। একটু চাপ দিতেই সাপ ফনা নিচে নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো। তারপর নিজের চোখ দিয়ে সাপকে ইশারা করতেই সাপটা ফিরে চলল। একটু পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনের ঝোপের ভেতরে।

এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রুদ্রদেব। সাথে কোনো অস্ত্র নিয়ে আসেনি। সাপটা যদি সত্যি আক্রমণ করে বসতো তখন আর কিছুতেই কিছু করা যেত না।

না, এখানে আর থাকা যাবে না। তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করলো রুদ্রদেব। অন্ধকার বলতে গেলে হয়েই গেছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোড়া কাছে চলে এলো সে। ঘোড়াটা এখনও লুকানো জায়গাতেই আছে। আরামে নিচের জমির ঘাস খেয়ে চলেছে। গুল্মের থলেটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিজেও উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। জঙ্গলের বাইরে এখনও একটু আলো অবশিষ্ট আছে। সেটা ব্যবহার করেই একটু এগিয়ে এতে হবে। ঘোড়া ছোটাল রুদ্রদেব। শিবিরে যখন পৌছালো ততক্ষণে রাত অনেক গভীর হয়েছে।

ওদিকে রিপুজিত তখন থেকেই রুদ্রদেবের কথা চিন্তা করছে। কোথায় গেল সে? অন্ধকারের পরে নিজে মশাল হাতে শিবিরের বাইরে অপেক্ষায় ছিল সে। সেই মশালের আলোতেই রুদ্রদেবকে আসতে দেখা গেল। রীতিমতো দৌড়ে গেল সে, 'কোথায় গিয়েছিলেন? মিথ্যে কথা বলবো না, একবার ভেবেছিলাম আপনি পালিয়ে গেছেন হয়তো ভয় পেয়ে।'

রিপুজিতের তামাশা বুঝতে পেরেছে রুদ্রদেব, 'না, পালাবো কোথায়? পৃথিবীর সব জায়গায় আপনার মতো লোকে ভরা।'

'আমি তো মনে মনে ভেবেছিলাম আমাকে একাই এই সেনা চালাতে হবে। তা কোথায় গিয়েছিলেন?'

ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো রুদ্রদেব, 'আপনার ভাবনাটা ঠিকই ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম পালিয়েই যাবো। এখানে থাকলে নিশ্চিত পরাজয় অথবা মৃত্যু। তবে কিছু দূর যেতেই মাথায় এটা মতলব চলে এসেছে, তাই ফিরে এসেছি।'

'মতলব? কী মতলব?'

'বলছি। সেনাদের সবাইকে ডাকুন। কালকের মতো বাছাই করার দরকার নেই। আজকে সবাইকেই লাগবে।'

'কেন?'

'একটু পরেই আমরা বারিগাজা আক্রমণ করবো।'

'রাতের বেলা? রাতের বেলা আক্রমণ কীভাবে করবো? ওদের ভেতরে যাবার তো কোনো উপায় নেই। আর রাতের বেলা যুদ্ধ করার অধর্ম।'

'কলঙ্কে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। সেসব থেকেই বলছি, এখানে কলংকের কোনো ব্যাপার নেই। ওরা আগেই অন্যায় করে ফেলেছে। চতুরঙ্গের নিয়ম ভেঙেছে। এবার আমাদের পালা। আমরাও এখন থেকে এই যুদ্ধে যুদ্ধের যে কোনো নিয়ম ভেঙে ফেলার অধিকার রাখি। যান, সময় হাতে নেই। আর ওঠা বাড়াবেন না। সব সেনাদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো করুন।'

রিপুজিত শিবিরের দিকে চলে গেল। রুদ্রদেব জানে, সেনাদের জড়ো করতে সে বেশি সময় নেবে না।

সেনারা জড়ো হতেই সমবেত সেনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রুদ্রদেব। তার গলা চড়ে এলো বেশ, 'তোমরা শোনো, আজকে রাতেই আমরা প্রবেশ করলো বারিগাজায়, আজ রাতেই আমরা বারিগাজা নগর আর প্রাসাদ দখল করবো।'

সৈন্যরা সবাই যথেষ্ট অবাক হয়েছে। আজ সকালেই বারিগাজায় প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে তারা। তাতে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে তারা। অনেক প্রাণহানি হয়েছে, আহত সেনার সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়। যে কাজ দিনের বেলা হয়নি, সে কাজ রাতের বেলা তারা কীভাবে করবে? রাতের বেলা যদি শত্রুর বাজ আক্রমণ করে তাহলে তো সেই ছুঁড়ে দেয়া পাথর দেখাও যাবে না। আর দেওয়ালের ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয়া তীরও দেখা যাবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে তাদের ঠেলে দিচ্ছেন এই সেনা উপদেষ্টা।

ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন সেনাদের মনে এলো না, কিন্তু তাদের মনে এলো নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়। সেনা উপদেষ্টার হঠাৎ কেন মতিভ্রম হলো তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ আবার তাকাচ্ছে রিপুজিতের দিকে।

সৈন্যদের দোটানা অবস্থা বুঝতে পারলো রুদ্রদেব। এরা এই রাতে যুদ্ধে যেতে ভয় পাচ্ছে। তাদের এখন সাহস যোগাতে হবে। সেই চেষ্টাই করলো রুদ্রদেব, নিজের পরিকল্পনার একটু জানালো সেনাদের, 'শোনো, এই রাতে আমরা খুব গোপনে আক্রমণ করবো। তোমরা কোনো রকমের দুশ্চিন্তা করবে না। ওরা বাজও ছাড়তে পারবে না, দেওয়ালের ওপর থেকে তীরও ছুঁড়তে পারবে না। আমি নিজে সব ব্যবস্থা করবো। এখন প্রথম কাজটা প্রথমে করতে হবে।'

প্রথম কাজটা কী তা নিয়ে আবার সবার মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। রুদ্রদেব দুই থলে ভর্তি করে গুল্ম ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এসেছে। সেগুলো তার আদেশে দুজন সেনা নামিয়ে আনল।

'শোনো সবাই, এখানে অনেক লতা পাতা আছে। লতাগুলোকে কিছু করার দরকার নেই। সবাই নিজের হাতে একটা করে পাতা নেবে। তারপর পাতাটাকে দুই হাতের মধ্যে নিয়ে ভালো করে ডলে রস বের করবে। ভালো করে শোনো, এইভাবে।' কীভাবে দুই তালুর মধ্যে রস বের করতে হবে তা নিজে একটা পাতা নিয়ে দেখাল রুদ্রদেব, 'এভাবে ভালো করে রসটা বের করবে। তারপর মুখের ভেতরে পুরে দিয়ে ভালো করে পিষবে। অনেক রস বেরিয়ে আসবে। ভয় নেই, এটা বিষ নয়, একটু তেঁতো স্বাদ লাগবে শুধু।'

তারপর শেষ কাজটা বোঝাল সে, 'মুখের ভেতরের রসটা আবার গিলে ফেলো না। সেই রস দুই হাতের তালুতে নিয়ে দুই পায়ের হাঁটুর নিচে একবারে গোড়ালি পর্যন্ত ভালো করে মাখিয়ে দেবে।'

এই কাজটাও নিজে করে দেখিয়ে দিলো সে। দুই পায়েই মাখিয়ে নিলো পাতার চিবানো রস।

সেনারা এবার আর ভয় পেলো না। আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। সেনা উপদেষ্টা নিজেই করে দেখিয়েছে। সবাই পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অনুকরণ করতে লাগলো রুদ্রদেবের।

সবার সাথে সাথে রিপুজিত আর অসিও পাতার রস দুই পায়ে লাগিয়ে নিলো। রিপুজিত কাজটা শেষ করে রুদ্রদেবের কাছে এসে দাঁড়ালো, 'আপনি বললেন, ওরা তীর ছুঁড়বে না, কিছুই করবে না। এই কথাটা মেনে নিতে পারলাম না। আপনি কি ওদের ওপর কালো জাদু করেছেন? সেই বিদ্যেও কি আপনার জানা আছে?'

'না, সেই বিদ্যে আমার জানা নেই।'

'তাহলে আমরা যখনই সেতু বিছাতে যাবো, তখনই তো ওরা তীর ছুঁড়বে। ওদের দেওয়ালের ওপরের সেনাদের চোখ এড়িয়ে এই কাজটা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ওরা একই সাথে ভেতরের সেনাদের সতর্ক করবে আর আমাদের তীর ছুঁড়ে নাস্তানাবুদ করবে।'

'সেটা আমিও জানি। তাই তো আমরা এবার ভেতরে ঢুকতে আমাদের বানানো সেতু ব্যবহার করবো না। ওদের সেতু দিয়েই পেরোবো।'

'মানে?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রিপুজিত তাকালো রুদ্রদেবের দিকে, 'ওদের সেতু ফেলতে হলে আমাদের আগে পরিখা পেরোতে হবে। আপনি পরিখা কী করে পেরোবেন?'

'সেই উপায়ও ভেবে রেখেছি। একটু পরেই সব দেখতে পাবেন। এখন আমাকে কিছু হাতের কাজ সেরে নিতে হবে। চলুন।'

'আচ্ছা, চলুন দেখি কী হাতের কাজ করবেন আপনি।' এবার উত্তেজনা পেয়ে বসেছে রিপুজিতকে।

শিবিরের ভাণ্ডার ঘরে চলে এলো ওরা দুজনে। এখানে অনেক কিছু রাখা আছে। সেগুলো থেকে খুঁজে দড়ির বেশ বড়ো দুটো পাকানো তাল বের করে নিলো। ওজন

নেহাত কম না। দুটো তাল খুলে দড়ি দুটোকে নিপুণ হাতে জোড়া দিয়ে ফেললো রুদ্রদেব। বেশ লম্বা একটা দড়ি পাওয়া গেছে এবার।

'শুনুন, রিপুজিত, আমি এই দড়ির সাহায্যেই ওপারে যাবো। আমি যেভাবেই হোক, ওপারে গিয়েই সেতু নামিয়ে মশালের সংকেত দেবো আপনাদের উদ্দেশ্যে। আপনি তখন সেনাদের নিয়ে সাবধানে পরিখা পেরিয়ে আসবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ,' মুখে যদিও সায় দিলো রিপুজিত, কিন্তু তার কোনো ধারনাই নেই কীভাবে রুদ্রদেব এই দড়ির সাহায্যে পরিখা পার হবে। এই অসম্ভব কাজ কীভাবে করবে সে? থাক, যেভাবে পারে করুক। তার ওপর যে দায়িত্ব সেটা পালন করবে সে। সেনাদের নিয়ে সেতু পেরিয়ে যেতে হবে নগরের ভেতরে।

অস্ত্র ভাণ্ডারের ভেতরে এসে দুটো ভয়াল দর্শন তীর বের করে নিলো রুদ্রদেব। এই তীর গুলো আকার আর ওজনে অনেক ভারী। সাধারণত শত্রুর শক্ত বর্ম ভেদ করতে, অথবা শত্রুকে বর্ম সমেত ঘোড়া অথবা রথের পিঠ থেকে ফেলে দিতে এই তীরগুলো ব্যবহার করা হয়।

জোড়া দেওয়া লম্বা দড়ির এক প্রান্ত তীরের প্রান্তের সাথে বেঁধে দিলো রুদ্রদেব। রিপুজিত আগে থেকেই তার সাথে ছিল। এখন অসিতও এসে যোগ দিয়েছে। দিনের বেলাতেই রুদ্রদেব লক্ষ্য করেছিল, বারিগাজার পরিখার ঐ পাশেই একটা শক্তপোক্ত গাছ আছে। সেটাকেই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলো রুদ্রদেব।

সবকিছু ঠিক হয়ে আছে। এবার শুধু অপেক্ষার পালা। সাতবাহনের বিশেষ বাহিনীর সব সদস্য শস্ত্র আর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

গাছের নিচের গাঢ় অন্ধকারে অপেক্ষায় আছে রুদ্রদেব, অসিত আর রিপুজিত। সঠিক সময়ের অপেক্ষা। রুদ্রদেব জানে সেই সময় আসতে খুব বেশি দেরি নেই।

৯২

রাতের বেলা নব বিবাহিত দম্পতি ছাড়া সবাই ঘুমায়, অনিদ্রার রোগীদের কথা আলাদা। বয়স্ক যেসব মানুষ নিজের স্মৃতির ভিড়ে চাপা পড়ে তারা ঘুমাতে পারেন না। বারিগাজার প্রহরীরা সেসব দলে পড়ে না, তাই তাদের একটু ঝিমুনি লেগে এসেছিল। তবে, সবাই যে ঘুমের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে তা নয়। নগরীর বাইরে যে শত্রু অপেক্ষা করছে। অসতর্ক হবার সময় না এখন। একটুও ভুল করলে জীবন দিয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সেনাপতি অ্যালেক কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। শত্রুর ওপর দেওয়ালের ওপর থেকে দিনরাত এক করে পাহারা দিতে হবে। তাই এই মুহূর্তে সবার নজর ওদিকেই আছে।

আর সেই কারণেই একেবারে দেওয়ালের নিচের দিকে নজর গেল না তাদের। প্রদীপের নিচে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি খুব কাছে মানুষের নজর থাকে না। এই কারণেই মানুষের সব বড়ো বড়ো বিপদের কারণ মানুষের কাছের মানুষই হয়।

দেওয়ালের গায়ে যেসব লতা গজিয়ে উঠেছে সেগুলো বেয়েই উঠে এলো সেই মহাবিপদ। প্রহরীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সামনের দিকে, নিজের পায়ের দিকে নজর দিচ্ছে না এখনও।

প্রথমে দেওয়াল বেয়ে যে রাজ গোখরোটা উঠে এসেছে, সে ছোবল বসালো পরিখার সেতুর নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ঠিক কাছের দেওয়ালের এক প্রহরীকে। একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠলো প্রহরী। তেমন একটা ব্যথা পেলো না সে। শুধু ঠোঁটে অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠলো। ব্যথাটার উৎস বুঝতে পারলো না সে, শত্রুপক্ষ থেকে কোনো নড়াচড়া হয়নি। কোনো তীর অথবা বর্শাও ছুটে আসেনি। কিন্তু ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে। একটু একটু করে অবশ হয়ে আসছে শরীর। একটু পরেই তীব্র জ্বালা শুরু হল, কিন্তু মুখে কোনো শব্দ করতে পারলো না প্রহরী।

শিকার ব্যথার উৎস বুঝতে না পারলেও সেই মারাত্মক বিষ ভালোই কাজ করেছে। দেওয়ালের ওপর নিঃশব্দে পড়ে গেল সে। মুখ দিয়ে লালা বের হয়ে আসছে, কোনো শব্দ করার সামর্থ্য নেই। একবার টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো প্রহরী, আবার পড়ে গেল।

সদর দরজার ওপরে ঐ জায়গায় ঠিক তিনজন প্রহরী ছিল। তাদেরকে তিনটা রাজ গোখরো একসাথেই ছোবল দিয়েছে। তাদের তিনজনের একই পরিণতি। মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে একটু পরেই প্রাণ বেরিয়ে গেল।

গুল্ম খোঁজার সাথে সাথে এই রাজ গোখরো খুঁজতেই আজ জঙ্গলে গিয়েছিল রুদ্রদেব। আসার সময়েই জঙ্গলের ধারটা তার নজরে পড়েছিল। সেখানেই রাজ গোখরোর চলাচলের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল তার অভিজ্ঞ চোখ। তখন কিছু না ভাবলেও পড়ে শত্রুর বাজ ব্যবহার দেখে রাজ গোখরো ব্যবহার করার বুদ্ধি মাথায় এসেছে রুদ্রদেবের।

খুঁজে খুঁজে ভাগ্যক্রমে আসল রাজাকেই খুঁজে পেয়েছিল সে। তারপরের কাজটাও ভালোভাবেই করেছে। সাপটাকে সম্মোহন করে বশে এনেছে। এবার এই সাপ তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য। সে যতক্ষণ সাপটা থেকে সম্মোহন মন্ত্র না তুলে নেবে ততক্ষণ সাপটা তার ইশারায় চলবে। শুধু এই একটা সাপ নয়, সে যেহেতু রাজা, তাই তার নিয়ন্ত্রণের অন্য সব বিষধর সাপও রুদ্রদেবের অধীনে কাজ করবে। সাপেদের একটা বিশাল বাহিনী রুদ্রদেব নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। পোষা বাজ বাহিনীর জবাব সম্মোহিত সাপ বাহিনী দিয়েই দেওয়া হবে।

সাপ কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। এমনিতে শিকার করার সময় সাপ এতটা বিষ ঢালে না। তবে এখন তারা সম্মোহিত। রুদ্রদেব জানে পরিখার সেতুর কাছের প্রহরীদের কেউ যদি সাপের ছোবল খেয়ে চিৎকার করে ওঠে তাহলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই সাপেদের ওপর নির্দেশ ছিল সেখানে ছোবলে বেশি করে বিষ ঢালার, যাতে করে প্রথমেই মুখে লালা চলে আসে আর কেউ কোনো আওয়াজ করতে না পারে।

তিন সেনা এখন মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছে। দেওয়ালের এই দিকে এখন আর কারো দৃষ্টি নেই। রুদ্রদেব জানে নজর রাখছে না ঠিক কিন্তু সময় খুব বেশি পাওয়া যাবে না। যে কোনো সময় অন্য সেনাদের এই শূন্যস্থান নজরে পড়ে যেতে পারে।

ভয়াল দর্শন তীরটা চার হস্ত বিস্তারের ধনুকে স্থাপন করলো রুদ্রদেব। রিপুজিত আর অসিতের চোখ যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে। তাদের বিস্ফোরিত দৃষ্টির সামনে ছিলা বেশ করে টেনে সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে এলো। লক্ষ্য মনে মনে আগেই স্থির করা আছে। ধনুক ফিরিয়েই ছিলা ছেড়ে দিলো। চোখের পলকে ছুটে গেল তীর।

তীরটা ছুটে যাবার সময় পুচ্ছের কাছে বাঁধা দড়িটাও নিয়ে গেল। পরিখা পেরিয়ে ওপারের গাছের কাণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করলো সহজেই। তীরের সাথে বাঁধা দড়ির অপর প্রান্তটাও চলে যেতো ওদিকে, তবে সময়মতো ধরে ফেলেছে রুদ্রদেব।

রুদ্রদেব হাত চালালো তাড়াতাড়ি। দড়ির এই দিকের প্রান্ত এদিকের গাছের কাণ্ডে বেঁধে ফেললো সে।

রিপুজিত আর অসিতের দিকে ফিরল সে, কণ্ঠে বেশ তাড়াহুড়া, 'শোনো, আমি এখন এই দড়ি দিয়ে ওপাশে যাবো। ঐদিকের প্রহরীরা এখন সবাই মৃত। আমি গিয়েই ওদের যন্ত্র ব্যবহার করে ওদের সেতু নামিয়ে দেবো। তোমরা তো তৈরিই আছো। সেতু নামতেই এক পলও দেরি করবে না। সাথে সাথে সেতু দিয়ে সেনা ছুটিয়ে দেবে। যথা সম্ভব নিঃশব্দে দৌড়াতে বলা আছে সেনাদের। ওপাশের সদর দরজাও আমি খুলে দেবো।'

'কিন্তু, আপনি ওপাশে এই দড়ি দিয়ে যাবেন কেমন করে? কাজটা অত সহজ হবে না।' রিপুজিতের কথাটা মুখেই রইল। রুদ্রদেব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এক লাফে সে উঠে পড়লো সেই টানটান করে বেঁধে রাখা দড়ির ওপর। তারপর সে যা করলো তাতে বড়ো বড়ো বাজিকর অথবা বানরের দলেরও ঈর্ষা হতে বাধ্য। এই

সরু দড়ির ওপর দিয়ে রুদ্রদেব এমন ভাবে দৌড়ে পেরিয়ে গেল যেন এটা একটা প্রশস্ত রাস্তা। ওপাশের দেওয়ালের ওপর লাফিয়ে নামলো সে।

এই দেওয়ালের জায়গায় প্রহরী তিনজন থাকলে অবশ্য এই কাজটা কোনোভাবেই করা যেত না। তাই সাপ পাঠিয়ে আগে এই তিনজনের ব্যবস্থা করেছে। এই মুহূর্তে তার পাশেই পড়ে আছে তিনজনের মৃতদেহ। একটা সাপও সে দেখতে পেলো দেয়ালের ওপর।

সেদিকে নজর দিলে এখন চলবে না। প্রথমেই সে যে দড়ি বেয়ে এসেছে সেটা এক কোপে কেটে দিলো সে। তারপরে নিভিয়ে দিলো দেওয়ালের ওপরের তিনটে মশাল। নইলে যে কারো নজরে পড়ে যেতে পারে। তবে সে এটাও জানে দেওয়ালের ওপরের সেনাদের বেশিক্ষণ ফাঁকি দেওয়া যাবে না। যন্ত্রের খোঁজ করতে হবে এখন।

দেওয়াল থেকে এক লাফে নগরীর ভেতরে নামলো সে। সদর দরজাটা দেখতেই তার মন দমে এলো। একজনের জন্য এই দরজা খোলা রীতিমতো অসম্ভব। সেই চেষ্টাও করলো না রুদ্রদেব। আবার দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে এলো। এবার লাফিয়ে নামলো পরিখার দিকে। এখানে এসেই খুঁজে পেলো সে যন্ত্রটা।

দুটো দড়ি দিয়ে পরিখার সেতু বাঁধা আছে। যন্ত্র ঘোরালেই সেই সেতু বিছিয়ে যাবে পরিখার ওপর। যন্ত্রের হাতল ঘোরানো অনেক কঠিন। দাঁতে দাঁত চেপে ঘোরালো সে। অনেক চাপ লাগাতে আস্তে আস্তে সেতু নামতে লাগলো পরিখার ওপর।

ওপাশ থেকে রিপুজিত আর অসিত সেতুর আস্তে আতে নেমে আসা দেখছে। বুঝতে পেরেছে রুদ্রদেব সফল হয়েছে। তবে এখনও পরিকল্পনার অনেক অংশই বাকি। তাদেরকে তাদের কাজটা ঠিকমতো করতে হবে।

নিজের সেনাদের ইশারা করলো রিপুজিত। অন্ধকারে কোনোমতে গা ঢাকা দিয়ে সেতুর দিকে এগোতে লাগলো বাহিনী।

সেতু পরিখার দুই প্রান্ত জুড়ে দিয়েছে ঠিক তখনই বাঁধল বিপত্তি। দেওয়ালের ওপরের এক প্রহরীর চোখে পড়ে গেল ঘটনাটা। সে কোনো শব্দ পায়নি। শুধু পরিখার ওপর দিয়ে বিছানো সেতু অন্ধকারে দেখতে পেয়েছে। সেটুকুই যথেষ্ট। জোরালো ঘন্টাধ্বনিতে কেঁপে উঠলো নগর। সাথে চিৎকার তো আছেই। নিজের গলার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চেঁচাচ্ছে বারিগাজার দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরা।

রুদ্রদেব দাঁতে দাঁত চাপল আবার। না, তীরে এসে তরী ডুবতে দেওয়া যাবে না। প্রহরীরা সবই দেখতে পেয়েছে। আর লুকানোর কিছু নেই। দেওয়ালের ওপর উঠে চিৎকার করলো সে নিজের সেনাদলের দিকে, 'তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এসো, ছোটো।'

সদর দরজা নগরীর ভেতর থেকে খোলে। সেদিকের হুড়কো খুলে দিয়ে এসেছিল রুদ্রদেব। টানা অপেক্ষা ঠেলা সোজা, তাই এপাশ থেকে ঠেলা দিয়েই দরজা খোলার পরিকল্পনা করেছিল। তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওপাশ থেকে আবার কেউ হুড়কো তুলে দিলেই শেষ।

সেনাদের আসার অপেক্ষা করলে হবে না। নিজেই কাঁধ দিয়ে জোরে চাপ দিলো দরজার ওপর। সাথে সাথে জোরালো চিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে। রীতিমতো জান্তব সেই গর্জন। হ্রেষার সাথে তার কিছুটা মিল আছে।

ওদিক থেকে বারিগাজার সেনারা ছুটে আসছে সদর দরজার দিকে। তদের পায়ের আওয়াজ পেলো রুদ্রদেব। আবার কাঁধ আর শরীর একত্র করে ধাক্কা দিলো দরজার গায়ে। এবার দরজার পাল্লা যেন একটু ফাঁক হয়ে এলো।

নতুন উৎসাহে দম নিয়ে আবার চাপ দিলো সে। জড়তা একবার কেটে যেতেই এবার দরজা নড়তে শুরু করেছে। মানুষ ঢোকার জায়গা হতেই ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

তখনই সে বুঝতে পারলো দরজা খোলার জন্য তার একা চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। তার বাহিনী এখনও সেতুর মাঝ পর্যন্তই আসেনি, ওদিকে বারিগাজার সেনার একটা অংশ সদর দরজার একেবারে কাছে চলে এসেছে। নিশ্চিত ওরা তার আগে পৌঁছাতে পারলে হুড়কোটা লাগিয়ে দিতো।

দলের প্রথম সেনা রুদ্রদেবের হঠাৎ ঢুকে পড়া দেখে থমকে গেল। তবে রুদ্রদেব থমকাল না। অর্ধ চন্দ্র ভল্লের এক আঘাতে পরলোকের পথে তাকে পাঠিয়ে দিলো সে। স্বর্গের পথে গেল না নরকের পথে ঠিক বোঝা গেল না।

তবে, এটা শুধু কাজের শুরু, বিপদের শুরু। সামনের সাথী নিহত হতেই একসাথে পনেরো জন বারিগাজার সেনা আক্রমণ করলো রুদ্রদেবকে।

মুচকি হাসল রুদ্রদেব, অনেকদিন পর এমন সুযোগ সামনে এসেছে। এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দুই পাক ঘুরলো সে। সামনে ভল্ল বাগিয়ে ধরা। ছিটকে সরে যেতে বাধ্য হল সেনারা। এত দ্রুতগতির সাথে তাদের পরিচয় নেই। ভল্লের আঘাতে তিনজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, বাকিদের কয়েকজনের গায়েও আঁচড় কেটেছে ধারালো ফলা।

ততক্ষণে সাতবাহন বাহিনী সদর দরজায় পৌঁছে গেছে। তাদের মিলিত চাপে সদর দরজা পুরোপুরি খুলে গেল। পিলপিল করে ভেতরে ঢুকছে সাতবাহন সেনা।

ভল্লের এক আঘাতে সামনে এক সৈন্যকে ফেলে দিয়ে ছুটল রুদ্রদেব। রিপুজিতের নেতৃত্বে সেনারা তাদের কাজ ভালোভাবেই সামলে নেবে। অসিতও জানে তাকে কী করতে হবে। ওদিকে নজর দেয়ার দরকার নেই। ওদিকে রিপুজিতের তড়িৎ নির্দেশে সাতবাহন সেনারা পুরো বারিগাজায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বারিগাজার প্রাসাদের দিক থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। তার মানে আসল প্রতিরোধের সম্মুখীন এখন হতে হবে। জায়গায় থেমে গেল রুদ্রদেব। নিজের মনোযোগ এক জায়গায় একত্রিত করলো। মনোযোগের পূর্ণ শক্তি আজকে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যবহার করলো সে।

ওদিকে দেওয়ালের ওপরের মহাঘন্টার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে অ্যালেকের। বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসলো সে। নিজের বাহুলগ্না সুন্দরী ছিটকে গেল বিছানা থেকে। এই শব্দের মানে জানে অ্যালেক। এই ঘন্টা কেবল মহা বিপদেই বাজে।

তার মানে শত্রু এই রাতের বেলাতেই কোনো চাল চেলেছে। মারাত্মক কোনো চাল। কিন্তু কী হতে পারে? ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে।

এখান থেকে সে যেই দৃশ্য দেখল, তাতে তার আতঙ্ক একেবারে উঁচুতে উঠে গেল। পরিখার ওপরের সেতু নেমে গেছে। তাতে শত্রুসেনারা ভেতরে ঢুকছে পিলপিল করে। সদর দরজার সামনে মশালের আলোয় তার সেনাদের লড়াই স্পষ্ট দেখতে পেলো সে।

সেনাদের তৈরি করার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে নিচে নেমে এলো অ্যালেক। যুদ্ধ সাজ খোঁজা বা পরার সময় এখন নেই।

নিচে নেমে সে দেখল, সৈন্যরা সবাই বিছানা ছেড়ে অস্ত্র হাতে উঠে এসেছিল। কারোই যুদ্ধ সাজ নেই। পরার সময় তারাও পায়নি। হাতের আছে যে যেই অস্ত্র পেয়েছে তা নিয়েই বেরিয়ে এসেছে।

অ্যালেক একটা আদেশই দিলো, এই সময়ে এই একটা আদেশই দেওয়া যায়, 'আক্রমণ। শত্রুদের কোনো রকম ক্ষমা করবে না। রক্তের শেষ বিন্দু থাকা পর্যন্ত আমরা লড়াই করবো।'

যুদ্ধ হুংকার দিয়ে বারিগাজার সেনা এগিয়ে গেল অগ্রসরমান সাতবাহন বিশেষ সেনাদলের দিকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখতে পেলো শত্রুসেনার সাথে এক ভয়ংকর সাথী যুক্ত হয়েছে। ভয়ংকর দর্শন সব গোখরো তাদের পক্ষে যুদ্ধ করছে। সেই সাপগুলো কেবল আক্রমণ করছে বারিগাজার সেনাদের। একেক ছোবলে টলোমলো পায়ে লুটিয়ে পড়ছে বারিগাজার সেনারা। যারা সাপের ছোবল এড়াতে পারছে তারা মারা পড়ছে শত্রুসেনার অস্ত্রের আঘাতে। বেছে বেছে শত্রু নিধন করছে সাতবাহন সেনারা।

তবে, প্রথমে সাপ দেখে সাতবাহনের সেনারাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। রুদ্রদেব চেঁচিয়ে বলেছিল তাদের উদ্দেশ্যে, 'তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না। এই সাপ তোমাদের কিছু বলবে না। নির্ভয়ে যুদ্ধ করো।'

তখনই সাতবাহন সেনা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করতে শুরু করেছে। সেনা উপদেষ্টার কথা আর ক্ষমতার ওপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। দুই দিকের তীব্র আক্রমণে ঝড়ের ধুলোর মতো উড়ে যেতে লাগলো বারিগাজার সেনারা।

অ্যালেক বুঝতে পেরেছে পরাজয় সমাগত। সেটা বুঝতে পেরে তার ক্রোধ চরমে উঠলো। তলোয়ারের হাতলে তার হাতের তালু শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। জীবনের শেষ এবং সেরা ঝলক দেখাতে হবে আজকে।

তখনই তার সামনে প্রায় বুক সমান উঁচুতে উঠে এলো এক রাজ গোখরো। ছোবল বসিয়ে দিলো একেবারে কপাল বরাবর। কিন্তু অ্যালেক সাধারণ কোনো সেনা নয়। তার তলোয়ারে যেন বিদ্যুতের চমক। ছোবল বসানো রাজ গোখরোর ফনা কেটে ফেললো সে তলোয়ারের এক আঘাতে। সাপের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। দেহটা মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগলো।

অ্যালেকের একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল রুদ্রদেব। এই কাজটা সে একেবারে কাছ থেকে দেখেছে। বাহবা দিলো সে জোর গলায়, 'বাহ, একেই বলে তলোয়ার চালনা।'

তীব্র দৃষ্টিতে এবার তার দিকে তাকাল অ্যালেক। রুদ্রদেব শান্ত স্বরে বলল, 'আচ্ছা, আপনার অবাক লাগছে না, কেন সাপগুলো কেবল আপনার সেনাদেরই ছোবল দিচ্ছে। কেন আমার সেনাদের কিছু বলছে না। কী কারণ হতে পারে?'

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অ্যালেক, 'অবাক লাগার কি আছে? তোমাদের এই ভারতীয়দের আমি খুব ভালো করেই চিনি। তোমরা কালও জাদুতে ওস্তাদ। এটাও নিশ্চয়ই কোনো ধরনের ছলনাময় কালো জাদু।'

'মানুষ অজ্ঞানতাকে সব সময় কালো জাদু ভাবে। তোমাকে বলে রাখি, যদিও এই জ্ঞান এই জীবনে তোমার আর কোনো কাজে আসবে না। একটা পাতা পাওয়া যায় আমাদের ভারতের জঙ্গলে। সেই পাতার রস শরীরে বিশেষ করে পায়ে মাখিয়ে রাখলে সাপেরা ঐ শরীরের কাছে আসে না। এটা একটা আয়ুর্বেদের জ্ঞান, কোনো কালো জাদু নয়।'

'শোনো, কালো জাদু, জ্ঞান, এসব উটকো আলাপ বাদ দাও। এসো তলোয়ারের ভাষায় কথা বলি।'

'সানন্দে, এই কথার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম।' রুদ্রদেব কথাটা শেষ না করতেই নিজের তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো অ্যালেক। এক লাফে পিছু হতে সেই আঘাত এড়িয়ে গেল রুদ্রদেব।

পরের আঘাতটা আর এড়িয়ে গেল না সে, তলোয়ারে ফিরিয়ে দিলো। তাতে অবশ্য অ্যালেক একটুও দমলো না, একের পর এক আঘাত করেই যেতে লাগলো, বেশ জোরের সাথে। আঘাতগুলো এড়াতে এড়াতে সামনের যোদ্ধার প্রতি আচমকা করুণা অনুভব করলো রুদ্রদেব। ক্রোধ যখন দৃঢ়তা দেয়, তখন সেটা শক্তি, আর যখন অন্ধ করে দেয়, তখন তা দুর্বলতা। এখানে ক্রোধ তার শত্রুকে অন্ধ করে দিয়েছে। আর এই কারণেই এই প্রবল শত্রুকে সহজেই হারিয়ে দিতে পারবে সে।

অ্যালেক লাফিয়ে দুই পাক ঘুরলো, তারপর তলোয়ার চালাল রুদ্রদেবের গলা লক্ষ্য করে। মাথা নিচু করে বসে পড়লো রুদ্রদেব। ভূমির সাথে লম্ব ভাবে নিজের তলোয়ার একবারেই গেঁথে দিলো অ্যালেকের বুকের ঠিক বাম দিকে।

এই আঘাতকে যুদ্ধের ভাষায় দয়ার আঘাত বলা হয়। পরাজিতের এখানে মৃত্যুর যন্ত্রণা সবচেয়ে কম হয়।

কুরুক্ষেত্রে চক্রব্যূহতে অভিমন্যুর সেই নরক যন্ত্রণার অন্ত কর্ণ ঠিক এই আঘাতেই করেছিলেন।

৯৩

রাজা মারা গেলে যুদ্ধ হয়, যদি যুবরাজ জীবিত থাকে। যুবরাজ মারা গেলেও যুদ্ধ হওয়া সম্ভব, যদি সিংহাসনের দাবিদার অন্য কেউ হাল ধরে। সবকিছু হারিয়ে গেলে, মারা গেলে জীবনে লড়াই করা চলে কিন্তু ভরসার গলা যদি কোনো ধারালো তলোয়ারে কেটে যায় তাহলে আর যুদ্ধ করা চলে না।

অ্যালেক এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল ভরসা। কেউ কোনো নিয়মের ধার ধারল না, কেউ বীরত্ব দেখাবার চেষ্টাও করলো না। অ্যালেকের দেহের সাথে সাথে সম্পূর্ণ বারিগাজার সেনার মনোবল যেন ভূপাতিত হয়েছে।

বারিগাজার সেনারা সবাই অস্ত্র ত্যাগ করলো। যারা এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেলো না, তারা একটু চালিয়ে যেতে লাগলো লড়াই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারাও বুঝতে পারলো এখানে হাতিয়ার ব্যবহার করে আর লাভ নেই। রুদ্রদেব জানে, যুদ্ধক্ষেত্রে এই অবস্থা ভয়ানক। নিজের সেনাদের সামলাতে না পারলে তারা এখন পাপ করবে। অস্ত্র ত্যাগ করা সেনারা এখন শরণাগতের অন্তর্গত। তাদেরকে এখন কোনোমতেই বধ হতে দেওয়া চলবে না।

রুদ্রদেব রিপুজিতকে খুঁজতে লাগলো। একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল তাকে। রিপুজিতের সামনে তাড়াতাড়ি গিয়ে বলল রুদ্রদেব, 'এখন সেনাকে সামলাতে হবে। আপনার এক হুংকার ছাড়া ওরা থামবে না। এখন আপনিই পারেন ওদের পাপ করা থেকে থামাতে।'

রিপুজিত কথাটা বুঝতে পেরেছে। সে চিৎকার করে উঠলো বজ্রকণ্ঠে, 'সবাই শত্রুদের বন্দি করো। পালিয়ে গেছে অনেক সেনা। ওদের খুঁজে বের করো। ওদেরকে বন্দি করে এক জায়গায় জড়ো করো। প্রাসাদের সদর দরজায় কড়া পাহারা বসাতে হবে। কেউ যাতে ঢুকতেও না পারে, বেরোতেও না পারে।'

রিপুজিতের কথাটা শুনেছে রুদ্রদেব। একটু পিছিয়ে এসে সে অসিতের দিকে ইশারা করলো, 'চলো আমার সাথে।'

রিপুজিতের সাথে সাথে একদল সেনা চলে গেল প্রাসাদের ফটকে। বাকি সেনারা চালাতে লাগলো বন্দি করার কার্যক্রম।

প্রাসাদের ভেতরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে। অসিত আর রুদ্রদেব মোটামুটি গোপনেই ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়েছে। এখন ভেতরে চলাচল করতেও ওদের তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

রুদ্রদেব চলতে চলতে অসিতের প্রশংসা করলো, 'আজ তুমি বেশ ভালোই লড়েছ অসিত। এখনও যদিও অনেক কিছুই শেখার বাকি আছে তোমার, তবু আজকের লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে তোমাকে এখন মাঝারি মানের সেনা বলাই যায়।'

বিদ্রুপ গায়ে মাখল না অসিত। সেদিন তীরে দুজনের প্রাণ নিয়েছিল সে, আর আজকে তলোয়ারে সাতজনের। তীরে কাউকে মারা আর তলোয়ারে মারার মধ্যে

অনেক পার্থক্য। শত্রুর শেষ নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনার মধ্যে বীরত্ব আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেটা যে মনের ওপর একটা বিশাল প্রভাব ফেলে তাও সন্দেহাতীত। তবে যুদ্ধক্ষণে সেসব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। তখন শস্ত্রধারীর অভ্যাস আর শিক্ষার বলে এমনিতেই প্রাণ হরণ করেছে।

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো অসিত, 'আচ্ছা। প্রাসাদের সামনে আমাদের সেনা পাহারায় আছে। কিন্তু আমরা প্রাসাদে একাই প্রবেশ করছি। এখানে তো ওদের লুকানো অনেক সেন্য থাকতে পারে।'

'লুকানো থাকতে পারে না, আমি জানি লুকানো আছে।' উত্তর দেয় রুদ্রদেব।

'তাহলে আমরা একা কেন প্রবেশ করছি?'

'এই প্রাসাদে এই মুহূর্তে একা প্রবেশ না করে আমার উপায় নেই। আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে।'

'কেন একা প্রবেশ করতে হবে?'

'তা একটু পরেই বুঝতে পারবে।'

প্রাসাদের নির্মাণ শিল্প মানে বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কে রুদ্রদেবের ভালোই ধারণা আছে। এসব রাজ প্রাসাদের বাস্তুর হিসেব একটু আলাদা। তার মানে সাধারণ সেসব বৈশিষ্ট্য এই প্রাসাদ নির্মাণের সময় ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে অস্ত্রাগার থাকার কথা সেখানেই আছে, যেখানে হাতিশাল থাকার কথা সেখানেই আছে। তার মানে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যেখানে রত্নাগার থাকার কথা সেখানেই নিশ্চয়ই থাকবে।

সেই হিসেব করে অসিতকে সঙ্গে নিয়ে রত্নভাণ্ডারের সামনে চলে এলো রুদ্রদেব। তবে এরপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। রত্নাগারের দরজায় অনেক প্রহরীদের দেখা যাচ্ছে।

অসিতও দেখতে পেয়েছে প্রহরীদের। দশ পনেরো জনের কম হবে না। ওদের দুজনকে দেখে সেনারা তেড়ে এলো না, দরজা আগলে নিজেদের অবস্থানে বর্শা বাগিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

অসিত কোমর থেকে তলোয়ার বের করে নিয়েছে। আস্তে আস্তে প্রহরীদের দিকে এগোতে উদ্যত হলো সে। সংখ্যা এখন আর তাকে ভয় পাওয়াতে পারে না। আত্মবিশ্বাস তার একেবারে তুঙ্গে। পেছন থেকে তার ঘাড়ে হাত রাখল রুদ্রদেব, চাপা স্বরে বলল, 'থামো।'

অসিত থেমে পেছনে ফিরে তাকাল, তার চোখে অবিশ্বাস, 'আপনি এই কয়েকজন সাধারণ সেনাকে ভয় পেয়ে গেলেন?'

রুদ্রদেবের দৃষ্টি সতর্ক, 'না অসিত, আমি সেনা দেখে ভয় পাইনি। কিন্তু ওরা এতজন হয়ে আমাদের দুজনকে দেখে কেন এগিয়ে আসছে না, সেটা দেখে ভয় পেয়েছি। আমরা কেমন কুশলী যোদ্ধা তা তো ওদের জানার কথা নয়। তবু ওরা এগিয়ে আসছে না কেন? আমি এমন রত্ন ভাণ্ডার অনেক দেখেছি। এজন্যই ভয়ের মাত্রাটা আরও বাড়ছে।'

'ওরা রত্নাগারের দরজায় পাহারা দিচ্ছে বলে এগিয়ে আসছে না, সহজ হিসেব।'

'শোনো অসিত, একমাত্র অজ্ঞানতাই মানুষকে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে। এই প্রাসাদ স্পষ্টতই বাস্তুশাস্ত্র মেনে বানানো হয়েছে। আর প্রাসাদ বানানোর শাস্ত্রে কিছু

গুহ্য নিয়ম থাকে। আর সেই গুহ্য নিয়মানুযায়ী রত্নাগার রক্ষার জন্য বেশ কিছু স্বয়ংক্রিয় গুপ্ত অস্ত্রের ব্যবস্থা থাকার কথা। ওরা সেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলোর ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। এখন ওরা যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে সেই অস্ত্রগুলো ওদেরকেই আক্রমণ করবে। তাই ওরা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে আসছে না।'

অসিত যেটুকু এগিয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ পিছিয়ে এলো। এবার তার গলায় আত্মবিশ্বাসের বদলে ভয়, 'এখন উপায়?'

উপায় কী সেটা রুদ্রদেবও আপাতত জানে না। সে ভাবছে। সবার জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না। রত্নাগারে তার একার প্রবেশ করা জরুরি। এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে, এসব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তৈরির কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। একেক কারিগর নিজেদের মেধা ব্যবহার করে একেক ভাবে তৈরি করে। এখানে কোথায় কী কল খাটানো আছে কে জানে।

নিজের মনোযোগের শক্তি একত্র করলো রুদ্রদেব। এখানে যাই করুক না কেন, তলের ওপর ভরের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করেই সেই যন্ত্র কাজ করবে। কোথায় সেই পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করা আছে সেটা আগে খুঁজে বের করতে হবে।

দেওয়ালের কাছেই একটা লম্বা পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকেই প্রথম নজর গেল রুদ্রদেবের। সজ্জার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে মনে হলেও একটু খটকা লাগলো তার। চারটে একই রকম পুতুল দুপাশে রাখা আছে। চারটেই একই রকম এক মানুষ সমান লম্বা।

রুদ্রদেবের নিজের ধনুক থেকে একটা তীর ছুটে গেল একটা পুতুলের দিকে। পুতুলটায় নাড়া লাগতেই চারটে পুতুলের মুখ আর শরীরের নানা জায়গা থেকে এক পশলা করে ছোটো তীর ছুটে এলো। এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল তীরগুলো চোখের পলকে। আর কয়েক হাত এগিয়ে থাকলেই এতক্ষণে রুদ্রদেব আর অসিতের ভীষ্মের শরশয্যা হয়ে যেত।

রুদ্রদেব বুঝতে পারলো পুতুলগুলোই সেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। ওরা পা বাড়ালে ভরের পার্থক্যে পুতুলগুলো তীর ছুঁড়বে। নাড়া লেগে ভর পার্থক্য হবার আগেই পুতুল থেকে তীর বেরিয়ে এসেছে।

রুদ্রদেব বুঝতে পারলো কী করতে হবে। আচমকা সবাইকে এমনকি অসিতকেও অবাক করে দিয়ে লাফ দিলো সে। শূন্যে থাকতেই দুটো পুতুলের মাথা সে ঘুরিয়ে দিলো রত্নাগারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাদের দিকে। নাড়া লাগতেই দুটো পুতুল থেকে ছুটে গেল তীরের বৃষ্টি। সেই তীরের পশলার সামনে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল প্রহরীর দোল। পরের দুটো পুতুলের ক্ষেত্রেও একই কাজ করলো রুদ্রদেব। চারবারের তীরের বৃষ্টিতে রত্নাগারের সামনের আর কোনো সেনাই জীবিত রইল না। চারটে পুতুলের মুখ এবার সে ঘুরিয়ে দিলো দেওয়ালের দিকে। এবার আর কোনো ভাবনা নেই। তীর বেরোলে দেওয়ালে গিয়ে বিঁধবে।

সয়ংক্রিয় অস্ত্র আর প্রহরী দুটোর ব্যবস্থাই একবারে করা গেছে। এবার রত্নাগারের দরজার চাবি খুঁজতে লাগলো মৃত সৈনিকদের কোমরে। বেশি সময় লাগলো না খুঁজে পেতে।

রত্নাগারে ঢুকেই ধন্ধে পড়লো রুদ্রদেব। তার পেছনে অসিত ঢুকে পড়েছে। সেও কিছুই বুঝতে পারছে না।

অনেকগুলো ছোটো বড়ো সিন্দুক সাজিয়ে রাখা আছে এদিক সেদিক। তার সেই বিশেষ সিন্দুকটা প্রয়োজন। তার স্মরণে ভালো করেই আছে, বারিগাজা ফেরত গুপ্তচর সেই সিন্দুক নিয়ে কী বলেছিল। একটা সিংহ খোদাই করা আছে সেই বিশেষ সিন্দুকের ওপর।

তাড়াতাড়ি সিন্দুকগুলো মশালের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগলো রুদ্রদেব। রত্নাগারের একেবারে পেছন দিকে সব সিন্দুকের পেছনে অবশেষে পাওয়া গেল সিংহ খোদাই করা সেই বিশেষ সিন্দুক।

চাবির তাড়া থেকে এবার সঠিক চাবি খুঁজে বের করার পালা। অসিতকে রীতিমতো ধমকে উঠলো রুদ্রদেব, 'মশালটা একটু এগিয়ে ধরো তো।'

অসিত তাড়াতাড়ি মশাল এগিয়ে ধরল। রুদ্রদেবের এমন অশান্ত অবস্থা সে আগে কখনো দেখেনি।

তাড়াহুড়ায় হাত চালালো রুদ্রদেব। চাবি বেছে নিচ্ছে, খোলার চেষ্টা করছে, ব্যর্থ হচ্ছে, তারপর আবার তুলে নিচ্ছে পরের চাবি। ওদিকে রিপুজিত যে কোনো সময় সেনা নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে আসতে পারে। প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলো রুদ্রদেব।

অবশেষে পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত চাবিটা। এক মোচড়ে খুলে গেল সিন্দুকের পাল্লা। কী মনে হতে পাল্লাটা খুলল না রুদ্রদেব। অসিতের দিকে তাকালো, 'তুমি একটু দরজার কাছে যাও তো। দেখো, এদিকে কেউ এসেছে কি না।'

অসিত চলে গেল। রত্নের দিকে তার আগ্রহ নেই। অঙ্গদকে খুঁজতে যেতে হবে ঝামেলা শেষ হলেই।

অসিত চলে যেতেই পাল্লাটা খুলে ফেলেছে রুদ্রদেব। ঝিকমিকিয়ে উঠলো রক্তনীলা। একবার দেখেই চিনতে পারলো সে, এটাই সেই রত্ন। কোনো ভুল নেই।

এক টানে নিজের কপালে বাঁধা ফেট্টি খুলে ফেললো সে। কপালের মাঝে গর্তটা অনুভব করলো একবার আঙুল দিয়ে। নীলাটা হাতে নিলো সে। এই রত্ন শক রাজা নাহাপনার সম্পত্তিও নয়, মহারাজ সাতকর্ণীর সম্পত্তিও নয়। এই রত্নের মালিক সে। কপালের গর্তে নীলাটা বসিয়ে দিলো সে আলতো করে। একেবারে খাপে খাপে মিলে গেল যেন। নিমেষে রুদ্রদেবের কপালের গর্তটা বুজে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেল। নীলাটা ঢেকে গেছে আচমকা গজিয়ে ওঠা চামড়ার নিচে। এবার আর তার কোনো আভা বাকি রইল না।

দরজায় অসিত দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্রদেব এসে দাঁড়াতেই সে বলল, 'কেউ নেই এখানে।' তারপর তাকাল রুদ্রদেবের দিকে। এই প্রথম রুদ্রদেবের কপাল দেখতে পেলো সে। যাক, অবশেষে পট্টি খুলেছেন তিনি।

প্রাসাদের বাইরের বেরোবার আগে রত্নাগারের সব তালা আবার লাগিয়ে দিলো ওরা। ওদের ঢোকার এখন আর কোনো চিহ্ন নেই। অসিতের দিকে তাকাল রুদ্রদেব, 'বৃথাই কষ্ট করলাম। তেমন কিছুই খুঁজে পাইনি।'

প্রাসাদের বাইরে চলে এলো ওরা। রিপুজিত সেখানেই সবাইকে একত্র করছে। বন্দি করা হয়েছে বারিগাজার সেনাদের।

রিপুজিত তাকাল রুদ্রদেবের দিকে, কিছুক্ষণের জন্য নিজের কাজ ভুলে গেল, 'বাহ। আপনার সব গুণের মধ্যেও বিচ্ছিরি একটা দোষ ছিল। মাথার ঐ বিদঘুটে কাপড়টা খুলে ফেলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এতদিনে আমার চোখের আরাম হলো। তা, কী খুশিতে এই কাপড় ত্যাগ করলেন? যুদ্ধ জয়ের খুশিতে?'

রুদ্রদেব হাসল, 'হ্যাঁ, তা ধরে নিতে পারেন। আচ্ছা শুনুন, আমি কয়েকজন সেনা নিয়ে এখন বন্দরের দিকটায় যাবো। ওদিকের হাল অবস্থাও একটু দেখা দরকার। ওখানে বিদেশি লোক আছে, সাধারণ লোক আছে, সেনারা আছে। তাদেরকেও একটু সামলাতে হবে।

অসিত আর একদল সেনাকে সাথে নিয়ে বারিগাজা বন্দরের দিকে রওনা দিলো রুদ্রদেব। অসিতের কানে কানে বলল সে, 'সাতবাহনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পালা। অঙ্গদকে নিশ্চয়ই বন্দরের দিকেই পাওয়া যাবে।'

সেনাদের নগরীর দিকে আসতে দেখে পথঘাট পুরো ফাঁকা হয়ে গেল। সেনাদের প্রতি আদেশ দিলো রুদ্রদেব, 'নগরীর সব সাধারণ লোকজনকে ঘর থেকে বের করে জড়ো করো। কেউ যেন ঘরের ভেতরে না থাকে।'

বন্দরে এসে মোটামুটি ধাক্কা খেলো অসিত আর রুদ্রদেব। বন্দর জাহাজ শূন্য। যুদ্ধের গোলমালের শব্দে সব জাহাজই বন্দর ছেড়ে পালিয়েছে। বন্দরের প্রহরীরাও নিজেদের পরিণতি জানে। তারাও নিশ্চয়ই ঐ জাহাজগুলো ধরেই চম্পট দিয়েছে। কেউবা যাবে বারবারিকনে, কেউ যাবে মিশরে, কেউবা আবার সবকিছু পেরিয়ে রোমে, গ্রীসে।

বন্দর খাঁ খাঁ করছে। আবার নগরীতে ফিরে এলো অসিত আর রুদ্রদেব। সেনার নাগরিকদের বের করে এনে জড়ো করার কাজটা ততক্ষণে প্রায় সম্পন্ন করে এনেছে।

অসিতের দিকে তাকাল রুদ্রদেব, 'তাড়াতাড়ি এই ভিড়ের মধ্য থেকে রাহুকে খুঁজে বের করো।'

রুদ্রদেবের আদেশ পেয়েই অসিত খুঁজতে শুরু করেছে। সবার মুখ দেখতে লাগলো মশালের আলোতে। একবার, দুবার, তিনবার। কিন্তু না, এখানে রাহু নেই, সেই চেহারা কখনোই ভুলতে পারবে না সে। সেই কাটা গাল, সেই কপট হাসি মাখা মুখ, ভুলে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

'রাহু এখানে নেই।' অসিতের গলায় আর্তনাদ।

'ভালো করে খোঁজো।' আচমকা রুদ্রদেবের মাথায় আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিলো। বারিগাজা বন্দরের সব প্রহরীর মাঝে একজন কেবল পালায়নি। অস্ত্র ত্যাগ করে এর মধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে সে। নিজের পরিবার কাছের এক নগরে থাকে। সেই পরিবারের চিন্তা পেয়ে বসেছিল তাকে।

তাড়াতাড়ি সেই প্রহরীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রুদ্রদেব, পেছনে আছে অসিত।

'তুমি রাহুকে চেনো?' সরাসরি প্রশ্ন করলো রুদ্রদেব।

'না। কে রাহু?'

অসিত এবার বলে উঠলো, 'গালে একটা কাটা দাগ আছে। সাথে একটা রঙিন বানরও আছে তার।'

এবার চিনতে পারলো প্রহরী, 'হ্যাঁ, রাহুকে চিনি। রঙিন বানর দিয়ে খেলা দেখায়। কিন্তু ও তো চলে গেছে।'

এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো অসিত, 'চলে গেছে মানে?'

'যখন প্রাসাদের দিকে গোলমাল শুরু হলো তখন সবাই বুঝতে পারলো ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিদেশি জাহাজ থাকার সাহস করলো না। রাহু সব বিদেশি ভাষা জানে। ওদের সাথে তার অনেক ভালো খাতির। সে তার রঙিন বানরের খাঁচা নিয়ে একটা বিদেশি জাহাজে করে চলে গেছে। আমার চোখের সামনেই। ছেলেটার চিন্তায় আমি আর যেতে পারলাম না। এখন বেঘোরে মরবো।'

রুদ্রদেব অস্ফুটে বলল, 'তোমার যাতে মরতে না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করবো।'

অসিত প্রহরীর কথাটা শুনে একটু দূরে এসে শানের ওপর বসে পড়েছে। তার আশা ভরসা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে আসছে তার চোখের সামনেই। অঙ্গদের এত কাছে এসেও ফল মিলল না।

রুদ্রদেবও এসে বসেছে তার পাশে, 'আমাদের লক্ষ্য পূরণ হয়নি অসিত। অঙ্গদকে আমরা খুঁজে পাইনি। আর ক্ষত্রিয় যোদ্ধা কখনো লক্ষ্য পূরণ হবার আগে চলা থামায় না।'

মহারাজ সাতকর্ণী পুরো সেনা নিয়ে কয়েকদিন পরেই বারিগাজা এসে পৌঁছান। তারপর সাতবাহন সেনা অভিযান করে উজ্জয়িনি পর্যন্ত দখল করে নেয়। শকদের বাণিজ্য আর রত্নের ভাণ্ডার পুরোপুরি চলে যায় সাতবাহনের হাতে। পুরো ভারত এক হবার আগে ভারতে এত বড়ো রাজ্য আর কোনো একক রাজা অথবা সম্রাটের ছিল না।

চোলা রাজ কারিকালা কলিঙ্গ দখল করেছিলেন অতি সহজেই। পুরস্কৃত ভূমিও ভোগ করেছিলেন তিনি। ইতিহাস অবশ্য এই কলিঙ্গ বিজয়ের কৃতিত্ব মহারাজ সাতকর্ণীকেই দিয়েছে। সেই হিসেবও একদিক দিয়ে ঠিকই আছে।